আর্থিক উন্নতি

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮ ৬ষ্ঠ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অনন্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাসাড়াশামাশাং বিষাসহিঃ॥
অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠত্ব' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী;—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াচ্ছে।

বাংলার কথা—তথ্য-সঙ্কলন

রংপুর

রংপুর জেলার পরিমাণফল ২২,২৬,৫৬০ একর। [illegible]রের সংখ্যা ৬ এবং গ্রামের সংখ্যা ৪,০২৬। মোট কর্ষিত [illegible]ন (১৯২৪ সনের রিপোর্টানুসারে) ১২,২৬,১০০ একর [illegible]ৎ মাথা-পিছু একরণ। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮১·২৫ [illegible]। গাই গরু ও ষাঁড়-বলদের সংখ্যা ৫,৬৭,১০৫। [illegible]ড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৭,০৯,৮৬১। লাঙ্গলের [illegible]া ৩,১৫,৫৯২। ১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন তামাকের [illegible]মাণ ১,০৪,৬২,৪৫০ মণ। ১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন [illegible]কের পরিমাণ ৩১,৯১,৫২০ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	[illegible]
১৮৮১	[illegible]
১৮৯১	২০,৬৫,৪৬৪
১৯০১	২১,৫৪,১১৫
১৯১১	২৩,৮৫,৩৩০
১৯২১	২৫,০৭,৮৫৪

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৭,৯১,১৪০ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১৭,০৬,১৭৭। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৭১৭।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সনে)

	শতকরা
মোট হিন্দুর সংখ্যা	৮·৬
„ মুসলমানের সংখ্যা	৪·৩
„ হিন্দু পুরুষের „	১৪·৮
„ মুসলমান „	৮·১
„ হিন্দু স্ত্রীলোক	১·৩
„ মুসলমান „ „	৭·২

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,১৩৭। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৭৩,৮০৯। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের) বালকবালিকার সংখ্যা ৬,৮৮,১৩২।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের) ৭০,৮৫৫।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৬,১৭,৮৭৭।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩০·২। হাজার করা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ৩০·৫ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৯·২।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫	৭২,১৩৯
	১৯২৫	৫০,৭৬০
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫	৮,৮৮২
	১৯২২	৪৭০
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫	২২২
	১৯২২	২৩৫

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু	২৩৭
স্ত্রী ”	২৩৭

ডাক্তারখানা

অন্ধ	১,৯৩৭
হিন্দু বিধবা	২৬,১৪৬
মুসলমান বিধবা	১,১২,৫৬১

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	৯৭৭
কুষ্ঠ রোগী	১,৯৩৭

রাজস্ব (১৯২০-২১)

	(টাকা)
ভূমি-রাজস্ব	১০,০১,৬৭৬
ষ্ট্যাম্প	৮,৩১,৬১২
আবকারী	১,৬৮,১৭০
আবগারী	২,৮৬,০১৪
আফিং	৪৮,৭২৪
বিবিধ	২,৬৭৯
পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস	৩,৩০,২৪৭
মোট	২৭,০৯,২০৪

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার পরিমাণফল ১৮,৩৮,১৮০ একর, সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৭২০। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৬,৭০,৪০০ একর অর্থাৎ আধা-পিছু ৭ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৪৩·৬২ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৩,৩২,১১৯। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৩,৪৮,৯৪৮। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৩৯,৭২৮। ১৯১০-১১ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৬৯,৫০,৭২২ মণ। ১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৫১,৫৩,৩০৮ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	৪,১৮,৭৮২
১৮৮১	৫,৭৯,৩৭২
১৮৯১	৬,৮০,৭৩৫
১৯০১	৭,৮৬,৩২৫
১৯১১	৯,৫২,৬৬০
১৯২১	৯,৩৬,২৭৬

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৫,১৫,১০২ ও মো

মুসলমানের সংখ্যা ২,৩১,৬৮০। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৩১৯।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সনে)

	শতকরা
মোট হিন্দু	৯·৮৩
„ মুসলমান	৭·১
হিন্দু পুরুষ	১৩·১
মুসলমান „	১২·৬
হিন্দু মেয়ে	·১
মুসলমান „	

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯২৭। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ২৩,০৪৫। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের) বালকবালিকার সংখ্যা ১,৩৩,২৩৫।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬—১৫ বৎসরের) ১৯২৫ সনে ২৭,২৫৮।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ১,০৬,১৭৭।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৫·৪। হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৪·৩ এবং মুসলমানের মধ্যে ৩১·৫।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—	২২,৪৪০
	১৯২২—	১৭,২০৪
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—	১৩৯৭
	১৯২২—	
	১৯১৫—	
	১৯২২—	১২২০

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু

স্ত্রী

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা

কুষ্ঠরোগী

অন্ধ

হিন্দু বিধবা —

মুসলমান বিধবা

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	৯,৮৭,১৫৫৲
ষ্ট্যাম্প	২,৩২,১০৪৲
আবকর	১,৫০,১২৯৲
আবগারী	২,৮৫,৫৮৫৲
আফিং	২১,৭০৫৲
বিবিধ	১,৫৩,৯৩৩৲
পথকর ও পাব্লিক ওয়ার্কস্ ...	২,৩৫,৯২৬৲
মোট	২০,৫৭,২৩৮৲

দার্জিলিং

দার্জিলিং জেলার পরিমাণফল ১,৪৬,৯৬০ একর।

সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩০২।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ১,৪৮,৪০০ একর।

অর্থাৎ আবাদিযুক্ত ½ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২২·২৪ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৪৭,১০৪।

খাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৪০,৮৪৯।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১৪,৩৪৭।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪,২৫,৮৪৫ মণ। ১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৩,৩০,০৬৩ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	১৪,৯২৬
১৮৮১	১,৫৪,৬৪৪
১৮৯১	৭,৫০,৫১৪
১৯০১	২,৪৯,১১৭
১৯১১	২,৬৫,৫৪০
১৯২১	২,৮২,৭৪৮

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ২,০১,০১৮ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৮,৫১৮।

প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ২৪০।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সনে)

	শতকরা
মোট হিন্দুর	১০·১
" মুসলমানের	১৫·৫
" হিন্দু পুরুষের	১৮·৫
" মুসলমান "	২৪·৫
" হিন্দু স্ত্রীর	·৭
" মুসলমান "	১·১

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪৮।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১সনে) ৭,৬৩১।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের) বালকবালিকার সংখ্যা ৭২,১৪২। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬১৫ বৎসরের) ৫,৮৪০। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৬৬,৯০২।

স্বাস্থ্য

হাজার করা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৮·৯।

হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ৩৮·৩ এবং মুসলমানের মধ্যে ৪১·৩।

ম্যালেরিয়ার মৃত্যু	১৯১৪—	৫,৭০২
	১৯২২—	৬,৪২৯
	১৯২৪—	২২০
	১৯২২—	×
	১৯১৫—	৩৮
	১৯২২—	×

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু

স্ত্রী "

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা

কুষ্ঠরোগী

অন্ধ

হিন্দু বিধবা

মুসলমান বিধবা

রাজস্ব (১৯২৩-২১)

ভূমি রাজস্ব	৩,৮৪,১৫৫৲
ষ্ট্যাম্প	৪৯,২০০৲
আবকর	১,৮১,৩৫৪৲
আবগারী	৩,২৬,৬১৪৲
আফিং	২১,৪০৯৲
বিবিধ	৪২,৬১৭৲

৯. পথকর ও পাবলিক সেস্	৬১,৩৩৭৲
মোট	৮,৭৭,২০৫৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

রাজসাহী

১। ভৌগোলিক অবস্থান, রাজসাহী পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত।

সহরে যাতায়াতের সুবিধা

(ক) (ঈশ্বরদি হইয়া)—আদমদিঘি—নবাবগঞ্জ শাখা রেল পথ। ঈশ্বরদি হইতে গাড়ী বদল করিয়া রাজসাহী ষ্টেশন। সহর হইতে ষ্টেশনের দূরত্ব প্রায় ১ মাইল। ষ্টেশনে সব ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে থাকে—ভাড়া ৵০ আনা।

(খ) (নাটোর হইয়া)—নাটোর ষ্টেশন হইতে ২৮ মাইল। মোটর বাসে যাওয়া যায়। ভাড়া ৸০ আনা।

(গ) (লালগোলা ঘাট হইয়া)—লালগোলা ঘাট পর্য্যন্ত রেলে, পরে ষ্টীমারে বদল—বর্ষাকালে রাজসাহী ষ্টীমার ষ্টেশন, অন্য সময়ে সাহেবপুর, সাহেবপুর হইতে সহর ২ মাইল দূরে, ঘোড়ার গাড়ীতে আসিতে হয়। ভাড়া ।০ আনা।

উপরি উক্ত ক ও খ পথ দিয়াই লোকে বেশী চলাচল করে। ক ও গ পথে মাল চলাচল হয়। ক পথের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

রাস্তাঘাট

রাস্তা মন্দ নহে। সহরের ভিতর ১ নং এবং ৭ নং ওয়ার্ডে ছাড়া সমস্ত রাস্তাই পাকা। ১ ও ৭ নং ওয়ার্ড ব্যতীত সমস্ত ওয়ার্ডেই বৎসরের সব সময়ে সমস্ত রকম যানবাহন যাতায়াত করে। বর্ষাকালে ১ ও ৭ নং ওয়ার্ডে গো-যান ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনে চলাফেরা করা অসম্ভব।

যানবাহন

(ক) যাত্রীদের জন্য মোটর বাস্ দুই চারিখানা ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, সাইকেল পাওয়া যায়।

(খ) মালের জন্য—দু' একখানা মোটর ট্রাক্ ও গরুর গাড়ী আছে।

সহর হইতে আদালত ২ মাইল ও ষ্টেশন ১ মাইল দূরে বলিয়া ঘোড়ার গাড়ীগুলির যোগদান ভালই হওয়া উচিত, তবে প্রতিযোগিতা খুব বেশী এবং রাজসাহী-নাটোর পথ মোটরবাসের একরূপ একচেটিয়া হওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ীর আয়ের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে। মোটের উপর যাহা আয় হয় তাহাতে গাড়োয়ানের পরিবারবর্গসহ খাওয়া পরা চলে। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান প্রায় সবই মুসলমান। ইহারা মুরুপ লুব্ধ ইহাদের নৈতিক চরিত্র ভাল নয়। রাজসাহী হইতে নাটোর পর্য্যন্ত প্রায় ৮টি মোটর সার্ভিসে ৫০ খানা বাস্ খাটে। যাত্রীর তুলনায় গাড়ী বেশী থাকায় দরুণ প্রতিযোগিতা খুব বেশী; সুতরাং আয়ের অনুপাতে আয় কম। কিছুদিন হইল সমস্ত সার্ভিসগুলি একত্র হইয়া সিণ্ডিকেটে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম সপ্তাহে গাড়ী প্রতি ১৪০৲ টাকা করিয়া আয় হইয়াছে। একটী মাত্র সার্ভিস সিণ্ডিকেটে যোগ দেয় নাই; ইহার বাস্ দুইটী। ইহাকেও সিণ্ডিকেটে যোগ দিতে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। চেষ্টা সফল হইলে রাজসাহী-নাটোর বাস্ সার্ভিস একটী খুব লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইবে।

নদী

সহরের দক্ষিণ দিকে পদ্মানদী। নদীতে ষ্টীমার সার্ভিস আছে এবং বহু নৌকা মালপত্র পারাপার করিবার এবং অন্যান্য বিষয়ে, চালান দিবার জন্য মোতায়েন আছে।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে নদীতে বিরাট চর পড়িয়াছে। চরের কিয়দংশ বর্ষায় ডুবিয়া যায়। চাই বলিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু চরে বসতি করে। চরভূমি খুবই উর্ব্বর—পটোল, বেগুন, মরিচ, কলাই, মুটি, তরমুজ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং পাবের নৌকাযোগে সহরের বাজারে নীত হয়।

চরের ওপারে পদ্মার প্রধান শাখা; ইহাতে ১২ মাস ষ্টীমার চলাফেরা করে। পদ্মার প্রধান শাখার দক্ষিণে

মুর্শিদাবাদ জিলা। চরের সহিত মুর্শিদাবাদ জিলার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

সহর এবং চরের মধ্যে পদ্মার যে শাখা আছে তাহাতে বৎসরে ৩ মাসের বেশীকাল ষ্টীমার চলাচেরা করিতে পারে না। বড় বড় নৌকাগুলিও বৎসরে ৮।৯ মাসের বেশী কাল চলাচেরা করিতে পারে না।

নদীতে মাছ নাই। জেলেরা চালানি মাছের কারবার করে।

বিভিন্ন পেশা

নাপিত—অধিকাংশেই উত্তর ভারতীয়। প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে নাপিতদের সমিতি মজুরি-ডবল করিবার প্রস্তাব করে। সেই অবধি উহাদের মজুরি ডবল (৵০) হইয়াছে।

ধোপা—টাকায় ২৪ খানা হইতে ৩২ খানা পর্য্যন্ত কাপড় কাচে। পুরুষগুলি মদ্যপ।

কামার—২।৮ ঘর কামার আছে। গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী করে।

কুমার—২।৩ ঘর কুমার আছে। ইহারা সহরের বাটীর বাসনপত্র সরবরাহ করে।

দোকানী—মুর্শিদাবাদের দোকানগুলি প্রায়ই মুসলমানদের করতলগত। লোক-সংখ্যার অনুপাতে দোকানী কম।

সহরের পাড়া

সহরে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন পল্লীতে বাস করে। সহরের মধ্যস্থান ভদ্রলোকদের অধিকারে, এবং অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অর্থাৎ গাড়োয়ান, পেয়ালা ইত্যাদি বাস করে। ভদ্র শ্রেণীর ভিতর মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্তই কম। মুসলমানদের অধিকাংশ গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর ও দিন-মজুর।

সহরের মধ্যস্থানে প্রায় সমস্তই পাকা বাড়ী। ভাড়াবাড়ী পাওয়া যায়। মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ খড়োবাড়ী ও টানের বাড়ীতে বাস করে। ভাল ও স্বাস্থ্যকর স্থানে ইয়োরোপীয়ান কোয়ার্টার। সহরে কোন খালি বাড়ী পড়িয়া নাই।

শিল্প

মটকা, গরদ ও টীল ট্রাঙ্ক তৈরী হয়। রাজসাহীতে নির্ম্মিত টীল ট্রাঙ্কের সমস্ত রাজসাহী জিলাতে এবং মালদহে বেশ কাটতি হয়। ইহা একটী লাভজনক ব্যবসা। মটকা ও গরদের ব্যবসা পতনোন্মুখ।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ইত্যাদি

একটী কলেজ এবং তিনটী হাই স্কুল ও একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা আছে। ছাত্র-সংখ্যা কলেজে ৭০০ এবং স্কুল ও মাদ্রাসাতে প্রায় ১০০০। কলেজে আর্ট ও সায়েন্সে ডিগ্রী পর্য্যন্ত পড়ান হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়, আদালত, জেলখানা সবই আছে। একটী সাধারণ পুস্তকাগার আছে। কেতাবের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমেত দশটী ব্যাঙ্ক আছে। মাড়োয়ারীরাও মহাজনী কারবার করে। এ ছাড়া রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি একটী বৃহৎ অনুসন্ধান-কেন্দ্র। মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়।

উৎসব

সরস্বতী পূজা ও দুর্গা পূজাই সহরের প্রধান উৎসব। বিজয়া দশমী ও রথযাত্রার দিন মেলা বসে, মেলাতে সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্য এবং খেলনা ইত্যাদি বিক্রয় হয়। সহরে একটী বায়োস্কোপ গৃহ আছে।

মিউনিসিপ্যালিটী

সহর ৭টী ওয়ার্ডে বিভক্ত। রাস্তা পাকা। সহরের মধ্য ভাগের পথগুলি ব্যতীত অন্যান্য পথ বৎসরের অধিকাংশ সময় যে-বেরামত অবস্থায় থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে যে সমস্ত পথে লোক ও যানবাহন বেশী চলাচেরা করে তাহাতে জল দেওয়া হয়। বৎসরের বাকী ১০ মাস সহর ধূলিময় থাকে—তখন পথে চলাচেরা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ড্রেন কাঁচা। পাকা ড্রেন একরূপ নাই বলিলেই হয়। যাহাও বা

আছে তাহাও নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না—সংস্কার করা ত দূরের কথা। অনেক বাড়ীতে সেপ্‌টিট্যাঙ্ক আছে। কিন্তু উপযুক্ত কর দেওয়া সত্ত্বেও প্রতি মাসে ২।১ বার বাতীত তাহা পরিষ্কার করা হয় না। জলের কল ও বিজলী বাতি নাই। সহরের পথগুলি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে কেরোসিন বাতির দ্বারা আলোকিত করা হয়। তাহাতে অন্ধকার দূরীকৃত না হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠে। পায়খানা দেখের দ্বারা নিয়মিতরূপে পরিষ্কৃত হয়। কলেরা, বসন্তের আক্রমণ প্রতি বৎসরই হয়। মোটের উপর সহরের স্বাস্থ্য মধ্যম রকমের।

শ্রীবিমলেন্দু বাগচী

রঙ্গপুরের সড়ক-সমস্যা

[১]

ধরণীবাড়ী হইতে উলিপুর যাওয়ার একটি পথ আছে। ঐ পথ, শুনিয়াছি, আমার পূর্বপুরুষ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। যখন, উলিপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়, তখন উহা হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল, ধরণীবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ড হইতে তাহার মধ্যে গিয়াছে। ঐ রাস্তাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়াছে। বর্ষাকালে দুই-খানি পুলের অভাবে উহা একেবারে অগম্য হইয়া পড়ে। সকলের পক্ষেই, বিশেষতঃ কৃগ্ন ও বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদের পক্ষে গাড়ীতে যাওয়া দূরের কথা, হাঁটিয়া যাওয়াই অনেক সময়ে কষ্টকর হয়। বর্ষাকালে গাড়ী চলিতে না পারায় ধান ও পাটের গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না এবং ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী বঞ্চিত হারে গাড়ীভাড়া দিয়া বহু কষ্টে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। আমরা এতাবৎ কাল ইউনিয়ন বোর্ডের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলাম। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা ঐ পুল দুইখানি হওয়া আদৌ সম্ভব মনে হয় না। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে এতদিনে হইয়া যাইত। যাহা হউক, আমরা আর এ প্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে ও নিজেদের জীবন বিপন্ন করিতে পারি না। আমি গাইবান্ধা অঞ্চলের রাস্তা ও কুড়িগ্রামের রাস্তার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু দেখিয়া স্বতই মনে হয় যে, এই দুইটির উপর রাস্তার কর্তৃপক্ষের তাদৃশ দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি আকর্ষণের তদ্রূপ চেষ্টা ইতঃপূর্বে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক আমরা মানুষ; প্রজা হিসাবে সকলেই সমান এবং সর্বত্র সমান দৃষ্টি প্রদান করাই উপযুক্ত বিভাগের ন্যায়সঙ্গত কার্য। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় বড় রাস্তার যে সব দ্রব্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়া থাকে, অন্ততঃ তদ্দ্বারাও পুল দুইখানি নির্মিত হইলে, যানবাহন ও লোকের চলাচলের সুবিধা ঘটিতে পারে। তদ্হেতু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সমীপে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলাম।

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল মুন্সী,
ধরণীপুর, পোঃ উলিপুর (রঙ্গপুর)

[

রঙ্গপুর জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার অন্তর্গত হরিপুর হইতে প্রায় ১২ মাইল একটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা কামারজানী পর্যন্ত গিয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ মাটী দেওয়ার অভাবে উহা লোক ও যানবাহনাদির যাতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত রাস্তা দিয়া প্রতিদিন বহু লোক অতি কষ্টে যাতায়াত করে। বর্ষাকালে রাস্তাটি চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে। রাস্তাটিতে ৪।৫ স্থানে পুল দেওয়া আবশ্যক। তথায় নৌকা যাতীত চলাচল করা কঠিন। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত গাড়ীর চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বর্ষার শেষে রাস্তার স্থানে স্থানে এত কাদা হয় যে, গাড়ী ও লোকজন চলিতে পারে না। এ জন্য রাস্তার দুই পার্শ্বের শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি করাইতে পথিককে চাষীর নিকট নির্যাতন ও তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। সাইকেল-আরোহীরা সাইকেল কাঁধে করিয়া পার করিতে বাধ্য হয়। বহুদিন যাবৎ মাটী না দেওয়ায় গাড়ীর চাকার দাগ স্থানে স্থানে এত গভীর হইয়াছে যে, উহাতে চাকার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। রাস্তাটিতে ৪।৫ স্থানে পুল দিয়া স্থানে স্থানে এক হাত দেড় হাত পর্যন্ত উঁচু করিয়া মাটী দিতে হইবে। বর্তমান বৎসরে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের উদরান্নের সংস্থান হইতেছে না। আশা

করি উক্ত রাস্তাটি বর্ত্তমান বৎসরেই বাঁধিতে আরম্ভ করা হইবে। উহাতে স্থানীয় মজুরদিগের উদরান্নের সংস্থান ও জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র সরকার

(রঙ্গপুর-দর্পণ)

[৩]

রঙ্গপুর জেলার ভুরুঙ্গমারী থানা হইতে উত্তর দিকে প্রায় ৮ মাইল একটি লোকাল বোর্ডের রাস্তা শিলমুড়ি পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ রাস্তাটি বহুদিন যাবৎ মাটী দেওয়ার অভাবে লোক ও যানবাহনাদির যাতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত রাস্তা দিয়া বহু লোক ও গো-গাড়ী অতি কষ্টে যাতায়াত করে। বর্ষাকালে রাস্তাটী চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়ে। রাস্তাটিতে তাত স্থানে পুল দেওয়ার বিশেষ দরকার। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়। বর্ষা-শেষে রাস্তার ভাঙ্গা স্থানে এত কাদা হয় যে, গাড়ী ও লোক চলিতে পারে না। উল্লিখিত ভাঙ্গা স্থান কয়টিতে বর্ষায় যাতায়াত করা কঠিন। সেই সমস্ত জায়গায় বর্ষায় ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত জল হয়। সেখানে নৌকাযোগে বা অন্য কোন প্রকারে যাতায়াত করাও সুকঠিন। লোকজন অতি কষ্টে সাঁতার দিয়া ঐ সমস্ত স্থান পার হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বহুদিন যাবৎ মাটী না দেওয়ায় গাড়ীর চাকার দাগ এত গভীর হইয়াছে যে, চাকা সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়া যাওয়ায় গাড়ী চলাচল একেবারে অসম্ভব। বলা বাহুল্য সাইকেল আরোহীদের ত কষ্টের সীমাই নাই। কারণ তাহারা সাইকেল কাঁধে লইয়া ঐ সমস্ত স্থানে সাঁতার দেয়। রাস্তাটির ভাঙ্গা স্থানে পুল দিয়া এবং স্থানে স্থানে ১।১॥ হাত পর্য্যন্ত মাটী দিয়া উঁচু করিয়া দিতে হইবে।

মহম্মদ নইমদ্দিন সরকার,

ভুরুঙ্গমারী

(রঙ্গপুর-দর্পণ)

[৪]

রাস্তা-নির্ম্মাণের জন্য আবেদন

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী গাইবান্ধার সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকটে প্রেরিত একখানা দরখাস্তের কিয়দংশ নিম্নরূপ :

সুন্দরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাপাসিয়া ও বোচাগাড়ী গ্রামের অধিবাসী দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনসাধারণের বিনীত নিবেদন এই যে, গত বৎসর হইতে এতদঞ্চলে শস্য-বপনের সময়ে অনাবৃষ্টি, ফলোদ্গমের সময়ে অতিবৃষ্টি, ও বর্ষার প্রাবল্যে উৎপন্ন শস্যের অপ্রাচুর্য্য, অধিকন্তু পরিশ্রমোপযোগী অপেক্ষাও অল্পমূল্যে তাহা বিক্রী হওয়ার ফলে কৃষকবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনে ও সাংসারিক ব্যয়ভার বহনে অনাটন হইয়াছে। এ বৎসরেও জ্যৈষ্ঠ মাসের অসাময়িক অতিবৃষ্টি পাট ও আশু ধান্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হওয়ায় কৃষকের পরিশ্রমের অনুপাতে শস্যাংশ সঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং সকলকেই ঋণ ও ভূমি-বন্ধকের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। আংশিক উৎপন্ন পাটও এত অল্পমূল্যে বিক্রী হয় যে তদ্দ্বারা রাজকরও পরিশোধ হয় নাই। আবার গত আশ্বিন মাসে অসাময়িক বর্ষা সমাগমে এবং ব্রহ্মপুত্র ও ত্রিস্রোতার জোয়ার-প্লাবিত বন্যার জলে এতদঞ্চলস্থ হৈমন্তিক কচি শস্যসম্ভার সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। অনেকে অতি সামান্য শস্যাংশও ঘরে আনিতে পারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপ অবস্থায় কৃষককুলের জীবিকার্জ্জনের অপেক্ষাকৃত সুলভ এমন কি উপায়ান্তর থাকিতে পারে? অনেকে এ যাবৎ গহনাপত্র, আসবাব ও তৈজসপত্রাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অতিকষ্টে বহন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণ উপায়হীন, রিক্তহস্ত ও নিঃসম্বল।

কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের হলচালনোপযোগী কোন জমিজমা অথবা গো-মহিষাদি নাই। এইরূপ নিঃসম্বল ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত কৃষিঋণ গ্রহণের সুযোগ ও সুবিধা পাইবে না। কোন প্রকার পূর্ত্তকর্ম্ম অথবা জনহিতকর কার্য্যের পারিশ্রমিক বিনিময়ে

এই শ্রেণীর কোনরূপ উপকার সাধিত হইলে এই বিপন্ন জনসাধারণ স্বাস্থ্য ও শ্রী ফিরিয়া পাইয়া পারিবারিক প্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে সক্ষম হইবে।

গাইবান্ধার অন্তর্গত কামারজানী হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা অনেকদিন হইতে বেহাপাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা সংস্কারাভাবে পারিপার্শ্বিক সমতলভূমি হইতে নীচু হইয়া পড়িয়াছে, বৎসরের অধিকাংশ সময়েই জলমগ্ন ও কর্দ্দমময় অবস্থায় থাকে। সুতরাং কামারজানী, বুড়ীর হাট, গাবতলার, হরিপুর ও চিলমারি প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীদের পক্ষে পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণের যাতায়াতের পক্ষেও যে কতদূর অসুবিধা হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না।

উক্ত জীর্ণ রাস্তার পুনর্গঠনকল্পে উপরিউক্ত নিঃসম্বল শ্রেণীর লোকদিগকে মজুর হিসাবে রাখিলে তাহাদের অন্নসংস্থান হইবে, অন্যদিকে একটা জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

কাপাসিয়া ও বোচাগাড়ী গ্রামের
জনসঙ্ঘ

রঙ্গপুরে অন্নাভাব

গাইবান্ধা (রঙ্গপুর) হইতে একব্যক্তি জানাইয়াছেন,—"রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার অন্নকষ্টের কথা পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার ও মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহের করুণ কাহিনী অবগত আছেন। বিভিন্ন স্থানে মাত্র সাতচল্লিশ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা এত সামান্য যে উহাতে গ্রামের অতি অল্পসংখ্যক লোকই উপকৃত হইতে পারিয়াছে। অনেক থানার এলাকায় কোনও সাহায্য বা ঋণ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সুন্দরগঞ্জ থানার এলাকাধীন কৃষক-সাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেক গ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ দুই দিন অন্তরও এক বেলা খাইতে পায় না; কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত থানার এলাকায় কোনও গ্রামে উল্লেখ-যোগ্য কোনও ঋণ দান করেন নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষের এতাদৃশ তাণ্ডব লীলায় লাঞ্ছিত তিন লক্ষ টাকা কৃষি-ঋণ ছাড়াও বিশেষ ওয়ার্কসের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট একজালীন দান কি দেশের লোক পাইতে পারে না? একমুষ্টি অন্নের সন্ধানে অসমর্থ হইয়া হতভাগ্য জনকজননী যে স্থানে সন্তান বিক্রয় করিতেছে এবং অনাহারে অনেকে অকাল মৃত্যুকে বরণ করিতেছে, সেই মহকুমার জনকতক অমিতব্যয়ী জমিদারের স্বার্থরক্ষার্থে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সার্টিফিকেট করিয়া প্রজার স্থাবর অস্থাবর নীলাম দ্বারা খাজনার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। নোটিশ পাওয়ার পূর্ব্বেই অনেকের সম্পত্তি নীলামে উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রতীকার হয় নাই।"

ভরতখালি হইতে এক ব্যক্তি জানাইয়াছেন,—"গাইবান্ধা মহকুমার অন্তর্গত সাঘাটা, ফুলছড়ি ও গাইবান্ধা এই তিন থানার অধীন অনুমান বেড়লক্ষ লোক অন্ন-সমস্যায় পতিত হইয়া বড়ই দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছে। বর্ত্তমানে লোকের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অন্নকষ্টের তাড়নায় অপাত্র খাইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইতেছে। সাঘাটা থানার এলাকাধীন ২ নং ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কুকুরা হাট গ্রামের বাসিন্দা সেখ নায়ক একটী লোক এতদিন পরিবারে মাঝে মাঝে উপবাস করিয়া অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু শেষকালে কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অখাদ্য খাইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইতেছে। সাঘাটা থানার এলাকাধীন ২ নং ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কুকুরা হাট গ্রামের বাসিন্দা সেখ নায়ক একটী লোক এতদিন পরিবারে মাঝে মাঝে উপবাস করিয়া অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু শেষকালে কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অখাদ্য খায়। এই অখাদ্য খাইয়াই তাহার কনিষ্ঠ পুত্রটী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপভাবে ঝিনঝিনা গ্রামের কুড়ির মুদীর একটী ছেলে অকালে মারা গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাঘাটা বাংলাতে লোকের অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তথায় অনুমান ২০ হাজার লোক সমবেত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল বিপন্নগ্রস্ত নিরন্ন লোকদের সম্মুখেই কৃষিঋণ দিবার তহসা দিয়া চলিয়া যান। তারপর জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যানও আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক মাস চলিয়া গেল, সাহায্য, কৃষি-

শুন কিছুই আসিল না। লোকে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া এদিক সেদিক ছুটিতেছে।"

ফুলছড়ির অবস্থা

গলনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—ফুলছড়ি (থানা ফুলছড়ি) নিবাসী সেখ ৫।৭ দিন অনাহারে থাকিয়া মারা গিয়াছে। তাহার বয়স ৩৫ বৎসর। পিতার নাম মৃত আকান সেখ। তাহার ৪টী সন্তান ও স্ত্রী আছে। তাহারা অন্নাভাবে মৃতবৎ হইয়াছে। গলনা ফুলছড়ি রিলিফ কমিটি, দুই তিন দিন হইল রিলিফ কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অতি সামান্য। দৈনিক জনপ্রতি মাত্র এক পোয়া চাউল দেওয়া হইতেছে। তাঁহারা মাত্র ১৬/০ ষোল মণ চাউল লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা ফুরাইল। এখন দেশবাসীর ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রয়োজন। অদ্যকার ডাকিমের নিকট দুই ইউনিয়ন বোর্ড হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দুইটি টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। সরকার কোন সাড়া দেন নাই।

ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গাইবান্ধা মহকুমার এলাকার অধিকাংশ স্থানে এ বৎসর অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফুলছড়ি ও সাঘাটা থানার অধিবাসীদিগের অন্নকষ্ট ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। সাঘাটা থানার এলাকাধীন একটী স্ত্রীলোকের অনশনে অকাল-মৃত্যু এবং অপর একটি লোকের সামান্য অর্থে সন্তান-বিক্রয়ের করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত থানার সেন্দুরা নিবাসী রমজান আলী বেপারী ক্রমাগত কয়েক দিবস উপবাসের পর ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত দুঃখকষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। যদি অদ্য সাহায্য প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে কত লোক যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে তাহা বলা যায় না।"

(বঙ্গবাসী—কলিকাতা)

কাবুলীর ঋণ

এ বৎসর যে কি ভীষণ দুর্দ্দিন হইয়াছে তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। পাটের মূল্য অত্যন্ত কম থাকায় কৃষক মালিকের যাহারা ঋণ মহাজনের ঋণ আদৌ দিতে পারে নাই; এই ধানের বাজারেও যে দিতে পারিবে সে ভরসাও নাই। ধানের দরও অত্যন্ত কম—প্রতি মণ ধান (১৯ ওজনের) ১৷৷০ টাকা মাত্র। এ বৎসর কৃষক আবাদেও বেশী ধান পায় নাই। এ জন্য কৃষকের দুর্দ্দশা চরম সীমায় উঠিয়াছে। তার উপর কাবুলীর জোর জুলুম। অনেক চাষী কাবুলীর নিকট হইতে প্রতি মন ৫।৭ টাকার করিয়া কাপড় লইয়া থাকে। কাবুলীর কাপড় প্রায়ই খারাপ। উহারা যে কাপড় বিক্রয় করে, তাহার জন্য বাজার অপেক্ষা ২।৩ গুণ বেশী মূল্য লিখিয়া লয় এবং ফেরাও কোন আপত্তি করে না। এ বৎসর শস্যের মূল্য কম থাকায় কৃষক কাবুলীর ঋণ শোধ করিতে পারিতেছে না। কাবুলীরা এখন দেনদারদিগের নামে আদালতে নালিশ আরম্ভ করিয়া যে সমন জারি করিতেছে তাহা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে। তাহারা একই আরজীতে ৮।১০ জনের নাম দাখিল করিয়া ৪৲।৫৲ টাকা পাওনার স্থানে ৫০৲ টাকা দাবি করিয়া দিয়াছে। একারণ লোকের যে কি দুর্গতি হইতেছে তাহা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। লোকের হাতে টাকাও নাই যে, ঐরূপ অবৈধ নালিশের জবাব দেয়। এখন উপায় কি?

শ্রীবিপিনবিহারী দাস রায়,
প্রেসিডেন্ট গলনা ইউনিয়ন বোর্ড,
থানা নাগেশ্বরী, রঙ্গপুর।

(রঙ্গপুর-দর্পণ)

বাজার দর

বাজারে দুধ উৎকৃষ্ট ৵০ দুই আনা সের মূল্যে বিক্রী হইতেছে। আলুর দর কিছু বাড়িয়াছে—সের প্রতি দর ৵৬ আড়াই আনা। আম একরূপ দুষ্প্রাপ্য। মৎস্য একরূপ দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য তরিতরকারী

এখনও কতকটা সুবিধায় পাওয়া যায়। তাল চাউলের মূল্য প্রতি মণ ৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। (রঙ্গপুর-দর্পণ)

চাউলের আমোদ

বর্ষার বারিধারা পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় চাউলের আমোদের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা স্থানীয় কাহারও অবিদিত নাই। যে দুইটী পথে আমোদে প্রবেশ করিতে হয়, বৃষ্টি হইলেই উহা এমন জলকর্দ্দমযুক্ত হইয়া উঠে যে, আমোদে যাওয়া দায়সাধ্য হইয়া উঠে। আমোদের দক্ষিণাংশেও জল সঞ্চিত হয়। ইতিমধ্যে কিছু রাবিশ ফেলিয়া চলাচলের পথটি কিছু উঁচু করা হইয়াছে বাস্তবিক। যেখানে সহরের যাবতীয় ভদ্রলোকের প্রয়োজন সে স্থানটির উন্নতি-সাধন আবশ্যক। (রঙ্গপুর-দর্পণ)

ওজনে প্রবঞ্চনা

কাঁটালবাড়ী বন্দরে যে সকল জিনিষ বিক্রয় হয় অধিক লাভের আশায় দোকানদারগণ উহা কম ওজনের বাটখারা দিয়া বিক্রয় করে। তদ্ব্যতীত পাল্লাও এমনভাবে প্রস্তুত যে, তদ্বারা মাপিলে আরও কম হইয়া যায়। সরিষার তৈল ওজন করিয়া বিক্রয় হয় না, মাটীর ঘটে /৪ সের করিয়া তৈল বিক্রয় হয়। মাপিলে /৩৷০ সেরের অধিক হয় না। এরূপ অবস্থায় /৪ সেরের দাম দিয়া ৩৷০ সের তৈল লইতে হয়। ধান চাউল টালাদ্বারা ওজন করিয়া বিক্রয় হয়। টালাগুলি সমান নয়, কোনটী ছোট কোনটী বড়। ইহাদ্বারা কেহ কেহ লাভবান হয় কেহবা ঠকিয়া যায়, এজন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাটখারা দ্বারা ওজন করিয়া ধান চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে অসুবিধার কোন কারণ হয় না। ধান, চাউল, সরিষা প্রভৃতি জিনিষ যাহাতে ঠিক ওজনে বিক্রয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা দূর করা উচিত, পরন্তু হাট বারে (অর্থাৎ সোম কিংবা শুক্রবার) বন্দরে উপস্থিত হইয়া বাটখারাগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গ্রাম সিংগীমারী, রঙ্গপুর।

(রঙ্গপুর-দর্পণ)

বড়খাতা কৃষক কনফারেন্স

১। বিগত ১৭ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় রঙ্গপুর জিলার থানা হাতীবান্ধার অধীন বড়খাতা গ্রামে কতিপয় জনহিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে একটী কৃষক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। এই সভায় হিন্দু মুসলমান আনুমানিক তিন হাজার কৃষক উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুন্সী হেদায়েৎউল্লা সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বড়খাতা সেন্টারের জমাদার বাবুও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় তুষভাণ্ডার হাই স্কুলের আরবিক্যাল টিচার মৌঃ আজিরউদ্দিন আহম্মদ ও ঝিপুরা নিবাসী মৌঃ আবদুল মজিদ ও মৌঃ হায়দারআলী মিঞা বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয় আলোচনা করিয়া কৃষকদিগকে উপদেশ প্রদানকরেন। সভার পর স্থানীয় জোতদার মৌঃ ফজলার রহমান সাহেব সভাস্থ উপস্থিত কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

(১) কৃষকগণ-পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। তজ্জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতে ছোট বড় কয়েকজন মেম্বর নিযুক্ত করিয়া একটী "কৃষক-সমিতি" গঠন করা হউক। উক্ত সমিতির মেম্বরগণ সালিসী বিচার দ্বারা সমস্ত বিবাদ মিটমাট করিবেন।

(২) কৃষিজাত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় এবং দোকানদারগণ জিনিষ অর্থাৎ চালানী মাল উচিত মূল্যে না দেওয়ায় কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তজ্জন্য এই বড়খাতায় একটী যৌথ কারবারের নাম দিয়া কৃষক-ভাণ্ডার খোলা হউক। সর্ব্বসাধারণে যেন তথা হইতে উচিত মূল্যে জিনিষ পত্র পাইতে পারে।

(৩) কৃষককুল উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করায় ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। অতএব যাহাতে সকলে স্বল্পসুদে টাকা পায়, তজ্জন্য এখানে একটি ব্রাঞ্চ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খোলা হউক।

(৪) ইতিপূর্ব্বে কৃষকগণ অন্যায়ভাবে নিজেদের হাতের

গরু, স্ত্রীর গহনা, থালা, বটী বাটী ইত্যাদি আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া জীবন বাঁচাইয়াছে। বর্ত্তমানে একমাত্র সম্বল ধান, তাও ভাল রকম জন্মে নাই। যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তার বাজার একেবারে নাই। এরূপ অবস্থায় মালিক, দেশী ও বিদেশী মহাজনগণ কে কাহার টাকা আগে আদায় করিতে পারে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কৃষককুল নিরুপায়। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক যেন দেশী ও বিদেশী মহাজনদিগের নালিশ আপাততঃ বন্ধ রাখেন এবং অনিবার্য্য নালিশের টাকা একযোগে ডিক্রী না দিয়া দীর্ঘ কিস্তিবন্দী করিয়া দেন।

(৫) পূর্ব্বে কাবুলীগণ কলিকাতার বহুরা বস্ত্রাপচা কাপড় দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে ধারে প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ধান, পাট ও তামাকের দর না থাকায় কৃষিকগণ তাহাদের পাওনা টাকা দিতে পারিয়া উঠিতেছে না। কাবুলীগণ এক টাকার স্থলে দশ টাকা, দশ টাকার স্থলে একশত টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং একই আরজীতে ১০।১২ জন কৃষকের নামে নালিশ করিয়া সমন ও আরজী প্যাদার হাত হইতে লইয়া আরজী গোপন করতঃ শুধু সমনখানা নিজেরাই বিলি করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে কাপড় প্রদান করে নাই এমত কতকগুলি কৃষকের নামেও নালিশ করিয়াছে ও করিতেছে দেখা যায়। সুতরাং এই সভা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

স্বাক্ষর মেহেরআলী শাহ
মোঃ আঃ বাউড়া, সাং বড়খাতা।
(রঙ্গপুর-দর্পণ)

২। বিগত ১২ই মাঘ বড়খাতা গ্রেসার মাঠে কৃষক কনফারেন্সের ২য় অধিবেশন হয়, উক্ত দিন অনুমান এক হাজার কৃষক সভায় যোগদান করে। সেণ্টারের জমাদার বাবু সভায় উপস্থিত ছিলেন। রমজান মাস বিধায় মুসলমান রোজাদারের কষ্ট হইয়াছিল। বেলা ২টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সভা হয়। ১ম অধিবেশনের বক্তা তিন জনই এই সভায় বক্তৃতা করিয়া কৃষককুলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি অচিরেই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কৃষকগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। যৌথ-কারবার খুলিবার জন্য প্রত্যেক কৃষকই কিছু কিছু চাঁদা ধার্য্য করিয়া আদায় পূর্ব্বক একটী ফণ্ড করিতেছেন। আশা করি ২।৩ সপ্তাহ মধ্যে কারবার খোলা হইবে। যাহাতে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খোলা হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

১২শে মাঘ রবিবার বুড়া দাংরোডুবী নামক স্থানে রঙ্গপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই তিন জিলার সম্মিলিত একটী সভার অধিবেশন হয়। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের প্রায় আট শত কৃষক উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করে এবং সাহায্য প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে। উক্ত সভায় হাজারের বেশী কৃষক উপস্থিত হইয়াছিল।

বর্ণিত সভায় স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত পদ্মনারায়ণ বর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত দুই জেলার কৃষক-গণকে এই কনফারেন্সে যুক্ত করা হয়। মৌঃ আব্দিরউদ্দিন শাহ, মৌঃ হাবিবারআলী সিদ্দিকী ও মৌঃ আবদুল মজিদ সাহেব দেশের ও দশের উপকারার্থে শারীরিক কষ্ট অবহেলা করিয়া বেলা দুইটা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা দ্বারা কৃষক-গণকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মেহেরআলী শাহ, বড়খাতা, রঙ্গপুর।
(রঙ্গপুর-দর্পণ)

মত ও পথ

দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার

রঙ্গপুর জেলায় সর্ব্বত্র লোকের আর্থিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কখনই অস্বীকার করা চলে না। তবে ইহাকে ঠিক দুর্ভিক্ষ বলা চলে না। খাদ্য দ্রব্যের অভাবকে যদি দুর্ভিক্ষ বলিতে হয় তবে বর্ত্তমান অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ নাম দেওয়া যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, ধনী নির্ধন কাহারও হাতে পয়সা নাই। এক শ্রেণীর লোক যাহারা দিন আনে দিন খায়, আজ তাহাদের ক্লেশের মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে,—কারণ ইহাদিগের কাজ নাই।

দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা

এই অর্থকষ্ট দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইলেও গাইবান্ধা মহকুমায় ইহার তীব্রতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। অন্ততঃ সংবাদপত্র পাঠ করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার দৈনিক পত্রাদিতে এবং "রঙ্গপুর-দর্পণ" পত্রে যে সমস্ত করুণ কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে, যদি উহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে উহার জন্য যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োজন তাহা হইতেছে বলিয়া আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। "অন্নাভাবে মৃত্যু" "সন্তান হত্যা" "সন্তান বিক্রয়" এই সমস্ত সংবাদের এই পর্য্যন্ত কোন প্রকার প্রতিবাদ হয় নাই। যদি অসত্য হয়, তবে ইহার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক, আর যদি সত্য হয় তবে ইহার জন্য সমগ্র জেলার সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

গাইবান্ধার অবস্থা

গাইবান্ধা হইতে প্রকাশিত "অগ্রদূতের" প্রথম সংখ্যায় "দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা" সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটী সংবাদ দেখিয়াছিলাম—কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যায় এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। গাইবান্ধায় যদি ক্লেশের মাত্রা প্রকৃতপক্ষে প্রবল হইয়া থাকে, তবে গাইবান্ধারই সকলের প্রথমে "দুর্গতের অন্বেষণে সেবায়" তার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গাইবান্ধায় কংগ্রেস কমিটি শক্তিশালী; কিন্তু কংগ্রেস এ সম্বন্ধে নীরব। গাইবান্ধায় সঙ্ঘবদ্ধ নেতা ও কর্ম্মীর অভাব নাই—মহিলা কর্ম্মীও অনেক আছেন। কিন্তু তাঁহারাও এ সম্বন্ধে কিছু করিতেছেন না।

পার্শ্ববর্ত্তী জেলার দৃষ্টান্ত

গাইবান্ধার পার্শ্ববর্ত্তী বগুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ প্রশমন-কল্পে তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা বোর্ডের সমবেত প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেট এ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন এবং ১২ হাজার টাকার ঋণের কাজ হইয়াছে। ইহাও পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় জেলা বোর্ডের প্রদত্ত ২৩০০৲ টাকা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন।

রঙ্গপুরে কি হইয়াছে ?

সরকারী ও অর্দ্ধসরকারী ভাবে রঙ্গপুরে এ পর্য্যন্ত কিরূপ কি করা হইয়াছে, আমরা তাহা অবগত নহি। দুর্ভিক্ষের সূচনায় আমরা মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। মফঃস্বল হইতেও এ সম্বন্ধে এক অথবা একাধিক পত্র "দর্পণে" প্রকাশিত হইয়াছিল। গাইবান্ধা মহকুমার স্থানে স্থানে কৃষিঋণ প্রদানের প্রচেষ্টা ও কৃষিঋণ প্রদান বিষয়ে সংবাদও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় কি পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেই বা কিরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে তৎসম্বন্ধে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

গাইবান্ধার শেষ সংবাদ

গাইবান্ধা হইতে আমরা যে সর্ব্বশেষ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে প্রকাশ সুন্দরগঞ্জ থানার অধীন যে সমস্ত ইউনিয়নের লোক অন্নবস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য ইউনিয়নে রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া উক্ত কমিটিতে কিছু কিছু করিয়া টাকা প্রদানপূর্ব্বক স্থানীয় পর্য্যাপ্ত জনসমূহের নিকট হইতে ধান্য, চাউল, বস্ত্র ও চাঁদা উঠাইয়া দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য নলডাঙ্গা সার্কেলের সার্কেল অফিসার মৌঃ মফিজউদ্দিন আহমদ সাহেব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত থানার ১১,১৩,১৪,১৫ ও ১৬নং ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করিয়া এই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন এবং কৃষিঋণ প্রদানের আশ্বাস দিতেছেন। আমরা সার্কেল অফিসার মহোদয়ের সাধু প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।

বিভিন্ন আর্ত্তত্রাণ সমিতি

আমরা সংবাদ পাইতেছি, দুর্ভিক্ষের প্রশমনকল্পে মফঃস্বলের স্থানে স্থানে আর্ত্তত্রাণ সমিতি সংগঠিত ও উহার আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তাহার পরে আর এই সমস্ত সমিতির কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। রঙ্গপুর সহরের মোসলেম ছাত্রসঙ্ঘও সহরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া অর্থ, বস্ত্র, চাউল সংগ্রহ করিতেছেন। এই সমস্ত আর্ত্তত্রাণ সমিতি কোথায় কিরূপ কার্য্য করিতেছে—কিরূপ ভাবে সাহায্য সংগ্রহ ও প্রদান করা হইতেছে, তাহা অবিলম্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

আমাদিগের শেষ কথা

আমরা পুনরায় বলিতেছি, দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এই যে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত হইয়াছে, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক না কেন, ইহা যে সহরে অপসৃত হইবে তাহা মনে না। বিগত সপ্তাহকালের অতিবৃষ্টির ফলে অনেক স্থলেই কৃষকের আশা ভরসা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। দুই এক মাসের মধ্যেই যে শত কৃষকের গৃহজাত হইত তাহা অন্যের হইয়া যাওয়ায় কৃষককে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইয়াছে। দুর্দ্দিনের করাল ছায়া যখন সহজে অপসৃত হইবার নহে তখন উহার প্রতিকারের জন্য দেশের বালবৃদ্ধ যুবাপ্রৌঢ় নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

(রঙ্গপুর-দর্পণ)

মালদহে জমিদার সভা

গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণে স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দ্বিতলস্থ কক্ষে মালদহ জেলার জমিদারবর্গের সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সিংহাবাদের বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ জমিদার শ্রীযুক্ত ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ জেলার অধিকাংশ জমিদার ও তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর যাবৎ মালদহের প্রধান ফসল আম আশানুরূপভাবে না হওয়ায়, বৈদেশিক রেশম-শিল্পের প্রতিযোগিতায় মালদহের রেশম শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়ায়, ধন না থাকায় ধনের আবাদ বন্ধ হওয়ায় এবং বর্ত্তমান বর্ষে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হ্রাস হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে বর্ত্তমানে মালদহের প্রজা-সাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা জমিদারগণের খাজানা আদায় দিতে পারিতেছে না। ফলে জমিদারগণ এই চৈত্র কিস্তির সাটের টাকা সরকারকে যথাসময়ে প্রদান করিতে অসমর্থ। কাজেই সরকার যেন অন্য জেলার জমিদারবর্গকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ১ বৎসর সময় দেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মানুযায়ী রাজস্বের কিস্তি খেলাপ করিলে জমিদারি যে নীলামে উঠিবে তাহা স্থগিত রাখিবার আদেশ দেন। রিভাইুয়েশন যেন পুনঃ বিবেচিত হয়। ইন্‌কাম ট্যাক্সের হেড্ অফিস দিনাজপুরে হওয়ায় এ জেলার লোকদিগকে বড় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঐ অফিস এই জেলায় যাহাতে স্থাপিত হয় তাহার জন্য অনুমতি দেন। বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট সম্পর্কে জমিদার ও প্রজার উপর যে অত্যাচার চাপিবে, তাহা যেন বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

ধর-বৃদ্ধি

গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া এ জেলার সহর ও মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ জেলার কৃষিজাত দ্রব্য নাকি অন্য জেলায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে এবং তাহার ফলেই নাকি এইরূপ ধর চড়িয়াছে।

মাছের বাজার

গত কয় দিন হইতে মাছের বাজার মিউনিসিপ্যালিটীর নব-নির্ম্মিত টীনের ঘরে বসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে কয়দিন এই বাজার মকদুমপুরে বসিয়াছিল। বর্ত্তমান টীনের ঘরটী কিন্তু মাছের বাজারের উপযুক্ত হয় নাই। মাছের আমদানি বেশী হইলে চলাফেরা করা বড়ই অসুবিধাজনক হয়।

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই যাহাতে বিশেষ অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তাদের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ধানগাছে পোকা

গাজোল থানার পূর্ব্ব-উত্তর অঞ্চলে ধান গাছ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আগুনে পোড়ার মত পুড়িয়া গিয়াছে। মহাদুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।

মহম্মদ ইসমাইল হোসেন
(মালদহ-সমাচার)

চাঁচল রাজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

বাৎসরিক হিসাব (১৯২৯, ১লা জুলাই হইতে ১৯৩০, ৪০শে জুন)

কেন্দ্রীয় সমিতি

১।	সমিতির ঠিকানা	চাঁচল রাজ সেণ্ট্রাল কো-
২।	সমিতির শ্রেণী	অমিশ্র শ্রেণী
৩।	সমিতির বিভাগ	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কমান
৪।	রেজেষ্টারীকৃত নম্বর এবং তারিখ	১৪৬ নং ; ২৭।৩।২৫ তারিখ
৫।	সভ্য-সংখ্যা	৮৭
৬।	কার্য্যকরী মূলধন	১৪৪৯১৯৶৬

সুদের হার

(ক) কর্জ্জ দাদন—৯৲ এবং ১০৸৶০
(খ) কর্জ্জ গ্রহণ—৭৲ (স্বল্প মিয়াদী) এবং ৮৲ (দীর্ঘ মিয়াদী
(গ) আমানত— ৪৲, ৫৲, ৬।০, ৭৲, ৭।০, ৮৲

পূর্ব্ব বৎসরের লভ্যাংশের (ডিভিডেণ্ডের) হার শতকরা ৮৲।

জমা

১।	অংশ বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি	
২।	আমানত	
	(ক) সাধারণের	
	(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক	
	কর্জ্জ আদায়	
	সংযুক্ত সমিতির নিকট হইতে	
	অন্যান্য আয়	
	(ক) সুদ আদায়	১১৮৬১৸৶২
	(খ) ভর্ত্তি	২৫৲
	(গ) ফরম বিক্রয়জনিত	১১০৲৬
	(ঘ) দণ্ড সুদ আদায়	২৬৷০
	(ঙ) ডিসকাউণ্টস	২৮১৷৶৬
	(চ) বিবিধ	১৲
	(ছ) ডিভিডেণ্ড	২৯২৷৶৩

	আমানত	
	(ক) সাধারণের	৪২৭০৮৷৩
	(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক	৩৩৫০০৲
	কর্জ্জ দাদন	
	(ক) সংযুক্ত সমিতিতে	
	খরচ	
	(ক) আমানতের সুদ	৭৮৩১৸৶৯
	(খ) ফরম বিক্রয়	৬৪৶০
	(গ) বেতন ও সহকারী	২১৭৭৸৶৬
	(ঘ) টিকিট খরিদ	২৭৷৶৬
	(ঙ) গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার	২০৲
	(চ) প্রাথমিক শিক্ষা	৬৲
৪।	অডিট ফি (ব্যাঙ্কে)	

জমা

বিবিধ প্রকার আদায়			
(১) অগ্রিম হিসাবে		২৬৮১২৲	
(২) অডিট ফি		৫২২৸/০	
(৩) কর্মচারিগণের প্রঃ ফণ্ড		১৫৫৲৬	
(৪) বিসিগুএর চাঁদা		৪৫৲	
(৫) গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার		৪৮৲	
(৬) সাস্‌পেন্স		৮০০০৲	৩৫৪৮২৸/৬
মোট			১৫৭০২২/২
গত বৎসরের তহবিল			৮১০৸/১১
সর্ব্ব মোট			১৫৭৮৩২৸/১

বিবিধ খরচ

(১) অগ্রিম		২৬৮০২৲	
(২) অডিট ফি			
(পল্লী সমিতি)		৯১৮/০	
(৩) সাস্‌পেন্স		৮০০০৲	৩৫১২০/০
			১৫৩৩০৭/৯
			৪৫২৫/৪
			১৫৭৮৩২৸/১

উদ্বর্ত্ত পত্র

(৩০।৬।৩০ তারিখের অবস্থা-জ্ঞাপক)

দেনা		পাওনা	
১। অংশ মূল্য আদায়		যদ্ভূত তহবিল—হস্তে ও ব্যাঙ্কে	
২। আমানত ও ফণ্ড		জমা	
(ক) সাধারণের	১১৬১০৭৸/৯	(ক) প্রাদেশিক নববায় ব্যাঙ্কের অংশ	
(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের	১০০০০৲	সংযুক্ত সমিতির নিকট কর্জ্জ পাওনা	
৩। আমানতের সুদ দিতে বাকী	৪৫০৯/৩	(তন্মধ্যে কিস্তি খেলাপ ৭১০৫০৲)	
৪। ডিভিডেণ্ড দিতে বাকী	১৫৫৮৸৲	পাওনা সুদ	
৫। বোনাস্	৬০৪৲	আসবাবের মূল্য	
৬। বেতন ও দরজামী দিতে বাকী	২৯৬৲	৬। অন্যান্য পাওনা	
৭। অন্যান্য আদায়		(ক) অডিট ফি আদায় বাকী	৩১০৯/০
(ক) কর্ম্মচারীদিগের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড	২২২৸/০	(খ) অতিরিক্ত অডিট ফি	
(খ) সমিতি রিজার্ভ ফণ্ড	৩৬৯৸৵৩	মালদহ ট্রেজারী হইতে কেহত পাওয়া যাইবে ৯৯৸/০	
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিঃ ফণ্ড	২৫৬৮/৬		
নিট লভ্য হইতে কত অন্যান্য ফণ্ড বাবদ		মোট	১৫৮১৭০/১
(ক) গৃহ নির্ম্মাণ ফণ্ড	২৫৪০৸/৬		
(খ) শিক্ষা প্রচার করা	২১৯৲		
(গ) অনাদায়ী টাকা পুরণ ফণ্ড	৪২১৮/২		
(ঘ) আসবাব	১২৬৸/০		
(ঙ) "বি" ক্লাস সমিতিকে পুরস্কার	২০৲		
(চ) দাতব্য	২৫৲		
বিসিওএর চাঁদা	৪৯৲		
গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার	৪৮৲		
সমষ্টি	১৫৫৩৬৭৸/১১		
নিট লভ্য	২৮০২/২		
	১৫৮১৭০/১		

স্বাক্ষর

১। কমলাকান্ত বাগচী, চেয়ারম্যান

২। গঙ্গারাম কুণ্ডু, সেক্রেটারী

৩। সেখ বহিরুদ্দিন আমেদ, ডিরেক্টর

জাত ও ক্ষতির হিসাব

(১৯২৯ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩০ সনের ৩০শে জুন)

ক্ষতি		জাত	
১। সুদ দেওয়া হইয়াছে ও দিতে বাকী		সুদ	১৪১১৪৸৶২
২। বেতন ও সংরক্ষণী দেওয়া হইয়াছে ও দিতে বাকী	২২৮৫৸৶৬	২। ফরম বিক্রয়	৪০৷৵৹
৩। আসবাব ইত্যাদির মূল্য হ্রাস		অন্যান্য প্রকার	
৪। অডিট ফি দেওয়া হইয়াছে		(ক) ভর্ত্তি ফি	
৫। অন্যান্য প্রকার		(গ) বিবিধ	
(ক) টিকিট		(ঘ) ডিস্‌কাউন্ট	
(খ) গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ঘরে অতিরিক্ত ডিভিডেণ্ড দেখান হইয়াছে	৭১/৯	(ঙ) প্রভিডেন্ট ফিপোষ্ট	
মোট	১১৭০৭৷৵৬	নষ্ট লভ্য	
নিট লভ্য	২৮০২৶২		১৪৫৩৯৸৮
	১৪৫৩৯৸৮		

ত্রিপুরার দুরবস্থা

ত্রিপুরা জিলার সবডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত মবিনগর থানার অধীন ১০নং শিবপুর ইউনিয়নের মধ্যে কনিকারা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটীর নিম্নে একটী জলা ভূমি। দুই বৎসর যাবৎ বন্যার জলে গ্রামবাসিগণের ফসলাদি ধ্বংস হওয়ায় গ্রামবাসী ছোট বড় সমস্ত লোকই অন্নাভাবে ও ডাল, নুন, বীজ, বস্ত্রাদি সর্ব্বপ্রকারের অভাবে অতিশয় কষ্টে নিপতিত হইয়াছে। যদি গ্রামবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সত্বর কোন সাহায্য না পায় তবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

এই গ্রামে ১০।১৪ দিন অতীত হইল সেকেন্দর আলী ও তাহার একটী কন্যা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আরও বহু লোক অন্নাভাবে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। কেহ কাহাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে সমর্থ নয়। গ্রামবাসী সকলেই এই রকম অভাবগ্রস্ত। চতুর্দ্দিক হইতে কোন মহাজন কি আত্মীয়-স্বজন হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না।

বর্ত্তমান সময় এই গ্রামের জমি বপন করার উপযুক্ত কাল। এই সময়ে বীজ বপন না করিলে আগামী বৎসরও নিশ্চিত। অতএব গ্রামবাসিগণের নিবেদন এই যে, অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট কৃষিঋণ-দানের এবং সাহায্য সমিতি সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করুন। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৭।

নিবেদক

হাফাত আলী, আমজাদ আলী, আবদুল আজিজ, আবদুল হামাদ, তমিজুদ্দিন।

(ত্রিপুরা-হিতৈষী)

পূর্ব্ববঙ্গে ঠগী

ইতিহাসে পাইয়াছি ঠগী নামে দস্যুদল ভারতের নানা গ্রামে বিচরণ করিত এবং পথিককে সর্ব্বস্বান্ত করিত।

মুসলমান রাজত্বের সময় এই দল পরিপুষ্টি লাভ করে। বঙ্গদেশেই হত্যাতার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল। ইংরেজ রাজত্বে উহা একবারে কমিয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন অনেক প্রবাদ শুনিয়াছি যে, কলিকাতা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও তথায় নানা প্রকার ঠগীদিগের অত্যাচার দেখা যাইত। ঢাকা সহরেও ইহা কম ছিল না।

বর্ত্তমানে বঙ্গের পল্লীতে ঠগীদের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে। আমরা ত্রিপুরা জেলার দেবীদ্বার থানার অন্তর্গত মাহিলগর গ্রামের আশেপাশে তিন তাসের জুয়া খেলা সম্বন্ধে অনেকবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার দেখা যাইতেছে না। বরং দিন দিন ইহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। শুনিয়াছি প্রথম প্রথম উহারা বাস্তবিকই পথিকদিগকে খেলায় প্রবৃত্ত করে। তৎপরে খেলার ছলে পথিকের পাথেয়, এমন কি কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময় মুরাদনগর থানার এক মোকদ্দমা কুমিল্লার সেসন কোর্টে চলিতেছে। কোন এক ফকীর-বেশী ঠগী মুরাদনগরে আসিয়া জনৈক স্কুলের ছাত্রের নিকট সিলটি করা অলঙ্কার বিক্রী করার জন্য প্রদান করে। ভাগ্যক্রমে উহা স্থানীয় সবরেজেষ্টার সাহেব জানিতে পারেন এবং উহার জন্য থানায় রিপোর্ট করেন। থানার অবাক উক্ত ফকীরের নিকট আরও সিলটী করা অলঙ্কার পাইয়া তাহাকে চালান দেন।

গত ১৯শে ফাল্গুন হারাণ ঘোষ নামক জনৈক ক্ষীর-বিক্রেতা মাহিলগরের নিকট ঠগীদিগের হাতে পতিত হয়। তাহারা উক্ত ঘোষের নিকট হইতে কতক ক্ষীর সেবা করিয়া উহার দাম ত দেয়ই নাই বরং তাহার তহবিলে যাহা কিছু ছিল সবই অপহরণ করিয়াছে।

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ
(ত্রিপুরা-হিতৈষী)

উত্তরবঙ্গে আলু চাষের কথা

এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আলু মানুষের প্রধান খাদ্য। বঙ্গদেশে ইহা প্রধান খাদ্য না হইলেও বাঙ্গালীর পক্ষে আলু যে একটী নিত্য-ব্যবহার্য্য উপাদেয় খাদ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় উত্তরবঙ্গে আলুর পচন-প্রবণতা দোষের জন্য সাধারণ বঙ্গবাসী এই নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যটী বৎসরে ২৩ মাস যাবতীয় অবশিষ্ট ৯।১০ মাসই ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। বঙ্গদেশে আলুর চাষ বৎসরে একবার মাত্রই হইয়া থাকে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে সেই ফসল সংগৃহীত হয়। এই সময় আলু খুব সস্তা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে, কারণ যাহারা আলুর আবাদ করে তাহারা অধিক দিন আলু ঘরে রাখিতে সাহস করে না, পাছে পচিয়া ষোল আনাই লোকসান হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের মধ্যেই দেশী আলু বিক্রয় শেষ হইয়া যেতে বাজারে আর দেশী আলু দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক জাতীয় আলুর আমদানি করিয়া বাঙ্গালায় আলুর অভাব মোচন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই আলু সাধারণতঃ সহরের লোকেই খাইয়া থাকে। মফঃস্বলের দরিদ্র লোকের উচ্চ দরে এই আলু কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য খুব কম। ফলে সাধারণ দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে আলু ৯।১০ মাসই দুষ্প্রাপ্য। আলুর পচন-প্রবণতা দোষ হইতে উদ্ভূত নানা কারণে আলুর চাষ, ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এতদ্দেশে আলুর চাষ ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সুযোগে ভিন্ন দেশের লোক এদেশে আলু বিক্রয় করিয়া বাজার হাজার টাকা লইয়া যাইতেছে। এমন কি ভারতে আলু আমদানি করার জল্পনা কল্পনা ভারতের বাহিরেও চলিতেছে।

আলু যদি না পচে বা কোনও উপায়ে আলুকে পচন হইতে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে :

(১) উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে আলু আবাদের উপযোগী জমির অভাব নাই। উত্তর বঙ্গের উঁচু জমি মাত্রেই আলুর চাষ হইতে পারে। আলুর চাষ অন্য শাকসব্জী ও তামাক ইত্যাদির চাষ অপেক্ষা অনেকাংশে সুবিধাজনক এবং অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমসাধ্য।

(২) বঙ্গদেশে আলুর চাষ আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসেই হইয়া থাকে। আলুর চাষ খুব কম বলিয়া

সাধারণতঃ কৃষক ও মজুরেরা বিশেষ কোন কাজের অভাবে একরূপ বসিয়াই দিন কাটায়। আলুর চাষ বৃদ্ধি হইলে কৃষকেরা এই দুই মাস যথেষ্ট কাজ করিতে পারিবে এবং কৃষি মজুরদিগকেও কাজ অভাবে বসিয়া কাটাইতে হইবে না।

(৩) আলু না পচিলে সমস্ত লোকেই সারা বৎসরের জন্য আলুর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে। তাহা হইলে দুর্দ্দিনাতার দিনে আর তাহাদিগকে অধিক মূল্যে আলু কিনিয়া খাইতে হইবে না। আর যাহাদের সংস্থান আছে তাহারা অধিক পরিমাণে আলু কিনিয়া রাখিয়া পরে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেও পারেন। কিনিয়া রাখিয়া পরে বিক্রয় করিলে কি পরিমাণ লাভ হইতে পারে তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

চৈত্র মাসে ১০/ মণ আলুর মূল্য ২।০ হিঃ ২৫৲
আলু রক্ষার কষ্ট ও অন্যান্য ব্যয় ।০ হিঃ ৫৲
মোট—৩০৲
শ্রাবণ মাসে আলু কমিয়া ৯/ মণ হইবে—
বিক্রয় মূল্য ৫৲ হিঃ ৪৫৲
আশ্বিন মাসে আরও কমিয়া ৭॥০ মণ হইবে—
বিক্রয় মূল্য প্রতি মণ ১০৲ হিঃ ৭৫৲

অতএব দেখা যাইতেছে আলু কিনিয়া রাখিয়া পরে বিক্রয় করিলে তিন মাস অন্তর বেড় গুণ ও ছয় মাস অন্তর আড়াই গুণ মূল্য পাওয়া যাইতে পারে।

(৪) আলুর চাষ বৃদ্ধি ও পচন দোষ হইতে আলু রক্ষার ব্যবস্থা হইলে ভিন্ন দেশ হইতে আলু আমদানি বন্ধ হইয়া যাইবে। এবং ক্রমশঃ এ দেশ হইতে আলু রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে অর্থাগমের সুযোগ উপস্থিত হইবে।

(৫) এই অন্নসমস্যার দিনে দরিদ্রের ঘরে আলুর ন্যায় উপাদেয় খাদ্য বস্তু থাকিলে তাহাদের অশান্তির সাধন হইবে।

শ্রীযুক্ত বি, সি, রায় (পোঃ চিলাহাটী, রঙ্গপুর) আলু রক্ষা করিবার এক বিজ্ঞানসম্মত অতি সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। পরীক্ষায় দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই প্রণালীতে আলু রাখিলে পঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না। ৵০ আনার ডাক টিকিটসহ তাঁহার নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারা যায়।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়,
সেক্রেটারী চন্দ্রকোণা এম, ই, স্কুল
পোঃ চিলাহাটী, রঙ্গপুর
(রঙ্গপুর-দর্পণ)

ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বাজার (১৯২৮-৩০)

পাট

ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে পাটের স্থান সকলের উপর। কাঁচা এবং তৈরী উভয় প্রকার পাটের ব্যবসা বহুকাল হইতে এবং রীতিমত শৃঙ্খলার সহিত চলিয়া আসিতেছে। বিদেশে পাটের পসার ক্রমেই বাড়িতেছে। য়ুরোপস্থ কার্খগুলি এখন সরাসরি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে মাল লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কিউবা দ্বীপের সান্টিয়াগো নগরস্থ একটী কার্খ এতদর্থে বিলাতস্থ ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনারের সহিত রীতিমত পত্র-ব্যবহার করিয়াছে। এই কার্খের লিখিত পত্রে প্রকাশ, কার্খটি এতদিন মার্কিণ দেশের কমিশন-এজেন্টদের নিকট হইতে পাট-জাত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ঠকিয়া আসিতেছে; কারণ এই কমিশন-এজেন্টগণ মালের জন্য অত্যন্ত চড়া দাম লইয়া থাকে। মন্টিভিডিও হইতে একজন ব্যবসাদারও এইরূপ সরাসরি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে থলিয়া আমদানি করিতে চায়। লাইপ্‌জিগ সহরস্থ একটী জার্মাণ কার্খও এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। ইহারা সকলেই ভারতীয় থলিয়া এবং পাট-রপ্তানিকারকদের সহিত সরাসরি সম্বন্ধ পাতাইতে উৎসুক।

পক্ষান্তরে ভারতীয় রপ্তানিকারকগণও বিদেশে এজেন্ট নিয়োগের পক্ষপাতী। বার্সিলোনা সহরের জনৈক সওদাগর স্বচেষ্টায় এইরূপ এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। স্পেনদেশে এই নয়া এজেন্ট নিয়োগে ফলও ফলিয়াছে, আরও দু চারিটি স্পেনীয় কার্খ অত্যন্ত ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের এজেন্ট হইবার জন্য লেখালেখি করিয়াছে। মিশিগান সহরের একজন সওদাগরও ভারতীয় থলিয়ার এজেন্সী লইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভারতীয় পাট ও পাটজাত বস্তুর জন্য যে সমস্ত দেশ এইরূপ মাথা ঘামাইতেছে তাহাদের মধ্যে স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা, মার্কিণ, জার্মাণি, ফ্রান্স এবং বিলাতই প্রধান। স্পেন কাঁচা পাট আমদানির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং মার্কিণ, কাঁচা পাট, ও ব্যাগ আমদানির অভিলাষী; আর এই দুই স্থানে কমিশন এজেন্ট, কলওয়ালা সকলেই ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে প্রয়াসী। জার্মাণি ব্যাগ, তন্তু, দড়ি ইত্যাদি চিজ সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেছে, আর ফ্রান্স চায় ব্যাগের খবর। ফরাসী অনুসন্ধানকারীরা সকলেই সওদাগর। ভারতের পাট সম্বন্ধে বিলাতের মাথাব্যথাই সব চেয়ে বেশী; আর এই জন্য বিলাতের তরফ হইতে খোঁজ খবর অনুসন্ধানের পালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শণ

বেলজিয়াম, বিলাত এবং জার্মাণিই ভারতীয় শণের প্রধান খরিদ্দার। ইতালি, ফ্রান্স এবং মার্কিণও ভারতীয় শণের নিতান্ত খারাপ গ্রাহক নহে। দড়ি, সামুদ্রিক তার (কেব্‌ল), টোয়াইন এবং থলি তৈরীর জন্যই শণ বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়। বহুকাল হইতে বেলজিয়ামই ভারতীয় শণের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। চেষ্টা করিলে ইয়োরোপে আরও শণ কাটান যাইতে পারে। লড়াইয়ের আগে রুশিয়াই ছিল ইয়োরোপের প্রধান শণ রপ্তানিকারক। লড়াইয়ের অবসানে রুশিয়া হইতে ইয়োরোপে শণ আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রুশিয়ান গবর্ণমেণ্ট শণের আবাদ

কমাইয়া দিয়া এখন গ্রাহকের আবাদ বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী। সুতরাং ভারতীয় শণ এখন অল্পদামে ইয়োরোপের বাজার দখল করিতে পারে, তবে ভারতীয় শণের আরো উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক। নিম্নে ভারতীয় শণের দোষগুলি উল্লেখ করা হইল :

(ক) ভারতীয় শণ নানা ধরণের। আবাদ সম্বন্ধে হুঁসিয়ার না হওয়ার জন্যই এই দোষ ঘটে।

(খ) ভারতীয় শণে ধুলামাটি থাকে যথেষ্ট। কারণ, মহলা জলে শণ ধোওয়া হয়। সময়ে সময়ে ভারতীয় শণে ভেজাল মিশাইবারও অপবাদ শোনা যায়।

(গ) বেল বাঁধার দোষ।

(ঘ) শ্রেণী বিভাগের অভাব।

যে যে কারণে ভারতীয় শণের দোষ জন্মে তাহা অল্পেশে নিবারণ করা যায়; কারণ প্রতিকারের উপায়গুলি সেরূপ কঠিন নয়। যদি আবাদকারীদিগকে আবাদ এবং পচান দেওয়া সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হইতে বলা হয়, এবং উহাতে দু পয়সা বেশী আসিতে পারে এই সহজ সত্যটী সমঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে চেষ্টা করিবে। শণ চালান দেওয়ার সময় শ্রেণী বিভাগ করা হয় না, ইহাতে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সওদাগর একটি কার্ম এ সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করিয়াছে। এই কার্মটীর মতে মাত্র শ্রেণীবিভাগ করিয়া রপ্তানি করার ফলে পূর্ব আফ্রিকার সিসল নামক তন্তু ক্রমে ক্রমে দুনিয়ার বাজার হইতে ভারতীয় শণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। কারণ, সিসলের ন্যায় শণ কিনিবার সময় তাহারা আদৌ টের পায় না, কিরূপ মাল খরিদ করিতেছে। তথাপি দুনিয়ার বাজারে ভারতীয় শণের বিশেষ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ভারতীয় শণ উৎকৃষ্ট ধরণের চিজ্। ভাল করিয়া আবাদ করিলে এবং শ্রেণী-বিভাগ করিয়া রপ্তানি করিতে পারিলে পাশ্চাত্য জগতে ইহার প্রচলন হইতে পারে, স্বয়ং এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রুশিয়া এবং ইতালিতেও উৎকৃষ্ট ধরণের শণ জন্মিয়া থাকে। বিলাতের ইম্পিরিয়াল ইন্‌স্টিটিউট্ ভারত, রুশিয়া এবং ইতালি এই তিন দেশের শণ লইয়া গবেষণা করে। এই সমস্ত শণ সমুদ্রের জলে এবং সাধারণ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয় শণের তুলনায় ইতালিয়ান এবং রুশীয় শণই আগে পচিয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় তন্তুরই যে জোর বেশী ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই গবেষণার ফলাফল এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড পুস্তিকাকারে দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি শণ ও তুলা একত্রে মিশাইয়া কাপড় প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। বোম্বাইয়ের কয়েকটি মিলের মালিক একটি বড় কার্ম এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন, পরীক্ষার ফল যদি ব্যবসা হিসাবে সাফল্য লাভ করে তাহা হইলে দুনিয়ার শণের চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে।

তুলা

১৯২৮-৩০ সনের মধ্যে ইয়োরোপের বাজারে ভারতীয় তুলার আসন ক্রমে সুদৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম এবং বিলাত ভারতীয় তুলার প্রধান খরিদ্দার। ১৯২৮-২৯ সনের পরে এই সমস্ত দেশের ভারতীয় তুলা আমদানি বিস্তৃতি হইয়াছে। বিলাতে আমদানি বাড়িয়াছে প্রায় তিন গুণ। ইয়োরোপে আমদানি-বৃদ্ধির কারণ—১৯২৯-২৮ সনে ভারতে অসম্ভব তুলা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ে ধর্মঘট-দুর্যোগ। ধর্ম-ঘটের জন্য বোম্বাইয়ের মিলগুলি তুলা লওয়া একরূপ বন্ধ করে। তুলা-ব্যবসায়ীরা তখন বাধ্য হইয়া সস্তায় তুলা বিক্রয় করিতে থাকে। আমেরিকান্ তুলার তুলনায় ভারতীয় তুলা যথেষ্ট সস্তা হওয়ায় ল্যাঙ্কাশিয়ার ভারতীয় তুলার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এতদিন এই ভারতীয় তুলায় আঁশ খাটো বলিয়া কিনিতে চাহিত না। ভারতীয় তুলা বেশী পাওয়া যাইত না, এইজন্যই ল্যাঙ্কাশিয়ার এইরূপ আপত্তি করিত। ভারতীয় তুলার ষ্টাণ্ডার্ড ঠিক পাওয়া যাইত না বলিয়াও আপত্তি উঠিত। এখন গাদায় গাদায় ভারতীয় মাল পাওয়া যাইতেছে দেখিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ার ভারতীয় তুলার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ডেভিড ডেনিসন্

20,169

কণ্ট্রাক্ট করিয়া ভারতীয় মাল লওয়ার জন্য ল্যাঙ্কাশিয়ার এখন জিদ করিতেছে।

পূর্ব্বে মামুলি ধরণের তুলা ক্রয় সম্বন্ধে বিলাতে খুব কড়াকড়ি ছিল। ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত নীতি অবলম্বিত হওয়ার পর এই কড়াকড়ি আর নাই। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটি এবং লিভারপুল কটন এসোসিয়েশান এখন রফা করিয়া ভারতীয় মাল লওয়ার ব্যবস্থা করিতেছে। ১৯২৯ সন হইতে এই নয়া বন্দোবস্ত-মাফিক কাজ হইতেছে। এই সমস্ত মিলিত চেষ্টার ফলে বিলাতে ভারতীয় তুলার কাটতি বাড়িবার সম্ভাবনা। আর এই কারণে গত দুই বৎসর হইতে বিলাতে ভারতীয় তুলা কাটিতেছেও বেশী।

বিদেশে উৎকৃষ্ট ভারতীয় তুলা বড় একটা রপ্তানি হয় না। উৎকৃষ্ট তুলা ভারতীয় মিলগুলিই গ্রহণ করে এবং দেশী মিলগুলির তরফ হইতে এই ধরণের তুলার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বিদেশের বাজারের কোন স্থিরতা নাই; এই অনিশ্চয়তার জন্য বিদেশে তুলা প্রায়ই রপ্তানি করা হয় না। আর বিদেশী চাহিদার চেয়ে দেশী চাহিদা মিটানোই লাভজনক। তবে ভারতীয় তুলার যাহাতে বিদেশে পসার বৃদ্ধি হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এইজন্য ল্যাঙ্কাশিয়ারে ভারতীয় তুলার কাটতি-বৃদ্ধি সুলক্ষণ বলিতে হয়।

বিলাতে ভারতীয় তুলার চাহিদা-বৃদ্ধির আরও একটি কারণ বর্ত্তমান। ক্যানেডিয়ান গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত পণ্যের বিনা সাম্রাজ্য-জাত বস্তুর মধ্যে বেশী সেই সমস্ত পণ্যই পছন্দ করিতেছে এবং তাহার জন্য শুল্ক-সুবিধারও ব্যবস্থা করিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতীয় তুলাজাত কাপড় চোপড় ক্যানাডায় কাটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিলাত এইরূপে ভারতীয় তুলাজাত বিলাতী কাপড় দ্বারা ক্যানাডার বাজার দখল করিতে চায়।

বোম্বাই এবং করাচীর তুলা-ব্যবসায়ীরা ডেফার্ড ডেলিভারি কণ্ট্রাক্ট (বিলম্বে মাল ছাড়ানোর চুক্তি) মানিয়া লইতে স্বীকৃত হওয়ায় ল্যাঙ্কাশিয়ারের পক্ষে ভারতীয় তুলা আমদানির সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই লওদাগরগণ এইরূপ চুক্তি মানিয়া লইতে পারিত না। তবে এইজন্য সওদাগরগণ ষ্টোরেজ চার্জ্জ এবং আটকান পুঁজির সুদ ইত্যাদি আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

ভারতীয় তুলার জাতির ও আঁশের উৎকর্ষসাধন করিতে পারিলে এবং আবাদ বাড়াইতে পারিলে ইয়োরোপে ভারতীয় তুলা রপ্তানি বাণিজ্য জোরসে চলিবে। সাকার ব্যারেজএর নির্ম্মাণ শেষ হইলে তুলার আবাদ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। অনেক সময় ভারতীয় তুলায় ভেজাল দেওয়া হয়। উৎকৃষ্ট আমেরিকান তুলার সহিত দেশী তুলা মিশ্রিত করা হয়। এই অসাধু ব্যবসায় পন্থা পরিহার করা দরকার। ইহাতে দেশীয় মিলগুলির সুবিধা তো হইবেই, অধিকন্তু রপ্তানি-বাণিজ্যেরও সুবিধা হইবে।

নারিকেলের দড়ির মাদুর-শিল্প

ভারত এবং ইয়োরোপের মধ্যে ভারতজাত নারিকেলের দড়ির মাদুর-শিল্পের ব্যবসাবাণিজ্য বেশ জোরে চলিতেছে। ভারতের এই শিল্প-বস্তুর প্রধান খরিদ্দার জার্ম্মাণি, বিলাত, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স। গত দুই বৎসর এই সমস্ত দেশে বেশ রপ্তানি হইয়াছে। বিলাত এবং ইয়োরোপের বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে ভারতের দড়ি-শিল্পের যৌথিক ষ্টল খোলা হইয়াছে। এই ষ্টল খোলার ফলে নানাদেশের ব্যবসায়ীদের মনে ভারতীয় দড়ি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে এবং ইহারা নানা প্রকার অনুসন্ধানও করিতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতের এই শিল্পটি একটী জীবন্ত শিল্প এবং ভবিষ্যতে ইহার প্রসারও ঘটিবে যথেষ্ট। কার্পেট এবং কার্টেন প্রস্তুতকারী একটি ফার্ম্ম দড়ি-শিল্পের কলওয়ালাদের নামধাম জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছে। আর একটি জিম্‌নাষ্টিকের উপকরণ নির্ম্মাতা ফার্ম্মও এইরূপ খোঁজ খবর লইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি ফার্ম্মও ভারতের নারিকেলের দড়ির কল-ওয়ালাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। উহারা নাকি এই ভারতজাত দ্রব্যাদি লইয়া বড় কারবার চালাইতেছে।

রেশম

বর্ত্তমানে ছনিয়ের বাণিজ্যের অধোগতির জন্য ভারতের রেশম শিল্প—কাঁচা এবং তৈরী, উভয়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। লড়াইয়ের আগে যে পরিমাণে রেশম এবং রেশমী কাপড় বিদেশে চালান যাইত এখন মাত্র তাহার এক-তৃতীয়াংশ চালান যায়। বিলাত এবং ফ্রান্সই ভারতের প্রধান খরিদ্দার। সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত মূলক শুল্ক বসাইবার পর হইতে এখন বিলাতেই ভারতীয় রেশম ও রেশমী কাপড় চালান যাইতেছে অত্যধিক পরিমাণে; কিন্তু পূর্ব্বে ফ্রান্সেই যাইত বেশী। ইয়োরোপের এক্‌জিবিশানে এক্‌জিবিশানে ভারতের রেশম সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজ খবর লওয়া হইতেছে এবং পত্রের দ্বারাও এই কাজ চলিতেছে। বিলাতে ভারতীয় কোরা রেশম পর্য্যন্ত বিক্রী হইতেছে। কলিকাতার একটী কার্ম্ম লণ্ডনের একটি কার্ম্মের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া মাল পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। লণ্ডনের আর একটি কার্ম্ম ভারতের কোরা রেশম প্রস্তুতকারীদের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইতে চাহিতেছে। এই কার্ম্মটির নিউ-ইয়র্ক সহরে একটী শাখা আছে। কোরা রেশমের রুমাল এবং গলবন্ধ প্রস্তুত করিয়া কার্ম্মটি আমেরিকায় রপ্তানি করিতে চায়। প্যারির একটি কার্ম্ম এবং নরওয়ের একটী কার্ম্মও ভারতীয় কোরা-রেশম-ওয়ালাদের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে বাণিজ্য করিবার অভিলাষী। উহারাও রুমাল, গলবন্ধ ও অন্যান্য রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিবে।

পশম

বিলাত এবং মার্কিণ ভারতীয় রেশমের প্রধান খরিদ্দার। বিলাত ভারতীয় পশম আমদানি করে কতক নিজের এলাকার জন্য আর কতক আমেরিকায় এবং কন্টিনেণ্টে পুনঃ রপ্তানি করিবার জন্য। ভারত এবং মার্কিণের মধ্যে পশম বাণিজ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯২৮-২৯ সনে বিলাত কাঁচা রেশম আমদানি বাড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে আবার কমাইয়াছে। ১৯২৮-২৯ সনে মার্কিণে ভারতীয় কাঁচা পশম রপ্তানি খুব বাড়িয়া যায় এবং ১৯২৯-৩০ সনে আরও বাড়িয়াছে। আলোচ্য সনে পূর্ব্ব-ভারতীয় পশমের ব্যবসা খুব বাড়িয়া যায়। লড়াইয়ের পরে এই ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ হইলেও বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা খুব ভাল এবং প্রায় লড়াইয়ের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে। ভারতীয় পশমজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পেট এবং রাগই প্রধান। লড়াইয়ের সময় এবং লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগের তুলনায় এই ব্যবসা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাত এবং মার্কিণ দুই দেশেই ভারতের কার্পেট এবং রাগ খুব চালান যাইতেছে। তবে আলোচ্য সনের পূর্ব্ব ছয় মাসের তুলনায় শেষের ছয় মাসে চালানের পরিমাণ অনেকটা কম হইয়াছে।

ভারতের কাঁচা পশম, রাগ ও কার্পেট সম্বন্ধে বৈদেশিকরা খুব অনুসন্ধানাদি করিতেছে। বেলজিয়ামের টুর্কি সহরের একটী বয়ন-প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কাঁচা পশম রপ্তানিকারকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পাতাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে; কয়েকটি ভারতীয় রপ্তানি ব্যবসায়ীর সহিত ইহাদের সম্বন্ধ স্থাপিতও হইয়াছে। ব্রাড্‌ফোর্ডের একটী কার্ম্ম আমেরিকায় বোষ্টন সহরে একটী শাখা খুলিয়াছে। আমেরিকায় বিলাতী পশম বিক্রয় করাই ইহার উদ্দেশ্য। কার্ম্মটি বোম্বাই এবং করাচীর পশম-রপ্তানিকারকদের সঙ্গেও ব্যবসা চালাইতেছে। বর্জ্জিত রেশমের চাহিদাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিদেশ হইতে এর জন্য খোঁজ-খবরের তাগিদ আসিতেছে। থানসড় সহরের বৃটিশ কন্সাল একটী প্রয়োজনীয় খবর পাইয়াছেন। থানসড় সহরের দুই জন ভারতীয় পশম-ব্যবসায়ী বিলাতে পশম চালান দিতে চায়। এতদিন থানসড় অঞ্চল হইতে পশম কলিকাতেই চালান যাইত। এই পশমের ঘর, ভাণ্ডার সমস্তই সুবিধাজনক বলিয়া লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছে। মোট কথা ভারতের পশমজাত দ্রব্য সম্বন্ধে দুনিয়ায় বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিয়াছে।

তৈল বীজ

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈলবীজের স্থান অতি

উচ্চে। ১৯২৮-২৯ সনে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যে মূল্য এবং পরিমাণে তৈলবীজ ৪র্থ স্থান দখল করে। তবে ১৯২৯-৩০ সনে তৈলবীজের রপ্তানি কিছু কমিয়া যায়। মোট রপ্তানির পরিমাণ লড়াইয়ের পূর্ব্বের চেয়ে এখনও অনেক কম। হ্রাসের কারণ এই যে, ভারতবর্ষে অনেক তেলকল স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিদেশে আর এক ছটাক কোপ্রা ও রপ্তানি হইতেছে না। লড়াইয়ের আগে কি সন এই বস্তু অনেক পরিমাণে বিদেশে চালান যাইত। ভারতীয় তৈল বীজ রপ্তানি হ্রাসের আর একটি কারণ এই যে, ইয়োরোপের বাজারে পাম্ তেল ও অন্যান্য নানাপ্রকার প্রাচ্যপ্রধান দেশজাত তৈলবীজ ভারতীয় তৈলবীজের সহিত ভীষণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ মসিনার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন দেশের মধ্যেই মসিনার যথেষ্ট টান, পক্ষান্তরে ইয়োরোপে আর্জ্জেন্টিনা হইতে মসিনা আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে. এই দুই কারণে ইয়োরোপে ভারতীয় মসিনা আর সেরূপ কাটিতেছে না। মসিনার তৈল নানাপ্রকার রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজকাল মসিনার তৈলের কাজ অন্যান্য তৈলের দ্বারা পূরণ হওয়ার জন্য মসিনার দর্শা ঠাণ্ডা হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইয়োরোপের প্রধান খরিদ্দার বিলাত, ফ্রান্স এবং ইতালি। এই তিনটি দেশেই ভারতীয় মসিনার আমদানি কমিয়াছে। তবে ১৯২৯-৩০ সনে ভারতীয় মসিনার রপ্তানি আবার বাড়িয়াছে। ইয়োরোপের ব্যবসায়ীরা মসিনা, মসিনার তেল রপ্তানিকারক, কারখানাওয়ালাদের সঙ্গে লেখালেখি আরম্ভ করিয়াছে।

আমেরিকা ভারতীয় রেড়ীর বীজের প্রধান খরিদ্দার; আমেরিকার রেড়ীর বীজের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইয়োরোপের মধ্যে ফ্রান্স, বিলাত ও ইতালিতে ভারতীয় রেড়ীর আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বিলাতই ইয়োরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। ১৯২৯-৩০ সনে বিলাতে রেড়ীর বীজ রপ্তানির মধ্যে ভারতের হিস্যা প্রায় অর্দ্ধেক। সরিষা আর বিদেশে তেমন যাইতেছে না। দেশের তেল-কলগুলিই এর জন্য দায়ী। পূর্ব্বে মোট উৎপাদনের ২৪% বিদেশে যাইত, এখন ১০% যায়। বিলাত, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি কেহই ভারতীয় সরিষা কিনিতেছে না। ১৯২৯ সনে ইতালি এক ছটাকও কিনে নাই। গত দুই বৎসর হইতে ইয়োরোপের বাজারে ভারতীয় তিসির ব্যবসায়ও মাটী হইবার উপক্রম হইয়াছে। ১৯২৮-২৯ সনে বিলাত একরূপ কিনিয়াছিল বটে; কিন্তু পরের সনে আবার আমদানি কমাইয়াছে অনেক পরিমাণে। ফ্রান্স ও এক সময়ে ইহার বড় খরিদ্দার ছিল, কিন্তু ১৯২৯-৩০ সনে ফ্রান্স তিল সম্বন্ধে একেবারে মাথা ঘামায় নাই। ইতালিও তিল ক্রয় কম করিয়াছে।

তৈলবীজ ভারতবর্ষের দেশীয় কলগুলিতেই বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। আর দিন দিন বিদেশে রপ্তানি কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু চিনাবাদামের অবস্থা ঠিক উল্টা দাঁড়াইয়াছে। চিনাবাদামের আবাদ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, রপ্তানিও কি সন বাড়িতেছে। ফ্রান্সই ভারতীয় চিনাবাদামের প্রধান খরিদ্দার। ১৯২৮-২৯ সনে ফ্রান্সের আমদানি সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছে। জার্ম্মাণি, বিলাত, ইতালি এবং হল্যাণ্ডও কিনিয়াছে প্রভূত পরিমাণে। জার্ম্মাণির চিনাবাদাম ক্রয় এতদূর বাড়িয়াছে যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণি ফ্রান্সের সমান হইয়াছে। হল্যাণ্ডের খরিদও খুব বাড়িয়াছে। ইয়োরোপে চিনাবাদামের আমদানি-বৃদ্ধির প্রধান কারণ, মার্গারিন্ এবং অন্যান্য ভক্ষণোপযোগী তৈল শিল্পের উপকরণ হিসাবে চিনাবাদাম অন্যান্য উপকরণ-গুলির স্থান অধিকার করিতেছে। পূর্ব্বে ভারতীয় চিনা-বাদামে বর্জ্জ্যযুক্ত এসিড থাকিত বেশী। এম্প্যায়ার মার্কেটিং বোর্ডে ভারতীয় চিনাবাদামের এই দোষ সম্বন্ধে নিন্দা করা হয়। বর্ত্তমানে ভারতীয় চিনাবাদামের এই মহৎ দোষ দূরীকৃত হইয়াছে। আমদানি বীজের খোসাও আর সেরূপ ভাঙ্গিতেছে না। ভারতবর্ষে রীতিমত গবেষণা করিয়া চিনাবাদামের এই দোষ দূরীভূত করা হইয়াছে। গবেষণা-লব্ধ নয়া বীজের আবাদে শ্রীদামা কমিয়াছে, বীজ সকালে পাকিতেছে আর বীজে তৈলের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে।

তৈল

বিলাত এবং ফ্রান্স চন্দন-তৈলের প্রধান খ

আলোচ্য সনে বিলাত কিন্তু পূর্ব্বের চেয়ে কম চন্দন তৈল আমদানি করিয়াছে, পক্ষান্তরে ফ্রান্সে আমদানি বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ মহীশূর রাজ্যেই চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। মহীশূরের নবনিযুক্ত লণ্ডনস্থ ষ্টেট্ কমিশনার ইয়োরোপ আমেরিকায় চন্দন তৈল বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৯২৮-২৯ সনে লিমন্-গ্রাস্ তেলের রপ্তানি বেশ সন্তোষজনক; কারণ, ফ্রান্সে ও আমেরিকায় এই তৈল অনেক বিকাইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে এই তৈল-বিক্রয়ের পরিমাণ লড়াইয়ের পূর্ব্বের অবস্থায় ঠেকিয়াছে। পাঞ্জাবের জনৈক প্রস্তুতকারকের সহিত লণ্ডনের একটি কার্ম্মের সাক্ষাৎ ব্যবসায়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

ভেজিটেব্‌ল্ তেলের মধ্যে ক্যাষ্টর অয়েল, বিলাতের বাজারে ১৯২৮-২৯ এবং ১৯২৯-৩০ সনে বেশ সুন্দর বিকাইয়াছে। এই দুই সনেই বিলাতে রপ্তানির পরিমাণ লড়াইয়ের পূর্ব্বের চেয়ে বেশী; তবে শেষের বৎসরে মূল্য সুবিধাজনক নহে। সোফিয়া সহরস্থ একটি বুলগেরিয়ান কার্ম্ম বোম্বাইয়ের জনৈক ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসা-সম্বন্ধ পাতাইয়াছে; এই বুলগেরিয়ান কার্ম্মটির সহিত এখন বোম্বাইয়ের চিনাবাদাম এবং মরিচের ব্যবসাও চলিতেছে। বোম্বে সহরের একটি কার্ম্মের সহিতও বোম্বাইয়ের রেড়ীর বীজ ও রেড়ীর তেলের ব্যবসা চলিতেছে। তবে বোম্বাই সহর হইতে রেড়ীর তৈল রপ্তানি এখন অর্দ্ধেকে পরিণত হইয়াছে; দেশের মধ্যে রেড়ীর তেলের প্রচলন-বৃদ্ধির জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে। নারিকেল তেলেও ভারতের বিশেষ সুবিধা নাই; কারণ রপ্তানির চেয়ে আমদানিই বেশী। জেনোয়া সহরের একটি ইতালিয়ান কার্ম্ম কলিকাতা ও দক্ষিণ ভারতের রপ্তানিকারকদের নিকট নারিকেল তেল গ্রহণ করিবার জন্য অনুসন্ধানাদি করিতেছে। মোট কথা ভারতীয় তেল বিদেশের বাজারে সেরূপ ভাল চলিতেছে না। চিনাবাদামের তেল, মসিনার তেল, তিলের তেল কদাচিৎ কখনও ইয়োরোপের বাজারে যাইতেছে; এবং ইয়োরোপের তরফ হইতে এই সমস্ত ভারতীয় তেল সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বিশেষ দেখা যাইতেছে না। তবে কখনও কখনও হঠাৎ দু-এক স্থান হইতে দু-একটা খোঁজখবর আসিতেছে। চায়নিজের একটি কার্ম্ম সর্ষপ তৈল সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছে; লণ্ডনের একটি কার্ম্ম মহুয়া তেল এবং মহুয়া তেলের খইল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছে; কাণপুরের হারকোর্ট বাটলার টেক্‌নোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের নিকট এই সমস্ত খোঁজখবর আসে; এবং এই ইনষ্টিটিউট্ কার্ম্মগুলিকে আবশ্যকীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিয়াছে।

খইল

লড়াইয়ের পর ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে যে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মধ্যে খইলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বিদেশে খইল রপ্তানির পরিমাণ লড়াইয়ের আগের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ভারতীয় খইলের মধ্যে ইয়োরোপের বাজারে মসিনা এবং চিনাবাদামের খইল সব চেয়ে বেশী কাটিতেছে। কাপাসের খইলের খরিদ্দার বিলাত এবং জার্ম্মানি। গত দুই বৎসর বিলাতে কার্পাস-খইল রপ্তানি কমিয়াছে; জার্ম্মাণিতে খইল রপ্তানি সম্বন্ধে ঠিক খবর জানা যায় নাই। ভারতে চিনাবাদামের আবাদ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং চিনাবাদামের খইল রপ্তানিও বাড়িতেছে। বিলাত এবং হল্যাণ্ডে এই খইল বেশী রপ্তানি হইয়াছে; জার্ম্মানিতে রপ্তানি কমিয়াছে। বিলাতে মসিনার খইল রপ্তানি পূর্ব্ববৎ; তবে হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে রপ্তানির কোন স্থিরতা নাই।

গত দুই বৎসর হইতে ভারতীয় খইল সম্বন্ধে বিদেশ হইতে যথেষ্ট খোঁজ-খবর লওয়া হইতেছে; এ-সম্বন্ধে বিলাতের মাথাব্যথাই বেশী দেখা যাইতেছে। গ্লাসগোর একটি বিরাট কার্ম্ম তেলের কলওয়ালা এবং রপ্তানিকারকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছে। কন্টিনেন্ট এবং আমেরিকা হইতেও চিঠিপত্র আসিয়াছে।

বোম্বাই হইতে বিলাতে যে সমস্ত খইল রপ্তানি হয় তৎসম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই খইলের মধ্যে অতি সামান্য মাত্রায় রেড়ী থাকে। খইল গরুর খাদ্য; বিলাতে এই সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহাতে এমন কোন

গরুর খাদ্য আমদানি করিতে দেওয়া হয় না যাহা গরুর পক্ষে হানিকর। খইল-ক্রেতাগণ এই আইনের ফাঁকিতে খইল কম দামে কিনিবার জন্য জিদ করিতে থাকে। হাঙ্গেরী এবং অষ্ট্রোহাঙ্গেরী দরুণ কিন্তু ভারতীয় খইলের এই দোষ উল্লেখ করিয়াই বিক্রীর চুক্তি করা হয়। বিলাতেও আমদানি সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বিলাতে ভারতীয় খইল বিক্রয়ের কোন অসুবিধা উপস্থিত হইবে না।

রং এবং ট্যান করিবার উপকরণ

বিদেশে ভারত হইতে নীল রপ্তানি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে একমাত্র বিলাতই ভারতীয় নীলের খরিদ্দার; কিন্তু বিলাতেও বিক্রয় কমিয়া যাইতেছে।

ভারত হইতে ইয়োরোপে যে সমস্ত ট্যান করিবার বস্তু চালান যায়, তাহার মধ্যে হরীতকীই প্রধান। বিলাত, জার্মাণি, ফ্রান্স এবং আমেরিকা এই জিনের প্রধান খরিদ্দার। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ভারত হইতে এই বস্তুর রপ্তানি কমিয়াছে। কমিবার কারণ এই যে, দেশের মধ্যেই এই বীজ কাটিয়া যাইতেছে বেশী। বর্ত্তমানে ভারতের ট্যানিং শিল্প বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। লড়াইয়ের আগের চেয়ে বর্ত্তমানে বিদেশে ট্যান করা চামড়া দ্বিগুণ রপ্তানি হইতেছে। বিদেশে হরীতকী রপ্তানি হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিদেশী ফার্ম হরীতকী এবং উহার নির্য্যাস সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেছে; রপ্তানিকারকদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। ইয়োরোপ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকাতেও হরীতকী এবং উহার নির্য্যাস বিক্রী হইতে পারে—পোর্ট এলিজাবেথের একটি ফার্মের ডিরেক্টার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাত এবং ফ্রান্স কাচ এবং গ্যাম্বিয়ারও ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু এই দুই বস্তু সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়ার সেরূপ কোন তাগিদ নাই। বিলাতের ট্যান করার শিল্প, আমদানিকারী একটি ফার্ম আরও দুই একটী জিনিস সম্বন্ধে ভারতবর্ষে খোঁজ করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে দুইজন জাহাজওয়ালা এই জিনগুলি চালান দেয়, তাহাদের বিষয় ঐ বিলাতী ফার্মটিকে জ্ঞাত করান হইয়াছে।

হাইড্, স্কিন ও লেদার

ভারতবর্ষের কাঁচা গোচর্ম্ম ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে বিলাত এবং কন্টিনেন্ট মাত্র অর্দ্ধেক মাল গ্রহণ করিয়াছে। কাঁচা স্কিনের ব্যবসার অবস্থা কিন্তু বেশ ভাল। ট্যান করা গরুর চামড়ার চাহিদাও বেশ, ট্যান করা ভেড়া এবং ছাগলের চামড়াও বেশ কাটিতেছে। ভারি হাইডের চাহিদা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাতলা হাইড এবং স্কিনের চাহিদা ক্রমে বাড়িতেছে। বুট এবং জুতার জন্য পাতলা চামড়ার দরকার; সুতরাং পাতলা চামড়াই কাটিতেছে। বুট এবং জুতাতে কাপড়ের চলন হওয়ায় লেদারের চাহিদা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। তবে জুতার কাপড়ের প্রয়োজন উর্দ্ধ সীমায় উপনীত হইয়াছে, সুতরাং লেদারের চাহিদা আর বেশী কমিবে না বলিয়া সকলে আশা করিতেছে। কিন্তু যদি লেদারের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় তবে মুস্কিলের কথা।

বিলাত, কন্টিনেন্ট এবং মার্কিণ হইতে চামড়া সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর ও তাগিদ আসিতেছে। ফ্রান্স, জার্মাণি, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, কানাডা প্রভৃতি দেশও অনেক তথ্য জানিতে চাহিতেছে। সাজসজ্জার কাজের জন্য গোসাপ ইত্যাদির চামড়ার জন্য অনেকে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে।

তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথের আর্থিক ইল্জৎ

১৯২৬ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সোবিয়েট ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাইবেরিয়া হইতে তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই নূতন রেলপথ ওমস্ক-লাইনের সেমিপ্যালাটিন্স্ক ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম রেখায় সেমিপ্যালাটিন্স্ক সহরকে ভেদ করিয়া ৪ মাইল দূরে ইয়াটিশ নদী পার হইয়া যাইবে। সেখান হইতে ইয়াটিশ নদীর পশ্চিম দিকে আসাশ সহর হইয়া চার-গার্ব্বার উপত্যকার মধ্য দিয়া ১০০ কিলোমিটার দূরে কোক্‌পেক্টিকি সহরে যাইবে। তারপর এই রেলপথ পশ্চিমমুখো হইয়া তার্শা নদীর উপত্যকার ভিতর দিয়া যাইবে, এবং আস্‌কি-সু নদী পার হইয়া, ইয়াটিশ্ নদী ও বলখাস হ্রদের আর্দ্র অববাহিকার ভিতর দিয়া সেমিরেচেন্স্ক্ সহরে যাইবে। তারপর ইহা সেমিরেচেন্স্ক্ সহর হইতে বলখাস্ হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল দিয়া কারাটাল নদী পার হইবে, এবং কারাটাল ও বিষ্ণ নদীর উপত্যকা দিয়া ন্যালিত্যারি পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া বক্রগতিতে যাইবে। পথিমধ্যে এই রেলপথ ইলি উপনিবেশ, তথা ইলি নদী পার হইয়া আসিবে। তারপর রেলপথ সোজা দক্ষিণমুখী হইয়া আল্মা-আটা সহরের উত্তরে অবস্থিত আল্মা-আটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইবে। আল্মা-আটা ষ্টেশন হইতে রেলপথ ফ্রাঞ্জে-আল্মা-আটা ডাক-সড়কের উত্তর দিকে যাইবে। পথিমধ্যে রেল সড়কটী কাস্‌কোলন, শিমেল্‌গান, কার্গালি প্রভৃতি কতকগুলি নদী পার হইবে। কোপা নদীর উপত্যকার মধ্যে রেলপথটী শোক্‌পার গিরিপথের মধ্য দিয়া আলা-টাউ পর্ব্বতমালা পার হইবে। পর্ব্বতমালা পার হইবার পর, রেলপথটী ও নদী পার হইয়া শোক্‌পার নদীর দিকে যাইবে। নিকটেই নভো ট্রইট্স্কো উপনিবেশ অবস্থিত; এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখো হইয়া রেলপথ কুর্গা-টা নদীর অভিমুখে হইবে, এবং উহার উপত্যকার ভিতর দিয়া লুগোভেস্কা ষ্টেশনে উপস্থিত হইবে। এই ষ্টেশনটী টাসখেণ্ড রেলওয়ের এরিস্ পিলপেক গুয়েনবুর্গ শাখা রেলপথের ৪২৪ তম কিলোমিটারে অবস্থিত।

রেলপথটী মোট ১,৪৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ হইবে। খরচ পড়িবে ২০৩,৭০০,০০০ রুবল্ (২০,৩৭০,০০০ পাঃ)। লেবার অ্যাণ্ড ডিফেন্স্ এর কাউন্সিল ১৯২৮ সনের ২৪শে মে তারিখে চরম এষ্টিমেট স্থির করিয়াছে।

১৯২৭ সনে এই নয়া রেলপথের নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছে। ১৯৩০ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সেমিপ্যালাটিন্স্ক সহরের উত্তরে ১৫৭ কিলোমিটার এবং লুগোভেস্কা সহরের দক্ষিণে ১৬১ কিলোমিটার রেলপথ অস্থায়ী ট্র্যাফিকের জন্য খোলা হইয়াছে।

তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথের অর্থনৈতিক মূল্য খুব বেশী। এই রেলপথ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আর্থিক কদরও বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্রস্তাবিত রেলপথের নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলির সহিত মোটা সোবিয়েট ইউনিয়নের একরূপ যোগাযোগ নাই বলিলেই হয়। নয়া রেলপথের কল্যাণে এই প্রদেশগুলির ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়া যাইবে, এবং এইগুলি সোবিয়েট ইউনিয়নের বাণিজ্য-সীমানার মধ্যে আসিবে। উদাহরণস্বরূপ এই রেলপথের উত্তরাঞ্চলস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টাচরিত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৩০ সনের প্রারম্ভেই এই প্রতিষ্ঠান-

ওজন ১,৪০০ ওয়াগন হরমুজ, ৭৪ ওয়াগন বিচালী, ১৬০ ওয়াগন মাংস, ৪০ ওয়াগন পাকা ও কাঁচা চামড়া ইত্যাদি মাল রপ্তানি করিবে বলিয়া নোটিশ দিয়াছে। রেল পথের দক্ষিণ ভাগে [illegible] উপত্যকা হইতে অনেক "কাফ্ ফেয়ার" চালান আসিবারও কথা ছিল। সুতরাং মোট ৮,০০০ ওয়াগন চালান যাওয়ার কথা।

১২২৮ সনে সের্গিয়োপোল পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম চীনের সহিত সোবিয়েট্ রুষিয়ার যথেষ্ট লাভজনক আদান প্রদান হইয়াছে। ১৯৩০ সনের মধ্যে বলখাস্ হ্রদ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ার কথা। নির্ম্মাণ শেষ হইলে এই হ্রদের উৎপন্ন সামগ্রী চালাইবার সুবিধা হইবে; আর এই হ্রদের ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথ এই রেল পথের সহিত সংযুক্ত হইবার অবসর পাইবে। ১৯৩০ সনের মধ্যে আল্মা-আটা পর্য্যন্ত দক্ষিণ সেকশানেরও নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার কথা। এই সেকশান শেষ হইলে উর্ব্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ সেটাইসোভিয়ট প্রদেশটীর (পূর্ব্বকার সেমিরেচিন্স্ক প্রদেশ) ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হইবে।

অর্থ নৈতিক ফলাফল

৩টি প্রদেশ এই রেলপথের কল্যাণে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। (১) পশ্চিম সাইবেরিয়া। ইহার মধ্যে আভ গোরোড্, বার্ণল্, বিস্ক, এবং কটসভ্ জেলা পড়িবে। (২) কাজাকস্তান এ, এস, এস, আর। এই প্রদেশের সহিত সেটাইসোভিয়ট, সেমিপ্যালাটিন্স্ক, এবং সিরদরিয়া গবর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত অলিয়েটিন্স্ক এবং শিমকেণ্ট জেলা দুইটি পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। (৩) কিরগিজ্ এ, এস, এস আর এর উত্তরাংশ। এই নূতন রেল পথের জন্য টাস্কেণ্ড হইতে নভো-সিবিরিস্ক্ এর দূরত্ব পূর্ব্বতন দীর্ঘ বৃত্তাকার ৪,৬১৮ কিলোমিটার স্থলে ২,৭১৩ কিলোমিটার হইবে।

নয়া রেলপথের এলাকায় যে সমস্ত ভূভাগ পড়িবে তাহার লোকসংখ্যা ৫,৫৪০, ৭০০ এবং সমগ্র ভূভাগের পরিমাণ ফল ১২৪, ৩৭৪, ৩৯৫ "গা"; ইহার মধ্যে কর্ষণ-যোগ্য ভূমির পরিমাণ ১৬,৫৮৭,১০৫ "গা", (১৩·৩%), উৎকৃষ্ট পশুচারণভূমি ৪৭,২৭৭,২৫৩ "গা" (৩৮%) এবং উৎকৃষ্ট জঙ্গলের আয়তন ১০,৫২৯,০০৮ "গা" (৮·৬%)।

তুর্কীস্থান সাইবিরিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইলে এই বিরাট বিভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হইবে; আর প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ এই ভূভাগের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাজাকস্তান এবং কিরগিজিয়া মুলুককে পেশা হিসাবে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—(১) কৃষি এবং গবাদি পশু-পালন (দুইটীই প্রায় সমান মূল্যবান্; তবে কৃষি, পশু-পালনের চেয়ে কিছু বেশী); (২) গবাদি পশু-পালন (কৃষির চেয়ে পশু-পালনই বেশী; (৩) পশুপালন (কৃষি একেবারে নাই বলিলেই চলে); (৪) কেবল কৃষি।

এই ভূভাগের কর্ষিত জমির পরিমাণ, ৪,৪১৫,৪১৯ "গা"; ইহার মধ্যে পশ্চিম সাইবেরিয়ার ভিন্ন ২,৮৬৭, ১৫৩ "গা" (৬৫%), সেমিপ্যালাটিন্স্ক গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ৭১৬,০০০ "গা" (১৭·৬%), সেটাইসোভিয়ট গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ৩৩৮,২০০ "গা" (৭·৬%), সিরদরিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন শিমকেণ্ট এবং অলিয়েটিন্স্ক জেলার ভিন্ন ১৯৫,৮৯৩ "গা" (৪·৪%), মোটা কাজাকস্তানের ভিন্ন ১,৩১০,০৯৪ "গা" (২৯·৬%) এবং উত্তর কিরগিজিয়ার ভিন্ন ২০৮,১৭০ "গা" (৫·৩%)।

এই মোটা ভূভাগের গবাদি পশুর সংখ্যা ২৮,৮৮৩, ৪৮০। প্রদেশ হিসাবে পশুর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পশ্চিম সাইবেরিয়া	৬,৫৪১,২০০ (২২·৬%)।
সেমিপ্যালাটিন্স্ক গবর্ণমেণ্ট	৮,২৮২,০০০ (২৮·৭%)।
সেটাই সোভিয়ট "	৫,১২১,৯০০ (১৭·৭%)।
শিমকেণ্ট জেলা "	১,৬২৮,৬০০ (৫·৭%)।
অলিয়েটিন্স্ক জেলা	৩,১২৩,৪০০ (১০·৯%)।
কাজাকস্তান গবর্ণমেণ্ট	১৮,১৫৫,৯০০ (৬৩·৭%)।
উত্তর কিরগিজিয়া	৪,১৮৬,৬৮০ (১৪·৪%)।

রেল পথটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে নিম্নলিখিতরূপ কৃষিজাত দ্রব্য এবং গবাদি পশু ইহার তাঁবে আসিবে :—

	শস্য	বড় বড় গবাদি পশু	ছোট ছোট পশু	মাখন পুড্	পশম চামড়া ইত্যাদি পুড্	ফল পুড্
পশ্চিম সাইবেরিয়া	৪৬	২০০,০০০	৩০০,০০০		১৫০,০০০	—
সেমিপ্যালাটিনস্ক গবর্ণমেণ্ট	১৮	২০০,০০০	৬০০,০০০	২০০,০০০	১[illegible]	—
ডেটাইসোভিস্ক্ গবর্ণমেণ্ট	৮	১০০,০০০	৫০০,০০০	১৫০,০০০	১[illegible]	৫০০,০০০
উত্তর কিরগিজিয়া	৪	৪০,০০০	৪০০,০০০	৮০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০
মোট	৭৬	৫৫০,০০০	১,৭৩০,০০০	৩,২০০,০০০	৭০০,০৬০	৫০০,০০০

১৯২৭ সনে মধ্য এশিয়াতে ২৮,৫০০,০০০ পুড্ মৈদা আমদানি হইয়াছিল ; কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ৬০,০০০,০০০ পুড্ মৈদা আমদানি হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্তমানে মধ্য এশিয়ায় আমদানি ময়দার মধ্যে ৪৮% সাইবেরিয়া, ৩৩% উত্তর ককেশিয়া, ১৭% ইউক্রেন্ এবং ১% টাম্বফেও রেলপথের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল যোগাইতেছে। তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়া রেলপথ নির্মিত হইলে উত্তর ককেশিয়া, এবং ইউক্রেণের ময়দা বিশেষ চালানি হইবে এবং কেবল সাইবেরিয়া হইতে মধ্য এশিয়ায় ময়দা আমদানি হইবে। যদি সাইবেরিয়া হইতে সরাসর মধ্য এশিয়ায় ময়দা আসিতে থাকে পুড্ প্রতি ২০ কোপেক যাতায়াত খরচা কমিয়া যাইবে। সুতরাং কেবল যাতায়াত চার্জের খাতেই ১২,০০০,০০০ রুবল্ বাঁচিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া সোবিয়েটের বহির্বাণিজ্য, বাড়িয়া যাইবেই।

ময়দা ব্যবসার জাতীয়তা সম্পাদনের (ন্যাশানালিজেশান্) জন্য পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ১২টী এলিভেটার এবং ৭টি মিল খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলির প্রত্যেকটিতে এক একটি এলিভেটার নির্মিত হইবে :—সেমিপ্যালাটিনস্ক, সের্গিয়োপোল্, ট্যাণ্ডিকুর্গান, আম্বা-আটা এবং ফ্রাঞ্জে।

মাংসের ব্যবসায় এইরূপ চালিয়া সাজা দরকার। কাজাকস্তান, সেমিপ্যালাটিনস্ক, সের্গিয়োপোল্, আম্বা-আটা, কিরগিজিয়া, ফ্রাঞ্জে এবং টকম্যাকে রিফ্রিজিরেটরসমূহ (দ্রব্য শীতল রাখিবার জন্য ঘরের আধার) নির্মাণ করিতে হইবে। পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এইগুলির সংখ্যার সাধন করিয়া কাটতি বাড়ান দরকার।

প্রস্তাবিত রেলপথের আশেপাশে, বার্নাউল, বিস্ক, সেমিপ্যালাটিন্স্ক, আম্বা-আটা, ট্যাণ্ডিকুর্গান্ এবং শিলিকে চামড়ার কারখানা আছে। কিরগিজিয়ায় প্রায় ৫০টি ট্যানারি আছে। সেমিপ্যালাটিনস্কে বৎসরে যাহাতে ১০০,০০০ বড় বড় পাকা চামড়া উৎপন্ন হয় এইরূপ ধরণের অতিরিক্ত ট্যানারির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফ্রাঞ্জেতে একটী ট্যানারি স্থাপন করা দরকার, এই ট্যানারিতে ১৭০,০০০ বড় চামড়া প্রস্তুত হইবে।

পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং সেমিপ্যালাটিন্স্ক প্রদেশ মাখন শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই দুই প্রদেশে অনেক বড় বড় মাখনের ফ্যাক্টরিও আছে। ম্যালোভড্লি, ডেটাইসোভিস্ক, ফ্রাঞ্জে, কারাকোল, স্লাভগোরোড এবং রুটস্কতে নূতন নূতন মাখনের ফ্যাক্টরি তৈরী করিতে হইবে।

এই অঞ্চলের বন এবং খনি শিল্প, সিমেণ্ট, কেমিক্যাল, মৎস্য এবং চিনিশিল্পও চালিয়া সাজান দরকার। এই সমস্ত শিল্প এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পের মধ্যে গণ্য। এইগুলির উৎপাদন যাহাতে বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মাংস এবং ফলের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ।

বর্তমানে এই অঞ্চলে সিমেণ্ট অনেক দূর হইতে আনয়ন করা হইতেছে। এজন্য ভাড়া তো বেশী বহন করিতেই হয় উপরন্তু ইহা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং এতদঞ্চলে সিমেণ্টের কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে শুবিস্ক সহরে যে কারখানাটী আছে উহাতে বৎসরে ১০০,০০০ পুড্ সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। কারখানাটির অসুবিধা এই যে, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংস্থানের কোন

ধরা বাঁধা উপায় নাই : রেলওয়ে হইতেও স্থানটির দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার ; সুতরাং অসুবিধা যথেষ্ট।

তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথটির নির্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে বলখাস হ্রদের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের খনি শিল্পের বিশেষ সুবিধা হইবে। বলখাস হ্রদে জাহাজ-পথ খুলিলে সুবিধা আরও বাড়িয়া যাইবে। শুল শাড্‌স্ক এবং কীল-এস্প্‌, টিন, এবং সীসা রূপায় খনিতে পরিপূর্ণ। সস্তায় কয়লা সরবরাহ করিবার সুবিধাও হইবে। তুর্কীস্থান সাইবেরিয়ান রেলপথে যে অস্থায়ী ট্রাফিক্ খোলা হইয়াছে মাত্র তাহার কল্যাণেই আক্‌ডালুকের স্বর্ণখনিসমূহের বিস্তার সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। সাইবেরিয়ার টোবলস্ক্ নগরে একটী বিরাট মেটালর্জিক্যাল ওয়ার্কস্ স্থাপিত হইতেছে। উহার বাৎসরিক উৎপাদনের হার দাঁড়াইবে ৬৬০,০০০ টন ; সুতরাং লোহার জন্য আর আলোচ্য অঞ্চলকে ভাবিতে হইবে না। প্রস্তাবিত রেলপথের আশেপাশে কয়লাও আছে বিস্তর ; সুতরাং এই অঞ্চলের খনিশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। বড় বড় কয়লা ডিপজিটসমূহের মধ্যে একিবাস্ টুবিন্সের ডিপজিটে প্রায় ৬ কোটী টন, কারাগাডিন্স্ক ডিপজিটে ৩০ কোটী টন এবং কুলডিন্স্কে প্রায় ১৬ কোটী টন কয়লা মৌজুত আছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক কয়লার ডিপোজিট আছে। বর্ত্তমানে মাত্র কুজ্‌নেট্স্ক অঞ্চলের খনিগুলি হইতে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে।

কাষ্ঠ-শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্যও এই রেলপথটীর পরিকল্পনা। সোবিয়েট রুশিয়া মধ্য এশিয়ায় কার্পাস তুলা উৎপন্ন করিতে চায়। এইজন্য কাঠের ঘরদুয়ার নির্ম্মাণের দরকার। রেলপথটী নির্ম্মিত হইলে এশিয়ায় সস্তায় কাষ্ঠ সরবরাহ করা চলিবে। কারণ কাঠের রেলভাড়া প্রায় ৪০% কমিয়া যাইবে।

রেলপথটী বলখাস হ্রদের নিকটবর্ত্তী হইলে মৎস্য ধরার ব্যবসাটীও খুব বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ইয়াটিশ্, নদী, বেসান্ আলাকুল, সিংকুল হ্রদ সমূহে যে মাছ ধরা হয় তাহা কেবল দেশের মধ্যে বিক্রী হয়। বলখাস হ্রদে যদি ব্যাপকভাবে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে কি পরিমাণ মাছ রপ্তানি করা যাইবে। বলখাস অঞ্চলে মাছ ধরার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য অধ্যাপক বার্গ ইতিপূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছেন।

স্থানীয় শিল্পগুলির বিস্তার-সাধনের জন্য গোটা অঞ্চলটীর ইলেক্‌ট্রিফিকেশান সম্পর্কে এখনও তত্দূর মাথা ঘামান হয় নাই। এ পর্য্যন্ত মাত্র একটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক ষ্টেশনের মোতাবিষা স্থির হইয়াছে। ষ্টেশনটি উবিন্স্ক্ নামক স্থানে স্থাপিত হইবে এবং ইহা হইতে শক্তি-সরবরাহ হইবে ৭০,০০০ কিলোওয়াট্। এই ষ্টেশনটী হইতে যতদূর পর্য্যন্ত শক্তি সরবরাহ করা চলিবে ; এমন কি, উহা সেমিপালাটিন্স্ক পর্য্যন্ত করা সম্ভব হইবে। এর জন্য প্রতি কিলোওয়াটে খরচ পড়িবে ১·৫৯ কোপেক। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা প্রধানতঃ কেমিক্যাল এবং মাইনিং শিল্প চালান হইবে। গোটা অঞ্চলের শক্তি-সম্পদ্ কম পক্ষে ১,২০০,০০০ অশ্বশক্তি ধরা হইয়াছে।

তুর্কীস্থান সাইবেরিয়ান রেল সড়ক নির্ম্মিত হইবার পর সোবিয়েট গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে আরও নানা অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা-বিধানের সমস্যা উপস্থিত হইবে। সুতরাং আরও নূতন নূতন রেলসড়ক সোবিয়েট গবর্ণমেণ্টকে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কতকগুলি রেল সড়ক সম্বন্ধে আলোচনাও চলিতেছে। যথা :—কুলুণ্ডা-সেমিপালাটিন্স্ক ; ডিভাক্-ফটস্ক ; আটবাসার-সেমিপালাটিন্স্ক কিংবা সেমি-রোপোল্ ; সেমিরোপোল্-তুরটচাক, আম্মা আটা-কুলজা ; ফ্রাঞ্জে-টোকমাক্-মাইবালি, ইত্যাদি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

গত ৮ই মে শুক্রবার বোলপুর শান্তিনিকেতনের আম্র-কুঞ্জের ছায়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুমনীষিগণের সমক্ষে, ছাত্র শিষ্য ও বন্ধুজনের সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমের বালক বালিকাগণ মিলিতকণ্ঠে বেদগান করেন এবং কবিকে কুঙ্কুম চন্দনে ও সমুচিত বেশভূষায় সজ্জিত করেন। চীনদেশীয় একজন চিত্রশিল্পী তাঁহাকে একখানি স্বহস্তাঙ্কিত ছবি উপহার দেন। প্যারিসের অধ্যাপক লুসাক, সিলভান লেভি, গ্রেসের ডাঃ কেন্‌সী, টিয়েনসিন্ (চীন) এর চীন্ সম্প্রদায় এবং জাতি সঙ্ঘের প্রমিক বিভাগের কতিপয় সদস্য দীর্ঘ জীবন কামনা ও শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সমাগত বন্ধুজনকে ধন্যবাদ জানাইয়া অন্তরের গভীর ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার কথায় সকলের হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত ও আধুনিক একটী কবিতা পাঠ করেন।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

সভ্যতার দান

আধুনিক যুগের সভ্যতার ভিত্তি পরস্পরাপেক্ষ সামাজিক এবং অর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই সভ্যতা বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সংহতির নবীন আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। যে সব জাতি পরস্পরের সংস্রব বর্জ্জন করিয়া আদিম জাতিসুলভ মনোবৃত্তির সহিত বিরোধমূলক আত্মরক্ষার ভাব লইয়া থাকিতে চায়, তাহারা আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মূল নীতিকে ব্যাহত করিয়া নিজেরাও দুর্গতিগ্রস্ত হইবে, অপরেরও দুঃখকষ্টের কারণ সৃষ্টি করিবে। মানবসমাজকে যুগধর্ম্মের অনুযায়ী নিজকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে এবং অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণের জন্য বর্ত্তমানে আমাদের যে দুঃখকষ্ট দেখা দিয়াছে, তাহাতে উৎসমুখের সাধন হইতে পারে সেজন্য পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সহযোগিতার প্রচেষ্টা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রথম ফল এই হইয়াছে যে, সুগঠিত যান্ত্রিকশক্তি এবং বৈজ্ঞানিক যানবাহনাদির সাহায্যে প্রবলতর জাতিসমূহের পক্ষে দুর্ব্বলকে শোষণ করিবার সুযোগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শক্তিমান জাতিসমূহের লোভোৎপাদন করিয়া দুর্ব্বলতর জাতিনিচয় সমগ্র মানব সমাজের আতঙ্কস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে ঐ সব দুর্ব্বল জাতিগুলিকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার অনিষ্টকর মনোবৃত্তি গঠন করিতে হইতেছে। এবং ঐ মনোবৃত্তি জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কুটিলতর বিরোধের ভাব তীব্র করিয়া তুলিতেছে। যাহা হউক বিদ্যমান সমাজের এই সব অব্যবস্থা এবং পরস্পরের মধ্যে এই সব সন্দেহ সংশয়ের ভাব ক্ষণিক। মানব জগতে নবীন মৈত্রী সর্ব্বত্র যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে। ভারতের ত্রাণনিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমানে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ভারত নিশ্চয়ই ঐ সভ্যতে উপেক্ষা করিবে না, জগতের স্বাধীনতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকিবে এবং তাহাতে জগতের বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের কল্যাণই সংসাধিত হইবে এবং বিভিন্ন জাতি ও

রাষ্ট্র তাহাদের সত্যের পূর্ণাভিব্যক্তির সুযোগ লাভ করিবে।

বাণীতে বিশ্বাস নাই

কবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে সংবাদপত্রের দুইজন প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেশবাসীর জন্য তাঁহার নিকট একটি বাণী চাহেন। তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—আমি যেখানেই গিয়াছি, লোকে আমাকে বাণী প্রদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু সকলকে আমি একই জবাব দিয়াছি। বাণী প্রদানে আমার বিশ্বাস নাই, উহা প্রদান করিবার কোন যোগ্যতা কিংবা অধিকারও আমার নাই। যদি কেহ আমাকে কোন বিশেষ প্রশ্ন করেন, আমি তৎসম্বন্ধে আমার নিজের মত প্রদান করিতে পারি; কিন্তু বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে, এমন কোন মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা নির্দিষ্ট কোন একটি সমস্যার কথা না বলিয়া বিশ্বজনীন সমস্যার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আমার ক্ষমতার অতীত। এজন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই। বড় বড় লোকেরা কতজনে কত বাণী দিয়াছেন, কিন্তু লোকে তাঁহাদের কয়টি বাণী মানিয়া চলিয়া থাকে? তাহা ছাড়া আমি বহু দিন হইতে বিতর্ক জীবন যাপন করিতেছি; জগতে থাকিয়া জগতের জন্য সকলকেই কাজ করিতে হয়, আমাকেও সেইরূপ কাজ করিতে হয় বটে, কিন্তু আমার মন প্রকৃত পক্ষে রহিয়াছে অন্য দিকে অর্থাৎ আদর্শ এবং কল্পনা-রাজ্যে।

আবেগ নহে—কাজ চাই

কবি বলেন, রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। বড় বড় রাজনীতিক প্রশ্নের সমাধান করাও আমার কর্তব্য নহে। আমি শুধু ইহাই জানি যে, আমি একজন ভারতবাসী, সেই হিসাবে ভারতমাতার প্রতি ভাবপ্রবণতাপূর্ণ অর্ঘ্য সাজাইলেই আমার কর্তব্য শেষ হয় না। আমার দেশবাসিগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার যথাশক্তি চেষ্টা করাই কর্তব্য। আপনি ইহাকে বাণী বলিতে চাহেন, কিন্তু আমি বাণী কথাটিকে ঘৃণা করি। আমার দেশবাসীর প্রতি আমার বাণী এই—ভাবোচ্ছ্বাসে তোমাদের সকল শক্তি নষ্ট হইতে দিও না, তাহাকে কার্যে পরিণত কর। 'বন্দেমাতরম্' যথেষ্ট হইয়াছে এখন 'বন্দেমাতরমে'র স্থানে 'বন্দেভ্রাতরম্' হউক। জাতীয় পতাকা উড়াইয়া কিংবা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা চরকায় কাটিয়া তোমরা স্বরাজ পাইবে না, জনসাধারণের জন্য গঠনমূলক কার্যের দ্বারা এবং তোমাদের দেশবাসীকে কার্যতঃ সেবা করিয়াই তুমি উহা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে।

হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন

হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন সম্বন্ধে কবি বলেন, যতদিন পর্যন্ত হিন্দু কিংবা মুসলমানের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায় দীর্ঘ ভ্রাতৃবিরোধী সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত হইয়া না পড়িবে, কিংবা শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমি ঐ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোন লক্ষণ দেখি না। শ্রীযুক্ত গান্ধী হিন্দুদিগকে মুসলমানদের নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তিনি উহা সমর্থন করেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া কবি প্রথমতঃ কিছুকাল ইতস্ততঃ করেন, পরে অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যদি আন্তরিকতাবে কোন জিনিষ অন্যায় বলিয়াই বুঝা যায় আপোষ মীমাংসার খাতিরে তাহা মানিয়া লওয়াতে স্থায়ী শান্তি ঘটিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। ব্যক্তির অথবা সম্প্রদায়ের অসঙ্গত দাবী মানিয়া লওয়া কিংবা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অনুচিত সুবিধা দান করা আমি সমভাবেই রাজনীতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। উহাতে শুধু ক্ষুধাই পাইবে এবং আরও অধিক পাইবার জন্য দাবী বাড়িবে। শেষটাতে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের অবস্থার একটুও পরিবর্তন ঘটে নাই, অথবা উহা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি করিয়া একটা ভুল করা হইয়াছিল। ঐরূপ ভাবে আড়াআড়ি পাড়ি দিয়া কোন ফল লাভ করা যায় না।

ভাবী শাসন-সংস্কার

ক্রমেই বিলম্ব হইয়া পড়িতেছিল, কবির অন্যান্য দর্শকদের সঙ্গে দেখা করা দরকার ছিল। তাঁহার নিকট দাবি করিয়া শাসন সংস্কারের যে সুবিধা প্রদান করিয়াছেন এবং ইংরেজেরা শাসনতন্ত্রে তাঁহাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য যে সব রক্ষাকবচ দাবী করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মৃদুহাস্য করিয়া কবি বলেন—না, ঐ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারিব না, আমি কোন সংবাদপত্র পাঠ করি না। কিন্তু সময় সময় আমার যুবক বন্ধুগণ প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন এবং বাধ্য হইয়া আমাকে ঐগুলির সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিতে হয়। আপনি যে কমিটির কথা বলিলেন, সেই কমিটির রিপোর্ট দুরদৃষ্টবশতঃ পাঠ করিবার সময় আমি পাই নাই। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনাটি আমি ঠিক বলিয়াই মনে করি। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের বাস্তবিক কোন সুদৃঢ় বন্ধনের অভাবে ঐ যুক্তরাষ্ট্রের গাঁথনি অত্যন্ত শিথিল হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র গবর্ণমেণ্টের হাতে খুব কম প্রয়োজনীয় অধিকারই থাকিবে, এবং ভারতীয় সমস্ত রাজ্যসমূহের প্রজাগণও বৃটিশ প্রজাদের সহিত একই মৌলিক অধিকারের অধিকারী হইবে।

ইংরেজদের নির্দ্দেশিত রক্ষাকবচগুলি স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি তাঁহার দেশবাসীকে নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন, আমি বিস্তৃতভাবে ঐ বিষয়টির অনুধাবন করি নাই। কিন্তু আমার মনে হয় সাধারণতঃ ইংরেজদের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই ঐ সব রক্ষাকবচ পরিকল্পিত হইয়াছে।

৮ই মে তারিখে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানেও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এবং ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) তারিখে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট গৃহে এক বিরাট সভা আহূত হয়, উক্তেন্দ্র সপ্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করা হইবে ও কিরূপ আনুষঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা হইবে তাহা বিচার করা। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ও উহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

১। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এই সভা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

২। এই সভার মতে, কবিবরের সমগ্র দেশবাসীর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্যে, তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

৩। প্রস্তাবিত সম্বর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসবাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক। প্রয়োজন হইলে উক্ত কমিটি তাঁহাদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

বঙ্গীয় নারী-সম্মিলন

সম্প্রতি কলিকাতার টাউন হলে নিখিল বঙ্গনারী মহাসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে মহিলাগণের মধ্যে যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। শত শত স্বেচ্ছাসেবিকা লাল খাদ্দী রংয়ের বস্ত্রে ভূষিত হইয়া প্রতিনিধিগণকে সম্মিলনের দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করে। সম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হলটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য ও প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে প্রবেশদ্বারে মাল্য চন্দনে ভূষিত করা হয়। হলের চতুর্দ্দিকে নানা রূপ ফটো রক্ষিত হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে ছয়টার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সহকারে সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সম্মিলনের নির্ব্বাচিতা সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিতা করেন। তৎপরে সম্মিলনের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শান্তিদাস সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া বেদব ঘোষি-

প্রাপ্ত বা পত্র আসিয়াছে তাহা পাঠ করেন। এই সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্তা স্বর্ণ কুমারী দেবী, সরোজিনী নাইডু, বেগম আলম, সুনীতি মিত্র, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতি। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় তিনশত প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগদান করেন। ঐদিন প্রাতে টাউন হলের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। পতাকা উত্তোলন কালে সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বলেন—

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তাঁহার প্রাচীন গৌরব ও মহিমার এবং পৃথিবীর স্বাধীন জাতিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ৩০ কোটি ভারতবাসী আজ দৃঢ় সংকল্পের মূর্ত্ত প্রতীক। আজ আমি এই পতাকা উত্তোলন করিতেছি; উন্মুক্ত আকাশতলে এই পতাকা সমগ্র বিশ্বের নিকট ঘোষণা করুক যে বাঙ্গালার নারীর দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে এই পতাকা অবনমিত হইবে না।

এই উৎসব উপলক্ষে টাউনহল প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। শতাধিক বালিকা লোহিত বর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়া সামরিক ভঙ্গীতে টাউনহলের সোপানাবলীর উপর তাহাদের প্রধান অধিনায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের নেতৃত্বে দণ্ডায়মান ছিল। পতাকা উত্তোলিত হইলে পর স্বেচ্ছাসেবিকাগণ পতাকাতলে সমবেত হয় এবং পতাকা অভিবাদন করে। তখন সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে দণ্ডায়মান হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী দ্বিতীয় দিনেও সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নারী সমাগম পূর্ব্বদিনের অনুরূপ ছিল।

সভার প্রারম্ভে কুমারী শান্তি দাস মহাত্মাজীর নিম্নলিখিত বাণী পাঠ করেন—

"আমি আশা করি বাঙ্গালার নারীরা তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় দিবেন।"

এই সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে ৭টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

১ম—নির্য্যাতিতা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

২য়—বীরত্বপূর্ণ।

৩য়—বন্দীদের মুক্তির দাবী।

৪র্থ—নারীদের পুরুষদের তুল্য নির্ব্বাচন।

৫ম—স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের নিন্দা।

৬ষ্ঠ—রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সকল কর্ম্মক্ষেত্রে যাহাতে নারী তাহার যথার্থ স্থান অধিকার করিতে পারে সেই জন্য এই নারী সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, এই মহা সভা হইতেই একটি স্থায়ী নিখিল বঙ্গ নারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হউক। জাতীয় মহাসভার সহযোগে এই প্রতিষ্ঠানেও সকল জেলার প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কেন্দ্র সমিতি থাকিবে এবং প্রতি জেলায় ও গ্রামে তাহার শাখা থাকিবে। কেন্দ্র সমিতি হইতে সকল কার্য্যাবলী পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে বঙ্গীয় নারীদিগকে শিক্ষিত ও সংবদ্ধ করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু নারীর কল্যাণকর অন্য সকল কার্য্য সম্বন্ধেও এই প্রতিষ্ঠান পশ্চাৎপদ হইবে না।

প্রস্তাবিত উক্ত প্রতিষ্ঠান কি করিবে?

১। সেবিকাদল গঠন। এই দল সত্যাগ্রহ প্রচার ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, চরকা প্রচলন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

২। সন্ধি সর্ত্তানুসারে পিকেটিং প্রচলন।

৩। জাতীয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

৪। ব্যায়াম ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য ক্লাব বা আখড়া স্থাপন।

৫। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম সমন্বয়।

এই নারী মহাসভায় সুচিন্তিত অভিমত এই যে, জাতির মধ্য হইতে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিতে হইলে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান প্রদান আবশ্যক এবং তাহা সম্ভব করিতে হইলে চাই—

১। অস্পৃশ্যতা নিবারণ। ২। জাতিভেদ দূরীকরণ। ৩। ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহে বাধা না দেওয়া। ৪। ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের

নরনারীর সহিত একত্র আহার। এই প্রস্তাব লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ হয়।

তৃতীয় দিনের অধিবেশন

শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় প্রস্তাব করেন যে, বহু বিবাহ প্রথা নিরোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, পর্দা ও পণ-প্রথা নিবারণ ও অবস্থা বুঝে নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া দরকার। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত সর্ত বাদ দেওয়া হউক। শ্রীযুতী তারা দেবী, রতন বেন, চারুশীলা দেবী প্রভৃতি এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন। আলোচনার পর ভোটাধিক্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপাদেবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে পর্দা আইন সমর্থন করা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান উত্তরাধিকার এবং সকল সমান সুযোগ ও অধিকার দাবী করা হয়। শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন ও শ্রীযুক্তা নির্ম্মলিনী সরকার, রতন বেন ইন্দুমতী গুহ ঠাকুরতা, যোগমায়া দেবী প্রভৃতি ইহা সমর্থন করেন। অতঃপর ইহা গৃহীত হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে অধিকসংখ্যক মহিলা সদস্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ভারতে প্রত্যেক নারীর অন্তরে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার দীপ-শিখা সমুজ্জ্বল রাখা কর্ত্তব্য, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার উত্থাপিত করেন। শ্রীযুক্তা শৈলবালা মল্লিক ইহা সমর্থন করিলে ইহা গৃহীত হয়। বাঙ্গালার দলাদলি মীমাংসা করিয়া একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য স্বয়ং সভানেত্রী একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। ইহাও গৃহীত হয়।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ১৯২৯ সনের সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সরকারী বিবরণে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯২০ সন হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের লোকসংখ্যা ক্রমেই অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য দেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় উহা সন্তোষজনক না হইলেও বাঙ্গালা দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। গত কয়েক বৎসরে বঙ্গদেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে কত জনের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে এবং কতজন বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

সন	হাজার করা জন্ম	হাজার করা মৃত্যু	হাজার করা বৃদ্ধি
১৯২২	২৭·৩	২৫·২	২·২
১৯২৩	২৯·২	২৫·৫	৩·৪
১৯২৪	২৯·৫	২৫·৯	৩·৬
১৯২৫	২৯·৬	২৪·৯	৪·৭
১৯২৬	২৭·৪	২৫·৭	২·৭
১৯২৭	২৭·৭	২৫·৬	২·১
১৯২৮	২৯·৬	২৫·৫	৪·১
১৯২৯	২৯·৩	২৩·৫	৫·৮

১৯১৯ সনে বাঙ্গালাদেশে জন্মের তুলনায় হাজার করা ৮·৭ জন, ১৯২০ সনে ২·৭ জন এবং ১৯২১ সনে ২·১ জন লোক কমিয়া গিয়াছিল। সেই তুলনায় ১৯২৯ সনে হাজার করা ৫·৮ জন করিয়া বৃদ্ধি খুবই সন্তোষজনক।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালা দেশের জন্ম-মৃত্যুর তারতম্য কি প্রকার তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। উহাতে ১৯২৯ সনের হিসাব দেওয়া হইয়াছে—

প্রদেশ	হাজার করা মৃত্যুর হার
বাঙ্গালা	২৩·৫
মাদ্রাজ	২৪·৩
বোম্বাই	৩০·৫৩
যুক্ত প্রদেশ	২৪·২৬
পাঞ্জাব	২৮·৭৫
মধ্যপ্রদেশ	৩৪·১৩
বিহার উড়িষ্যা	২৩·৯

উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৩০·৮২	৫৩·৬৬
ব্রহ্মদেশ	২৮·৪৩	২২·০৬
আসাম	৩২·৭৭	২০·১

বাঙ্গালা দেশের জন্মের হার এক ব্রহ্মদেশ ছাড়া ভারত বর্ষের সকল প্রদেশ হইতে কম এবং ব্রহ্মদেশ ও আসাম হইতে বাঙ্গালা দেশের মৃত্যুর হার কম। ১৯২৯ সনে হাজার করা মৃত্যুর তুলনায় পাঞ্জাবে ১৪·৭ জন, বাঙ্গালে ১২·৬ জন, আসামে ১১·৯ জন, যুক্ত প্রদেশে ১০·১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯·৮ জন, বিহার ও উড়িষ্যায় ৮·৭ জন, বোম্বাইয়ে ৭·৭ জন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৭·২ জন, বাঙ্গালায় ৫·৮ জন এবং ব্রহ্মদেশে ৪·৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বৃদ্ধির হার অপর প্রদেশের তুলনায় অনেক কম হইলেও গত ১০ বৎসরে বৃদ্ধির হার ক্রমেই উন্নত হইতেছে।

১৯২৯ সনে বাঙ্গালা দেশের মোট মৃত্যুর তুলনায় হাজার করা ৫·৮ জন বৃদ্ধি পাইলেও এই বৃদ্ধির হার সকল জেলাতে সমান হয় নাই। এমন কি, বাঙ্গালার ৭টী জেলাতে এই বৎসর যত লোক মরিয়াছে, তত লোকের জন্ম হয় নাই। নিম্নে কোন্ জেলাতে কি হারে মৃত্যু তুলনায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেওয়া হইল—

জেলা	১৯২৮
বীরভূম	৭·৯
মুর্শিদাবাদ	১২·৮
নোয়াখালী	৮·১
বরিশাল	৪·২
মেদিনীপুর	৯·০
বাঁকুড়া	
২৪পরগণা	
ত্রিপুরা	
চট্টগ্রাম	
বর্দ্ধমান	
ময়মনসিংহ	
জলপাইগুড়ি	
খুলনা	
রঙ্গপুর	
ঢাকা	৫·৯
হুগলী	
হাওড়া	১·৭
দার্জ্জিলিং	৫·১
মালদহ	৫·৮
রঙ্গপুর	৩·৭
ফরিদপুর	৩·৭

নিম্নলিখিত ৬টী জেলায় ১৯২৯ সনে জন্ম হইতে মৃত্যু-সংখ্যা বেশী হইয়াছে। নিম্নে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে জন্মের তুলনায় কোন্ জেলায় হাজারকরা কতগুলি লোক হ্রাস পাইয়াছে তাহা দেওয়া হইল—

জেলা	১৯২৮	১৯২৯
যশোহর	৭·০	৯·৮
কলিকাতা	১১·৩	৯·৫
রাজসাহী	১·৬	১·৪
পাবনা		০·৯
নদীয়া		০·৬
দিনাজপুর		০·৩

১৯২৯ সনে বাঙ্গালা দেশে মোট ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার ২৭টী শিশু জন্মগ্রহণ করে। উহার মধ্যে ৭ লক্ষ ১ হাজার ১৪৫টী বালক ও ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ১০০টী বালিকা ছিল। ১৯২৮ সনে ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৮০টী শিশু জন্মিয়াছিল।

১৯২৯ সনে বাঙ্গালা দেশে মোট ৫০৮৮৬টী মৃত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় যত শিশু জন্মে তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৪টী মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট হয়। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের মৃত শিশুর জন্মের হিসাব প্রদত্ত হইল—

সন	মৃত শিশুর জন্ম সংখ্যা	হাজার করা হার
১৯২৩	৬২০৭৫	৪·২৬
১৯২৪	৬৪১৫৯	৪·৪৭
১৯২৫	৬২২৮১	৪·৩৩
১৯২৬	৫৯৫৭১	৪·৪৬
১৯২৭	৫৮৫৭৯	৪·৩৫
১৯২৮	৫৬৪০০	৩·৯৪
১৯২৯	৫০৮৮৬	৩·৮২

মৃতবৎসার একটী প্রধান কারণ মাতৃ জাতির স্বাস্থ্যের অবনতি। গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া মৃত শিশুর জন্মের পরিমাণ কিছু কিছু কমিতেছে। উহা আনন্দের বিষয়।

১৯২৯ সনে বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন কারণে মোট ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৬৩ জন লোক মারা গিয়াছে। উহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৩৪ জন পুরুষ ও পাঁচ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪২৯ জন স্ত্রীলোক। ১৯২৮ সনের তুলনায় এই মৃত্যু-সংখ্যা ১৪৭৪২ কম। ১৯২৯ সনে ৫২৪৬০ জন পুরুষ ও ৪০১৯২ জন স্ত্রীলোক কম মারা গিয়াছে। ১৯১১ সনের পর হইতে বাঙ্গালাদেশে মৃত্যুর হার আর কখনও এত কম হয় নাই।

জন্মের ন্যায় মৃত্যুর হারও বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানে সমান নহে। বিভিন্ন বিভাগে মৃত্যুর হার ১৯২৯ সনে কিরূপ ছিল এবং ১৯২৮ সনের তুলনায় উহা কত হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

বিভাগ	১৯২৯ হাজার করা	১৯২৮ সনে হাজার করা
বর্দ্ধমান	২৩·০	২৫·৪
প্রেসিডেন্সী	২১·৫	২৩·১
রাজসাহী	২৩·৪	২৮·৬
ঢাকা	২০·৬	২৩·৬
চট্টগ্রাম	১৯·০	২২·৫

জেলা হিসাবেও মৃত্যুর হার অনেক বিভিন্ন হইয়াছে। রাজসাহী জেলাতে ১৯২৯ সনে মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ৩৩·১, কিন্তু ময়মনসিংহে এই হার ছিল ২২·৭ এবং ত্রিপুরায় ছিল ১৮·৬। তারপর অধিকাংশ জেলায় ১৯২৮ সনের তুলনায় মৃত্যুর হার কমিলেও নদীয়া, যশোহর, বাঁকুড়া, মালদহ, পাবনা ও খুলনা জেলাতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন সহরে ১৯২৯ সনে মোট ৭০৩৬১ লোক মারা গিয়াছে এবং পল্লীসমূহে মারা গিয়াছে ১০২০৯০২ জন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালায় সহর ও পল্লীতে মৃত্যুর হার প্রায় এক প্রকার। সহরে মৃত্যুর হার হাজার করা ২৩·৬ এবং পল্লীতে মৃত্যুর হার হাজার করা ২৩·৫। পল্লী-অঞ্চল জলাভাব, চিকিৎসার অভাব এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতির অত্যাচারের দিক্ দিয়া সহরেরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে সহরগুলির মধ্যে কলিকাতা সহরেই মৃত্যুর আধিক্য সব চেয়ে বেশী। এখানে ১৯২৯ সনে হাজার করা লোক মরিয়াছে ৩০·৬ জন, কলিকাতা সহর বাদ দিলে অন্যান্য সহরগুলিতে পল্লী অপেক্ষা মৃত্যুর হার অনেক কম হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে একটী ভয়াবহ বিবরণ পাওয়া গেল। উহা হইতেছে প্রসবের ৬ মাসের মধ্যে প্রসূতিদের মৃত্যু সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি। এই ব্যাপার দিন দিন কি প্রকার ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, তাহা নিম্নের তালিকায় দেখা যাইবে।

বৎসর	প্রসূতির মৃত্যুর সংখ্যা (প্রসবের ৬ মাসের মধ্যে)
১৯২৯	৯৭৭০
১৯২৮	৭২২৬
১৯২৭	৪৩৯৭
১৯২৬	৩৩২৮
১৯২৫	২৭৯০
১৯২৪	১৯৭২
১৯২৩	১১৮৫

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৯২৩ সনের পর হইতে প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিতেছে এবং ৭ বৎসরে উহা প্রায় ৯ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা জানি যে, বাঙ্গালায় যত প্রসূতি মারা যায়, তাহার খুব কম অংশই সরকারী বিবরণে ধরা পড়ে। তথাপি সরকারী বিবরণ অপর্য্যাপ্ত হইলেও প্রসূতির মৃত্যুর হার যে ক্রমেই ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহার কারণ কি তাহা অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করা উচিত।

পুরুষ ও নারীর মধ্যেও মৃত্যু-হারের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৯ সনে পুরুষের মধ্যে হাজার করা ২৩·৭ জন এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ২৩·৩ জন

মারা গিয়াছে। ১৯২৯ সনে নদীয়া ও মোরখোলি জেলা ছাড়া আর সকল জেলাতে নারী অপেক্ষা পুরুষ মরিয়াছে বেশী। রাজসাহীতে সব চেয়ে বেশী পুরুষ (হাজার করা ৩৪·২ জন) এবং কলিকাতাতে সব চেয়ে বেশী নারী (হাজার করা ৪৪·৬ জন) মারা গিয়াছে।

অক্ষম ও অসমর্থ লোকের সাহায্য

নিতান্ত অক্ষম ও অসমর্থ লোকের সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি আছে। ইহার নাম ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটি। ভারতীয় গরীবদের সাহায্যের জন্য ঐ সমিতির একটী শাখা আছে।

সম্প্রতি জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই শাখা সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমাদের সমিতি কেবল সমাজের অতি দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরই সাহায্য করেন। একথা প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে। যাহারা এক সময়ে সম্পন্নশালী ছিলেন এবং ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন, কিংবা বিকলাঙ্গ হইয়া উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়াছেন, এমন ব্যক্তিদিগকেও এই সমিতি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। আমি তাই প্রত্যেক ধনীর নিকট আবেদন করি, এই সমিতিকে সাহায্য করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থিত করিয়া বলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে যাহাদের বাস, তাহাদের মধ্যে খৃষ্টান ব্যতিরেকে অপর দরিদ্রগণ এই শাখা সভার নিকট এত বেশী সংখ্যায় সাহায্য-প্রার্থী হইতেছে যে, সমিতি আর এখন সাহায্য দিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় সমিতির আয় বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

১৯৩০ সনে সমিতি ৮৬০০৶১১ পাই হাতে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। আলোচ্য বর্ষে সমিতির আয় হয় ৫৩১২৬৶০ আনা। তন্মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটী হইতে ৪৮৭৯৪৶০ আনা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা বাবদ ৫৩০২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিতভাবে এই টাকা ব্যয় হইয়াছে :—মাসিক সাহায্য ৪০২৮২, দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য—১১৪৫০, আকস্মিক কাজের জন্য সাহায্য—৮০৮৶৩ পাই, শীতের কাপড় দান—১০৪৮৶, অন্যান্য—৪১২১৷৶০ আনা, মোট ব্যয় ৫১,১০৫৬৶৩ পাই। হাতে আছে ১২,৬৭২৶৮ পাই। ১৯৩০ সনের শেষ দিনে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ৯৫৩ জনকে মাসিক ৪১৫০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এই টাকা দ্বারা মোটের উপর ৯৫৩ জন এবং তাহাদের পরিবারের ১০৪৭ জন মোট ২০০০ জন উপকৃত হইতেছে।

উপরোক্ত ৯৫৩ জনের মধ্যে বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকের সংখ্যা ৩৪০১ জন, অন্ধ ৫৮ জন, খঞ্জ ৫ জন, বধির দুইজন, পিতৃ-মাতৃহীন—৬ জন, উন্মাদ ৩ জন, দরিদ্র ছাত্র—৩৯ জন, এবং সহায়হীন বিধবা ৪৯০ জন।

সভাস্থলে শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ দাস ঘোষণা করেন, তিনি ৫০০০৲ টাকা দান করিবেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর বলেন যে, তিনি প্রতি বৎসর সমিতির হস্তে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিবেন।

অতঃপর ১৯৩১-৩২ সনের জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন :—

বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, মিঃ জে, এন, বসু, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত সীতানাথ পাল, শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ কুমার, রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র-মোহন ঠাকুর, শামসুল-উলেমা ডাঃ হেদায়েৎ হোসেন, রায় হরিনন্দর পাল, প্রভৃতি।

এই সমিতিকে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটী বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দুইভাগে বিভক্ত, একভাগ দরিদ্র খৃষ্টানদিগকে, অপর ভাগ দরিদ্র ভারতবাসীকে সাহায্য দান করে। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার উইলে লিখিয়া গিয়া-

ছিলেন যে, ঐ সোসাইটিকে ১ লক্ষ টাকা দান করিতে হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে আবদ্ধ হয়। তাঁহার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য উক্ত সোসাইটীকে ১ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। সে কালের অনেক বড় লোক ঐ সোসাইটীকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠপুর অবৈতনিক কৃষি শিল্প বিদ্যালয়

গত ১০ই বৈশাখ দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে (২৪ পরগণা) উক্ত বিদ্যালয়ের ৪র্থ বার্ষিক সভায় ছাত্রদের ক্রীড়া প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম এস এ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় অনেক মাননীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মহোদয় পুরস্কার বিতরণ করিবার পর কৃষি সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। পৃথিবীর আদিম কৃষিজীবী দেশ ভারতবর্ষ ও চীন হইতে আজকাল-কার আমেরিকা ও জাপান পর্য্যন্ত যত জাতি এবং দেশ ধনসম্পদে এবং সভ্যতায় উন্নত হইয়াছে কৃষিই যে তাহাদের উন্নতির মূলে একথা তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন। আমাদের দেশ যেরূপ দরিদ্র তাহাতে কলকব্জা-সহায় ব্যয়বহুল বিদেশীয় কৃষি-পদ্ধতি যে এখন অবলম্বিত হইতে পারে না, একথা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। তিনি সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং সঙ্ঘ দ্বারা একত্রে যৌথ কৃষির ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দেন। তিনি আশা করেন মাত্র সঙ্ঘ দ্বারাই আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি-সাধন হইবে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের এবং অভিজাত অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বহস্তে হল চালনা করিতে যে কোন বাধা নাই একথা তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলেন এবং প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, তিনি স্বহস্তে হল চালনা করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিজ পুত্রকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছেন।

সভান্তে সন্ধ্যায় প্রবর্ত্তীবিশিক্ষা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ছায়াচিত্রযোগে শ্রমিকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত ছাত্রদিগকে কৃষিশিল্প সম্বন্ধীয় হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিরক্ষরতা দূর করা এবং বিশেষভাবে তাহাদিগকে কার্য্যদক্ষ করিয়া পাঠদশায় বিদ্যালয় হইতে পারিশ্রমিক প্রদান দ্বারা খাওয়া পরা ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ব্যয়-কার্য্যে সারদর্শী হওয়ায় বর্ত্তমানে দুইটী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইতেছে।

মাত্র ভিক্ষা, চাঁদা ও সাময়িক সাহায্য সম্বল করিয়া বিদ্যালয়টী চারি বৎসর কাল চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান মাস হইতে ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড মাসিক দশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ এবং কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ বিশাল তাহাতে দেশের দানশীল মহাত্মাগণের সাহায্য না পাইলে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। আশা করি তাঁহাদের করুণা হইতে এই দরিদ্র বিদ্যালয় বঞ্চিত হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, সেক্রেটারী।

ঘরবাড়ী ও জমির দালাল

[কলিকাতা নগরে অনেক ভদ্রযুবক কমি ও বাড়ীর দালালি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই একটি মাত্র পেশাকেই জীবিকোপায় হিসাবে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন। এইরূপ দালালি ব্যবসায়ে নিযুক্ত এক জন যুবকের সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তার কোন কোন অংশের মর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল :—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—আপনি কি করেন ?

উঃ—ঘরবাড়ী ও জমির দালালি।

প্রঃ—তার মানে কি ? আপনি কি ঘরবাড়ী ও জমির কেনাবেচার সহায়তা করেন ?

উঃ—আজ্ঞে না। অনেক লোক ঘরবাড়ী বিশেষতঃ জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার চান। অনেক নয়, কখনো কখনো কয়েক লাখ টাকাও চাহিয়া থাকেন। ইঁহারা যেমন টাকা ধার চান, অন্যদিকে তেমনি এমন লোক আছেন যাঁরা জমি, ঘরবাড়ী বন্ধকস্বরূপ পাইলে টাকা ধার দিতে রাজী আছেন। এই উভয় প্রকার লোকের মধ্যে যোগাযোগটা স্থাপন করিয়া দেওয়াই আমাদের কাজ।

প্রঃ—কিন্তু সে কাজ তাঁরা নিজেরাও ত করিতে পারেন। আপনাদের সাহায্য কেন লন ?

উঃ—দালালেরা সর্ব্বদা ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে বলিয়া তাদের একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। তাছাড়া কেহ টাকা চাহিলেও যে তিনি চট্ করিয়া টাকা দিতে পারেন এমন লোককে পাকড়াও করিতে পারিবেন তা নয়। পরস্পর জানাশুনা থাকিলেও দুই দলের সাক্ষাৎভাবে কারবার চালানো—দর কষাকষি করা নানাকারণে উচিত বলিয়া মনে হয় না। তাঁরা দরদস্তুর ঠিক করিয়া দিবার ভারটা দালালের উপর ছাড়িয়া দেন।

প্রঃ—আচ্ছা, যোগাযোগটা কিরূপে স্থাপিত হয় ?

উঃ—প্রথম কথাবার্ত্তাটা দালালে দালালে হয়। ধরুন ক একজন জমিদার। তিনি তাঁর জমিদারির অংশ-বিশেষ বন্ধক রাখিয়া ৩ বা ৬ বৎসরের জন্য ২ লাখ টাকা ধার চান। আমি তাঁর দালাল। খ নামক আর একজন ধনী ব্যক্তি আছেন। তিনি এই প্রকারে টাকা খাটাইয়া থাকেন এবং এই টাকা দিতে পারেন। তখন আমি খুঁজিতে থাকিব তাঁর দালাল কে ? বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষেরই দালাল একাধিক ব্যক্তি হইতে পারেন। যা হোক্, তখন কথাবার্ত্তাটা দালালে দালালে চলিতে থাকে, কোন পক্ষের দালালই অপর পক্ষের নাম ঠিকানা জানিতে পারেন না বা পরিচিত হইবার জন্য নীত হন না যতক্ষণ না দালালেরা নিজ নিজ ব্যক্তির নিকট বিস্তর হাঁটাহাঁটি করিয়া একটা দরদস্তুর ঠিক করিয়া ফেলেন। দরদস্তুর ঠিক হইয়া গেলে তখন যিনি ধার লইবেন তিনি আমাকে কিংবা আমার সহিত আরো যাঁ জনকে একটা হুকুমনামা এই বলিয়া লিখিয়া দিবেন যে, 'হাঁ, আমি অমুকের সাহায্যে এতটা ধন অত সুদে গ্রহণ করিতে রাজী আছি'। তখন অপর পক্ষ হইতে পাল্টা জবাব আসে যে তাঁরাও রাজী। তখন তাঁদের সঙ্গে

দেখা সাক্ষাৎও করা যাইতে পারে। এই পর্য্যন্ত হইল আদালতের কার্য্য। তারপর দুইপক্ষ নিজেরা বোঝাপড়া করিয়া চুক্তি ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

প্রঃ—আপনি বলিলেন, পক্ষের নাম আগে জানানো হয় না। তাঁর বিষয়ের কথাও জানানো হয় না কি?

উঃ—বিষয় লইয়াই ত কথা। তাঁর জমিদারি, ঘরবাড়ীর সঠিক আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়াই ত আমার কর্ত্তব্য। ঐ সকল তথ্য আমি যোগাইতে বাধ্য।

প্রঃ—কি কি তথ্য আপনাকে যোগাইতে হয়?

উঃ—প্রথমতঃ জানাইতে হইবে যে, জমির উপর অন্য কোন দায় আছে কি না অর্থাৎ জমি পূর্ব্বতন কোন ঋণে আবদ্ধ কি না। তারপর আমাকে দেখাইতে হইবে খাজানা ও সেস্ বাবদ্ কত আদায় হইয়াছে, আর খাজানা ও সেস্ বাবদ্ কত দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি বাদ দিয়া যা থাকে তা থেকে আবার ১০% বাদ দিতে হইবে জমিদারি চালানোর খরচা। এরপর যা থাকে তাই হইল নিট্ লাভ। এই নিট্ লাভের বহর দেখিয়াই টাকা ধার দেওয়া নেওয়ার কারবার চলে। কলিকাতার—মফঃস্বলেরও বটে—ঋণদাতারা সর্ব্বদাই চান যে যাঁরা ঋণ গ্রহণ করিবেন তাঁদের কিছু না কিছু জমি কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে থাকে। কারণ ভবিষ্যতে যদি মোকদ্দমা করিতে হয়, তবে কলিকাতায় জমি থাকিলে ঋণদাতার পক্ষে সুবিধা হয়।

প্রঃ—নিট্ লাভ দেখিয়া টাকা ধার দেওয়ার অর্থ কি?

উঃ—ইহার অর্থ এই যে, জমির যা আয় দাঁড়ায় তারস্বরূপ তার নির্দ্দিষ্ট গুণ টাকা দেওয়া হয়। যেমন পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ক দুই লাখ টাকা ধার চান। তিনি যে জমিদারি বন্ধক রাখিতে চান তাঁর বার্ষিক আয় যদি ৪০ হাজার টাকা হয়, তবে তাঁর পক্ষে ঐ জমি বন্ধক রাখিয়া ২ লাখ টাকা পাওয়া সহজ হইবে। কিন্তু তাঁর জমির আয় যদি ৩৫ হাজার টাকা হয়, তবে তিনি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পাইবেন, কিন্তু ২ লক্ষ টাকা পাইতে তাঁকে বেগ পাইতে হইবে।

প্রঃ—আপনারা এই আয়ের হিসাবটা কিরূপভাবে করেন? ধরুন, বর্ত্তমান বৎসর দুর্ব্বৎসর। এ বৎসর যে ভাবে আদায় হইবে তাহাকেই স্বাভাবিক বলিয়া ধরিলে ত অন্যায় করা হইবে।

উঃ—না, দুর্ব্বৎসরকে স্বাভাবিক ধরা হয় না। সেইজন্য দস্তুর হইতেছে বিগত তিন বৎসরের আয়ব্যয় দেখানো। তাতে জমিদারির স্বরূপ জানা যায়।

প্রঃ—তা হলে আপনারা বলিতে চান যে, যত টাকা কর্জ্জ চাই, বন্ধকী জমির আয় মোটামুটি তার ½ অংশ হইবে।

উঃ—দেখুন, একটা মজার কথা এই যে, যখন সুবৎসর থাকে তখন কখনো কখনো ½ অংশ হইলেও চলে, কিন্তু দুর্ব্বৎসরে চলে না। আর আজকাল ঐ ½ অংশই দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

প্রঃ—সুদের হার কিরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হয়?

উঃ—তাও সুবৎসর দুর্ব্বৎসরের উপর নির্ভর করে। গত বৎসরের কথা বলি। গত বৎসর বাজারের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা ছিল। অনেক জমিদারকেই ঋণ করিতে হইয়াছে। জমিদারির উন্নতি সাধন বা ঐরূপ কোন কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের প্রয়োজন হয় নাই, জমিদারি বাঁচাইবার জন্যই প্রয়োজন হইয়াছিল। অনেকে সরকারকে তৃতীয় কিস্তির খাজানা দিবার সময় হইতেই বিলক্ষণ টানাটানি অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর চতুর্থ কিস্তির সময়ের ত কথাই নাই। সরকারকে সূর্য্যাস্তের আগে খাজানা না দিলে জমিদারি নীলামে যাইবে এই আইনের ফলে ইঁহাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। চৈত্র মাসের আগে অর্থাৎ মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এই প্রকারের কর্জ্জের সুদেও অত্যন্ত তারতম্য ঘটিয়াছে। অন্যান্য বৎসর জমিদারি খুব ভাল হইলে ৭%এ টাকা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হইত না। ৭½% কে স্বাভাবিক হার বলা যাইতে পারিত। কিন্তু গত বৎসর পৌষের আগে ৮% বা ৮½%এ যাঁরা টাকা পাইয়াছিলেন তাঁরা ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। কারণ মাঘে

হইতে সুদের হার দাঁড়াইয়াছিল ৯%, ৯½%, ১০% এমন কি ১২%। কারণ টাকার দরকার ছিল অনেকের, কিন্তু বাজারে টাকার অভাব ছিল। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন সময় ও অবস্থা বিশেষে সুদের হারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

প্রঃ—সুদটা কি ভাবে দেওয়া হয়?

উঃ—কেহ ৬ মাসের, কেহ ১ বৎসরের কড়ার করেন।

প্রঃ—আচ্ছা, গত বৎসর না হয় দুর্ব্বৎসর বলিয়া টাকার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য বৎসরে কোন্ কোন্ কারণে টাকা ধার লওয়া হয়?

উঃ—সুবৎসরেও কেহ কেহ ঠিক সময়ে কিস্তির টাকা দিবার জন্য ঋণ করেন। তা ছাড়া শ্রাদ্ধ, বিবাহের জন্য ত ঋণ আছেই। কেহ কেহ ভাল জমিদারি কিনিবার জন্য বা নিজ জমিদারির উন্নতি-সাধন করিবার জন্যও টাকা ধার লন। মামলা মোকদ্দমা চালাইতেও কম টাকা ধার করা হয় না।

প্রঃ—এই প্রকার কার্য্য করিয়া দালালেরা কি পান? তাঁদের আয়টা কোথা হইতে হয়?

উঃ—যিনি কর্জ্জ গ্রহণ করেন তিনিই উভয় পক্ষের দালালদের একটা অংশ ধরিয়া দেন। আজ-কাল যত টাকা ধার লওয়া হয় তার ২% অথবা ১½% এর বেশী দালালদের কপালে বড় জোটে না। আগে ৩%ও কখনো কখনো জুটিত। এ ছাড়া ১% অথবা ১½% এটর্ণি খরচ অর্থাৎ উভয় পক্ষের পাকাপাকি কাজের জন্য কর্জ্জ-গ্রহীতাকে দিতে হয়। সুতরাং দুই লাখ টাকার ঋণের জোগাড় করিয়া দিতে পারিলে খোক ৪০০০৲ টাকা পাইবার সম্ভাবনা। উহাকে উভয় পক্ষের দালালের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলেই প্রত্যেকের উপার্জ্জনের পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

প্রঃ—তাহলে দালালের সংখ্যা কম হইলেই ভাল।

উঃ—তা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু আজকাল নানা কারণে প্রত্যেক পক্ষেই একাধিক দালাল থাকেন বলিয়া মাথাপিছু আয়টা কমিয়াছে।

প্রঃ—আপনারা বৎসরে যদি ৪।৫ টা কেসও পান, তবে বিনা পরিশ্রমে অনেক উপার্জ্জন করিয়া ফেলেন।

উঃ—৪।৫টা কেস্ পাইলে বৎসরে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থাকে না। কিন্তু পরিশ্রমের কথা কি বলিতেছেন! কিরূপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয় সে বিষয়ে আপনাদের কোন ধারণা নাই। তাছাড়া আমাদের দেশে দালালেরা এখনো সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন নহেন। নানাপ্রকার অপমানও অনেককে সহিতে হয়। কোন একটি পক্ষ জোগাড় করা সহজ নয়। তাছাড়া দালালে দালালে রেষারেষি ত আছেই। সুতরাং বৎসরে ৩।৪টি কেস্ পাওয়াও দুষ্কর। আর কেস্ পাইলেই যে শেষ পর্য্যন্ত তাহা ফাঁসিয়া যাইবে না, কেহ বলিতে পারে না। হয়ত দুই পক্ষের কথাবার্ত্তার ফলে দেখা গেল একপক্ষ সঠিক সংবাদ দেন নাই। সুতরাং তখনি সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে আগের থেকে যদি দালালকে কথা দেওয়া না থাকে যে, দালালের দোষ না থাকিলেও যদি লেনদেন বন্ধ হয় ত ১% বা ঐরূপ কিছু তাঁকে দেওয়া হইবে, তবে দালালের ভাগ্যে পরিশ্রমের ফলে কিছু না জুটিতেও পারে।

প্রঃ—আচ্ছা, দালালেরা সময় লইবার জন্য কোন কাজ অনেক দিন হাতে রাখিতে পারেন না কি?

উঃ—পারেন বৈ কি। মাসখানেক হয়ত তিনি হাতে রাখিয়া দিলেন, এই আশ্বাস দিয়া যে কাজটা তিনি করিয়া দিবেন। কিন্তু সেরূপ করা উচিত নয়। যেটা হইবার সেটা ৪।৭ দিনের কথাবার্ত্তাতেই হইয়া যায়।

প্রঃ—আপনি শুধু জমি ও জমিদারির কথাই বলিয়াছেন, ঘরবাড়ীর কথা বড় বলেন নাই। কেন?

উঃ—তার কারণ ঘরবাড়ী নিয়া বড় বেশী কারবার হয় না। জমিজমার সঙ্গে হয়ত ঘরবাড়ী থাকে। ঘরবাড়ীর আর সামান্য বলিয়াই ধরিতে হয়, স্থায়িভাবে বাড়ী ভাড়া বাবদ যা পাওয়া যায়। সে আর কত? টাকা ধারের জন্য জমি-বন্ধকই প্রশস্ত।

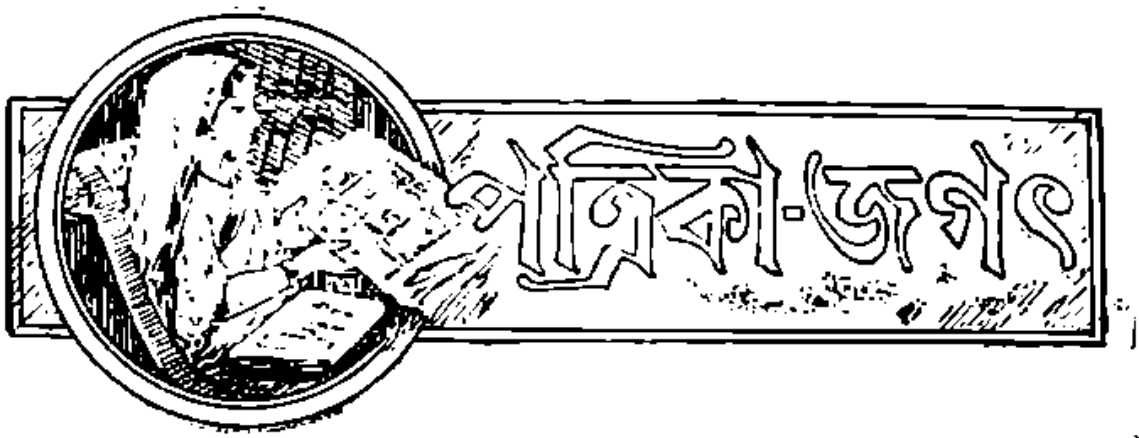

"ইণ্টারন্যাশানাল লেবার রিভিউ", মার্চ্চ ১৯৩১

উত্তর আমেরিকার আর্থিক ভাঁটা

(১) ক্যানাডা

সকল দেশেই বেকার-সমস্যাটা বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত বৎসর অক্টোবর মাসে ক্যানাডায় বেকার-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৭৫,০০০; ঐ বৎসরের নর্ম্মাণের তুলনায় উহা ১১৫,০০০ অধিক। এবারে যেরূপ দুর্বৎসর পড়িয়াছে তাহাতে ক্যানাডার মত বিপুল শিল্প-প্রধান দেশে এই সংখ্যাটাকে অল্প বলিয়াই ধরিতে হইবে। টোরোণ্টো, হ্যামিলটন, মণ্ট্রিল প্রভৃতি শিল্প-প্রধান স্থানেই এই দুর্যোগ বেশী হইয়াছিল, তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সমগ্র দেশের দুরবস্থা কম ছিল বলিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মনিযুক্তদের সূচীতে দেখা যায় যে—

অক্টোবর	১৯২৯	সূচী ১৮·৩
আর	,, ১৯৩০	,, ১৮·৬

অর্থাৎ কর্ম্ম-নিযুক্তদের সংখ্যা ২০% কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্যানাডায়—

অক্টোবর	১৯২৯	সূচী ১২৪·৬
আর	,, ১৯৩০	,, ১১২·৯

অর্থাৎ কর্ম্মনিযুক্তদের সংখ্যা ১০% কমিয়া গিয়াছে।

বেকার-সমস্যা লাঘব করিবার মানসে ডোমিনিয়ান সরকার রেলপথ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ২,৮০,০০,০০০ ডলার মঞ্জুর করেন। সরকার মনে করিয়াছিলেন যে, এই ভাবে কতকগুলি বেকার লোকের অন্নসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে শীত ঋতুর মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিল; যে সব ক্যানাডাবাসী যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন, তথায় দুর্যোগ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের অনেককেই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ১,০০০,০০০ জন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের চেষ্টায় যায়। তাহার অধিকাংশই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

বেকার হওয়ার ফলে বেকার বীমা সম্বন্ধে খুব বাদানুবাদ চলিতে থাকে। এ পর্য্যন্ত এই ধারণাই প্রবল ছিল, এরূপ বিশাল ও বিবিধ শিল্পের সুবিধাযুক্ত দেশে বেকার বীমার কথা উঠিতে পারে না। এখন কিন্তু অনেকেই বলিতেছেন যে, অনিচ্ছায় যাহাতে কাহাকেও বেকার-দলভুক্ত না হইতে হয় সেই জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করা সমাজ ও শিল্পের কর্ত্তব্য।

কৃষি

দুনিয়াব্যাপী আর্থিক ভাঁটা ক্যানাডার গম উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহকেও কাবু করিয়াছে। আলবার্টা, মনিটোবা ও সাস্‌কাট্‌চিউয়ান প্রদেশসমূহের ক্ষেত্রফল ৭৫৭,০০০ বর্গ মাইল। ইহা ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইতালি ও স্পেন, এই তিন দেশের ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশী। ১৯২৬ সনে লোকবল ছিল প্রায় ২১ লক্ষ। এই প্রদেশগুলির অনেক অংশই এখনো অনাবাদী ও অব্যবহৃত রহিয়াছে। দুনিয়ার গম-উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের মধ্যে এইগুলির স্থান শীর্ষদেশে। ১৯২৮ খৃঃ ক্যানাডায় ৭০,৭২০,০০০ কোয়ার্ট গম উৎপাদিত হয়—ইহার মধ্যে ৬৮,১২৫,০০০ কোয়ার্ট পাওয়া গিয়াছিল এই তিনটি প্রদেশ হইতে। ক্যানাডায় উৎপাদিত এই গমের মধ্যে ৫০,০০০,০০০ কোয়ার্ট রপ্তানি করা

হইতেছিল। গম রপ্তানি করা হয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানিতে; সুতরাং ক্যানাডার পশ্চিম অংশকে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কতখানি ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা বোঝা যাইতেছে। দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগের ফলে গমের দর উৎপাদন-খরচার নীচে নামিয়া যায়। ১৯২৯ সনের উৎপন্ন গমের অনেক পরিমাণ গোলায় জমিয়া আছে; ১৯৩০ সনের উৎপন্ন গম এখনো বিক্রয় করা যায় নাই; সুতরাং পশ্চিম ক্যানাডাবাসী কৃষিজীবীদিগের দুরবস্থা চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। ইয়োরোপে বহু নরনারীকে বেকার বসিয়া থাকিতে হইতেছে বলিয়া তাহাদের রুটী খরিদ করিবার পয়সা জুটিতেছে না। তাই ক্যানাডার চাষীদিগকে দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে। ক্যানাডার গমের গোলাগুলি গমের ভারে ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছে, অথচ এখন লোকে যেরূপ অন্নকষ্ট অনুভব করিতেছে বোধ হয় আর কখনো সেরূপ করে নাই।

আর এক কথা। কৃষিকর্ম্মে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মজুর-নিয়োগের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। "কম্বাইন" নামক যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে (এই যন্ত্রের সাহায্যে কাটা ঝাড়া এক সঙ্গেই হয়) অনেককে বেকার-শ্রেণীভুক্ত হইতে হইয়াছে; এই যন্ত্র চালাইতে মাত্র ২ জন লোক আবশ্যক হয় ও ৪০ একর জমি একদিনে চাষ করা চলে। যে কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্বে বসন্তকালে ৩০ জন ও শীত-কালে ১২০-১৫০ জন লোক খাটিত, এখন সেখানে সারা বছরে ১৪ জন লোক দিয়া কাজ চালান হয়। আর ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলিতে ৮।১০ জনের বদলে ২।৩ জন লোক খাটানো হয়। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক একটী "কম্বাইন" যন্ত্র অন্ততঃ ৫টী করিয়া লোককে বেকার পর্য্যায়ে ফেলে। এখন চাষবাসের কাজে লোকে ৫০।৬০ দিনের কাজ আশা করে না, গড়ে বৎসরে মাত্র ২০ দিনের কাজ পায়। তাহাতে এই হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যেখানে শস্য কাটার সময় সহস্র সহস্র লোক রেলপথে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্তে যাতায়াত করিত, এই গত ২ বৎসর ধরিয়া আর সেরূপভাবে রেলগাড়ী চলে না।

যন্ত্র ব্যবহারের আর একটী ফল লক্ষ্য করা যাইতেছে। যন্ত্রপাতিতে যে টাকাটা ব্যয় করা হয় তাহা আদায় করিয়া লইবার জন্য চাষের পরিধি বৃহত্তর করিতে হইতেছে। ফলে বৃহৎ বৃহৎ দল্ল পড়িয়া উঠিতেছে; এই সব দলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের টক্কর দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। রুশিয়ায় অল্প মজুরি দিয়া এইরূপ বৃহৎ দল্ল প্রতিষ্ঠান চাষের কাজ চালাইতেছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এবং রুশিয়াও যে ক্যানাডার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারে এ ভয় ছোট ছোট চাষীদিগের মনে আছে। এই সব কারণে চাষ-বাস উঠাইয়া দিবে কি না তাহা ঐ সব চাষী ভাবিয়া পাইতেছে না। আত্মরক্ষার চেষ্টায় কৃষক-গণের সমবায়মূলক বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদিগকে "পুল" বলা হয়; কিন্তু গমের দর অস্বাভাবিকভাবে পড়িয়া যাওয়াতে "হুইট পুল"কেও কাবু হইতে হইয়াছে।

বিদেশীর আগমন (ইমিগ্রেশন্)

দেশের এই দৈন্যের দিনে সাধারণতই বিদেশীর আগমন লোকে বিষনয়নে দেখে। বিদেশী মজুর দেশী মজুরের সহিত টক্কর দিয়া কম মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয় এবং তাহার ফলে মজুর-শ্রেণীর জীবনযাত্রার মাপকাঠি খাটো হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই বেকারের যুগে বিদেশী মজুরেরা শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। অধিকন্তু, কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মজুর-চাষিরা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া নবাগত বিদেশী মজুরগণের বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনাই অধিক। ফলে সকল রকম বিদেশী মজুর-অভিযানের পথ-রোধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ক্যানাডার এই নবীন নীতি গোড়াকার অনুসৃত নীতি হইতে বিভিন্ন; ক্যানাডাবাসী পূর্ব্বে বিদেশী শ্রমিক প্রভৃতিকে সাদরে আহ্বান করিতেন, এই মনে করিয়া যে, এই নবাগতের দল কৃষিক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিবে ও দেশজ পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করিবে। হয় ত ক্যানাডার এ অবস্থা অধিকদিন থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বের মত বিদেশী শ্রমিক আর আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(২) যুক্তরাষ্ট্র

দুনিয়াব্যাপী আর্থিক ভাঁটা মার্কিণবাসীদিগকেও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। এদেশের নির্ভুল বেকার-সংখ্যা দেওয়া দুরূহ। কেন না সেরূপ কোন তথ্য-তালিকা নাই। তবে বেকার-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার কোন অসুবিধা হইবে না। শ্রমিক বিভাগের (ডিপার্টমেণ্ট অব্ লেবার) কারখানা-কর্মীর সূচী দেখিয়া বোঝা যায় যে, কর্মীর সংখ্যা (এম্প্লয়েড্) গত বৎসরের তুলনায় ২০%এর চেয়েও নামিয়া গিয়াছে। ১৯১৪ সন হইতে এরূপ সূচী সংগ্রহ চলিতেছে; কিন্তু গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই সূচী যত নামিয়া গিয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে সেরূপ হইতে আর কখনো দেখা যায় নাই। শ্রমিক-তথ্য-সংগ্রহ বিউরো (বিউরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্) ১৩,৬১৩ কারখানাশিল্পের হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় (১) কর্ম্মে নিযুক্তদের সংখ্যা ১৯·৬% কমিয়া গিয়াছে, ও (২) মজুরি ২৮·৪% কম দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, পূরা সময় কাজ করানো হয় নাই। সেপ্টেম্বরের পর কর্ম্মীর সংখ্যা আরো কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকান্ ফেডারেশন অব্ লেবার বলেন যে, ডিসেম্বর মাসে সভ্যদিগের ২২% লোক বেকার হইয়া পড়ে এবং জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বেকার-সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস করেন। কোন কোন ব্যবসায় ও কোন কোন জেলায় বেকার-সংখ্যা আরো অধিক। যথা, নবেম্বর মাসে ৬০% কি ৭০% রাজমিস্ত্রী শিকাগো সহরে বেকার বসিয়াছিল। ঐ সহরে কোন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সাধারণতঃ ৩৮০০০ জন লোক কাজ করে। সেখানে মোটে ১৮,০০০ লোক রাখা হয়। উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি দিলেও বেকার-সংখ্যার গুরুত্ব বোঝা যাইবে। ফেডারেল কার্ম বোর্ডের নবেম্বরের বুলেটিনে উৎপাদন-হ্রাসের একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া হইল (১৯২৬-১৯২৫ গড়=১০০) :—

শিল্প	জুলাই	সেপ্টেম্বর
	১৯২৯	১৯৩০
লৌহ	১৪২	৮৬
বয়ন শিল্প	১১৮	৮৮
মোটর গাড়ী	১৪২	৬৮
জুতা বুট	১২০	১৮
চামড়ার দ্রব্য	১১৪	
রবার টায়ার ও টিউব	১৭১	৮৪
কাচ	১৬৪	৮৫
সিমেণ্ট	১১৮	১১১

বড় বড় সহরগুলির দিকে তাকাইলেও ঐ একই কথা দেখিবে। নিউইয়র্ক সহরের জনবল ৬,৯৮১,৯২৭; ফেডারেল ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ানের হিসাবে বেকার-সংখ্যা ৩০০,০০০; সেবার অর্গ্যানাইজেশনের মতে ৭০০,০০০ হইতে ৮০০,০০০র মধ্যে, আর নিউইয়র্ক ডুনিয়ার বোর্ড অব্ ট্রেড্ অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্টেশনের মতে ৬০০,০০০ (নবেম্বরের শেষে)।

সরকারী শ্রমিক বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কোহেন বলেন যে, ইলিনয় প্রদেশে ৪০০,০০০ জন বেকার। ইহার অধিকাংশই শিকাগো সহরে। শিকাগোর জন-সংখ্যা ৩,৩৭৫,৩২৯ আর বেকার-সংখ্যা ২৪০,০০০। ডেট্রয়টু সহরে (জন-সংখ্যা ১,৫৭৩,৯৮৫) ১লা ডিসেম্বর ৯০,০০০ জন বেকার দেখা যায়। ফিলাডেল্ফিয়ার (জন-সংখ্যা ১,৯৬৪,৪০০) ১৫০,০০০ জন বেকার আছে বলিয়া প্রকাশ। প্রত্যেক সহরেই এই রকম বহুসংখ্যক বেকার পাওয়া যাইবে।

কর্পেন উড্স যে সরকারী হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে। অর্থাৎ বোঝা যাইতেছে যে, মার্কিণ দেশেও বেকার বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

প্রতিবিধানের কথা

বেকার-সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

স্বাভাবিক অবস্থায় দান-ভাণ্ডারগুলি হইতে যে সাহায্য করা হয়, তাহাতে বেকারের রুক্ষ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না বলিলেই চলে। এবারের এই দারুণ সঙ্কটের সময়, ষ্টেট ও মিউনিসিপ্যালিটী অন্ন-বস্ত্র বিতরণের জন্য বহু টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের দানও বড় কম নহে। নিউ-ইয়র্ক সহরে ৮,০০০,০০০ ডলার ও শিকাগো সহরে ৪,০০০,০০০ ডলার দান-ভাণ্ডারে চাঁদা তুলিয়া জমা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বেকার-বীমা বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় জন্য বড় বড় সহরগুলিতে চারিদিক্ হইতে কর্ম্মহীন বহু লোক কর্ম্মের আশায় আগমন করিয়া বেকার-সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। এই যে সাহায্য-ব্যবস্থার কথা বলা হইল, সেরূপ সাহায্য সাধারণতঃ এরূপ লোককে দেওয়া হয় যাহার দৈন্য চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং তাহাকেও নেহাৎ অভাব (বেয়ার-নেসেসারিজ) মেটানোর জন্যই দেওয়া হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিউইয়র্ক সহরের বেকারদিগের মধ্যে ২০%এর দৈন্য চরমে ঠেকিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য মাসে অন্ততঃ ২,০০০,০০০ ডলার দরকার। অধিকন্তু শীত আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চরম দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

জেলাগুলির অবস্থাও ভাল নহে। বৃষ্টির অভাব ও পশুর মড়ক-পতনের ফলে কৃষিজীবীদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য রেডক্রস্ সোসাইটী ৪,০০০,০০০ ডলার তুলিয়াছেন; কৃষি-বিভাগও বীজ এবং জীবজন্তুর আহার্য্য বণ্টন করিতে সাহায্য করিতেছেন। সাধারণের উপকারজনক অনুষ্ঠানাদিতে বহুৎ টাকা চাঁদা হইতেছে। বেকারদিগকে কর্ম্ম দিবার জন্য ফেডারেল ষ্টেট ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি গৃহ-নির্ম্মাণ, রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি সাধারণের সুখ-সুবিধা-সাধক কর্ম্মগুলির পরিসর বাড়াইয়া দিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশগুলিতেও এইরূপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর রেলপথ ও অন্যান্য সাধারণের উপকারজনক প্রতিষ্ঠানে ৭০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মোট কথা দরিদ্রদের সাহায্যকল্পে ও কাজ দিবার উদ্দেশ্যে সমাজের টাকা অপর্য্যাপ্তভাবে ব্যয় করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমাদের দেশে কোন কর্ম্মঠ লোক ক্ষুধা ও শীতের দরুণ দুঃখ ভোগ না করে, জাতি হিসাবে ইহা দেখা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।"

শুধু যে বর্ত্তমানের বেকার সমস্যা লইয়াই মাথা ঘামান হইতেছে, তাহা নহে; ভবিষ্যতেও এই সমস্যার হাত কি ভাবে এড়ান যাইবে সে চেষ্টাও চলিতেছে। এতদিন বেকার-বীমা ও পাবলিক্ এম্প্লয়মেণ্ট অফিস স্থাপনের উপযোগিতা মার্কিণবাসী স্বীকার করে নাই। এখন লোকের মনে এ চিন্তা উঠিয়াছে যে, বেকার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত আবশ্যক। আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার "ন্যাশনাল সিষ্টেম্ অব্ পাব্লিক এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের" পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে সিনেটর ওয়াগ্নার কংগ্রেসে এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বেকার বীমার কথা ব্যাপক-ভাবে আলোচিত হইতেছে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—নিউইয়র্ক ও শিকাগো সহরে বস্ত্রশিল্পে নিয়োগকর্ত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন মিলিয়া এক বেকার বীমার যৌথ ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে। জেনারেল ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাই ও অন্যান্য দু-একটী কোম্পানীও এদিকে নজর দিয়াছে। তবে এইসব ব্যবস্থা হইতে মাত্র ২০০,০০০ লোক সাহায্য পাইতে পারে। কোন কোন ট্রেড্ ইউনিয়ন সভ্যগণের কেহ কর্ম্ম অভাবে বসিয়া থাকিলে সাহায্য করিয়া থাকে। এরূপ সাহায্যের পরিমাণও অল্প। এখনো অনেকেই সাধারণের টাকা বেকার বীমায় খরচ করার বিপক্ষে। তবে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে যে এ সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব, এ কথা অল্পে অল্পে অনেকেই বুঝিতেছেন। নিউইয়র্কে গবর্ণর ফ্রাঙ্কলিন্ রুসভেল্ট বেকার-বীমা-নীতির পক্ষপাতী; তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ম্যাসাচুসেট্, রোড্ আইল্যাণ্ড, কনেক্টিকাট, পেন্সিলভিনিয়া ও ওহায়োর গবর্ণরদিগকে এক সভায় আহ্বান করেন।

শ্রমিক আইন প্রণয়নকারী মার্কিণ সঙ্ঘ (আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর লেবার লেজিস্লেশন্) শিল্প কর্ত্তৃক বেকার-বীমা প্রবর্ত্তনের এক অভিনব প্লান দাখিল

করিয়াছেন ; এই প্ল্যান অনুসারে সমস্ত ভারটাই নিয়োগ-কর্ত্তাকে বহন করিতে হইবে। নিয়োগ-কর্ত্তা মজুরি বিলের ১½% সেই বিশেষ শিল্পের এক সাধারণ ফাণ্ডে জমা দিবেন —তাহা সরকারের তত্ত্বাবধানে খরচ হইবে। এই প্ল্যানের মধ্যে নতুনত্ব এইটুকু যে, যে নিয়োগকর্ত্তা নিয়মিতভাবে অধিকসংখ্যক লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন তাহাকে 'রিবেট্' দেওয়া হইবে। মজুর আন্দোলন এখনো বাধ্যতা-মূলক বেকার বীমা বিষয়ে একমত হইতে পারে নাই। বস্ত্র-শিল্পের মজুর (অ্যামাল্‌গামেটেড্ ক্লোথিং ওয়ার্কার্স) এরূপ বীমার পক্ষে রায় দিলেও আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার ইহার বিপক্ষে। এই বিপক্ষদল বলেন যে, তাহা হইলে শ্রমিককুল সরকারের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িবে। এই সব বাক্‌বিতণ্ডার ফল কি হইবে, বলা কঠিন ; তবে অনেকে মনে করেন যে, যখন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণরূপ সমাজ বীমা চলিয়া গিয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে এরূপ একটা সমাজের হিতকর বীমা চলিয়া যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

মজুরি

নানা শিল্পে মজুরির হার কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে—তবে ১৯২১ সনের ভাঁটার সময় যেরূপ নামিয়া গিয়াছিল সেরূপ নামে নাই। পক্ষান্তরে অনেক শিল্প-ধুরন্ধরের মত এই যে, মজুরির হার যত চড়া থাকে ততই ভাল, কেননা তাহা হইলে ক্রয়শক্তি বাড়ার দরুণ স্তূপাকারে উৎপাদনের সুবিধা হইবে। তাই তাঁহারা মজুরির হার যথাসাধ্য চড়া রাখিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। এইজন্য প্রেসিডেন্ট হুভার গত ডিসেম্বর মাসে বলিতে পারিয়াছিলেন "ব্যবসা মন্দা হইলেই সাধারণতঃ যেরূপ মজুরির হার নামিতে দেখা যায়, এবারে তাহা দেখা যায় নাই। ইউনিয়নের মজুরির সূচী সংখ্যায় দেখা যায় যে, গত তিন বৎসর মজুরির হার যেরূপ ছিল, এবারও সেইরূপই আছে। ফলে দেশের ক্রয়-শক্তি যতটা হওয়ার কথা এখন তার চেয়ে অনেক বেশী রহিয়াছে।" কিন্তু এখনে ব্যতিক্রমও দেখা যাইতেছে : (১) গৃহ-নির্ম্মাণ শিল্পে অভাবের তাড়নায় অনেককেই অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে কোন তথ্য-তালিকা না থাকিলেও ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট। (২) মজুরির হার পূর্ব্ববৎ রাখিলেও কার্য্যের সময় কম করাতে ব্যক্তিগত আয়ের মাত্রা কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মোট মজুরির পরিমাণ এবং সেই হেতু ক্রয়-শক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। কোন তথ্য-সংগ্রাহক সংসদের মতে মজুরি ২০% কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯২৯ সনে মোট মজুরির পরিমাণ অধিক ছিল এবং জাতীয় আয়ে (ন্যাশানাল ইনকাম্) মজুরির হিস্সাই অধিক ছিল। মজুর সুখ-সম্পদের জন্য যত অধিক ব্যয় করিতে পারে, তাহার কার্য্য-ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবার তত সুবিধা হয়। সুতরাং মোট মজুরির পরিমাণ এক বৎসরে যদি ৯,০০০,০০০,০০০ ডলার কমিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক মজুর স্বীয় আয়ের বেশ মোটা অংশ নেহাৎ প্রয়োজন বাবদ্ খরচ করিতেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অতি অল্পই খরচ করিতে পাইতেছে ; অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানকাঠি তাহাকে খাটো করিয়া আনিতে হইতেছে। যদি এই ভাবে মজুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং স্থায়ী ভাবে নামিয়া যায়, তাহা হইলে যে সব জিনিষ মজুরের নেহাৎ প্রয়োজন সেগুলি বাদে অন্য পণ্য বিক্রয় করা দুঃসাধ্য হইবে ও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। (৩) প্রাণধারণের খরচার মাত্রাও কমিয়া যাইতেছে। পণ্যের পাইকারী দর যে ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতে 'কষ্ট্ অব্ লিভিং' কমে নাই। ১৯৩০ সনের আগষ্টমাস নাগাদ্ পাইকারী দর ১৪% কমিয়া যায় ; খাদ্য দ্রব্যের দরও ১০% পড়িয়া যায় ; বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের দরও নামিয়া যায়। কিন্তু আজানি ও বাড়ী ভাড়ার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই চলে। এখন যদি খাদ্যদ্রব্য ও খুচরা দর কমিয়া যায় (এবং কমাই সম্ভব) তবে আপাত (নমিন্যাল) মজুরি কমিতে পারে ; তাহা বলিয়া মার্কিণ মজুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লাইফ্ খাটো না হইতেও পারে, কেননা মার্কিণবাসীর ধারণা মজুরি চড়া রাখা উচিত।

কাজের ঘণ্টা

"শর্ট-টাইম্" কাজ হওয়ার ফলে, কাজের ঘণ্টা কমিয়া

গিয়াছে। যান্ত্রিক উৎপাদনের বিপুল ক্ষমতা দেখিয়া লোকের মনে সন্দেহ হইয়াছে পাছে কোন কোন শিল্পে চিরকালের জন্য কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিতে হয়। আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের মতে ভবিষ্যতে বেকার নিবারণ করিতে হইলে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করিয়া কার্য্য-সময় স্থির হওয়া কর্ত্তব্য এবং মাহিয়ানা সমেত ছুটির বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নিয়োগ-কর্ত্তাদের অনেকেই এই মত পোষণ করেন না: তবে ক্রমশঃ অনেকেই এ কথার সত্যতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যুক্তি-প্রয়োগ

১৯১৯ হইতে ১৯২৯ খৃঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মাথা-পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫% বাড়ে। সেই সময়ের মধ্যে কারখানার মজুরদের সংখ্যা ৯,০০০০০০ হইতে ৮,১০০,০০০তে আসিয়া ঠেকে। এই প্রথম আমেরিকায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে, অথচ কম মজুর নিয়োগ করা হইয়াছে। খনি, রেলপথ ও কৃষিকার্য্যে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। খনির কাজে 'বিটুমিনাস' কয়লা-শিল্পে 'পার্ট-টাইম্' (আংশিক সময়) কাজের পরিমাণ বাড়িলেও, দেখা যায় যে, মাথা-পিছু উৎপাদন ৪০% বাড়িয়াছে অথচ নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ৬% কমিয়াছে। রেলপথেও কর্ম্ম-কুশলতা (এফিসেন্সি) বাড়ে, কিন্তু লোক খাটে, ৩০০,০০০ বা ১৫% কম। কৃষিকার্য্যে, ট্র্যাক্টর, কম্বাইন প্রভৃতি যন্ত্র-পাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ২৫% বাড়িয়া যায়, অথচ ৩,০০০,০০০ লোক চাষ-আবাদ ছাড়িয়া দিয়া সহরে কাজের অন্বেষণ করিতে ছুটে। তবে একথা সত্য যে, অন্যান্য পেশায় অধিকসংখ্যক লোক লওয়া হইতে থাকে। চতুর্দ্দিকে সুখ-সম্পদ্ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে হোটেল, রেষ্টঁা, গ্যারেজ, সার্ভিস্-ষ্টেশন, বীমা কোম্পানী, সিনেমা প্রভৃতির কাজ বেশ চলিতে থাকে ও ফলে তাহারা নতুন নতুন লোক নিযুক্ত করিতে থাকে। কিন্তু আবার বাজার মন্দা হইলে এই ব্যবসাগুলিতেই বেশী ক্ষতি হয়। প্রকৃত পক্ষে যে সব লোক এখন বেকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই সব কারবারে নিযুক্ত ছিল।

যন্ত্র-পাতি ব্যবহার, একাকার ও পরিচালনার উৎকর্ষ সাধনের ফলে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; এবং এই বেকার দলকে নতুন কাজ চুঁড়িয়া লইতে যে বেগ পাইতে হয়, তাহাতে তাহাদের সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়া যায়, যখন কাজ মেলে তখন অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয় ও কাজেরও কোন স্থিরতা থাকে না এবং বৃদ্ধ নিপুণ কারিগরের পক্ষে নতুন কাজ উপযুক্ত মজুরিতে পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদি টেক্‌নিক্যাল উন্নতি এত তাড়াতাড়ি না করা হইত—যদি রহিয়া বসিয়া শনৈঃ শনৈঃ করা হইত, তাহা হইলে কৃষি বা কারখানা-শিল্প এত অধিক লোককে বেকার করিত না। যুক্তি-প্রয়োগ কিছুকাল অন্তে 'হাণ্ডার্ড অব্ লিভিং' বাড়াইয়া দেয় ও সভ্যতার উন্নতির সহায়ক হয়—এ কথা যতই সত্য হউক না কেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, অত্যন্ত শীঘ্র টেক্‌নিক্যাল উন্নতি সাধনের ফলে লোককে (মজুরকে) বিপন্ন হইতে হয়। এইরূপ দ্রুত উন্নতি-বিধানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে মজুর নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে (ইহাকে "টেক্‌নলজিক্যাল আন্‌এম্প্লয়মেণ্ট" বলে) এবং যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ হেতু উৎপাদন-বাহুল্য (ওভার প্রডাক্‌শন) হইতেছে। অধ্যাপক ওগ্‌লি মিচেল বলেন যে, কতক-গুলি লোককে বলি দিয়া (যদিও তাহাদের কোন দোষ নাই বা তাহারা কোন ভুল করে নাই) টেক্‌নিক্যাল উন্নতি সাধন করা হইতেছে; এপর্য্যন্ত এই দুঃখের লাঘবের জন্য কোনরূপ সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করা হয় নাই, প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা হইয়াছে। যতদিন সমৃদ্ধির প্লাবন ছিল ততদিন এরূপ বেকারের ফল বিশেষ বোঝা যায় নাই। যাহারা বেকার হইতেছিল তাহারা অন্য কোন একটা উপ-জীবিকা গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু যেই মন্দা জগতে ভাঁটা পড়িল, তখন ইহার তীব্রতা অনুভব করা গেল; তখন এইসব বেকার ব্যক্তি নতুন যেসব উপজীবিকার পথ ধরিয়াছিল সেগুলি রুদ্ধ হইল এবং দেখা গেল যে, বেশী লোক না রাখিয়া সামান্য ২।৩টি লোক রাখিয়াই ঐসব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বাজারের চাহিদা মেটানো যাইতেছে।

ফলে শত সহস্র লোককে বেকার হইতে হইয়াছে। সুতরাং সকলেই বুঝিল যে, এই নতুন সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তাই বেকার বীমার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, উৎপাদনকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাউক যে, উৎপাদন ও টেক্‌নিক্যাল উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বেকার রোধ করা হয়। উইলিয়াম গ্রীণ (ইনি আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের সভাপতি) বলেন যে, যদি মজুরের কাজ 'ষ্টেবিলাইজ্' না করা যায় তবে বেকার বেনিফিট গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ন্যাশনাল ইনডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স বোর্ডও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উৎপাদন স্থিতীকরণ

কিন্তু উৎপাদন-স্থিতীকরণ (ষ্টেবিলাইজেশন অব্ প্রডাক্‌শন) বা মজুর নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা বড় সোজা কথা নয়। ইহার জন্য আবশ্যক হয় নির্ভুল পূর্ব্বাভাস (ফোর্কাষ্টিং) ও অপেক্ষাকৃত স্থির প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়টি ঠিক থাকিলে, প্রথমটির আঁচ করা অসম্ভব নয়; কিন্তু দ্রুতগতি টেক্‌নিক্যাল উন্নতিতে ও আবিষ্কারের ফলে টেক্‌নলজিক্যাল বেকার সৃষ্টি হয়, তাহাতেই প্রতিযোগিতা স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যান্য অনেক দেশের মত, যুক্তরাষ্ট্রেও উৎপাদিকাশক্তি যাদব শক্তিকে ছাপাইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, তখনই যে উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতেছিল, সেইগুলি যদি পুরা-সময় চালান যায়, তবে বার মাসের ব্যবহারের উপযুক্ত পণ্য ৮ মাসেই উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। দি ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ কমিশনর অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ বলেন যে, যদি দেশের ১৩৫৭টি জুতার কারখানার মধ্যে মাত্র ২০০টি পুরা সময় চালান যায় তবে তাহা দিয়াই দেশের জুতার চাহিদা মিটানো যাইবে। বাকীগুলিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তেমনি যদি ৬০৫৭টি 'বিটুমিনাস' কয়লা খনির মধ্যে মাত্র ১৪৮৭টিতে ৩০০ ঘণ্টা কাজ চালান যায়, তাহা হইলেই দেশের চাহিদা মেটানো যাইবে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা দিন দিন এত তীব্র হইতেছে যে, অনেক উৎপাদন-ক্ষেত্রে পুঁজি ও মজুরের কোন সিকিউরিটি নাই। তাই পাছে অভাবনীয় টেক্‌নিক্যাল উন্নতির ফলে তাঁহাদের যন্ত্রপাতি অকেজো ও লাভশূন্য হইয়া পড়ে, এই ভয়ে শিল্পধুরন্ধরগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লাগানো পুঁজি হইতে আয় করিতে চাহেন। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইকনমিক সার্ভে প্রায় ২০০টী বড় বড় কারখানা-ওয়ালাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন যে, ৪০%, কারখানার পুঁজি আদায় করিয়া লইবার জন্য দুই বৎসরের মধ্যেই নতুন যন্ত্রপাতি বসাইতে হয় ও ৬৪% কারখানায় তিন বৎসরের মধ্যেই নতুন কল আমদানি করিতে হয়। প্রতিযোগিতার জন্যই এত তাড়াতাড়ি কল বদ্‌লাইতে হইয়াছে। অধিকন্তু, কোন উন্নততর প্রণালীর কল আবিষ্কৃত হইলেও শিল্পধুরন্ধর পুরাতন কলে কিছুদিন কাজ চালাইলেও চালাইতে পারেন; কিন্তু পাছে কোন প্রতিযোগী এই নব আবিষ্কারের সহায়তা লইয়া তাঁহার উপর টেক্কা দিয়া যায়, এই ভয়ে সাত তাড়াতাড়ি পুরাতন কল খারিজ করিয়া নতুন উন্নততর প্রণালীর কল বসাইতে বাধ্য হন। ফলে আরো কয়েকটী লোকের অন্ন যায়। এই ভাবে বেকার-সংখ্যা বাড়িয়াই চলে।

কেহই বলিবে না যে, এরূপ কলকব্জার উন্নতির প্রয়োজন ছিল না—তবে কথা হইতেছে যে, একটু মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিলেই ভাল হইত। যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া কারবারের বিপক্ষেই এতদিন জনমত প্রবল ছিল এবং তাই "অ্যান্টি-ট্রাষ্টস্" কায়েম করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিযোগিতার মূলে কুঠারাঘাত করার পথ রোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি ক্রমশঃ কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিযোগিতার মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন আবার অ্যান্টি-ট্রাষ্টের উল্টা গান শোনা যাইতেছে। গত অক্টোবর মাসে আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের বাৎসরিক সভায় জুডার বলেন যে, আমাদের এই প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার এ উদ্দেশ্য নয় যে, প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পের মধ্যে অস্থিরতা আসে ও সকল শিল্পী দরিদ্র হইয়া যায়। যদি এই নিয়ন্ত্রণ-বিধির মধ্যে কোন দোষ থাকে, তবে তাহা দূর করা

কর্ত্তব্য। উৎপাদন-বাহুল্য যে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ভাঁটা ও বেকার বৃদ্ধির জন্য দায়ী একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ ও মজুৎ-নিরোধে দ্বিতীকরণ হওয়া আবশ্যক। দেশের ভিতরকার বাজার ধরিলে এ কথার কতকটা সমাধান করা চলে; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বেলায় ইহা তত সহজ নহে। এ বিষয়ে আরো গবেষণা হওয়া আবশ্যক।

আন্তর্জ্জাতিক হেতুনিচয়

পূর্ব্বে যে সব সমাজ-সমস্যার কথা বলা হইল সেগুলির জন্য কতকগুলি আন্তর্জ্জাতিক হেতুও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রে এইসব আন্তর্জ্জাতিক কারণগুলি লইয়া কিছু কিছু আলোচনা সুরু হইয়াছে। এই সেদিনকার অভিভাষণে প্রেসিডেন্ট গম, রবার, কফি, চিনি, তামা, রূপা, দস্তা, তুলা প্রভৃতি পণ্যগুলির দুনিয়া-ব্যাপী উৎপাদন-বাহুল্যের প্রতি এবং ঐ সব পণ্যের দর ক্রমশঃ নামিয়া যাওয়ার ফলে উৎপাদক দেশগুলির ক্রয়-শক্তির হ্রাস-জনিত বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এশিয়ার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লব, ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের অশান্তি ও রুশিয়ার বাড়তি পণ্য বিদেশে বিক্রয়ের প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া দেখান যে, এই সব কারণেও পণ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। অধিকন্তু স্বর্ণ-বিতরণ, আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা, শুল্ক দেওয়াল প্রভৃতির জন্য পণ্যের বাজার নষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক ভি ইয়াং পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন যে, যদি যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো খাড়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাড়তি খাদ্য-দ্রব্য, কাঁচা মাল ও তৈরী মাল বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে। তাই তিনি বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে "সহযোগ নীতি" অবলম্বন করিতে হইবে; আমেরিকার আর্থিক প্রণালী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাহার দ্বারা দুনিয়াব্যাপী আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়, ষ্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিং (জীবন-যাত্রার ধারা) উন্নত হয় এবং লোকের ভোগ-শক্তি বাড়িয়া যায়; আমেরিকার সকল শুল্কনীতি ও চুক্তির মধ্য হইতে এই কথাই পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক; তবে সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে, আর্থিক উন্নতির জন্য শান্তি ও সদ্ভাব আবশ্যক।

এইসব আলোচনার মধ্য হইতে এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, বর্ত্তমানের সকল অশান্তির মূলে আছে আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ।

"মেমরেণ্ডাম অব্ প্রডাক্‌শন অ্যাণ্ড ট্রেড্" (দুনিয়ার উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী) ১৯২৩ হইতে ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত। লীগ্ অব্ নেশনসের আর্থিক বিভাগের তাঁবে প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ জুন, ১৯৩০, স্থান জেনেভা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯।

ভূমিকা বাদে কেতাবের পরিচ্ছেদগুলি এই :

(১) মুদ্রা, (২) লোকবল, (৩) উৎপাদন, (৪) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, (৫) শিল্প এবং (৬) কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের দরের উঠা নামা।

৩৩টি তালিকার এইরূপে ৭৮ পৃষ্ঠায় আসল কেতাব-খানি শেষ হইয়াছে। এর পরের কয়েক পৃষ্ঠায় ৬টা বিস্তৃত তালিকায় দ্রব্যাদির নানা প্রকার তুলনায় মূল্য ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৬-২৮ সনে লোকবল, খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপাদন এবং বাণিজ্যের বহর কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আন্দাজ করা যাইবে।

১৯২৬=১০০

	লোকবল	কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য		বাণিজ্যের বহর	
	১৯২৮	১৯১৭	১৯১৮	১৯২৭	১৯২৮
(ক) পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপ					
রুশিয়া বাদে	১০২	১১১		১২৪	১৮০
রুশিয়া শুদ্ধ	১০৩	১০৫	১১১	১২৩	১২৯
(খ) বাকী ইয়োরোপ	১০১	১১৮	১১৮	১০৯	১১২
ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	১০২	১১৫	১১৯	১১৩	১১৭
ইয়োরোপ, রুশিয়া শুদ্ধ	১০২	১১০	১১৩	১১১	১১৭
উত্তর আমেরিকা	১০২	৯৯	১০৪	১০২	১০৭
ক্যারিবিয়ান্	১০২	৯৬	১০২	১০২	৯৬
দক্ষিণ আমেরিকা	১০৪	১১৫	১২১	১১৩	১১৯
আফ্রিকা	১০৩	১০৩	১০৭	১১১	১২২
এশিয়া, রুশিয়া বাদে	১০১	১০২	১০৫	১০০	৯৮
ওশেনিয়া	১০৩	১০০	১০৪	১০৫	১০১
দুনিয়া	১০২	(১) ১০৫ (২) ১০৩ (৩) ১০৭	(১) ১০৮ (২) ১০৮ (৩) ১০৯		

(১) খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল। (২) খাদ্যদ্রব্য। (৩) কাঁচামাল।

মধ্য ও পূর্ব্ব ইয়োরোপ বলিলে আলবেনিয়া, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোবাকিয়া ইস্তোনিয়া, জার্ম্মাণি, গ্রীস্, হাঙ্গেরি, লাত্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, রুশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ও ইয়োরোপীয় তুরস্ক বুঝিতে হইবে। উত্তরে মেক্সিকো হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে পানামা পর্য্যন্ত ভূভাগ হইল ক্যারিবিয়ান্ আর আলাস্কা, কানাডা, লাব্রাডোর, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও যুক্ত রাষ্ট্র লইয়া উত্তর আমেরিকা।

উপরি উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, দুনিয়ার লোকবল বহু বাড়িতেছে, খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন তার চেয়ে বেশী বাড়িয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে দুনিয়াব্যাপী হাহাকারের জন্য অন্ততঃ খাদ্যের যোগানকে দায়ী করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানের দুঃসময় সত্ত্বেও ১৯২৮ সনে দক্ষিণ আমেরিকা ও ইয়োরোপের অবস্থাই সব চেয়ে ভাল বলিতে হইবে।

দুনিয়ার লোকবল

	লোক বল কোটি		শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি		দুনিয়ার শতকরা কত অংশ	
	১৯২৬	১৯২৮			১৯২৬	১৯২৮
(ক) পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপ						
রুশিয়া বাদে	১৭'১০	১৭'৪৭	১০০	১০২'০	৮৯	৮'৯
রুশিয়া সুদ্ধ	৩১'৮০	৩২'৮৭	১০০	১০৩'৩	১৬'৫	১৬'৭
(খ) বাকী ইয়োরোপ	১৯'৫০	১৯'৭৩	১০০	১০১'২	১০'১	১০'১
ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	৩৬'৬০	৩৭'২০	১০০	১০১'৬	১৯'০	১৯'০
ইয়োরোপ রুশিয়া সুদ্ধ	৫১'৩০	৫২'৬০	১০০	১০২'৫	২৬'৬	২৬'৮
উত্তর আমেরিকা	১২'৭৮	১৩'০৮		১০২'৩	৬'৬	৬'৭
ক্যারিবিয়ান	০'১৮	০'২৪		১০১'৯	১'১	১'৬
দক্ষিণ আমেরিকা	৭'৬০	৭'৯৮		১০৫'০	৩'৯	৪'১
আফ্রিকা	১৪'০০	১৪'০৪		১০২'৫	৭'০	৭'০
এশিয়া, রুশিয়া বাদে	১০২'৮৪	১০৪'০৩		১০১'২	৫৩'৪	৫৩'০
ওশেনিয়া	'৯২	'৯৫	১০০	১০৩'৩	০'৫	০'৫
দুনিয়া	১৯২'৬৪	১৯৬'২৩	১০০	১০১'৯	১০০	১০০
দুনিয়া, চীন বাদে	১৪৬'৭৮	১৫০'৩৬	১০০	১০২'৪	—	—

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, দুনিয়ার অর্দ্ধেকের বেশী লোক এশিয়ায় বাস করে।

ইহার সহিত উৎপাদনের সাধারণ সূচী তুলনীয়। ১৯২৬ সনকে ১০০ ধরিলে উৎপাদনের সাধারণ সূচী নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

(ক) পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপ						
রুশিয়া বাদে	৮৪	৯১	১০৫	১০০	১১১	১২০
রুশিয়া সুদ্ধ	৭৬	৮১	৯৯	১০০	১০৫	১১১
(খ) বাকী ইয়োরোপ	১০২	১০৭	১১২	১০০	১১৮	১১৮

ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	৯৩	৯৯	১০৮		১১৪	১১৯
ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ	৮৬	৯১	১০৪	১০০	১১০	১১৩
উত্তর আমেরিকা	৯৭	৯০	৯৬		৯৯	১০৪
ক্যারিবিয়ান্	১০১		১০৫		৯৫	১০২
দক্ষিণ আমেরিকা	৯৮	৯১	৯৮		১১৪	১২১
আফ্রিকা	৮৮	৯৪			১০৩	
এশিয়া, রুশিয়া বাদে	৮৯	৯৪	৯৯		১০২	১০৫
ওশেনিয়া	৮৬	৯৩	৯০	১০০		১০৪
দুনিয়া	৯১	৯২	১০০		১০৪	১০৮

এই সম্পর্কে খাদ্যদ্রব্যের সূচীসংখ্যাও প্রণিধানযোগ্য।

	১৯২৩	১৯২৪				
(ক) পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপ						
রুশিয়া বাদে	৯৪	৯৪			১০৯	১২২
রুশিয়া সুদ্ধ	৮১	৮২			১০২	১০৯
(খ) বাকী ইয়োরোপ	৯৭	৯৮	১০৮	১০০	১০৭	১০৬
ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	৯৫	৯৬	১০৯	১০০	১০৭	১১৫
ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ	৮৬	৮৭	১০৩	১০০	১০৩	১০৮
উত্তর আমেরিকা	১০৯	৯৯	১০০	১০০	১০৫	১১১
ক্যারিবিয়ান্	৯২	১১০	১০৪		৯৭	১০৯
দক্ষিণ আমেরিকা	১০০	৯১	৯৮		১০২	১০৮
আফ্রিকা	৯৭	১০০	১০৩	১০০	১১১	১১০
এশিয়া, রুশিয়া ও চীন বাদে	৯৬	১০০	১০১	১০০	১০১	১০৩
ওশেনিয়া	৮৬	১০২	৮৮	১০০	৯৫	১০৮
দুনিয়া	৯৫	৯৪	১০১	১০০	১০০	১০৮

মোটামুটি বলা চলে রুশিয়া বাদে পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপের অবস্থাই সব চেয়ে ভাল। ১৯২৬ সনের (১৯২৩ সনেরও বটে) তুলনায় ১৯২৮ সনে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে নাই এমন ভূভাগ নাই, যদিও বৃদ্ধিটা সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। গোটা দুনিয়ার খাদ্যদ্রব্যও তালে তালে বাড়িতেছে।

খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল এবং মোট উৎপাদনে কোন্ ভূভাগের মূল্য কতখানি তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। সমস্ত হিসাব ১৯২৬ সনকে মান ধরিয়া করা হইয়াছে।

মোট দুনিয়া = ১০০

	খাদ্য দ্রব্য		কাঁচা মাল		মোট উৎপাদন	
	গড় ১৯২৩-১৯২৫	গড় ১৯২৬-১৯২৮	গড় ১৯২৩-২৫	গড় ১৯২৬-২৮	গড় ১৯২৩-২৫	গড় ১৯২৬-২৮
(ক) পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপ						
রুশিয়া বাদে	১৮·৪	১৭·০	৯·৭	১১·৩	১৩·৫	১৪·৪
রুশিয়া শুদ্ধ	২৭·২	২৯·১	১২·১	১৪·৬	২০·৭	২৩·১
(খ) বাকী ইয়োরোপ	১৮·২	১২·৬	১৭·৮	১৬·৪	১৫·১	১৪·৩
ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	২৯·৬	২৯·৬	২৭·৫	২৭·৭	২৮·৭	২৮·৭
ইয়োরোপ, রুশিয়া শুদ্ধ	৪০·৪	৪২·৫	২৯·৯	৩১·০	৩৪·৯	৩৭·৪
উত্তর আমেরিকা	২৪·৫	২৩·৪	৩৯·৩	৩৭·৫	৩০·৯	২৯·৮
ক্যারিবিয়ান্	২·৬	২·৪	২·২	১·৭	২·৪	২·১
দক্ষিণ আমেরিকা	৫·৮	৫·১	৫·১	৪·৮	৫·৫	৫·৮
আফ্রিকা	২·৫	২·৫	৩·০	২·৯	২·৭	২·৭
এশিয়া রুশিয়া বাদে	২২·৫	২১·৬	১৮·৩	১৮·৯	২০·৭	২০·৩
ওসেনিয়া	১·৭	১·৭	২·২	২·২	১·৯	১·৯
দুনিয়া	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

দেখা যাইতেছে যে, ইয়োরোপের লোকবল যদিও দুনিয়ার লোকবলের মাত্র ৩০% অংশ, খাদ্য-দ্রব্যের ব্যাপারে ইয়োরোপের স্থান সর্ব্বোচ্চ, দুনিয়ার সমগ্র খাদ্যদ্রব্যের ৪০% এর বেশী ইয়োরোপে উৎপন্ন হয়। লোকবল হিসাবে উত্তর আমেরিকার দুনিয়ার ৯% লোকও নাই। কিন্তু দুনিয়ার খাদ্যের ২৩।২৪% আমেরিকায় বর্ত্তমান। অন্যদিকে এশিয়ার পৃথিবীর তামাম লোকের ৭০%এর অধিক অবস্থিত থাকিলেও তাদের খাইবার ব্যবস্থা দুনিয়ার ২০% এর কিছু বেশী অংশ মাত্র। ইয়োরোপের অনুপাতে এশিয়াতে আরো ৫½ গুণ খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান থাকা উচিত ছিল, আর উত্তর আমেরিকার অনুপাতে এশিয়ার আরো ৯ গুণ খাদ্য-দ্রব্যের সংস্থান থাকা উচিত ছিল। এশিয়ার লোকের দারিদ্র্যের একটা কারণ এইখানেই স্পষ্টীকৃত হইবে। এশিয়াবাসী একজন আমেরিকানের ½ অংশ ও একজন ইয়োরোপীয়ানের ¼ অংশ খাদ্যদ্রব্য মাত্র নিজের পুষ্টির জন্য পায়। চীনা ও ভারতীয়ের বেলায় এই হিসাবও থাকে কি না সন্দেহ।

সাধারণতঃ এইরূপ একটা মতবাদ প্রচলিত আছে যে, এশিয়া তথা ভারতবর্ষ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের ভূমি, আমরা এশিয়াবাসীরা কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া শিল্পজাত ও কারখানা-প্রসূত দ্রব্যাদি কিনিয়া থাকি। উপরে উদ্ধৃত তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে এশিয়া খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালে ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক পশ্চাতে। আপাততঃ আমদানি রপ্তানির হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াও বলা চলে যে, এশিয়াবাসীরা খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল পাঠাইয়াই শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের অধঃক্ষেত্রে খাবারও আমরা ঘরে রাখি না, তার অনেকখানি বিদেশে পাঠাইয়া থাকি। সুতরাং ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার তুলনায় আমাদের দারিদ্র্য কতখানি তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই গেল উৎপাদনের কথা। এবার নীচের তালিকার হইতে আমদানি-রপ্তানির কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

দুনিয়ার পণ্য বাণিজ্য

(কোটি ডলার)

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
১। মধ্য ও পূর্ব্ব ইয়োরোপ									
(ক) রুশিয়া সুদ্ধ	৪৫৩·০	৫৮৮·৮	৬১০·৫	৪০৬·৮	৪৭১·২	৫০৫·৮	৮৬৯·৮	১০৬০·০	১১১৬·৩
(খ) রুশিয়া বাদে	৪১৪·১	৫৫২·১	৫৬১·৯	৪০০·৬	৪৩০·১	৪৬৫·৪	৮১৪·৭	৯৮২·২	১০২৭·৩
২। বাকী ইয়োরোপ	১২৮০·৫	১২৯৮·৭	১৩৩৫·৯	৯১৬·৭	১০০৮·৫	১১২০·০	২১৯৭·২	২৩০৭·২	২৩৫৫·৯
৩। ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	১৬৭৪·৬	১৮৫০·৮	১৮৯১·৮	১৬১৭·৩	১৪৩৮·৬	১৪৮৫·৪	২৯৯১·৯	৩২৮৯·৪	৩৩৮৩·২
৪। ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ	১৪১৩·৪	১৮৮৭·৫	১৯৪৬·৪	১৩৪৩·৫	১৪৭৯·৭	১৫২৫·৮	৩০৪৭·০	৩৩৮৭·২	৩৪৭১·২
৫। উত্তর আমেরিকা	৫৪৭·২	৫৩০·৭	৫০৭·৬	৬০১·৬	৬০৪·৭	৬৪৯·৪	১১৪৮·৮	১১৩৫·৪	১১৮৭·০
৬। ক্যারিবিয়ান্	৬৯·৬	৬৮·১	৬৪·৯	৮৭·১	৮২·৭	৮১·৫	১৫৬·৭	১৫৪·৮	১৪৬·৪
৭। দক্ষিণ আমেরিকা	১৭২·০	১৭৭·৩	১৯০·৮	১৮৬·২	২১৬·৪	২২৩·৫	৩৫৮·২	৩৯০·৭	৪১৪·৩
৮। আফ্রিকা	১৩৩·৪	১৪৭·৪	১৫৫·৮	১২৬·০	১৩৯·৫	১৪৯·৮	২৫৯·৪	২৮৬·৯	৩০৫·৬
৯। এশিয়া, রুশিয়া বাদে	৪৭৭·৪	৪৮০·৫	৪৫৮·৪	৫২৭·৪	৫১১·৭	৪২৬·৫	১০০৪·৮	৯৯২·২	৯৪৭·৯
১০। ওশেনিয়া	৯৮·৬	১০২·৫	৯৩·৬	৯৫·২	৯৫·১	৯৬·৮	১৯৩·৮	১৯৭·৬	১৯০·৪
মোট (৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত)	৩২১১·৭	৩৩৭৪·০	৩৪৪৭·৫	২৯৭৭·০	৩১৩০·৮	৩২২৩·০	৬১৮৮·৭	৬৫০৪·৮	৬৬৭০·৮

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের হিস্যা।

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
১। মধ্য ও পূর্ব্ব ইয়োরোপ									
(ক) রুশিয়া সুদ্ধ	১৪·১	৩৭·৪	১৭·৭	১৪·৭	১৫·১	১৫·৭	১৪·৪	১৬·৩	১৬·৭
(খ) রুশিয়া বাদে	১২·৯	১৬·৪	১৬·৩	১৬·৫	১৩·৭	১৪·৫	১৩·২	১৫·১	১৫·৪
২। বাকী ইয়োরোপ	৩৯·২	৩৮·৫	৩৮·৮	৩০·৮	৩২·২	৩১·৬	৩৫·২	৩৫·৫	৩৫·৩
ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	৫২·১	৫৪·৯	৫৫·১	৪৪·৩	৪৫·৯	৪৬·১	৪৮·৪	৫০·৬	৫০·৭
ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ	৪০·৩	৫৫·৯	৫৬·৫	৪৫·৫	৪৭·৩	৪৭·৩	৪৯·৬	৫১·৮	৫২·০
উত্তর আমেরিকা	১৭·০	১৫·৭	১৫·৬	২০·২	১৯·৩	২০·২	১৮·৬	১৭·৫	১৭·৮
ক্যারিবিয়ান্	২·২	২·০	১·৯	২·৩	২·৮	২·৫	২·৫	২·৪	২·২
দক্ষিণ আমেরিকা	৫·৪	৫·৩	৫·৫	৬·৩	৬·৮	৬·৯	৫·৮	৬·০	৬·২
আফ্রিকা	৪·১	৪·৪	৪·৫	৪·২	৪·৫	৪·৭	৪·২	৪·৪	৪·৬
এশিয়া, রুশিয়া বাদে	১৪·৯	১৩·৭	১৩·০	১৭·৭	১৬·৩	১৫·৪	১৬·২	১৪·৯	১৪·০
ওশেনিয়া	৩·১	৩·০	২·৭	৩·২	৩·০	৩·০	৩·১	৩·০	২·৯
মোট (৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

আমরা কোথায় তোমরা কোথায়

যত বড় দার্শনিক যুক্তিই কপ্‌চাই না কেন, এই সব অঙ্ক-তালিকা বর্ত্তমান দুনিয়ায় আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। দুনিয়ার বাণিজ্যের স্রোত ক্রমাগতই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। আর তার চেয়েও জোরে স্রোত বাড়িতেছে। ইয়োরোপের না কি শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, অতিশয় দুর্দ্দিন চলিতেছে। কিন্তু অনলস ইয়োরোপ দুর্দ্দিনেও যেরূপ কাজের বহর দেখাইতেছে তাতে চমৎকৃত হইতে হয়। গোটা দুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মোট মূল্যের আধাটা লইয়া একা ইয়োরোপ কেনাবেচা করিতেছে অর্থাৎ নিজেকে সমৃদ্ধ করিতেছে ও বাকী জগতের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতেছে। তারপরেই উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার স্থান। অর্থাৎ এশিয়ার অষ্টমাংশ লোক লইয়া আমেরিকা এশিয়ার উপর টেক্কা দিয়াছে। এশিয়াবাসী আজ যদি উত্তর আমেরিকানদের তুল্য হইত তবে একা এশিয়ার পক্ষেই গোটা দুনিয়ার মোট আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য চালানো সম্ভবপর হইত। আর এশিয়াবাসী যদি ইয়োরোপীয়ানদের তুল্য হইত তবে একা এশিয়ার পক্ষে গোটা দুনিয়ার মোট আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের চেয়েও বেশী বাণিজ্য (৩১০০ কোটি ডলার মূল্যের আমদানি, ৩০০০ কোটি ডলার মূল্যের রপ্তানি) চালানো অসম্ভব হইত না। কিন্তু এশিয়ার অপটুতার জন্য আজ দুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০০০ কোটি ডলার বা ১৭৫০০০ কোটি টাকা। তাই ইয়োরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া বলিতে সাধ যায়

তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোন স্বপনে হব না কি কাছাকাছি ?

শ্রীসুধাকান্ত রে

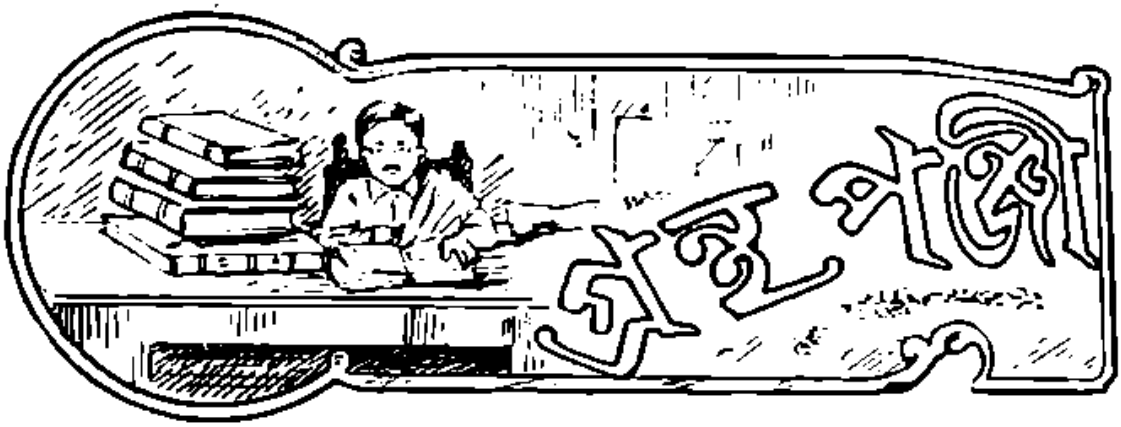

১। দি ইকনমিক সিচুয়েশন ইন্ গ্রেট বৃটেন (গ্রেট বৃটেনের আর্থিক অবস্থা) তয় ছাপটার ই সেটন। লণ্ডন জেনারেল প্রেস্ লিমিটেড্, লণ্ডন। ১৯৩১। ২ পি, ৬ পে।

২। ক্রিটিসিজ্‌ম অ্যাণ্ড আদার এস্ত্রেসেস্ (সমালোচনা ও অন্যান্য বক্তৃতা), তয় জোশিয়া ষ্টাম্প। আর্থেই বেন লিমিটেড্, লণ্ডন। ১৯৩১। ১৫ পি।

৩। দি এগ্রিকালচারাল সিচুয়েশন (কৃষির অবস্থা), ১৯২৯-৩০। বেভেরিজ অ্যাণ্ড টুমিনেলি এস্ ও, রোম।

৪। কোলেক্‌টিভিসেম্‌মুস্ উণ্ড ইন্‌ডিভিডুয়ালিসম্‌মুস্ ইম্ আর্বেইট্‌সগেবিট্‌স্‌প্রোব্লেম্ (মজুর আইন সম্পর্কিত নিয়মাবলী ও প্রয়োগের সমষ্টিত্ব ও ব্যক্তিস্বাধ), ডক্টর ওর্জ বাউম্। রাইমার হবিং, বার্লিন। ১৯৩১। ২৮ পৃঃ।

৫। লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল ইন্ ন্যাশনাল পলিটিক্স (জাতীয় রাষ্ট্রনীতিতে মজুর ও পুঁজিপতির স্থান), হারউড্ লরেন্স চাইল্ড্স্। ওহিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলম্বাস্। ১৯৩০। ১৩+২৮৬ পৃঃ। ৩ ডলার।

৬। কনটেম্‌পোরারি সোস্যাল মুভমেণ্টস্ (সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনসমূহ), জেরোম ডেভিস্। 'শতাব্দী সমাজ বিজ্ঞান সিরিজ'। সেঞ্চুরি কো, নিউ-ইয়র্ক ও লণ্ডন। ১৯৩০। ২০+৩০১ পৃঃ।

৭। এ বিব্লিওগ্রাফি অব্ সোস্যাল সার্ভে্স্ (সামাজিক জরীপের গ্রন্থপঞ্জী)। অ্যালেন ইটন ও মেলভিল এম্ হ্যারিসন। রাসেল সেজ্ ফাউণ্ডেশন, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। ৪৮+৪৬৭ পৃঃ।

৮। ইয়ার বুক অব্ এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন (কৃষি সমবায়ের বার্ষিকী), ১৯৩১। হোরেস্ প্লাঙ্কেট ফাউণ্ডেশন। হর্স রুটলেজ অ্যাণ্ড সন্স, লণ্ডন। ১৯৩১। ৮+৫৮২ পৃঃ।

৯। দি নিউ ক্যাপিটালিজ্‌ম অ্যাণ্ড দি সোস্যালিষ্ট (নয়া পুঁজিনিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্রবাদী), হ্যারি ডব্লিউ লেইড্‌লার। লীগ্ অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ডিমক্রেসী, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩১। ৪৭ পৃঃ। ১০ সেণ্ট।

১০। দি প্রব্লেম্ অব্ মেনটেনিং পারচেজিং পাওয়ার : এ ষ্টাডি অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ডিপ্রেশন অ্যাণ্ড রিকভারি (ক্রয়-শক্তি অব্যাহত রাখিবার উপায় কি : শিল্পে ভাঁটা ও তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় সম্বন্ধে গবেষণা), পি ডাব্লিউ মার্টিন। পি এস্ কিং, লণ্ডন। ১৯৩১। ১৪+৩১৪ পৃঃ। ১৫ পি।

রেলওয়ে দুনিয়ায় ভারতের স্থান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

এক্ষণে পৃথিবীর রেল ট্রাফিকের সহিত ভারতের রেল ট্রাফিকের তুলনা করা যাক্। প্রথমতঃ যাত্রীর সংখ্যা ধরা যাক্। ১৯২৭ সনে পৃথিবীর কোন্ দেশে কত জন যাত্রী অন্ততঃ এক কিলোমিটার ভ্রমণ করিয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

যে সব দেশের যাত্রী-কিলোমিটার ২০০০,০০,০০,০০০+

১। মার্কিণ রাজ্য (১৯২৬)
২। জার্ম্মানি
৩। ভারতবর্ষ
৪। ফ্রান্স
৫। সোবিয়েট রুশিয়া
৬। জাপান

যে সব দেশের যাত্রী-কিলোমিটার ৩০০,০০,০০,০০০+

১। চেকোস্লোভাকিয়া	৯২৬,৪০,০০,০০০
২। পোলাণ্ড	৬৩০,৭০,০০,০০০
৩। অষ্ট্রেলিয়া *	৫৭৮,৬০,০০,০০০
৪। বেলজিয়াম	৫৭৯,০০,০০,০০০
৫। ক্যানাডা	৪৯১,১০,০০,০০০
৬। সিংহল	৪৪৪,৭০,০০,০০০
৭। অষ্ট্রীয়া	৩৭১,২০,০০,০০০
৮। গ্রেট বৃটেন	৩১৭,০০,০০,০০০
৯। রুমানিয়া	৩১৫,১০,০০,০০০
১০। সুইট্‌জারল্যাণ্ড	৩০২,৫০,০০,০০০

রেল ব্যবহারকারীর সংখ্যা-বিষয়ে কেবল মার্কিণ রাজ্য ও জার্ম্মানি ভারতের উপর টেক্কা দিয়াছে। এ থেকেই লোক চলাচল ও ট্রাফিকের আয় সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসা সংগঠনে রেলওয়ের স্থানটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইবে। মাল চলাচলের ক্ষেত্রেও ভারতের এই আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব বজায় আছে। ১৯২৭ সনে অন্ততঃ এক কিলোমিটার রেলে কোন্ দেশে কতটা মাল আনা যাওয়া করিয়াছে তাহার একটা হিসাব নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

যে সব দেশের টন-কিলোমিটার ৩০০,০০,০০,০০০+

১। মার্কিণ রাজ্য	৬৩১৭০,০০,০০,০০০
২। সোবিয়েট রুশিয়া	৮১৬৫,০০,০০,০০০
৩। জার্ম্মানি	৭১৯১,৭০,০০,০০০
৪। ক্যানাডা	৫৪৮৯,৩০,০০,০০০
৫। ফ্রান্স	৪৪০৭,৫০,০০,০০০
৬। ভারতবর্ষ	৩৫৮১,৩০,০০,০০০
৭। গ্রেট বৃটেন	৩০৮১,৮০,০০,০০০

যে সব দেশের টন-কিলোমিটার ৪০০,০০,০০,০০০+

১। পোলাণ্ড
২। ইতালি
৩। জাপান
৪। বেলজিয়াম
৫। দক্ষিণ আফ্রিকা
৬। অষ্ট্রেলিয়া
৭। রুমানিয়া

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে মাল-বহনের ব্যাপারে ভারতীয় রেলের স্থান দুনিয়ায় বেশ উচ্চে। ভারতীয় রেলওয়ে জাপানী রেলওয়ের তিন গুণ ও ইতালীয় রেলওয়ের আড়াই গুণ মাল চালাচালি করিয়া থাকে।

সুতরাং দুনিয়ার কারবারী বাজারে ভারতের স্থান মোটা রকম।

(৩)

পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে যে, রেল দুনিয়ায় ভারতের স্থান ষষ্ঠ; এক মাত্র যাত্রিবহনের বেলায় তৃতীয়। সুতরাং তুলনামূলক রেলওয়ে সংখ্যাবিজ্ঞানে ভারতকে যদি পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তবে তাহাতে অন্যায় হইবে না। অর্থাৎ তাহা হইলে শিল্পে ও বাণিজ্যে—বস্তুতঃ কারখানার কাজ-কর্ম্ম ও উন্নতিতে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতি হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এই প্রকারের বর্ণনা ভুল হইবে, কারণ শিল্প-কারবারের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সংখ্যাবিজ্ঞান ও আন্তর্জ্জাতিক তুলনা ব্যতীত এক পাও চলা যায় না। দল, সম্প্রদায় শ্রেণী বা জাতিগত তথ্য-তালিকার মূল্য অস্বীকার করি না। এই সব তথ্য-তালিকা হইতেই মোট শক্তি ও সামর্থ্যের কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু দেখা যাইবে যে, বিষয় জন-সংখ্যার বিষয় আয়তনে এই সকল দল, শ্রেণী বা জাতি বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের উপযুক্ততা, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরস্পর তুলনা করিতে গেলে সকলের আগে দেখা দরকার প্রত্যেক বর্গ মাইলে এই প্রকার মোট শক্তি ও সামর্থ্যের কতটা পড়িতেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির আর্থিক, সামরিক ও সভ্যতাগত শক্তি তুলনা করিবার কালে শুধু কতকগুলি অঙ্ক বা তালিকা লইয়া তুলনা করিলে অতিশয় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। মাথাপিছু এবং বর্গ মাইল প্রতি "মাথা"গুলি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ গড়, ব্যক্তিগত মূল্য, বাহির করিলেই তুলনামূলক সংখ্যাবিজ্ঞান তার সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সমর্থ হয়।

উপরে রেলপথ, লোকোমোটিব, টন-কিলোমিটার ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল আন্তর্জ্জাতিক তথ্য-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতে রেলওয়ে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, শিল্প বা বাণিজ্যেরই বা কত শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা বুঝা যায়, কিন্তু ভারতীয় রেলওয়ের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অর্থাৎ বিশ্ব-আদর্শে ও বিশ্ব-অর্থনীতিতে ভারতের স্থান কোথায় জানিতে হইলে ভারতীয়েরা প্রত্যেকে মাথাপিছু অথবা প্রত্যেক মাইলে ঐ সব সুবিধার কতখানি করিয়া পায় তাহা দেখা দরকার। দুনিয়ার কোন্ দেশে প্রত্যেক দশ হাজার লোকের পক্ষে কত মাইল বা কিলোমিটার (১ কি—৫ মা) আছে তাহা নীচের তালিকায় দেখানো যাইতেছে। অঙ্কগুলি ১৯২৫ সনের।

যে সব দেশে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য আছে ১০ কিলো +

১।	কানাডা	৬৮·৯
২।	আর্জ্জেন্টিনা	৩৮·৪
৩।	মার্কিণ রাজ্য	৩৮·০
৪।	সুইডেন	২৪·৬
৫।	চিলি	২৩·১
৬।	মেক্সিকো	১৮·১
৭।	সুইটজারল্যাণ্ড	১৪·৭
৮।	বেলজিয়াম	১৪·২
৯।	নরওয়ে	১৩·১
১০।	ফ্রান্স	১২·০
১১।	হাঙ্গারী	১১·৫
১২।	অষ্ট্রিয়া	১০·৮
১৩।	চেকোস্লোভাকিয়া	১০·৩

যে সব দেশে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য আছে ৫ কিলো +

১।	আর্ম্মানি	৯·২
২।	ব্রাজিল	৯·০
৩।	গ্রেট বৃটেন	৭·৪
৪।	পোলাণ্ড	৭·১
৫।	স্পেন	৭·১
৬।	রুমানিয়া	৬·৮
৭।	রুশিয়া (এশিয়াস্থ)	৫·৫
৮।	ইতালি	৫·৪
৯।	রুশিয়া (ইয়োরোপস্থ)	৫·০

যে সব দেশে প্রতি ১০,০০০ অধিবাসীর জন্য আছে ৫ কিলো—

১।	জাপান	২·৭
২।	স্যাক্স	২·৬
৩।	ভারতবর্ষ	১·৯
৪।	ফিলিপাইন	১·১
৫।	চীন	০·৩
৬।	পারস্য	০·২

মাথাপিছু কোন্ দেশের লোকের তাঁবে কতখানি রেলওয়ে আছে তাহা দ্বারা যদি ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-গত এফিসেন্সির ধারণা করিতে হয়, তবে বলিতেই হইবে ভারতের স্থান অনেক নীচে। তবু অন্তে ভারত ৬ষ্ঠ হইলেও তুলনামূলক সংখ্যাবিজ্ঞানে পারস্য, চীন ও ফিলি-পাইনের ঠিক উপরেই ভারত। অথবা বাস্তব তুলনামূলক সংখ্যা-বিজ্ঞান বলিতেছে ভারতের স্থান প্রায় শূন্য।

এই গেল লোক-সংখ্যার দিক্ হইতে গণনা। এখন আয়তনের দিক্ হইতে কিলোমিটারে কোন্ দেশে কি পরিমাণ রেল লাইন আছে তাহার তুলনামূলক তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

যে সব দেশে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রেলওয়ে আছে ৫ কিলো+

১।	বেলজিয়াম্	৩৮·৫
২।	গ্রেট বৃটেন	১৪·৫
৩।	সুইটজারল্যাণ্ড	১৪·০
৪।	জার্ম্মাণি	১২·৩
৫।	বাভারী	১০·৩
৬।	চেকোশ্লোভাকিয়া	১০·০
৭।	ফ্রান্স	৯·৭
৮।	অষ্ট্রিয়া	৮·৪
৯।	ইতালি	৬·৮
১০।	পোল্যাণ্ড	৫·০

যে সব দেশে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রেলওয়ে আছে ১ কিলো+

১।	জাপান	
২।	মার্কিণ রাজ্য	
৩।	রুমানিয়া	৪·১
৪।	সুইডেন	৩·৫
৫।	স্পেন	৩·১
৬।	গ্রীস	২·৫
৭।	দক্ষিণ আফ্রিকা	১·৫
৮।	ভারতবর্ষ	১·৩
৯।	আর্জ্জেন্টিনা	১·৩
১০।	মেক্সিকো	১·৩
১১।	চিলি	১·২
১২।	নরওয়ে	১·১
১৩।	রুশিয়া (ইয়োরোপস্থ)	১·০

যে সব দেশে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে রেলওয়ে আছে ১ কিলো—

১।	ক্যানাডা	০·৭
২।	শ্যাম	০·৫
৩।	ব্রাজিল	০·৩
৪।	ফিলিপাইন	০·৩
৫।	চীন	০·১
৬।	রুশিয়া (এশিয়াস্থ)	০·১
৭।	পারস্য	০·০১

জনসংখ্যার অনুপাতে অথবা দেশের আয়তনের অনুপাতে ভারতের রেলপথের প্রসার লাভের অশেষ সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে ভারতের দারিদ্র্য বা অনগ্র-সরতা ঘুচাইবার জন্য উপরি উদ্ধৃত তিন শ্রেণীর রেলওয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। প্রতি ১০,০০০ অধিবাসীর জন্য কত কিলোমিটার রেল আছে, তাহা ধরিয়া ১৯২৫ সনের জন্য নিম্নলিখিত রেলওয়ে-সমীকরণগুলি পাওয়া যায়ঃ

মার্কিণ রাজ্য	(৩৮·০)	= ০·১৭ ফ্রান্স	(১২·০)	
		= ১৪ জাপান	(২·৭)	+
		= ২০ ভারতবর্ষ	(১·৯)	
ফ্রান্স	(১২·০)	= ১·৩ জার্ম্মাণি	(৯·২)	+
		= ২·২২ ইতালি	(৫·৪)	
		= ৬·৩ ভারতবর্ষ	(১·৯)	
জার্ম্মাণি	(৯·২)	= ১·২৪ গ্রেট বৃটেন	(৭·৪)	

= ১৮৪ ইয়োরোপীয়

রুশিয়া (৪·০)

৩·৪ জাপান (২·৭)

= ৪৮৪ ভারতবর্ষ (১·৯)

জাপান (২·৭)= ১·৪২ ভারতবর্ষ (১·৯)

= ৯ চীন (·৩)

ভারতবর্ষ (১·৯)= ৬·৩ চীন (·৩)+

= ২·৪ পারস্য (·২)

উপরি উক্ত অঙ্কগুলি নিছক গাণিতিক তত্ত্ব নয়। এই তালিকাগুলি হইতে আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, রেল-সম্পদে মার্কিণ রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসী প্রত্যেক রুশীয়ের চেয়ে ৩·১৭ গুণ অধিক ধনী, আর প্রত্যেক ভারতবাসীর চেয়ে ২০ গুণ অধিক ধনী। রুশীয়দের মাথাপিছু রেলওয়ে মাইলপথ জার্মাণদের চেয়ে বেশী; আবার প্রত্যেক জার্মাণ প্রত্যেক বৃটনের চেয়ে ১·২৪ গুণ ও প্রত্যেক জাপানীর চেয়ে ৩·৪ গুণ অধিক রেলওয়ে সম্পন্ন। তদ্রূপ প্রত্যেক জাপানী প্রত্যেক চীনার চেয়ে ৯ গুণ, আর প্রত্যেক ভারতবাসী প্রত্যেক চীনার চেয়ে ৬·০ গুণ ও প্রত্যেক পারসীর চেয়ে ১·৪ গুণ অধিক রেলওয়ের অধিকারী। রেল-দুনিয়ায় চীন ও পারস্যের স্থান সর্বনিম্নে। ভারতকে তার নিকটবর্তী কোন শক্তির নাগাল পাইতে হইলে, যথা জাপানের নাগাল পাইতে হইলে (দুনিয়ায় জাপানের স্থান উচ্চ নয়), দীর্ঘ সময় ধরিয়া বিপুলভাবে রেলের প্রসার করিতে হইবে। রেলওয়ের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে বড় শক্তিগুলির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। রাষ্ট্রনীতি, সামরিক শক্তি, সংস্কৃতিতে বড় বা প্রথম শ্রেণীর শক্তি হইতে হইলে কত হাজার মাইল রেলপথ থাকা চাই বা ১০,০০০ অধিবাসীর জন্য কত কিলোমিটার রেল থাকা প্রয়োজন তাহা নির্দেশ করা যায় না। কারণ স্বাধীন জাতির পক্ষে রেলওয়ের নিয়তম সীমা কিছু নাই। ১৯২৪ সনের তুলনামূলক সংখ্যাবিজ্ঞান একথা বলে না যে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অথবা দুনিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্বতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়তম দৈর্ঘ্যের রেলপথ থাকা চাই। তবে যেন রেলওয়েতে জাপানের সমকক্ষ হওয়াই ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ প্রতি ১০,০০০ অধিবাসীর জন্য ২·৭ কিলোমিটার রেলপথ চাই। তাহা হইলে রেল কারবারকে (৬২,০৭৪ কিলো) ১·৪২ গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বর্তমান ৬২,০৭৪ কিলোমিটার রেলপথের জায়গায় ৮৭,১৪৫ কিলোমিটার পরিমাণ রেলপথ বানাইতে পারিলে মাথাপিছু রেলসম্পদে ভারত জাপানের সমকক্ষ হইবে। এইভাবে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের অথবা তাদের পরস্পর তুলনা করিয়া কোন্ দেশ রেলসম্পদে কতখানি ধনী তাহা তুলনামূলকভাবে দেখা যায়। এই সকল সমীকরণের ফলেই তুলনামূলক সংখ্যাবিজ্ঞান বিশ্ব অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারে।

১৯২৪ সনে জাপান ও ভারতের রেলমাইল পথ তুলনা করিলে নিম্নলিখিত দুইটি সমীকরণ পাওয়া যায়ঃ

১ ভারতবর্ষ (৬২,০৭৪)= ৩·৩ জাপান (১৭,৫১৬)+

২ জাপান (২·৭)= ১·৪২ ভারতবর্ষ (১·৯)

প্রথম সমীকরণ হইল শুধু রেলপথের দৈর্ঘ্যের তুলনার ফল। ইহা হইতে এইটুকু শুধু বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ। কিন্তু দুই দেশের এফিসেন্সি বা সম্পদ্ সম্বন্ধে ইহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে ত আসা যায়ই না, পরন্তু সে বিষয়ে ভুল হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক কাজের সমীকরণ হইল দ্বিতীয় সমীকরণটি। জাপানীর সহিত ভারতীয়ের তুলনা করিলে জাপানী যে সমৃদ্ধতর তা এই সমীকরণের দ্বারা বুঝা যায়।

জাপানের স্থান বিশেষ উঁচু নয়। তথাপি আজ জাপানের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছানো ভারতের পক্ষে সহজসাধ্য সম্ভাবনার বাহিরে। বর্তমান সময়ে যেরূপ গতিতে ভারতীয় রেলের বিস্তার হইতেছে, সেইরূপ গতিতে হইতে থাকিলে ৬২,০৭৪ কিলো দৈর্ঘ্য ৮৭,১৪৫ কিলো দৈর্ঘ্যে পরিণত হইতে অনেক সময় লাগিবে। ১৯২৭-২৮ সনে ৭০০ মাইল অর্থাৎ ১১২০ কিলোমিটার নূতন রেলপথ তৈরী হয়। আর ৩,৬২০ মাইল বা ৫৮০৮ কিলোমিটার পথের নির্মাণ-কার্য্য চলিতেছিল। ভারতের রেলপথের বর্তমান প্রসারের বার্ত্তা নীচের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

১৯১৩ ৫৫,৭৭৪ কিলো

১৯২৮ ৬৩,২১২ „

এই তালিকা হইতে আমরা রেলওয়ে বিস্তার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সমীকরণ তৈরী করিতে পারি :

ভারত (১৯২৭)—১·১৩ (১৯১৩)

১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে যে ভারতে রেল-বিস্তার ঘটিয়াছে, তা কেউ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু জাপানের রেল শিল্পনিষ্ঠার কাছাকাছি পৌঁছাইতে হইলে এই মন্থরগতি থাকিলে চলিবে না। ঐ সময়ে জাপানী উন্নতির হার নিম্নরূপ হইয়াছে :

জাপান (১৮,৭৫৯ কিলো) ১৯২৭=১·৭৬ জাপান (১০,৬১০ কিলো) ১৯১৩

ভারতের উন্নতির দৌড় (১·১৩) জাপানের উন্নতির দৌড়ের (১·৭৬) চেয়ে কম। আর পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে যে, জাপান (১৯২৮)=১·৪২ ভারত (১৯২৮)। সুতরাং রেল-সম্পদে ভারতকে জাপানের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইলে ভারতীয় শিল্পোন্নতি-কামীদের কতখানি কাঠখড় পোড়াইতে হইবে সহজেই অনুমেয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, জাপান ইতিমধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না।

ভারতের দারিদ্র্য বা পশ্চাৎপদতা বুঝিবার জন্য টন-কিলোমিটার বা যাত্রী-কিলোমিটার সম্পর্কে তুলনামূলক সংখ্যা বিজ্ঞানের সমীকরণ তর্কাবলী প্রয়োগ করিলেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইবে। এখানেও জাপানের সঙ্গেই তুলনা করা যাক্।

১৯২৭ সনের অঙ্কমতে, ভারতবর্ষ (৩৫,৮১০,০০০,০০০ টন-কিলো)=২·৭ জাপান (১২,৪৫৫,০০০,০০০ টন-কিলো)

অর্থাৎ ভারতবর্ষের রেলওয়েতে জাপানের রেলওয়ের চেয়ে ২·৭ গুণ মাল বাহিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ, লোকসংখ্যাও বিপুল, সুতরাং এইরূপ মাল যাতায়াতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কিন্তু মাথাপিছু মূল্য ধরিলে সমীকরণটা কি দাঁড়ায় ?

১৯২৭ সনে ভারতের অনুমিত লোক-সংখ্যা ৩৩১,৫০০,০০০ ও জাপানের ৬১,২৭৫,০০০। সুতরাং মাথাপিছু ভারতীয় রেলওয়েতে বাহিত হইয়াছে ১০৮ টন-কিলো, আর জাপানী রেলওয়েতে ২০৩ টন-কিলো। অর্থাৎ রেলওয়ে টন-কিলোমিটার দ্বারা নির্দ্দেশিত ধনবাদিত্ব

জাপান (২০৩)=১·৮ ভারত (২০৮)

সুতরাং প্রত্যেক জাপানী প্রত্যেক ভারতীয়ের চেয়ে ১৮ গুণ বেশী শক্তিশালী। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের সম্পর্কটাও করিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে তুলনামূলক রেলওয়ে অর্থতত্ত্বের জন্য দুই ধরণের সমীকরণ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথমটি নিম্নলিখিত কর্ম্মূলা দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

"ক" দেশ (১৯৩০)=শ. "খ" দেশ (১৯৩০)

কোন বিশেষ সময়ে মাথাপিছু অথবা প্রতি বর্গ মাইল মূল্য হিসাবে এক আর্থিক আয়তন অন্য আয়তন হইতে শ গুণ বেশী প্রস্তুত, পটু অথবা কার্য্যকরী।

দ্বিতীয়টির কর্ম্মূলা নিম্নরূপ :

ক (১৯৩০)=শ. ক (১৯১০)

একই দেশের উন্নতির সূচী সংখ্যা দুই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রসারের হার অর্থাৎ অন্তর্গত + বা—, এই প্রকার সমীকরণের প্রতিপাদ্য।

তুলনামূলক শিল্প-নিষ্ঠার তৃতীয় এক প্রকার সমীকরণ হইতে পারে। ইহাতে দুই বিভিন্ন জনপদের দুই বিভিন্ন সময়কার অবস্থা নিম্নলিখিত কর্ম্মূলা দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে :

ক (১৯৩০)=খ (১৯০৪)

—গ (১৮৮৫)

এইরূপে রেলওয়ে পটুতা সম্পর্কে দেখা যাইবে যে, ১৯১৩ সনে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে জাপানের ১০,৬১০ কিলোমিটার রেলওয়ে যাইল পথ ছিল। সে সময়ে জাপানের লোক-সংখ্যা ছিল ৫৩,৫৬০,০০০। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০,০০০ জাপানীর জন্য রেল ছিল ১·৯ কিলোমিটার। ইহা হইতে নিম্নরূপ সমীকরণ পাই :

ভারত (১৯২৮) ১·৯=জাপান (১৯১৩) ১·৯

অর্থাৎ ১৯২৫ সনের রেল-ভারত ১৯১০ সনের রেল-জাপানের তুল্যমূল্য ছিল। অন্য কথায়, ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষ জাপানের চেয়ে ১২।১৩ বৎসর পশ্চাতে ছিল।

জার্মাণি অথবা ফ্রান্সের তুলনায় রেল ভারত অন্ততঃ ৫০ বৎসর পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। এই হিসাবে ভারতে বলিতে গেলে এখনো রেলওয়ে যুগ আরম্ভ হয় নাই। আমরা একণে দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব ও বিশ্ব অর্থনীতির দুনিয়ার বাস করিতেছি। এই যুগে ভারতের রেল শিল্প ও অন্যান্য শিল্প "আদিম"তা ঘাপিতে হইলে তৃতীয় প্রকার সমীকরণ বিশেষ কাজের। এই সকল সমীকরণ অবশ্য খুব সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাদের ব্যবহারের একটা সীমা আছে। ক (১৯৩০)=খ (১৯০৪) ইত্যাদি ধরণের সমীকরণ বিভিন্ন দেশের শিল্প সম্বন্ধটা ত বুঝাইবেই, অধিকন্তু এইরূপ কার্য্যকরী ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে যে এর "পরের বাপ" বা "উচ্চতম সীমা" কি হইতে পারে, কোন্ লক্ষ্য অভিমুখে কি প্রকার আর্থিক নীতি অবলম্বন করিলে ভারত সত্য সত্য অগ্রসর হইতে পারিবে।

ভারতের সহিত আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের একাল ও সেকাল*

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ, পি এইচ, ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লড়াইয়ের পর থেকে ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯০১ সন হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসর কাল ভারতে আমেরিকান বাণিজ্যের ঝোঁক ছিল গড়ে ৫·৮%, পক্ষান্তরে বিলাত ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের ৪০% এর ভাগীদার। ১৯২৭-২৮ সনে আমেরিকার হিস্সা দাঁড়াইয়াছে ৯·৯% এবং বিলাতের হিস্সা নামিয়াছে ৩৪·৯%এ। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আমেরিকার স্থান এখন দ্বিতীয়। আর একটী মজার ব্যাপার এই যে, বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে নেপোলিয়ানের লড়াইয়ের আমলে আমেরিকার স্থান ঠিক এইরূপই ছিল। ১৮০২-৩ সন হইতে ১৮০৭-৮ সন পর্য্যন্ত বিলাত, আমেরিকা এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের হিস্সা ছিল যথাক্রমে ৬১%, ২১% এবং ১২%।

ইন্দো-আমেরিকান্ বাণিজ্যের আদিযুগ

ভারতের সঙ্গে মার্কিণের ব্যবসা বাণিজ্য সুরু হয় ১৭৮৫ সনে। আমেরিকার স্বাধীনতার লড়াইয়ের আমলে ভারত হইতে আমেরিকায় মালপত্র রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮৩ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ভার্সাইয়ের সন্ধির পর এই ব্যবস্থা রদ হইয়া যায়। ১৭৮৪ সনে ভারতের পণ্ডিচেরি বন্দরে প্রথম আমেরিকান জাহাজ উপস্থিত হয়। জাহাজখানি চীনদেশে যাইতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতেই থামিয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে আমেরিকান জাহাজের প্রথম আগমন হয় ১৭৮৫ সনে। জাহাজখানির নাম 'হাইফ্লা'। রোড আইল্যাণ্ড হইতে কেপ্ অব্ গুড্ হোপ্ অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিয়া জাহাজখানি হুগলী নদীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমেরিকা হইতে হুগলী নদী পৌঁছিতে জাহাজখানির ৪ মাস সময় লাগে। জাহাজখানি করাসী পতাকা উড়াইলে তবে উহা হইতে কলিকাতা বন্দরে মাল নামাইতে দেওয়া হয়। 'হাইফ্লা'র পর ক্রমে আরো অনেক মার্কিণ জাহাজ কলিকাতায় আসিতে থাকে। সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য মার্কিণ জাহাজগুলিকে অন্যান্য বিদেশী জাহাজের সমান

* শ্রীঅন্নদানাথ সরকার, এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

সুবিধা ও অধিকার প্রদান করা হয়। তবে বিলাতী জাহাজের সমান অধিকার মার্কিণ জাহাজগুলি পাইত না। মার্কিণ জাহাজগুলিকে কলিকাতায় তখন 'পাইলটেজ্' খরচা বহন করিতে হইত। ১৭৯৪ সনে বিলাত এবং মার্কিণের মধ্যে যে বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত হয় তাহাতে মার্কিণ জাহাজগুলি বিলাতী জাহাজের সমকক্ষতা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমদানি শুল্ক সম্বন্ধে আমেরিকানগণ বিলাত-বাসীরই মত পক্ষপাত ভোগ করিবার অধিকারী হয়। এই সন্ধিপত্রের নাম 'জে সন্ধি'।

সন্ধির ফলাফল

এই সন্ধির ফলে ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকার সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ আমেরিকানগণ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতে মালপত্র ভারতবর্ষে রপ্তানি করিতে পারিবে না, এ সম্বন্ধে মোলযোগ উপস্থিত হয়। এই ধরণের বাণিজ্য ধনবিজ্ঞানের ভাষায় 'সার্কিটাস্' বাণিজ্য নামে অভিহিত। বিলাতের বিচারালয়ে এ সম্বন্ধে একটি বড় মোকদ্দমায় আমেরিকানরা জয়লাভ করে। আমেরিকান-গণ ভারতবর্ষের সহিত 'সার্কিটাস্' ব্যবসা চালাইবার অধিকার পায়। তবে ভারতবর্ষ হইতে মাল আমদানি করিতে হইলে আমেরিকানদিগকে ভারতবর্ষের বন্দর হইতে একেবারে সোজা আমেরিকান বন্দরে পাড়ি দিতে হইবে।

এই সার্কিটাস্ বাণিজ্যের অধিকার পাওয়ায় আমে-রিকার কম লাভ হয় নাই। এই অধিকার না পাইলে আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে আরও অনেক সময় লাগিত। কারণ তখন পর্য্যন্ত আমেরিকা মাত্র কৃষিপ্রধান দেশই ছিল। সামান্য সামান্য শিল্পদ্রব্য যাহা প্রস্তুত হইত তাহা আদৌ ভারতীয় বাজারের উপযোগী ছিল না। ১৭৮৯ সনে স্বয়ং মহামতি হ্যামিলটন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত সনে কলকারখানায় মোতায়েন মজুরের সংখ্যা ছিল কৃষিকার্য্যে মোতায়েন লোকজনের মাত্র এক-অষ্টমাংশ। আমেরিকায় তখন কলকারখানা-যুগের নব উন্মেষের সময়। ১৭৮৭ সনে আমেরিকায় প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। সরকারী খাজাঞ্চিখানা হইতে এই কারখানাকে অর্থ-সাহায্যও করা হয়; তবুও এটা ফেল মারে। আমেরিকায় তখন যে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল তা ম্যাঞ্চেষ্টারের তুলনায় অত্যন্ত মোটাই হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় ম্যাঞ্চেষ্টারেও ছিল বহুৎ পেছনে।

ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর আমেরিকার প্রথমেই ঝোঁক পড়ে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর। ১৮১৯-২০ সন পর্য্যন্ত আমেরিকায় ভারত হইতে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপড়ই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। কিছুদিন পরে ভারতীয় চিনি প্রাধান্য লাভ করে। পরে নীল আবার চিনির স্থান গ্রহণ করে। ভারত হইতে আমেরিকায় মাল আমদানি ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। আমেরিকাই যে সমস্ত মাল গ্রহণ করিত তাহা নহে। আমেরিকা হইতে ভারতীয় মালপত্র ইয়োরোপে পুনঃ রপ্তানি হইত। ১৮০৬-৭ সন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিতে থাকে। এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত বিলাতের আবার লড়াই বাধায় আমেরিকা হইতে ইয়োরোপে ভারতীয় মাল পত্র পুনরায় রপ্তানির পথে বাধা উপস্থিত হয়।

মার্কিণ লিপিংএর জন্ম কথা.

ইঙ্গ-ফরাসী লড়াইয়ে হল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত যোগদান করে। সুতরাং ফ্রান্সের এবং হল্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। ভারতের সহিত পর্ত্তুগাল এবং ডেনমার্কের বাণিজ্য ১৮০৬ সন হইতে ১৮০৮ সন পর্য্যন্ত চলে। ক্রমে এই দুই দেশের সঙ্গেও ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধে। এইরূপে দুনিয়ার জাহাজী ব্যবসার একটা মোটা অংশ মার্কিণের হস্তগত হইয়া পড়ে। মার্কিণের টনেজের পরিমাণ ১৭৮৯ সনে ছিল ১০০,০০০ টনের কিছু বেশী। ১৭৯৪ সনে টনেজের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০,০০০ টন এবং ১৮১০ সনে ৯০০,০০০ টন।

চালানি ব্যবসায়ে আমেরিকা এত মোটা লাভ করিতে থাকে যে, আমেরিকা ভারতীয় মাল সোজা স্বদেশে আনয়ন করিয়া ইয়োরোপে পাঠাইতে থাকে। ১৮০২ সনে ইঙ্গ-আমেরিকার মোট বাণিজ্যের (আমদানি রপ্তানি) পরিমাণ

হাজার ১০৮,৩১,২১৮ সিক্কা-টাকা* অর্থাৎ ১,৩৫৩,৯০২ পাঃ। ১৮০৬ সনে এই বাণিজ্য দ্বিগুণ বাড়িয়া হয় ২১৮,৬৪,৩০৩ সিক্কা টাকা অর্থাৎ ২,৭৩৩,০৩৮ পাউণ্ড।

নিম্নের তালিকায় ১৮০৪ সনে মার্কিন-ভারত বাণিজ্যের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

১৮০৪ সনে ভারতে আমেরিকান দ্রব্য আমদানি

	সিক্কা টাকা
মদ	১১,৭৭,৬৫০
সাইডার	৩৩২
কফি	৩,৮৯৩
আধারের ঘড়ি	১,৭৮০
ধাতু দ্রব্য	১,৪৪,০৪৯
কাঠ ও তক্তা	৩৯,৮০০
মদলা	৫৫,৬৮৭
অফেলম্যান্‌স্ ষ্টোর্স	১৪,২৯৯
কাপড়-চোপড়	২৫,০১৬
বনাত	২,৬০০
বিবিধ মাল	১,১৮,৮২৬
মোট বাণিজ্য আমদানি	১৫,৮৪,০৭৭
সোনারূপা	৭১,০৪,২৮২
মোট সোনারূপা ও পণ্য	৮৬,৮৮,৩৫৯

১৮০৪ সনে আমেরিকায় ভারতীয় দ্রব্য রপ্তানি

	সিক্কা-টাকা
কাপড় চোপড়	৮০,৪৩,৫৭৬
চিনি	১১,৬৯,২৬১
নীল	২,১৩,৮৯০
তুলা	১,১৮,৫৯২
কর্পূর	৬,৪১৬
আদা	১৩,৫১১
বীজ	১,০০০
পশ, ফ্লানেল ও সুতলি ঘড়ি	১৩,০৫১
ক্যানভাস্ ও চট	২২,৮১০
বিবিধ মাল	২৫,০৩৭
মোট পণ্য দ্রব্য রপ্তানি	৭৬,২৭,১৪৪
পুনঃ রপ্তানি	৮৮,০৬৭
মোট রপ্তানি	৭৭,১৫,২১১
সোনারূপা রপ্তানি	শূন্য
মোট সোনারূপা ও পণ্য দ্রব্য রপ্তানি	৭৭,১৫,২১১

ইঙ্গ-আমেরিকান্ বাণিজ্যে বাঙ্গালার হিস্সাই সব চেয়ে বেশী

গোটা ভারতের মধ্যে বাঙ্গালার সহিতই আমেরিকার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বেশী। নিম্নের তালিকা হইতে বিষয়টী পরিষ্কার বোঝা যাইবে :—

৬ বৎসরে (১৮০২-৭) আমেরিকা হইতে (সোনা রূপা ও পণ্য দ্রব্য) আমদানি :—

	সিক্কা টাকা
বাঙ্গালা	৩৬৪,৮১,৯৩১
মাদ্রাজ	৪৪,৭০,১২২
বোম্বে ও সুরাট	৮,৭৩,০৯১
মোট আমদানি	৪৪৯,২৫,১৪৪

৬ বৎসরে (১৮০২-৭) আমেরিকায় (সোনারূপা ও পণ্য দ্রব্য) রপ্তানি :—

	সিক্কা-টাকা
বাঙ্গালা	৩৭৩,৮৫,৮০৬
মাদ্রাজ	৩৫,৯৩,০৩৪
বোম্বে ও সুরাট	৬,৮২,১৫০
মোট রপ্তানি	৪১৫,৬১,৭৯০

* ১০০ সিক্কা-টাকা চল্‌তি ১১৬ টাকার সমান।

এই আমদানি বাণিজ্যের মধ্যে স্বর্ণরৌপ্যের পরিমাণ ৩৯১,৬৯,৫০০ সিক্কা টাকা এবং অন্যান্য মালপত্র ধরিয়া ৫৭,৫৫,৬৫৪ সিক্কা টাকা। রপ্তানির মধ্যে মালপত্রই প্রধান। ৬ বৎসরের মধ্যে মোট ৪১৫,১১,৭৯০ সিক্কা টাকা মূল্যের পণ্য দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য রপ্তানির মূল্য মাত্র ১৫৪,১৭৬ সিক্কা-টাকা। বলাবাহুল্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাল আমেরিকায় জাহাজ-বোঝাই হইয়া চালান যাইত। নিম্নে কলিকাতা বন্দর হইতে আমেরিকায় মাল চালানের একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

৩১শে যে যে বর্ষ শেষ হইয়াছে	বস্ত্র সিক্কা টাকা	নীল সিক্কা টাকা	চিনি সিক্কা টাকা	বিবিধ মালপত্র সিক্কা টাকা	মোট সিক্কা টাকা ৯
১৭৯৬-৯৭	২০,৭৭,৮৮৮	৫০	৩,৩৪,২৮৪	১,৪৮,০৮৫	২৫,৮০,০০৪
১৭৯৭-৯৮	১৪,৩৮,৬৬৭	শূন্য	৪,১৯,৮০৩	৬৭,১০২	২০,২৯,৪০২
১৭৯৮-৯৯	৮,৩০,৩৪৯		১,৭০,৮৬০	১,৬১,৮৪৮	১১,৬০,১৭৭
১৭৯৯-১০০	২৮,৪৪,৩৩০		৬,৪৯,৩৪০	২,৮২,২৬৪	৫৭,৮৫,৯৩৭
১৮০০-১	৫১,৩৬,৩৬৪		৪,৫০,৪১৩	৩,১৯,৮৫৬	৬১,০৬,৭০০
১৮০১-২	৪১,৫২,২৪৪		৩,১০,৩৭৯	১,০৯,২০৫	৪৫,৬৫,৮২৮
১৮০২-৩	৫০,২১,৯৪০	৬৬,২৪৬	৫,০৪,৫৯৪	৫,১৭,১১২	৪৯,০৯,৯০৫
১৮০৩-৪	৫৪,৫০,৮০৫	৩২,৭১৬	৮,৫০,৩১৩	৪,২২,১৯২	৬৭,৬০,০৪৬
১৮০৪-৫	২৪,৮৯,৫৯৯	৭৭,৫৮৬	৬,৫৩,৩৩২	১,২৪,২৭৬	৩২,৪৪,৫৯০
১৮০৫-৬	৪৭,৬৩,১০২	২,১৩,৮৯০	১১,৬৯,২৬১	১,৩১,১৭২	৬২,৭৮,০৫৪
মোট	৩৩৩,০৫,৪৬২	৩,৯১,২৯৮	৫৭,২৫,৭০৯	২০,৭৭,৭৭২	৪১৫,০০,১৯১

ভারতে আমেরিকান পণ্য আমদানির মধ্যে সোনা-রূপা সর্ব্বপ্রধান

পূর্ব্বে আমেরিকায় ভারতবর্ষে রপ্তানির যোগ্য কোন মালপত্র উৎপন্ন হইত না। এই জন্য ইণ্ডো-আমেরিকান ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির অভাব লক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। ইয়োরোপের দেশগুলি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মালপত্র ভারতবর্ষে পাঠাইত। আমেরিকা মালপত্রের অভাব সোনারূপা দ্বারা পোষাইয়া লইত। ১৮০২-৩ সন হইতে ১৮০৭-৮ সন পর্য্যন্ত ভারতে আমেরিকান সোনারূপা আমদানি আমেরিকান্ পণ্য দ্রব্য আমদানির চেয়ে ৭ গুণ বেশী দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ইয়োরোপের দেশগুলির (বিলাত ছাড়া) পণ্য রপ্তানির তুলনায় সোনারূপা রপ্তানির অনুপাত দাঁড়ায় ১:২।

সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকায় মার্কেন্টালিজ্‌ম্ নীতি আর অনুসৃত হইত না। আমেরিকানদের মধ্যে তখন মিলেস বা ব্যালিজেস এর মত বুলিয়নিষ্ট কেহ ছিল না; সুতরাং ভারতে বুলিয়ন রপ্তানির পথে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের পর আমেরিকায় মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগী ধাতুনিচয়ের ক্রমাগতই অভাব বোধ হইতে লাগিল; সুতরাং আমেরিকার পক্ষে বহুল পরিমাণে মূল্যবান ধাতু রপ্তানি করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ভারতে সোনারূপা পাঠান বন্ধ করিতে হইবে অথচ ভারতীয় মালপত্র খরিদ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পুঁজিরও সংস্থান করা চাই, এ সম্বন্ধে আমেরিকা নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে।

ভারতীয় বাণিজ্যে আমেরিকার পোয়াবারো

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে

অধিকাংশ দ্রব্য সোনারূপার বিনিময়ে গ্রহণ করিত। এ সত্ত্বেও কিন্তু আমেরিকা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভবান হইত। ১৭৯৮-৯৭ সনে বাঙ্গালার আমদানি রপ্তানির বিবরণীতে প্রকাশ, "একখানি আমেরিকান জাহাজ যদি ডলার-বোঝাই হইয়া আসে তাহা হইলে সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়াও ৩০% লাভ থাকে। জাহাজকে কর্জ্জ গ্রহণের জন্য অবশ্য বৎসরে ৭% সুদ যোগাইতে হয়। ১৪ মাসের মধ্যে এই লাভ পাওয়া যায়।

ইউরোপে লড়াই বাধিবার জন্যই আমেরিকা এইরূপ লাভ করিবার অবসর পায়। যুযুধান ইয়োরোপীয় দেশগুলির মত আমেরিকাকে উচ্চহারে শুল্ক, ভাড়া এবং বীমার অর্থ যোগাইতে হইত না। পক্ষান্তরে আমেরিকা ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির বন্দরে অবাধে গমন করিত। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং অন্যান্য বিলাতী সওদাগরদের তখন এই সমস্ত দেশে প্রবেশ নিষেধ। আমেরিকানগণ অত্যন্ত হিসাব করিয়া ব্যবসা পরিচালন করিত। সাফল্য লাভের ইহাও একটী কারণ বটে। আমেরিকানদের খরচপত্র কম হইবার কারণ এই যে, ইয়োরোপীয়ান ব্যবসায়ী মহলের মত ইহাদের স্বজাতি-প্রীতি বা শাদা চামড়া-প্রীতি অন্ততঃপক্ষে ব্যবসা-ক্ষেত্রে ছিল না। ইহারা অবাধে ভারতীয় ব্যবসায়ীর, দালাল প্রভৃতির দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইত। খরচপত্র কমিবার ইহাও একটী মস্ত বড় কারণ। এই সম্পর্কে রাঘবদাস দে নামক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম করা যাইতে পারে। ইনি মাসিক ৩৲ বেতনের কেরাণী হইতে ব্যবসা বাণিজ্যের কল্যাণে মৃত্যুকালে ৪০০,০০০ পাঃ মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যান।

আমেরিকার শুড়ে বালি

আমেরিকা কিন্তু তাহার এই সস্তা বাণিজ্যনীতির সুফল বেশীদিন ধরিয়া ভোগ করিতে পারে নাই। ১৮০৬ এবং ১৮০৭ সনে বিলাত এবং ফ্রান্স পরস্পরের মধ্যে যে অবরোধনীতি ঘোষণা করে তাহাতে ইঙ্গো-আমেরিকান বাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। আমেরিকা কিন্তু আশা করিতে থাকে যে, লড়াইয়ের মাল বদলা চালান বন্ধ করিলে বিলাত এবং ফ্রান্স নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। এই উদ্দেশ্যে মার্কিণ আপন বন্দরগুলিতে মালপত্র রপ্তানি সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি করিতে থাকে। প্রেসিডেন্টের নিকট লাইসেন্স না লইলে কাহারই মালপত্র চালান দেওয়ার উপায় রহিল না। ইয়োরোপ কিন্তু তাহার অবরোধনীতি ত্যাগ করিল না। ১৮০৯ সনে আমেরিকা বিলাত, ফ্রান্স এবং উহাদের মিত্রগণের সহিত সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলে। ইহার ফলে ইঙ্গো-আমেরিকান বাণিজ্য তাঁটা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই ব্যবসা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কারণ ১৮১২ সন হইতে ১৮১৪ সন পর্য্যন্ত আমেরিকা বিলাতের সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। ১৮১৪ সনের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে দুই দেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। পর বৎসরে সমগ্র ইয়োরোপে শান্তি স্থাপিত হয়।

লড়াইয়ের পর ব্যবসার হালচাল

শান্তি-স্থাপনের পর পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে আমেরিকাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করে। ব্যবসা বাণিজ্যের হালচাল কিন্তু একই ভাবে চলিতে থাকে। সোনারূপাই আমেরিকান রপ্তানি বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রয় বটে, কিন্তু লণ্ডন-সরেরের-দস্ত বিলগুলিও কলিকাতায় বেশ কাটিতে থাকে। কলিকাতায় এইরূপ বিল-বিনিময় চলে বৎসরে ৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের। আমেরিকানগণ এই বিলগুলির পরিবর্ত্তে আপন সওদা করিয়া লইতে থাকে।

কিন্তু একটী বিষয়ে একটী বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই সময়ে ভারতের বস্ত্র আর আমেরিকায় সেরূপ রপ্তানি হইত না। ভারতীয় বস্ত্রের স্থান ক্রমে বিলাতী এবং মার্কিণ কাপড় অধিকার করিয়া লয়। বিলাতের সহিত লড়াইয়ের সময় আমেরিকায় তুলাশিল্পের বহুল প্রচার হইয়া যায়। ১৮০৮ সনে আমেরিকায় ১৫টী কটন মিল আর ৮০০০ স্পিণ্ডল (টেকো) ছিল; ১৮১৫ সনে স্পিণ্ডল সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩০,০০০টী এবং ১৮৩০ সনে দাঁড়ায় ১,২৪৮,০০০টী।

কারখানায় মালপত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

তুলাজাত দ্রব্যও সস্তা হইয়া পড়ে। ১৮১৫ সনে তাঁতীদের দ্বারা প্রস্তুত সাধারণ ব্যবহারের যে কাপড়ের দর ছিল ৪০ সেন্ট গজ, ১৮৩০ সনে সেই কাপড়ের দর দাঁড়ায় কি গজ ৮ সেন্ট মাত্র। সুতরাং আমেরিকায় ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা কমিয়া যায়। অন্য পক্ষে আমেরিকাই আবার উদ্বৃত্ত বিলাতী কাপড় ভারতবর্ষে রপ্তানি করিতে থাকে। যুদ্ধের অবসানে আমেরিকার বাজার দখল করিয়া বসিবার জন্য বিলাত পাগলের পাগলের এই সমস্ত কাপড় আমেরিকায় চালান দিয়াছিল।

এই সময়ে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় মালপত্রের মধ্যে নীল, রেশম এবং সোরা প্রাধান্য লাভ করে। ১৮১৮-১৯ সনে এই বাণিজ্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়; কিন্তু এই সনের পরই তাঁটা পড়িতে থাকে।

ভারত-আমেরিকান বাণিজ্যের অধোগতি ও তাহার কারণ

দুইটী কারণে ইংলো-আমেরিকান বাণিজ্যের অধোগতির সূচনা। প্রথমতঃ ১৮১৮-১৯ সনের আমেরিকার দারুণ ব্যবসা-বিপ্লব; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার নিজস্ব শিল্পোন্নতি। ইঙ্গ-আমেরিকান লড়াইয়ের সময়েই এই শিল্পোন্নতির গোড়া-পত্তন হয়। শিল্পোন্নতির যুগে ক্রমশঃ আমেরিকার নজর বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া স্বদেশের শিল্প-ব্যবসার উপর পড়ে। ইয়োরোপের যেসকলিও এই সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে আমেরিকার প্রতিযোগিরূপে অবতীর্ণ হয়; ফলে আমেরিকা ভারতীয় বাণিজ্যে আর সেরূপ লাভবান হইতে পারে না। ১৮১৬ সন হইতে ১৮৪২ সন পর্য্যন্ত আমেরিকা নিজেকে উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরে সংরক্ষিত করিয়া রাখে। তাহাতেও আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যপক্ষে ভারতীয় হস্ত-শিল্পগুলি ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে; আমেরিকায় ভারতীয় খাদ্য-শস্য এবং কাঁচামালের চাহিদাও একদম কমিয়া যায়।

আমেরিকা কিন্তু ভারতীয় চটকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই (তৎকালে তাঁতে মাল প্রস্তুত হইত)। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত আমেরিকা হইতে তুলা চালান দেওয়ার সময় ভারতীয় চট দ্বারা বাঁধাই করিতে হইত। ১৮৫০-৫১ সনে ভারতবর্ষ হইতে ১,৯৭০,৭১৪ টাকা মূল্যের ৭৯০,২৯১ মণ পাট এবং ২,১৪৯,৭৮২ টাকা মূল্যের ৯,০৫,৭১৩ খানি তাঁতে প্রস্তুত থলে এবং পাটের কাপড় বিদেশে চালান যায়। ইহার মধ্যে উত্তর আমেরিকার হিস্যা ছিল ৯২৪২ মণ পাট এবং ২,২৯০,৪২৭ খানি থলে এবং চট। কিন্তু আমেরিকার এই চাহিদা ভারতের সহিত মোটা রকমের বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী দাঁড়ায়; কারণ ভাঙা সহর হইতেও এই সমস্ত জিনিস আমদানি করা যাইত। ১৮৩৫ সনে ভাঙা সহরে পাট-শিল্প প্রবর্ত্তিত হয়।

অষ্টম দশকে ব্যবসাবাণিজ্যের গতি

বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমেরিকা শিল্পক্ষেত্রে বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সত্ত্বেও ভারতের সহিত আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য সেরূপ বাধা জন্মিতে পারে না।

নিম্নের তালিকায় আমেরিকার শিল্পোন্নতির পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

সন	মজুরের সংখ্যা	কলকব্জার অশ্বশক্তি	উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য	পাইকারী দরের সূচী
১৮৬৯	২,০৫৪,০০০	২,০৪৬,০০০	১,৩৯৫,০০০,০০০	১০৫
১৮৭৯	২,৭০০,০০০	৩,৪১১,০০০	১,৯৭৩,০০০,০০০	৮৫
১৮৮৯	৪,২৫২,০০০	৫,৯০৯,০০০	৪,২১০,০০০,০০০	৮৩
১৮৯৯	৪,৭১৩,০০০	১০,০৯৮,০০০	৪,৮৩১,০০০,০০০	৭৫
১৯০৯	৬,৬১৫,০০০	১৮,৬৭৫,০০০	৮,৫২৯,০০০,০০০	৯৭
১৯১৯	৯,০০০,০০০	২৯,৪২২,০০০	২৪,৮০৯,০০০,০০০	২০৬
১৯২৫	৮,৩৮৪,০০০	৩৪,৭০৫,০০০	২৮,৭৭৫,০০০,০০০	১৫১

১৮৮৪-৮৫ সনে ভারতের সমগ্র বাণিজ্যে মার্কিণের হিস্তা ছিল মাত্র ০·০৭%। পক্ষান্তরে বিলাতের হিস্তা ঐ সনে দাঁড়ায় ৫৫·৩%। এই সময়ে ভারত হইতে প্রধানতঃ নীল, চামড়া, পাট, খলে, চট এবং শেলাক আমেরিকায় রপ্তানি হইত। তৎকালে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াই ভারতীয় পাটের খলের প্রধান বাজার ছিল। ১৮৮৪-৮৫ সনে ভারতবর্ষ হইতে ৮২৭ লক্ষ পাটের খলে বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে মার্কিণ মুলুকে যায় ২২৫ লক্ষ খলে। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৭ লক্ষ, ব্রহ্মদেশ উপনিবেশে ১৬৭ লক্ষ এবং বিলাতে ৭০ লক্ষ। এই সময়ে ভারতীয় চট বিদেশে যেরূপ রপ্তানি হইত না। ১৮৮৪-৮৫ সনে ভারতবর্ষ ১৫৩ লক্ষ গজ, চট বিদেশে রপ্তানি করে এবং ইহার অধিকাংশই মার্কিণ গ্রহণ করে। ভারতীয় চা সেই সময়ে কখনও কখনও আমেরিকায় চালান যাইত। কলিকাতার টী সিণ্ডিকেট আমেরিকায় চায়ের রেওয়াজ বাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ফলে ১৮৭৮-৭৯ সনে আমেরিকায় চা রপ্তানি ১৭,৪০৫ পাউণ্ড হইতে ১৮৮২-৮৩ সনে ৬৭৬,৫০৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বাড়তির হার অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। আমেরিকাতে প্রধানতঃ চীন এবং জাপানের চা-ই বিক্রয় হইত। ভারতীয় চা-করগণ আমেরিকার বাজার দখল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মার্কিণের বাজার চীন এবং জাপানের চায়েরই একরূপ একচেটিয়া হইয়া থাকে।

নিম্নের তালিকায় আমেরিকার চা আমদানি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশের তুলনামূলক হিসাব প্রদত্ত হইল :—

মার্কিণ দেশে চা আমদানির খতিয়ান

	১৯১০-১৪	১৯২৫	১৯২৬
		১০০০ ডলার	
আমেরিকার মোট চা আমদানি	১৬,৭০২	৫১,৪৪৪	৩১০৪৯
বিলাত হইতে	৩,১৮০	৯,৩০৪	৮,১১৩
চীন হইতে	২,৮৯৮	২,৪৮৪	৩,০১৬
জাপান হইতে	৭,৯৪৭	৬,৪৪৬	৬,৮৯৮
বৃটিশ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে			

পঁচিশ বৎসর আগে খনিজ তৈলই ভারতে মার্কিণ আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বচেয়ে সেরা ছিল। বর্ত্তমানেও এই তৈলই এদেশে মার্কিণের প্রধান রপ্তানি চিজ্। এই খনিজ তৈলের মধ্যে আবার কেরোসিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৮৭৮-৭৯ সনে মার্কিণ হইতে ভারতে খনিজ তৈল আমদানি হয় ৩০ লাখ গ্যালন; দাম ২১ লাখ টাকা। ১৮৮২-৮৩ সনে আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি গ্যালন, দাম ৮৮·৯ লাখ টাকা। এই সনে ভারতে মোট মার্কিণ চিজ্ আমদানির মূল্য ৯৩·৪ লাখ টাকা; অর্থাৎ খনিজ তৈলের হিস্তা মোট মার্কিণ [illegible] আমদানির ৯৫%।

রুশ তৈলে প্রতিযোগিতা

আমেরিকান খনিজ তৈল বেশীদিন ধরিয়া ভারতীয় ভূমিতে একাধিপত্য করিতে পারিল না। ১৮৮৬-৮৭ সনে রুশদেশ হইতে অল্প পরিমাণে কেরোসিন তৈল ভারত ভূমিতে প্রথম পদার্পণ করে। রুশিয়ার তৈল নিকৃষ্ট ধরণের হইলেও দামে অত্যন্ত সস্তা; রুশ দেশ আমেরিকার চেয়ে ভারতের নিকটতর বলিয়া তথাকার তৈল সস্তা দাঁড়ায়। ভারতীয় জনসাধারণ সস্তা রুশিয়ান তৈলের খুব পক্ষপাতী হইয়া উঠে। ফলে আমেরিকান কেরোসিন রপ্তানি খুব কমিয়া যায়। কেবল মাত্র ইয়োরোপীয়ান এবং ধনবান ভারতবাসীদের জন্য অল্প পরিমাণে আমেরিকান তৈল আসিতে থাকে।

নিম্নের তালিকায় ভারতে কেরোসিন তৈল আমদানির ১৯০১-২ সন হইতে ৫ বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল (১০০০ গ্যালনে হিসাব) :—

	১৯০১-২		১৯০৩-৪	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬
রুশিয়া	৮৪,৪৭৮		৫৭,৩২০	৪০,০০৪	১,৬১৭
মার্কিণ	৫,১৬৮		৬,৭২২	৭,৪৭৭	২২,০০২
বেলজিয়া			২,৩৭২	৯,২৮১	৪,১২৩
ফ্রেঞ্চ উপনিবেশ		৫২২	৩,৭৮৩	১১,৯৬৯	১০,৫৯১
সুমাত্রা		২৮৬	১,০৪৮	৫,৯৪৩	৫,৪০১
অন্যান্য দেশ		২৮৯	১৪	১,২১৬	১৫
বিদেশের মোট		৮১,৪৫১	৭১,৫৫৯	৭৬,১৯০	৫০,৯৪৯
বর্ম্মা হইতে আমদানি		১৭,৪৫০	৩৫,২০৬	৪১,৭২৯	৩৭,১৬০

রুশিয়ান প্রতিযোগিতায় আমেরিকার কেরোসিন, অর্থাৎ প্রধান রপ্তানি বস্তু এইরূপে ভারতের বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গোটা আমদানি-বাণিজ্যই হ্রাস হইবার উপক্রম হয়।

নিম্নের তালিকায় ১৮৯৮-৯৯ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ইংরেজ-আমেরিকান বাণিজ্যের পরিচয় দেওয়া হইল :—

সন	মার্কিণ হইতে ভারতে খনিজ তৈল আমদানির মূল্য	মার্কিণ হইতে ভারতে আমদানি দ্রব্যের মোট মূল্য	ভারত হইতে মার্কিণে রপ্তানি দ্রব্যের মোট মূল্য
১৮৯৪-৯৫	৯,৭৪৫,২২০	১১,০৬৪,৪১০	৫৮,৪২০,৯১০
১৮৯৫-৯৬	৯,৬৩৩,৭১০	১১,০৯৪,৫৮০	৫৯,১৫৮,৯৬০
১৮৯৬-৯৭	৯,০৭৩,৯১০	১৪,৬৬৯,৪৯০	৪৮,১৮৪,৯৮০
১৮৯৭-৯৮	১০,৮০৫,২০০	১৪,৩১০,১৫০	৫৮,৭৬০,৯৪০
১৮৯৮-৯৯	৯,৫৪৯,১৯০	১৩,৬২৬,৭০০	৫৩,৮৭৩,০৪০

বহির্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ১৮৯৮-৯৯ সনের বৃটিশ ভারতে সরকারী বাণিজ্য-বিবরণীতে প্রকাশ,—"আমেরিকাবাসী আর মসিনা লইতেছে না,... নীলের অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌ এবং ট্যানকরা চামড়ার চাহিদা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র খনের চাহিদা ভাল বোধ হইতেছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই বস্তুর চাহিদা দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়াছে এবং কাঁচা চামড়ার যোগান-বৃদ্ধি ট্যান করা চামড়ার চাহিদা-হ্রাসের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

বাস্তু সমিতি*

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, পি-এইচ-ডি

(১) বিলাত

বাস্তু সমিতি কাহাকে বলে

বাস্তু সমিতির (বিল্ডিং সোসাইটির) একটা অর্থ প্রথমে দেওয়া দরকার। নিজস্ব একটি বাড়ীর মালিক হইবার ইচ্ছা কাহার না আছে? অথচ বাড়ীঘর তৈরী করিতে যে খরচ পড়ে একবারে তাহা দেওয়া অনেকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া বাড়ী তৈরার করিবার বাসনা অনেকের মনেই লয় পায়। কিন্তু এমন যদি উপায় থাকিত যে, বাড়ী করিবার জন্য যত টাকা লাগে তাহা নির্দ্দিষ্ট কম সুদে ধার পাওয়া যাইতেছে এবং তারপর সমগ্র টাকা ৫, ৭, ১০, ১৫ অথবা ২০ বৎসরে সমানভাবে মাসে মাসে শোধ করিয়া দিলেই চলে, তবে নিশ্চয়ই অনেক বেশী লোক বাড়ী তৈয়ার করিতে সমর্থ হইত। বাস্তু সমিতিগুলির একটা মুখ্য কাজ লোকদের এইরূপে বাড়ী তৈরী করিতে সমর্থ করা। বস্তুত, ইংলণ্ডে বহু বাস্তু সমিতির প্রচেষ্টায় শত শত বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণত কোন পরিবারকে বাড়ীভাড়া বাবদ মাসে যত টাকা দিতে হয় সমিতির ঋণ-শোধের জন্য তার চেয়ে বড় বেশী কিছু দিতে হয় না।

সুতরাং বাস্তু সমিতির কাজ হইল যাহারা সঞ্চয় করিতে চায় ও বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিতে চায় তাহাদের সাহায্য করা। যাহারা টাকা সুদে খাটাইয়া লাভবান্ হইতে চায় এবং যাহারা বাড়ীঘর তৈরী ইত্যাদির জন্য ধার লয়, এই উভয় প্রকার লোকই একত্রে জুটিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে। ইহাদিগকে অবশ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারী শাসন মানিয়া চলিতে হয়। যাহারা সমিতির কাছে টাকা সঞ্চিত রাখিয়া সুদ পায় তাহারা হয় সভ্য-অংশীদার অথবা আমানতকারী। ইহাদের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বাড়ীঘর ক্রয় করিবার জন্য কর্জ্জ দেওয়া হয়। যাহারা টাকা খাটায় তাহাদের এক হারে সুদ দেওয়া হয়, আর যাহারা টাকা ধার লয় তাহাদের কিঞ্চিৎ উচ্চহারে দিতে হয়। এইরূপে যে অতিরিক্ত লাভ হয় তাহা হইতে সমিতির পরিচালনা খরচ, স্থায়ী মজুত (রিজার্ভ) ইত্যাদি রাখিয়া নির্ম্মাণের কার্য্য চালানো হইয়া থাকে।

এই প্রকার সমিতির সহিত ব্যাঙ্কের সাদৃশ্য থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার কাঠামো ও উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন। বাস্তু সমিতি কতকটা সমবায় প্রণালীতে কাজ করে এবং সভ্যদের হিতসাধন করা ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তাহা ছাড়া ইহা ইচ্ছা করিলেই ধার দিতে পারে না। মাত্র নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে দিতে পারে :

(১) যে কোঠাবাড়ীর নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা ক্রয় করিবার জন্য, তা কোন ব্যক্তি নিজেই ভোগ করুক বা ভাড়া খাটাক্।

(২) কোন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে অথবা বাড়ীঘর বাড়াইতে সাহায্য করিবার জন্য।

(৩) কোন বন্ধকের টাকা শোধ করিবার জন্য।

বাস্তু সমিতির প্রসারের কারণ

বিলাতে প্রায় দেড়শত বৎসর আগে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। এই দেড়শত বৎসরে সমিতি সংক্রান্ত আইনকানুনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এই প্রকার সমিতির প্রসার সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

---

* হ্যারোল্ড বেলম্যান লিখিত "দি বিল্ডিং সোসাইটি মুভমেণ্ট" নামক গ্রন্থ ভিত্তি করিয়া লিখিত।

বৎসর	সোসাইটির সংখ্যা	মোট সভ্যের সংখ্যা	বন্ধকী সম্পত্তি পাউণ্ড	মোট সম্পত্তি পাউণ্ড
১৮৯০	২৩৭৮	৬,১৫,০২৫	৪,৭৭,৬০,৪০৪	৫,১৪,৯৫,৪৮০
১৮৯৫	২৫৬৯	৬,৩১,৫৫৫	৫,৩১,১৯,৫৭১	৫,৪১,৯৮,৪৪১
১৯০০	২২৩৮	৫,৮৪,৬৫১	৪,৫৮,৪১,৪১১	৯,৯১,৬৭,১১৮
১৯০৫	১৯২০	৫,৯৮,৮২৯	৫,৩২,১১,৩১৩	৬,৯০,৯১,২৫৪
১৯১০	১৬৯০	৬,২৯,৮৮৬	৫,৯৬,৯৬,০৫৫	৭,৬২,৮৬,৭১৩
১৯১৩	১৫৫২	৬,০৯,৮০১	৬,০৭,৩৩,৪৬৪	৬,৫৩,১৫,৮৯৮
১৯১৫	১৪৫৪	৬,২৬,১৭৪	৫,২৮,৮৯,৪৮০	৬,৪৭,৫৪,৬৫৪
১৯২০	১২৭৬	৭,৪৭,৫৮৯	৬,৮৮,১১,৬৯০	৮,৭০,৬০,৩৫৮
১৯২৫	১০৮৮	১১,২৯,৪৫৫	১৪,৫৮,৫৭,১১৯	১৬,৯১,৯৬,৬৫৮
১৯২৬	১০৬৬	১২,৫৭,৪০০	১৭,১২,২০,৮১৫	১৯,৩৮,৫৮,০৩৪

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, মোট সমিতির সংখ্যা কমিয়া গেলেও অন্যান্য দিকে অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় স্থায়ী হইতে না পারিয়া কোন কোন সমিতি উঠিয়া গিয়াছে, কোন কোনটা অন্য এক বা অধিক সমিতির সহিত মিলিত হইয়াছে। সমিতিগুলির প্রসার লাভের প্রধান কারণ এই : (১) যাহারা টাকা খাটায় তাহারা যাহাতে খুব বেশী সুদ পায় তজ্জন্য চেষ্টা, (২) কর্জ্জ গ্রহণকারীদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, (৩) পরিচালনার খরচা খুব কম রাখা, এবং (৪) যথেষ্ট মৌজুত হাতে রাখা।

কার্য্যতঃ ব্যাঙ্ক সমিতি হইতে দুই শ্রেণীর লোক উপকৃত হইয়া থাকে :

(১) সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে যাহারা অল্প কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়া তাহা সমিতির কাছে সঞ্চিত রাখিতে পারে। এই টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িতে থাকে। যাহারা বেশী টাকা রাখে তাহারা ত উপকৃত হয়ই।

(২) যে সকল ব্যক্তি সমিতির নিকট ঋণ গ্রহণ করে।

ব্যাঙ্ক সমিতি দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(১) স্থায়ী (পারমানেন্ট) (২) অস্থায়ী (টারমিনেটিং)। আজকাল স্থায়ী সমিতির রেওয়াজই বেশী। নির্দ্দিষ্ট সময় বা উদ্দেশ্যের পূরণ হইলেও সমিতি শেষ হইয়া যায় না। "জামিন" হিসাবে আজকাল ব্যাঙ্কসমিতির আমানত ও অংশের আদর খুব বেশী। সমিতিগুলি অত্যন্ত নিরাপদ ও ভালভাবে পরীক্ষিত হওয়ায় লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক সমিতিতে টাকা খাটাইলে সুবিধা এই যে, এক দিকে গুণকয় (ডিপ্রিসিয়েশন) হেতু কিছু বাদ দেওয়া হয় না। অন্য দিকে টাকা সহজে ফিরিয়া পাওয়া যায়, সুদের হার ভাল এবং পুঁজি আদায়ের সুবিধা সন্তোষজনক।

টাকা খাটাইবার সুবিধা

ব্যাঙ্ক সমিতিতে যাহারা টাকা খাটাইতে চায় তাহারা যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে যাহারা অল্প টাকা খাটাইতে চায় তাহারাও বেশী টাকা খাটাইবার তুল্য সুবিধা পায়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হার ও প্রথা প্রচলিত থাকিলেও টাকা খাটানোটা সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে : অংশ ও আমানত।

আমানতকারীরা অংশীদারদের মত চড়া হারে সুদ পায় না। কিন্তু তাহাদিগকে উত্তমর্ণ হিসাবে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। যদিও সমিতি উঠিয়া যাইবার সময় আমানতকারীদের দাবী প্রথম বলিয়া স্বীকৃত হয়, সমিতি চলতি থাকা কালে তাহাদের গুরুত্ব অংশীদারের চেয়ে কম। সাধারণতঃ সমিতিগুলি আমানতী টাকার উপর ৪% হারে সুদ দিয়া থাকে। যৌথ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় এই হার তাহার চেয়ে উচ্চ বলিয়া এবং এই প্রকারে টাকা খাটানো অতিশয় নিরাপদ বলিয়া ছোট খাট মহাজনদের

কাছে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত প্রিয়। আমানত-কারী মুস্কেই সমিতির সভ্য নহে, যদিও ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ আইন না থাকিলে আমানতকারী আপনাআপনি সভ্য হইয়া যাইতে পারে।

আইন দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন সমিতি আমানত বা ঋণ হিসাবে মোট যে টাকা লইতে পারে তাহা অনাদায়ী বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, কোন সমিতিই এই শেষ সীমা অবধি ঋণ বা আমানত গ্রহণ করে না। অনেক সমিতি নিয়ম করিয়া এক-তৃতীয়াংশের বেশী গ্রহণ করা বন্ধ রাখিয়াছে। অনেকে আবার একদম আমানত গ্রহণ করে না। এই সব সমিতি আরো বেশী নিরাপদ্।

শেয়ার বা অংশ দুই প্রকারের হইয়া থাকে :

(১) সম্পূর্ণ পরিশোধিত অংশ।

(২) কিস্তিবন্দীতে পরিশোধিত অংশ।

সম্পূর্ণ পরিশোধিত অংশের যাহা দাম সেই টাকা গোড়াতে কেহ কেহ সমিতিকে এককালীন দিয়া দেয়। অনেকে বেশী টাকা এক সঙ্গে জমাইতে পারে না। ইহারা অল্পে অল্পে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিতে থাকে।

বড় বড় লণ্ডন সমিতি সমূহ অংশীদারদিগকে আয়কর-বিহীন ৪½% হইতে ৫% পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিয়া থাকে। মধ্য ও উত্তর ইংলণ্ডে ৪% হইতে ৪½% হইল স্বাভাবিক হার। কখনো কখনো ৫% পাওয়া যায়।

অনেক প্রকার পরীক্ষার পর এক্ষণে বাস্তু সমিতি আয়কর-শূন্য সুদ দিয়া থাকে। সমিতি করটা সোজাসুজি "আভ্যন্তরিক রাজস্ব বিভাগে" পাঠাইয়া দেয়। সেজন্য যাহারা সমিতিতে টাকা খাটায় তাহাদের আর আলাদা করিয়া আয়-কর দিতে হয় না। এই বন্দোবস্তের দরুণ একদিকে বাস্তু সমিতি অনেক প্রকার ঝুঁটিনাটির দায় (উত্তমর্ণ সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়া ইত্যাদি) হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। অন্যদিক্ থেকে টাকাটা সরকারী তহবিলে গিয়া পৌঁছিতেছে ও দেশের মঙ্গলের জন্য সমিতি-গুলি কাজ করিবার অবসর পাইতেছে।

কোন কোন সমিতি ৬% লভ্যাংশ দিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। কিন্তু ৬% দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতক-গুলি কঠিন সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, অধিকাংশ ব্যক্তি সেগুলি পালন করিতে সমর্থ হয় না এবং ফলে তাহাদের লাভের পরিমাণ ৬% এর অনেক কম হইয়া যায়।

বাস্তু সমিতিতে যাহারা টাকা খাটায় সুদ ও আসল আদায় করিবার বিশেষ সুবিধা তাহারা ভোগ করে ও দালালি, কমিশন, ষ্ট্যাম্প খরচা ইত্যাদি বাবদ তাহাদিগকে কিছু দিতে হয় না। কখনো কখনো পাশ বই ও মিনে-কাগুন যোগাইবার খরচ হিসাবে একটা সামান্য প্রবেশিকা টাকা লওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার খরচ আদায় করার প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। কিস্তিবন্দীতেও যাহারা অংশ ক্রয় করে তাহারা ঠিক সময়ে টাকা দিতে না পারিলে বড় আদায়ের প্রথা সাধারণের পক্ষে অপ্রীতিকর ত বটেই, তাহা ছাড়া তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সমবায়ের স্পৃহাও কমিয়া যায়। সেই জন্য বড় আদায় না করিয়া অতিরিক্ত লভ্যাংশ হারাইবার ভয় দেখানোই বেশী কার্য্যকর হইয়াছে।

কাহারা টাকা খাটাইতে পারে?

যাহারা বাড়ী কিনিতে চায় শুধু তাহারাই বাস্তু সমিতিতে টাকা খাটাইতে পারিবে, অন্যেরা পারিবে না, এমন নয়। সমিতিতে যে ব্যক্তি টাকা খাটাইতেছে তাহাকেই আবার টাকা ধার লইতে হইবে, অথবা যে ব্যক্তি টাকা ধার লইতেছে তাহাকেই টাকা খাটাইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কোন ব্যক্তি কখনো বন্ধক বিভাগের সহিত কোনপ্রকার লেনদেন না করিয়াও বাস্তু সমিতিতে টাকা রাখিবার শুধু হিসাব খুলিতে পারে। অন্যদিকে কোন ব্যক্তি বন্ধকীর সহায়তা চাহিলে, তাহাকে যে সমিতির সভ্য হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। লণ্ডনের সব চেয়ে বড় সমিতির সভ্য-সংখ্যা এক্ষণে ৬৮,৭০০। ১২,৫০০ এরও কম সভ্য ঐ সমিতির নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে।

সমিতির নিয়মাবলীতে স্পষ্ট নিষেধ না থাকিলে নাবালক অংশীদার হইতে পারে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত

সে সাবালক না হইবে ততদিন সে ভোট দিতে, সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক হইতে অথবা নিজ অংশ হস্তান্তরিত করিতে সমর্থ হয় না।

দেখা গিয়াছে যখন দুর্বৎসর বলিয়া অন্য ভাবে টাকা খাটানো তত নিরাপদ বিবেচিত হয় নাই তখন ব্যাঙ্ক সমিতিতে অনেক বেশী লোকে টাকা খাটাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে ব্যাঙ্ক সমিতিতে টাকা খাটাইলে লাভের তারতম্য ঘটে না, সকল প্রকার বিপদের মধ্যেও এই প্রকার প্রতিষ্ঠানে টাকা খাটানো নিরাপদ্ বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমাজতন্ত্রবাদী বার্ণার্ড শ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধনবিভাগের সপ্তম প্রণালী—সমানভাবে ভাগ করা

ধনবিভাগের ছয়টি প্রণালী আলোচনা করা হয়েছে। কোনটাই শ'এর মনোমত নয়, তাও দেখানো হয়েছে।

সপ্তম প্রণালী হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে সামাজিক মোট আয়টা সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া। এই প্রণালী কোন্ যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবার আমরা তাই দেখাবো।

আধুনিক সমাজে গরীব আছে, ধনীও আছে। শ চান না যে গরীব বা ধনীর ধনগত অসাম্য বজায় থাকে। বা গরীব-ধনীর বর্ত্তমান আর্থিক ভেদের অস্তিত্ব থাকে।

দারিদ্র্য তিনি পছন্দ করেন না কেন? দারিদ্র্যের যে একটা মাহাত্ম্য আছে তা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মত এই যে আধুনিক সমাজের দারিদ্র্যের মধ্যে মাহাত্ম্যের কিছু নেই, বরং এটা মানুষকে অধঃপতির গর্ত্তে টেনে নিয়ে যায়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যারা দারিদ্র্যের জন্যই অবনত, তারা নিজেরাই অনেক সময়ে নিজেদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে সচেতন নয়, বা উন্নতির জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখায় না।

দারিদ্র্যের জন্য গরীবরা রোগে ভোগে, অনেক সময়ে চুরি ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, অভাবের চাপে তাদের আচার-ব্যবহারেও কদর্য্যতা প্রবেশ করে।

ধনীরা গরীবের কাছ থেকে দূরে থাকে, ভাবে যে গরীবরা দূরে থাকলে দারিদ্র্যের কুফল তাদের গা ঘেঁসতে পারবে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। গরীবদের মধ্যে যদি রোগের আবির্ভাব হয়, তা ধনীদের পাড়ায় ছড়িয়ে প'ড়তে বেশী দেরী লাগে না। গরীবরা যদি চুরি-জুয়াচুরি খুনো-খুনিতে রত হয়, তার ফলে ধনীদের সন্ত্রস্ত থাকতে হয় ও কড়া পাহারার বন্দোবস্ত ক'রতে হয়। গরীবদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অজ্ঞতা আদব-কায়দার অভাব, তা সংক্রামিত হ'য়ে ধনীদের ছেলেমেয়েদেরও আচার-ব্যবহারকে দূষিত ও কদর্য্য ক'রে তোলে। অভাবের তাড়নায় অনেক সময়ে গরীবের সুন্দরী মেয়ে ধনী যুবককে আকৃষ্ট করে, তার ফলে যুবকের রক্ত দূষিত হয়। তার স্ত্রী রোগে জর্জ্জরিত হয়, তার সন্তান-সন্ততিও হয়তো বিকলাঙ্গ হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্যের কুফল অনেক, আর সেগুলাকে গণ্ডী কেটে সমাজের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ রাখা কারুর সাধ্য নয়।

শ'এর মতে দারিদ্র্যের কুফল এত বেশী যে, সমাজ থেকে দারিদ্র্য একেবারে বিদূরিত করা দরকার। এলিজাবেথের সময়ে বিলাতে এই নীতি প্রচলিত হ'ল যে,

খাদ্যকে না খেতে পেয়ে ম'রতে দেওয়া হবে না। তার ফলে, গরীবদের খেতে দেবার বিরাট বন্দোবস্ত বিলাত করেছে বটে, কিন্তু এখন আমাদের বোঝা করা দরকার যে, কেবল যে আমরা মানুষকে না খেতে পেয়ে ম'রতে দেবো না তা নয়, দারিদ্র্য-অভিশাপ মানুষের জীবন থেকে একেবারে দূরীভূত ক'রবো। অনেকের অনেক দোষ থাকতে পারে। তার জন্য তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত হ'তে পারে। কিন্তু তাদের হাজার দোষই থাকুক না কেন, দারিদ্র্যরূপ দণ্ড যেন তাদের জন্য উদ্যত করা না হয়। দারিদ্র্যই যদি তাদের শাস্তি হয়, তবে তারা ত' ভুগ্‌বেই, সমাজও তার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে ঢের বেশী ভুগ্‌বে।

ধনীদের জীবনও নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয়। তাদের জীবনেও অসংখ্য যন্ত্রণা। ধনসম্পত্তির দেখাশোনা, চাকর-বাকরকে ঠিক মতো চালানো। গরীব আত্মীয়দের আপাতত সওয়া, সামাজিক পদমর্য্যাদা বজায় রাখা। বেশী ছেলেমেয়ে হ'লে তাদের ভবিষ্যতে আরামে থাকবার যথাযথ ব্যবস্থা করা—এই সব কর্ত্তব্য-ভারের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ ধনীদের দিবারাত্র ত্যক্ত বিরক্ত ক'রে তোলে। আর ধনীদের জীবনের চরম ভয় এই যে, কখন দারিদ্র্য-রাক্ষস তার নিষ্ঠুর থাবা কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে তাদের ওপর নিক্ষেপ করে।

ধনীদের মধ্যে কেউই যে জীবনে আনন্দ পায় না, তা নয়। ধনীদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা গরীবদের মতই সমাজের হিতকর কাজে খাটেন ও নিজেদের ছেলে মেয়েকে রীতিমত মানুষ ক'রতে চেষ্টা করেন। তাঁদের জীবনে আনন্দ আছে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে গরীব সাধারণের জীবনের কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। সাধারণে যেমন খাটে তাঁরাও তেমনই খাটেন। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, তাঁদের হঠাৎ অভাবে পড়বার ভয় নেই।

আর একদল ধনী আছেন, যাঁরা সর্ব্বদাই কোন না কোন আমোদ-আহ্লাদে বা হুজুগে মেতে আছেন। ঘোড়-দৌড়, থিয়েটার, কনসার্ট, ঘড়ি-ঘড়ি ফ্যাশান মাফিক পোষাক-পরিচ্ছদ বদলানো, এই নিয়েই তাঁরা থাকেন। এঁরা খাটেন খুবই, কিন্তু এঁদের খাটা হচ্ছে ফ্যাশান জগতের পরিচালকদের নির্দ্দেশমত ছুটাছুটি করা। এঁদের খাটুনিতে সত্যিকার আনন্দ নেই। সত্যিকার আনন্দ না থাকলেও তাঁরা ভাবেন যে তাঁরা আনন্দ পাচ্ছেন।

ধনী হওয়ার জন্যই অপার সুখ পান, এমন এক শ্রেণীর ধনীও আছেন। তাঁরা হচ্ছেন, কৃপণ-বিমুখ ধনীর দল। কোন কাজই তাঁরা ক'রতে চান না। কেবল সঞ্চিত অর্থের ব্যয় ও অপব্যয়ই যেন তাঁদের ধর্ম্ম।

আলস্যের মত খারাপ জিনিষ শ'এর মতে আর কিছু নেই। সেইজন্য শ অলস ধনীর দল একেবারে লোপ পাওয়াতে চান। যারা অনুক্ষণ আমোদে লিপ্ত, এমন ধনীরা সত্যই কোন সুখ পায় না, তাদের অস্তিত্বের উপরও সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষ কিছু নির্ভর করে না। প্রথমোক্ত ধনীর দল ত' গরীবেরই সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধনী হওয়ার মধ্যে গুণ কিছু নেই, দোষ অঢেল; যে টুকু গুণ দেখা যায়, তা গরীবদের মত থাকার জন্যই।

তা হ'লে গরীব হওয়া দোষের, ধনী হওয়াও ভাল নয়। মানুষের আর্থিক অবস্থা তবে কি রকম হওয়া উচিত?

মানুষ না খেতে পেয়ে বা না প'রতে পেয়ে মারা যাবে বা কষ্ট পাবে, এইটা শ চান না। সাধারণ খাওয়া, পরা ও থাকার অভাব ঘেটানো চাই। এইটাই হ'ল শ'এর মতে ন্যূনতম আর্থিক ব্যবস্থা।

উৎকৃষ্টতম ব্যবস্থাটা কি?—যতখানি উন্নতি হতে পারে, তাতে কোন আপত্তি নেই, বরং আনন্দের কথা। কল-কব্জার সভ্যতা বাড়ার জন্য আজ সাধারণ লোকের ঘরেও নানা আরামের ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে এই আরামের ব্যবস্থা বাড়বে ও বাড়ুক, অনন্তকালের জন্য অনন্ত পরিমাণেই বাড়ুক, তাতে শ'এর কোন আপত্তি নেই।

তাঁর আপত্তি এইখানে, সমাজে যখন লোক দারিদ্র্যে কষ্ট পাচ্ছে, তখন ধনীর হাতে ধনসম্পত্তি পুঞ্জীভূত হতে দেওয়া হবে না। আরাম বা বিলাসিতার ব্যবস্থা চাই না, তা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, যদি সমাজে আরামের ব্যবস্থা হয়, তবে সে আরাম যেন সকলেই সমানভাবে ভোগ ক'রতে সুযোগ পায়। একদিকে অসীম অভাব, আর

একদিকে অপার ঐশ্বর্য্য—এই দৃশ্য তাঁর পক্ষে অসহ্য। ধন-সম্পত্তির পরিমাণ যাই হোক না কেন, তা সমানভাবে ভাগ করা হোক্, তার ফলে সমাজ ধনীই হোক্ আর দরিদ্রই হোক্।

সুতরাং, দারিদ্র্যের ওপর শ'এর যেমন বিতৃষ্ণা, অলস ধনীর ওপরও তাঁর তেমনই ঘৃণা। কিন্তু ধনসম্পত্তি সৃষ্টির ওপর তাঁর কোন বিতৃষ্ণা নেই। সমাজের ধনসম্পত্তি বাড়ুক, তাতে তাঁর উৎসুক্য হয়েই। কিন্তু তিনি চান যে, ধনসম্পত্তি যেন সমানভাবে ভাগবাটোয়ারা হয়। এইটাই শ'এর মতে শ্রেষ্ঠতম ধনবিভাগ প্রণালী।

(ক্রমশঃ)

মস্তরামের মেলা

শ্রীঅমরনাথ সরকার, এম, এ, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ

মেলার উৎপত্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধুলাউড়ি একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামখানি লালবাগ মহকুমার রাণীনগর থানার এলাকাভুক্ত। এই গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে মাঠের মধ্যে মস্তরামের মেলা বসিয়া থাকে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবারে মেলা বসে। মেলাটি সকাল হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

মস্তরাম বাবাজী নামক জনৈক বিখ্যাত সাধু পুরুষের নাম অনুসারে এই মেলার উৎপত্তি। এই সাধু লাল-বাগের সন্নিকটে গঙ্গার ধারে সাধকবাগ নামক স্থানে বাস করিতেন। সকলেরই ধারণা ইনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই মেলা এবং এই সাধুপুরুষের সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রকাশ, বহুকাল পূর্ব্বে এই সাধু নৌকাযোগে নিকটবর্ত্তী ধরমামারির বিল দিয়া যাইতে-ছিলেন। হঠাৎ ইনি মাঝিকে নৌকা ঘুরাইয়া সোজা দক্ষিণ দিকে চালাইতে বলেন। মাঝি বলে, মাঠের মধ্যে নৌকা যাইবে কেমন করিয়া? তবু সাধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া মাঝি নৌকার গতি ফিরায় এবং সাধুর অলৌকিক ক্ষমতাবলে মাঠের মধ্যে দাঁড়ার সৃষ্টি হইয়া নৌকা চলিতে থাকে। এই দাঁড়াটি ক্রমে মস্তরামের দাঁড়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এই দাঁড়ার ধারে মস্তরাম বাবাজীর নামে মেলা বসিতে থাকে। প্রায় ৪০ বৎসর হইতে মেলাটি বসিয়া আসিতেছে।

চতুঃসীমা ও অবস্থান

মেলার উত্তরে ধুলাউড়ি, নটিয়াল, নবিপুর, সাধরাজ; পূর্ব্বে, কুমোরপুর, মহিষমারি, ধরমামারি ও বাসুদেবপুর; দক্ষিণে, জিৎপুর, মোল্লাপাড়া, গোকুলচক; এবং পশ্চিমে ঘাসের চক, পাথমারি, গোধনপাড়া গ্রাম অবস্থিত। মেলাটি ধরমামারি বিলের সন্নিকটে অবস্থিত। মেলা যেখানে হয় সেই স্থানে মস্তরামের দাঁড়ার উৎপত্তি। এই দাঁড়াটী ধরমামারি বিলের সহিত নিকটবর্ত্তী পাথমারি বিলের সংযোগ সাধন করিয়াছে। এই দাঁড়া এবং বিল দুইটি বারমাস নৌ-চলাচলের উপযুক্ত থাকে।

যাত্রি-সংখ্যা ও লোক-সমাগম

নিকটবর্ত্তী প্রায় ৩০।৪০ খানি গ্রাম হইতে লোকজন এই মেলায় আগমন করিয়া থাকে। মেলায় লোকসংখ্যা প্রায় ১০।১২ হাজার হয়। হিন্দু মুসলমান সকলেই মেলা দেখিতে আসে। মেলার লোকসংখ্যায় হিন্দু মুসলমানের অনুপাত প্রায় ২:৩ হইবে। আশে পাশের গ্রামগুলিতে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক, সেইজন্য মেলা-দর্শনকারী লোকের মধ্যে মুসলমানের ভিড়াই বেশী। ২।৩ক্রোশ দূরের লোক

তো আসেই, ৪।৫ ক্রোশ, এমন কি ৮।১০ ক্রোশ দূরের লোকও আসিয়া থাকে।

মেলায় লোক-সমাগমের প্রধান হেতু এই যে, মন্তরামের নিকট অনেকে মানৎ করে, আশাপূর্ণ হওয়ার পর তাহারা মানৎ দেওয়ার জন্য এখানে আসে। তরকের দল, কলমূল, দুধ, চিনি প্রভৃতি বস্তু তো দাঁড়ায় মন্তরামের নামে নিক্ষেপ করেই, কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে গাঁজা ও কল্কে। এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় চিজ্ না হইলে নাকি বাবাজীর মনস্তুষ্টি হয় না। এই দাঁড়ায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানৎ করিয়া থাকে এবং এই বস্তু প্রদান করিয়া থাকে।

আর্থিক মূল্য

এই ক্ষুদ্র মেলাটীতে দোকানপাটের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। লোকে এখানে শুধু দাঁড়ায় সংগতিকা কল্কে নিক্ষেপ করিবার জন্যই আসে না, জিনিষপত্র খরিদ করিতেও আসে।

মেলায় মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী—প্রায় ৩০খানা। প্রত্যেক দোকানের গড় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৮০৲ টাকা হয়। পানের দোকানের সংখ্যা, গোছা ও খিলি পান সমেত, প্রায় ১০।১২ খানি, গড় বিক্রয়ের পরিমাণ ৬৲ টাকা। মনোহারী দোকানের সংখ্যা ১০।১২ খানি। এই সমস্ত দোকান খুব বড় নহে। পাড়াগেঁয়ে লোকের সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এই সমস্ত দোকানে মিলে, খুব ভারি ভারি দামের জিনিস এই সমস্ত দোকানে নাই। প্রত্যেক দোকানের গড় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ২০৲ টাকা হইয়া থাকে।

এবারকার মেলায় পাখার দোকান আসিয়াছিল ৪ খানা, প্রত্যেক দোকানের গড় বিক্রয়ের পরিমাণ কমসেকম ৫৲; হাঁড়ির দোকান ১ খানা, ইহাতে মিঠাই সওয়ার উপযোগী ছোট ছোট পাত্রই বেশী—বিক্রয়ের পরিমাণ ১০৲; মাছের দোকান ৮ খানা, গড় বিক্রয় ৩৲; তরীতরকারীর ৪ খানা, গড় বিক্রয় ৩৲; তরমুজ ও খিরার দোকান ৪ খানা, গড় বিক্রয় ৩৲; মাটির খেলানার দোকান ৪ খানা, প্রত্যেক দোকানের গড় বিক্রয়ের পরিমাণ আন্দাজ ৪৲ টাকা করিয়া হইবে; আমের দোকান ৪ খানা, ডাব-নারিকেলের দোকান ৪ খানা এই সমস্ত দোকানের গড় বিক্রয় ৩৲ টাকা; মালাকরের দোকান ৪ খানা, গড় বিক্রয় ৪৲; কামারের দোকান ৫ খানা, বিক্রয় ৫৲ টাকা করিয়া; সোনার দোকান ৮ খানা, এবং প্রত্যেক দোকানে অন্ততঃপক্ষে ১১৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে। মেলায় মোট দোকানের সংখ্যা ১০০ খানা হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মেলায় মোট বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩০০০৲ টাকা হইবে। বৈশাখে মোট ৪ বার মেলা বসে; প্রত্যেক মেলায় গড়ে ২৫০০৲ টাকার মাল বিক্রয় হইলে এই ৪টী মেলায় মোট প্রায় ১০,০০০৲ টাকার কারবার হইয়া থাকে।

অসুবিধা

মেলাটী যে স্থানে বসে সেখানে ছায়ার একান্ত অভাব। মাত্র একটী চারা বট গাছ সম্বল, নিকটে বহুদূরে আর কোন গাছই নাই। গ্রীষ্মের সময়ে সেইজন্য লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। লোক আসিয়া বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারে না, কিছুক্ষণ গাছতলায় সময় কাটাইবার পর সকলেই চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পানীয় জলের কোনই বন্দোবস্ত নাই। নিকটবর্ত্তী বিলের জলই সম্বল, কিন্তু সেই জল পানের যোগ্য নহে। ভক্তবৃন্দকে কর্দ্দমাক্ত দাঁড়ার জলেই স্নান করিতে হয়। নিকটে যদি আরও দুই চারিটি বড় গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে মেলাটী প্রভূত লাভ করিতে পারে।

রাস্তাঘাট যানবাহন

মেলায় আর একটী অসুবিধা, রাস্তাঘাটের অভাব। যে স্থানে মেলাটী বসে তাহার নিকটে কোন ভাল সড়ক নাই। অনেক লোককে বিলের কাদাজল পার হইয়া আসিতে হয়। আর বেশীর ভাগ লোকই আসে পায়ের মত শক্ত চিনসুর্থ মাঠ ভাঙ্গিয়া। মানুষ না হয় যেমনতেন প্রকারেণ ঈপ্সিত স্থানে আসিতে পারে, কিন্তু গো-গাড়ীর

আসার বড়ই অসুবিধা। প্রত্যেক মেলায় প্রায় ৫০ খানা গাড়ী, ২০০টী ঘোড়া, ৪০ খানা সাইকেল আবির্ভূত হয়। নিকটবর্ত্তী পদ্মপার-সংলগ্ন বিল দুইটীতে নৌকা চলাচল হয়। সুতরাং নৌকাযোগেও মেলায় লোকজন আসিয়া থাকে। মোট নৌকার সংখ্যা প্রায় ২০ খানি হইবে। এই সমস্ত যান-বাহনে আগত পদব্রজ লোক ছাড়া বাদবাকী সকলেই যে পদব্রজে আগমন করিয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

সামাজিকতা

মেলায় নারী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। মোট লোকের ৬৫% নারী। তথাকথিত অনুন্নত জাতির মেয়েরা তো আসেই, ভদ্রঘরের মেয়েরাও বাদ যায় না। ভদ্রলোক তথা ভদ্র ঘরের মেয়েদের যাতায়াত ক্রমেই বাড়িতেছে। আসার কারণ, নিছক ধর্ম্ম নয় নিশ্চয়ই, সখের খাতিরেই প্রধানতঃ ইহাদের আবির্ভাব।

মেয়েরা বাহিরে আসিতে চায়; ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। মেয়েরা এইরূপে দলে দলে যত বাহিরে আসিতে থাকিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, পল্লী অঞ্চলের ভদ্র সম্প্রদায় ও ভদ্রভাবাপন্ন তথাকথিত ছোটলোকের দল মেয়েদের এইরূপ বাহিরে আসা পছন্দ করিতেছে না।* মেয়েরা তাহাদের একঘেয়ে বদ্ধজীবনে যে এইরূপে একটু আধটু বাহিরে আসার সুযোগ পায়, ইহারা তাহাও বন্ধ করিতে চায়। আজ দেশব্যাপী যে স্বরাজ আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে দেশের মুক্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হওয়া উচিত; কিন্তু এই সুপ্ত পাড়াগেঁয়ে অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ স্বাধীনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতি, যাহা এতদিন অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা রোধ করিয়া স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। নেতাদের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

ভারতীয় মেলার ফিলসফি

ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। ভারতে মানুষের প্রতি কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ধর্ম্মভাবাপন্ন। আর ধর্ম্মের ছাপ না পড়িলে ব্যাপক কোন কাজই এদেশে সুসম্পন্ন হওয়ার আশা নাই। অন্যান্য দেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এক্সিবিশান প্রভৃতি ব্যাপারে মেলা বসিয়া থাকে, এদেশে মেলা বসে ধর্ম্মের কারণে। কোন দেবতা বা কোন সাধু মহাজনের নাম না থাকিলে এদেশে মেলা জমে না। তাই দেখা যায়, দেব মন্দির, সাধুর আস্তানা বা স্থান—এই সমস্ত চিহ্নের আশে পাশেই বড় বড় মেলা, বাজার ইত্যাদি গজাইয়া থাকে। তবে সহর অঞ্চলে আজকাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে বটে; কারণ স্বদেশী মেলা নামক বস্তুটী ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সহরে দেখা দিতেছে; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে দেশ-মাতৃকার প্রভাব এখনও তত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখানে ঠাকুর দেবদেবী আর সাধু মহান্তের এখনও পূর্ণপ্রভাব বর্ত্তমান। সুতরাং মেলার ব্যবসার দিকটা এখনও পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই।

অর্থনীতির তরফ হইতে বলিতে গেলে বলিতে হয় এই ধর্ম্মের মেলাকে আর্থিক মেলাতে পরিণত করিতে হইবে; অর্থাৎ মেলার লোকজনের মধ্যে যাহাতে ব্যবসায় বুদ্ধিটী আবির্ভূত হয় তাহা করিতে হইবে। এখনও যে লোকের মনের মধ্যে এ ভাবটা কিছু কিছু নাই, তাহা নহে; তবে ভবিষ্যতে যাহাতে অধিকাংশে মানুষের মধ্যে এ ভাব জাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মেলাতে এখন লোকে শুধু সাধারণ ব্যবহারের জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া থাকে। ভবিষ্যতে যাহাতে ব্যবসায়ী ব্যক্তিরাগণ ব্যবসার জন্য পণ্যদ্রব্য খরিদ করিতে পারে এমন ব্যবস্থার পক্ষপাতী। মোট কথা ভবিষ্যতে এই জাতীয় মেলাগুলি যাহাতে ব্যবসার মেলাতে পরিণত হয় সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা দরকার।

---

* বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তথাকথিত ছোট জাতের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা দিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর দেখাদেখি ইহারাও নিজেদের মেয়েদের ঘরে আটক করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী হইতেছে।—আঃ উঃ সম্পাদক।

মেলার ভবিষ্যৎ

মেলাটী যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা একটী প্রকাণ্ড মেলায় পরিণত হইতে পারে। এখন যেমন মাত্র বৈশাখ মাসে ৪ দিন মেলা হয়, তাহার পরিবর্ত্তে সারা বৈশাখ ব্যাপিয়াই যাহাতে মেলাটী স্থায়ী থাকে তাহার চেষ্টা করিলে নিতান্ত নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মেলাটীর উন্নতি-সাধনের জন্য প্রথমতঃ রাস্তা সড়কের ব্যবস্থা করা দরকার। এ অঞ্চলে মোটেই মেলা নাই। দেশের জমিদার, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, ইউনিয়নবোর্ড প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করিলে মেলাটী একটী পরম নগরের ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। প্রচেষ্টাকারীদের ইহা হইতে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনাও হইতে পারে; দেশবাসী জনসাধারণেরও ইহাতে যথেষ্ট সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

জীবন যুদ্ধে বাঙ্গালী

কিছুদিন যাবৎ দেশের মধ্যে কথা উঠিয়াছে, জীবনযুদ্ধে বাঙ্গালী সকলের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহামতি গোখেল ঘোষণা করিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা যে কথা আজ বলিতেছে, ভারত সে কাজ কাল করিবে।" মহাপুরুষের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ ভারতের ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী এতদিন নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। এখন অনেকে ঐ বাক্যের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই বিষয়ে অগ্রণণ্য। তিনি বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বক্তৃতায় সংবাদ-পত্রে পুস্তিকায় সর্ব্বত্র প্রমাণাদি সহ দেখাইতেছেন যে, বাঙ্গালী পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল এখন আর সে স্থানে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস চেন্সেলার কর্ণেল সুরাবর্দ্দি সেদিন ছাত্রদের সভায় ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভায় পঞ্জাব-নিবাসী স্যর ফজলী হোসেন মিঃ গোখেলের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—যে কথা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সে কথা সত্য হইতে পারিত, কিন্তু এখন আর উহাতে সত্যতার গন্ধও নাই। সেদিন শিক্ষক সম্মিলনের বরিশাল অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়ও বাঙ্গালীর অবনতির এক কঠোর বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। আরও ছোট বড় অনেকে প্রতিদিন বাঙ্গালী জাতির অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এখন দেখিতে হইবে যাঁহারা বাঙ্গালীকে এইরূপ হেয় প্রতিপন্ন করিতেছেন তাঁহাদের উক্তি কতটা যুক্তিসহ। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার বাহিরের অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সহিত তুলনা করিয়া বাঙ্গালীর ব্যবসা-পটুত্বের অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের উক্তি কতকাংশে সমর্থনযোগ্য হইলেও, তিনি নিজেই কি লক্ষ্য দিবেন না যে, বেঙ্গল কেমিকেল প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহার সহিত তিনি নিজে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে? স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল, ধনকুবের লাহাগণ, ভাগ্যকুলের রায়পরিবার, চাকা ও চট্টগ্রামের মুসলমান ব্যবসায়িগণ, পূর্ব্ববঙ্গের সাহা মহাজনগণ এবং এইরূপ আরও অসংখ্য ব্যবসায়ী কি শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে এখনও বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন না? অবশ্য ইংরেজ বা মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ ভারতের নানাস্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা পাইলে বাঙ্গালীও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে না এমন কথা নাই।

বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের রাসায়নিকদের মধ্যে এখনও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণই নেতৃত্ব করিতেছেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, রসিক লাল দত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁহার শিষ্যগণ যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন কোন অবাঙ্গালী তাহা পারেন নাই। অবশ্য সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহার সাফল্যে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তিনি অবাঙ্গালী হইয়াও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন বলিয়াই বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এই কথা বলিলে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাই প্রকাশ করা হয় না কি?

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের নিকট সমগ্র ভারতের সাহিত্যিক-সমাজ নিষ্প্রভ হইয়া আছে, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। এখনও বঙ্গ সাহিত্য যে স্থানে অবস্থিত ভারতের অপরাপর সাহিত্যের ঐ স্থানে পৌঁছিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী ভারত ও ভারতের বাহিরের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকগণের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। তিনি যুগাবতার স্বরূপ; তাঁহার সহিত অন্যের তুলনা করিলে অন্যের প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তুলনায় বাঙ্গালার যতীন্দ্র মোহন, সুভাষচন্দ্র অন্য কোনও অবাঙ্গালীর পশ্চাতে পড়িয়া নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।

মহিলা সম্বন্ধে বাঙ্গালী কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সমকক্ষ কে আছেন? এখনও বাঙ্গালী রবীন্দ্র নাথ, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আন্তর্জ্জাতিক বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে আজও মহামতি গোখেলের বাঙ্গা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলনে দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালীই অপরাপর জাতি অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ বলিয়া তাহার অখ্যাতি আছে; মানুষের জীবনে কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ইহা বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া থাকিলেও বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্বেরও একটি কারণ।

বাঙ্গালীর যদি পতন হইয়াই থাকে তবে তাহার জন্য দায়ী কে তাহা অবশ্যই অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও করিতে হইবে। কিন্তু একটি লোককে শুধু দুর্ব্বল, অমানুষ বলিয়া সর্ব্বদা নিন্দা করিলে তাহার যেমন নৈতিক অবনতি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কোন সদ্‌গুণ থাকিলে তাহা বিকাশের অবসর পায় না, সেইরূপ একটি জাতিকেও কেবল নিন্দাভাজন হইতে হইলে তাহারও নৈতিক অবনতি হওয়া খুবই সম্ভব।

জাতিকে উন্নত করিতে হইলে উহার ভিতরে যে সদ্‌গুণ আছে তাহারই বিকাশ সাধন আবশ্যক। এইজন্য আমরা বলি নেতৃগণ কেবল আমাদের নিন্দাই না করিয়া আমাদের গুণগুলিও বিকশিত করিতে চেষ্টা করুন।

(পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

৪৪ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযদুনাথ পাল বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়—১৩৩৬ আর্থিক উন্নতি ৬ষ্ঠ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'জ্যেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আনার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

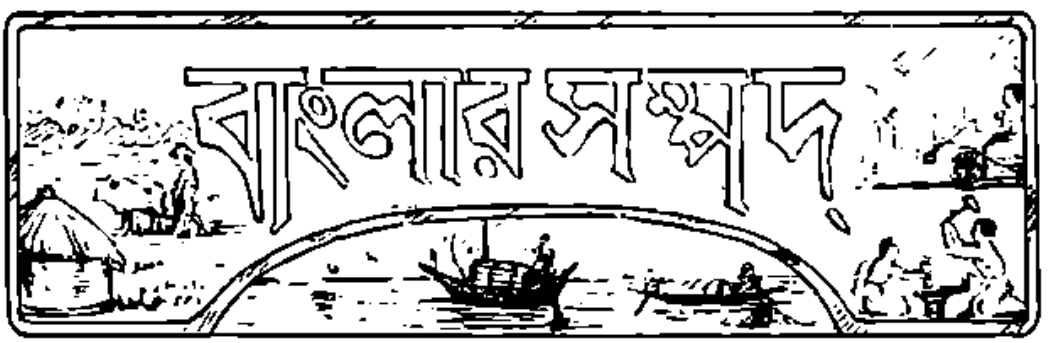

*বাংলার একটি প্রয়োজনীয় কুটীর-শিল্প

পিত্তল, তাম্র ও কাঁসার বাসন তৈয়ারী করিয়া যাহারা জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশে ১,৫০,০০০ লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহারা প্রায় সকলেই পুরাতন প্রণালীতে বাসন তৈয়ারী করে; উন্নততর উপায়ে বাসন তৈয়ারী করিবার যে সকল কৌশল ইদানীং আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার খোঁজখবর ইহারা রাখে না।

সাধারণতঃ এদেশের শিল্পীরা দুই প্রকারে তাম্র, কাঁসা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত করে।

(১) ঐ সমস্ত ধাতু অগ্নির উত্তাপে নরম করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটিয়া নানারূপ আকার প্রদান করা হয়।

এই প্রণালীতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময় লাগে। এই পরিশ্রম ও সময় কমাইতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প দরে পিত্তল, কাঁসা, তাম্র ইত্যাদির বাসন বিক্রয় করা যাইতে পারে।

(২) ধাতু ঢালাই করিয়া ইচ্ছানুরূপ আকার প্রদান করা হয়।

ইহাতে প্রথম প্রণালী অপেক্ষা পরিশ্রম কম লাগে। কিন্তু বেশী পরিমাণ ধাতুর প্রয়োজন হয়। জিনিষগুলি অত্যন্ত ভারি এবং টেঁকসই হয় বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা পছন্দ করে না, এবং পছন্দ করিলেও প্রচুর অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে পারে না। বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে সকলেই অল্প খরচায় কাজ সারিতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জল খাইবার গেলাসের কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট আকারের টেঁকসই গেলাস প্রস্তুত হয়, কিন্তু এরূপ গেলাসের প্রচলন খুব বেশী নহে। তদপেক্ষা হয়ঃ জার্ম্মাণি হইতে আনীত পিত্তলের চাদরের গেলাসেরই প্রচলন বেশী। এইরূপ গেলাস খুব অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে সব দিক্ দিয়াই যাহ-

সঙ্কোচের প্রয়োজন হইয়াছে। এ সময়ে আধুনিকতম উপায়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতি-বিধান না করিলে এবং অল্প ব্যয়ে জিনিষপত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা না হইলে, এদেশের প্রাচীন শিল্পগুলি একে একে বিলুপ্ত হইবে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অল্প ব্যয়ে কি করিয়া 'চালাই' প্রণালী দ্বারা থালা, গেলাস, ঘটি, বাটি ইত্যাদি তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বীরভূম জেলার রুদ্ররামপুর, মালদহাটি ও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নামক স্থানে অনেক কাঁসারী বাস করে। তাহাদিগকে উন্নত প্রণালীতে বাসন প্রস্তুত করার উপায় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সরকারী শিল্প বিভাগ বলেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায়ে কাজ করিলে ধাতুর খরচা শতকরা ২০ ভাগ এবং শ্রমের খরচা শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন, বাংলার নানা স্থানের কাঁসারীদের নিকট উন্নত প্রণালী প্রদর্শন করা হইবে। কিন্তু আপাততঃ অর্থাভাবের জন্য এ কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কুমারের চাক

মৃৎ-শিল্পের চলন বাংলা দেশে খুব বেশী। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ইহার চর্চ্চা হয়, কিন্তু উপযুক্ত চাকার অভাবে ইহার তেমন উন্নতি হইতেছিল না।

প্রায় দুই বৎসর নানারূপ পরীক্ষার পরে সরকারী শিল্প বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা) একটি সহজ হস্তচালিত চাকা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে কুমারদের উপকার হইবে। এখন যে-সব জিনিষ তৈয়ারী হয় তাহা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিষ আরও কম সময়ে ইহাদ্বারা তৈয়ারী হইতে পারিবে। ইহার ফলে দেশের ৩০০,০০০ কুমারের অবস্থার উন্নতি হইবে।

কলের চাকায় যত মাল তৈয়ারী হয় এই চাকা দ্বারাও ঠিক তত মাল তৈয়ারী হইতে পারিবে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, একটি সহজ ফ্রিক্সনের ব্যবস্থা থাকায় ড্রাইভিং পিনিয়নের অপেক্ষা না রাখিয়াই চাকাটী কাজ করিতে পারে। চালাইবার হাতল দুই চারিবার ঘুরাইয়া দিলেই চাকাটী ইচ্ছামত বেগে ঘুরিতে থাকিবে ও অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিবে।

কুমারেরা এখন যে চাকা ব্যবহার করে তাহা পুরাতন ধরণের। তাহা দ্বারা ভাল কাজ হইতে পারে না। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত চাকার সাহায্যে তাহারা বড় এবং বেশী মজবুত জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিবে। পুরাতন ধরণের চাকা তৈয়ারী করা খুব সহজ এবং তৈয়ারী করিতে খরচও কিছু কম লাগে। কিন্তু বড় জিনিষ গড়িবার জন্য যত সময় দরকার তত সময় পর্য্যন্ত এই পুরাতন ধরণের চাকার গতি-বেগ থাকে না। প্রথমবার ঘুরাইয়া দিবার তিন চার মিনিটের মধ্যেই উহার বেগ কমিয়া যায় ও কুমারেরা প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য খুব সাধারণ ও সাদাসিধা জিনিষ ছাড়া প্রায় আর কিছুই তৈয়ারী করিতে পারে না।

বেশী পাতলা ও সূক্ষ্ম ডৌলের জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইলে চাকা শুধু আস্তে আস্তে ঘুরিলেই চলে না। চাকাটী একভাবে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরা চাই। কাজেই নূতন চাকার চাহিদা বেশী হইবার সম্ভাবনা।

নূতন চাকায় কেমন কাজ হয় তাহা কলিকাতায় কুমারটুলির ১নং বস্তিতে কালীভূষণ মল্লিকের দোকানে, দেখা যাইতে পারে।

বাংলার গ্রাম্য শিল্প

আমাদের বর্ত্তমান অন্নকষ্ট সম্বন্ধে যাঁহারা অল্প বিস্তর চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন যে, ভ্রমাদির দুর্ম্মূল্যতা ব্যতিরেকেও দেশের দুরবস্থার আর একটি গুরুতর কারণ আছে, তাহা সাধারণ গ্রামবাসীর কোন প্রকার লাভজনক উপজীবিকার অভাব। অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান দুই চারিটী ফসল চাষের সময় ব্যতীত বৎসরের অবশিষ্ট সময় কৃষকেরা আলস্যে দিন কাটায়, যে সকল শিল্প বাংলার জনপদ-সমূহে অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, তৎসমুদয়ের অনেকগুলি এখন লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন্ কোন্ শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারা যায়, তাহার আলোচনা নিম্নে করা যাইতেছে :

তুলাজাত দ্রব্য

বাংলায় তুলা চাষ আজকাল নিতান্ত সামান্য। সমস্ত ভারতের অনুপাতে শতাংশের এক অংশেরও কম। আবার নিখিল ভারতের ২ শত ৮২টী তুলার কলের মধ্যে বাংলায় মোটে ১২টী অবস্থিত। কার্পাসের কারখানা শিল্পে বাংলা এত পশ্চাৎপদ হইলেও, বাংলায় গৃহজাত কার্পাস শিল্প এখনও আছে। প্রত্যেক জিলাতেই ৪।১০ ঘর তাঁতি ও জোলা আছে, এবং সুতাকাটাও সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া যায় নাই; কিন্তু বাস্তবিক যাহারা জীবিকার জন্য বস্ত্রবয়নের উপর নির্ভর করে, এরূপ ২৫ হাজার কিংবা তদূর্দ্ধসংখ্যক ব্যক্তি কেবল মেদিনীপুর, যশোহর, পাবনা, ঢাকা, বরমনসিংহ, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জিলাতে দৃষ্ট হয়। এই কয়েকটী জিলা ভিন্ন বাঁকুড়া ও খুলনায় এখনও মোটা কাপড়ের উৎপাদন নিতান্ত কম হয় না। বাখরগঞ্জ, মেদিনীপুর ও যশোহরে গ্রামাঞ্চলের ধান ও ২৩ পরগণা এবং নদীয়ার স্থানে স্থানে অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে অনেক তন্তুবায় নিযুক্ত আছে। মার্জ্জিত রুচির উপযোগী ধোসুতি, পাগড়ী ও পর্দার কাপড়ও আজকাল মেদিনীপুর ও নদীয়ার দুই একটী গ্রামে উৎপন্ন হইতেছে। সুখের বিষয় যে, বেঙ্গল-নাগপুর রেল এবং অন্যান্য বড় বড় কোম্পানী এই প্রকার পাগড়ীর কাপড় ক্রয় করিয়া দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করিতেছে। ঢাকার মলমল, জামদানি ও কুসিদা বস্ত্র চির প্রসিদ্ধ। শান্তিপুর ও ফরিদপুরের শাড়ীর বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন। হুগলী জিলায় সিয়াসুখ নামক কাপাস ও রেশম-মিশ্রিত পাতলা জামা প্রস্তুত করিবার বস্ত্র, হাওড়া জিলার মোটা মেটের কাপড়, হুগলীর ছাপান রুমাল এবং ফরিদপুরের কাঁথা প্রভৃতি মনোরম দ্রব্যের কাটতি বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। কেবল পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলার সূক্ষ্ম কার্পাস শিল্প স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না।

২। রেশমী কাপড়

বাংলার রেশমবস্ত্র এক সময়ে ভারতের বাহিরে বহু দূরদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাজারের অধিক রেশম-শিল্পী এখন কেবল বীরভূম, বাঁকুড়া রাজসাহী মালদহ ও মুর্শিদাবাদে আছে। এই কয়েকটী জিলা ভিন্ন মেদিনীপুর ও বগুড়াতেও তুঁত রেশম অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে পরিমাণ রেশমসুতা বাংলায় উৎপাদিত হয় তাহার তুলনায় সুতাকাটা কম হয়। রেশম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ। এখানে মটকা, গরদ, রুমাল, ছাপান কুসিদার ও অন্যবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রাজসাহী, বগুড়া ও মালদহেও মটকা কম পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও বরমনসিংহেই তাঁতির চাষ অধিক এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ তসরের প্রধান কেন্দ্র। এই সকলের বিস্তৃত প্রচলন হইলে অনেকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে।

৩। কম্বল গালিচা

মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জিলায় বহু দিবস হইতে মোটা কম্বল, কম্বলের আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। উৎসাহ পাইলে শিল্পিগণ যে অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, মুর্শিদাবাদে প্রস্তুত বিলাতী প্যাটার্নের রাগ্ তাহার উদাহরণ। দার্জ্জিলিং হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রস্তুত যে, রাগ্ ও গালিচা আসিতেছে, তাহা বেশ ভাল জিনিষ বটে, তবে মূল্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের ক্রয়ের উপযুক্ত নহে। বরাহনগরেও গালিচা প্রস্তুত হয় এবং তার বেশ সুখ্যাতি আছে। কিন্তু বিদেশজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে হইলে ইহার বহুল প্রসার ও মূল্য কমান প্রয়োজন।

৪। তৈজসপত্র

পিতল কাঁসা শিল্প এক সময়ে বাংলার প্রায় প্রত্যেক জিলাতেই ছিল। বর্ত্তমানে এনামেল ও চিনামাটির প্রতিযোগিতায় ইহার বিক্রয় হ্রাস পাইলেও এখনও কাঁসারীর ব্যবসা দ্বারা অনেক বিক্রমপুরবাসী জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। পিতল কাঁসার দ্রব্যের উৎপাদন-কেন্দ্রের মধ্যে বিষ্ণুপুর, নলহাটি, ঘাটাল, খাগড়া, বাঁশবেড়িয়া, রাণাঘাট, নাটোর, বামরাই, কাশমারি ও ইসলামপুর

প্রভৃতি স্থানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বেকার-সমস্যার সমাধানে এই শিল্পটি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা অনুধাবনযোগ্য।

৫। গৃহসজ্জার উপকরণ

প্রত্যেক জিলাতেই এখন বাঁশ, বেত ও নল খাগড়া দ্বারা নানাবিধ গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। ধরমা, বাঁশের চাটাই, ঝুড়ি, চেঙারি প্রভৃতি না হইলে গৃহস্থের চলে না। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বাঁশ ও বেত দ্বারা উচ্চস্তরের শিল্প—যথা বাক্স, পেটারা, মোড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে তাহা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। বোধ হয় অল্পদামের ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ ইত্যাদির প্রচলন হওয়ায় এই শিল্পগুলির বিলোপ ঘটিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত সহানুভূতি পাইলে যে এদেশের লোকেরাও সুন্দর সুন্দর উপাদান প্রস্তুত করিতে পারে, দেশীয় আধুনিক প্যাটার্ণে প্রস্তুত চেয়ার, টেবিল, টিফিন বাস্কেট, ট্রে প্রভৃতি তার উদাহরণস্থল। প্রসঙ্গক্রমে মাদুর, শীতলপাটি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। শীতলপাটি শিল্প পাবনা, ময়মনসিংহ, যশোহর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই শিল্পটির বিস্তারলাভ বাঞ্ছনীয়। নিত্যব্যবহার্য্য ও প্রয়োজনীয় না হইলেও এই দুইটি শিল্প বাংলার নিজস্ব।

পূর্ব্বে মাদ্রাজ ও সিংহল উপকূল হইতে শঙ্খ আমদানি করিয়া তাহা হইতে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। মুর্শিদাবাদ, বগুড়া ও ঢাকার হাতীর দাঁতের কাজ, দার্জ্জিলিংয়ের রূপার কাজ, বীরভূম, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা মুর্শিদাবাদ ও দার্জ্জিলিংয়ের লেসের কাজ, এ সমস্তই চারুশিল্পের অন্তর্গত। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকার মূর্ত্তি এবং হুগলীর চিত্রিত ও রঞ্জিত মৃত্তিকার তৈজস পত্রাদি জগতে যথেষ্ট সমাদর পাইবার যোগ্য। এই সমস্ত মৃৎ-শিল্প উৎসাহ পাইলে বাংলার ঘরে ঘরে নূতন সম্পদ্ আনয়ন করিতে পারে। এইরূপ অনেক গ্রাম্য শিল্প আছে যাহার বহুল প্রচলনদ্বারা দেশের অর্থসম্পদ্ অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে। আজ জাতীয় জীবনে নব পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। এই শুভক্ষণে পুরাতন গ্রাম্য শিল্পের পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। এইরূপে জনসাধারণের উপজীবিকার একটা সংস্থান হইতে পারে।

(কাশীপুর নিবাসী—বরিশাল)

কৃষিশিক্ষায় দেশবাসীর ঔদাসীন্য

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে সরকারী কৃষি-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী এই সরকারী অনুষ্ঠানের ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে সরকার-প্রদত্ত কৃষি-শিক্ষার প্রতি খুব অল্প-সংখ্যক লোকই আকৃষ্ট হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে একবার কলিকাতা, চট্টগ্রাম এবং ডুমরাওনে হাই স্কুলে ছাত্রদিগকে কৃষিসম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক পড়াইয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর ভারতের কৃষি বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে গত ১৯২০ সনে ঢাকায় এবং চুঁচুড়ায় কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বৎসর পরে ১৯২৪ সনে কলিকাতায় যে কৃষিশিক্ষা কন্‌ফারেন্সের বৈঠক বসে, তাহাতে স্থির হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রদিগকে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হইবে। পাঞ্জাবে এ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য সেখানে ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। ডেপুটেশন ফিরিয়া আসিয়া যে সুপারিশ করেন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হয় এবং তদনুসারে ১৯২৬ সনে ঢাকায় শিক্ষক তৈয়ারীর জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরন্তু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তথা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়েও কৃষিশিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ইনস্পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়,—১৯৩০ সনে সর্ব্বপ্রথম ১৫ জন কৃষিশিক্ষক সরকারী বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বাঙ্গালার ১২টী জেলার ১৫টী বিদ্যালয়ে কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্দ্ধমান মেদিনীপুর এবং যশোহর এই তিন জেলার প্রত্যেকটীতে ২টী করিয়া ৬টী কৃষি বিদ্যালয় আছে; আর বীরভূম, হুগলী, নদীয়া, বহরমপুর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, পাবনা এবং বাঁকুড়া এই নয়টী জেলায় একটী করিয়া মোট ৯টী বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত। এই ১৪টী বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টীতে বাগান এবং বাকী ৮টীতে চাষের জমি লইয়া কাজ হয়। এই সব বিদ্যালয়ে অবশ্য স্বাধীনভাবে কাজ চলিতেছে। সর্বসমেত ৪শত ১৪ জন ছাত্র কৃষিবিষয়ক পাঠ মুখস্থ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতে চাষের কাজ শিখিতেছে। কিন্তু সরকারী বিবরণেই প্রকাশ,—ছাত্রদের বা তাহাদের অভিভাবকদের ইহাতে বেশী উৎসাহ নাই। বৃথা অর্থব্যয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরকাল তাঁহারা এই ভাবে স্কুল চালাইয়া দেখিবেন; এই পাঁচ বৎসরে স্কুল হইবে মোট ৬০টী এবং তাহাতে ছাত্র হইবে অনুমান ২ হাজার ৪ শত জন। পাঁচ বৎসর পরেও যদি বুঝা যায় যে, কোন ফল হইতেছে না, তাহা হইলে তখন ব্যবস্থান্তর করা হইবে। পঞ্জাবের ব্যবস্থা বাংলায় প্রবর্তন করা ভুল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সেখানকার জল মাটী, সেখানকার লোকের অভ্যাস, শক্তিসামর্থ্য, সেখানকার লাভ-লোকসানের হিসাব নিকাশ কি এখানকার সহিত মিলিতে পারে? আমাদের মনে হয় বিলাতী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষী তৈয়ারী করিবার বা চাষ আবাদ করিবার এখানে বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। বাংলার চাষের জমি প্রচুর, জলবায়ুও অনুকূল; কেবল চাষীরা রোগে ও অভাবে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গো-বংশও ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, ইহাই বাংলার কৃষি-সম্পদের প্রধান পরিপন্থী। গবর্ণমেণ্ট যদি চাষীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কিছু অর্থব্যয় করেন, পল্লীগ্রামসমূহে জলকষ্ট নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন, গোবংশ বৃদ্ধির জন্য গোচরভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই আবার সুজলা সুফলা বাংলা শস্যশ্যামলা হইবে, আবার বাংলার ক্ষেতে সোনা ফলিবে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

দেশের দুর্দ্দিন

উকিল-মোক্তার মক্কেল চায়, কিন্তু মক্কেল নাই; যদি বা থাকে তো টাকা দিয়া মামলা করিতে পারে না। ডাক্তার-কবিরাজ রোগী চায়, কিন্তু রোগী অর্থাভাবে আর বৈদ্যের বাড়ী সহজে যায় না; যদি বা যায় তো বেশীর ভাগ অর্থ দিতে অপারগ। দোকানদার খরিদ্দার চায়; খরিদ্দার মিলা কঠিন, যদি বা মিলে তো বেশীর ভাগ বাকী চায়। উমেদার চাকুরী চায়, কিন্তু খোঁজ করিতে যাইয়া দেখে, যাঁহারা চেয়ারে ঠ্যাস্ দিয়া বসিয়া আছেন তাঁদেরই চাকুরি থাকিবে কি যাইবে এই চিন্তায় তাঁহারা কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন। সরকার ভাবেন আদালতে কোর্ট ফি বৃদ্ধি হয় না কেন, রেজিষ্ট্রেশন আয় কত হয় না কেন, কেন পোষ্টাফিসের আয় কমিল, কেমন সব কণ্ট্রাক্ট-পাল্ট হইল, ইত্যাদি। কিন্তু তাহার উপায় একটু সহজেই হয়, কারণ নিরুপায় কেরাণীকুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে বিশেষ সময় লাগে না। 'রিট্রেঞ্চমেণ্ট' কমিটী বসিয়াছে, ফলাফল কিছুদিন পরে বাহির হইবে বটে। এখনই অনুমান করা কঠিন নয় যে, যাহার মাহিয়ানা ২০০৲ তাহার কমিবে না, হয় ত বা কমিলে অতি সামান্য, আর ৭০৲ মাহিয়ানার কেরাণীর হয় চাকুরি যাইবে নতুবা ৪০৲ বেতন দাঁড়াইবে। গরীব চিরদিন এমনি করিয়া মরে, বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই।

প্রথমোক্ত নিরুপায়দের মধ্যে, উমেদারদের অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ। এমন একদিন ছিল যেদিন, তাহারা উমেদারী করিতে আসিয়া ৫।১০ দিন করিয়া এর ওর বাড়ী খাকিয়া চাকুরি বাকুরির চেষ্টা করিত; কিন্তু যেমন দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, তাতে কিছু দিন পরে হয় তো সেরূপ করাও অসম্ভব হইবে। কারাগারে এমন অনেক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, যাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া তাদের অবস্থা অবগত হইলে, দুঃখে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা কম ছিল, তাদের অবস্থাও এইরূপ। আজ চাষী চাষ করিয়াও অনাহারে, দোকানদার দোকান করিয়াও অর্দ্ধাহারে, উমেদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও হতাশ হইয়া মৃতপ্রায়।

জলপাইগুড়ির লোক চা বাগানের উপলক্ষ্য করিয়া এতদিন বুক টান করিয়া চলিত, আজও হয় তো বারআনা মাছের সের হইলে অতি অল্প সময়ে টিন পেড্ খালি হয়; কিন্তু যাহাকার যেন করালমূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে, কারণ মুষ্টিমেয় লোকের অর্থ থাকিলেও অধিকাংশের অবস্থা

কাহিল। একদিকে ধানের দাম নাই, অন্য দিকে সেয়ারের দাম নাই, পাটের দাম নাই, চাউলের দাম থাকিলেও ধানের দাম খুবই কম। এখানকার মফঃস্বলের লোকদের সঙ্গে আধ ঘণ্টা আলাপ করিলে চোখে জল আসে, অথচ তাদেরও আত্ম-রক্ষার উপায় নাই।

শ্রীভবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
(শিবোত্তর—জলপাইগুড়ি)

গ্রামের কথা

বিগত ২৩শে চৈত্রের "পল্লীমঙ্গল"—নারায়ণগঞ্জ লিখিয়াছে। চৈত্র মাস শেষ হইতে চলিল, কিন্তু এবার তেমন বর্ষণ হইল না। বৃষ্টির অভাবে মাঠের মাটী শুকাইয়া পাথর হইয়া আছে, নানা স্থানে জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। বাংলায় এবার তেমন বর্ষা হয় নাই। বর্ষার জল বেশী হইলে, গ্রামের ডোবা পুকুর, নীচু জমি, বালজমি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়া যায়, ঐ সঙ্গে দূষিত পদার্থ, আবর্জ্জনা ধৌত হওয়ায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। বর্ষা না হওয়ায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। নানা স্থান হইতে কলেরা বসন্তের প্রকোপের খবর আসিতেছে। এ সহরেরও স্থানে স্থানে কলেরা আছে। বৃষ্টির অভাবে বাঁধা পুকুরের জল খারাপ হইয়া যাইতেছে, যদি বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বর্ষণ না হয় তবে অনেক পুকুরের জল পানের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। বৃষ্টির অভাবে তরকারীর ফলন ভাল হইতেছে না। বাজারে শাকসব্জীর আমদানি কম, কুমড়া, লাউ, উচ্ছে, বেগুনের দর বেশ চড়া। বৃষ্টি হইলে এ সকল সস্তা আবার সস্তা হইত। মাঘে একদিন বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ঐ বৃষ্টির জল কাঁচা মাটীতে বসিতে পারে নাই, পড়িবামাত্রই টানিয়া গিয়াছে। ভালরূপ বৃষ্টি না হইলে জমিতে লাঙ্গল বসিবে না, কৃষকেরা জমি তৈয়ার করিয়া বপনের সুযোগ পাইবে না। আম কাঁটাল-পল্লীবাসী গরীব কৃষকের গ্রামের প্রধান সম্বল, কিন্তু এবার এতদঞ্চলে মোটেই আম কাঁটাল হয় নাই। আমের যে সামান্য মুকুল হইয়াছিল, কাঁটাল গাছে যে মুদ্রি পড়িয়াছিল বৃষ্টির অভাবে উহা ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে উহাদের একটি ফলও গাছে থাকিবে না। চাষ আবাদ এবং খাদ্যের জন্য অচিরে বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক।

চাউলের দর অকস্মাৎ বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত জিনিষের দরই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ দেশের কৃষকের ঘরে খোরাক থাকে না, বৎসরের অধিকাংশ সময় উহাদের কিনিয়া খাইতে হয়। গত বৎসর অতিরিক্ত পাট দিয়া ঐ পাট বেচিয়া যে মূল্য পাইয়াছে তাহাতে চাষের খরচও না উঠায়, ঋণগ্রস্ত কৃষক একেবারে ঠেকিয়া পড়িয়াছে। চৈত্র মাসে দেনা শোধ দিতে হয়। হাতে একটি পয়সা নাই; নিত্যপ্রয়োজনীয় তেল, নুন, চাল, ডাল, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষের দাম হঠাৎ চড়িয়া যাওয়ায় কৃষকগণ এ সময় বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যদি খাইতে কর্জ্জ করিতে হয় তবে চাষের টাকার উপায় কি হইবে? বৃষ্টি না হওয়ায়, তাহা ঘাসের অভাবে গরুর দুধ কমিয়া যাইতেছে। দুধের দাম তেমন চড়ে নাই, প্রায় একরূপই আছে। ইহাতেও কৃষকেরই অসুবিধা। দুধের দাম বেশী হইলে তবু ঘরে বেচিলে নগদ কিছু আমদানি হইত। জল না হওয়ায় অন্য বৎসরের তুলনায় মৎস্যের আমদানি কম ও বাজার চড়া। অনেক স্থানে গ্রাম্য চাষারা মাছের দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ জেলেদের উপর জুলুম করিতে উদ্যত হইয়াছে, এরূপ শুনা গিয়াছে। জেলেরা বলে, এক পাট-পচা জল, তাতে আবার কচুরীর তাপে মাছের বংশ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, আগের মত জলে আর তেমন মাছ মিলেনা, কোন কোন বৎসরের বংশ লোপ পাইতে চলিয়াছে। মাছ বাঙ্গালার প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। মাছ না মিলিলে, বাঙ্গালার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হইয়া পড়িবে।

পল্লীতে হাহাকার

আমি ইতিমধ্যে দেশে গিয়াছিলাম। কয়েক দিন দেশে থাকিয়া দেশের যে দুরবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা অবর্ণনীয় এবং হৃদয়বিদারক। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক—দেশাপড়া জানে না, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শত কষ্ট ইহারা নীরবে সহ্য করিতেছে।

ইতিহাসে মন্বন্তরের কথা পাঠ করিয়াছি, এবার তাহা অপেক্ষাও পল্লীগ্রামের অবস্থা অধিক শোচনীয়। পৌষ মাস হইতেই পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকের অন্নাভাবে দিন যাইতেছে। দুই বেলার বদলে কেহ এক বেলা, কেহ দোর মোচা প্রভৃতি পাইয়া দিন যাপন করিতেছে। বৈশাখ আষাঢ় মাসেই লোকে ঠেকিয়া থাকে, তাহাতো সামনে পড়িয়াই আছে। লোকের কি যে হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য অঞ্চলের ধনিগণ ও গ্রামের সচ্ছল ব্যক্তিগণ যদি একটু মুক্তহস্ত হইয়া উপযাচী প্রতিবেশীর সহায়তা করেন, তবেই অনেকটা রক্ষা হইতে পারে, নতুবা লোকের দুঃখ কষ্টের ভীষণতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। লোকে না খাইতে পাইয়া মরিবে—পল্লী লোকশূন্য হইবে।

মহাজনগণ মাসের ছেলে মাস ভাঙিয়া থাকেন। তাঁহারা ২।৩ বৎসরের মধ্যে শতি টাকার আসল বা সুদ কিছুই আদায় করিতে পারেন নাই, কাজেই নূতন করিয়া টাকা ধার দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। অন্যান্যশ্রেণী কৃষক কোথাও কিছু না পাইয়া নিজের এবং পরিবারের চিন্তায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ দিকে আবার যম রাজার বাহন কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক পীড়াসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে অনশনক্লিষ্ট, অভাবহেতু মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকদিগের উপর লীলা শেষ করিয়া দিতেছে। পয়সা নাই, ভাত নাই, ভিক্ষা নাই, রোগের চিকিৎসা নাই, এ অবস্থায় পড়িয়া রোগের হাত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ফলে দলে দলে লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে।

জলাভাব

পল্লীগ্রামে এই চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রায়ই কূপের জল শুকাইয়া যায়। যদিও বা ২।১টীতে স্বল্প পরিমাণ জল পাওয়া যায়, তাহাতেও এক প্রকার জলজ কীটের উদ্ভব হওয়ায় জল পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের অনেক অঞ্চলেই বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। একজন কর তিনজন আদায় হইতেছে। কিন্তু গ্রামের লোকের জন্য কূপ বা জলকূপ দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা অনেক স্থানে এখনও হয় নাই। বিশেষজ্ঞ যে সকল গ্রামে অশিক্ষিত লোকের বাস, তথায় ইউনিয়ন বোর্ডের কৃপাবারি আদৌ পতিত হয় না।

খাল বিল, ডোবা নালা এবং কূপের অপরিষ্কৃত কাদাজল পান করিয়া, আমি যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি সেই অঞ্চলের লোকেরা কলেরা রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হইতেছে।

কলেরার আক্রমণ

পাবনা জিলার বেড়া থানার এলাকাধীন রঘুনাথপুর, গোপালিয়া, দয়ারামপুর, খাঁপুরা, সিঙ্গুরী প্রভৃতি ১০।১২ খানি গ্রামে এবং সুজানগর থানার অধীন করা, চাকিপাড়া, সৈয়দপুর প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে কলেরা এবার ভীষণ ভাবে দেখা দিয়া অনেকগুলি পল্লী এক প্রকার জনশূন্য করিয়াছে। এই সকল গ্রাম যে যে অঞ্চলে অবস্থিত তথায় লোকের অন্নাভাবে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার উপর ভীষণ কলেরার আক্রমণে লোকের দুর্দশা ভীষণতর হইয়াছে। শীঘ্র গবর্ণমেণ্ট হইতে সকল গ্রামে সাহায্যের কোন বন্দোবস্ত করা না হইলে এই সকল পল্লী শ্মশানে পরিণত হইবে।

নওসের আলী আহম্মদ, পোঃ বাজারআমীরপুর,
গ্রাম সৈয়দপুর, পাবনা।

পাবনা জেলায় অন্নকষ্ট

রিলিফ কমিটির সভাপতিরূপে পাবনার কালেক্টারের নিম্নলিখিত আবেদনটী বাহির হইয়াছে :—

বর্ত্তমান বৎসরে পাবনা জেলার দরিদ্র অধিবাসিগণের মধ্যে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ মহকুমায় এই অন্নকষ্ট অতি প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, জলপ্লাবন ও কীটাদির উপদ্রবে ধান জন্মে নাই, তাহার উপর পাটের বাজার অত্যন্ত মন্দা হওয়ায় লোকের দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে।

জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড নিরন্ন অধিবাসীদিগের দুর্দশা-নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই ১,৭২,০০০৲ টাকা কৃষিঋণস্বরূপে

চাষী প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড শ্রমিকগণের সাহায্যের জন্য ১২,০০০৲ টাকা রাস্তার মাটী কাটার কাজে ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কেবল যাহাদের জমি আছে এইরূপ কৃষকগণের ও কায়িক পরিশ্রম করিতে সমর্থ পুরুষদিগেরই সাহায্য হইয়াছে। তাহাদের মধ্যেও অনেক লোককে ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে সাহায্য দিতে পারা যায় নাই।

ঐ সকল ব্যক্তি ব্যতীত বহু নিঃসহায় দরিদ্র লোক আছেন—যেমন বৃদ্ধ নরনারী, যাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধব কেহ নাই এবং অন্ধ খঞ্জ এবং ব্যাধিগ্রস্ত লোক ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা। ইহারা সাধারণতঃ প্রতিবেশীদিগের স্নেহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে। এতদ্ব্যতীত বহু পর্দ্দানশীন রমণী আছেন, যাঁহাদের কোনও সহায় সম্বলই নাই, কেবল সহৃদয় প্রতিবেশীদিগের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোনও মতে দিন চালান, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। বর্ত্তমানে এই সকল হতভাগ্য নরনারী ও বালকবালিকাগণ কোনও সাহায্যই পাইতেছেন না। তজ্জন্য তাঁহারা নীরবে দারুণ ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং হতাশ হইয়া অনাহারে মরিতে বসিয়াছেন।

যে উপায়ে হউক আমাদের স্বদেশবাসী এই হতভাগ্য নিরন্নগণকে বাঁচাইতেই হইবে। জনসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া আমরা মাত্র ২০০০৲ টাকা লইয়া এই মহতের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ঐ টাকার অধিকাংশই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দয়া করিয়া দিয়াছেন এবং সিরাজগঞ্জ হইতে সামান্য কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান সম্বল অতি সামান্য এবং এই দুর্ব্বৎসরে গবর্ণমেণ্টও বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

সেইজন্য আমি আমার সহৃদয় স্বদেশবাসিগণের নিকট দরিদ্র ও অসহায়দিগের সেবার জন্য সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি। অর্থ, অন্ন, বস্ত্র যে কোনও প্রকার দানই হউক, সিরাজগঞ্জের রিলিফ কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ, সি, হার্টলী, আই, সি, এসের নিকট অথবা পাবনা রিলিফ কমিটীর সম্পাদক খাঁ বাহাদুর মৌলভী এ, কে, ফজিলুদ্দিন আহমদ সাহেবের নিকট প্রেরিত হইলে সাদরে কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইবে। ইতি—

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল

(সুরাজ—পাবনা)

সিরাজগঞ্জ দুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপায়ের সমালোচনা

উপরে যে কথা লিখিত হইয়াছে তার বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইতেছে।

সিরাজগঞ্জের উন্নতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পাবনা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য যে ১২০০৲ শত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। তাহা দ্বারা যে পন্থা অবলম্বনে রাস্তা প্রস্তুত করা হইতেছে তাহা অদ্ভুত রকমের। বহুদিন হইতে যে ট্রাঙ্ক রাস্তা আছে তাহাতে গাড়ী ইত্যাদি চলার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ইহাকে আরো প্রশস্ত করিয়া ও ইহার দুই দিকে প্রশস্ত নয়ানজুলী করিয়া কোন স্থানে দুই হাত কোন স্থানে তিন হাত গভীর করিয়া বহু লোকের ধান ও কোঠা নষ্ট করিয়া অস্বচ্ছরূপে মাটী কাটিয়া প্রায় তিন ফুট উচ্চ করিয়া রাস্তা হইতেছে। চাষা শরীরের রক্ত জল করিয়া শ্রোত্রতাপিত হইয়া কি কষ্টে ধান ও কোঠা বপন করিয়াছে তাহা বোর্ডের কর্ম্মচারীদিগের কিছুমাত্র বুঝিবার সাধ্য নাই। হরবাড়ী গ্রামের নিকট রাস্তায় এইরূপ খুনাখুনী করা শক্ত নষ্ট করিয়া মাটীকাটার প্রতিবাদকল্পে প্রায় ৩০০ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিল। হলিদা গ্রাম হইতে আলুকদিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া বাগবাটী হাটখোলা পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইয়াছে তাহা আরো অদ্ভুত। এই রাস্তা সম্পূর্ণরূপে গ্রামের মধ্য দিয়া হইয়াছে। সুতরাং রাস্তার উপর ১০ হাত প্রশস্ত ও ২।৩ ফুট উচ্চ করিতে কাহারও দশত বাড়ীর উঠানে, কাহারও বাড়ীর পশ্চাৎভাগে ৩৪ হাত কাহারও বা ৫।৫ হাত প্রশস্ত নয়ানজুলী করিয়া মাটী লেওয়া হইয়াছে ও কাহারও মরিচের চাল, কাহারও বড় বড় গাছ কাটিবার জন্য কর্ত্তারদিগের যাদু হুকুম দিয়াছেন। প্রায় তিন শত কুলী যোগাড়ের করিয়া তাকাতপড়ার মত তাড়াতাড়ি কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। এমন কি, এই রাস্তা সোজা করিবার জন্য বোর্ডের বহু দিনের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া

একটা বাড়ীর উপর দিয়া কোন পুলাতক ব্যক্তির ঘরের ভিটা নষ্ট করিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। ঝরিপা গ্রাম হইতে হাটখোলা পর্য্যন্ত যে রাস্তা প্রস্তুত হইল, তাহাতে গ্রামের উত্তর দিকস্থ নদীর জল গ্রামে প্রবেশ করার সমস্ত নালাগুলি বন্ধ হইয়া গেল। প্রত্যেক বৎসর বর্ষার জল গ্রামে প্রবেশ করিয়া খাল-বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া যায়। গত বৎসর বেশী বর্ষা হওয়ায় এই বৎসর ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। গ্রামে যত ডোবা ও খাল বর্ত্তমান আছে, তাহার উপর এই রাস্তার জন্য যে সমস্ত গভীর খাল হইল তাহা বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে ও বৃক্ষপত্র ইত্যাদি পচিয়া এমত দুর্গন্ধ হইবে যে, লোকের বাস করা কঠিন হইবে ও খুব সম্ভব লোকের বাটীতে যে ৩।৪ হাত গর্ত্ত হইল তাহার জলে ডুবিয়া তাহাদিগের শিশু সন্তানগুলি মারা যাইবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়
(সুরাজ—পাবনা)

ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ

হরিপুর রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আবদুল সরকার (পোঃ পূর্ব্বদিয়র) লিখিয়াছেন—১১ নং হরিপুর ইউনিয়নে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অনশনক্লিষ্ট হীন দরিদ্রদিগকে এই দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত এখানে একটী রিলিফ কমিটি খোলা হইয়াছে। কিন্তু সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ অতি অল্প দিনেই তহবিল নিঃশেষ হইয়া আসিল। বর্ত্তমানে অনাবৃষ্টি বশতঃ শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বে আউশ ধান্য পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আরও প্রায় দুই মাস রিলিফের কার্য্য উদ্যমের সহিত চালাইতে হইবে। বর্ত্তমানে কমিটীর তহবিলে ৬৮/১ ছয় টাকা সতরা পনর আনা মাত্র আছে। এই দুর্দ্দিনে স্থানীয় চাঁদা আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

গাইবান্ধার আবেদন

সকলেই অবগত আছেন যে, পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় বাঙ্গালার পাট-প্রধান জেলাগুলিতে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গাইবান্ধা মহকুমাও এই বিপদ্ হইতে রেহাই পায় নাই। বিশেষতঃ কৃষক-মণ্ডলে অর্থাভাব এবং দুর্দ্দশা রোজ রোজ বাড়িতেছে। গত আশ্বিনের শেষে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল বন্যা আসিয়া সমস্ত আমন ধান্য নষ্ট করিয়া দেয়। কাজেই অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্নাভাবের হাহাকার চারিদিকে দুর্দ্দশার কথাই জ্ঞাপন করিতেছে। গাইবান্ধার ৩০।৩৫ মাইলব্যাপী নিম্নভূমির অধিবাসী সকলেই আজ একান্ত বিপন্ন। প্রায় ২।০ লক্ষ লোক অন্নকষ্টে বিপন্ন, অনাহার-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা রোজই বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরুপায় হইয়া কত পিতা ও মাতা কত দুগ্ধ-পোষ্য শিশু-সন্তানদের রাখিয়া নিষ্ক্রমণ হইতে বাধ্য হইতেছে। এই সব অঞ্চলে যেসব কংগ্রেস-কর্ম্মী আর্ত্ত ও নিরন্নদের সেবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাঁহারা জানাইতেছেন যে, এই অঞ্চলের লোকদের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

আজ তাই আমরা নিরন্ন ও বিপন্নদের সেবার জন্য দেশবাসীর নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিতেছি। আপাততঃ আমরা প্রতিদিন ১৫ মণ চাউল ও সামান্য কাপড় বিতরণ করিতেছি। আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অতি অল্প। দেশবাসীর কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া গ্রামবাসীদের প্রাণরক্ষা করুন। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে। সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য কোষাধ্যক্ষ হাফিজর রহমান, এম, বি, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। নিবেদক মহিউদ্দিন খাঁ, সভাপতি গাইবান্ধা কংগ্রেস কমিটী।

গাইবান্ধা কৃষক শ্রমিক-সঙ্ঘ

সফিউদ্দিন আহম্মদ, মোক্তার, গাইবান্ধা হইতে লিখিয়াছেন, গাইবান্ধা কৃষক শ্রমিক সঙ্ঘের নেতা মৌঃ সেখ সাহ মোহাম্মদ আলী সাহেব দুর্ভিক্ষের কবল হইতে কৃষক ও মজুরদিগের রক্ষার্থ রিলিফ কমিটী স্থাপন করিয়াছেন, এবং গাইবান্ধা কংগ্রেস রিলিফ কমিটীর পক্ষ হইতে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ চাউল ও কাপড় বিতরণ করিয়াছেন :

১। ভরতখালির কংগ্রেস রিলিফ কমিটী—চাউল ২৬/০ মণ, কাপড় ৭ খানা।

২। সাধাটা—চাউল ২০/০ মণ।

৩। কুমারখাড়ী—চাউল ১৭/০ মণ।

৪। বোনারপাড়া—চাউল ১৮/০মণ, কাপড় ১৯ খানা।

মফঃস্বল সংবাদ

( )

যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত প্রতি হাটে বাজারে ধান, চাউল, ডাল, তরিতরকারী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল খাদ্য দ্রব্য বলিয়া নহে, জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য প্রত্যেক জিনিষের দরই বাড়িয়াছে। হঠাৎ এই প্রকার বাজার-দর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা নানাবিধ গুজবই শুনিতে পাইতেছি। এবার টাকার এতই অভাব যে, দরিদ্র সাধারণ সস্তার জিনিষও কিনিতে পারিতেছে না। তদুপরি যদি ক্রমশই খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে দেশে যে একটা অশান্তি, উদ্বেগ, ও আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এই মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে ও তৎপ্রতীকারার্থ চেষ্টা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

(২)

বাঞ্ছারামপুর ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রামে গো-মরক দেখা দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি গরু রোগাক্রান্ত হইয়াছে তাহার একটীও রক্ষা পায় নাই। যাহাতে পশু-চিকিৎসক সত্বর এ অঞ্চলে আসিয়া গো-মরক নিবারণে যত্নবান হন তজ্জন্য আমরা প্রেসিডেন্টদ্বয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(৩)

গত ১৮ই চৈত্র সন্ধ্যার পর এ অঞ্চলে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং তৎসঙ্গে অনেক করকাপাত হইয়া গিয়াছে। করকাপাতে বোর ধান, আম, ভুট্টা ও খিরাই প্রভৃতির অনিষ্টসাধন করিয়াছে। ভুট্টাতে চাষ-আবাদের সুবিধা হইয়াছে। এবার কৃষকেরা পাটের চাষ খুব কম করিয়াছে। প্রতি বৎসর যে পাটের বীজ ৸০, ৷০ আনা সের দরে বিক্রয় হইত, এবার তাহা ৵০, ৴১০, ৴৫ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

(৪)

বাঞ্ছারামপুরী কংগ্রেস শিবির হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করায় ইউনিয়ন বোর্ড হইতে ঔষধ দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

(৫)

স্বাস্থ্যের অবস্থা আদৌ ভাল নয়। প্রায় প্রতি গ্রামেই ম্যালেরিয়া জ্বর, উদরাময়, হামজ্বর, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণ পরিলক্ষিত হইতেছে।

(পল্লীবেণু—চাকা)

নোয়াখালিতে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাষ

কেণী মহকুমার কুটীরহাট ও রামপুরের, সদর মহকুমার সেনবাগ থানার ১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং ইউনিয়নের সম্পূর্ণ স্থানের, বেগমগঞ্জ থানার তিন চারিটী গ্রামের এবং কোম্পানীগঞ্জ থানার ১নং ও ২নং ইউনিয়নের সমস্ত স্থানের অর্দ্ধেক জমির আশুধান্য একপ্রকার 'লেদা' পোকায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এইসকল পোকা ধানের গাছ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহারা গ্রামের ঘাস পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে। চার পাঁচদিন যাবৎ প্রবল বারিপাত হওয়ায় পোকা নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু পুনরায় আশুধান্য রোপণের কোন আশাই আর নাই। এই বছর প্রজার যে প্রকার অভাব অনাটন তাহার উপর কৃষি নষ্ট হওয়ায় তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামে চুরির সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে। দরিদ্র প্রজাগণ ও জমি-জোত-শূন্য খেতার শ্রমজীবিগণ অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অসৎ উপায়ে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা করিতেছে। দরিদ্র কৃষিজীবিগণ পেটের জ্বালায় বীজ ধান্য পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহারা গ্রামের ধনাঢ্যদিগকে ধান দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। মহাজনগণও খাতকের নিকট হইতে এই বৎসর টাকা

আদায় করিতে না পারায় ঋণদান করিতে পারিতেছে না। অধুনা প্রজাগণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে শাসাইতেছে। আষাঢ় মাসে দেশের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বাহ্নেই সরকারকে সদর মহকুমায় ২৫০০০৲ হাজার ও সেদীতে ২০০০০৲ হাজার টাকা কৃষিঋণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন। অনেক আলোচনার পর ঠিক হয় যে, কৃষিঋণ পাওয়া গেলে যাহাদের দুই কানি জমি আছে এইরূপ প্রজাকে বীজ ধান ইত্যাদি খরিদ করার জন্য কানি প্রতি ৭৷০ টাকা হারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। বেকার শ্রমজীবিগণের সাহায্যের জন্য ইউনিয়নবোর্ড ও ডিষ্ট্রি বোর্ড তাহাদিগকে কাজে খাটাইয়া যথাসম্ভব কম খরচে রাস্তাঘাট মেরামত এবং কচুরীপানা ও জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(দেশের বাণী—নোয়াখালি)

বিক্রমপুরের আর্থিক অবস্থা

বাহেরক

এবার এ-অঞ্চলে পাটের আবাদ কম হইয়াছে। পাটের পরিবর্ত্তে লোকে যথেষ্ট ধান বুনিয়াছে। এদেশে মোটেই আম হয় নাই। গত বৎসর অনেক গরীব লোক আম খাইয়া বাঁচিয়াছে। এবার কোন গাছে আম দেখা যায় না। অন্য স্থান হইতেও আমদানি হয় না। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে দুধ বেশ সস্তা। মাছ পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু উহা দুর্ম্মূল্য। তরকারী যথেষ্ট পাওয়া যায়, মূল্যও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বেশ সুলভ। চাউলের দর ৷৷০ ও ৷৷০, ডাল তৈল ইত্যাদি সুলভ। মোটের উপর এবার সকল জিনিষই সস্তা।

টাকার অভাব

টাকা পয়সার আমদানি না থাকায় দেশে হাহাকার। লোকের হাতে মোটেই পয়সা নাই। কাজ কর্ম্মও পাওয়া যায় না। ৵০, ৶০ ষোল হিসাবে মজুর পাওয়া যায়। এত সস্তা কাজ এদেশে কেহ কখনও করায় নাই। এবার সস্তা মজুর পাইয়া অনেকে পুষ্করিণী কাটাইয়া লইয়াছে। আরও অনেকে পুকুর কাটাইত, কিন্তু নদীর জলে তাহা করে নাই। কুলী মজুর কৃষকেরা হয় এক প্রকারে দিন কাটাইতেছে; কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই। অনেক পরিবার বিদেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশায় বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহাও উপযুক্ত সময়ে না পৌঁছাতে অনেক সময় উপবাস করিয়া থাকে। এবার দেশে কাহারও নিকট ধার পাওয়া যায় না। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার সামান্য তালুকদারী বা দু'চারখানা জমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু এবার উহা পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাদিগকে উপবাস করিতে হইতেছে। কৃষকেরা এবার খাজানা বা পত্ত কিছুই দেয় না, চাহিলে বলে সুদিন আসুক, সবুর করুন। সুদিন কবে আসিবে ভগবান জানেন।

(পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

পাবনায় কলেরার প্রকোপ

পাবনা জেলার বেড়া থানার অধীন অনেকগুলি গ্রামে মাসাধিককাল হইতে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হইয়াছে, শুধু এক ঘোপলিন্দা গ্রামেই প্রায় ৬০।৭০ জন লোক এই রোগে মারা গিয়াছে। অন্যান্য গ্রামেও মৃত্যুর সংখ্যা কম নয়? বর্ত্তমানে ঐ সব গ্রামে ঔষধ ও সেবার অভাবে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। কাহারও দ্বারা কাহারও সাহায্য হইবার উপায় নাই। গ্রামে এই প্রকার ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ পানীয় জলের অভাব। এই সমস্ত গ্রামের নিকটে একটী বিল আছে, পূর্ব্বে এই বিলে প্রচুর জল থাকিত। আজ কয়েক বৎসর হইল যমুনা নদী নিকটে আসায় এই বিলের মুখ কার্ত্তিক মাসেই বন্ধ হইয়া যায়। যমুনা ও পদ্মা নদীর জল পাইবারও উপায় নাই। বিলটীর দুইদিকের মুখই বন্ধ হওয়াতে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কেবল কতকগুলি কাদা থাকে, ঐ কাদার উপরে জোর ১৷০ হাত জল থাকে ও তাহা

অতীব দুর্গন্ধময় হইয়া যায়। এই বিলটীর উভয় পার্শ্বের অধিবাসীরা নিরুপায় হইয়া এই দুর্গন্ধযুক্ত কাদা জলই ব্যবহার করে। এই কাদা জল ব্যবহার করিয়াই গ্রামবাসী কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। জলের কোন একটা সুব্যবস্থা না হইলে অদূর ভবিষ্যতে লোকের অবস্থা আরও ভয়াবহ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত গ্রামে কচিৎ কোন বাড়ীতে ইঁদারা বা কূপ আছে। দুই একটী অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী ইঁদারা আছে। সেই সব পাড়ায় কলেরার উপদ্রবও কম। যাহারা নদীর জল ব্যবহার করিতেছে তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশই কলেরার কবলে পড়িতেছে। এই সব স্থানে কূপ কি ইঁদারা খনন করা বড় ব্যয়সাধ্য। এ কারণ অধিকাংশ লোকেই কূপাদি খনন করাইতে পারে না। যদি জেলাবোর্ড হইতে ঐ সমস্ত গ্রামের মাঝে মাঝে করিয়া নলকূপের ব্যবস্থা হয় তবে জনসাধারণ এই ভীষণ জলকষ্ট ও কলেরার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

শ্রীবিনোদরঞ্জন শিকদার
সন্ন্যাসীবাধা, পাবনা
(সুরাজ—পাবনা)

কাঁথিতে ওলাউঠার ব্যাপকতা

কাঁথি মহকুমার নানাস্থানে ওলাউঠা ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং অনেক লোক উহাতে মারা যাইতেছে। খলাধালী, হরিপুর, বাহিরীপাইকবাড়, বালীয়া-শঙ্করপুর, সুবর্ণনগর, বহরোপাদুই ও রূপনগর প্রভৃতি বহু গ্রামে লোকে ওলাউঠাক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। এ সময় ওলাউঠার বিধি-নিষেধগুলি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা এবং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সকলের পক্ষেই একান্ত উচিত। অন্যদিকে জেলাবোর্ড হইতেও ওলাউঠাক্রান্ত পল্লীগুলিতে চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত-সংখ্যক চিকিৎসক প্রেরণ করা একান্ত আবশ্যক।

প্রাকৃতিক উপদ্রব

স্থান হইতে পোকার অত্যাচার সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সবে মাত্র আউশ ধান গাছ ধরিয়া উঠিয়াছে, ইহারই মধ্যে পোকা কর্তৃক ঐ সব ধানের চারা বিনষ্ট হইতেছে। ইহা ভাবী আশঙ্কার কারণ। বলা যায় না দেশের ভাগ্যে এবার কি আছে। একেইত অভাবের রাক্ষসী মূর্ত্তি চারিদিকে করাল বদন ব্যাদন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আউশ ধানের এই মহামারী বাস্তবিকই আমাদিগকে ভাবী আশঙ্কায় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে কৃষি বিভাগের এবং জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। এ সম্পর্কে আমরাও কৃষকগণকে একটি উপদেশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সকল পোকা বিনাশের একমাত্র উপায় উনুনের ছাই। যে সকল স্থানে এই সকল পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, সেই সকল স্থানের কৃষকগণ সারাদিন ছাই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ঐ ছাই ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া ধান গাছের উপর ছড়াইয়া দিবে। এই প্রকারে উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন বা ৩।৪ দিন দিতে পারিলে সমস্ত পোকাই মরিয়া যাইতে পারে। যদি ইহাতেও বাধা-বিঘ্ন না হয়, তবে অভিজ্ঞদের পরামর্শানুযায়ী যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া পোকার অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিতে হইবে। ছাই যে পোকার একমাত্র ঔষধ তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। তবে ছাইগুলি শুষ্ক হওয়া দরকার এবং তাহার সহিত অন্য কোনও জিনিষ যাহাতে মিশিতে না পারে, তাহার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাতঃকাল ব্যতীত অন্য সময়ে ছাই নিক্ষেপ করা ফলপ্রদ হইবে না। কৃষকগণ আপনাদের কৃষির কণ্টক দূর করিবার চেষ্টা করিলে অনেকটা সফলতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

(নোয়াখালি হিতৈষী)

চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ভদ্রাসন গ্রামের নিবারণচন্দ্র সাহার বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা প্রায় ২৫০০৲ টাকা লইয়া গিয়াছে। পালং ষ্টেশনে রেল ডাকাতির

সম্পর্কে ধৃত একব্যক্তি স্বীকার উক্তি করায়, পুলিশ কিছু টাকা ও গহনাপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

যশোহরের অন্তর্গত ঝিনাইদহের বেলডাঙ্গা হাট হইতে ফিরিবার সময় উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কাপড় ও টাকাকড়ি কয়েকজন ডাকাত লুট করিয়া লয়। ১০ জন ধৃত হয়, তন্মধ্যে ১ জনের ৫ বৎসর ও ৪ জনের ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বাকী ৫ জন ও ২ জন স্ত্রীলোক খালাস পাইয়াছে।

বরিশালের অন্তর্গত হিজলা গ্রামের অবয় আলির গৃহে চোর প্রবেশ করিলে অবয় আলি তাহাকে জড়াইয়া ধরে। চোরের সঙ্গী অবয় আলির পেটে ছোরা বসাইয়া দিয়া উভয়ে পলায়ন করে।

বরিশালের অন্তর্গত হিজলা থানার ভায়ইয়া গ্রামের সনাতন নাথের গৃহে ডাকাত পড়িয়া ৩ হাজার টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে।

নদীয়ার অন্তর্গত কালীগঞ্জের নিকটস্থ কমলবাটী গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে।

বাবু যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য পলাশীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। একব্যক্তি তাঁহার মাথায় লাঠি মারিয়া আশী টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তিনি নিমাই সেখ নামক এক প্রসিদ্ধ ডাকাতের নাম করিয়াছেন। সে পলাতক আছে।

দিনাজপুরের নিকটস্থ ডামুড্যা হাট হইতে আসিবার সময় অজ্ঞাতকুল বিষ্ণুর অনেক টাকা অপহৃত হইয়াছে।

যশোহরের অন্তর্গত ঝিঁকরগাছা থানার লাউজানি গ্রামের পূজারীর বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে।

যশোহরের অন্তর্গত মাজিয়া গ্রামের বিজয়কুমার দত্ত শঙ্করডাঙ্গা হাট হইতে ফিরিবার পথে কয়েকজন লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। দস্যুরা তাঁহার উদরে বর্শা বিদ্ধ করে। বর্শার ফলক টানাটানিতে পেটের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহাকে কলিকাতার হাসপাতালে আনা হইয়াছে। তিনি ক্রমে সুস্থ হইতেছেন।

হাবকুড়ি, মুগকল্যাণ, বাঁটুল প্রভৃতি স্থানে চোরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফুলকা জেলার বীরহারওয়া থানার সাতসাহি গ্রামের শ্রীনবীনচন্দ্র দাসের বাড়ীতে ২০ জন ডাকাত ঢুকিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে এবং তাঁহাকে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া তাহাতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া এক গর্ত্তে ফেলিয়া আগুন লাগাইয়া তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোককেও ভীষণ প্রহার করিয়াছে। ঐ গ্রামে ও পার্শ্বের গ্রামে অনেকবার ডাকাতি হইয়াছে।

মুন্সিগঞ্জের অন্তর্গত টঙ্গিবাড়ী থানার ভরানগর গ্রামের মাঠে এক মস্তকহীন দেহ পাওয়া যায়। বম্বেগাওর এক মুসলমান স্ত্রীলোক ঐ দেহ তাহার স্বামীর বলিয়া সনাক্ত করে। ঐ ব্যক্তি টাকা আদায় করিয়া ঘটনার দিন গৃহে ফিরিতেছিল।

ডাকাতির হিড়িক

ইংরেজী ১৯০১ সনের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে, সহর মফঃস্বলে, জলে স্থলে সর্ব্বত্র শনৈশ্চরের যে দৌর্দ্দণ্ড ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। বাঙ্গালার দিকে দিকে যতই অপরিমিত ভাবে ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, ততই দেশের শান্তি ব্যাহত হইয়া পড়িতেছে। দেশের শান্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে, শাসক সম্প্রদায় এবং মনীষী নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে, নতুবা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা কখনও রক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে না।

গত জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রত্যেক জনপদে, প্রত্যেক সহর বন্দরে ও মফঃস্বলে যে সকল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টে চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। আমরা বাঙ্গালার জিলাগুলির কোথায় কত ডাকাতি হইয়াছে, তাহার একটী হিসাব প্রদান করিলাম, উহাতেই বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল কতদূর তাহা অনায়াসে নির্ণয় করা যাইবে।

জিলার নাম	ডাকাতির সংখ্যা
মেদিনীপুর	১০৩
রংপুর	৭৭
ময়মনসিংহ	৬৮

২৪ পরগণা	হুগলী ২০
ঢাকা	জলপাইগুড়ি ২৩
দিনাজপুর	পাবনা ২২
বগুড়া	মুর্শিদাবাদ ২০
বাখরগঞ্জ	ফরিদপুর ১৩
নদীয়া	
বর্দ্ধমান	
চট্টগ্রাম	
খুলনা	
মালদহ	
রাজসাহী	
রংপুর	

দেশের জনসাধারণের ধনপ্রাণ কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণও কিরূপ ব্যাকুলভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে। যদি ইহার কোনরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা না হয় এবং এইভাবে আরও কিছু দিন এই ডাকাতি কার্য্য চলিতে থাকে, তবে দেশের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িবে তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

(নোয়াখালি-হিতৈষী)

বিহার-উড়িষ্যার শিল্প-পরিচয় (১৯২৯-৩০)

লাক্ষা

লাক্ষা প্রধানতঃ বৈশাখী, কটকী, কুসুমী, এবং জেঠি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈশাখী শস্য তত্দূর ভাল হয় নাই, কটকী ফসলের অবস্থা পূর্ব্ব সনের চেয়ে ভাল হইলেও আশানুরূপ হয় নাই। অঘানি ফসল এক সিংভূম ছাড়া আর কোথাও আশানুরূপ হয় নাই। জেঠি ফসলের অবস্থা সর্ব্বত্রই খারাপ। জুলাই, সেপ্টেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি মাসে পলাশের ভাল দর ছিলিছিল; সেপ্টেম্বর মাসে বের ফসলের দরও ভাল ছিল। মোট কথা, গোটা বৎসর ধরিয়া সকল রকম ফসলই বেশ ভাল দরে বিকাইয়াছে।

ধান ছাঁটাই

আলোচ্য সনে বিহার প্রদেশে ধান তত ভাল ফলে নাই। এইজন্য বাঙ্গালা এবং সম্বলপুর অঞ্চল হইতে উন্না চাউল আমদানি করিতে হয়। বাঙ্গালা এবং সম্বলপুরের চাউল বিহারী চাউলের চেয়ে ভাল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চাউলের চাহিদাও বেশ দেখা যায়। বিহারের চালকলগুলি হইতে পশ্চিম অঞ্চলে আরোয়া (আতপ) চাউল চালান যায় বিস্তর; আলোচ্য সনে রেঙ্গুনী চাউলের জন্য এই চাউল পশ্চিমাঞ্চলে সেরূপ কাটিতে পারে নাই। বিহারী ধানের দর বেশী, সেইজন্য কলওয়ালারা রেঙ্গুনী চাউলের প্রতিযোগিতার মুখে ধানের সুবিধাজনক পড়তা ফেলিতে পারে নাই। সুতরাং অধিকাংশ বিহারী কলকেই সারা বৎসর ধরিয়া বেশ পাইতে হইয়াছে।

সর্ষ্ষপ তৈল

আলোচ্য সনে বিহারে সরিষা ভাল ফলে নাই, সেই জন্য সরিষার দাম চড়িয়া যায়। ফলে যুক্তপ্রদেশের তেলকল-ওয়ালাদের সঙ্গে বিহারী তেলকলওয়ালাদের আটিয়া উঠা কঠসাধ্য হইয়া পড়ে। বৎসরের গোড়াতেই সরিষার বাজার অত্যন্ত চড়া হয়, তবে পরে আবার বাজার ভাল হইয়া যায়। অধিকাংশ বিহারী মিলের ভাগ্যেই এই সনে লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। কোনরূপ খরচা পোষাইয়া লইয়া মিলগুলি এই বৎসরে টিঁকিয়া থাকিতে পারিয়াছে।

ময়দার কল

বিহার অঞ্চলের ময়দা প্রধানতঃ বাঙ্গালায় চালান হয়। আলোচ্য সনে বিহার হইতে ময়দা চালান দেওয়া সেরূপ সুবিধাজনক হয় নাই। কারণ বাঙ্গালার ময়দা আটার কলে এখন অষ্ট্রেলিয়ান গম ব্যবহৃত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ান গম ভারতীয় গমের চেয়ে উৎকৃষ্ট, ইহাতে ময়দা আটাও হয় বেশী। সুতরাং বিহারের ময়দার কলগুলি তথা ভারতীয় গম উৎপাদনকারীরা মুস্কিলে পড়িয়াছে। বিহারের কলগুলি আলোচ্য সনে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় লাভ করিতে পারে নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া কল কলের সংখ্যা আর বাড়ে নাই। ভাগলপুরে একটি নূতন কল স্থাপিত হইতেছে; কলটির নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

লোহা-লকড়

সুবিখ্যাত টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা

এই প্রদেশের জামশেদপুরে অবস্থিত। ১৯২৮ সনের ধর্ম্মঘটের দরুণ আলোচ্য সনে এই কারখানার ইস্পাত-উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। সরকারী রেলওয়েগুলির তরফ হইতে বেশী অর্ডার না আসাতে অবস্থা আরো খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। কারখানায় যে নির্ম্মাণের কার্য্য যাতে লওয়া হইয়াছিল তা চলিতে থাকে, তবে তেমন গুরুতর কোন নূতন কাজে হাত দেওয়া হয় নাই। সহরে শ্রমিকদের জন্য অনেক কোঠা বাড়ী তৈয়ারীর কাজ শেষ হইয়াছে। জলের জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা, বিজলি সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করা হয় নাই।

তারের পেরেক শিল্প

জামশেদপুরে দি ইণ্ডিয়ান ষ্টীল্ ওয়ার প্রডাক্টস্ কোম্পানী সকল রকমের পেরেক তৈয়ারী করিয়া থাকে। আলোচ্য সনে পেরেক-উৎপাদনের খরচা যথেষ্ট কমাইয়া দিলেও, দেখা গিয়াছে যে, আমদানি করা বিদেশী পেরেকের চেয়ে এই স্বদেশী পেরেক দামে অনেক আক্রা। কোম্পানী পেরেক পরিষ্কার এবং পালিশ করার জন্য ৬টী ব্যাট্‌লার মেশিন্ বসাইয়াছে। এ ছাড়া আলোচ্য সনে আরও ১২টী উন্নত ধরণের পেরেকের মেশিন আমদানি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ছোট ছোট পিপা হাতেই তৈয়ারী করা হইত। আলোচ্য সনে একটী স' বেক এবং কেগ্ মেশিনও কায়েম করা হইয়াছে। ষ্টীল্ বেণ্ডিং সেকসান এবং চাঁদির তার প্রস্তুত করার সেক্‌সান খোলা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত সেখোক্ত সেকসানে ১০,০০০ তোলা চাঁদির তার প্রস্তুত এবং বিক্রী হইয়াছে। আলোচ্য সনে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে এই নূতন শিল্পটী আরম্ভ হইয়াছে।

লোহার ফাউণ্ড্রি

ছোট ছোট লোহার কারখানাগুলির অবস্থা আলোচ্য সনে বিশেষ ভাল যায় নাই। কারণ জল-চালিত আক মাড়াইয়ের কলের চাহিদা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে এবং তৎস্থলে স্বয়ং-চালিত কলের রেওয়াজ ক্রমশই বাড়িতেছে।

কয়লা-শিল্প

আলোচ্য সনে বিহার-উড়িষ্যার মোট কয়লা-উৎপাদনের পরিমাণ ১৪৯ লাখ টন; ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৫ লাখ এবং ১৪৭ লাখ টন। এই প্রদেশে ঝরিয়ার খনি অঞ্চল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অঞ্চলের উৎপাদনে বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই; কারণ ১৯২৭, ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১০৫, ১০৬ এবং ১০৬ লাখ টন। হাজারিবাগ অঞ্চলে রেল কোম্পানী-অধিকৃত খনিগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যই গোটা প্রদেশের উৎপাদন বাড়িয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য সনে কয়লার উৎপাদন-বৃদ্ধি বেশ স্থির গতিতে চলিয়াছে, তবে উৎপাদন সেরূপ বেশী বাড়ে নাই। খনি-অঞ্চলে কুলি-সরবরাহ সম্বন্ধে কোন অসুবিধা দেখা যায় নাই। এই সনে গবর্ণমেণ্ট খনিগুলির উপর একটী নূতন সেস ধার্য্য করিয়াছেন। এই সেস্‌লব্ধ অর্থ গৃহস্থালীর কার্য্যে নরম কোক্ কয়লার প্রচলন বাড়াইবার জন্য প্রচার-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু এই সরকারী প্রচেষ্টা, নরম কোক্ কয়লা-শিল্পকে কতদূর সহায়তা করিবে তাহা এখনই বলা সম্ভবপর নয়। খনি-অঞ্চলে মালবাহী গাড়ীর (ওয়াগন্) যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। ১৯২৯ সনের বর্ষাকালে মালগাড়ীর অভাবে অনেক কয়লা খাদেই থাকিয়া যায়। কয়লার খাদে বালি প্রদান কার্য্য সমভাবে চলিয়াছে। এতদর্থে সম্প্রতি একটী সমবায় সোসাইটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

ম্যাঙ্গানিজ ওর্

আলোচ্য সনে বিহার অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ্ উৎপাদন কমিতে দেখা যায়। দুনিয়ার বাজারে টানের চেয়ে যোগান বেশী হওয়াতেই ম্যাঙ্গানিজ্ শিল্পের এই দুর্দ্দশা। সোভিয়েট রুশিয়া ককেশাস অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ্ আহরণ করিয়া তাহা অসম্ভবরূপ সস্তা দরে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের গঙ্গা-যাত্রার উপক্রম হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও

নাকি ম্যালানিজের সন্ধান মিলিয়াছে; সেও একটা ভরের কারণ বটে।

অভ্র-শিল্প

অভ্র-শিল্পের অবস্থা বেশ ভাল। বাজারে ইহার টানও যেমনি দরও তেমনি সুবিধাজনক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই শিল্পটী তেমন জোর করিতে পারে নাই।

ভাগলপুরের রেশম-শিল্প

ভাগলপুরের রেশমের বাজার একেবারে মাটী, তবে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনে অবস্থা কিছু ভাল।

শক্তিচালিত হোসিয়ারি এবং নিটিং শিল্প

আলোচ্য সনে ঝরিয়ায় একটি শক্তি-চালিত হোসিয়ারি এবং নিটিং মেশিন্ স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানীটি বিহার উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিহার উড়িষ্যা ষ্টেট্ এড্ টু ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ আক্‌ট্ অনুসারে সহায়তাও পাইতেছে। আলোচ্য সনের নবেম্বর মাস হইতে মিলের কার্য্য আরম্ভ হয়। সেখিনে সুন্দর সুন্দর গেঞ্জি, আণ্ডার ভেষ্ট, ইভিন্ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। এই নব্য মিল বিহার উড়িষ্যায় একটি নূতন শিল্প কায়েম করিয়াছে।

বিহার উড়িষ্যার কুটীর-শিল্প

আলোচ্য সনে বিহার উড়িষ্যার কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌এর কার্য্যাবলী বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। আলোচ্য সনে ইন্‌ষ্টিটিউটের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ, ১,৭৭,১২০ টাকা; ১৯২৮ সনে ছিল ১,৩২,৪০৯ টাকা। ইন্‌ষ্টিটিউট পরিচালনের খরচা ২৪,৪০১ টাকা মাত্র। বর্ত্তমানে পর্দ্দা সেক্‌শানটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইয়াছে। লণ্ডন এজেণ্ট প্রায় ১০,০০০ টাকার মাল বেচিয়াছে; নিউজিল্যাণ্ডেও একটি এজেন্সি খোলা হইয়াছে এবং উহার কাজও বেশ সন্তোষজনক দেখা গিয়াছে। পর্দ্দা শিল্পের মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১৯,৩৭৯ টাকা। এই ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রায় ৫৯ প্রকার নূতন ডিজাইনের পর্দ্দা প্রস্তুত হইতেছে।

বয়ন ও রঞ্জন সম্বন্ধেও নানাপ্রকার গবেষণা-কার্য্য এবং ডিমন্‌ষ্ট্রেশান চলিতেছে। তবে এই নূতন প্রচেষ্টা এখনও নিতান্ত শৈশবাবস্থায় আছে বলিতে হইবে।

পুরী মাচ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ কোম্পানী এবং মজঃফরপুর বেঙ্গল ফ্রুট প্রিজার্ভিং কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের পাওনা পরিশোধ করিতে না পারায়, গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিহার গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিয়া শিল্পকার্য্যে সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানীর পক্ষেই উহা প্রণিধানযোগ্য নহে।

আলোচ্য সনে বিহার-উড়িষ্যা হইতে মাছ চালানের পরিমাণ ১১৪,২২০ মণ, ১৯২৮ সনে ছিল ৮৪,১৫৮ মণ। চিল্কা হ্রদ হইতেই অধিকাংশ মাছ রপ্তানি হইয়াছে। পুকুরের জন্য মাছের পোনা চালানের পরিমাণ আলোচ্য সনে ২৫০,৫০০ ফ্রাই; পূর্ব্ব সনে ছিল ২২৮,৫০০ ফ্রাই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে কার্পাসজাত বস্ত্র রপ্তানি (১৯২৯-৩০)

১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে সিন্ধ বর্জ্জিত বোম্বাই প্রদেশের কার্পাসজাত বস্ত্র রপ্তানির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:

তুলা

আলোচ্য সনে বোম্বাইয়ের তুলার বাজার নৈরাশ্যব্যঞ্জক। গোটা দুনিয়া জুড়িয়া এই সনে তুলার দর নামিতে দেখা যায় এবং তুলার দর সম্বন্ধে স্পেকুলেশনও একরূপ স্থগিত থাকে। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারেও এই দুনিয়া-ছাড়া ব্যাপারের ধাক্কা লাগে। ভারতীয় তুলার দর প্রতি ক্যাণ্ডি ১৪ হইতে ২০ টাকা দাঁড়ায়। এইজন্য গোটা ভারতীয় তুলা দর-হিসাবে আমেরিকান তুলার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। মূল্য-হ্রাসের জন্য ইয়োরোপে ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধি হয়। ভারতীয় মিল-গুলিতে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বেশী তুলা লাগিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মঘট হওয়ায় এক ঝোঁকে অত্যধিক মাল জমা হইয়া থাকায়

অত কাটতি সেরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। এই সনে আমেরিকান তুলার পরিমাণ ১৪,৯১৯,০০০ বেল (প্রত্যেক বেলএ ৫০০ পাউণ্ড মাল থাকে)। ভারতবর্ষে এক বেলএ ৪০০ পাউণ্ড মাল থাকে, সুতরাং আমেরিকার মোট তুলা ভারতের হিসাবে ১৮,৬৪৯,০০০ বেলএর সমান। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আমেরিকার তুলা ৫০০,০০০ বেল বেশী। পক্ষান্তরে ভারতের তুলা-উৎপাদন, অনাবৃষ্টি ও পোকার উপদ্রবে কমিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে তুলা ফলিয়াছিল ৪,৮১১,০০০ বেল, আলোচ্য সনের ফসল ৪,২৩০,০০০ বেল।

লিভারপুলের বাজারে মাঝারি রকমের আমেরিকান তুলার দর ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের প্রথমে ১০৮০ পেঃ দাঁড়ায়; ১লা মে তারিখে দর ৯·৯০ পেঃএ নামে এবং জুলাই মাসের শেষে আবার ১০·৬০ পেঃ দাঁড়ায়। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দরের কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কিন্তু এই মাসের শেষেই আবার দর নামিয়া ৯·৮৭ পেঃ হয়। ইহার পরে নিউ ইয়র্কের সিকার বাজার আগুন হয়; সঙ্গে সঙ্গে ৭ই নবেম্বর তারিখে দর নামে ৯·৪৭ পেঃএ। এর কয়েকদিন পরে ৯·২৫ পেঃএ নামে। জানুয়ারি মাসের প্রথমে দর বাড়িয়া হয় ৯·৬২ পেঃ; কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আবার কমিয়া হয় ৮·৬২ পেঃ। এই মার্চ্চ তারিখে দর ৮·২৮ পেঃ, ১১ই মার্চ্চ তারিখে দর সর্ব্বনিম্ন কোঠায় নামিয়া ৭·৮৮ পেঃ এ দাঁড়ায়। বৎসরের শেষে দর দাঁড়ায় ৮·৫৭ পেঃ। ভারতীয় তুলার দর মোটা বৎসর ধরিয়াই নামিতে থাকে। মোট কথা ভারতীয় তুলার অবস্থাই বিদেশের বাজারে কাহিল, দর সবচেয়ে বেশী। দর কমিবার জন্য বোম্বাইয়ের তুলা বিদেশের বাজারে চালান যায় যথেষ্ট পরিমাণে। আলোচ্য সনের রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৩০০০ টন কম হইলেও, ১৯২৬—২৭ এবং ১৯২৭—২৮ সনের চেয়ে অনেক বেশী। রপ্তানি-হ্রাসের কারণ জাপানের চাহিদা-হ্রাস। চীন, মার্কিণ, ফ্রান্স এবং বিলাতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াছে। আলোচ্য সনের শেষ ভাগে বোম্বাই বন্দরে মৌজুত তুলার পরিমাণ কমপক্ষে ১,২৮৭,০০০ বেল। পূর্ব্ব সনে এই সময় মৌজুত ছিল ১,১৮৮,০০০ বেল।

কাপড়-চোপড়

আলোচ্য সনে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বোম্বাইয়ের মিলগুলিতে বেশী কাপড়-চোপড় প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু জাপানের প্রতিযোগিতার মুখে মিলগুলি বিশেষ লাভ করিতে পারে নাই। জাপানের পক্ষে কোন কোন বাজার বন্ধ হইয়া গেলেও বোম্বাইয়ের বাজারে সস্তায় মাল ছাড়িয়া কতকটা ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াছে।

পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাই ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের প্রধান বাজার। আলোচ্য সনে মোট মাল-বোঝাই হ্রাস হয় ১৫ লাখ গজ, মূল্য ৬০ লাখ টাকা। হলীণ কাপড়ের চাহিদা-হ্রাসই এই হ্রাসের প্রধান কারণ। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই বোম্বাইয়ের মিলগুলিকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার প্রভাব অনুভব করিতে হইতেছে। ঘরিদ্দার দেশগুলি, প্রধানতঃ ইরাক ও পারস্য, মাল কম গ্রহণ করিয়াছে। টাঙ্গানিয়াকা, আদেন ও জাঞ্জিবার কোরা কাপড় কম গ্রহণ করিয়াছে; তবে কেনিয়া কলনি, ইরাক, পোর্টুগীজ ইষ্ট আফ্রিকা ও আরবের নেটিভ ষ্টেটগুলিতে এবং পারস্যে কোরা কাপড়ের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ষ্টাণ্ডার্ড লংক্লথ কাপড়ের দাম ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসের শেষে প্রতি গজ ১৫৷৷০ দাঁড়ায়; সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দর নামিয়া প্রতি গজ ১৫।০ আনা হয়। ১৯৩০ সনের জানুয়ারির মাঝামাঝি দর দাঁড়ায় ১৪৷৷০ আনা গজ। ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দর দাঁড়ায় ১৩।০ আনা গজ, এবং এই দরই আলোচ্য সনের শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে।

মোট রপ্তানির মধ্যে হলীণ কাপড়ের হিস্যা ৮০% এবং কোরা কাপড়ের হিস্যা ১৮%।

কার্পাস সূতা

আলোচ্য সনে বোম্বাইয়ের সূতা-শিল্পের অবস্থাও কাহিল। বোম্বাইকে বিদেশের প্রতিযোগিতার বাহিরে হইতে হইতেছে, অধিকন্তু দেশের মধ্যেও প্রতিযোগিতা সোয়াইতে হইতেছে। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মিলগুলির সূতা ক্রমে বোম্বাই সূতার স্থান দখল করিয়া

নইতেছে। বর্ষাঘটের জন্যই বোম্বাইয়ের এই দুর্দশা। দুনিয়া-জোড়া বাণিজ্য-ব্যাপের জন্যও বোম্বাইয়ের অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছে। তবে রপ্তানি কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু রপ্তানি বাড়িলেও মূল্য বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। মোটা সুতা অধিক পরিমাণে রপ্তানিই এই মূল্য-হ্রাসের কারণ। পাকিস্তান কাউন্সিল ডিপ্রিসিয়েশনের জন্যও সস্তা মাল রপ্তানি বাড়িয়াছে। আমদানি শুল্ক বাড়িবে এই আশঙ্কায় মিলগুও অনেক মাল গ্রহণ করিয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কার্পাস-জাত দ্রব্য আমদানি (১৯২৯-৩০)

১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে সম্প্রতি সেই সনের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির (সিন্ধু-বর্জিত) বহির্বাণিজ্যের সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে কার্পাস-জাত চিজ আমদানির এই সনের হিসাব নিম্নে প্রকাশিত হইল।

তুলা আমদানি

ভারতীয় তুলা সস্তা হওয়ায় বোম্বাই প্রদেশে বিদেশী তুলার আমদানি কম হইয়া যাইতেছে। আলোচ্য সনে আমদানি হইয়াছে ২৪,০০০ টন, কিন্তু পূর্ববর্তী সনে আমদানি হইয়াছিল ২৯,০০০ টন। আলোচ্য সনে আমদানির মূল্য ৩৮৯ কোটি টাকা হইতে ৩৩১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। আমদানি কমিয়াছে মার্কিন মুলুক হইতেই খুব বেশী। আলোচ্য সনে মার্কিন তুলা আমদানির পরিমাণ ১,৬৮৯ টন মাত্র, মূল্য মোট ১৯৫৮ লাখ টাকা। ইহার আগের সনে মার্কিন তুলা আসিয়াছিল বোম্বাই প্রদেশে ১১,৭৮৭ টন, মূল্য ১৩৮ কোটি টাকা। অন্যপক্ষে কেনিয়া উপনিবেশ হইতে তুলা আমদানি উঠিয়াছে ১৫,০০০ টন হইতে ১৯,০০০ টনে, দামও উঠিয়াছে ২২৩ কোটি হইতে ২৮ কোটি টাকায়। আফ্রিকা হইতে মোট তুলা আমদানি হয় ২০,০০০ টন; ইহার পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ ৮১০ টন জাপানে এবং ৫৬৬ টন বিলাতে। বাকী আফ্রিকান তুলা সমস্তই ভারতীয় মিলগুলির ভুক্তিসাত হইয়াছে।

তুলার কাপড়-চোপড়

আলোচ্য সনে বস্ত্র-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই সনে জাপান কোরা এবং রঙীন সৌখিন কাপড়চোপড়ে বোম্বাইয়ের বাজার ছাইয়া ফেলে। বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা এই সনে বর্ষাঘটের জন্য তীষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার উপরে সাদা কাপড়ের টক্ অনেক হাতে থাকায় নূতন করিয়া কল চালানও অসম্ভব হইয়া উঠে। জাপানের প্রতিযোগিতার ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে বোম্বাই কাপড়ের তো দুর্দশা ঘটেই, অধিকন্তু বিলাতী কাপড়চোপড়ের অবস্থা একেবারে কাহিল হইয়া পড়ে।

আলোচ্য সনে মোট তুলার বস্ত্র আমদানির মূল্য (কেন্ট সহ) ১৪৭৫ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে রঙীন বস্ত্র ৫৭৯ কোটি টাকার, কোরা ৪৩৪ কোটি টাকার এবং ধোলাই ৩১২ কোটি টাকার। পূর্ব সনের তুলনায় ১৩৮ কোটি টাকার আমদানি কম। ধোলাই বস্ত্র আমদানি কম ১০৫ এবং রঙীন বস্ত্র ১০২ কোটি টাকার; কিন্তু কোরা কাপড় আমদানি বৃদ্ধি হয় ৭৫ লাখ টাকায়। কেন্ট্‌এর আমদানি হ্রাস পাইয়া ৮৪৭৭ লাখ টাকা হইতে ৭২৮১ লাখ টাকা হইয়াছে। কেন্ট্ আমদানি হ্রাসের কারণ এই যে, বিলাত হইতে আমদানি ৩৭১১ লাখ টাকার স্থলে আলোচ্য সনে ২৮৭৮ লাখ টাকায় নামিয়াছে। পক্ষান্তরে মার্কিন দেশ হইতে কেন্ট্ আমদানি ৪৫২১ লাখ টাকা হইতে ৪৯৯৫ লাখ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাইয়ের বস্ত্র আমদানি বাণিজ্যে বিলাতের হিস্যা ৬৮৪% হইতে ৫৭% এ নামিয়াছে; কিন্তু জাপানের হিস্যা বাড়িয়াছে ২১% হইতে ৩০% এ।

কোরা কাপড়ের মধ্যে লং ক্লথ ও শার্টিংই বেশী; এই দুই চিজ্ সম্পূর্ণরূপে জাপানই যোগাইয়াছে। বাকী কোরা কাপড়ের মধ্যে ধুতি, ও শাড়ীই প্রধান; এই সমস্ত কাপড় বিলাতই সরবরাহ করিয়াছে। জাপানী লংক্লথ ও শার্টিং আমদানি ২০৩ কোটি টাকা হইতে ২৮২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শিটিং বাড়িয়াছে ৭৮২ লাখ টাকা হইতে ৯৩১৯ লাখ টাকায়। কোরা কাপড়ে জাপানের হিস্যা ৬৯% হইতে ৭৬% এ উঠিয়াছে

এবং বিলাতের হিস্যা পড়িয়া গিয়াছে ৩১% হইতে ২২% এ।

ধোলাই কাপড়ে বিলাতের হিস্যা ৮৯%। বিলাতের এই রপ্তানি বাণিজ্যের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই। বিলাতী ধোলাই কাপড়ের মধ্যে (১) মলমল, (২) সং ক্লথ ও শার্টিং, (৩) ধুতি, শাড়ী ও স্যাটিন এবং (৪) নয়নসুখ প্রধান; এই কয় চিজ্ এক্লা বিলাতই পাঠাইয়াছে।

মোট রঙ্গীন কাপড় আমদানির মূল্য ৫·৭৯ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে বিলাতের হিস্যা ৩·৯৬ কোটি এবং জাপানের হিস্যা ১·২৫ কোটি টাকা।

সূতা

আলোচ্য সনে বোম্বাইয়ে সূতা আমদানি হ্রাসের পরিমাণ ২০৪ লাখ পাউণ্ড হইতে ১৯২½ লাখ পাউণ্ড, মূল্য হ্রাস ২·৭১ কোটি টাকা হইতে ২·৭১ কোটি টাকা। চীন এবং বিলাত হইতে সূতা আমদানি কমিয়াছে; কিন্তু জাপান হইতে আমদানি বাড়িয়াছে।

জাপান তৎসহ সূতা এবং মিহি সূতা দুই প্রকার সূতারই ভারতে রপ্তানি বাড়াইয়াছে। মিহি সূতার মধ্যে ৩১ হইতে ৪০ সূতাই বেশী। পূর্ব্বোক্ত সূতার বৃদ্ধির পরিমাণ, ৪৭½ লাখ পাউণ্ড হইতে ৭০ লাখ পাউণ্ড এবং শেষোক্ত সূতার ৫ লাখ হইতে ১০ লাখ পাউণ্ড। মার্সিরাইজড্ সূতার আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০ লাখ হইতে ৫২½ লাখ পাউণ্ড, মূল্য বৃদ্ধি ১৯·৩৭ লাখ টাকা হইতে ২৯·৮৭ লাখ টাকা। এই সূতার মধ্যে জাপানের হিস্যা ৯০%, বাকী যোগাইয়াছে বিলাত। বোম্বাই প্রদেশে মোটা সূতা ব্যবহারকারী কলের সংখ্যা প্রায় ৯০% হইলেও মিহি-সূতা-ব্যবহারকারী কলের সংখ্যা বাড়িতেছে।

মোটা সূতার অধিকাংশই বিলাত হইতে আসিয়াছে এবং আগের বছরের চেয়ে আমদানিও বাড়িয়াছে। বাজারে সস্তা অথচ ভাল জিনিষই কাটিতে দেখা গিয়াছে।

ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের খনিজ সম্পদ্

দ্বীপপুঞ্জের ভূতত্ত্ব

ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ খুব বেশী দিনের নয়ে। আভ্যন্তরীণ তাপশক্তির প্রভাব এখনো শেষ হয় নাই। এই অঞ্চলে মোট ৪০০টি আগ্নেয় গিরির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ৮০টি এখনো সতেজ অবস্থায় আছে এবং সময়ে সময়ে যথেষ্ট অগ্নুৎপাত হয়। খনিজ পদার্থ উৎপাদনকারী হিসাবে গোটা দ্বীপপুঞ্জকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—পূর্ব্ব ও পশ্চিম। পশ্চিমের ভাগ প্রাগৈতিহাসিক পরিবারভুক্ত। পূর্ব্বের ভাগটি পিয়েডোটাইট্‌স্ এবং অনুরূপ পাহাড়ে পরিপূর্ণ।

প্রাগৈতিহাসিক ভাগের বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক টিনের ওরে পরিপূর্ণ; এখানে সোনা রূপার 'সেলিফাইট্'ও দৃষ্ট হয়। সোনার খনির এখনো কোথাও বিশেষ খোঁজ পাওয়া যায় নাই; যে দু-এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে সেখানেও বেশী প্রথাতেই কাজ চালান হইতেছে।

জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপে কোথাও কোথাও তাম্র, সীসা, দস্তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাইমোর দ্বীপে এখনো সন্ধান চলিতেছে। লোহার খনির সন্ধান সব চেয়ে বেশী পাওয়া গিয়াছে।

দ্বীপপুঞ্জের মোটামুটি পরিচয়

ওলন্দাজ পূর্ব্বভারত এপর্য্যন্ত কৃষিসম্পদের জন্যই দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। চিনি, রবার, কফি চা, কোপ্রা, মসলা প্রভৃতিই ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু এই দ্বীপপুঞ্জে যে নানাবিধ খনিজ পদার্থও রহিয়াছে সে কথা বহু লোকে জানে না। তবে এই দ্বীপপুঞ্জে কেরোসিন তেল ও টিন পাওয়া যায় ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে। কিন্তু তা ছাড়া এদেশে যে সোনা, রূপা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ্, ক্রোমিয়াম্, নিকেল, হীরা ও নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরে পরিপূর্ণ সে খোঁজ অনেকে রাখে না। এই ভূভাগ আয়তনে স্পেনের পশ্চিম উপকূল হইতে রুশিয়ার পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত উরল পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের চেয়েও বড়। অবশ্য এই বিরাট এলাকার মধ্যে অধিকাংশ সমুদ্র অবস্থিত। বাণ্ডিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ডানৎদিস্ বন্দর হইতে আন্দ্রিয়াটিক সাগর তীরবর্ত্তী ট্রিয়েষ্টে বন্দর পর্য্যন্ত একটি সরলরেখা টানিলে তার পশ্চিমে যে ইয়োরোপ পড়ে সেটা স্থলভাগ তার সমান,—এই হিসাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াকে বাদ দিতে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে ধরিতে হইবে।

খনন-কার্য্য কেন উন্নতি লাভ করে নাই

এই বিরাট ভূখণ্ড অরণ্যপূর্ণ, জলাশয়েরও অভাব নাই। দূরে এবং কাছেও যথেষ্ট জঙ্গল আছে। তবু এই অঞ্চলে নানা কারণে খনিজ উত্তোলন-কার্য্য আজই উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চল গ্রীষ্ম-মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া গভীর আগাছা ও ঘাসে পরিপূর্ণ অথবা, বিস্তীর্ণ চাষের জমি বা জলাভূমিতে আবৃত। জমি খুঁড়িবার সময় এই সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করা চাই; জমির নিম্নদেশেও শিকড়ে শিকড়ে আচ্ছন্ন, তৎ সমুদয় পরিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। আবার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে খনিজ পদার্থ যে কোথায় আছে তাহার সন্ধান লওয়াও সহজ নয়। এজন্য রীতিমত অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে মাসের পর মাস অবিচলিত ধৈর্য্যের

সহিত কাজ করিবার জন্য উপযুক্ত অভিযানের দরকার হয়। অসভ্য-পরিচালনে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকেও দরকার। কিন্তু এই সমস্ত অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য লোকজনের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে তাহাদিগের সহিত ধীর, সংযত, জ্ঞানসঙ্গত ব্যবহার করিয়া আগে তাহাদিগকে বশ করিয়া লইতে হইবে।

পুঁজিপাটা চাই

গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত দ্বীপে খনির কাজ চালাইতে হইলে যথেষ্ট অর্থব্যয়ের দরকার। কোন লোকের পক্ষে একাকী এই কাজে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। প্রথমতঃ, গবেষণা এবং অনুসন্ধান চাই। এই প্রাথমিক কার্য্যেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। এজন্য রীতিমত কোম্পানী বা পয়সাওয়ালা সিণ্ডিকেট্ খাড়া না করিলে উপায় নাই। প্রাথমিক কার্য্য সমাধা করিয়া খনির কাজ করিতে পারিলে লোকসান খাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। খনির কাজ করিবার জন্য লম্বা মেয়াদ পাওয়া যায় ও লাইসেন্স্ ট্যাক্স্ ইত্যাদির হারও সুবিধাজনক।

এই দ্বীপপুঞ্জের খনি-সম্বন্ধীয় চল্‌তি আইনকানুনগুলি একটু খতাইয়া দেখা যাক।

খনি আইন

ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চল্‌তি আইনের বলে ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যের উপর জমির মালিকের বা অধিকারীর কোন দাবী দাওয়া নাই। সমস্ত খনিজ পদার্থ রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের নিকট হইতে 'পারমিট' বা কন্‌সেশান' না লইয়া কেহই খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতে পারে না।

সাধারণতঃ "ক" শ্রেণীর খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিবার জন্য 'পারমিট' দেওয়া হইয়া থাকে। "ক" শ্রেণীর খনিজ পদার্থ হইতেছে মূল্যবান প্রস্তর, গ্রাফাইট্, প্লাটিনাম, ইরিডিয়াম্, সোণা, রূপা, পারদ, বিস্মাথ্, মোলিবডেনাম্, টিন, উল্‌ফ্রাম্, সীসা, তামা, দস্তা, ক্যাড্‌মিয়াম্, কোবাল্ট্, নিকেল্, ক্রোমিয়াম্, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ্, এ্যান্টিমনি, আর্সেনিক, ষ্ট্রোন্টিয়াম্ এবং এই সমস্ত ধাতুর মিশ্রণ ও ধাতুযুক্ত অন্যান্য পদার্থ, গন্ধক, এ্যাসফাল্ট্ বা বিটুমেন যুক্ত খনিজ পদার্থ, সারের উপযোগী কস্‌ফেট, সল্টপিটার, পাহাড়ে লবণ ও অনুরূপ নানাবিধ লবণ।

"খ" শ্রেণীভুক্ত খনিজ পদার্থসমূহের আবিষ্কার বা সন্ধান সম্বন্ধেও আইনতঃ কোন বাধা নাই। কোন ধাতু-বিশেষের উল্লেখ না করিয়া ব্যাপক এবং সাধারণভাবে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের জন্য 'পারমিট' বা অনুমতি গ্রহণ করিলে এই "খ" শ্রেণীর খনিজ পদার্থেরও অনুসন্ধান চলিতে পারে। তবে আবিষ্কারক বা অনুসন্ধানকারীতে "খ" শ্রেণীর ধাতু সম্বন্ধে কোন দাবী বর্ত্তিবে না। "খ" শ্রেণীর মধ্যে আছে, অ্যাস্‌বেষ্টস্, সকল প্রকার কয়লা এবং পিট, খনিজ তৈল অ্যাস্‌ফাল্ট্, ওজোসিরাইট, তরল বা কঠিন সকল প্রকার বাইটুমিনাস্ খনিজ দ্রব্য, মার্শগ্যাস ব্যতীত সকল রকমের দাহ্য গ্যাস্; আয়োডিন্ এবং আয়োডিন্ মিশ্রিত দ্রব্যসমূহ। কোন ক্ষেত্রে "ক" শ্রেণী বা "খ" শ্রেণী সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে গভর্ণর জেনারেলের মীমাংসাই চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

পারমিট এবং কন্‌সেশান গ্রহণের আইনকানুন

পারমিট গ্রহণের জন্য প্রত্যেক অঞ্চলের গভর্ণর বা রেসিডেণ্টের নিকট দুইটী দরখাস্ত করিতে হইবে। উভয় দরখাস্তে দরখাস্ত-প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিখিত হয় ও একটি দরখাস্ত দরখাস্তকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তারিখ হিসাবে পারমিট বিলি করা হয়।

নিম্নলিখিত প্রকার ব্যক্তিগণ পারমিট পাইবার অধিকারী: নেদারল্যাণ্ডের প্রজাগণ, যে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ব্যক্তি, নেদারল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডস্ পূর্ব্ব ভারতীয় আইন অনুসারে গঠিত কোম্পানী, কার্ম বা সিণ্ডিকেট্, যাহাদের ম্যানেজার, বোর্ড অব্ ম্যানেজমেণ্ট সমস্ত বা অধিকাংশই নেদারল্যাণ্ডস্ পূর্ব্বভারতের অধিবাসী।

কোন দরখাস্তকারী পারমিট গ্রহণের জন্য যতগুলি ইচ্ছা দরখাস্ত করিতে পারিবে। তবে প্রত্যেক দরখাস্ত নির্দ্দিষ্টভাবে এক এলাকাভুক্ত ও ১০,০০০ হেক্টার

(২৫,১১০ একর) এর কম জমির জন্ত হওয়া চাই। এবং অন্ত কাহাকেও পারমিট দেওয়া জমির জন্ত দরখাস্ত চলিবে না। বলা বাহুল্য, যে সমস্ত জমি গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে বা অন্ত কোন কারণে যাহার বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে না, তাহার জন্ত দরখাস্ত করা চলিবে না। পারমিট মাত্র তিন বৎসরের জন্ত দেওয়া হইয়া থাকে। তারপর দুইবার ১ বৎসর করিয়া মেয়াদ বাড়াইয়া লওয়া চলে। মেয়াদ না বাড়াইয়া দেওয়া বা সময়ের পূর্ব্বে পারমিট নাকচ করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের আছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত পারমিট হস্তান্তর করা চলে না। দরখাস্তকারীদের যথোচিত জামিন সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখিতে হয়, যেন পরে মালিক বা অধিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তার ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়।

একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পারমিট গ্রহণকারী গবর্ণমেণ্টের নিকট কন্‌সেশানের জন্ত দরখাস্ত করিতে পারিবে; তবে যে জমির জন্ত পারমিট দেওয়া হয়, তাহাতে উপযুক্তরূপ খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলিয়াছে এবং খনির কাজ চালানও সম্ভবপর হইবে এরূপ প্রমাণ দেখাইতে হইবে। "খ" শ্রেণীর খনিজ পদার্থের জন্ত কোনরূপ কন্‌সেশান্ দেওয়া হয় না।

কন্‌সেশান করিবার জন্তও দুইখানি দরখাস্ত পেশ করিতে হয়। এই আবেদনপত্রে আবেদনকারীর নাম, ধাম, খনিজ দ্রব্য এবং তাহার পরিচয়, যে এক বা অধিক স্থানে খনিজ দ্রব্য আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহার নির্ভুল মানচিত্র, যে স্থানে খনির কার্য্যের যেমিনারি, ইমারৎ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইবে তাহার অবস্থান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। যদি উক্ত জমি কাহারও অধিকারভুক্ত থাকে তাহা হইলে মালিকের ক্ষতিপূরণের জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট রীতিমত জামিন দান করিতে হইবে। যে ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে যদি কাহারও ক্ষতি হয় তাহা হইলে সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এক এলাকাভুক্ত মাত্র ২৫,১১০ একর পর্য্যন্ত জমির জন্ত এইরূপ আবেদন করা চলে। ৭৫ বৎসরের জন্ত কন্‌সেশান দেওয়া হয়। কন্‌সেশান হস্তান্তর করিতে হইলে গবর্ণর-জেনারেলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

পারমিটের উপর নিম্নলিখিত হারে কর ধার্য্য আছে: স্থায়ী খাজানা হেক্টার প্রতি বার্ষিক ২½ সেণ্ট বা আধপেনি, অর্থাৎ একর প্রতি ½ পেনি। ইহা ছাড়া খনিজ মোট বিক্রয়ের উপর ৪% বার্ষিক খাজানা দিতে হইবে। তবে ৫০০০ পিণ্ডার (৪১৬ পাঃ ১৬ শি) পর্য্যন্ত বিক্রয়ের আয়ের উপর কোন ট্যাক্স্ লাগিবে না; করপ্রদানের সময় এই ৫০০০ পিণ্ডারের খাজানা মকুব পাওয়া যাইবে।

কন্‌সেশানের জন্ত নিম্নলিখিতরূপ কর ধার্য্য আছে: স্থায়ী খাজানা হেক্টার প্রতি কি সন ২৫ সেণ্ট বা ৯ পেনি অর্থাৎ একর প্রতি ২ পেনি; বার্ষিক মোট স্থূল বিক্রয়ের উপর ৪% কিংবা নিট্ লাভের উপর ১০% কর। তবে কন্‌সেশান গ্রহীতা যদি সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারে যে, পূর্ব্ব বৎসরে লোকসান হইয়াছে এবং আলোচ্য সনেও এইরূপ কর দিতে হইলে লোকসান স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেল আপন খুসিমাফিক কর হ্রাস করিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্ব সনের নিট্ আয়ের ১% খাজানা স্বরূপ দিতেই হইবে। স্থায়ী খাজানার হ্রাস হইতে পারে না।

আইনের কড়াকড়ির উদ্দেশ্য

নেদারল্যাণ্ড্স্ পূর্ব্বভারতীয় গবর্ণমেণ্ট খনন-কার্য্যের জন্ত যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এজন্ত গবর্ণমেণ্ট বহু ভূতত্ত্ববিৎ, খনি-ইঞ্জিনিয়ার ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মোতায়েন রাখিয়াছেন। সময়ে সময়ে এই সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিস্তৃত অভিযানও প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে এই প্রাথমিক কার্য্যের জন্ত সমস্ত খরচপত্র গবর্ণমেণ্টকে বৃথাই বহন করিতে হইত; কারণ গবর্ণমেণ্ট কিছু আর সকল সময়ে নিজেই খনির কাজ চালাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইত, বড় বড় পয়লাওয়ালা কোম্পানীই খনির কাজ চালাইয়া মোটা লাভ করিয়া লইত। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিয়া এইরূপভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"ক" শ্রেণীর খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া থাকেন; "খ" শ্রেণীর সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট খাস দখলের পক্ষপাতী নহে; এই শেষোক্ত শ্রেণীর খনিজ দ্রব্য যেসরকারী ব্যক্তি বা কোম্পানীর সাহায্যেই আহরণ করা সম্ভবপর।

মজুর আইন ও সমাজ মঙ্গল

আসাম চা-বাগিচার কাজ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার কাজের মজুর আসাম হইতেই পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বেও চীনা মজুর প্রচুর পাওয়া যাইত। কিন্তু চীনের অন্তর্বিপ্লবের পর হইতে ভাল চীনা মজুর আগের মত আসে না, সুতরাং তাহাদের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। টিনের খনিতে চীনা মজুরের খুবই কদর; সুতরাং এই সমস্ত টিনের খনিতে যথেষ্ট অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। চীনা কুলির ঘাটতি ক্রমশঃ আসাম কুলির দ্বারা পূরণ করিতে হইতেছে। মেসে শিল্প এবং প্ল্যান্টেশনগুলি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া মজুরের চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রেও আসামই সম্বল। এই সমস্ত ত আছেই, তার উপর কিরূপ ধরণের ঔপনিবেশিক লওয়া হইবে, তারও যাছ্‌বিচার আছে। অধিকাংশে মজুর চুক্তিবদ্ধ। এর জন্য চলতি মজুর-আইন, সরকারী কুলিপরিদর্শন বিভাগ প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। এই আইনের বলে, বিশেষ ধরণের পারমিট ছাড়া মজুরকে চুক্তিবদ্ধ করার উপায় নাই; আর সেজন্য রীতিমত ভাবে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে। যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর চুক্তিবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করাই হয় না। প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ মজুরকে চালান দিবার পূর্ব্বে তাহাকে মজুর পরিদর্শন আফিসে হাজির করিতে হয়। এই সময়ে মজুরকে চুক্তি-পত্রের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, সে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে কি না; ইচ্ছা থাকিলে সে তখনো ফিরিয়া যাইতে পারে। মোট কথা সাবধানতা যত প্রকার অবলম্বন করা দরকার তাহার কোনটাই বাদ দেওয়া হয় না। এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর সরকারী কর্ম্মচারী চুক্তিনামায় নাম সহি করিলে পর উহা আইনতঃ গ্রাহ্য হয়। এই সঙ্গে কুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, সে বিদেশে যাইয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ত কি না। এইরূপ যাবতীয় করণীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পর মজুর বিদেশে চুক্তিবদ্ধ-মজুর রূপে যাইবার অনুমতি পায়।

চুক্তিবদ্ধ হইবার পর মজুরকে সকল প্রকার চুক্তি মানিয়া চলিতে হয়। ত্রুটি হইলে মজুরকে বিচারালয়ে হাজির করিয়া যথাবিহিত শাস্তি প্রদান করা হয়। অন্য দিকে মালিকদিগকে মজুর-আইনসমূহ মানিয়া চলিতে হয়। সরকারী মজুর-পরিদর্শক মালিকদিগকে মজুরঘটিত আইনকানুন মানিতে বাধ্য করে। মালিকদের কাজ হইল মজুরদিগকে বিনা পয়সায় বা সুবিধা দরে আহার্য্য প্রদান করা, যাদের উপযুক্ত ঘরবাড়ী সরবরাহ করা, ছাপেসহ ও পরিমিত খাটুনির ব্যবস্থা করা, খাটিবার সময়ে ও শেষে সদ্ব্যবহার করা, রোগ হইলে চিকিৎসা এবং হাসপাতালের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। যাহাতে মালিকদিগের তরফ হইতে এই সমস্ত ব্যবস্থা বা অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না ঘটে, সেইজন্য মজুরদের বাসগৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে, মালিকের আফিসে, কারখানায় সর্ব্বত্র মজুর-পরিদর্শকের অবাধ গতিবিধি স্বীকৃত হইয়াছে। এই সরকারী কর্ম্মচারী যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে, সে মজুরই হউক, কিংবা মালিকের কর্ম্মচারীই হউক, গোপনে বা প্রকাশ্যে আবশ্যকীয় প্রশ্নাদি করিতে পারে বা তাহার নিজের আফিসে তলব করিতে পারে। তদনুযায়ী পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মজুর আইন দুনিয়ার সর্ব্বত্র সামাজিক আইনরূপে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। কারণ প্রথমতঃ এই আইনের দ্বারা মজুরদের উপর মালিক-দিগের অন্যায় আচরণের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে; অন্য পক্ষে মজুরেরাও যাহাতে মালিকদের ক্ষতি না করে সেদিকে নজর রাখা হইয়াছে। মজুরেরা যখন স্বেচ্ছায় চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে তখন তাহারা মালিকদের কাজ উঠাইয়া দিতে আইনতঃ বাধ্য। সরকারের পক্ষ হইতে মজুর এবং মালিক উভয়ের পক্ষে এইরূপ হিতকর আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও এই দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন প্ল্যান্টেশনে মজুরদের পক্ষে হিতকর অনুরূপ নিয়মকানুনের ব্যবস্থা

ছিল। উদাহরণস্বরূপ সুমাত্রার পূর্ব্বোপকূলস্থ ডেলি প্ল্যান্টেশনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মজুর আইনের বহুপূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্যে মজুরদের স্বাস্থ্য-রক্ষার এবং অন্যান্য হিতকর কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। এই ডেলি কোম্পানী সুমাত্রা দ্বীপের সুবিখ্যাত তামাক-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর তাঁবে মজুর ও কেরাণীদের হাসপাতাল, রোগনির্ণয়ের গবেষণাগার, মজুরদের বিশ্রামের ও খেলার ঘর ইত্যাদি রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, আজও তার চেয়ে বেশী কিছু করা কোথাও সম্ভবপর হয় নাই। তবে সুমাত্রা, বিলিটন (টিনের খনি), বোর্নিয়ো ও জাভা (রয়াল ডাচ্ পেট্রোলিয়াম কোম্পনী) প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে তুল্য বিবেচনা করা চলে।

আফগানিস্থানে নূতন রেলওয়ে

ইয়োরোপের সহিত এশিয়ার সংযোগ

এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে স্থলপথে সংযোগ-সাধন করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব আফগানরাজ আমানুল্লা জার্ম্মাণির কোন বৃহৎ কোম্পানীকে একটি রেলপথ নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে নাদির শার শাসনকালে এই রেলপথ আফগানিস্থান হইতে ইয়োরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে। এক জার্ম্মাণ কোম্পানী এই বৃহৎ রেলপথ প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে এই রেলপথ প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেলওয়ের প্রত্যেক বিভাগে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আফগান যুবককে সকল বিভাগের কার্য্যে পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে, এই সর্ত্ত হইয়াছে। তাহা হইলে নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে শিক্ষিত আফগানগণ নিজেরাই এই রেলওয়ে পরিচালনা করিতে পারিবে।

এই রেলপথ প্রথমতঃ কাবুল হইতে জালালাবাদ হইয়া টার্কহাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবেই। ইহাতে কাবুল হইতে আফগান সীমান্তে যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। ইতি-পূর্ব্বে যাইবার রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং কাবুল হইতে ভারতবর্ষে আসারও বিশেষ সুবিধা হইবে; প্রকৃত পক্ষে কাবুলই এই বিশাল রেলওয়ের সংযোগস্থল হইবে। অপর একটী লাইন কাবুল হইতে গজনি হইয়া কান্দাহার পর্য্যন্ত গমন করিবে। কান্দাহার কাবুল হইতে প্রায় ৩১৫ মাইল দূরবর্ত্তী। এই পথ তত দুর্গম নয়। পরে কান্দাহার হইতে আফগানিস্থানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিরাট নগরী পর্য্যন্ত এই লাইন বর্দ্ধিত হইবে। হিরাট নগরী মধ্য এশিয়ার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু এই পথ বড়ই দুর্গম। এই স্থান আফগানিস্থানের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা উচ্চ। এই স্থানের অধিকাংশ স্থল শীতকালে সর্ব্বদা বরফে আচ্ছাদিত থাকে। শীতকালের কয়েক মাস এই প্রদেশের জনগণের দুর্গতির সীমা থাকে না। এই লাইন প্রস্তুত হইলে তাহাদের চলাচলের সুবিধা হইবে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীরও সচ্ছলতা হইবে।

আফগানিস্থানের এই রেলওয়ে ভবিষ্যতে হিরাট হইতে রুশিয়ার বিখ্যাত "কাসক" ও "টাশখেন্ড" রেলওয়ের সহিত মিলিত হইবে। কাবুলের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে টাশখেন্ড পর্য্যন্ত এই পথ অতিশয় দুর্গম। এই পথে যে সকল পর্ব্বত-মালা আছে তাহার উচ্চতা স্থানে স্থানে ১০০০ ফুটেরও অধিক। বর্ত্তমানে এই পথ প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু কাবুল হইতে কাসক পর্য্যন্ত লাইন তৈয়ারীর কাজ এখন হইতেই চলিতে থাকিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, আফগানিস্থানের উত্তর-পশ্চিম দিকে এই লাইন কাবুল হইতে কান্দাহার হইয়া হিরাট এবং কাসক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং কাবুলের পূর্ব্বদিকে কাবুল হইতে জালালাবাদ ও টার্কহাম হইয়া একেবারে খাইবার রেলওয়ে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অপর একটী লাইন কান্দাহার হইতে চমন হইয়া কোয়েটা পর্য্যন্ত গমন করিবে। কাজেই কান্দাহার একটী প্রসিদ্ধ জংশনে পরিণত হইবে। পেশোয়ার ও কোয়েটার যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ইয়োরোপ-যাত্রী স্থলপথে কোয়েটা, চমন, কান্দাহার, হিরাট ও কাসক, পুনরায় কাসক হইতে "ট্রান্স ক্যাসপিয়ান" রেলওয়ে যোগে মারভ পর্য্যন্ত, পুনরায় মারভ হইতে টাশখেন্ড, তোষাক্, আদ্‌কাবার

এবং ওরেনবুর্গ হইয়া মস্কো, সেন্টপিটার্সবার্গ ও অবশেষে বার্লিনে উপস্থিত হইবেন।

এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইলে মধ্য এশিয়া ও মধ্য ইয়োরোপ এক প্রকাণ্ড স্থলপথের দ্বারা মিলিত হইয়া জগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে। এই মিলনের দ্বারা উভয় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে বর্ত্তমানে জলপথে যে আদান-প্রদান হইতেছে ভবিষ্যতে তাহা স্থলপথেই সাধিত হইবে। এই রেলপথে এশিয়া হইতে ইয়োরোপে পৌঁছিতে সাতদিনের বেশী সময় লাগিবে না।

জার্মাণ কোম্পানী তাহাদের নিজ ব্যয়ে এই লাইন প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা এই অনুমতি প্রদানের জন্য আফগানরাজকে উপযুক্ত নজর দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

এই লাইন প্রস্তুত হইলে বর্ত্তমানে আফগান জাতির যে অংশ সম্পূর্ণ বর্ব্বরতা জাতি বলিয়া অভিহিত হইতেছে সেই লোকগুলি শিক্ষায় ও জ্ঞানে প্রকৃত মানুষ হইতে পারিবে। যে সকল জাতি দস্যুবৃত্তি অথবা নানাবিধ গর্হিত উপায়ে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া অন্যায় ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা উন্নত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইবে। ইহাতেই আফগান জাতি গড়িয়া উঠিবে।

এই নূতন লাইন নির্ম্মিত হইলে জগতের বাজারের পরিধি আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে সকল জাতিরই বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।

(সঞ্জীবনী)

নারী-শিল্প-শিক্ষায় জিলাবোর্ড

খুলনা জিলা বোর্ড নারী-শিল্প-শিক্ষার উন্নতি-বিধান-উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১৫৲ টাকার ৯টী বৃত্তি দানের মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ৫টী মহিলাকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। অপর ৪টীও শীঘ্রই দেওয়া হইবে।

রেল কর্তৃপক্ষের অভিনব ছাঁটাই

ই, বি, রেল কর্তৃপক্ষ চাকা বিভাগে যাত্র-সংক্ষেপের আর এক অভিনব নমুনা দেখাইয়াছেন। চাকা রেল ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকযাত্রীদের বিশ্রামাগারের ঝি ছাঁটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্তরূপ পরিচারিকা না থাকিলে বিশ্রামাগারটী মোটেই নিরাপদ নহে। পরিচারিকার মাহিয়ানা অতি সামান্য, অথচ তাহার অভাবে বিষম বিপদ ঘটিতে পারে। (সকালের)

বীরভূম ভূস্বামি-সঙ্ঘ

গত ১লা বৈশাখ বৈকাল ৪টায় সিউড়ী টাউন হলে জমিদারবর্গের এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে "বীরভূম ভূস্বামি-সঙ্ঘ" গঠিত হইয়াছে। বহু জমিদার ও প্রজার তরফের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সঙ্ঘের মোটামুটি উদ্দেশ্য ও কার্য্যধারা নিম্নরূপ :

১। বীরভূম ভূস্বামি-সঙ্ঘ প্রজাগণের বিরোধী নহে বরং সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের কল্যাণকামী।

(ক) কোন প্রজা উৎপীড়িত হইয়া এই সঙ্ঘকে জানাইলে সঙ্ঘ তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(খ) প্রজাবর্গের হিত করিবার জন্য সঙ্ঘ জমিদারবর্গকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

(গ) প্রজার জমিদারে যে মতভেদ চলিতেছে সঙ্ঘ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

২। সঙ্ঘ-শ্রেণীভুক্ত জমিদারদিগকে অল্প হারে সুদ লইয়া ঋণ দিবার জন্য সঙ্ঘ একটী "জমিদার ব্যাঙ্ক" গঠন করিবে।

৩। আংশিক খাজনা কি সঙ্ঘশ্রেণীভুক্ত জমিদারবর্গের সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে এই সঙ্ঘ বাহির করিয়া সকল প্রজাকে অংশানুসারে পাঠাইয়া দিবে।

৪। সঙ্ঘ জমিদারবর্গের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

৫। জমিদারে জমিদারে, জমিদারে প্রজায় বা প্রজায় প্রজায় যে বিবাদ-বিসম্বাদ হয়, তাহা মিটাইবার জন্য এই সঙ্ঘ একটী সালিশী বোর্ড গঠন করিয়া আদর্শ জমিদারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে।

৬। বার্ষিক মাত্র ২৲ দুই টাকা চাঁদা দিলেই যে কোন ভূস্বামী এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন। প্রত্যেককে এই অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটীতে যোগ দিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। বীরভূমের প্রতি থানা হইতে একজন করিয়া এবং অতিরিক্ত আট জন সভ্য লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে চাকার সকালের পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই।

জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি বীরভূম জেলার কয়েকজন জমিদার "বীরভূম ভূস্বামি-সঙ্ঘ" নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। সমিতিটী অতি সময়োচিত হইয়াছে। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের ভাব বিদ্যমান। জমিদারগণ প্রজা দ্বারাই পুষ্ট, অথচ প্রজাদের স্বার্থের দিকে তাঁহারা প্রায়ই উদাসীন থাকেন। প্রজাগণ সহজেই রক্ত

জন করিয়া জমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, কিন্তু সে জমির উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। এই সব কারণেই প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের উপর সংশোধন চলিতেছে এবং রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা দ্বারা প্রজাদের অনেক সুবিধা করিয়াও দেওয়া হইয়াছে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল অধুনা তাহা প্রায়শঃ দেখা যায় না এবং এক পক্ষের যে কোন প্রকার আন্দোলনকেই অপর পক্ষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে জমিদার ও প্রজার স্বার্থ যথার্থই পরস্পরবিরোধী নয়, অন্যান্যসাপেক্ষ। একের সুখ সুবিধা ও উন্নতির উপর অন্যের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় আজ বীরভূমের জমিদার সঙ্ঘ এরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাব থাকিলে উভয়েই উভয়ের আন্তরিকতা ও সাধুতায় মুগ্ধ হইবেন এবং ইহা বুঝিতে কঠিন হইবে না যে, কেহই কাহারও শত্রু নয়। একমাত্র বিশ্বাস ও প্রীতি দ্বারাই লোকের মন জয় করা যায়। সঙ্ঘের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক কেবল জমিদারদের স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠিত না হইয়া ইহাদ্বারা যাহাতে প্রজাদের সুবিধাও হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইলে সঙ্ঘের কার্য্য আরও প্রশংসনীয় হইবে। দরিদ্র প্রজাগণ মহাজনের হস্তে একান্ত নিষ্পীড়িত। সুদখোর মহাজনের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলেই প্রজাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদেরও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। আশা করি বীরভূম ভূস্বামি-সঙ্ঘ এ কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য-বৃদ্ধির মানসে, আশা করি, অন্যান্য স্থানেও এরূপ প্রচেষ্টা চলিবে।

ভূমি-বিক্রয়ে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য কি

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় নূতন আইন অনুসারে জমি বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে রেজেষ্ট্রী অফিসেই জমিদারের প্রাপ্য সেলামীর টাকা ও সেই টাকা জমিদারের নিকট পাঠাইবার খরচা দাখিল করিতে হয়। এই টাকা যদি তখনই জমিদারের নিকট রেজিষ্ট্রারের মারফতে পাঠাইবার বিধি থাকিত তবে জমিদারের পক্ষে সেই টাকা পাওয়া হইতে অনেকটা সুবিধাজনক হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আইনে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে জমিদারগণ সেলামীর টাকা কদাচিৎ পাইতেছেন। রেজিষ্ট্রার সেলামীর ঐ টাকা কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেলামীর টাকা জমিদারের নিকট পাঠাইবার খরচা কালেক্টর পান বটে, কিন্তু কালেক্টর ঐ টাকা পাঠান না। বিক্রীত জমির মালিক যদি একাধিক হন তবে ঐ টাকা আদায়ের জন্য সমুদয় মালিকের পক্ষ হইতে একজন সাধারণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রতিনিধি কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে টাকা পাইতে পারেন। এইভাবে টাকা বাহির করিতে মালিকদের অনেক ব্যয় বহন করিতে হয় ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ অনেক জমিদারই এই বিরক্তিকর অবস্থার ভিতর দিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদেরও বাসস্থান বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন প্রদেশে হওয়ায় বা কাহারও নাবালক না হওয়ায় সমুদয় মালিকের পক্ষে একত্র হইয়া ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা আদৌ সম্ভবপর হয় না। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই টাকা জমিদারগণ না লইলে তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার বিধি আইনে রহিয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি সেলামীর বহু টাকা কালেক্টরীতে জমা হইতেছে, কিন্তু মালিকগণ আইনের ঐ প্রতিবন্ধকতার জন্য তাহা আদায় করিতে পারিতেছে না, সুতরাং ঐ টাকা ক্রমে বাজেয়াপ্ত হইবে।

মালিক একজন হইলে তখনই তাহাকে সেলামীর টাকা কালেক্টরের পাঠাইতে হইবে আইনে এই বিধান থাকিলেও মালিকগণ তাহাও পাইতেছেন না। ক্রেতার নামও এখন জারি না হওয়ায় সেও নিজ মত খাজানার টাকা দিতে পারিতেছে না। এই আইনের ফলে গবর্ণমেণ্টের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও প্রজা ও জমিদার প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। ইহাতে সরকারের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ ও পোষ্টাল বিভাগের আয়-বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেলামীর বহু টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের কোষাগার

পূর্ণ হইবার অন্যতম উপায় হইয়াছে। কিন্তু যে জমিদার আজ বিপন্ন, ঋণগ্রস্ত তাহার বহু টাকা সরকারের কোষাগারে সঞ্চিত থাকিলেও, সে সময় খাজানা দিতে না পারায় তাহার ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। জিলার কালেক্টরগণ যাহাতে এই সেসামীর টাকা মনিঅর্ডার যোগে জমিদারের নিকট অযথা বিলম্ব না করিয়া পাঠাইতে বাধ্য হন গবর্ণমেণ্ট হইতে এই প্রকার আদেশ প্রদত্ত না হইলে অনেক জমিদারেরই ভূসম্পত্তি যে এই দুর্দিনে নীলাম হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(সুরাজ—পাবনা)

নারী-কর্ম্মি-শিক্ষা-মন্দির

গত ২০শে মে তারিখ হইতে নারী-কর্ম্মি-শিক্ষা-মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

কাঁথি সহর হইতে দুই মাল দূরবর্ত্তী হাকিমপ্রামে স্বর্গীয় রোহিণীকুমার দাস মহাশয়ের নির্ম্মিত একখানি বাড়ীতে এই শিক্ষা-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। এই বাড়ীর খুব নিকট পর্য্যন্ত মোটর যাইবার সুবিধা আছে। শিক্ষার্থিনীগণ কাঁথি পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে মোটরযোগে ঐ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। রাস্তা-খরচ শিক্ষার্থিনীকে বহন করিতে হয়।

কয়েকটি নিয়ম

শিক্ষার্থিনীগণকে নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য চরকা, নাটাই আদি সরঞ্জাম শিক্ষা-কালের জন্য শিক্ষা মন্দিরে রাখিতে হয়। পাঁজ বা তুলা সঙ্গে আনিতে হয়।

প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। সর্ব্বদা নিজের কার্য্য ও শিক্ষা-মন্দিরের নিয়মানুযায়ী কার্য্য নিয়মসভাবে করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থিনী যতদূর সম্ভব কম গহনাদি সঙ্গে লইয়া আসিবেন। বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিষ ব্যতীত সমস্ত বাহুল্য বর্জ্জন করিবেন।

যাঁহারা শিক্ষা মন্দিরে বাস করিবেন তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি সঙ্গে আনিতে হইবে :

১। বিছানা—(ক) সতরঞ্চ, কম্বল বা বালুচ, বিছানার চাদর, মশারী, বালিশ, ইচ্ছা করিলে তোষক।

(খ) সন্তানাদি সঙ্গে থাকিলে, তাহাদের উপযোগী বিছানা।

২। ছোট বাক্স—ইহাতে অন্যান্য জিনিষপত্র, নিজ নিজ বস্ত্র, পুস্তক ও প্রসাধন দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

৩। থালা ১, বাটী ১, গ্লাস ১, সম্ভব হইলে ঘটী ১, এবং হারিকেন ১।

যাঁহাদিগকে নিজ ব্যয়ে থাকিতে হইবে তাঁহাদিগকে প্রথম উপস্থিতির দিন ৭৲ টাকা ও সন্তানাদি থাকিলে প্রত্যেকের জন্য ১৲ টাকা হিসাবে জমা দিতে হইবে।

(নীহার-কাঁথি)

জয়নগর ইউঃ বোর্ড

১৩৩৪ সালের হিসাব

আয়

জেলা বোর্ডের দান	৬২৫৲
পূর্ব্ব সনের আগত তহবিল	১৯৭৸৮
খোঁয়াড়ের জমা	২১৲
৩৭ (ক) ধারা অনুযায়ী ট্যাক্স আদায়	৮১৭৸৬
৩৭ (খ) ,, ,,	১৪১৸৶৬
পরোয়ানা আদির ফিস	১৪৶০
	১২৬৪৸৶৮

কেরাণীর বেতন	১৪৪৲
হকাদার চৌকিদারের বেতন	৬১২৶০
রাস্তা নির্ম্মাণ	৫২৲
পুল নির্ম্মাণ	১০৭৸৶৬
আফিস খরচ	২৪৪৯
অন্যান্য খরচ	৫৪৸৩
মোকদ্দমা খরচ	২৭৸০
	১০৬২৸৬৩

পরোয়ানা জারির ফিস	১৪৵০
	১০৭৭/১
	১৮১৬/৫
	১২৬৪৬৵৮

১৩৩৫ সালের হিসাব

আয়

পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	১৮১৬/৫ পাই
৩৭ (ক) ধারা অনুযায়ী ট্যাক্স আদায়	৬৩৪।০ আনা
৩৭ (খ) ধারা অনুযায়ী ট্যাক্স আদায়	২৩৮॥০ আনা
সমন জারির ফিস	৫৵০ আনা
চৌকিদারের পুরস্কার	৩৫৲ টাকা
জরিমানা আদায়	১৭৸০ আনা
খোঁয়াড়ের ধনা	২৩৲ টাকা
	১১৩৯৷৵৫

কেরাণীর বেতন	১০৮৲
চৌকিদার দফাদারের বেতন	৫০৪৲
পোষাক খরচ	১৬।০
দফাদারের তৈল খরচ	৬৲
রাস্তা নির্ম্মাণ	২১৩৸৬
আফিস খরচ	২৫৵৩
জরিমানা পাঠান চর	১৭৸০
সমন জারি	৫৵০
পুরস্কার	৩২৲
	২২৯/৯
তহবিল	২১০।/৮
	১১৩৯৷৵৫

১৩৩৬ সালের হিসাব

পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	২১০৵৮
খোঁয়াড় হইতে আয়	৩৮৲
৩৭ (ক) ধারা মতে রেট আদায়	৯৯৩৷০
৩৭ (খ) ধারা মতে রেট আদায়	১০৮৷৵০
জেলা বোর্ডের দান	৫৫৵০
৪১ ধারা মতে জরিমানা আদায়	৸৵০
সমন জারির ফিস	৭৸৵০
জরিমানা আদায়	৪।০
পুরস্কার	২৲
	১৪১২।৵৮

চৌকিদারের বেতন	৯০০।০
পোষাক খরচ	১৬।০
তৈল খরচ	৬৲
কেরাণীর বেতন	৭২৲
আদায়ী খরচ	১২০৲
রাস্তা মেরামত	৮২৫৵০
প্রাথমিক শিক্ষা	৮০৲
জরিমানা	৪।০
সমন জারির ফিস	৭৸৵০
পুরস্কার	২৲
বিবিধ প্রকারের খরচ	৩২।০
	১৩২৩৷০
	৯৬৵৮
	১৪১২৷৵৮

মফিজউদ্দিন ভূঁঞা
প্রেঃ অমনগর ইঃ বোর্ড, থানা শিবপুর (ঢাকা)।

অন্নমণ্ডপ ইউনিয়ন বোর্ড

১৩৩৭ সালের হিসাব

আয়

১৩৩৬ সালের মজুত তহবিল	৫১৮/৯
খোঁয়াড়ের জমা আদায়	২০৷৹
৩৭ (ক) ধারানুযায়ী ইউনিয়ন ট্যাক্স আদায়	১১৪২৶৹
জিলা বোর্ডের সাহায্য	২৪৸৹
ইউনিয়ন বেঞ্চের বাবদ জমা	১২৮৸৹
ইউনিয়ন কোর্টের ফিস জমা	৬৮৭৸/০
সমন আমিন ফিস্ জমা	২৪৶৹
বর্জ্জ বাবদ	৩০৷৩
অন্যান্য বাবদ	৮৲
	২০২৮৷৶৹
	২০২৪৷৬
তহবিল	৭৪৶৬

ব্যয়

দফাদার ও চৌকিদারদের বেতন	৯২৪৲
পোষাকের মূল্য	৩৮৷৹
কেরাণীর বেতনাদি	২১৮৲
আদায় খরচ	৭০৷৹
রাজঘাটার খেয়া	২০৲
রাস্তা মেরামত খরচ	১৩৬৶৩
জল সরবরাহ (নির্ম্মাণ)	৭৫৲
ঐ (মেরামত)	৪৬৲
অফিস গৃহ নির্ম্মাণ	১১৮৯৶
বিদ্যালয়	১৪৫৲
চিকিৎসা	৪৲
ইউঃ বেঞ্চ	২৩৷৶
ইউঃ কোর্ট	৩২৶৹
সমন আমিন ফিস	২৪৶৹
জল পরিশোধ	৩০৷৩
বিবিধ	৩২৲
মোট	২০২৪৷৬

বেঞ্চ ও কোর্ট

বেঞ্চে ১৩৩৭ সনে ১০৪টী মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৮৪টী নিষ্পত্তি হইয়াছে, ২০টী মোকদ্দমা মুলতবী আছে। কোর্টে ৩২৫ মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিষ্পত্তির সংখ্যা ২৮২, মুলতবীর সংখ্যা ৪৩।

১৯৩০ সনের জন্ম-মৃত্যু

জন্ম-সংখ্যা :—পুরুষ ১০৬, স্ত্রী ১০০, মোট ২০৬।

মৃত্যু-সংখ্যা :—পুরুষ ৮৮, স্ত্রী ৭৮, মৃত প্রসূত ১১, মোট ১৮৪।

১৩৩৮ সালের আয়ব্যয়ের বাজেট

আয়

৩৭ (ক) ধারানুযায়ী ট্যাক্স	
অনাদায়ী ট্যাক্সের ক্ষতি-পূরণ শতকরা ১০৲ টাকা হারে ...	
৩৭ (খ) ধারানুযায়ী ট্যাক্স	
অনাদায়ী ট্যাক্সের ক্ষতি-পূরণ শতকরা ১০৲ হারে	১১৷৹
খোঁয়াড়ের আয়	৫০৲
জিলা বোর্ডের সাহায্য	৩০৲
বেঞ্চের আয়	৬০৲
কোর্টের আয়	২৪০৲
	১৭৩০৲
তহবিল	৪৮৯
	১৭৭৮৯

ব্যয়

দফাদার ও চৌকিদারদের বেতন	

দফাদার ও চৌকিদারদের পোষাকের মূল্য	৩২৷৹
দফাদারের তৈল সলিতা খরচা	৬৲
কেরাণীর বেতন	২১৩৲
অনাদায়ী ট্যাক্সের ক্ষতিপূরণ	৪১৲
ট্যাক্স আদায় খরচ	২৮৷৹
রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত খরচ	১৩০৲
জল সরবরাহ ব্যয় (পুরাতন ইঁদারা সাফাই)	৫০৲
স্কুলের সাহায্য	১২৫৲
দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যয়	২৯৲
বানীয়াড়া দক্ষিণ বাড়ী শ্মশান ঘাট নির্ম্মাণের ব্যয়	৩০৲
রাজঘাটের খালে বেরা	২০৲
অফিস ব্যয়	১০০৲
	১৭৩০৲
	৪৮৮৯
	১৭৭৯৮৯

জয়নগুপ হাই স্কুলে বর্ত্তমান সনে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে; পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্কুলের চেয়ে এই স্কুলের শিক্ষাকার্য্য ভাল চলিতেছে। ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে প্রায় ২০০ শত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ১৪০ শত হইবে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এতদ্দেশের কৃষক সম্প্রদায়ে বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে বেশ উৎসাহ জন্মিয়াছে। ইহা অতীব সুখের বিষয়। উক্ত স্কুল পরিচালনার্থে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কৃপাময় বিশ্বাস মহাশয় প্রাণপণে চেষ্টা ও নানারূপে আর্থিক সহায়তা করিতেছেন বলিয়াই স্কুলটী উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি বিদেশী ছাত্রদিগকে বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন। অতএব আশা করি, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ইউনিয়নবাসিগণ উক্ত সর্ব্বজনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিয়া বাধিত করিবেন। কিছুদিন হইল জয়নগুপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর রায় মহাশয় এই দুর্দ্দিনে উক্ত স্কুলে নগদ ৩০০৲ তিনশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছে। উক্ত স্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ও পূর্ব্বাপর স্কুলের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

জয়নগুপের যুবক-সঙ্ঘের সহায়তায় এই গ্রামে কয়েক মাস যাবৎ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০।৪৫ জন হইয়াছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়,
জয়নগুপ ইউনিয়ন বোর্ড, চাকা।

কুড়িগ্রাম সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের

৩০।৬।৩০ তারিখের উদ্বর্ত্তপত্র

দেনা

বিবরণ	
১। অংশ বিক্রয়মূলক মূলধন	
২। আমানত :—	
(ক) সভ্যগণের	
(খ) সভ্য নহেন এমন ব্যক্তির	
৩। প্রাদেশিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট কর্জ্জ গ্রহণ	১,১৪,৬০০৲
৪। সংযুক্ত সমিতির আমানত	২,৭৫৭৷৵০
৫। সুদ বাবদ	৭,২০০৵৪
৬। ডিভিডেণ্ড বাবদ	২,৩৫৯৸৵৮
৭। বোনাস্ বাবদ	৪৬১৷০
৮। পরিচালনার ব্যয় বাবদ	১,২৩৮৷৶৯
৯। ডেলিগেট ফি	১৷৷০
১০। অন্যান্য :—	
(ক) কর্ম্মচারিগণের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড	৪৩০৸৵১
(খ) সমিতির রিজার্ভ ফণ্ড	১,৪৯৬৷৵০
(গ) অডিটর ফি অতিরিক্ত	২১৸৵০
(ঘ) বি, সি, ও, এস, চাঁদা অতিরিক্ত	২৲
১১। রিজার্ভ ফণ্ড	৮২,০৯৲৪
১২। অন্যান্য ফণ্ড :—	
(ক) বিল্ডিং ফণ্ড	
(খ) লাইব্রেরী ফণ্ড	

(গ) শিক্ষা-বিস্তার ফণ্ড	৩৫০৲
(ঘ) ব্যাড্‌ডেট ফণ্ড	২,৪০২৶৩৷
(ঙ) ইন্‌সপেক্‌সন্ বাবদ	৪০০৲
১৩। দাতব্য ফণ্ড	১০০৲
১৪। অবিতরিত লভ্যাংশ	৪৭৬৸৶৷৷০
	২,৪৭,১৬৫৲
	৪,৮৬০৸৶১
	৯৬১৮২৫৸৶৬

বিবরণ

নগদ তহবিল :—

(হাতে ও ব্যাঙ্কে)

২। অন্যান্য কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী সমূহের অংশ বাবদ

৩। প্রতিভিডেন্ট ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ড　　১০০০৲

৪। ঐ ব্যাঙ্কের অস্থায়ী আমানত　　১,৩৪০৸৶৮

৫। সংযুক্ত সমিতিসমূহের নিকট পাওনা আসল বাবদ
(তন্মধ্যে কিস্তিবেলাপী ৮৫,৪৫১৸৶০)

৬। সুদ বাবদ　　১১,৩৫৫৸৶০
(তন্মধ্যে কিস্তিবেলাপী বাবদ ৬৩০১৲)

৭। ষ্টকের মূল্য　　৭০০৲

৮। অডিট ফি　　৮৫০৸৶০

৯। বি, সি, ও, এস, চাঁদা　　১০০৲

১০। অগ্রিম বেতন　　৪৬৮৲

১১। মোকদ্দমা খরচ　　১৫

১২। হোমসেক বাক্স মূল্য　　১৫১৸৶০

১৩। খাতা ফরমের মূল্য　　৩৪৮৶৬

১৪। ডিভিডেণ্ড অতিরিক্ত　　৬৫৸৶০

২,৬২৮৫৫৸৶৮

শ্রীইন্দুভূষণ রায়
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
আবদুর রাজ্জাক্
(রঙ্গপুর—দর্পণ)

অল্পবয়স্ক অপরাধিগণের সহায়ক সমিতি

আজকাল অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে জেলের পরিবর্ত্তে অনেক সময় রিফর্মেটরি স্কুলে অথবা সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। তথা হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া যাহাতে সদ্ভাবে থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারে তজ্জন্য অল্পবয়স্ক অপরাধীকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে বেকার অবস্থায় পড়িয়া আবার বিপথগামী হওয়া ইহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

এই শ্রেণীর অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতায় একটী সমিতি আছে। বিগত ২৪শে এপ্রিল তারিখে চৌরঙ্গীর ওয়াই-এম-সি এ'তে এই সমিতির বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি স্যার জর্জ্জ রাঙ্কিন বলেন, সমিতির তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত যুবককে রাখা হয় তাহাদের জন্য চাকুরীর বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, তাহা সত্ত্বেও সমস্ত যুবকের চাকুরীর উপায় করা যাইতেছে না। এবিষয়ে দেশের বিশিষ্ট জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। কারণ একবার মাত্র অপরাধ করিয়া যাহারা কারাদণ্ড পায় তাহাদিগকে অনেক চেষ্টা করিয়া সৎপথে আনয়ন করা হয়। তাহাদিগকে যদি কোন কাজে নিযুক্ত না রাখা যায়, তাহা হইলে বেকার অবস্থায় বিপথগামী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

শ্রীযুক্ত এইচ, এস, সুরাবর্দ্দি বলেন, এই সমিতির কার্য্যের সহায়তা করা জনসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজ সেবার দিক্ হইতে সমিতির কার্য্য বড়ই দরকারী।

কলিকাতার নাবালক অপরাধীদের বিচার সম্বন্ধে বি, কে, মুখার্জ্জি বলেন, ১৬ বৎসরের বালক যদি একবার অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে চির জীবনের জন্য তাহাকে দাগী আসামী বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। আমার মনে হয় এরূপ করা উচিত নয়। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখিলে অল্পবয়স্ক অপরাধীর চরিত্র সংশোধন হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া নূতনভাবে জীবন চালাইতে পারে। এরূপ অপরাধীর জন্য চাকুরীর বন্দোবস্ত করিয়া সমিতি যথার্থ জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন। সমিতির তত্ত্বাবধানে আলীপুরে একটী হষ্টেল আছে। তথায় এই শ্রেণীর অপরাধীদিগকে মুক্তির পর আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করা হয় এবং কোন না কোন কাজ জোটাইয়া দেওয়া হয়। এই সুযোগে অনেকেই নূতনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে পারে।

উক্ত সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মেজর বি, জি, মালায়া বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহাতে জানা যায়, আলীপুরের হষ্টেলে ১৯২৯ সনে ১১০ জন অপরাধী ভর্ত্তি হইয়াছিল, ১৯৩০ সনে ১৩৩ জন ভর্ত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৪ জনের চাকুরীর সংস্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কোষাধ্যক্ষ মিঃ চার্লস বেত্রাম যে রিপোর্ট দেন তাহাতে জানা যায়, ১৯৩০ সনে সমিতির আয় হইয়াছিল ৪৭৮৩৷৵ এবং ব্যয় হইয়াছে ৪৫৪৮/৮ পাই। হাতে আছে ২৩৯৫৪ পাই।

ঐ টাকার অধিকাংশই গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিতেছেন।

(সঞ্জীবনী—কলিকাতা)

কৃষিতে ভারত

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী সম্পন্ন; সুতরাং সে সকল দেশে সরকার যে টাকা কৃষিতে ব্যয় করেন তাহা এদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে করা সম্ভব নয়, এ কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু ইতালী তেমন ধনী দেশ নহে। একাধিক ইংরেজ অর্থ-নীতিবিদ্ ভারতবর্ষের সঙ্গে ইতালীর তুলনা করিয়াছেন। ইতালী ও ভারতবর্ষে সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কৃষি-ব্যয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯২৪-২৫ সনে সরকার কৃষির জন্য এদেশে মোট যে টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তাহা ষ্টীল প্রটেক্‌শান অ্যাক্ট অনুযায়ী লৌহ-ব্যবসায়ের জন্য ব্যয়িত অর্থ অপেক্ষাও কম। লৌহ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা তিন লক্ষ মাত্র। আর ভারতের শতকরা প্রায় ৮০ জন চাষী।

দেশ	প্রতি হাজার অধিবাসীর জন্য (টাকা)	প্রতি হাজার একর কর্ষিত ভূমিতে (টাকা)
জার্ম্মাণি (১৯১০)	৯৪৲	৭৫৲
যুক্তরাষ্ট্র (১৯১৯-২০)	১,০২০৲	২১০৲
ইংলণ্ড (১৯২১)	৭৬০৲	১৩৮০৲
ইতালী (১৯২৫-২৬)	২৪৫৲	১৮৪৲
ভারতবর্ষ (১৯২৪-২৫)	৩৪৲	৩০৲

১ একরে আমাদের বাঙ্গালার প্রায় ৩ বিঘা।

১৯২৯-২৮ সনের হিসাব (বাজেট) অনুযায়ী কোন্ প্রদেশে কৃষিতে কত ব্যয় হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পাঞ্জাব	৫৪,৫৯,০০০৲
মাদ্রাজ	৩৪,৮৪,৬০০৲
যুক্ত-প্রদেশ	৩০,২৪,৯১১৲
বোম্বাই	২৮,৪০,০০০৲
বাংলা	২১,২৭,০০০৲

যদি দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে হয় তবে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য যেমন চেষ্টা করিতে হইবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতির জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

দশ কাঠা জমিতে গড়ে প্রতি বৎসর কোন্ দেশে কত শস্য উৎপন্ন হয় তার হিসাব এই :

দেশ	মণ
বেলজিয়াম	১১
ডেন্‌মার্ক	৮
জার্ম্মাণি	৮
ইংলণ্ড	৮
ইজিপ্‌ট	৬

জাপান	৬
কানাডা	৬
মার্কিন	৬
অষ্ট্রেলিয়া	৫
ভারতবর্ষ	৪

অথচ ভারতবর্ষে জমির খাজানার চার শতু নয়। ১০০৲ টাকা মূল্যের ফসল জন্মাইলে কোন্ দেশে কত রাজস্ব দিতে হয় তার নমুনা :

ইংলণ্ড	৮৶
ইতালী	৭৲
অষ্ট্রীয়া	৪৸৶
ফ্রান্স	৪৸৶
জার্ম্মাণি	৫৲
বেলজিয়াম	২৸৶
হল্যাণ্ড	২৸৶
ভারতবর্ষ	১৫৲ হইতে ৪০৲

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ

এবার রেল-বিস্তারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তের কোটি টাকার উর্দ্ধ একটি ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব বিলাতে আরি করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শতকরা ৬২ টাকা অগৃহীত রহিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতীয় ঋণ বাজারে পড়িতে পাইত না। প্রস্তাব বাহির হইবামাত্র ঋণের টাকা আসিয়া যাইত, এমন কি বহু টাকা ফেরৎ দেওয়া হইত। ভারতীয় ঋণের সুদের হার বেশী হইত এবং বেশ লাভজনক ছিল। কিন্তু এবার লণ্ডন ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ২৷৹টাকা থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৯৲ টাকা হারের ঋণের টাকারও আজ পর্য্যন্ত শতকরা ৬২৲ টাকা অগৃহীত রহিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা ইহার একটা প্রধান কারণ। তারপর বিলাতের লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই টাকায় মালপত্র বিলাতে কেনা হইবে কিনা? মিঃ বেন বলিয়াছেন যে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত অনুসারে যেখানে সবচেয়ে সস্তা পাওয়া যায় সেইখানে ক্রয় করা হইবে। বিলাতের লোক তাহা শুনিবে না। তাহারা বলে আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য নাই, আমাদের টাকা লইয়া তোমরা অন্য দেশে মাল কিনিবে আর সে দেশের ব্যবসা বাড়িবে। এতদিন বিলাতের টাকা লইয়া বিলাতেই বেশী দামে মাল ক্রয় করা হইত। তাহাতে বিলাতের লোক বেশী হারে সুদ ও বেশী হারে লভ্যা পাইত। ইহাতে আপত্তি করিয়া হাই-কমিশনারের পদ করা হয়; তিনি ইয়োরোপে সস্তায় মালামাল ক্রয় করেন। ১৭৫ বৎসরে ইংরেজ ভারতে রেলগাড়ী তৈয়ারীর কোনও কারখানা করেন নাই বা উৎসাহ দেন নাই। এমন কি টাটা কোম্পানীর নিকট হইতেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাল লওয়া হয় না, কারণ দাম বেশী। আমরা বলি হউক না বেশী দাম, তবুও দেশে জিনিষ কিনিলে ক্রমে বেশী কারবারের উন্নতি হইয়া সস্তায় দেওয়ারও ব্যবস্থা হইতে পারে। ভারত সরকার অনেক মালামাল বিদেশ হইতে ক্রয় করেন। কিন্তু যদি যতদূর সম্ভব বেশী মাল ক্রয় করা হয়, তবে অনেক বেশী শিল্প বাড়িতে পারে। উৎসাহে সব শিল্পই বৃদ্ধি পায়। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সস্তাই একমাত্র বিবেচনার বিষয় নয়। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়িত টাকার কত বেশী অংশ দেশে থাকে তাহাই সর্ব্বপ্রথম দ্রষ্টব্য। বিলাতের লোক যদি বলিতে পারে যে, বেশী দাম হইলেও বিলাতে জিনিষ কিনিতে হইবে, নতুবা ঋণ দিব না; ভারতবাসীও তবে বলিতে পারে, যতই বেশী দাম হউক না কেন, উৎসাহ দিয়া বেশী মাল উৎপন্ন করাইতে হইবে ও ক্রয় করিতে হইবে। নতুবা আমরা নিরস্ত্র হইয়া মাথায় হাত পায়ে ফেলিয়া ট্যাক্স দিব না। এ কথায় দিনও বেশী ঘুরে নাই।

(জনমত-জলপাইগুড়ি)

সর্ব্বত্র ব্যয়-হ্রাসের প্রচেষ্টা

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব সরকারী বিভিন্ন বিভাগে শতকরা দশ টাকা হিসাবে খরচ কমাইতে চাহেন। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য সিমলায় এক কমিটি বসিয়াছে। তাঁহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের এবং অন্যান্য দেশের সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব ও পরামর্শ লইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

করিবেন। জাপান গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব বলিয়াছেন,—সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন শতকরা কুড়ি টাকা হারে কমাইয়া দেওয়া উচিত। ইংলণ্ড তথা ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানেও ব্যয়সঙ্কোচের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীর বেতন কমানো হইয়াছে। কোথাও কোথাও যে ব্যয়সঙ্কোচে আপত্তির সুর শুনা যাইতেছে না, এমনও নহে। ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন কোন বিভাগ জানাইয়াছেন যে, কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া দিলে বা লোক কমাইয়া দিলে কাজ পণ্ড হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ কথায় কাণ দিবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ইতিমধ্যেই ভারত গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের বহু কর্ম্মচারীকে জবাব দেওয়া হইয়াছে এবং বহু কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, লোক কমাইয়া দেওয়াই ভাল; তথাপি বেতন কমাইয়া দেওয়া ভাল নহে; আবার আর এক পক্ষের মত সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহারা বলেন,—লোক যত বেশী হয়, ততই ভাল; তবে খরচ কমাইবার জন্য বেতন কমাইয়া দেওয়াই সমীচীন। রেলের আফিসেও এইরূপ হইতেছে। বাজী কমিয়াছে, কাজেই ষ্টেশও কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। আয়ব্যয় সমান না হইলে কোন কাজই সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না। সরকারী রাজস্ব যদি কমিয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারী ব্যয় কমাইতেই হইবে। এদেশে প্রায় অল্প বেতনের কেরাণীদের উপরেই ব্যয়সঙ্কোচের কুঠার পড়িতে দেখা গিয়া থাকে। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; রেল ও সরকারী আফিসসমূহের স্বল্পশিক্ষিত কেরাণীদের চাকুরী হইলে, শিক্ষিত বেকারে যে দেশ ভরিয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক বেসরকারী সওদাগরী আফিস হইতেও বহু লোককে জবাব দেওয়া হইতেছে। এক সঙ্গে এত লোকের উপার্জ্জন রহিত হইলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা আরও কঠোর হইয়া উঠিবে, মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীরা—সাধারণতঃ কেরাণীরা—যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাই খরচ করিয়া থাকে, তাহাদের অর্থ সঞ্চিত হইতে পায় না। আবার অনেকগুলি কেরাণীকে বরখাস্ত করিলেও সরকারের বা কোম্পানীর বিশেষ ব্যয়-হ্রাস সম্ভবপর নহে। কাজেই কতকগুলি কেরাণীর উপার্জ্জন বন্ধ হইলে বহু পরিবার অনাহারে প্রাণ হারাইবে, পরন্তু তাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থারও কঠোরতা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। অথচ যদি কর্ত্তৃপক্ষ উপর দিক্ হইতে মোটা মাহিয়ানার কয়েকজন মাত্র কর্ম্মচারীকে জবাব দেন, অথবা তাঁহাদের মোটা বেতন হইতে কিছু কিছু কাটিয়া লয়েন, তাহা হইলে খুব বেশী অসুবিধার কারণ হয় না।

বৃটিশ তন্তুবায়দের আন্দোলন

৬০ জন রক্ষণশীল লর্ড এবং কমন্স সভার কতিপয় রক্ষণশীল সভ্য সম্প্রতি কমন্স সভার গৃহে সমবেত হইয়া, ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবণ করেন।

লর্ড শীল, স্যার স্যামুয়েল হোর, মিঃ নেভিল চেম্বারলেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রক্ষণশীল দলপতি বল্ডুইন উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন: ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত সংরক্ষণী সর্ত্তের কথা হইয়াছে, তৎসমস্তই রক্ষণশীলদলের মতে অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। এগুলি অঙ্কুর রাখিয়া ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সংযুক্ত রাষ্ট্রবুনক্ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা, তাহাই রক্ষণশীল দল বিবেচনা করিবেন। বৃটিশ বণিকদিগকে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় এই দলের আছে। সুতরাং ভারতের সহিত মীমাংসার সময় যাহাতে বৃটিশ বাণিজ্যের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা না হয় তৎপ্রতি রক্ষণশীল দল বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

সভায় এই পত্র পাঠ করা হয়। ল্যাঙ্কাশিয়ারের পক্ষ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ বলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা রক্ষণশীলদলের শরণাপন্ন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডিমেট্রোইডি এই প্রতিনিধিদলের নায়ক ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের মনে হয়, ল্যাঙ্কাশিয়ারের স্বার্থ বলি দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যেন রাজদ্রোহ করিতেছেন। * * এসময়ে আর চুপ করিয়া থাকা যায় না; পরিষ্কার ভাবে স্পষ্ট কথা বলিবার সময় আসিয়াছে।

* * * ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা আশা করি এবং দাবী করি পার্লামেন্ট অবশ্যই আমাদের অধিকার রক্ষা করিবেন।

গান্ধী বার বার বলিয়াছেন, বৃটিশ বস্ত্রের আমদানি বন্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সহিত চুক্তি করিয়া কোনই লাভ হইবে না।

প্রতিনিধিদলের কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন ও স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন, রক্ষণশীলদল অবশ্যই তাঁহাদের সাহায্য করিবেন।

উদারনৈতিক দলের সহিত সাক্ষাৎ

অতঃপর ল্যাঙ্কাশিয়ারের প্রতিনিধিগণ, উদারনৈতিক দলের কতিপয় সদস্যের সহিত দেখা করেন। প্রত্যুত্তরে উদারনৈতিক সদস্যগণ বলেন,—আপনাদের বক্তব্য শুনিয়া আমরা অভিযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর ল্যাঙ্কাশিয়ারের প্রতিনিধিগণ আর একটি ডেপুটেশন গঠন করিয়া ভারতসচিবের নিকট গিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারের অভিযোগের কথা আলোচনা করেন।

বৃটিশপণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ

বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী গ্রহণের আন্দোলন এক জিনিষ নহে; এই দুই কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে এই পার্থক্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি বিলাতের এক দল বস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং তন্তুবায় এই অভিযোগ করিতেছেন যে, দিল্লীর চুক্তির সর্ত্ত প্রতিপালিত হইতেছে না। এই অভিযোগ যদি স্বদেশী প্রচার সম্পর্কে হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্বয়ং ভারতসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েজউড বেন তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছেন। তথাপি বৃটিশ তন্তুবায়দের আন্দোলন থামিতেছে না।

রয়াল এক্সচেঞ্জের প্রস্তাব

ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্র-বয়নের প্রধান কেন্দ্র; তথাকার রয়াল এক্সচেঞ্জে ৮০০০ বৃটিশ তন্তুবায় সমবেত হইয়া ভারতের বয়কট আন্দোলনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা করিয়া যে প্রস্তাব করা হয়, তাহার গুরুত্ব খুব বেশী, সচরাচর এরূপ প্রস্তাব করা হয় না।

বিগত এই মে তারিখের সভায় রয়াল এক্সচেঞ্জের সভাপতি সার আর্থার হালস্বার্থ স্বয়ং এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবের গোড়াতেই ভারতের বয়কট আন্দোলন, আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি এবং পিকেটিং প্রভৃতির নিন্দা করা হয়। অতঃপর বলা হয় যে, ভারতবাসীর আইনসঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সকলেরই সহানুভূতি আছে। স্বাধীন শাসন লাভের জন্য চেষ্টা করা অন্যায় নহে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় দলের প্রস্তাবসমূহ বৃটিশ কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বেই অনুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং এসময়ে উভয় দেশের অকল্যাণের জন্যই বৃটিশ পণ্য বয়কটের যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা বন্ধ করা আবশ্যক।

পরিশেষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বলা হইয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বয়কট আন্দোলন থামাইয়া দেন এবং আমদানি শুল্ক হ্রাস করেন তাহার উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দিল্লীর চুক্তির উদ্দেশ্য

বিগত ৪ঠা মে তারিখে কমন্স সভায় আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। অনেকেই ভারত সচিবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে মিঃ বেন বলেন, "রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে পরিচালিত বয়কট আন্দোলন বন্ধ করাই দিল্লীর চুক্তির উদ্দেশ্য। এই চুক্তিতে স্বদেশী প্রচারের অধিকার অস্বীকার করা হয় নাই। ভারতবাসীরা ইচ্ছা করিলে লোককে বুঝাইয়া স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "দিল্লীর চুক্তির সর্ত্তগুলি মোটামুটিভাবে প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস; যদি কোনও স্থলে সর্ত্ত লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে, তবে তাহার কথা আমাকে জানাইলে আমি তদন্তের ব্যবস্থা করিব।"

স্বদেশী প্রচারের ফল

বোম্বাইয়ের কলওয়ালা সমিতির সভাপতি এবং অন্যান্য

সভার অন্যতম সদস্য মিঃ এইচ, পি, মোডি লিখিয়াছেন, ল্যাঙ্কাশিয়ারের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত্ত প্রতিপালিত হইতেছে না, একথা সত্য নহে। আমার মনে হয়, ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। এরূপ হইল কেন তাহার কারণ ইহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। স্বদেশী প্রচারের ফলে ভারতবাসীরা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সহজে তাহারা আর বিলাতী বস্ত্র গ্রহণ করিবে না। তবে যে পরিমাণ এবং যে রকমের বস্ত্রের চাহিদা হইবে, তাহা যদি ভারতের মিলে উৎপন্ন না হয়, তবে ভারতবর্ষে কিছু কিছু বিদেশী বস্ত্রের কাটতি হইতে পারে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ভারতবাসীর ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। সে জন্য বিলাতী দ্রব্যের কাটতি কমিয়াছে।

বোম্বাইয়ের কলে কর্ম্মবৃদ্ধি

বোম্বাই সহরে ৭১টি কাপড়ের কল আছে। তন্মধ্যে ২৪টি কলে দিবারাত্রি কাজ হইতেছে। এত বেশী কাপড়ের ফরমাইস্ আসিয়াছে যে, দিবারাত্রি কাজ করিয়াও সময়মত সমস্ত কাপড় সরবরাহ করা যাইতেছে না।

(দেশীয়নী—কলিকাতা)

পার্লামেণ্টে আপোষের আলোচনা

পার্লামেণ্টে ভারত-সচিবের আফিসের ব্যয়সঙ্কোচ আলোচনা-প্রসঙ্গে গান্ধী-আরউইন আপোষের কথাও উঠিয়াছিল।

চুক্তিভঙ্গের অনুযোগ

স্যর ফিলিপ কানলিফ-লিষ্টার এই বিতর্কের উদ্বোধন করেন এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ল্যাঙ্কাশিয়ারের বাণিজ্যে উন্নতির কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তিনি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং বলেন যে, যদি ইহাকে চুক্তি বলিয়া অভিহিত করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, চুক্তি তো অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতেছে না বটেই, চুক্তির মূল মর্ম্মানুসারেও কোন কাজ করা হইতেছে না। ভারতে এক্ষণে যে সমস্ত বৃটিশ বস্ত্র ও কার্পাস পণ্য মজুত আছে, সেইগুলিকে পুনরায় পাঠাইয়া দিবার জন্য কোম্পানী গঠিত হইতেছে, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই সাংঘাতিকরূপে চুক্তিভঙ্গ হইতেছে।

উদারনৈতিকদিগের দরদ

স্যর হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল উদারনৈতিকদলের পক্ষ হইতে স্যর ফিলিপ কানলিফ-লিষ্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি ল্যাঙ্কাশিয়ারের প্রতিবাদে সভাতল ধ্বনিত করিয়াছেন। ল্যাঙ্কাশিয়ারের বণিকদের মনোভাব এত গুরুতর ও ব্যাপক যে, কমন্স সভার সদস্যদের উহা শ্রবণ না করা সম্ভব নহে। স্যর হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, জাপানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভারতের ক্রয়-ক্ষমতার গুরুতর হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় আমদানি-শুল্কের বৃদ্ধি ও বন্ধকটের প্রাবল্যের জন্যই ল্যাঙ্কাশিয়ারের বাণিজ্যের এত শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। ইহার একমাত্র পথ হইতেছে, উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত গোলটেবিলের নির্দ্ধারিত পন্থা অনুসরণ করা। কিন্তু এই জন্য অবশ্যই ভারতে ও বৃটেনে অনুকূল আবহাওয়া প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

ভারত-সচিবের উত্তর

ভারত সচিব শ্রীযুক্ত ওয়েজউড বেন কমন্স সভাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যদিও তাঁহারা ল্যাঙ্কাশিয়ারের বিপক্ষে ক্লিষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছেন, তথাপি ভারতের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের তদনুরূপ দায়িত্ব আছে। অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার একটী মাত্র দিকে সকলের মন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; শ্রীযুক্ত বেন এই মনোভাবের অত্যন্ত নিন্দা করেন এবং বলেন যে, বর্ত্তমানকালে একমাত্র ল্যাঙ্কাশিয়ারের বাণিজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অন্যান্য দেশের বাণিজ্যেরও অবনতি ঘটিয়াছে। তিনি জাপানের প্রতি,

ঘনিষ্ঠতা ও ভারতের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে ল্যাঙ্কাশিয়ারের সুবিধা অনেক বেশী হইবে।

শ্রীযুক্ত বেন নির্দ্দেশ করেন যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। ইহাদ্বারা কেবল যে বিদেশী পণ্য অব্যাহত-ভাবে বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে, ভারতীয় শিল্পের উৎসাহ দিবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেন পরিষ্কাররূপে বলেন যে, চুক্তির দ্বারা সাধারণ আইনের পথ অবরুদ্ধ করা হয় নাই এবং তাহা কংগ্রেসের সদিচ্ছার সহিতই প্রযুক্ত হইবে। সম্প্রতি বাণিজ্যের যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ উন্নতির আভাস পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বাজারে এক্ষণে কতক বৎসর ধরিয়া এমন কতকগুলি জিনিষের চাহিদা থাকিবে, যেগুলি পূরণ করিবার জন্য ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক দাবী করিতেছে এবং ইংলণ্ডের এই দাবীও সকলে স্বীকার করিতেছে। কিন্তু সকলে এই কথাও স্বীকার করেন যে, ভারতের আর্থিক নীতি আর্থিক চুক্তি দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত।

ভারতীয় নেতা চুক্তি পালন করিতেছেন

শ্রীযুক্ত বেন ইংলণ্ড ও ভারতের সম্পর্কের উন্নতিবিধান এবং উভয় পক্ষের চরমপন্থীদিগকে সংযত রাখার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্য বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন নহে, তদপেক্ষাও উহার একটি গভীরতর উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইতেছে ভারতে সদিচ্ছার প্রবর্ত্তন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সহিত শান্তির পথে চলিতেছেন। গোল-টেবিল বৈঠকে যে সমস্ত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অহিংসকে যোগ দেওয়াইতে প্ররোচিত করিয়াছেন,—তাঁহাদের সেই সমস্ত কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বেন অনেক কথা বলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন,—"আমাদের সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা যখন ভারতীয় জনসভার একটা বৃহৎ মণ্ডলের সর্ব্বজনমান্য নেতাকে চুক্তি করাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন আমার বিশ্বাস, এই কার্য্যের দ্বারা একটি বৃহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতের উক্ত জননায়কও এই চুক্তি পালন করিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমরা যে শান্তির পথ ধরিয়া চলিয়াছি, যদি সেই পথে আমাদিগকে চলিতে দেওয়া হয়, তবে ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠতম ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে।"

চার্চ্চিলের অভিযোগ

শ্রীযুক্ত উইনষ্টন চার্চ্চিল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, শ্রীযুক্ত বেন গোলটেবিলের একটা অংশকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন এবং অপর অংশের দিকে চক্ষু বুজিয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, পার্ল্যামেণ্টের কি ইহাই উদ্দেশ্য যে, যাবৎ ল্যাঙ্কাশিয়ার ধ্বংস না হইয়া যায়, তাবৎ সমস্ত ব্যাপারকে এই ভাবেই চলিতে দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর এবং ল্যাঙ্কা-শিয়ারের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। বিলাতী বস্ত্র-বর্জ্জন ভারতের জনসাধারণের পক্ষে হিতকর নহে। পরন্তু বস্ত্র-বর্জ্জন যত অনিষ্টকর, আর কোন জিনিষ বর্জ্জনই তত অনিষ্টকর নহে। যতদিন দাবির হাতে আছে, ততদিন কি ইহা হইতে দেওয়া আমাদের উচিত? ভারতে এই বর্জ্জন-আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়াও বিশেষ কঠিন কাজ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। ফরাসী, জর্মাণ, জাপান, ইটালিয়ান বা মার্কিণ,—কোন জাতিই তাহাদের অধীন কোন একটা উপনিবেশে এরূপ আন্দোলন বন্ধ করিতে অসুবিধা বোধ করিত না। ইংরেজের অসহায় অবস্থা দেখিয়া তাহারা হাসিতেছে। ভারতের জনসাধারণ গত দুই বৎসর হইতে যে কষ্টভোগ করিতেছে,—ভ্রমিক গবর্ণমেণ্টই তাহার জন্য দায়ী। শ্রীযুক্ত চার্চ্চিল আরও বলেন যে, বয়কট রাজনৈতিক কারণেই হউক কিংবা অর্থনৈতিক কারণেই হউক, উহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা উচিত। বৃটিশের উদ্দেশ্য ও বৃটিশের কর্ত্তব্যের উপর লোকের বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে এবং সেই দুর্ব্বলতার ফলেই বয়কট দেখা দিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কও ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এমন পথে চলিতেছেন যে, ক্রমে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া যাইবে।

লর্ড ষ্ট্যান্‌লি বলেন, যুক্তির দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে না, বলের দ্বারা তাহা পাইবার চেষ্টা হইতেই বয়কটের উদ্ভব হইয়াছে।

বড়লাট ও গবর্ণমেণ্ট

রক্ষণশীল সদস্য শ্রীযুক্ত ওয়েদারাল্ড "দুর্ব্বল বড়লাট ও দুর্ব্বল গবর্ণমেণ্ট" বলিয়া তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ইহাতে অপর রক্ষণশীল সদস্য শ্রীযুক্ত আইজাক ফুট তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যে বড়লাট বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য ব্রুটেনের অধিকাংশ লোকই অপছন্দ করিবে।

শোষণের দিন নাই

কমাণ্ডার কেনওয়ার্দ্ধি বলেন যে, ভারতকে শোষণ করা হইতেছে বলিয়া ভারতের লোকদের যে ধারণা আছে, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে এখন আর সেই শোষণের দিন নাই।

হোরের প্রশ্ন

স্যর স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেন যে, গোলটেবিলের বৈঠকে যে সদিচ্ছা সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা মন্ত্রিসভার অবলম্বিত নীতির জন্য অক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 'স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া'ই এখন মন্ত্রিসভার নীতি হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন, যদি সাধারণ বুদ্ধি, সদিচ্ছা ও সাধু বিশ্বাসের ভাব প্রবর্ত্তিত না হয়, তবে ভারতকে অধিকতর অধিকার দানের বিবেচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। স্যর স্যামুয়েল হোর জিজ্ঞাসা করেন, স্পষ্টভাবে জানিতে চাই, গবর্ণমেণ্টের নীতি কি, রক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলি সুনির্দ্দিষ্টরূপে গৃহীত হইয়াছে কিনা এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি কথায় ও কার্য্যে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা।

বিতর্কের উপসংহার

ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত বেন বিতর্কের উপসংহারে বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইবার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি, করাচী কংগ্রেস এবং বড়লাটের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার মতে অবশ্যই এই সমস্ত ঘটনা দ্রুতবেগে চলিয়াছে, কিন্তু দেরী ও ঔদাসীন্যবশতঃ কোথাও বিলম্ব হইয়াছে এরূপ অভিযোগ তিনি মানিতে পারেন না। স্যর স্যামুয়েল হোর গোলটেবিলের কার্য্য চালাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বেনের ঔৎসুক্য তদপেক্ষা কম নহে। কিন্তু এখনও অনেক বাধা কাটাইতে হইবে। কার্য্য চলিতে থাকুক বলিয়া সকলের যে সমবেত ইচ্ছা, গবর্ণমেণ্টও তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে যে কোন প্রস্তাব হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। শ্রীযুক্ত ফুট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিদিগকে যুক্তরাষ্ট্র নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া হইবে কিনা। শ্রীযুক্ত বেন উত্তরে বলেন যে, কাহাকে কাহাকে লইয়া এই প্রকার প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা গভীর মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিতেছেন এবং এই বিষয়ে কোনও উপেক্ষা প্রদর্শিত হইবে না।

চার্চ্চিলের ক্রোধ

বিতর্কের উপসংহারে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত ব্রাকেন দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী কি প্রস্তাবিত সংরক্ষণী ব্যবস্থাগুলি মানিয়া লইয়াছেন? তিনি এই প্রশ্নের সোজা উত্তর চাহেন, কিন্তু ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত বেন ইহার কোন জবাব দেন নাই। তখন শ্রীযুক্ত চার্চ্চিল একেবারে লাফাইয়া উঠেন এবং ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"আমরা কি কোন জবাব পাইব না?" শ্রীযুক্ত চার্চ্চিলের এই প্রকার আচরণে শ্রমিক সদস্যদের মহলে বিদ্রূপাত্মক চীৎকার ও হাস্যধ্বনির সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত চার্চ্চিল অভিযোগ করিতে থাকেন যে, শ্রীযুক্ত বেন আসল প্রশ্নটির উত্তর কৌশলের সহিত এড়াইয়া যাইতেছেন। কিন্তু শ্রমিক সদস্যদের জয়ধ্বনি ও হাস্য-পরিহাসের মধ্যে চার্চ্চিলের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল। তখন শ্রীযুক্ত বেন উঠিয়া বাধা দেন এবং বলেন যে, কি কি সর্ত্তে বৈঠকের পুনরায় অধিবেশন হইবে, তাহা গান্ধী-আরউইন চুক্তিতেই উল্লিখিত হইয়াছে। (অমৃতবাজার-কলিকাতা)

মেয়েদের চাকরি করার সু ও কু

[মেয়েদের চাকরি করা ভাল কি মন্দ এ বিষয় নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ চলছিল। সে আলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল। শ্রীবিশ্বচন্দ্র দত্ত]

প্রঃ—আপনি মেয়েদের চাকরি করার পক্ষে না বিপক্ষে?

উঃ—আমি তাদের চাকরিতে আপত্তির কিছু দেখি না। পুরুষরা যদি চাকরি ক'রতে পারে, মেয়েরাই বা পারবে না কেন? এতে তাদের আত্মসম্মান বোধ বাড়বে, পুরুষের ওপর অস্বাভাবিক নির্ভরতা ক'মে যাবে, দরকার হ'লে তাদের নিজেদের ভার নিজেরাই বইতে পারবে।

প্রঃ—কিন্তু এর একটা প্রধান আপত্তির কথা আপনি ভেবে দেখছেন না। মেয়েরা চাকরি ক'রলেই তারা ঘর-সংসারের কাজে অমনোযোগী হবে। ছেলেমেয়ে ভালভাবে মানুষ হবে না। সংসারের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সেই জন্যে আমার মনে হয় যে, অবিবাহিতা মেয়ের, বা সন্তানহীনা বিধবার, কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান যাঁর আছে এরকম বিধবার, চাকরি করা চলতে পারে। কিন্তু সন্তানবতী সধবা মেয়েদের কিছুতেই চাকরি করা চলতে পারে না। তাতে সমাজের হানি হবে, মঙ্গল হবে না। আপনার এ বিষয়ে মত কি?

উঃ—আপনার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। আজকাল টাওনিগ্ প্রভৃতি অনেক মনস্তত্ত্ববিৎই ঐ মত পোষণ করেন। তবে ঘরসংসার ছেলেপুলে দেখতে হবে ব'লে ঘরসংসারের কাজ ক'রেও যদি সময় থাকে, আর সেই সময়টুকুতে কোন চাকরি ক'রে যদি কিছু টাকা রোজগার ক'রে সংসারের সাহায্য করা যায়, তাতে আমি বিশেষ কোন আপত্তির কারণ দেখি না।

প্রঃ—মেয়েদের চাকরির কথা ওঠে প্রধানতঃ তাদের আর্থিক স্বাধীনতার জন্যে। যারা টাকার জন্যে চাকরি ক'রতে যায় না, অর্থাৎ যারা চাকরি করাটাই সুখের বিষয় মনে করে, সে সব মেয়েদের কথা আলাদা। কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই টাকার অভাবে তাদের যে হীনতা স্বীকার ক'রতে হয়, সেই হীনতাটুকু এড়াবার জন্যেই চাকরি ক'রতে যায়। এই সব মেয়েদের জন্যে এক বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। ছেলে মানুষ করা ও ঘরকন্নার কাজ দেখা সমাজের পক্ষে একটা অতি দামী ও অত্যাবশ্যক কাজ। এই কাজ তারা ক'রছে ব'লে গবর্ণমেণ্ট থেকে তাদের সরকারী ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেক কাজই দাম দিয়ে কিনতে হয়। আর যারা সমাজের সবচেয়ে দামী কাজ ক'রছে, তাদের অমনি অমনি খাটিয়ে নেওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দেখি না। বর্ত্তমান বন্দোবস্তের ফল এই হয়েছে যে, ঘরকন্নার কাজ করাটা একটা ঘৃণার ব্যাপার, একটা হেয় জিনিষ, এমন কি দাসত্বের চিহ্ন ব'লে মেয়েমহলে গণ্য হ'তে চলেছে। এই মনোভাবকে তাড়াবার জন্যে, আর বাড়ীর ভেতরেই মেয়েদের উপযুক্ত মর্য্যাদার সঙ্গে

প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গবর্ণমেণ্ট থেকে তাদের তাতার বন্দোবস্ত করা দরকার। এ প্রস্তাবটা বিখ্যাত লেখক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের। প্রস্তাবটা আপনার কেমন মনে হয়?

উঃ—ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলবার আছে। প্রথমতঃ, ঐ বন্দোবস্তের জন্যে অনেক টাকার দরকার—অত টাকা আমাদের দেশে কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, তাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য বাড়বার এবং সাংসারিক শান্তি নষ্ট হবার সম্ভাবনা, কারণ স্ত্রী যদি গবর্ণমেণ্ট থেকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ-সাহায্য পায়, সে স্বামীর বশে নাও থাকতে পারে, স্বামীকে সে সম্মান নাও ক'রতে পারে। তৃতীয়তঃ, স্বামী যদি স্ত্রীর ভার নেয় তা হ'লে ওরকম তাতার বন্দোবস্ত করবার দরকারই দেখি না। আর যদি স্বামী স্ত্রীর ভার নিতে রাজী না হয়, তা হ'লে ত' স্ত্রী আদালতের সাহায্যে স্বামীর কাছ হ'তে গ্রাসাচ্ছাদন আদায় ক'রতে পারে। এই সব কারণে বিবাহিতা নারীর জন্য সরকারী তাতার বন্দোবস্ত করা বাঞ্ছনীয়ও নয়, আর তা কাজে পরিণত করাও, অন্ততঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়,একেবারে অসম্ভব।

প্রঃ—আপনি যে সব কথা ব'ললেন তার মধ্যে অনেকটা সার আছে স্বীকার না ক'রে পারছি না। জগতের শ্রেষ্ঠতম দেশগুলোও যে প্রণালী এখনও গ্রহণ ক'রতে সাহস করে নি, ভারতের মত দরিদ্র দেশের তা কাজে পরিণত ক'রতে যাওয়া আকাশ-কুসুমই মনে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে, নতুনত্বের চেয়ে গতানুগতিকতার প্রতিই আপনার মন বেশী পক্ষপাতী ব'লেই আমার প্রস্তাবটার উপযুক্ত বিচার আপনি ক'রতে পারেন নি। বর্ত্তমানে ভারতের পক্ষে তার আর্থিক দুরবস্থার জন্যে ঐ প্রণালী কাজে লাগানো অসম্ভব, তা অস্বীকার করি না—কিন্তু বর্ত্তমানে একটা জিনিষ অসম্ভব ব'লে, সেই জিনিষটা যদি সত্যিই বাঞ্ছনীয় হয়, তা ভবিষ্যতে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা কেন হবে না, তা বুঝতে পারছি না। আর আমার প্রস্তাব থেকে যে সাংসারিক অশান্তি সৃষ্টি হবার কথা ভাবছেন, আমার মনে হয় আপনার এই ধারণা, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের আধিপত্য আহরি করবার ও স্ত্রীলোকদের আয়ত্ত ক'রে রাখবার যে মনোভাব আমাদের সকলেরই মধ্যে অল্প-বিস্তর আছে, তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আমরা চাই যে, মেয়েরা আমাদের একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে থাকে, সেই জন্যে যদি তাদের আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করবার এতটুকু উপায় কোথাও দেখি ত' সেইটা বন্ধ ক'রে দেওয়া সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্যে বিশেষ আবশ্যক মনে করি। স্বাধীনভাবে অর্থ-লাভের সুবিধা হ'লে, আপনার ভয় হয় যে, মেয়েরা পুরুষকে মানবে না, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ভূমিসাৎ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের হাত-পা বেঁধে রেখে, তার রোজগারের সকল সুবিধা লুপ্ত ক'রে দিয়ে, টাকা রোজগারে ক্ষতির দেখিয়ে, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব আহরি করবার যুগ গত হয়েছে। পুরুষ বা স্ত্রীলোক কেউই কারুর চেয়ে ছোট নয়, দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রধান, এইটাই বর্ত্তমান যুগের বাণী। কিন্তু পুরুষের টাকা রোজগারের ক্ষমতা আছে ব'লে, মেয়েরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারে না। চাকরি ক'রে তারা পুরুষের সমান হ'তে পারে বটে। কিন্তু, আগেই বলেছি, যে সব মেয়ের স্বামি-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘরকন্না ক'রতে হয়, সে সব মেয়ে চাকরি ক'রে কিছু টাকা রোজগার করার চেয়ে যদি সাংসারিক কাজকর্ম্মে মন দেয়, তা হ'লে সেটা প্রত্যেক সংসারের পক্ষে, জাতির পক্ষেও, অধিকতর মঙ্গলজনক হয়। মেয়েরা যাতে গৃহস্থালীর কাজ হেয় বলে মনে না করে, ও টাকার থলি একান্তভাবে পুরুষের করায়ত্ত হওয়ার জন্যে যাতে নিজেদের একেবারে অসহায় মনে না করে, তার জন্যেই সরকার হ'তে তাদের তাতার বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

উঃ—আপনার লম্বা বক্তৃতা ত' শুনলুম, কিন্তু এখনও আপনার মতে সায় দিতে পারছি না। ভবিষ্যতে পারি কিনা তা ভেবে দেখা যাবে। কিন্তু এই সম্বন্ধে একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে।

প্রঃ—কি সেটা ?

উঃ—সেটা হচ্ছে এই যে, আপনার সরকারী ভাতা কাজে পরিণত করা এখন সম্ভবই নয়, কিন্তু স্বামীর রোজগারের শতকরা একটা নির্দিষ্ট অংশ স্ত্রীর সম্পত্তি ব'লে আইন ক'রে স্থির ক'রে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, স্বামীর রোজগারের শতকরা দশটাকা যদি স্ত্রীর ব'লে আইন ক'রে স্থির করে দেওয়া হয়, তা হ'লে যাঁর স্বামী ৫০০৲ টাকা রোজগার করেন, তিনি স্বামীর মাইনের থেকে ৫০৲ টাকা গৃহস্থালী চালাবার পারিশ্রমিকরূপে আদায় ক'রতে পারবেন। এ প্রণালীতে সরকারী খরচা বাড়াবার দরকার নেই। অথচ, একটা আইন পাশ ক'রে, আপনার মতে মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ বাড়াবার জন্য যা দরকার, তা করবার একটা সহজ ব্যবস্থা হ'তে পারে।

প্রঃ—আপনি যে প্রস্তাব করলেন, সেটা আমার প্রস্তাবের চেয়ে ঢের বেশী কার্য্যকর, কারণ মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা বাড়াবার জন্যে আমি যে প্রস্তাব করেছি তা কাজে লাগানো সুদূর ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আপনার প্রস্তাব এখনই কাজে লাগানো যেতে পারে। আমার মনে হয়, এই প্রস্তাবটী কাজে পরিণত করবার জন্যে, অর্থাৎ ঐরূপ আইন পাশ করার জন্যে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। ভারতের শিক্ষিত মহিলারা এবিষয়ে অগ্রসর হবেন না কি ?

উঃ—আপনার এই ইচ্ছা 'অরণ্যে রোদনে' পরিণত হবে ব'লেই আমার আশঙ্কা। কারণ, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে মেয়েদের চাকরি ক'রতে পারা ভারতীয় নারী-মহলে একটা সব-অর্জ্জিত অধিকাররূপে গণ্য হ'তে চলেছে। আপনার প্রস্তাব অবলম্বন ক'রে তারা যে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে চাকরি করার সোজটা সামলাতে চাইবে, তা মনে হয় না। আপনার প্রস্তাবটা তাদের উন্নতির পরিপন্থী ব'লেই তারা মনে ক'রতে পারে। পারিবারিক জীবনে নারীর শ্রমের মূল্য কতখানি তা আজকালকার যুক্তবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা স্বীকার ক'রলেও, এবং আমাদের মেয়েরা ২।১০ বছর পরে ঐ ধারণার ঢেউ ভারতে প্রথমভাবে দেখা দিলে তার সমর্থক হ'তে পারলেও, বর্ত্তমানে শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে চাকরি করার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'তে চাইবে ব'লে মনেই হয় না।

প্রঃ—চাকরি করাটাই যে মেয়েদের পক্ষে খারাপ তা ত' বলছি না। কিংবা, চাকরি করা থেকে তাদের একেবারে বঞ্চিত ক'রতে হবে, তাও মনে করি না। বরং অনেক বিষয়ে মেয়ে-চাকরো না হ'লে আজ-কাল মেয়েদেরই অসুবিধা ও সম্মানের হানি-কর হয়। আধুনিক সমাজে মেয়েদের সম্মানরক্ষার জন্যেই মেয়ে নার্স, মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে পুলিস, মেয়ে শিক্ষক একান্ত আবশ্যক। শুশ্রূষা, অভিরক্ষা, সমাজ-সেবা ও আইন-তৈরী—এসব কাজেও মেয়েদের থাকা বিশেষ দরকার। ছেলেদেরে দেখাশুনা করার জন্যে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র থেকে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ওস্তাদ নিযুক্ত করতে পারে, অথবা ২৪ সংসার মিলে নিজেদের সংগৃহীত টাকা দিয়ে সেরূপ ওস্তাদ নিযুক্ত ক'রতে পারে; কলকত্তার ও বড় বড় হোটেলে সস্তায় খাবার তৈরীর বন্দোবস্ত বাড়ুলে ঘরে ঘরে রান্নাবান্নার কাজ একেবারে উঠে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এই রকমে, গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্ম অনেকটা সঙ্কুচিত হ'য়ে আসবে এবং তাতে মেয়েদের কাজের চাপ অনেকটা লঘু হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয়, ঘর-সংসার চালানোই ভবিষ্যতেও মেয়েদের প্রধান পেশা বলে গণ্য হবে। এবং ঐ পেশাতেই মেয়েরা যাতে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তার জন্যে আমাদের প্রস্তাবিত কোন না কোন পন্থা অবলম্বিত হবে। তাই নয় কি ?

উঃ—এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বাড়াতে চাইনা। তবে, আমাদের বর্ত্তমান মেয়েদের পক্ষে কতদূর যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় তা কেবল মেয়েরাই ব'লতে ও বুঝতে পারেন। যদি দেখি আমাদের প্রস্তাব মেয়েদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, ও তাঁরা এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করবার জন্যে অন্ততঃ একটুও ক্ষেপেছেন, তখনই বুঝবো যে আপনার আমার এই আলোচনা সত্যিই সার্থক হয়েছে।

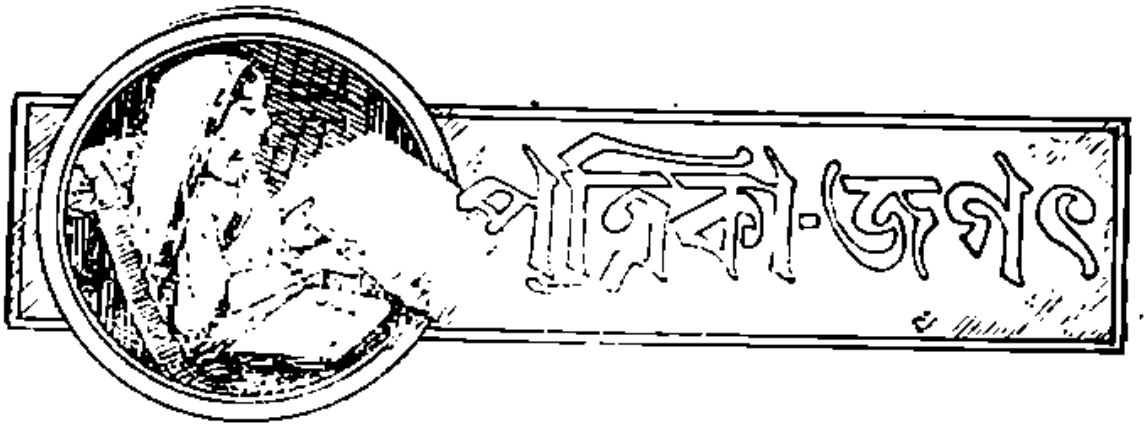

"দি কনটেম্পরারি রিবিউ," মার্চ্চ, ১৯৩১

বিলাতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

উৎপাদন বনাম খাদন

বিলাতের ১৯৩০-৩১ সনের বাজেটের বাহের পরিমাণ ভাল করিয়া জানা যায় নাই।* বর্ত্তমান সনের মাত্র ৯ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এই ৯ মাসের হিসাবে দেখা যায়, (ক) আয়-কর, উর্দ্ধ-কর এবং মৃত্যু-কর হইতে প্রস্তাবিত আয়ের সংস্থান হইবে না; (খ) শুল্ক, আবগারি এবং টিকিট হইতেও আশানুরূপ আদায় হইবে না; (গ) পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তাবিত খরচের চেয়ে অনেক বেশী খরচ হইয়া যাইবে। এই প্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্যের উপর বিলাতের ঘাড়ে আবার নূতন এক দফা অতিরিক্ত ব্যয়-ভার চাপিয়াছে। বেকার বীমার জন্য মূলধনের বহর ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।

১৯১৪ সনের পূর্ব্বে

বিলাতের এই আর্থিক দুরবস্থার কারণ কি? বিলাত, আর শুধু বিলাত কেন—সমুদয় জগৎ, আজ এক নূতন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখে উপনীত হইয়াছে। এই নূতন সমস্যাটির সমাধান কেহই করিতে পারে নাই; সেইজন্য সকলকেই কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে উৎপাদন এবং খাদন চলিত সমান তালে; কখনো কখনো খাদনই উৎপাদনকে ডিঙাইয়া যাইত। বিলাতের লোক-সংখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত ৫ গুণ বাড়িয়াছিল। খাদন-বৃদ্ধির একটা ফল এই হইয়াছিল যে, ১৯১৪ সনের ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঘর ধীরে ধীরে বাড়িতে ছিল, উৎপাদকদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে ঘোরতর প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দুনিয়ার বাজারে বৃটেনের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল ও বিদেশে প্রচুর মাল চালানো সম্ভবপর হইয়াছিল। মানুষের উৎপাদন-শক্তি অনেক বাড়িয়াছিল সত্য, খাদনও পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই।

মহাযুদ্ধের সু ও কু

দুনিয়া পরিবর্ত্তনশীল। ১৯১৪ সনের পর হইতে নূতন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব অত্যাশ্চর্য্যরূপ ধারণ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই নূতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই মহাসমরের ফলে দিনের উপর দুই বিপরীত ক্রিয়া প্রসূত হইয়াছে। প্রথমতঃ, লড়াই বাছা বাছা সমর্থ ব্যক্তিদিগকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দুনিয়ার শিল্পোন্নতির অগ্রগতিতে বাধা দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধই আবার অপ্রত্যাশিতরূপে মানুষের মধ্যে অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক শক্তির উন্মেষ সাধন করিয়া ভবিষ্যতে বিরাট শিল্প-সৌধ গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর জয়লাভের জন্য যে যাত্রা সুরু করিয়াছে, যুদ্ধের জন্য সে তাহাতে বিরত হইতে পারে নাই। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনী শক্তির বলে মানুষ প্রকৃতির উপর তাহার আধিপত্য অব্যাহত রাখিয়াছে; কলকারখানায়

---

*পার্লামেন্টে বাজেট পেশ হইবার পূর্ব্বে লিখিত। আঃ উঃ সম্পাদক।

পুরুষের অভাব নারীর দ্বারা পূরিত হইয়াছে। তাই দেখা গিয়াছে লড়াইয়ের ফলে মানুষ পঙ্গু হইয়া যায় নাই, তার সৃষ্টি-ক্ষমতাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। লড়াইয়ের মধ্য হইতে মানুষ বর্দ্ধিত উৎপাদন-শক্তি লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। লড়াইয়ের মধ্যেই মানুষ তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রমাণ পাইয়াছে, কারণ লড়াই চলিয়াছিল মানুষে মানুষে নয়, প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র-শক্তির সহিত যন্ত্র-শক্তির। তবে লড়াইয়ের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত কেহই মানুষের এই সৃজন-শক্তির বিষয় টের পায় নাই। ক্ষেত্র-বিশেষে মাত্র উৎপাদন বাড়িতে দেখা গিয়াছিল। লড়াইয়ের পর, যুদ্ধব্যাপৃত, সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত মানুষের মধ্যে ভোগের দারুণ স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেইজন্য ১৯২০ সন পর্য্যন্ত জিনিষপত্রের মূল্যের ক্রম-বর্দ্ধনশীল গতি অব্যাহত থাকে। এই সময় পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে পারা যায় নাই।

উদ্ভাবনা ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ

১৯২০ সনের পরের দশ বৎসরের মধ্যে দুনিয়ার শিল্প-উৎপাদন-ক্ষমতা আবার ১৯১৬ সনের স্তরে পৌঁছিয়াছে। জেনেবা হইতে প্রকাশিত উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবরণী হইতে জানিতে পারি,* ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯৩১ সনে দুনিয়ার কাঁচা মাল বাড়িয়াছে দেড় গুণ। কাঁচামাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কলকারখানার উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়িয়া গিয়াছে অসম্ভবরূপে,—মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে দ্বিগুণ কি তিন গুণ বেশী। নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হওয়ায় অবস্থা আরো ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রেষ্টন সহরের দুইজন লোক নাকি এক প্রকার অত্যদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট নূতন কাপড়ের কল উদ্ভাবন করিয়াছে। এই নূতন কলের বিশেষত্ব এই যে, ইহার জন্য নিপুণ কারিগরের আবশ্যক হইবে না, মাত্র মেয়ে মজুরের দ্বারা ইহার কাজ সুষ্ঠুরূপে চলিবে। এই ব্যাপার একপক্ষে বিশেষ ভাল হইলেও অন্যপক্ষে বিশেষ খারাপ ফল প্রসব করিবে। এইরূপ নয়া নয়া কলকব্জা কায়েম করার ফলে বেকার লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে কৃষি এবং শিল্পে যদি এইরূপ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি কায়েম করা না হইত, তাহা হইলে দুনিয়ার বেকার সংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পাইত না। উত্তর আমেরিকার কৃষি-ক্ষেত্রে "ট্রাক্টর," "কম্বাইন" এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কায়েম করার ফলে সেখানকার মোট কৃষি মজুরের প্রায় সিকি সংখ্যাকে বেকার হইতে হইয়াছে। এই নূতন মহাদেশে শিল্পক্ষেত্রেও নূতন নূতন যন্ত্রপাতি কায়েম করার ফলে প্রত্যেক মজুরের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে কমসে কম ৪০%।

উৎপাদন-বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ আত্মপ্রসার

দুনিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ, লড়াইয়ের পরে দুনিয়ার সর্ব্বত্র দেশাত্মবোধের নূতন অবতারণা। সমস্ত দেশই আজ কৃষি, শিল্প, সমস্ত বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে চায়। এই জন্য দেশে দেশে নূতন নূতন কলকারখানা বসাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

তৃতীয় কারণ সিক্কা স্থিতীকরণ

শিল্প-বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ, দুনিয়া জুড়িয়া সিক্কা স্থিতীকরণের প্রয়াস। জগতের অধিকাংশ রাষ্ট্র বাস্তবিক মুদ্রা সরবরাহ না করিয়া মুদ্রা সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার-পত্র বাজারে ছাড়িয়া দেয়। ফলে মাল-উৎপাদনকারীরা মালের মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া যায়। কারণ গবর্ণমেণ্ট যে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, লড়াইয়ের পর, ইয়োরোপের আট আটটা দেয়া রাষ্ট্রের সিক্কা ব্যবস্থার 'মৃত্যু' ঘটে, আর পাঁচটার নিকায় অসম্ভব জোয়ার-ভাঁটা দেখা দেয়। এই দারুণ দুর্য্যোগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রই স্বর্ণ বা স্বর্ণ বিনিময় মান অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল[১]। এই প্রয়াস সফলই

* গত মাসের আর্থিক উন্নতিতে এই বিবরণীর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। আঃ উঃ সম্পাদক।

১ এবিষয়ে বৈশাখ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত সমালোচনা দ্রষ্টব্য। আঃ উঃ সম্পাদক।

প্রসব করিয়াছে। কারণ নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি করিলেও এই নয়া শিল্পব্যবস্থা মাল-উৎপাদনের সহায়তা করিয়াছে, মাল-উৎপাদনের পথে বাধা জন্মায় নাই।

সুখ ও দুঃখের জন্মদাতা

যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের এই অভাবনীয় উৎপাদন-ক্ষমতা, সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাতে মঙ্গলই ঘটিবার কথা। লড়াইয়ের মধ্যে যে অভাব দৈত্য মানবজাতির টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিল, এই প্রাচুর্য্যই তাহা হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচুর্য্যই আবার মানুষের পরম দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ এই প্রাচুর্য্যের জন্য খুসী হইবার কথা; কারণ মূল্য-হ্রাসেই প্রাচুর্য্যের কষ্টিপাথর। কিন্তু মূল্য-হ্রাসের স্থানে একেবারে দারুণ ভাঁটা দেখা গিয়াছে। আর্থিক প্রাচুর্য্যের মধ্যে আর্থিক দুঃখ, একটি বিরাট প্রহেলিকার সৃজন করিয়াছে।

প্রাচুর্য্যে অভাব— প্রথম কারণ

তিনটি কারণে এই অভাবনীয় প্রাচুর্য্যের মধ্যেও দুনিয়া দারুণ দুঃখে পড়িয়াছে। এই কারণত্রয়ের মধ্যে প্রথম নম্বরের কারণটী এই যে, অর্দ্ধজগৎ যখন লড়াইয়ের ফলে পর্য্যুদস্ত, তখনই এই আশ্চর্য্য উৎপাদনক্ষমতা আরম্ভ হয়। সুতরাং দুনিয়ার পক্ষে যেরূপ ক্রয় করিবার কথা সেরূপ ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ রুশিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। রুশিয়া প্রকাণ্ড দেশ; কিন্তু রুশিয়ার বাজার দুনিয়ার পক্ষে শূন্য। শুধু রুশিয়া কেন? বিরাট চীনও অরাজকতার আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে। সুতরাং দুনিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িলে বা কি হইবে? দুনিয়ার সেরা সমৃদ্ধিশালী দেশ আমেরিকা সম্বন্ধেও সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে—আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানবের আর্ত্তনাদ। এই আমেরিকা সম্বন্ধেই কয়েক মাস আগে একজন পাশ্চাত্য লোক বই লিখিয়াছে,—"আমেরিকা কঙ্কাল ব্রিটেন" (আমেরিকার ইংল্যাণ্ড বিজয়)।

অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা

পণ্যদ্রব্যের খাদন-হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ—দুনিয়া-ব্যাপী অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতার বেড়াজাল। এই অর্থনৈতিক স্বদেশপ্রেম যেমন একদিকে দেশের পক্ষে উৎপাদন-বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি অন্যপক্ষে শুল্ক-প্রাচীর উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া বিদেশী মালপত্রের উপর "প্রবেশ নিষেধ" আজ্ঞা জারি করিয়াছে। দুনিয়ার দেশগুলা যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। তারা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি-মূল্য উৎপাদনের খরচের চেয়েও কম ধার্য্য করিয়া দুনিয়ার বাজার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চায়, অথচ অন্যদিকে শুল্ক-প্রাচীরের পর প্রাচীর উত্তোলন করিয়া আপন এলাকার মধ্যে বিদেশী পণ্য আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দেখা গেলেও প্রকৃত-পক্ষে খাদনের গলা টিপিয়া ধরা হইতেছে।

দালালদের কীর্ত্তি

খাদন-হ্রাসের তৃতীয় কারণও একটী আছে। লড়াইয়ের গোলযোগের সময় দুনিয়া জুড়িয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর মানব সম্প্রদায় লাভের অংশ শোষণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহারা দালালশ্রেণীর মানুষ। কাঁচামাল ক্রয় এই মধ্যবর্ত্তী জীবদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। ইহারা অসম্ভবরূপ সস্তায় মাল কিনিয়া কলওয়ালাদের নিকট চড়া দরে বিক্রয় করে। কলওয়ালাদের সেইজন্য উৎপাদনের খরচাই অনেক সময় পোষায় না, অথচ সস্তায় কাঁচামাল বেচিয়া সাধারণ লোকে অতি আক্রা মূল্যে শিল্পদ্রব্য কিনিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে উৎপাদনের বহর বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু খাদন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, বা উৎপাদনের সহিত তাল রাখিয়া চলিতেছে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে, ছয়টী বড় বড় কারণের (তিনটী উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং তিনটী খাদন-ব্যাপারে) সমবায়ে দুনিয়ায় বর্ত্তমান ভীষণ আর্থিক দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে। অর্থশাস্ত্রিগণ শুধু সস্তার মহার্ঘতাকেই ভুগিতেছেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

বিলাতের অসুবিধার কারণত্রয়

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ত্তমান দুর্যোগে বিলাতের অদৃষ্টে কি ঘটিবে? বিলাত সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। বিলাত কাঁচামাল এবং আহার্য্য দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার; সুতরাং এই সমস্ত চিজ সস্তা হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত বিলাতের সুবিধা হইবারই কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনটী কারণে বিলাতের অসুবিধা ঘটিতেছে। প্রথমতঃ একে ত জিনিষ বিক্রয়ের ব্যাপারে গোটা দুনিয়া বিলাতের সঙ্গে টক্কর দিতেছে এবং বিলাতী জিনিষ গ্রহণ না করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তার উপর উত্তর ইংলাণ্ডের রপ্তানিযোগ্য শিল্প-গুলি সেকেলে হইয়া গিয়াছে। উত্তর ইংলাণ্ড লোহা-লক্কড়ের কারখানায় ভরপুর। কিন্তু এই অঞ্চলের কল-কারখানায় যন্ত্রপাতি সমস্তই সেকেলে ধরণের। এই সেকেলে ধরণের হাল-হাতিয়ার এক বিলাত ছাড়া কোন দেশই বরদাস্ত করিবার পক্ষপাতী নয়। আর এই ধরণের যন্ত্রপাতি লইয়া দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলির সহিত বিলাতের পক্ষে টক্কর দেওয়ার কল্পনা করাও অসম্ভব।

বিলাতের লৌহ-শিল্পের যে দশা, তুলা-শিল্পেরও সেই অবস্থা। আজ ১৯৩১ সনেও ল্যাঙ্কাশিয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ চালাইতেছে। অন্য দিকে কলকারখানা-পরিচালনার ব্যবস্থাও সেই মান্ধাতার আমলের মতই রহিয়াছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে তুলা-শিল্পের যন্ত্রপাতি পরিচালনার ব্যবস্থা সমস্তই আধুনিক কালোপযোগী। একা বিলাতই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত তুলাজাত জিনিষপত্র বাজারে বেচা সম্বন্ধেও বিলাত সেই পুরাতন কায়দার অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। সুতরাং বিলাতকে যদি তুলাশিল্পে দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে কলকারখানার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, কারখানা পরিচালনা, মাল বাজারে বেচা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই একেলে হইতে হইবে।

মালিক বনাম মজুর

বিলাতের পক্ষে আর একটী অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে মজুরদের মজুরি লইয়া। লড়াইয়ের পর হইতে এই মজুরির ব্যবস্থা লইয়া বিলাত মহা হাঙ্গামায় পড়িয়া গিয়াছে। এই মজুরির হার লইয়া মালিক আর মজুরের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ বিলাতের পক্ষে নূতন নহে। লড়াইয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই হাঙ্গামা-হুজ্জৎ চলিয়া আসিতেছে। তবে লড়াইয়ের পূর্ব্বে বিলাত এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছিল। মজুরদের মজুরির হার এমনভাবে বাধা হইতেছিল, যাহাতে শ্রমিক-জগতে ধর্ম্মঘট ইত্যাদি দুর্যোগ না আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন যখন তখন আরম্ভ হয় না; উহার গতি ধারাবাহিকভাবে ও ক্রমান্বয়ে সাধিত হয়; তাই বিলাত তাল সামলাইয়া লইতে পারিতেছিল। কিন্তু লড়াই আসিয়া সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিয়াছে।

গুণ হইয়া হইল দোষ

বিলাতের দুর্দ্দশার অর্থ এই যে, বিলাতের রপ্তানি-বাণিজ্য বিষম বাধা পাইতেছে। ১৮৯৯ সনে মালপত্রের দাম চড়িতে সুরু হয়; লড়াই বাধার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র আরো দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হারও বাড়িয়া যায়। লড়াইয়ের মধ্যে রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়, কারণ দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য ও যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার জন্য নূতন নূতন কলকারখানা কায়েম করিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার মাল তৈরীর কারখানাসমূহ হইতে অনেক মজুর শেষোক্ত শ্রেণীর কল-কারখানায় আসিতে বাধ্য হয়। লড়াইয়ের পর আবার নূতন অবস্থার আবির্ভাব হয়। লড়াইয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিলাত গাদায় গাদায় মাল উৎপাদন অপেক্ষা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মাল উৎপাদনেই বেশী মনোনিবেশ করিয়া আসিয়াছে; এবং বিলাতের ইহাই বিশেষত্ব। কিন্তু লড়াইয়ের পর গোটা দুনিয়ার গাদায় গাদায় মাল উৎপাদনের দিকেই ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বিলাতের সূক্ষ্ম কারিগরদের ভাত মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিতে ঐরূপ নিপুণ কারিগরের প্রয়োজনও বড় একটা নাই। নারী মজুর এবং আনাড়ি পুরুষ মজুর যাহাই এই

সমস্ত যন্ত্রপাতির কাজ অল্পেপে চলিয়া যাইতেছে। লড়াইয়ের আগে পর্য্যন্ত বিলাতের ধারণা ছিল যে, সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের উন্নত ধরণের মালপত্রের খরিদ্দার নিশ্চয়ই বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু বিলাতের এই সোনার স্বপন আজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

দরের স্থিরতা চাই

লড়াইয়ের পর ১৯২০ সন পর্য্যন্ত জিনিষপত্রের দাম চড়িতে থাকিলেও ঠিক এই সনের পর হইতেই প্রচণ্ড বেগে জিনিষপত্রের মূল্য-হ্রাসের পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং জিনিষপত্রের দরদস্তুর সম্বন্ধে যখন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই, তখন মজুরির স্থায়ী হার বাঁধিয়া দেওয়া যায় কি উপায়ে? এই জীবণ বাধাবিঘ্নের মুখেই বিলাতকে তাহার রপ্তানি-যোগ্য শিল্পবস্তুগুলির উৎপাদনে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের জাতীয় জীবনে এইরূপে যে ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, মালপত্রের দরের স্থিরতা না ঘটা পর্য্যন্ত তাহার সমাধানের কোন আশা নাই। অন্ততঃ বিলাতের পক্ষে লড়াইয়ের পূর্ব্বের দর চাই-ই চাই।

সরকারী রাজস্বনীতি

বিলাতের পুনরভ্যুদয়ের পথে শেষ বাধা হইতেছে বিলাতের রাজস্বনীতি। ১৯২০ সনের পর জিনিষপত্রের মূল্য কমার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের জাতীয় ঋণের ভার ক্রমেই দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। "জাতি সঙ্ঘের" প্রতি কপটী প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত দেশই দারুণ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। বিলাতও এই সমবেদনা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, সুতরাং বিলাতের জাতীয় সমস্যা এই শেষোক্ত কারণে আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। মোট কথা, এক জার্ম্মানি ছাড়া, দুনিয়ার সমস্ত শক্তিই যুদ্ধের জন্য যোগাড়যন্ত্র করিতেছে প্রাণপণে। লীগের জন্মদাতা মার্কিণই যুদ্ধসজ্জা করিতেছে সবচেয়ে বেশী—মার্কিণের সমর সজ্জা দুনিয়ার যে কোন শক্তির চেয়ে বেশী। বিলাতের রপ্তানি বাণিজ্য যাহাতে হওয়ায় বিলাতী কলকারখানা আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট ইত্যাদি বসাইতে পারিতেছে না। এর জন্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কাহিল; বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে। আবার এই বেকারদলের সংস্থানের জন্য করদাতাগণের স্কন্ধে অতিরিক্ত কর-ভার চাপানো হইয়াছে।

প্রতিকারের পথ

অবস্থা তো এই দাঁড়াইয়াছে। এখন উপায় কি? সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি মহাভারত রচনা করা দরকার। সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিতে হইলে, দুইটী প্রধান পন্থার আভাস দেওয়ার প্রয়োজন। শিল্প-ব্যবসায় কমিটির মতে রপ্তানি-বাণিজ্যের উপরেই বিলাতের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। এই কমিটির মতে দুনিয়ার প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে টিঁকিতে হইলে বিলাতকে বড় বড় শিল্পগুলি চালিয়া সাজিতে হইবে। সুতরাং বিলাতের রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়-ধুরন্ধরদিগকে এই প্রাথমিক কর্ত্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতিক্ষেত্রেও সকলকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রকার শিল্পের বেলায় আন্তর্জ্জাতিক জোট বাঁধিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এক একটী দেশ যদি আপন আপন খেয়াল খুসি অনুসারে কারখানা চালাইয়া যায়, তাহা হইলে দুর্দ্দশার শেষ হইবে না। সকলের মিলিত হওয়ার উপরই সমস্ত আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। ইহা আজগুবি চিন্ত বা আকাশকুসুম নহে। দুনিয়ার বস্তুতান্ত্রিক মানুষের দল ইতিমধ্যেই একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক কায়েম করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইবে তখনই, যখন দুনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে। দুনিয়ার ইতিহাসে তখন ইহা একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিণত হইবে। আশা করা যায়, বিলাতই এই কার্য্যে অগ্রণী হইবে। তখন বিলাতের অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা, কার্য্যকলাপ, সকলের উপর প্রাধান্যলাভের চেষ্টা না করিয়া সকলের সহিত সহযোগিতার দিকেই ফিরিবে। বিলাতের নিজের এবং অন্যান্য দেশের মঙ্গলের জন্য তখন বিলাতের প্রধান ধান্ধা হইবে দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়াস।

১। "মেমরেণ্ডাম্ অন্ ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেড্ আণ্ড ব্যালান্স অব্ পেমেণ্টস্" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জের) ১৯২৭-২৯। ভল্যুম ১। রিভিউ অব্ দি হ্যাবিট ট্রেড্ (প্রথম ভাগ। দুনিয়ার বাণিজ্য আলোচনা)। জেনেভা, ১৯৩০। ১১৯ পৃঃ। মূল্য ৪শি বা ১ ডলার।

২। ঐ ১৯২৬-২৮। ভল্যুম ২। ব্যালান্স অব্ পেমেণ্টস্ (দ্বিতীয় ভাগ। দেশ-বিদেশের বাণিজ্যিক জের)। জেনেভা, ১৯৩০। ২০৪ পৃঃ। ৬শি বা ১·৫০ ডলার।

৩। ঐ ১৯২৬-২৮। ভল্যুম ৩। ট্রেড্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স অব্ সিক্সটি-ফোর কাণ্ট্রিস্ (তৃতীয় ভাগ)। ষাটটি দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় সংখ্যা-তথ্য। জেনেভা, ১৯৩০। ৩২০ পৃঃ। ১০ শি বা ২,৫০ ডলার।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচন

জাতি সঙ্ঘের তাঁবে প্রকাশিত এই তিনটি কেতাবের নামেই মালুম হইবে যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য লইয়া তচ্‌নচ্ ভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করাই উদ্দেশ্য। প্রথম ভাগে গোটা দুনিয়ার মোট বাণিজ্যের বহর কি ছিল তাহা চাখিয়া দেখা হইয়াছে। বাণিজ্য বলিতে বুঝিতে হইবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যা লেন দেন হয়। এ বস্তু পণ্য হইতে পারে, সোনারূপার মুদ্রা হইতে পারে, ভাল ভাল সোনা হইতে পারে। পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল সভ্য দেশই ঠিক হিসাব রাখিয়া থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের আমদানি রপ্তানির অঙ্ক ও তালিকা সহজেই পাওয়া যায়। সোনারূপার হিসাব কোন দেশ ভিন্ন করিয়া রাখে, কোন দেশ রাখে না। বলা বাহুল্য, পণ্যের চলাচলটাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণবস্তু।

প্রত্যেক দেশ অন্য বহু দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত না থাকায় এবং কোন কোন দেশে শুল্ক প্রাচীরের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হইয়াছে কি না, হইলে কতখানিই বা ব্যাহত হইয়াছে, তা লইয়া সুবেষণা করার এ স্থান নয়। কিন্তু মোটামুটি বলা চলে, কোন প্রকার কৃত্রিম বাধা-বিপত্তিই দেশে দেশে পরস্পর পণ্যের লেনদেন একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে না। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পণ্য আমদানি রপ্তানির শক্তি বা প্রয়োজন সকল দেশের সমান নয়। কোন দেশ আবার আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী করে, অন্য কোন দেশ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী করে। বিভিন্ন দেশ শিল্পে, কৃষিতে, ব্যবসায়ে দুনিয়ার বাজারে বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া আছে, সকলের উন্নতি সমান হয় নাই। তারপর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ, ভৌগোলিক সংস্থান, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বা তদভাব ইত্যাদি বহুবিধ কারণও আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, গতি ও প্রসার স্থির করিয়া দেয়। বস্তুতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারটা অত পাঁচটা ব্যাপার-নিরপেক্ষ সমস্যা নয়।

এক দেশের সহিত অন্য দেশের বিনিময় হয় মালের। অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা টাকাপয়সার সাহায্যে ক্রয়বিক্রয় নয়, মাল দ্বারা মাল ক্রয় বা বিক্রয়। বিভিন্ন মালের বিভিন্ন প্রকার ওজন আছে, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রার ভাষায় ঐ দেশের মালের পরিমাণও হইয়া

থাকে। আবার এক দেশের মুদ্রার সহিত অন্য দেশের মুদ্রার সম্পর্কটাও সর্ব্বদাই স্থিরীকৃত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের পরস্পর পণ্য আদান-প্রদানে কোন গোলযোগ ঘটিতেছে না। কিন্তু আমদানি রপ্তানির পরিণাম ফল প্রত্যেক দেশের পক্ষে একরূপ হইতেছে না। যে দেশের মোট আমদানির চেয়ে মোট রপ্তানি বেশী সে দেশ অন্যান্য দেশের নিকট হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ বেশী অংশটুকুর মূল্য অর্থাৎ মূল্যস্বরূপ সোনা পাইবার আশা রাখে। এইরূপ দেশের বাণিজ্যকে বলে অনুকূল বাণিজ্য,—অন্যান্য দেশ হইতে এরূপ দেশে সোনা আসে। আর যে দেশের আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে বেশী, তার অবস্থা উল্টা। সে দেশকে অন্যান্য দেশে সোনা পাঠাইতে হয়। সোজা ভাষায়, মালে মালে ক্রয় বিক্রয়ে কাটাকাটি যায়। তারপর যে দেশের পক্ষে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে সেই দেশই অন্যান্য দেশ হইতে সোনা পায়। আন্তর্জ্জাতিক ঘোরালো আবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও এইখানে বলা উচিত যে, শুধু অনুকূল বা প্রতিকূল বাণিজ্য হইতে কোন দেশের সমৃদ্ধি বা তদভাব বিচার করিলে অন্যায় হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলে তবেই তার বিভিন্ন ফলাফল সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। সে জ্ঞানলাভের পক্ষে এ তিনটি কেতাব যথেষ্ট সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তার আগে এই তিনের মধ্যে যে মসলা আছে তা যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে পারা চাই। এখানে শুধু দু একটি দফায় কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা হইবে।

প্রথম ভাগের প্রথম ৭৮ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৩টি অতি প্রয়োজনীয় তালিকা স্থান পাইয়াছে, আর শেষকালে ৪টি দীর্ঘ তালিকা আছে। প্রথম ১৩টি তালিকার সাহায্যে দুনিয়ার বাণিজ্যের হালচাল নিম্নলিখিত দফায় বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে :—(১) দুনিয়ার বিভিন্ন মহাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ, (২) দুনিয়ার মোট বাণিজ্যের শতকরা কত অংশ কোন্ মহাদেশে, (৩) ১৯২৭ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে বিভিন্ন মহাদেশের বাণিজ্য কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, (৪) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আমদানি রপ্তানির মূল্য, (৫) ১৯২৭ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আমদানি রপ্তানির কিরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে, (৬) বিভিন্ন দেশে মাথা পিছু বাণিজ্যের পরিমাণ, (৭) কতকগুলি দেশের রপ্তানিকে আমদানির শতকরা অংশরূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, (৮) ১৯১৩ সনের ক্রয়ক্ষমতা সমঝৌতা অনুসারে পণ্যাদিকে নিম্নরূপ ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়।—(ক) জীবিত পশু, (খ) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য, (গ) কাঁচা ও আংশিক শিল্প দ্রব্য, (ঘ) শিল্প দ্রব্য, (ঙ) সোনা ও রূপা। বিভিন্ন দেশের আমদানি রপ্তানিতে এই সব দ্রব্য কোন্‌টা শতকরা কত অংশ, (৯) ১৯১৩ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২০ হইতে ১৯২৮ সন অবধি আমদানি রপ্তানির দামে কিরূপ উত্থান পতন হইয়াছে, (১০) ১৯১৩ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২০ হইতে ১৯২৮ সন অবধি আমদানি রপ্তানির পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়াছে, (১১) প্রত্যেক বৎসরে পরিমাণ, দর ও দামের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, (১২) যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ১০টি দেশ হইতে বিভিন্ন মহাদেশে আগত আমদানি মোট আমদানির শতকরা কত অংশ, (১৩) যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ১০টি দেশে বিভিন্ন মহাদেশ হইতে আগত রপ্তানি মোট রপ্তানির শতকরা কত অংশ, (১৪) কোন্ মহাদেশে কোন্ দেশ শতকরা কত রপ্তানি পাঠায়, (১৫) কোন্ মহাদেশ হইতে কোন্ দেশ শতকরা কত আমদানি গ্রহণ করে, (১৬) আমদানি রপ্তানির এক বছরের গতি।

দুনিয়ার বাণিজ্যের বহর

গোটা দুনিয়ায় আমদানি বাণিজ্য কত কোটি টাকার হয়? রপ্তানি বা কত কোটি টাকার? আর প্রতি বৎসর বাণিজ্য বাড়িতেছে না কমিতেছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর নীচের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

(কোটি ডলারে)

সন	আমদানি	রপ্তানি	মোট
১৯২৭	৩৩৭৬.৪	৩১৩৭.৮	৬৫১৪.২
১৯২৮	৩৪৬০.৯	৩২৪৯.৯	৬৭১০.৮
১৯২৯	৩৫০৪.৩	৩২৭৪.২	৬৮০৮.৫

এক ডলারকে দুই টাকা বার আনার শামিল ধরিলে ১৯২৯ সনে আমদানির পরিমাণ ৯৭১২.৩২ কোটি টাকা,

রপ্তানির পরিমাণ ১০০৪ কোটি টাকা ও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮৭২৩.৩২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। দুনিয়ার লোক-সংখ্যা মোটামুটি ২০০ কোটি ধরিলে প্রত্যেক লোকের কপালে প্রায় ৯৪৲ টাকা করিয়া মোট বাণিজ্য দাঁড়ায়, অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তি প্রায় ৪৯৲ টাকার জিনিষ কিনে ও ৪৫৲ টাকার জিনিষ বেচে। বলা বাহুল্য, ইহা তামাম্ দুনিয়ার গড়। দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জাতি তথা ব্যক্তি অতিশয় দরিদ্র। সেই দারিদ্র্যের তুলনায় ধনী দেশসমূহের ঐশ্বর্য্যের ছবি আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এই গড়ের সাহায্যে।

দ্রষ্টব্য যে, ১৯২৮ সনের তুলনায় ১৯২৯ সনে দুনিয়ার মোট বাণিজ্য বাড়িয়াছে ১·৪%, আমদানি ২% আর রপ্তানি মাত্র ৪%।

বিভিন্ন মহাদেশের খতিয়ান

নীচের তালিকা দুইটি হইতে দুনিয়ার পণ্য আমদানি রপ্তানির বাজারে বিভিন্ন মহাদেশের কিস্মৎ বুঝা যাইবে।

কোটি ডলারে দাম

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
১। ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	১৮৫৯·২	১৮৯৭·৬	১৯২৪·৮	১৪৪১·০	১৪৮৭·৮	১৫০৬·৭	৩২৯০·২	৩৩৮৫·৪	৩৪১১·৫
২। ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ	১৮৮৮·৯	১৯৪৬·৩	১৯৬৭·৮	১৪৮২·৫	১৫২৮·৩	১৫৮২·৫	৩৪৭১·৪	৩৪৭৪·৬	৩৫৫০·৩
৩। উত্তর আমেরিকা	৫৩০·৫	৫৩৭·১	৫৬১·৫	৬০১·৫	৬৪৭·৩	৬৫২·৩	১১৩৬·০	১১৮৫·২	১১৯৩·৮
৪। ল্যাটিন আমেরিকা	২৪৪·০	২৪৯·৮	২৫৮·৩	২৯৯·৫	৩১২·৯	৩০৪·৩	৫৪৩·২	৫৬২·৭	৫৬২·৬
৫। আফ্রিকা	১৪৮·৩	১৫৯·০	১৬৮·৫	১৪১·২	১৫৩·৪	১৫২·৪	২৮৯·৫	৩১২·৪	৩২০·৯
৬। এশিয়া, রুশিয়া বাদে	৪৬১·৩	৪৭৬·৪	৪৮৪·১	৫১৫·৩	৫০৯·৮	৫০৪·২	৯৭৫·২	৯৮৬·২	৯৮৮·৩
৭। ওশেনিয়া	১০২·৮	১৪·৫	৯৪·১	৯৫·৮	৯৮·২	৯৮·৫	১৯৮·৬	১৯২·৭	১৯২·৬
মোট (২ হইতে ৭ অবধি)	৩৩১৬·৪	৩৪৬০·৯	৩৫৩৪·৩	৩১৩৭·৮	৩৫৪৯·৯	৩২৭৪·২	৬২১৪·২	৬৭১০·৮	৬৮০৮·৫

শতকরা অংশ (ডলারে)

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
১। ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে	৫৪·৯	৫৪·৯	৫৪·৫	৪৫·৯	৪৫·৮	৪৬·৯	৫০·৬	৫০·৪	৪০·৮
২। ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ	৫৫·৯	৫৬·২	৫৫·৭	৪৭·২	৪৭·০	৪৮·৩	৫১·৮	৫১·৭	৫২·২
৩। উত্তর আমেরিকা	১৫·৭	১৫·৫	১৫·৯	১৯·৩	১৯·৯	১৯·৩	১৭·৪	১৭·৭	১৭·৫
৪। ল্যাটিন আমেরিকা	৭·২	৭·২	৭·৩	৯·৫	৯·৭	৯·৩	৮·৩	৮·৪	৮·৩
৫। আফ্রিকা	৪·৪	৪·৬	৪·৮	৪·৫	৪·৭	৪·৭	৪·৪	৪.৬	৪·৭
৬। এশিয়া, রুশিয়া বাদে	১৩·৭	১৩·৮	১৩·৭	১৬·৪	১৫·৭	১৫·৪	১৫·০	১৪·৭	১৪·৫
৭। ওশেনিয়া	৩·১	২·৭	২·৬	৩·১	৩·০	৩·০	৩·১	২·৯	২·৮

মোট (২ হইতে ৭ অবধি)

গোটা দুনিয়ার মোট বাণিজ্যের তুলনামূলক সমালোচনা গত মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে দ্রষ্টব্য। এখানে শুধু ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের শোধিত অঙ্ক প্রকাশিত হইল।

গত মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে ১৯২৯ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে বিভিন্ন মহাদেশের বাণিজ্য-হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। নীচের তালিকায় ১৯২৭ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থা দেখানো যাইতেছে।

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
১। ইয়োরোপ, রুশিয়া বাদে		১০২	১০৪	১০০	১০৩	১০৭		১০৩	১০৫
২। ইয়োরোপ, রুশিয়া সুদ্ধ		১০৩	১০৪	১০০	১০৩	১০৭		১০৩	১০৫
৩। উত্তর আমেরিকা		১০১	১০৬	১০০	১০৭	১০৪		১০৪	১০৫
৪। ল্যাটিন আমেরিকা		১০২	১০৬	১০০	১০৪	১০২		১০৪	১০৪
৫। আফ্রিকা		১০৭	১১৪	১০০	১০৯	১০৮		১০৮	১১১
৬। এশিয়া, রুশিয়া বাদে		১০৩	১০৫	১০০	৯৯	৯৮		১০১	১০১
৭। ওশেনিয়া		৯২	৯২		১০৩	১০৩		৯৭	৯৭
মোট (২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত)		১০৩	১০৫	১০০	১০৩·৫	১০৪	১০০	১০৩	১০৪·৫
দরের সূচীসংখ্যা		৯৯	৯৭	১০০		৯৭	১০০	৯৯·৫	৯৭

১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে যত বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, ১৯২৯ সনে তার চেয়েও কম হইয়াছে। এশিয়ার রপ্তানি এবং ওশেনিয়ার অতোহধিক আমদানি কমিয়া গিয়াছে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি লাভ করিয়াছে ইয়োরোপ। আফ্রিকার আমদানি ও মোট বাণিজ্য সকল মহাদেশের উপর টেক্কা দিলেও রপ্তানি বাণিজ্য ১৯২৯ সনে কাৎ হইয়াছে। মোটামুটি বলা চলে দুনিয়ায় বাণিজ্যিক দুর্দিনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপের মাথা খাড়া রাখিবার চেষ্টা প্রণিধানযোগ্য।

এই সম্পর্কে দুনিয়ার তিনটি সাম্রাজ্য—বৃটিশ, ফরাসী ও নেদারল্যাণ্ড—দুনিয়ার বাণিজ্যে কিরূপ ভাগ বসাইয়াছে ও উন্নতি-অবনতি লাভ করিয়াছে তার একটু খোঁজ লইব।

বৃটিশ সাম্রাজ্য (কোটি ডলার)

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
মোট বৃটিশ সাম্রাজ্য	১০২২·৮	১১১৩·২	১০৪৬·৪	৮৭৮·০	৮৯৫·৪	৮৭৭·৫	১৯০০·৮	১৯০৮·৬	১৯২৩·৯
মোট, যুক্তরাজ্য বাদে	৪৮৯·৭	৪৮৯·৯	৫০৫·০	৫৩১·৯	৫৪৩·০	৫২২·৫	১০২২·৬	১০৩৩·২	১০২৭·৮
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
১৯২৭ = ১০০									
মোট বৃটিশ সাম্রাজ্য									
মোট, যুক্তরাজ্য বাদ									
বৃটিশ সাম্রাজ্য, দুনিয়ার মোট বাণিজ্যের শতকরা অংশ									

ফরাসী সাম্রাজ্য (কোটি ডলার)

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
মোট	২৭০·৮	২৭৬·৫	৩০২·৬	২৬৫·৫	২৫৬·৬	২৫১·১	৫৩৬·৩	৫৩৩·১	৫৫৩·৭
মোট, ফ্রান্স বাদ	৬৩·১	৬৭·০	৭৪·১	৪৯·১	৪৪·২	৪৪·৮	১১২·২	১১১·২	১২৮·৯
	%			%	%	%	%	%	

নেদারল্যাণ্ড সাম্রাজ্য (কোটি ডলার)

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
মোট	১৪০·৩	১৪৯·৭	১৫৭·৭	১৪৩·৭	১৪৪·৫	১৪০·৬	২৮৪·০	২৯৪·২	২৯৮·৩
মোট, নেদারল্যাণ্ড বাদ	৩৭·৮	৪১·৮	৪৭·১	৬৭·৩	৬৪·৭	৬০·৮	১০৫·১	১০৬·৫	১০৭·৭
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
১৯২৭ = ১০০									
মোট	১০০	১০৬·৭	১১২·৪	১০০	১০০·৬	৯৭·৮	১০০	১০৩·৬	১০৫·০
মোট, নেদারল্যাণ্ড বাদ	১০০	১১০·৬	১২৪·৬	১০০	৯৬·১	৯০·০	১০০	১০১·৩	১০২·৫

মোট, দুনিয়ার মোট
বাণিজ্যের শতকরা হিসা

উপরের হিসাবগুলি সমস্তই পণ্যের।

শেষের তিনটি তালিকা হইতে সাম্রাজ্য হিসাবে ইংরেজের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গোটা দুনিয়ার মোট বাণিজ্যের ২৮।২৯% ইংরেজের, ৮% ফরাসীর, আর ৪½% নেদারল্যাণ্ডের। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে, সম্রাট দেশের (যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড) বাণিজ্যের পরিমাণ সাম্রাজ্যস্থ ভূভাগের বাণিজ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশী। কিন্তু ইংলণ্ডে সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য খোদ ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের কাছাকাছি, অন্য দুই দেশে অনেক কারাক্। অর্থাৎ বাণিজ্য-সম্পদে ইংরেজের উপনিবেশসমূহ ধনী বটে। উপরের তিনটি তালিকা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে।

দশটি অগ্রসর দেশ

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিম্নলিখিত দশটি

দেশ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বলা বাহুল্য স্থানটা শুধু পণ্যের মূল্য,—ডলারে করিয়া বাহির করা হইয়াছে। লোকবল বা আয়তন লইয়া বিচার করিতে গেলে এই স্থানের অদলবদল হইয়া যাইবে। দেশগুলির নাম :—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ক্যানাডা, ভারতবর্ষ, জাপান, নেদারল্যাণ্ড, ইতালি, বেলজিয়াম। ইহা ছাড়া আর্জ্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্র, চীন রাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া ব্রহ্মোদশ, চেকোস্লোভাকিয়া চতুর্দ্দশ, ফিনল্যাণ্ড পঞ্চদশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ষোড়শ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

নিম্নের তালিকা দুইটি হইতে প্রথম ১০টি দেশের আমদানি, রপ্তানি ও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ এবং মোট আমদানি, মোট রপ্তানি ও মোট বাণিজ্যে প্রত্যেকের হিস্যা কত তা জানা যাইবে।

কোটি ডলার

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
১। যুক্তরাষ্ট্র	৪১৬·৩	৪০৭·৮	৪৩৩·১	৪৭৫·৯	৫০৩·০	৫১৫·৭	৮৯২·২	৯১০·৮	৯৪৮·৮
২। যুক্তরাজ্য	৪৩৫·১	৫২৫·৩	৪৪১·১	৩৪৫·১	৩৫২·১	৩৫৫·০	৮৭৮·২	৮৭৫·৪	৮৯৬·১
৩। জার্ম্মানি	৩৩৬·৯	৩৩৩·৫	৩১০·৩	২৪০·৫	২৭৬·৬	৩০১·৬	৫৮১·৪	৬১০·১	৬১১·৯
৪। ফ্রান্স	২০৭·১	২০৯·৫	২২৮·৫	২১৬·৪	২০১·৪	১৯৬·৩	৪২৪·১	৪১০·৯	৪২৪·৮
৫। ক্যানাডা	১১০·৯	১২৬·৬	১২৪·৮	১২৫·৯	১৪০·১	১১২·১	২৩৬·৮	২৬৬·৭	২৩৬·৯
৬। ভারতবর্ষ	৯০·৬	৯১·২	৯১·৪	১১৬·২	১২০·৭	১১৭·৭	২০৬·৮	২১১·৯	২০৯·১
৭। জাপান	৯৯·৫	৯৯·০		৯০·৬	৮৮·৬	৯৬·৯	১৯০·১	১৮৭·৬	১৯৬·৯
৮। নেদারল্যাণ্ড	১০২·৫	১০৭·৯		৭৬·৪	৭৯·৮	৮০·০	১৭৮·৯	১৮৭·৭	১৯০·৬
৯। ইতালি	১০৫·১	১১৫·৩		৮০·৭	৭৬·৬	৭৮·৩	১৮৫·৮	১৭১·৯	১৯০·৩
১০। বেলজিয়াম	৮০·৮	৮৮·৯		৭৪·০	৮৫·৮	৮৯·৪	১৫৪·৮	১৭৪·৭	১৮৭·৯
১১। আর্জ্জেন্টিনা	৮২·৫	৮০·৭		৯৭·২	১০১·৭	৯০·৭	১৭৯·৭	১৮২·৪	১৭৫·০
১২। চীন	৬৯·৯	৮৪·৯		৪৩·৪	৭০·৪	৬২·৫	১০৩·৩	১৫৫·৩	১৪৭·৪
১৩। অষ্ট্রেলিয়া	৭৮·৭	৬৯·৯		৬৯·২	৬৭·৬	৬৮·৩	১৪৭·৯	১৩৭·৫	১৩৬·০

	মোট আমদানির%			মোট রপ্তানির%			মোট বাণিজ্যের%		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
১। যুক্তরাষ্ট্র	১২·৩৩	১১·৭৭	১২·২৫	১৪·১৭	১৪·৪৮	১৪·৭৫	১৩·৭০	১৩·৫৭	১৩·৯০
২। যুক্তরাজ্য	১৪.৭৯	১৪·১১	১৪·৩১	১১·০০	১০·৮০	১০·৮৪	১৩·৪৮	১৩·০৪	১৩·১৬
৩। জার্ম্মানি	১০·০৪	৯·৬৩	৯·০৬	৭·১৬	৮·৫১	৯·২১	৮·৯৪	৯·০৯	৯·১৩
৪। ফ্রান্স	৬·১৫	৬·০৫	৬·৪৭	৬·৯০	৬·২০	৬·০০	৬·৫১	৬·১২	৬·২৪
৫। ক্যানাডা	৩·২৯	৩·৬৫	৩·৫০	৪·০১	৪·০১	৩·৪৫	৩·৬৪	৩·৯৭	৩·৪৮
৬। ভারতবর্ষ	২·৬৮	২·৬০	২·৫৯	৩·৭০	৩·৭১	৩·৫৯	৩·১৭	৩·১৬	৩·০৭
৭। জাপান	২·৯৫	২·৮৬	২·৮০	২·৮১	২·৭০	২·৯৬	২·৯২	২·৭৯	২·৮৯

৮। নেদারল্যাণ্ড	৩·০৪	৩·১১	৩·১০	২·৪৩	২·৪৪	২·৭৫	২·৮০	২·৮০
৯। ইতালি	৩·১১	৩·৩৩	৩·১৭	২·৪৭	২·৩৯	২·৮৫	২·৮৬	২·৭৯
১০। বেলজিয়াম	২·৩৯	২·৪৭	২·৭৯	২·৩৬	২·৭৩	২·৩৮	২·৬১	২·৭৬
১১। আর্জেন্টিনা	২·৪৪	২·৩৩	২·৩৮	৩·১০	২·৭৭	২·৭৬	২·৭২	২·৫৭
১২। চীন	২·০৭	২·৪৫	২·৩২	২·০২	১·৯১	২·০৫	২·৩১	২·১২
১৩। অষ্ট্রেলিয়া	২·৩৩	২·০২	১·৯১	২·০১	২·০৯	২·২৭	২·০৫	২·০০

অন্ত অনেক বিষয়ের মত বাণিজ্য-জগতেও যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু যুক্তরাজ্য বড় বেশী পশ্চাতে পড়িয়া নাই। এই উভয় দেশকে এক শ্রেণীর বিবেচনা করা চলে। জার্মানি ও ফ্রান্স দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দেশ। আর ক্যানাডা হইতে আর্জেন্টিনা পর্য্যন্ত ৭টি দেশকে এক শ্রেণীর মনে করিলে অন্যায় হইবে না। ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, জাপান ও ইতালির মধ্যে পরস্পর স্থানের অদলবদল ও পার্থক্যের অল্পতা প্রণিধানযোগ্য।

১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে দুনিয়ার বাণিজ্যের ৬০% অংশ প্রথম দশটি অগ্রসর দেশের ও ৪৬% অংশ প্রথম পাঁচটি দেশের হেফাজতে হইয়াছিল। সমগ্র দুনিয়ার বাণিজ্যের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের ৮।৯ গুণ, আর ইংরেজীভাষী জাতিদ্বয় দুনিয়ার বাণিজ্যের প্রায় ২৭% দখল করিয়া লইয়াছে। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নাই যেখানে এই দুই দেশের পণ্য-ভারবাহী তরণী ঘাটে ভিড়ে নাই অথবা যেখান হইতে শূন্য তরণীতে প্রবালদ্বীপ উঠানো হয় নাই। এরা বেচাকেনায় ওস্তাদ জাত বটে।

মাথাপিছু বাণিজ্যের বহর

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুনিয়ার লোকের মাথাপিছু মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৯৮৲ টাকা। কিন্তু এ হিসাব দুনিয়া ধরিয়া। দুনিয়ার সকল দেশে লোকবল আর কিছু একই প্রণালীতে ছড়ানো নাই। সুতরাং দেশ ধরিয়া হিসাব করিলে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন প্রকার অঙ্ক পাওয়া যাইবে। নীচের তালিকা হইতে এ বিষয়ে কিছু আন্দাজ করা যাইবে। (পণ্যের মূল্য ডলারে)।

	আমদানি			রপ্তানি			মোট		
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
নিউজীল্যাণ্ড	১৪৭·১১	১৪৪·৭৪	১৪৭·৬২	১৫৭·৭২	১৭৯·৫৫	১৭৬·৩৯	৩০৪·৮৯	৩২৪·২৯	৩৩৪·০৮
ক্যানাডা	১১৫·৭৬	১৩০·৫১	১২৭·৩৯	১৩১·৪১	১৪৪·৪৩	১১৪·৪৩	২৪৭·১৭	২৭৪·২৪	২৪১·৮২
বেলজিয়াম	৯৮·৫০	১০৭·২৮	১১৮·৮৩	৯০·২১	১০৩·৬০	১০৭·৯৩	১৮৮·৭১	২১০·৮৮	২২৬·১৬
অষ্ট্রেলিয়া	১২৬·২৪	১১০·৩৫	১০৬·২৪	১১০·৯৫	১০৬·৭১	১০৭·১৬	২৩৭·১৯	২১৭·০৬	২১৩·৪১
যুক্তরাজ্য	১১৭·০৩	১১৪·৩৬	১১৮·১৪	৭৫·৭৬	৭৬·৯৫	৭৭·৪২	১৯২·৭৯	১৯১·৩১	১৯৫·৬৬
ফ্রান্স	৪৯·৬৬	৫০·০৩	৫৪·৪৭	৪১·৭০	৪৮·১০	৪৬·৮৮	১০১·৩৯	৯৮·১০	১০১·৪৫
জার্মানি	৫০·৪২	৫২·২৭	৫০·২০	৩৮·৩৯	৪০·৩৬	৪৭·২৮	৯১·৮১	৯২·১৩	৯৭·৪৮
যুক্তরাষ্ট্র	৩৪·৩৭	৩৫·২৮	৩৫·২৪	৩৯·২৯	৪১·০৫	৪২·০৯	৭৩·৬৬	৭৪·৩৩	৭৭·১৪
ইতালি	২৫·৭৬	২৮·০০	২৬·৯৮	১৯·৭৭	১৮·৮০	১৮·৮৬	৪৫·৪৩	৪৬·৮০	৪৫·৮৪
জাপান	১৬·১৭	১৫·৮২	১৫·৮২	১৪·৭০	১৪·১৬	১৪·০০	৩০·৯০	২৯·৯৮	৩১·১৫
ভারতবর্ষ	১·৭৩	২·৭০	২·৭৪	৩·৪১	৩·৪২	৩·৪৩	৬·২৪	৬·০৫	৬·২৭
দুনিয়া	২·৪৪	৩·১৬	২·৮০	২·৭৬	২·৩০	২·৯৭	৫·২০	৫·৭৯	৫·৭৭
চীন	১·৫৩	১·৮৫	১·৭৯	১·০৮	১·৫০	১·৩৬	২·৯১	৩·৩৮	৩·১৫

৮২টি দেশের মধ্যে সকলের নীচে রহিয়াছে চীন, তার উপরে কশিয়া, তার উপরে ভারতবর্ষ। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের কিয়ৎ বাহির হইবে। সত্য বটে, শুধু লোক পিছু আমিদারের বহর দেখিয়া কোন দেশের শক্তি সম্বন্ধে কোন কিছু কল্পনা করা চলে না। তথাপি ভারতবর্ষের অবস্থা অতিশয় খারাপ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এত বড় একটা দেশের স্থান আরো উপরে হওয়া উচিত ছিল। নিউজীল্যাণ্ড প্রথম, এ প্রথমের অর্থ অবশ্য তেমন কিছু নয়। মাঝখানে চারিটি দেশ ছাড়িয়া ক্যানাডা ও বেলজিয়াম। বড় দেশগুলির মধ্যে প্রথমেই বেলজিয়ামকে পাইতেছি, মাঝখানে একটি দেশের পর অষ্ট্রেলিয়া, তারপর বড় দেশ পাই যুক্তরাজ্য। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও যুক্তরাজ্য অন্যের উপর টেক্কা দিয়াছে। তৃতীয় বড় দেশ ফ্রান্স। ঠিক পরেই জার্মানি। কিন্তু ফ্রান্সের আগে মাঝখানে ৯টি দেশ রহিয়াছে। তারপর তিনটি দেশ ছাড়াইয়া যুক্তরাষ্ট্র, যে যুক্তরাষ্ট্র মোট মূল্যের বেলায় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একাসনে বসে। পরবর্তী বড় দেশ ইতালি,—মাঝখানে ব্যবধান আছে ১৩টি দেশের। আরো ৯টি দেশ ছাড়াইলে পর জাপানে পৌঁছা যায়। জাপান আর ভারতবর্ষের মাঝখানে এক বিশাল ফাঁক,—৩০টি দেশ; ফিলিপাইন, রোরিয়া, শ্যাম, তুরস্ক, কেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলি এই ফাঁকের মধ্যে রহিয়াছে।

পণ্যের শ্রেণী-বিভাগ

পণ্য যে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে তাহা ক, খ, করিয়া পূর্বেই নির্দেশ করা গিয়াছে। নীচের তালিকা হইতে কয়েকটি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীতে শতকরা হিসাব জানা যাইবে।

		আমদানি শ্রেণী					রপ্তানি শ্রেণী				
		ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
বেলজিয়াম	১৯২৬	০·২	১৫·৬	৫২·২	২১·৯	০·১	০·৮	৯·৪	৩৪·২	৫৪·২	০·৩
	১৯২৯	০·২	২০·৪	৫২·১	২৭·৩	০·০	০·৪	৭·৮	৩৩·০	৫৮·৬	০·২
	১৯২৪	০·৭	২২·১	৬২·৭	১৪·২	০·৩	০·৩	১০·২	১৯·৭	৬৯·৩	০·৫
	১৯২৭	০·৬	২৬·২	৫৯·১	১৩·৯	০·২	০·৩	১০·১	২৩·৮	৬৪·৬	১·২
	১৯২৬	১·১	৩৩·৭	৪৬·৬	১২·৮	৫·৮	০·১	৪·৯	২৩·৭	৭০·৯	০·৪
	১৯২৯	১·১	২৭·৩	৫১·৫	১৯·২	৩·৯	০·২	৫·০	১৮·৫	৬৯·২	৭·১
	১৯২৫	১·৬	৪১·১	৩৫·৪	১৭·৬	৪·৩	০·৩	৫·৯	১৪·৪	৭২·০	৭·৪
	১৯২৮	১·৭	৪১·৩	৩২·০	১৯·৯	৫·১	০·৩	৫·৭	১০·৩	৭১·৯	৮·৮
যুক্তরাষ্ট্র	১৯২৬	০·৩	২০·৯	৫১·২	২১·৬	৬·০	০·১	১৬·৪	৪৩·৬	৩৮·০	৩·৯
	১৯২৯	০·৫	২১·২	৪৬·৮	২৪·০	৭·৫	০·১	১৩·৬	৩৮·৯	৪৪·০	৩·৪

এই অঙ্কগুলির সহিত গত বৈশাখ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত ছলিয়ার তামাম লোকের পেশার পরিচয় (পৃঃ ২০) তুলনীয়। উপরের পাঁচটি দেশের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় আমদানিতে দেশগুলির ক্রম এই ঃ যুক্তরাজ্য ½ অংশ, জার্মানি ⅛ অংশ, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স ½ হইতে ⅛ অংশ, যুক্তরাষ্ট্র ½ অংশ। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে কম পরমুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয়। খাদ্য ও পানীয় রপ্তানিতে এই সব দেশের ক্রমটা উল্টিয়া গিয়াছে। যথা, যুক্তরাষ্ট্র মোট রপ্তানির ½ বা ½ অংশ, ফ্রান্স ১/১০ অংশ, বেলজিয়াম ১/১০ হইতে ১/১০ অংশ, যুক্তরাজ্য ১/১০ অংশ ও জার্মানি ১/১০ অংশ। কাঁচামাল ও আধা-শিল্প দ্রব্য আমদানিতে এক যুক্তরাজ্য (½ অংশ) ব্যতীত প্রত্যেকের অংশ অর্ধেকের

উপর। তন্মধ্যে ফ্রান্সের সব চেয়ে বেশী, অন্য তিনটি দেশ কাছাকাছি। রপ্তানির বেলায় এক যুক্তরাষ্ট্র (½ অংশ) ব্যতীত আর কারো অংশ এক-তৃতীয়ের বেশী নয়। সব চেয়ে নীচে যুক্তরাজ্য (¼ অংশ), তারপর জার্ম্মানি ও ফ্রান্স (⅛ হইতে ⅛ অংশ), তারপর বেলজিয়াম (⅛ অংশ)। পিয়রসন আমদানিতে ক্রম হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানি, ফ্রান্স। আর রপ্তানিতে জার্ম্মানি ও যুক্তরাজ্য উভয় চলিতেছে (⅛ অংশ), তার অব্যবহিত নীচে ফ্রান্স, তারপর বেলজিয়াম (⅛ অংশ), অনেক নীচে যুক্তরাষ্ট্র। সকল দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে ফ্রান্সের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জার্ম্মানির স্থান দ্বিতীয় এবং ইংলণ্ডের তৃতীয়।

বাণিজ্যের গতি (১৯২৯)—শতকরা হিসাব

যে দেশ হইতে আমদানি

যে মহাদেশে আমদানি	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্ম্মানি	ফ্রান্স	কানাডা	ভারত	জাপান	নেদারল্যাণ্ড	ইতালি	বেলজিয়াম	আর্জ্জেন্টিনা	চীন	অষ্ট্রেলিয়া	অন্যান্য দেশ
ইয়োরোপ	১৩·১	৭·৫	১২·২	৫·৮	২·৩	৩·০	০·৪	৩·৫	২·২	৩·১	৫·১	১·৩	২·৭	৩৮·৬
উত্তর আমেরিকা	১৪·০	৯·২	৪·৯	৩·৫	৮·৯	২·৮	৭·৯	১·৭	২·২	১·৫	২·৩	৩·০	০·৬	৩৮·৫
ল্যাটিন আমেরিকা	৩৭·৮	১৪·৬	১০·৮	৫·৬	০·৭	২·৫	০·৬	১·৬	৪·৪	৪·১	৩·০	০·২	০·১	১৩·০
আফ্রিকা	১০·১	২৯·০	৫·৫	২২·৪	১·৪	২·১	১·৬	১·৪	৩·৪	২·৩	০·২	০·৪	২·০	১৭·৮
এশিয়া	১৮·০	১৭·৮	৫·৮	১·৫	১·৪	৭·৪	৯·১	২·৯	১·৪	১·৫	০·১	৩·৬	৩·৩	২৮·২
ওশেনিয়া	২৩·১	৪২·০	২·৭	২·২	৫·০	৩·৫	২·৮	০·৭	০·৮	০·৭	০·১	০·৪	১·৯	১৪·১
সমস্ত মহাদেশ	১৫·৭	১১·২	৯·৭	৫·২	৩·২	৩·৮	২·৮	২·৮	২·০	২·৯	৩·৬	১·৭	২·২	৩২·৯

যে দেশে রপ্তানি

যে মহাদেশ হইতে রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্ম্মানি	ফ্রান্স	কানাডা	ভারত	জাপান	নেদারল্যাণ্ড	ইতালি	বেলজিয়াম	আর্জ্জেন্টিনা	চীন	অষ্ট্রেলিয়া	অন্যান্য দেশ
ইয়োরোপ	৬·৫	১৩·২	১০·০	৫·৬	১·৬	৩·৪	১·১	৪·৫	৩·৬	৪·৬	২·৬	১·২	২·০	৪০·১
উত্তর আমেরিকা	৮·১	১১·৮	৬·৮	৪·৪	১৪·১	১·০	৪·৬	২·৩	২·৬	২·১	৩·৬	২·২	২·৬	১৭·০
ল্যাটিন আমেরিকা	৩৫·৩	১৮·৯	১০·১	৬·১	০·৮	—	০·২	৫·২	২·৮	৪·৮	২·৫	—	—	১৩·০
আফ্রিকা	৬·১	৪৫·২	৫·৭	১৮·১		৩·২	১·০	২·০	৩·৩	৩·০	—	—	০·১	১২·১
এশিয়া	২৬·৫	১২·৩	৩·৯	৪·০	০·৬	৪·৮	৭·৩	৪·০	১·৮	১·৪	০·৮	৫·১	১·৯	২৭·৬
ওশেনিয়া	৪·৭	৪৭·৯	৫·৫	৮·৪	২·১	৪·৭	৬·০	০·৪	২·৭	৪·৬	—	০·৬	১·২	১১·২
সমস্ত মহাদেশ	১২·০	১৬·৫	৮·২	৫·৭	৪·১	২·৯	২·৭	৩·৮	৩·০	৩·৪	২·৪	১·৮	১·৯	৩১·৪

বিভিন্ন মহাদেশের আমদানি-রপ্তানিতে কোন ক্ষেত্রেই উপরের ১০টি দেশের অংশ ৬০% এর কম নহে। সর্ব-শেষ তত্ত্বে প্রদত্ত অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যায় এবিষয়ে এই তেরটি দেশের কোন্ কোন্ মহাদেশের সহিত লেনদেন সব চেয়ে বেশী। দুই দফা অঙ্ক লইয়া আলোচনা করিলে বহু তথ্যের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। ইয়োরোপে আপন আমদানির সব চেয়ে বড় হিস্যা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির; উত্তর আমেরিকার বড় হিস্যাগুলি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ক্যানাডা ও জাপানের: ল্যাটিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি ½ অংশের বেশী, যুক্তরাজ্য হইতে তার অর্দ্ধেক ও জার্মানি হইতে তার ¼; আফ্রিকার বাজার দখলে রাখিয়াছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্রও কতকটা বটে; এশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্ত-রাজ্য প্রধান, জাপান এবং ভারতও কেলনা নয়; ওশেনিয়ার ইংরেজের জরুরতকার, যুক্তরাষ্ট্র তার অর্দ্ধেক বাণিজ্য করে। অন্য দিকে, ইয়োরোপ সব চেয়ে বেশী মাল যোগায় যুক্ত-রাষ্ট্রকে, তারপর জার্মানিকে; উত্তর আমেরিকা যুক্তরাজ্য, ক্যানাডায় বেচিয়া যুক্তরাষ্ট্রে বেচে; ল্যাটিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী রপ্তানি করে, তার অর্দ্ধেক যুক্তরাজ্যে ও এক-তৃতীয়াংশের কম জার্মানিতে; আফ্রিকার রপ্তানি বেশী যুক্তরাজ্যে, তার ¼ অংশ ফ্রান্সে; এশিয়া প্রায় ¼ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে ও ¼ অংশ যুক্তরাজ্যে রপ্তানি পাঠায়; ওশেনিয়ার প্রায় অর্দ্ধেক রপ্তানি বিলাতে যায়।

এই গেল মোটামুটি দিক্‌নির্ণয়,—প্রত্যেক মহাদেশের মোট আমদানি ও রপ্তানিকে ১০০ ধরিয়া তার কত অংশ কোন্ দেশ পাঠাইতেছে অথবা গ্রহণ করিতেছে তার বিচার। কিন্তু প্রত্যেক দেশ যে অংশটা যোগাইতেছে সেটা তার নিজ মোট আমদানি বা রপ্তানির কত অংশ তার হিসাব এই সঙ্গে দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ তা সম্ভব হইবে না। মোটামুটি একটা বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে মাত্র।

ইয়োরোপকে আপনার মোট রপ্তানির সব চেয়ে বেশী অংশ আর্জেন্টিনা (১৯২৭-৮২·৯) পাঠায়, তারপর নেদার-ল্যাণ্ড (১৯২৮-১৪·২%), জার্মানি (১০·৭%), অষ্ট্রেলিয়া (৯·৪%), ফ্রান্স (১৯২৭-৬৬·৫%) ইত্যাদি।

উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা নিজ রপ্তানির ৪৭·৬% ও জাপান ৪৩·৮% পাঠায়। ইয়োরোপে জাপান পাত্তা পায় না, নিজের রপ্তানির মাত্র ৬·৮% পাঠাইয়া সন্তুষ্ট থাকে। উত্তর আমেরিকায় নেদারল্যাণ্ডসের সেই অবস্থা। চীন (২·৩%) ও জাপান বাদে অন্য ১১টি প্রত্যেকটি দেশ ইয়োরোপে ৩০% এর বেশী পাঠায়,—যুক্তরাজ্য মাত্র ৩৪·৭%, কিন্তু উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা ও জাপান বাদে সকলের হিস্যাই ২০% এর কম।

ল্যাটিন আমেরিকায় রপ্তানির সব চেয়ে বেশী অংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে (১৮·৬%)। তারপর যুক্তরাজ্য (১১·৩%), জার্মানি (৭·৪%) ইত্যাদি হইতে।

আফ্রিকায় ফ্রান্স যোগায় (১৯২৭-২৪·৫%), যুক্তরাজ্য ১১·২%, ইতালি ৭·৪% (১৯২৮) ইত্যাদি।

চীন ও জাপান আপন রপ্তানির ৬৬·৬% (১৯২৮) ও ৪২·৭% এশিয়ায় পাঠায়, ভারত দেয় ২৬·৮%, যুক্তরাজ্য ২১·৪%, অষ্ট্রেলিয়া ১৯·২%, যুক্তরাষ্ট্র ১২·৫% ইত্যাদি। ল্যাটিন আমেরিকা (০·১) ও আফ্রিকায় (০·০)। চীনের অন্ন নাই। তাই চীন এশিয়ায় অন্ন জুড়ায়। জাপানও ঘরের কাছে আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যস্ত।

ওশেনিয়ায় ইংরেজের মোট রপ্তানির ১০·৪% আসে, তারপর অষ্ট্রেলিয়ার (৪·০%), যুক্তরাষ্ট্রের (৩·৬%), ক্যানাডার (৩·২%)।

দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে সাজাইয়া বিভিন্ন দেশের মূক ও অমূক বাণিজ্যের খতিয়ান করিবার চেষ্টা দেখা যায়, আর তৃতীয় ভাগে আছে পণ্য সম্পর্কে আমদানি-রপ্তানির বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

শ্রীসুধাকান্ত দে

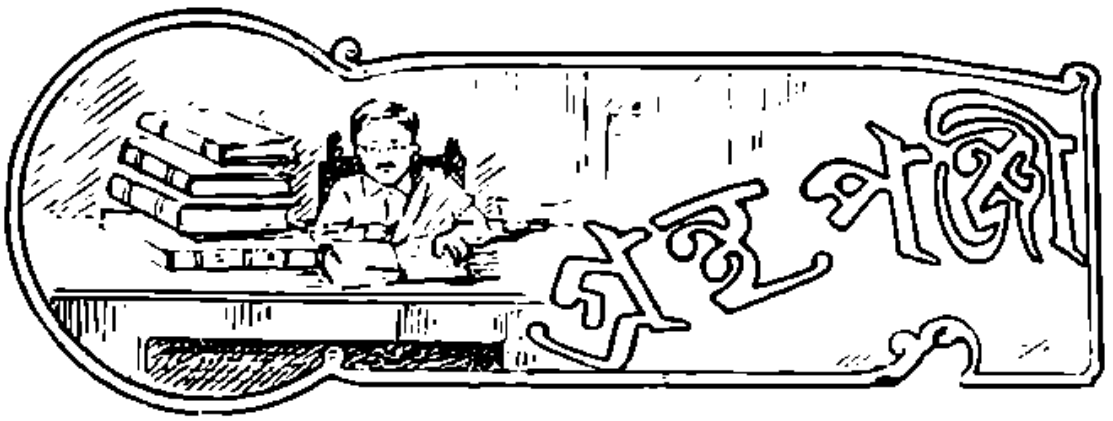

১। "ট্যাক্সেশন। ইট্‌স ইন্‌সিডেন্স অ্যাণ্ড এফেক্টস্" (করতত্ত্ব; মাথা পীছু কর ও তার ফলাফল)। এইচ্‌ এ লিল্‌বারম্যান্‌। ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩১। পৃঃ ১৯+৩৫৯। ৭শি ৬ পে।

২। "বৃটেন অ্যাণ্ড ফ্রারণ্ড্‌ ট্রেড্‌" (বৃটেন ও দুনিয়ার বাণিজ্য), এ লাভ্‌ডে। লন্ম্যান্‌স্‌ গ্রীন অ্যাণ্ড কো লিমিটেড, লণ্ডন। ১০ শি ৬ পে।

৩। "রেলওয়ে দুনিয়ায় ভারতের স্থান", অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, ৩৫বি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৭। ।০ চারি আনা।

৪। "ইকোন্যালিটি" (সাম্য), আর এইচ্‌ টনি। অ্যালেন আনউইন্‌ অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। ৭ শি ৬ পে।

৫। "ব্রোড ষ্ট্রীট অ্যাণ্ড লোম্বার্ড ষ্ট্রীট" (লণ্ডনের টাকার বাজার বনাম নিউ ইয়র্কের টাকার বাজার), হ্রাল্ডিস্‌ ভর্‌রট হার্ট। ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কো লিমিটেড, লণ্ডন। ১৯৩১। ৮ শি ৬ পে।

৬। "বৃটিশ ব্যাঙ্কস্‌ অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার" (ইংরেজদের ব্যাঙ্ক ও কৃষি), এস এবেলিন্‌ টমাস্‌। লণ্ডন জেনারেল প্রেস লিমিটেড্‌, লণ্ডন। ২শি ৬পে।

৭। "হণ্ডের্ট য়ারে গ্রীশিশে লাণ্ডভির্টশাফ্‌ট" (গ্রীক্‌ কৃষির এক শ বৎসরের ইতিহাস), ডক্টর ডেমেট্রিয়স্‌ জি টুসো-লুসোস। ফ্রিডরিশ্‌ ক্রিষ্টিয়ান্‌স্‌ ফেল্‌ডাগ, বার্লিন। রে-মা ৬।

৮। "অয়েল ফ্যাক্টস্‌ অ্যাণ্ড ফিগারস্‌" (তৈল সম্বন্ধীয় তথ্য তালিকা)। মে, ১৯৩১। ফ্রেডরু সি ম্যাথিশন অ্যাণ্ড সন্স, লণ্ডন। ১শি ৬পে।

৯। ফ্রেডিট্‌ অ্যাণ্ড কারেন্সি কন্‌ট্রোল (সাউথারি ও ও সিল্ক বিষয়ক), ডিনি কোপ্‌ল্যাণ্ড। ম্যাকমিলান, লণ্ডন। ৫ শি ৬ পে।

ভারতের সহিত আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের একাল ও সেকাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ, পি-এইচ-ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৫-৬ সন হইতে বাণিজ্যের অগ্রগতি

১৯০৫-৬ সন হইতে ইণ্ডো-আমেরিকান ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধার অগ্রগতি দেখা যায়।[১]

এই বৎসরে আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল্ কোম্পানী ভারতের তেলের বাজারে আবার আপন স্থান অধিকার করে। ১৯০৫ সনের রাষ্ট্র সঙ্ঘের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর রুশিয়ায় তেল উৎপাদন কমিয়া যায়। এই ঘটনার পর রুশিয়া আর তেল রপ্তানি ব্যাপারে মুরিয়া করিতে পারে না। যাহিছু উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা দেশেরই প্রয়োজনে ব্যয়িত হইতে থাকে।[২] ১৯০৫ সন হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল্ কোম্পানী বি রয়াল ডাচ্ এবং বার্মা অয়েল্ কোম্পানীর বাঁধা দর অনুসরণ করিয়া কেরোসিনের দর স্থির করিয়া আসিতেছে। উপরি উক্ত দুইটী কোম্পানীর তেলের দর বেশী। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল্ কোম্পানীর দর সস্তা অথচ তেল ভাল। এই জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল্ কোম্পানী ভারতীয় কেরোসিন আমদানি ব্যাপিজ্যে একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবার অবসর পাইয়াছে।[৩] মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকা এক কেরোসিন ছাড়া অন্যান্য প্রকার ব্যবসায়ে তাদৃশ মনোযোগ দান করে নাই। তথাপি

---

১ ভারতের আমদানি বাণিজ্যে মার্কিণের স্থান :—

১৯০১-২	১৯০২-৩	১৯০৩-৪	১৯০৪-৫			১৯০৭-৮	১৯০৮-৯
১·৪%	১·৫%	১·৫%	১·১%			২·৫%	২·৭%

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে মার্কিণের স্থান :—

১৯০১-২	১৯০২-৩	১৯০৩-৪	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০
৬·৯%	৬·৭%	৬·০%	৬·৩%	৮·২০%	৯·০%	৭·৮%	৮·৮%	৭·৫%

২ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দুইটী প্রতিযোগি ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ বিস্তর রুশিয়ান কেরোসিন তেল এদেশে আনিয়াছে। রয়াল ডাচ্ শেল কোম্পানীর অধীন বি এসিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ৩ বৎসরে রুশিয়া হইতে ভারতবর্ষে এবং সিংহলে ২০,৮৮০,০০০ ইম্পিরিয়াল গ্যালন তেল আমদানি করে। বি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ট্রাষ্ট ইহার দেখাদেখি ১৯২৭ সনের শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ২১,০০০,০০০ ইম্পিরিয়াল গ্যালন তেল আমদানি করে। ইহাতে রয়াল ডাচ্ শেল গ্রুপ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১৯২৭ সনের দর-হ্রাসের লড়াই ঘোষণা করে।

৩ নিম্নের তালিকায় ভারতে মার্কিণের তেল রপ্তানির তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

(হাজার গ্যালন)

	১৯১৩-১৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
মার্কিণ হইতে	৪২,৩১১	৫৫,২২৭	৫৬,২৪৯	৪৫,৪৮৫
অন্যান্য দেশ হইতে	৬৮,৮৫০	৭১,৯৮০	৭৯,২২২	৬৪,০৫০

১৯২৬-২৭ সনে বার্ম্মা হইতে আমদানি তেলের পরিমাণ ১৩ কোটী গ্যালন ; ১৯২৫-২৬ সনে ১২৮০ লক্ষ গ্যালন, এবং ১৯২৪-২৫ সনে ১২৫০ লক্ষ গ্যালন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বার্ম্মা ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ কেরোসিন তেল যোগাইয়া থাকে। বাকী এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে মার্কিণ মোটা অংশ যোগাইয়া থাকে।

দেখা যায়, ১৯০৯ সন হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে সে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। একমাত্র বিলাত এবং জার্ম্মানিই ছিল আমেরিকার উপরে। আমেরিকার নিজেই জাপান, তবে জাপান আমেরিকাকে মাশুল পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল।

উপরি উক্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা গড়ে কি সনে ভারতে ৪৪৯ লাখ টাকার মাল জাহাজ বোঝাই করিয়া পাঠাইয়াছে; উহার মধ্যে খনিজ তেলের হিস্যা ৪৯%। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে লোহা-লক্কড়, তুলা, তুলার কাপড়-চোপড়, পাত্র, কলকব্জা, এবং মোটরগাড়ী প্রধান। ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ কি সন গড়ে ১৬৮৪ লাখ টাকার পণ্য আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছে; ইহার মধ্যে কাঁচা চামড়া এবং ট্যান্ করা চামড়া ৩৪৯ লাখ টাকার, পাট, ২৩৩ লাখ টাকার, চট এবং থলে ৭৮৪ লাখ টাকার।

লড়াইয়ের পর ইণ্ডো-আমেরিকান ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি

লড়াই বাধিবার পর হইতেই ইণ্ডো-আমেরিকান্ ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে কাঁপিয়া উঠে। মাল আদান-প্রদানের রকমারির কিন্তু বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। শুধু ভারত নয় এশিয়ার অন্যান্য দেশের সহিত আমেরিকার বাণিজ্যও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৬ সন হইতে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার রপ্তানি দ্রব্যের ৭৬·১% ইয়োরোপ গ্রহণ করিত। ১৯২৭ সনে আমেরিকা হইতে রপ্তানি দ্রব্যের হিস্যা ইয়োরোপের পড়িয়াছে ৪৭·৬%; পক্ষান্তরে এশিয়ার হিস্যা এই সময়ের মধ্যে ৩·১% হইতে ১১·৪% এ উঠিয়াছে। ইয়োরোপ হইতে আমেরিকায় মাল আমদানি কমিয়াছে ১৮৯৬-১৯০০ সনে ৪২·৬% হইতে ১৯২৭ সনে ৩০·৫%এ। পক্ষান্তরে এশিয়া হইতে বাড়িয়াছে ১৪·৬% হইতে ৩০%এ। মোট কথা, এক ইয়োরোপ ছাড়া অন্যান্য সকল মহাদেশের সহিতই আমেরিকার ব্যবসাবাণিজ্য বাড়িয়াছে। ইয়োরোপের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটিবার কারণ, আমেরিকা ক্রমে কৃষি-প্রধান দেশ হইতে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বের মত আমেরিকা আর ইয়োরোপ হইতে শিল্প দ্রব্য ক্রয় করে না; পূর্ব্বে আমেরিকার ইয়োরোপ হইতে অনেক মাল পুনরায় রপ্তানি হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। এখন আমেরিকা নিজেই অন্যান্য দেশের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। বাণিজ্য-জাহাজের সুবন্দোবস্ত এবং উৎকর্ষ বিধান, এবং নানা প্রকার ব্যাঙ্ক সুবিধা দানের ফলে, মার্কিণ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণ ছাড়াও আমেরিকার ব্যবসাবাণিজ্য-বৃদ্ধির আর একটী প্রকাণ্ড কারণ রহিয়াছে। লড়াইয়ের আমলে ইয়োরোপীয় দেশগুলি ভারতের বাজারে আর শিল্প দ্রব্য পাঠাইতে পারিতেছিল না: আমেরিকা এবং জাপান সেই অবসরে আপন আপন শিল্প কায়েম করিয়া ভারতের বাজার অধিকার করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছে।

স্থায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি

পরবর্ত্তী তালিকায় দেখা যাইবে ১৯২৪-২৬ সনের অস্থায়ী বাণিজ্য-হ্রাসের পর ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনের মধ্যেই বাণিজ্য আবার পূর্ব্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। গত শতাব্দীতে ইণ্ডো-আমেরিকান ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল একভাবে; লড়াইয়ের পরে এই বাণিজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতিতে। লড়াইয়ের আগে মার্কিণের বাণিজ্য-বৃদ্ধির কারণ কেবল আমেরিকার শিল্পোন্নতি নহে; ইহার আরও অনেক আকস্মিক কারণ আছে। এই কারণগুলি দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বহির্ব্বাণিজ্য অতিগ্রস্ত হয়। লড়াইয়ের পরে কিন্তু আমেরিকার বাণিজ্যোন্নতি ঘটিয়াছে সম্পূর্ণ পৃথক কারণে। যুযুধান দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য অস্থায়িভাবে আমেরিকার হাতে পড়ার জন্যই ইণ্ডো-আমেরিকান বাণিজ্য কাঁপিয়া উঠে নাই। আমেরিকার গায়ায় গায়ায় মাল উৎপাদনের ক্ষমতা এবং ইহার আনুষঙ্গিক মূল্য-হ্রাসই ইহার প্রধান কারণ। অন্যান্য চিন্ন সম্বন্ধে না হইলেও আমেরিকান শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে একথা বেশ খাটে।

ইঙ্গ-আমেরিকান প্রতিযোগিতা

মার্কিণ ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতা নেহাৎ একেলে নয়, এ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে প্রায় একশ'বছর আগে। ১৮৩০-৩১ সনের বাঙ্গালার সরকারী বাণিজ্য বিবরণীতে এই প্রতিযোগিতার আভাষ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ,—মার্কিণের প্রতিযোগিতা বিলাতের পক্ষে যদিও মারাত্মক হইয়া উঠে নাই, তবুও স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতা বিলাতের পক্ষে ধাক্কা হইয়া উঠিবে। ভারতের বাজারে কয়েক লক্ষ জিনিষের ব্যবসায়ে মার্কিণ ইংরেজকে রীতিমত কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনের একটী বিবরণীতে প্রকাশ—মেশিনারি, মোটরগাড়ী, রবার টায়ার, বিদ্যুতের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি মালের ব্যবসায়ে আমেরিকার প্রতিযোগিতা বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

এই সমস্ত জিনিষের ব্যবসায়ের মধ্যে মেশিনের ব্যবসায়ই বিলাতের সব চেয়ে বড় ব্যবসা। ১৯২৭-২৮ সনে ভারতের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এই দফায় বিলাতের হিস্যা দাঁড়ায় মোট বিলাতী আমদানি বাণিজ্যের ১০·৫%। ১৯১৩-১৪ সনে বিলাতের অবস্থা আরও ভাল ছিল। তবুও ১৯২৬-২৭ সনের তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনের অবস্থা অনেক ভাল। নিম্নের তালিকায় ইহার পরিচয় দেওয়া হইল :—

ভারতে মেশিন আমদানির পরিচয়

	১৯১৩-১৪	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
বিলাত	৯০%	৭৮·২%	৭৮·৫%
মার্কিণ	৩%	১০·২%	১০·১%
জার্মানি	৬%	৭%	৬·৭%
অন্যান্য দেশ	১%	৪·৬%	৪·৭%
	১০০%	১০০%	১০০%

ভারতীয় শিল্পের মধ্যে এখন তুলা, চা এবং পাট প্রধান। এই সমস্ত শিল্পে ব্যবহৃত মেশিনারি প্রায় সমস্তই বিলাতী। অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে মজুরগণ যে

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের স্বরূপ

	১৯১৩-১৪			১৯১৬-১৭			১৯২৬-২৭		
	রপ্তানির মূল্যের শতকরা হার	আমদানির মূল্যের শতকরা হার		রপ্তানির মূল্যের শতকরা হার	আমদানির মূল্যের শতকরা হার		রপ্তানির মূল্যের শতকরা হার	আমদানির মূল্যের শতকরা হার	
বিলাত	৩৪·৮	৬৪·৮	২৫·১	৩০·৩	৬৫·৩	২৫·৩	৩৪·৩	৫৪·৩	২৫·৩
মার্কিণ	৮·৩	৭·০	৭·৯	১১·৭	৭·৫	৭·৯	১১·৭	৭·৫	৭·৯
জার্মানি	৭·৪	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬
জাপান	৭·৪	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬
ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালি	৭·৪	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬
অন্যান্য দেশ	৭·৪	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬
মোট আন্তর্জাতিক	৭·৪	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬	৭·৮	৭·৮	৭·৬

ধরণের কলকব্জা এতদিন ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত কলকব্জার যোগানদার অব্যাহত থাকিবে। আমেরিকা সবেমাত্র ভারতের কলের বাজারে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সস্তায় কলকব্জা বসানই প্রধান কথা, এবং কলের গুণ কিংবা ক্ষমতা যাচাই করিয়া লইবার অবসর নাই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমেরিকান কলের চাহিদা বেশী। তবে এর জন্য বিলাতের ভয় পাবার কোন কারণ নাই। কারণ বিলাতী কল সম্বন্ধে দরদের হৃদয়ে উচ্চ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, আর বাজারে মাল ফেলা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত ইত্যাদিতে বিলাতী প্রতিষ্ঠান-গুলি কাহারও অপেক্ষা কম ওস্তাদ নহে। আমেরিকা যা একটু সুবিধা করিয়াছে তা কেবল কৃষিকার্য্যের কল বিক্রয়ে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের মত ছোট ছোট ক্ষেত-বিশিষ্ট দেশে এই সমস্ত কলের চাহিদা বড় একটা হইবে না। অন্যান্য কল সম্বন্ধে আমেরিকার ভারতীয় বাজার দখল করিতে এখনও অনেক দেরী আছে।

তবে মোটর গাড়ীর বেলায় আমেরিকা সকলের উপরে টেক্কা মারিয়াছে। আমেরিকা একটী প্রকাণ্ড দেশ; নিজের এলাকার মধ্যের চাহিদা পূরণের জন্যই আমেরিকাকে গাদায় গাদায় মোটরগাড়ী তৈরীর উপায় স্থির করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমেরিকা যে ভাবে সস্তায় মোটরগাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিতেছে, তা অন্যান্য দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার। তবে বিলাতও মোটর ব্যবসায়ে একেবারে পিছাইয়া নাই। এখনও সর্ব্বনিম্ন দামের বিলাতী মোটর গাড়ীর চেয়ে আমেরিকান গাড়ী যদিও খুব সস্তা, তবুও বিলাতী গাড়ী মজবুত এবং টেঁকসই বলিয়া ভারতে বিলাতী গাড়ীর পসার ক্রমে বাড়িতেছে। বিলাতের মধ্যে একমাত্র মরিস গাড়ী গাদায় গাদায় উৎপন্ন হয়। এই মরিস কোম্পানী ছাড়া, দেখিতে গেলে, মোটর গাড়ী সম্বন্ধে বিলাত এবং আমেরিকার প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের গ্রাহকের রুচি-মাফিক গাড়ী প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। লরি এবং বাস্ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ভারি এবং দামী বৃটিশ গাড়ী কেবল বৃটিশ কারখানাগুলিই তৈরী করে; পক্ষান্তরে ভারতীয় কারখানাগুলি সস্তা এবং বালকা আমেরিকান গাড়ীর পক্ষপাতী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার পক্ষে বিলাতকে ভারতের মোটরের বাজার হইতে তাড়াইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে।

রবার টায়ার, বিদ্যুতের সরঞ্জাম, কিল্ম, রবারের জুতা, সৌখিন দ্রব্য ইত্যাদির ব্যবসায়ে আমেরিকার প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত খাতে বিলাতের রপ্তানির পরিমাণ মোট রপ্তানির মাত্র ৩%। আমেরিকা নিশ্চয়ই বিলাতকে এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত করিতে পারিবে না, আর যদিও পারে, তবুও তাহাতে বিলাতের রপ্তানি-বাণিজ্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

এই সমস্ত ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় বাদ দিলেও দেখা যায়, ভবিষ্যতে আমেরিকার পক্ষে বড় বড় শিল্প ক্ষেত্রেও বিলাতকে কাহিল করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা আছে। লোহালক্কড় আর বস্ত্র এই দুইটীই বিলাতের প্রধান শিল্প—ভারতে বিলাতী দ্রব্য আমদানির মধ্যে এই দুই জিনের হিস্যা প্রায় ৫১%। আমেরিকা এই দুই বিষয়েও বিলাতকে হারাইতে পারে, তবে আপাততঃ ভারতের বাজারে এই দুই আমদানিতে আমেরিকার হিস্যা নগণ্য মাত্র।

বিলাতের পক্ষে একটী আশঙ্কার বিষয় এই যে, দুনিয়ার মধ্যে তুলা-শিল্পে, একমাত্র মার্কিণই বিলাতের সমকক্ষ। ১৯২৬ সনে মার্কিণ দেশে দুনিয়ার ৩২.২%, এবং বিলাতে ৩৩.৩% তাঁত ছিল। তবে মার্কিণ আপন এলাকার বিরাট চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে বিশেষ কিছু রপ্তানি করিতে পারে না। মার্কিণ তুলা-শিল্পের এখন মাত্র শৈশব কাল। আমেরিকান কলওয়ালারা সম্প্রতি দুনিয়ার বাজার দখল করিবার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে স্পিণ্ডলের সংখ্যা তো বাড়াইয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে মজুর-দিগকে ডবল খাটাইবারও বন্দোবস্ত করিয়াছে।

তবে উচ্চাঙ্গের বস্ত্র উৎপাদনে বিলাতের ইজ্জৎ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। স্বয়ং মার্কিণ বিলাতী মিহি কাপড়ের খরিদ্দার, কিন্তু মাঝারি ধরণের বস্ত্র সম্বন্ধে জাপান, মেক্সিকো

ও দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন বিলাতের সহিত বিষম প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। মার্কিণ দক্ষিণ আফ্রিকার পর্য্যন্ত বিলাতী কাপড়ের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডেও কিছু স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতের বাজারই যে মার্কিণের হাতে আসিবে না তাহার স্থিরতা কি?

লোহা-লক্কড়ের বেলাতেও বিলাতের কপাল ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। বিলাতের লোহা এবং কয়লার খনি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। বিলাতে এক-তৃতীয়াংশ লোহার ওর এখন বিদেশ হইতে আসিতেছে। তবে আমেরিকা এসম্বন্ধে বিদেশের বাজার দখল করার দিকে সেরূপ নজর দেয় নাই, ঘরের চাহিদার দিকেই এখন তার নজর। মার্কিণ একমাত্র ক্যানাডায় টক্কর দেওয়া সুরু করিয়াছে। মার্কিণে কয়লা আর লোহার অফুরন্ত ভাণ্ডার। ভবিষ্যতে মার্কিণ যে লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায়ে বিলাতের কি দারুণ প্রতিযোগী হইয়া উঠিবে তা ব্যাখ্যা করিতে স্পষ্টাক্ষরে বিঘোষিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ব্যবসাবাণিজ্যের চাল চাল দেখিয়াও বেশ বোঝা যাইতেছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই লোহা-লক্কড় এবং তুলা-শিল্পে মার্কিণ-ব্রিটেনের প্রতিযোগী হইয়া উঠিবে। মহাযুদ্ধের পর হইতে মার্কিণের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ বাণিজ্যের বহর ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তবুও এখন এই বাণিজ্যের একটী মোটা অংশ নিষ্পন্ন হইতেছে ত্রিকোণাকারে। ভারত আমেরিকার নিকট বেশী মাল রপ্তানি করে। আমেরিকা এই বাড়তি আমদানি শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করিয়া ফুলাইতে পারে না। সুতরাং আমেরিকাকে অনেক কাঁচা মাল বিলাতে পাঠাইয়া দিয়া ভারতের বাড়তি রপ্তানি শোধ করিতে হয়। বিলাত এই আমেরিকান কাঁচা মালের পরিবর্ত্তে ভারতে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য পাঠাইয়া দেয়। আমেরিকা যতই শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিবে ততই এই ত্রিকোণাকার বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া আসিবে। আমেরিকা তখন ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাণিজ্য চালাইতে পারিবে। আমেরিকার প্রস্তুত টাইপরাইটার, মোটর গাড়ী প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য এই কার্য্যের উপযোগী নয়; গরীব ভারত আর কত এই সমস্ত দামী জিনিষ কিনিবে? সস্তা কাপড় চোপড় এবং লোহালক্কড় দ্বারাই আমেরিকাকে এই সাক্ষাৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে।

বাস্তু সমিতি (২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহা, পি-এইচ্-ডি

বন্ধকী কারবার

বাস্তু সমিতির প্রধান অবলম্বন হইতেছে বন্ধক-দাতা অর্থাৎ যে বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার লইতেছে। যে অংশীদার সমিতিতে টাকা খাটায়, তাহার চেয়ে বন্ধক-দাতার মর্য্যাদা কম নহে।

প্রথমে বুঝিয়া দেখা দরকার, বন্ধক কাহাকে বলে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর সম্পত্তি বন্ধকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ক খএর নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া জমি কিনিতে চায়। কিন্তু খ অথচ জামিন ছাড়া টাকা ধার দিবে না। ক ঐ জমিটাই জামিন রাখিতে পারে। অর্থাৎ ক সম্পত্তিটা খএর নিকট হস্তান্তরিত করিবে। তাহার কাছে স্বত্ব-পত্রাদি রাখিয়া দিবে ও এইরূপে ঐ জমি কিনিবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার কতকাংশ ধার পাইবে। সমস্ত টাকা শোধ হইয়া গেলে ক আপনা আপনি খএর নিকট হইতে জমি ফিরিয়া পাইবে।

১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাস অবধি বাস্তু সমিতিসমূহ তিন প্রকার জমি বন্ধক লইয়া টাকা ধার দিত : ফ্রীহোল্ড লীজ্‌হোল্ড ও কলিহোল্ড।

ফ্রীহোল্ড বলিতে সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ ও অবাধ স্বত্ব বুঝায়। এই প্রকার জমির মালিকেরা ঐ জমিতে নির্ম্মিত সকল রকম ঘর-বাড়ীরও মালিক হয়।

ফ্রীহোল্ড জমির মালিকের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য কোন সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মিলে তাহাকে লীজ্‌হোল্ড বলে।

১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিহোল্ড প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক।

টাকা কিরূপে ধার দেওয়া হয়

উন্নতি সাধন করিবার জন্য, জমের জন্য, বাড়ী তৈরীর জন্য বাস্তু-সমিতির সভ্যেরা ধার লইতে পারে। সেই জমি নিজেই ভোগ করুক বা খাটাইয়া টাকা উপার্জ্জন করুক অথবা অন্য কাহাকেও ভাড়া দিয়া ভোগ করুক, তাহাতে টাকা ধার লওয়ার কোন বাধা হয় না। কিন্তু টাকা ধার দিবার পূর্ব্বে সমিতির সার্ভেয়ার বা জমি-পরিদর্শকের ঐ জমির জন্য টাকা দিবার পক্ষে সম্মতি দেওয়া চাই। সমিতিও যথোচিত জামিন রাখিয়া তবে ঝুঁকি লয়। অবশ্য যদি টাকা শোধ না করে তবে সম্পত্তি বিক্রয়ের হাঙ্গামা আছে, তারপর আসল ও সুদ আদায়ের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচা আছে। পরিদর্শক জমির যে মূল্য করিয়া দেয় অথবা যত টাকায় ঐ জমি কেনা হইয়াছে (এ দু'য়ের মধ্যে যেটা কম সেটাকেই ধরা হয়) তাহার শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত অংশ ধার দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ সম্পত্তির দামের ন্যূনপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ সমিতি কর্ত্তৃক ঝুঁকি বাবদ্ রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া হয়।

যাহারা নিজেদের জন্য বাড়ী তৈরী করিবার উদ্দেশ্যে টাকা ধার লয়, তখনো কখনো তাহাদিগকে বেশী উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজকাল বড় বড় সমিতি এরূপ পার্থক্য করে না,—যাহারা টাকা খাটাইয়া টাকা উপার্জ্জনের জন্য ধার চায় তাহাদিকে বাধা দেওয়া হয় না। অল্পকালস্থায়ী লিজ্‌হোল্ডের উপর টাকা ধার দেওয়া বাস্তু-সমিতিগুলির পছন্দসই নয়। এইরূপ সম্পত্তির তাড়াতাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় উহার উপর টাকা ধার দেওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী।

ঋণের উর্দ্ধসীমা কখন ছাড়ানো যায়

কোন কোন বাস্তু-সমিতি সম্পত্তির মূল্যের ৭৫% হইতে ৮০% এর অধিক টাকা ধার দিয়া থাকে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত প্রকার 'কোল্যাটারেল' বা আনুষঙ্গিক জামিনের দরকার হয় :

(১) কোন বীমা আফিস কর্ত্তৃক প্রদত্ত গ্যারাণ্টি (প্রতিজ্ঞা) বা ইন্‌ডেমনিটি পলিসি (ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য পলিসি)।

(২) ১৯২৩ সনের 'গৃহ-আইন' অনুযায়ী স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের গ্যারাণ্টি।

(৩) সিন্ট-এজেড্ (স্বর্ণপক্ক) বা ট্রাষ্টি (সরকার অনুমোদিত) জামিন আমানত।

(৪) অন্য ফ্রী হোল্ড বা লিজ্‌হোল্ড সম্পত্তির স্বত্বপত্রের আমানত।

(৫) গ্যারাণ্টিরূপে কোন আমানতের উপর প্রদত্ত লিয়েন (দখলাধিকার)।

সমিতির চক্ষে এই সকল জামিনের গুরুত্বের তারতম্য আছে। বাস্তু-সমিতিসমূহ সাধারণতঃ ৪ নং ও ৫ নং অতিরিক্ত জামিন লইয়া ৭৫।৮০% এর বেশী টাকা ধার দিতে ইচ্ছুক করে না। সরকার হইতে গৃহ-আইন পাশ (১৯২৩) করিয়া আন্দোলনটিকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। এই আইন গেয়ারেণ্টি আইন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গ্যারাণ্টি পাইয়া বাস্তু-সমিতি গৃহের মূল্যের ৯০% পর্য্যন্ত টাকা ধার দিতে সমর্থ। গ্যারাণ্টির মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

আদায় কম হওয়ার ফলে লোকসান হইলে, মূল্য জমির মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ ধরিয়া হিসাব করিলে যে লোকসান হইত, তাহার সঙ্গে প্রকৃত লোকসানের যে পার্থক্য, তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন।

সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মত কোন অবস্থা উপস্থিত হইবার ঠিক এক মাস আগে সমিতিকে কর্তৃপক্ষের নিকট সে খবর দিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ হুকুম করিলে তখনি ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। খবর পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে সমস্ত বন্ধকের টাকা শোধ করিয়া দিয়া পাট্টা ইত্যাদি নিজের জেরাজতে রাখিতে পারেন।

সমিতি অধমর্ণকে সময় দিলেও কর্তৃপক্ষের দাবির ঘুচিয়া যায় না। যে পর্যন্ত সমিতি কর্তৃক অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ জমির মূল্যের ৪৫% না দাঁড়ায় সে পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের দাবির বজায় থাকে।

কর্তৃপক্ষেরা নিজ খুসীমত উপরি উক্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তবে ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য-সচিব অনেক উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু লণ্ডনের অধিকাংশ সমিতি গ্যারাণ্টির সুযোগ গ্রহণ করে নাই, যদিও মফঃস্বলের কোথাও দু একটি সমিতি এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। মোটের উপর কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ এখন পর্যন্ত দেখান নাই।

বীমার সহিত যোগাযোগ

কোন কোন সময়ে বীমা কোম্পানী, মনোনীত বিত্তির ব্যাঙ্ক-সমিতি টাকা ধার দেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য দায়িত্ব লয়। বীমা কোম্পানী অবশ্য সকল রকম ক্ষতিপূরণের ভার লয় না। কোন সমিতি ৭৫৮০% এর বেশী ধার দিলে যদি অধমর্ণ তাহা শোধ করিতে না পারে তবেই বীমা কোম্পানীর দায়। জামিন-স্বরূপ সমিতির কাছে এরূপ বাটী বন্ধক রাখিতে হইবে যাহা পরে অধমর্ণ নিজের বসত-বাটীরূপে ব্যবহার করিবে, আর ঐ বাটীর মূল্য ১,৫০০ পাউণ্ডের বেশী হইবে না। বন্ধকের মেয়াদ সাধারণত ২০ বৎসরের বেশী হইবে না এবং ব্যাঙ্ক-সমিতির জরীপে সম্পত্তির যে মূল্য স্থিরীকৃত হইবে তাহার ৯০% এর বেশী ধার দেওয়া চলিবে না। এই প্রকার গ্যারাণ্টী লাভ করিতে হইলে অধমর্ণকে একটা উচ্চ হারে প্রিমিয়াম দিতে হয়। হারটা বন্ধকের সর্ত ও অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বীমা ব্যবসায়ের এই প্রকার প্রসার অল্প দিন আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এখনো কোন দস্তুরমাফিক নিয়ম-কানুন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সাধারণত প্রথা এই দাঁড়াইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক-সমিতির সম্পত্তি বিক্রয়ের কারণ ঘটিলে (টাকা না পাওয়ার জন্য), সমিতি ঠিক তাহার পরে তিন মাসের মধ্যে সে কথা বীমা কোম্পানীকে জানাইয়া সুদ ও আসল শোধ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবে, অথবা সেই সময়ে যত টাকা পাওনা শুধু তাহাই চাহিবে; তখন বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে কোন সাহায্য না পাইলে বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে অথবা বীমা কোম্পানীর নির্দেশমত টাকা আদায়ের অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। ব্যাঙ্ক-সমিতি প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সম্পত্তির মূল্যের ৪৫%এ নামিয়া আসিলে বীমা কোম্পানীর কাজ শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিবেচনা করা বন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমানে এই প্রথা সম্বন্ধে একটা আপত্তি এই করা হয় যে, টাকা না পাইলে ব্যাঙ্ক-সমিতি বীমা কোম্পানীর হাতে কর্তব্যাকর্তব্যের ভার ছাড়িয়া দেয়। এই স্থলে বন্ধকী সমিতির ক্ষতি করিয়া বীমা কোম্পানীর কোন লাভ হইবে না বলিয়া ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। এক্ষণে প্রায় ১৫০টি সমিতি বন্ধকী কারবারের সহিত নিজেরাই বীমার ব্যবসা চালাইতেছে।

টাকা ধার লওয়ার প্রণালী

টাকা ধার লইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হইতেছে কোন্ ব্যাঙ্ক সমিতির নিকট হইতে ধার লইবে তাহা ঠিক করা। তারপর তাহাকে একটি আবেদন পত্রে প্রস্তাবিত জামিন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়া পূরণ করিয়া সমিতির আফিসে পাঠাইয়া দিতে হয়। সঙ্গে জমি পরিদর্শনের একটা ফী বা টাকাও পাঠাইতে হয়। আবেদন পত্রে সম্পত্তির স্বত্ব, অবস্থা, ভাড়া হিসাবে মূল্য ও করের উদ্দেশ্যে বার্ষিক মূল্য, ক্রয় কালীন দর ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। ইহার পর সমিতির জরীপ-

কারী গিয়া সম্পত্তি দেখিয়া আসে ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট দাখিল করে। সমিতি তখন আবেদনকারীকে জানায়, কত টাকা ধার দিতে পারিবে। আবেদনকারী তাহাতে রাজী হইলে, তাহাকে সাধারণত সমিতির সদস্য হইবার জন্য (আগে সদস্য হইয়া না থাকিলে) প্রবেশিকা ও ধার দেওয়ার খরচা বাবদ কয়েক শিলিং টাকা দিতে হয়। বর্ত্তমানে বাস্তু সমিতির আইন অনুযায়ী তাহার সভ্য হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কখনো কখনো সম্পত্তি ক্রয় ছাড়া সম্পত্তির উপর ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য সমিতির নিকট টাকা ধার লওয়া হয়। তখন সমিতির পরিদর্শককে বাড়ীঘরের নক্সা ও অন্যান্য তথ্য পাঠানো দরকার। যেখানে বাটী নির্ম্মাণকারী কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা চায় সেখানে পূর্ব্বেই সমিতির সঙ্গে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায়।

সমিতির প্রধান বা জিলা আফিস হইতে সম্পত্তির দূরত্ব অনুসারে জরীপের ফী ধার্য্য করা হয়। অনেক সময় কর্জ্জের পরিমাণের উপরও উহা নির্ভর করে। নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে হইলে যাতায়াতের খরচা বাবদ কিছু ধরে। সম্পত্তির উপর বাটী যখন তৈরী হইতে থাকে তখন পরিদর্শককে একবারের বেশী যাতায়াত করিতে হয়,—ধার দেওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা ভালভাবে হওয়া দরকার। তারপর সমিতি আবেদনকারীকে কিছু না বলিয়া সমিতির পরিচালক-মণ্ডলীর নিকট গোপনীয় সমস্ত তথ্য পাঠাইয়া দেয়। সেজন্য এরূপ ক্ষেত্রে দেয় টাকা কিছু বেশী। কাজটা অবশ্য এটর্ণির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। কর্জ্জের পরিমাণ, কাজের ধারা এবং বাটীর অবস্থানের উপর এটর্ণির খরচা নির্ভর করে। এই খরচা ও জরীপ বাবদ যে টাকা অবমর্ণের কাছে চাওয়া হয়, তাহা সাধারণ বন্ধকী কারবারের ফীর চেয়ে কম।

কি করিয়া ধার শোধ হয়

নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ ও আসল মাসে মাসে শোধ করিয়া দেওয়াই রীতি। কত দিনের কড়ারে সব টাকা শোধ করা হইবে তাহার উপর নির্ভর করে প্রত্যেক কিস্তিতে কত দিতে হইবে। এ বিষয়ে অবমর্ণকে যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। পাঁচ হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিবার ভার অবমর্ণ লইতে পারে,—ইহার চেয়ে অধিক সময়ও দেওয়া হয়। বার্ষিক কিস্তি ছাড়া কর্জ্জগ্রহণকারী আরো কিছু দিতে চাহিলে তাহা লওয়া হয়। অতিরিক্ত যাহা এইরূপে দেয় তাহার সুদটা সেই দিন হইতেই মাপ হইয়া যায়। কখনো কখনো বন্ধক-দাতার হাতে হঠাৎ অনেক টাকা আসায় একবারে শোধ করিবার সুবিধা হইতে পারে। তখন তাহা শোধ করিয়া দিতে বাধা না দিয়া উৎসাহ দেওয়া হয়। শুধু সময়মত একটা খবর দেওয়া দরকার, অথবা যতটা সময় পূর্ব্বে নোটিস্ দেওয়া দরকার ততটা সময়ের সুদ যোগ দিয়া টাকাটা তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বাস্তু-সমিতির মধ্যস্থতায় কোন ব্যক্তির যদি বাটীর মালিক হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে সমিতির টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ঐ বাটী হস্তান্তরিত করিবার অধিকার থাকিবে না, এমন নহে। যে কারণেই তাহার ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার ইচ্ছা হোক না কেন, সে পূর্ব্বাহ্নে বাজারে উহা বিক্রয় করিতে পারে, অথবা এজেন্টের সাহায্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, সমিতি বাধা দিবে না। কিন্তু বাটীর দর এমনভাবে ঠিক হওয়া দরকার যে, তাহা হইতে সমিতির প্রাপ্য টাকাটা উঠিয়া আসে। বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে, সমিতির এটর্ণি সেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে বন্ধকী টাকা সমিতির হাতে তুলিয়া দিতে পারে। অথবা সমিতির টাকা নিম্নলিখিত প্রকারেও আদায় করা যাইতে পারে। মনে করুন, ক কোন সমিতির নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিছুকাল পরে সে ঐ বাটী খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে মনস্থ করিল। সমিতির কাছে ঐ বাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার লওয়া হইয়াছে খ ইহা জানে। ইহাও সে জানে ক কতক টাকা এযাবৎ পরিশোধ করিয়াছে। তখন ক ও খ-এ কথাবার্ত্তা হইবে খ কত

টাকাতে ঐ বাটী ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। যদি উভয়ের মধ্যে কথা ঠিক হইয়া যায় তবে ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকা খরচ করিয়া দিবে না। বন্ধকীর দাবীটা খারিজ করিয়া লইবে এবং সে বাবদ টাকা মোট টাকা হইতে বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই খরচ দিবে। ব্যাঙ্ক কমিটি এইরূপ পরিবর্ত্তনে আপত্তি করে না। কিন্তু নূতন লোকটি ভাল লোক হওয়া চাই এবং কাজটাতে কমিটির সম্মতি থাকা চাই।

আয়কর সম্বন্ধে ব্যবস্থা

কর্জ্জগ্রহণকারী সভ্যগণ যে টাকা পরিশোধ করেন তাহা হইতে সাধারণতঃ আয়কর বাদ পাইতে অধিকারী নহেন। কিন্তু তাহারা মহাজনমূলে প্রদত্ত সুদ হইতে আয়কর বাদ পাইতে অধিকারী। আগে এ বিষয়ে বন্দোবস্তটা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। অবসরপ্রাপ্ত সমিতির কাছে প্রদত্ত সুদের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিতে হইত। তারপর ট্যাক্স দারোগার কাছে টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইত। তাহাতে অনেকের এই নিয়ম না জানায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সমিতি বৎসরের শেষে জেলার ট্যাক্স-দারোগার নিকট এক বিবৃতি পাঠাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি মোট কত টাকা সুদ দিয়াছে তাহা দেখায়। ইহাতে অবসরপ্রাপ্তদিগকে সার্টিফিকেটের জন্য আর দরখাস্ত করিতে হয় না। তাহারা সোজাসুজি আপনা আপনি ঐ পরিমাণ টাকা হইতে আয়-করের টাকা ফেরৎ পাইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার লবণ শিল্প ও ব্যবসায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে লবণ উৎপন্ন হইত তাহাতেই বাঙ্গালার অভাব মোচন হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করিবার পর হইতে ভারতের ব্যবসাক্ষেত্রে প্রথমতঃ তাহাদের কর্ম্মচারীদের ও পরে কোম্পানীর নিজের একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার ফলে বাঙ্গালার এই ব্যবসায় ও শিল্প ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। ইংরাজ বণিকদিগের চেষ্টার অবশেষে ফল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার সকল লবণ কারখানা উঠিয়া গেল—এই ব্যবসায়ে তাহাদের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। তখন বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী লবণের উপর নির্ভর করিল। এই একাধিপত্যের বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচনা করিয়া ফল নাই।

বাঙ্গালার লবণ শিল্প তৎকালে যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। বাঙ্গালার লবণ তখন বাঙ্গালা দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। বাঙ্গালার সকল কারখানায় সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে লবণ মজুত থাকিত। কোম্পানীর একাধিপত্যের প্রারম্ভে সকল কারখানায় যে লবণ মজুত ছিল, কথিত আছে তাহা নিঃশেষ হইতে প্রায় দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতা সহরের বহু লবণ-ব্যবসায়ী প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে তখন বিদেশী লবণ অপেক্ষা এদেশে উৎপন্ন লবণই বিশেষ পছন্দ করিত। ব্যবসায়ীরা তখন অধিক দামে এই লবণ বিক্রয় করিত। স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালা দেশে বিদেশী লবণ বর্জ্জিত হইয়াছিল। তখন হইতে এদেশে "কর্কচ লবণ" ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু এই কর্কচ লবণ বোধাইয়ের অতি নিকৃষ্ট লবণ। ইহাই বাঙ্গালা দেশে অতি সমাদরে ও সকল ধর্ম্মব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহু-তর ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার জনমত উপেক্ষা করায় বিদেশী লবণ সহজে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রধান প্রধান স্থানে এই লবণের কারীগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তমলুক, হিজলি, কাঁথি, সুন্দরবন, জোলা (বাখরগঞ্জ) ও চট্টগ্রাম লবণ তৈয়ারীর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সুন্দরবন ও ২৪ পরগণায় প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী কলিকাতা সহরে প্রেরিত হইত এবং এখান হইতে বাঙ্গালার চারি দিকে চালান হইত।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার এই শিল্পসম্পদ্ বিলুপ্ত হইলে চারিদিকে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। এই ব্যবসায়ে লুনিপুণ মালাজি শ্রেণীর বহুলোক নিয়োজিত ছিল। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বহু গৃহস্থ এই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। এই সকল লোক বেকার হওয়ায় তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোন উপায় রহিল না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এই সকল জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালসার অনেকেই এজগৎ হইতে চিরবিদায় লইল। বাঙ্গালার লবণ শিল্পের এই নিদারুণ মৃত্যু এখনও অনেকেরই স্মৃতিপটে মুদ্রিত রহিয়াছে।

আজকাল বাঙ্গালার জন্য প্রতি বৎসর ১৪০ কোটি মণ লবণ কলিকাতার বন্দরে আমদানি করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ মণ লবণ এডেন হইতে ও বাকী ১ কোটি মণ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এডেন, লোহিত সাগরতীরবর্ত্তী বন্দর, জেদ্দিস্ট, স্পেন, চেলোয়ার (লিভারপুল), হামবুর্গ ও রুমানিয়া হইতে লবণ ভারতে আমদানি হইয়া থাকে। করাচী ও পশ্চিম উপকূলে যে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অতিশয় অল্প।

যে বাঙ্গালা দেশ একদিন শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নত ছিল, আজ তাহার অধিবাসীরা অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। আধুনিক শিক্ষায় বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা উন্নত হইয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধান করিতে অক্ষম প্রতিপন্ন হইতেছে। অবাঙ্গালীর তীব্র প্রতিযোগিতার আজ বাঙ্গালী সমস্ত ব্যবসায়ে ও শিল্পে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। স্বদেশীর যুগে ভারতের নব জাগরণ হইয়াছিল। এই জাগরণের ফলে যাহারা বাস্তবিক কিছু কাজ করিয়াছে আজ তাহারাই সৌভাগ্যবান। আজ বাঙ্গালার সমস্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য অবাঙ্গালী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। ইহা কি বাঙ্গালীর অক্ষমতার পরিচায়ক নহে? বাঙ্গালীকে আজ বস্ত্রাভাব মোচনের জন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। বাঙ্গালার কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য মাড়োয়ারীদের সাহায্য না লইলে উপায় নাই। এক কথায় ভারতে ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের পরেই পশ্চিমা ও ভাটিয়া-দিগের স্থান। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর মধ্যে যে ভীষণ বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে ইহার প্রতিকারের উপায় কি? বাঙ্গালার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে যে ইহার কিছুমাত্র সমাধান হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালার সকল স্বদেশানুরাগী ও উন্নতমনা ব্যবসায়ীদিগের সহানুভূতির অভাবই যে আজ বাঙ্গালার শিল্প-বিস্তারের প্রধান অন্তরায় তাহা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

আজ দশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি ডকেটীক কোম্পানী খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু দুই একটা ভিন্ন অন্যগুলি তাহাদের প্রাথমিক কার্য্যাদি মাত্র করিতেছে। ইহার কারণ কি? কোন বাঙ্গালীর সম্মুখে কোন ডকেটীক কোম্পানীর কাগজপত্র স্থাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অতীতের দুই একটা কোম্পানীর সহিত তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞের মত বলেন,—"ওসব কিছু না, আজ আছে কাল নাই।" এই যে দেশের প্রতি ও দশের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব, দেশ হইতে ইহা নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও কলঙ্ক আর কিছু নাই।

লবণ ব্যবসায়ে গভর্ণমেণ্টের যে সহানুভূতির কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরে যদি বাঙ্গালাদেশ এই কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশে অবাঙ্গালীরা আসিয়া যে সে ব্যবসায় হস্তগত করিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই ব্যবসায়ে মূলধনও প্রচুর প্রয়োজন। কাজেই এই ব্যবসায় করিতে হইলে ডকেটীক

কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে কোম্পানী গঠিত করিয়া বিশেষ দায়িত্বশীল লোকের দ্বারা উহা পরিচালনা করা উচিত, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে ইহা বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে তাহা সুনিশ্চিত। ভারত গভর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ে লবণ প্রস্তুতের যে অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। বোম্বাই ও করাচীর কারখানাগুলিকে সাহায্য করিলে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের এমন অমনোযোগের কারণ কি? সে যাহাই হউক, বাঙ্গালা তাহার নিজের প্রয়োজনীয় লবণ প্রস্তুত করিবে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা যখন তাহাদের নিজের লবণ প্রস্তুত করিতেছে তখন বাঙ্গালার কি পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা শোভা পায়?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়
(নন্দীঘনী—কলিকাতা)

বয়স্কশিক্ষা ও যুবশিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ গোবিন্দপুর (২৪ পরগণা)

শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি অক্ষরজ্ঞান। লিখন এবং পঠনে অভিজ্ঞ হইলেই আমরা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য দাবী করি। অন্য কোন কাজের উপযুক্ত নয় বলিয়াই বোধ হয় শৈশবকাল বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রশস্ত। কিন্তু লিখন পঠনে অভিজ্ঞতা ব্যতীত শিক্ষার ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে, এবং আমাদের কর্ত্তব্য লিখন ও পঠনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শিক্ষাকে সর্ব্বতোমুখী করা। এই গণ্ডী যখনই ছেদন করিব, তখনই দেখিব শিশু শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্ব রহিয়াছে "যুবশিক্ষায়"। এখন, কিরূপভাবে এই সমস্যার সমাধান হওয়া যায় তাহাই আলোচ্য।

কিন্তু এই আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে "শিক্ষা"শব্দের অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহার অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে, একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়,—শিক্ষার আবশ্যকতা কি?

জগতে স্বাধিকার-বোধ যত সহজে জন্মে, স্বাধিকার সংরক্ষণের জ্ঞান তত সহজে জন্মে না, অথচ স্বাধিকার-বিচ্যুতি জীবের মৃত্যুস্বরূপ। এক কথায়, জগতের ক্রমোন্নতির সহিত যদি সমান তালে চলিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া তাহা অধিকার করিতে হইবে এবং সেই অধিকার বজায় রাখিতে হইবে। এই অধিকার নির্ণয় ও তাহা বজায় রাখিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও ক্ষমতা যাহাদ্বারা লাভ করা যায় তাহার নাম শিক্ষা। লিখন পঠন তাহার সামান্য অংশ মাত্র।

যুবশিক্ষা সম্বন্ধে এযাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় নাই। স্থানে স্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও কিছুদিন পরে তাহার বিলোপ ঘটিয়াছে। এতদপেক্ষা বেশী কিছু আমি দেখি নাই বা শুনিতেও পাই নাই। অনেক নৈশ বিদ্যালয় শেষে যাত্রা-থিয়েটারের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকে যুবশিক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন।

কিন্তু এত শীঘ্র হতাশ না হইয়া বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। তৎপূর্ব্বে জানিতে হইবে, আমাদের নিরক্ষর যুবকেরা কেহ বেকার নয়। কোন না কোন কাজে তাহারা লিপ্ত আছেই। কিন্তু প্রশ্ন এই, লেখা-পড়া শিখিতে আগ্রহ নাই কেন? উত্তর এই যে, লিখন ও পঠনের যে প্রণালী তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করা হয়, বা যাহা অনুসরণ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়, তাহা একেবারে নীরস। তাহারা বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হইবার মত কিছুই দেখিতে পায় না। সেখানে এমন কোন ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি না যাহা তাহাদের সারাদিনের কঠোর শ্রম-জনিত গ্লানি ও অবসাদ দূর করিতে পারে, তাহাদের মনের উপর স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিতে পারে। সেই জন্য নৈশ

বিদ্যালয় স্থাপী হয় না। অথচ সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সারারাত্রি জাগিয়াও তাহারা যাত্রাথিয়েটারের পাঠ (পার্ট) মুখস্থ করে এবং তাহার মহলা দেয়।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া যুবশিক্ষা-সম্বন্ধে আমি কয়েকটিমাত্র কথা বলিতে চাই :—

১। শিক্ষা-প্রণালী চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে।

২। নিম্নলিখিত উপায়ে জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত করিতে হইবে :

(ক) ভদ্র ও উন্নত সমাজে মিশিবার সুযোগ দিয়া ;

(খ) দৈনিক উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ;

(গ) মানসিক ও সামাজিক হীনতা দূর হইতেছে অনুভব করাইয়া।

৩। নূতন নূতন জীবিকার সন্ধান দিতে হইবে।

৪। পারিপার্শ্বিক জগতের উপর দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দিতে হইবে।

৫। স্বকীয় পেশা অসৎ না হইলে কখনও হীন নয়, একথা উপলব্ধি করাইতে হইবে।

৬। অর্থনৈতিক শিক্ষার দ্বারা সকলকে সচেতন করিতে হইবে। উপরিউক্ত দফাগুলি সম্বন্ধে পর পর আলোচনা করিতেছি।

১। নিরক্ষর যুবকদিগকে নৈশ বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করিতে হইলে শিক্ষার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। ম্যাজিক লণ্ঠন, ধর্ম্মপুস্তক বা কোন সামরিক ঘটনা অবলম্বনে কথকতার অবতারণা করিয়া তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে হইবে। পরে সামান্য সামান্য নৈতিক শিক্ষা (যাহা সর্ব্বদা তাহাদের প্রয়োজনে লাগে) আরম্ভ করিয়া ক্রমে পুস্তকাদি নির্দ্দিষ্ট করিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

২। যুবকেরা যে কাজ করে এবং তাহাতে যাহা উপার্জ্জন করে তদপেক্ষা অধিক আয়ের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, অথচ সেই কাজ যেন তাহাদের কঠোর বলিয়া মনে না হয়। যে সমস্ত ভদ্র-সন্তান তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, সমাজে যেন তাঁহাদের সুনাম থাকে। তাঁহারা যেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন। আর যাহারা শিক্ষালাভের জন্য তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিবে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতা যেন তাঁহাদের থাকে। ছাত্রেরা যেন মনে করিতে পারে যে, শিক্ষাগুরুর আসিয়া তাহাদের সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতেছে, তাহারা আচারে ব্যবহারে, চরিত্রে, নৈতিক জীবনে, কার্য্যে ও চিন্তায় উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। তাহাদের অসভ্যতা, নীচতা, অশুচিতা দূর হইয়া দিন দিন তাহারা মার্জ্জিত হইতেছে, বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য সমাজে আসন পাইবার উপযুক্ত হইতেছে।

৩। তাহাদের বর্ত্তমান আয় বাড়াইবার উপায় দেখাইতে হইবে। এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু বলিয়া দেওয়া কঠিন। যদি ছাত্রগণ কৃষিজীবী হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে অক্ষরজ্ঞান দিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য হইতে অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অনেক স্থানে কৃষকেরা বার মাস কাজ করে না। সেখানে অবসর সময়ে তাহাদিগকে বিভিন্ন কাজে আকৃষ্ট করিতে হইবে। দেশের অভাব ও অভিযোগগুলি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং এমন সব আয়ের পথ দেখাইতে হইবে যাহাতে তাহারা সহজে লাভবান হইতে পারে। যেমন, সহজে পাটের দড়ি করা, দড়ি হইতে বস্তা, কাছি, শক্ত সুতোস্, থোলা, শিকা ; শণের দড়ি হইতে জাল ; কাপাস হইতে চরখায় সুতা, সুতা হইতে পরিধেয় বস্ত্র, জামার থান, গায়ের চাদর ; জামার থান হইতে সহজে গেঞ্জি, ফতুয়া, সিরজাই, কোট নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।

৪। আমাদের দেশের কৃষকেরা নিজ নিজ বাপ পিতামহের নিকট যেরূপ কৃষি শিক্ষা করে তদপেক্ষা বেশী কিছু শিখিতে চায় না। সন্ধান রাখিতে হইবে, নিকটে কোথাও উন্নততর প্রণালীতে চাষ আবাদ হইতেছে কিনা এবং তাহারা বেশী আয় করিতে পারিতেছে কিনা। তাহা হইলে সেই উন্নত কৃষি-প্রণালী যাহাতে তাহাদের আয়ত্ত হয়, সেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হয়ত কোন ফসল নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা কিছুদিন আগে বা পরে উৎপাদন করিতে পারিলে অধিক মূল্য পাওয়া যায়, সেগুলির সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে।

৫। অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই নিজ নিজ পেশা

হীন বলিয়া উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, জগতে মাত্র দুইটি পথ আছে, তাহা সৎ এবং অসৎ। যদি তাহাদের পেশা অসৎ না হয়, অর্থাৎ তাহারা যদি মিথ্যা বলিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়া বা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন না করে, তাহা হইলে তাহাদের পেশা যে হীন নয় বরং সম্মানের ও গৌরবের তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে তাহারা গাড়ীই হাকুক বা পাল্কীই বহুক।

৬। তাহাদের অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকগণ সঙ্কটাপন্ন নয়। এবার পাটের দর ৩৲ টাকা হওয়ায় যেমন তাহাদের দেখা দিয়াছে, গত ১৩৩৩ সনে ৩০৲ টাকা দর থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষে যেন তেমনি গ্রাস করিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের আপদ্ বিপদ্, দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য সঞ্চয় করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। একারণ অনেক পরিহারযোগ্য খরচ কমাইতে হইবে। ঋণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতে হইবে। আয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, যতই সামান্য হউক, ব্যয়ের পথ প্রসারিত করিতে হইবে। তাহারা পরিশ্রমী ও বটেই। তথাপি সুযোগ স্থাপন করিয়া পরে পরে বিবিধ কাজ করিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে। বহুক্ষণ এক রকমের কাজ করিতে দৈহিক অবসাদ যত না জন্মে, মানসিক অবসাদ জন্মে তদপেক্ষা অধিক। মাঝে মাঝে কাজের পরিবর্ত্তন হইলে, চিন্তা-ধারা পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ঘটিতে পারে না। অথচ আয়ের মাত্রা বাড়িয়া যায়। মধু, গাঁজা, তাড়ি পরিত্যাগ করিয়াও আয় বাড়াইতে পারে।

দেশের মধ্যে চাকরি পাইবার আগ্রহ অতিশয় প্রবল। কলকারখানায় চাকরি লইয়া অতি হীনভাবে জীবন-যাপন করিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য উপায়ে যত উপার্জ্জন হয় কলকারখানায় তদপেক্ষা বেশী হয় বলিয়া অন্য কাজ সম্মানার্হ হইলেও তাহা করিতে চায় না। তাহারা বুঝে না নিজের ব্যক্তিত্বকে হীন করিয়া পয়সা উপার্জ্জনে জীবনের সার্থকতা নাই। সহরে বা সহরতলীতে চাকরি ব্যতীত যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে সে কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। তা ছাড়া সহরে বা সহরতলীতে বসবাস অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য যুবশিক্ষার প্রথম স্থান নির্ণয় করিতে হইবে সুদূর পল্লীগ্রামে। সেখানে সর্ব্বসাধারণকে ভালবাসিয়া আপনার করিতে হইবে। বিপদে আপদে আশ্রয় ও উপদেশ দিয়া তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন হইতে হইবে।

জগতে অশনবসন-সমস্যার মীমাংসার জন্যই যত উদ্যোগ আয়োজন। এই জন্যই, বিশেষতঃ সংসারটাকে নিজের আয়ত্তে পরিচালিত করিবার জন্য, উপযুক্ত জ্ঞানের দরকার। আর সেই উপযুক্ত জ্ঞান বিদ্যালিক্ষার দ্বারা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞান প্রধানতঃ দুই প্রকার—সাংসারিক উন্নতিসাধক ও আত্মিক উৎকর্ষসাধক। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। সেজন্য বিদ্যালিক্ষার সোপান ছিল নিরক্ষরতা দূর করিয়া পুস্তকাদি হইতে নৈতিক জ্ঞানমূলক উপদেশ সংগ্রহ ও নৈতিক চরিত্র গঠন। তাই বিদ্যালিক্ষা বলিতে কৃষিবিদ্যা, বয়নবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, পশুপালন-বিদ্যা ইত্যাদি অর্থকরী বিদ্যা না বুঝিয়া আমরা নিরক্ষরতা সংহার বিদ্যাই বুঝিয়া আসিতেছি। ক্রমে ঘরে যখন ভাত ফুরাইয়া আসিয়াছে, কাপড় যখন বিলাতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তখন আমাদের নিরক্ষরতা-সংহারমূলক বিদ্যাটুকু যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন সেই ভাবে সৎ বা অসৎ পথে চালাইয়া ভাত কাপড়ের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া অধিক দিন বাঁচিতে পারা যায় না। সেজন্য বিদ্যালিক্ষার মধ্যে জ্ঞানযোগের পর্ব্ব উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মযোগের দীক্ষা গ্রহণ করিব। এবং তদনুযায়ী আমাদের শিক্ষার ধারা নির্ণয় করিব। ইহা হইতেই আমাদের যুবশিক্ষার সমস্যা সহজ হইয়া পড়িবে।

অবশ্য নিরক্ষরতা আগেই দূর করিয়া তার উপর যুব-শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু আজ-কালকার মত শত গণ্ডা পাঠ্য পুস্তকের কিছুই প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসিক পরিচয়, ভৌগোলিক সম্বন্ধ নির্ণয়, পদ্য ব্যয়, সন্ধি সমাসের বিচার ইত্যাদি ব্যবহারিক জীবনে অকেজো পদার্থগুলি নির্ম্মূল করিতে হইবে।

যুবকেরা সারাদিন মাঠে কাজ করিয়া রাত্রে নিজ নিজ পুত্র-কন্যার সহিত একযোগে শিশুর মত "অ, আ, ক, খ," মুখস্থ করিতে পারে না। সেজন্য বয়স্কতার মধ্য দিয়া তাহাদের বর্ণ-পরিচয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতঃপর অক্ষর-জ্ঞান অর্জ্জিত হইলে ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোলের প্রাথমিক আরম্ভ না করিয়া তাহাদের সাংসারিক জীবনের আবর্জ্জনা-গুলি নির্ব্বাসন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে—তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার, রোগশোক প্রতীকারের, অমিতাচারের শোষণ প্রতিরোধ করিবার, সত্য কথা বলিবার, ন্যায় কাজ করিতে সৎসাহস অর্জ্জন করিবার, আয় বৃদ্ধির উপায়জনক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পথেই আমাদের দেশের নিরক্ষরতা দূর হইবে এবং ক্রমশঃ দেশের সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করিলে প্রভূত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

যশোহরের চিঠি

শ্রীসুকুমার মিত্র, যশোহর

প্রায় এক বৎসর পরে যশোহরে আসিয়াছি। সহরের অবস্থার যে খুব একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ষা নামিয়াছিল বেশ প্রবলভাবেই, এখন যেমন প্রখর রৌদ্র তেমনই প্রচণ্ড গরম। চারি পাশে বন গজাইয়া উঠিয়াছে এবং মশারও উৎপাত যথেষ্ট। মিউনিসিপ্যালিটীর বন কাটিবার হুকুম থাকিলেও লোকে পারিয়া উঠে না। কারণ প্রথমতঃ ঐ সময় 'জন' বা 'মানুষ' পাওয়া কঠিন, সকলেই নিজ নিজ ক্ষেতের কাজে লাগিয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ বন কাটিলেও আবার গজাইয়া উঠে। আম কাঁটাল বা লিচু এবার হয় নাই বলিলেও চলে, চাষীরা হায় হায় করিতেছে। তাহাদের অবস্থা শোচনীয় বলিতে হইবে, কারণ তাহারা যে দু'পয়সার সংস্থান করিতে পারিত তাহাও হয় নাই। সহরে হাট বসে সপ্তাহে দুইদিন,—সোমবার ও শুক্রবার। বাজার রোজই বসে। দোকান-পাট যথেষ্টই আছে, তবে এবারকার দুর্ব্বৎসরে অবস্থা কাহারও সুবিধার নয়। বেচা-কেনা খুবই কম। হাটে লোক-সমাগমও পূর্ব্বের মত হয় না। এবারকার দুর্ব্বৎসরই ইহার একমাত্র কারণ নয়, যশোহর জেলার স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। যে সকল গ্রাম হইতে লোক আসিত তাহাদের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। এবারকার লোক-গণনার প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৯২১ সন অপেক্ষা ১৯৩১ সনে শতকরা প্রায় ৩ জন করিয়া লোক কমিয়া গিয়াছে। যশোহর জিলাকে এই শোচনীয় দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার কোন চেষ্টাই সরকার করিতেছেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সহরের লোক-সংখ্যা খুব সম্ভব কিছু বাড়িয়াছে। ১০ হাজার হইতে ১২ হাজারে উঠিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। গ্রীষ্মকালে ধূলা ও মোটরের উৎপাতে লোকের পক্ষে টেঁকাই দায় হইয়া উঠে। মিউনিসি-প্যালিটী অবশ্য এবার একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটা ভাড়াটে মোটর ট্রাকে জলের ট্যাঙ্ক বসাইয়া রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘণ্টায় ৫৲ হিসাবে ভাড়া। ট্যাক্সী ও মোটর বাস্ সহরে যথেষ্ট। সহর হইতে ঝিনাইদহ, নড়াইল, খাজুরা ও কেশবপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে মোটর লাইন গিয়াছে এবং এই সকল লাইনে ইহারা ভাড়া খাটে। বর্ষা শেষ কোম্পানীর দুইটী পেট্রল ষ্টল স্থাপিত হইয়াছে, একটী ষ্টেশনের নিকটে আর একটী থানার নিকটে। থানার নিকটেই মোটর ট্রাক। ষ্টেশনের নিকট একটী সিনেমা-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কিছুদিন চলিয়া ইহা বন্ধ হইয়া যায়। দিনে দুইবার

দেখানো হয়। একজন মুসলমান ও একজন মাড়োয়ারী যুবক ইহার প্রতিষ্ঠাতা।[১] যশোহরের বিখ্যাত চিরুণীর কারখানার কথা সকলেই জানেন। তবে দুঃখের বিষয় প্রবল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিদেশীয় প্রতিযোগিতার জন্য কোন বৎসরই কোম্পানীটী লাভ দেখাইতে পারে না। স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিজ উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় একটী নূতন চিরুণীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার কারখানার উৎপন্ন মাল বাজারে ভালই কাটিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। হৃষীকেশ অবৈত নিজের কর্তৃপক্ষ এখানে একজন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। সহরে অনেক নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। ফলে মিউনিসিপ্যালিটীর কিছু আয় বাড়িয়াছে। এই দুর্ভিক্ষসত্ত্বেও মিউনিসিপ্যালিটী পায়খানা-কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখানে ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস্ চলিতেছে ৪টী। এখানকার 'যশোহর লোন কোম্পানী লিমিটেড্' (১৮৭৮ সনে স্থাপিত) বাংলা দেশে যে কয়টী 'বাঘা বাঘা' লোন কোম্পানী আছে তাহাদের অন্যতম। কোম্পানীর ১৯২৯-৩০ সনের অর্থাৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হাতের কাছে রহিয়াছে। কোম্পানীর মূলধন ১,২০,০০০৲ টাকা। প্রত্যেক অংশ ১০৲ করিয়া ১২০০০ অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১০০,০০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। বাকী ২০,০০০৲ টাকার অংশ অনাবশ্যক বোধে বিক্রয় করা হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর লভ্য হইয়াছে ১২,৭০০৶১ পাই। রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইয়াছে (ঐ টাকা হইতে) ৬,৭০৪/০ পাই। ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে শতকরা ৬৲ হারে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর আমানত হইয়াছে সর্ব্বসুদ্ধ ৪৯,৮২,০৭০৲/১১ পাই। কোম্পানীর রিজার্ভ ফণ্ডে আছে সর্ব্বসুদ্ধ ৫,৪২,৮৩১৲/৩ পাই। কোম্পানীর জমিদারির আকার-প্রকার ক্রমশঃ বিপুলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। নিজ ভূমি ও দ্বারস্থ সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১২৩০৩৯৲। কোম্পানীর অধিকৃত বাটীর মূল্য হইতেছে ১০৩১০০৲। কোম্পানী ধারন করিয়াছে ৪৪ লক্ষ টাকার উপর, তন্মধ্যে প্রায় ৩৬০০০৲ টাকা আদায়ের অযোগ্য। এই কোম্পানীর পর হাতের সাম্নে পাইতেছি 'যশোহর ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড' নামক কোম্পানীর একত্রিশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। কোম্পানীর মূলধন প্রতি অংশ ৫৲ হিসাবে একলক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ২৫ হাজার টাকার অংশ রিজার্ভে আছে। বাকী ৭৫ হাজার টাকার অংশের মধ্যে ১৪৩৬২ অংশ বিক্রয় হইয়াছে এবং তাহার মূল্য ৭১৮১০৲ টাকার মধ্যে অনাদায় ২৪৫৲ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৭১৪৫৫৲ টাকা মূলধনভুক্ত হইয়া কার্য্য চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর মুনাফা হইয়াছে ৬৮২০৪, উহা হইতে রিজার্ভ ফণ্ডে রক্ষিত হইয়াছে ৩২৫০৲ টাকা। ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে শতকরা ৫৲ হারে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী আমানত পাইয়াছে সর্ব্বসুদ্ধ ৩১৫০৫৩।৬ পাই। রিজার্ভ ফণ্ডে আছে সর্ব্বসুদ্ধ ৮৮১৩২৸/৩ পাই। কোম্পানী ধারন করিয়াছে প্রায় ৭ লাখ টাকা। বেঙ্গল ষ্টাম্পড্ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় উপরোক্ত কোম্পানীটী বেশ একটু ধাক্কা খাইয়াছে। কারণ বেঙ্গল ষ্টাম্পড্ ব্যাঙ্কে উহার ১৭০০০৲ টাকা ছিল। তবে এ ধাক্কা সামলাইতে কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। যশোহর লোন কোম্পানীর ডিরেক্টার ১৫ জন। এই ১৫ জনই আইনব্যবসায়ী। যশোহর ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেডের ডিরেক্টার ২১ জন। এই ২১ জনের মধ্যে ১৭ জন আইনব্যবসায়ী। অবশিষ্ট ৪ জনের মধ্যে একজন ওভারসিয়ার, একজন সিভিল কোর্টের কর্ম্মচারী, একজন লোন কোম্পানীর বেতনভোগী সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং আর একজন কোর্ট অব ওয়ার্ডস্এর ম্যানেজার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। উল্লিখিত দুটী কোম্পানী ছাড়া আরও দুটী উল্লেখযোগ্য কোম্পানী আছে—সমবায় ব্যাঙ্ক ও যশোহর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক। কিন্তু ঐ দুইটী ব্যাঙ্কের কোন কার্য্য-বিবরণী হাতের কাছে

১ সম্প্রতি ইহা আবার বন্ধ হইয়াছে। যশোহরের মত সহরে দিনে দুইবার সিনেমা দেখানো কখনই সম্ভব নহে।

না থাকায় কিছু দেখা সম্ভব হইল না। সমবায় যাহা কয়েক বৎসর হইল তাহার ভাড়াটে বাড়ী হইতে নব-নির্মিত অট্টালিকায় উঠিয়া গিয়াছে।

মিউনিসিপাল নির্বাচন শেষ হইল, পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাই রহিলেন। মনোমালিন্যে কিছু অদল-বদল হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদী বার্ণার্ড শ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন্ কোন্ জিনিষ আগে কেনা দরকার ?

বর্ত্তমান সমাজে ধনসম্পত্তি সমানভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হয় না। কেউ বেশী পায়, কেউ কম পায়, কেউ পায়ই না। এতে বর্ত্তমান সমাজের ওপর কি ফল দেখা যাচ্ছে ?

কোন গৃহস্থের সংসারে যদি ছেলেদের খাবার বা পরবার অভাব থাকে, সেখানে সংসারের কর্ত্তাগৃহিণী যদি সেট, পাইডার, লিপ্‌স্টিক প্রভৃতিতে ও অন্যান্য আমোদ আহ্লাদে পয়সা ব্যয় করেন, তা হ'লে সেই কর্ত্তাগৃহিণীকে কেউ সু-কর্ত্তা বা সু-গৃহিণী ব'লবে না। সাংসারিক অভাব মেটাতে গেলে, যে অভাবগুলা বেশী দরকারী, সেগুলা আগে মিটিয়ে তবে ছোটখাটো অভাবগুলা মেটানো দরকার। সামাজিক জীবনেও তাই, আগে সাধারণ অভাবগুলা মেটাবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তারপর বিলাসিতা যোগানোর ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান সমাজে কিন্তু আয়ের পার্থক্য থাকার ফলে, যা হওয়া উচিত তার উল্টা ব্যবস্থাই চল্‌ছে। গরীব ও ধনী দুই শ্রেণীর লোকই প্রথমেই তাদের খাওয়া পরা থাকার জিনিষের জন্য টাকা খরচ করতে আরম্ভ করে। গরীবের টাকা কম, তাই সে খাওয়া পরা থাকার সাধারণ অভাবগুলাও মেটাতে পারে না। ধনীর টাকা বেশী, সে তার খাওয়া পরা থাকার সব অভাবই ভাল ক'রে মেটালেও তার হাতে অনেক টাকা থাকে। তাতে সে মোটর গাড়ী, নানা প্রকার বিলাসদ্রব্য অলঙ্কার, দামী কাপড়চোপড় ও আরাম ও খেয়ালের নানা ব্যাপারে টাকা চালতে পারে। সেই দিকে টাকা চালতে পারে ব'লে, সাধারণের আহার্য্য, কাপড়চোপড় ও ঘরবাড়ীর যথেষ্ট অভাব থাকলেও বিলাসিতার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মেটাবার জিনিষপত্র যোগাবার জন্য সমাজের শ্রম-শক্তি নিয়োজিত হয়। গরীবদের অভাব মেটাবার থাকলেও, তাদের টাকা দেবার ক্ষমতা নেই ব'লে তাদের অভাব মেটাবার জিনিষের দিকে সমাজের শ্রম ও উৎপাদন-শক্তি ছোটে না, অথবা যতটুকু তাদের হাতে দেবার ক্ষমতা কেবল ততটুকুই ছোটে।

দামী জিনিষ ভোগ করা বা তৈরী করা দোষের নয়, কিন্তু যেখানে সাধারণ অভাবগুলা মেটেনি সেখানে দামী খেয়াল মেটাবার বন্দোবস্ত নিতান্ত নিন্দনীয়। যেখানে শিশুদের ভাল দুধ জোটে না, সেখানে বড় লোকের প্রিয় কুকুরের সুখসুবিধার জন্য বিরাট বন্দোবস্ত সুনীতির পরিচায়ক নয়। অথচ বর্ত্তমান সমাজে এই ধরণের দৃশ্য চারিদিকে। এর কারণ কি ? আয়ের পার্থক্য। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের আয় অন্য শ্রেণীর লোকের চেয়ে কম না হ'লে, একের অভাব ভাল ক'রে মেটাবার আগেই অন্যের বিলাস যোগাবার আড়ম্বরপূর্ণ বন্দোবস্ত হ'তে পারতো না।

সুসন্তান জননে বাধা

আয়ের পার্থক্য থাকার দ্বিতীয় কুফল এই যে, এতে মানবজাতির বংশগত উন্নতির একটা বিরাট বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

জন্তু-জানোয়ারের বংশগত উন্নতি মানুষ ক'রতে আরম্ভ করেছে। কিরূপ পুং ও স্ত্রী জন্তুর মিলনে ঈপ্সিত প্রকারের

কম উৎপন্ন করা যায়, তা আজ মানুষের জ্ঞানের অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে।

সন্তান-সুপ্রজনন বিদ্যার অনেকটা উন্নতি হয়েছে বটে; কিন্তু, জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে যেমন, মানুষের ব্যাপারে সন্তান-সুপ্রজনন বিদ্যাটী খাটানো তেমন সোজা নয়। এর পথে বাধা অনেক:—(১) স্ত্রী ও পুরুষ জন্তুর মিলন করাবার সময়, কিরূপ পশু-পাখী আমরা চাই তার একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হয়; কিন্তু মানুষের সন্তান উৎপাদনের সময়, ঠিক কি কি গুণ-ওয়ালা সন্তান চাই তাহার ধারণা করা অনেক সময় শক্ত হ'য়ে ওঠে। কারণ, মানুষের সদ্‌গুণের বিচার বড় সোজা নয়; তাছাড়া, আমরা অনেক সময়ে যেগুলা দোষ মনে করি, সেগুলাই কালে উচ্চ শ্রেণীর গুণে পরিণত হয়; (২) বলা যেতে পারে যে, কদর্য স্ত্রী-পুরুষের মিলন যাতে না হয়, তার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে; কিন্তু এটাও সোজা নয়; কারণ, জগতে এমন বলে কমই আছে যার মধ্যে কোন না কোন দোষ বা খুঁত নেই; (৩) মানুষের একটা স্বাধীন সত্তা ও স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কোন একটী বিশেষ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে সমাজের মঙ্গলকর সন্তানের উদ্ভব হবে ব'লে তাদের মিলিত ক'রতে চাইলেই, তারা তাতে রাজী না-ও হ'তে পারে।

এই সব কারণে শ মনে করেন যে, যৌন-সম্মিলনে জোর জবরদস্তি ক'রে সুপ্রজনন-বিদ্যার নীতিগুলা খাটানো সম্ভব নয়। এইজন্য তিনি চান যে যৌন-নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা প্রচলিত হোক্। তাতে, তাঁর মতে, প্রকৃতি-দেবীই উপযুক্ত স্ত্রীর সঙ্গে উপযুক্ত পুরুষের মিলন ঘটিয়ে দেবেন, ও তার ফলে শ্রেষ্ঠ সন্তানের উদ্ভব হবে।

কেউ কেউ আশ্চর্য্য হ'য়ে হয়তো ভাববেন—এ আর নূতন কথা কি? আধুনিক সমাজে ঠিক তাই ত' হচ্ছে।

শ দেখাচ্ছেন যে আধুনিক সমাজে ঠিক এই অবাধ স্বাধীনতা জিনিষটী প্রচলিত নেই। যৌন-নির্বাচনের পথে একটা প্রধান বাধা হচ্ছে আয়ের পার্থক্য।

আধুনিক সমাজ আয়-ভেদে নানা স্তরে বিভক্ত। এক স্তরের স্ত্রী বা পুরুষ অন্য কোন স্তরের স্ত্রী বা পুরুষকে দেখে আকৃষ্ট হ'লে, তাকে পেলে তার জীবন সার্থক হবে বুঝলেও, তার ইচ্ছার পূরণ হওয়া সহজ নয়। কারণ আয়ের পার্থক্যের জন্য তাদের সামাজিক পদমর্য্যাদার পার্থক্য ঘটেই। আয়ের পার্থক্য থাকাতে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকগুলার আদবকায়দা ও আচার-ব্যবহারেরও পার্থক্য ঘটেই। এটাও যৌন-সম্মিলনের পথে আর এক বাধা। আয়ের-কারণের পার্থক্য থাকাতে উপযুক্ত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সহজ হয় না। তা ছাড়া, আয়ের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীভেদ হওয়াতে, প্রত্যেক শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষের নির্বাচন-ক্ষেত্রও অনেকটা সঙ্কুচিত হয়। কোন স্ত্রী বা পুরুষ যেরকম সঙ্গী বা সঙ্গিনী পেলে সন্তুষ্ট হ'তে পারতো, ঠিক তেমনটী পায় না, আর যাকে পায় তাকে নিয়েই কোনরকমে সন্তুষ্ট হ'তে চেষ্টা করে।

তা ছাড়া, আয়ের পার্থক্যের জন্য, বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সৃষ্টি হওয়ায়, লোকে অনেক সময়ে বিবাহের জন্যই বিবাহ করে না, বিবাহের সাহায্যে উচ্চতর পদমর্য্যাদা বা অধিকতর অর্থলাভের চেষ্টা করে।

এইসব কারণে, আয়ের পার্থক্য স্বাধীন যৌন নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, এবং তার ফলে সুসন্তান উৎপাদনেও বাধা দিচ্ছে।

আইন আদালত

আর্থিক অসাম্যের ফলে বর্ত্তমান সমাজের আদালতগুলায় সুবিচার হয় না। আর্থিক অসাম্যের প্রতি বার্ণার্ড শ'র এটী দ্বিতীয় অভিযোগ। এ কথাটা কতদূর সত্য?

আধুনিক আইন-কানুন ধনী-দরিদ্রের ভেদ মানে না, ধনীর জন্য এক আইন, আর দরিদ্রের জন্য আর এক আইন, এমন ব্যবস্থা তাতে নেই। একই আইনের আওতায় ধনী ও দরিদ্র উভয়েই বাস করে। তবু শ ঐ অভিযোগ কি ক'রে উপস্থিত করেন?

আইন সকলের জন্যই সমান বটে। কিন্তু আধুনিক আইন-কানুন অত্যন্ত জটিল। আদালতে যেতে গেলে, উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য না নিলে, নিজের বক্তব্য উপযুক্ত জোরের সঙ্গে বিচারকের কাছে পেশ করা অসম্ভব।

আর ভাল উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইতে গেলে পয়সা লাগে প্রচুর। এইজন্য ধনী গরীবের অধিকার মর্দিত করতে সাহস পায়। গরীব প্রতিবাদ ক'রলে বলে "আদালতে গিয়ে তুই আমার সঙ্গে লড়বি কোন সাহসে, আদালতে লড়তে গেলে পয়সা লাগে, আমার পয়সার জোর আছে, তোর নেই; সুতরাং, আদালতে গেলে তুই ভাল উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য পাবিনা, সেইজন্য তোর হারের সম্ভাবনা খুবই বেশী।"

দেওয়ানী মামলায় (বিবাহ আপদ, চুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কিত) না হয় এই কথা বলা চলে। ফৌজদারী মামলা সম্পর্কেও কি ঐ কথা বলা চলে?

ফৌজদারী মামলায় অপেক্ষাকৃত গুরুতরগুলা গভর্মেণ্ট কর্তৃক চালানো হয় বটে। কিন্তু তা হ'লেও পয়সা থাকাতে ধনীরা ভাল উকীল ব্যারিষ্টার দিতে পারে, সাক্ষীদের হাত ক'রতে পারে বা তাদের ভয় দেখাতে পারে, আর বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি ক'রতে পারে অথবা নানা মতলব খাটিয়ে বিচারে দেরী করিয়ে দিতে পারে। কাজেই ফৌজদারী মামলাতেও ধনীরা নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে।

আইন অনেক সময়ে ধনীদের দ্বারাই তৈরী হয়। সেই সব আইনের গোড়াতেই গলদ থাকা আশ্চর্য্য নয়। আজকাল পার্লামেণ্টের মেম্বাররা আইনে কম। তার ফলে গরীবরা পার্লামেণ্টে ঢুকে আইন তৈরী ক'রতে পারে বটে। কিন্তু এখনও বিলাতে গরীবের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে যেতে পারে না। কারণ, পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের সময় অনেক খরচ—অনেক সময়ে ৫০০ থেকে ১০০০ পাউণ্ড; পার্লামেণ্টে ঢুকলেও, ভবিষ্যতে সভ্য-গিরি থাকবে কিনা ঠিক নেই, সেইজন্য আয়ের স্থিরতা নেই, বার্দ্ধক্যে কোন পেনসানের বন্দোবস্ত নেই। এই সব কারণে, শ এর মতে, গরীবরা উপযুক্ত সংখ্যায় পার্লামেণ্টে ঢুকতে পারে না বা ঢোকে না। আর সেই সুযোগ নিয়ে ধনী সভ্যরা ধনীদের অধিকারগুলা যাতে বাড়ানো যায় বা অন্ততঃ বজায় রাখা যায় এমন সব আইন তৈরী করে।*

শ'র মতে ধনীদের সবচেয়ে মূল্যবান ও মানিকের অধিকার হচ্ছে—বিনা শাস্তিতে কুড়েমি করতে পারা। এই অধিকারটা তারা বহুযুগ ধ'রে এত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যে এটা যে উঠিয়ে দেওয়া যায় তা আমরা ভাবিই না। যেন সমাজে এটা চিরকালই থাকতে বাধ্য। শ মনে করেন যে, কুড়েমি চুরি করার চেয়েও পাপ। এক বছরে চুরি ডাকাতির ফলে মানুষের যতটা সর্ব্বনাশ হয়, কুড়েমি থেকে তাঁর মতে তার চেয়েও বেশী সর্ব্বনাশ হয়। অথচ, আমরা চুরি ডাকাতি বন্ধ করার চেষ্টা করি, কিন্তু কুড়েমি দমনের কোন চেষ্টাই করি না। কুড়েমি করাটাই যেন ভদ্রলোকের চিহ্ন। আর কাজ করাটা যেন ছোটলোকের নিদর্শন!

সভ্য সমাজে কুড়েমি দমন করার জন্য আইন থাকা দরকার। অথচ সেই আইন তৈরী হয় না কেন? কারণ, ধনীরাই কুড়েমি করেন, আর ধনীরাই আইন প্রণয়নের কর্ত্তা।

(ক্রমশঃ)

---

* বার্ণার্ড শ'র বইখানিতে অনেক একদেশ-দর্শী কথা আছে, এটা তার একটী নিদর্শন। পার্লামেণ্ট ধনীদের মঙ্গলের জন্য আইন করতে পারেন। কিন্তু গরীবদের ভাল'র জন্যও যে কুড়ি কুড়ি আইন করেছেন তা অস্বীকার করা যায় না।—লেখক।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধঋণ আদায় স্থগিত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভার জগতের অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া উহার প্রতীকারকল্পে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের যে সমর-ঋণ আছে, সেই টাকা এক্ষণে পরিশোধ না করিলেও চলিবে। মিঃ হুভারের এই ঔদার্য ও সাময়িকতাপূর্ণ ঘোষণা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইয়োরোপের প্রায় সমুদয় শক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঋণদায়ে আবদ্ধ। ইয়োরোপের বিভিন্ন শক্তির নিকট যুক্তরাষ্ট্র কত বেশী সাড়ে এগার শত কোটী ডলার পাইবে। এই বিপুল অর্থের সুবৃহৎ বিশাল।

আমেরিকার কাছে বর্তমানে ইয়োরোপের কোন্ গবর্ণমেণ্টের কত দেনা আছে, তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

গবর্ণমেণ্টসমূহ	ঋণের পরিমাণ
গ্রেট বৃটেন	৪৪২,৬০,০০,০০০ ডলার
ফ্রান্স	৩৮৬,৪০,০০,০০০ "
ইতালি	২০১,৭০,০০,০০০
বেলজিয়াম	৪,০৪,৭৩,০০০ "
পোল্যাণ্ড	২০,২১,৫৭,৭২৬
রুশিয়া	৩০,৩৩,২৯,৬১৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৭,০০,৭১,০২০ "
অষ্ট্রিয়া	২,৪০,৩৯,৭৭৩
গ্রীস	৩,১৯,৭০,০০০ "
রুমানিয়া	৬,৪৫,৬০,৫৩০ "
যুগোশ্লাভিয়া	৬,১৮,৫০,০০০
আর্মেনিয়া	১,৮৪,২১,১৪১ "

অন্যান্য ক্ষুদ্র শক্তিসমূহের ঋণের পরিমাণ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সমগ্র পৃথিবীর সর্বসুদ্ধ ১১৬০,৬৭,৮৬,৪০০ ডলার ঋণ আছে (এক ডলারের মূল্য বর্তমানে প্রায় ৩৲০ আনা)।

সমস্ত সভ্যজগৎ আর্থিক দুর্দশায় কবলে নিপতিত। জার্মাণির অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ নূতন টেক্স বসাইয়া জার্মাণিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন জার্মাণি আমেরিকার শরণাপন্ন হইয়াছে। সে যুদ্ধের ঋণ পরিশোধে নিজের অক্ষমতা জানাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুভার জার্মাণির আবেদন গ্রাহ্য করিয়া জানাইয়াছেন—ইয়োরোপের সমস্ত শক্তিগুলি ঋণশোধ বাবদে যুক্তরাষ্ট্রকে যে টাকা দিয়া থাকে তাহা এক বৎসর দিতে হইবে না।[১]

ভারত গবর্ণমেণ্টের কি লাভ হইবে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভার এক বৎসরের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দেনাপাওনা স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কথা আলোচনা করিয়া বৃটিশ রাজস্ব-সচিব পার্লামেণ্ট সভায় এক বিবৃতি প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, মিঃ হুভারের প্রস্তাবের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশ, ডোমিনিয়ন ও ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন যে, এই সমস্ত দেশের দেন-দেনও ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নলা হইতে যে সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট হুভারের প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে ১৯৩১ সনের ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের

---

১ ফ্রান্স সম্মত না হওয়ায় জার্মাণির সহিত সম্পর্কটা একটুআধরিবর্তিত করা হইয়াছে। আঃ উঃ সম্পাদক।

ঋণ, সমরঋণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের দেয় সুদ ও আসলের টাকা দেওয়া স্থগিত থাকিবে। পক্ষান্তরে ক্ষতিপূরণ বাবদ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য যে টাকা আছে, তাহাও এই এক বৎসর কাল পাওয়া যাইবে না।

১৯৩১ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে হিসাব করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেখিয়াছিলেন, যুদ্ধের ঋণ বাবদ তাহাকে আরও ১৬,৭২১,০০০ পাউণ্ড অর্থ দিতে হইবে।

১৯২৯-৩০ সন পর্য্যন্ত সমর ঋণ সম্পর্কে যে অর্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের দেয় হইয়াছিল, তাহা এইরূপ কিস্তিবন্দি করিয়া পরিশোধ করা হইতেছিল যে, ১৯৪৬-৪৭ সন পর্য্যন্ত বৎসরশুই শোধ হইয়া যাইত। কিন্তু আর্থিক অভাববশতঃ ১৯২৯-৩০ সনে এবং ১৯৩০-৩১ সনে এই কিস্তির টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে পারা যায় নাই। ১৯৩১-৩২ সনের বাজেটেও এই সমর-ঋণের কিস্তিরট াকা ধরা হয় নাই। কারণ অর্থাভাববেতু তাহা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না বলিয়া গোড়াতেই ইহা বাদ দিয়া রাখা হইয়াছে।

তবে সুদের টাকাটা অবশ্যই দিতে হয়। এই দরুণ প্রতি বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ৮,৩৩,০০০ পাউণ্ড না দিলে চলে না। এই টাকাটা আবার দুই কিস্তিতে শোধ দেওয়া হয়। ১৯৩১ সনের ১লা জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর স্থগিত থাকায় বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে ভারত সরকারের বাজেট হইতে ৪,১৮,০০০ পাউণ্ড বাদ পড়িবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আগামী বৎসরের বাজেট হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

প্রস্তাব অনুসারে ক্ষতিপূরণ বাবদ ভারতবর্ষে ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩২-৩৩ সনে যে অর্থ পাইবার কথা আছে, তাহাতে দেখা যায়, ভারতের ভাগে প্রতি বৎসর সঙ্কে ২,২৮,৩০০ পাউণ্ড পড়ে। এই টাকাটা মাসিক কিস্তি অনুসারে পাওয়া যায়। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ১৯৩১ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩২ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত—বর্ত্তমান বাজেটের এই নয় মাস কাল—উপরি উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই নয় মাসে মোট ১,৭২,০০০ পাউণ্ড এবং পরবর্ত্তী তিন মাসে (১৯৩২ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত) মোট ৫৭,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হইবে।

সুতরাং এই দেনা ও পাওনা কাটাকাটি করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এবারকার বাজেটে মোট ২,৪৬,০০০ এবং পরবর্ত্তী বাজেটে মোট ৩,৬১,০০০ পাউণ্ড লাভ করিবেন।

বৃটিশের কি লাভ হইবে

কমন্স সভার রক্ষণশীল দলপতি মিঃ বল্ডুইনের প্রশ্নের উত্তরে বৃটিশ রাজস্ব সচিব মিঃ গ্রেডেন বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী ব্যক্ত করিয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বান্তঃকরণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের মূলনীতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তদ্বিষয়ে নিম্নরূপ বিবৃতি প্রকাশ করেন।

"প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাবের কথা আমরা যত চিন্তা করি ততই আমাদের মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একটি অতি উদার ও মহৎ প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের গোড়ার কথা বিবেচনা করিয়া যদি ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ এই প্রস্তাব মানিয়া না লয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কারণ হইবে।

"তাড়াতাড়ি কাজ না করিলে এই প্রস্তাবের দ্বারা বহুত কোন ফল হইবে না। বিশেষভাবে জার্ম্মাণির কথা ভাবা উচিত। জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বিলম্ব হইলে এই প্রস্তাব দ্বারা তাহার উপকার নাও হইতে পারে।

"আমরা এবিষয়ে একমত যে, এখন আর আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন আহ্বান করিবার সময় নাই। এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। সুতরাং জার্ম্মাণির নিকট যাঁহাদের যে প্রাপ্য আছে, তাঁহারা যাহাতে এখন সেই টাকার জন্য তাগিদ না দিতে পারেন তাড়াতাড়ি তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

"এই অবস্থায় আমরা প্রস্তাব করি, পাওনাদার রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে অগৌণে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ককে এই সংবাদ দেওয়া উচিত যে, আপাততঃ এক বৎসরের জন্য যেন জার্ম্মাণির নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করা না হয়। অবশ্য

শেষ মীমাংসা আমাদের উপর নির্ভর করে না, তজ্জন্য অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লওয়া আবশ্যক। তথাপি আমরা আশা করি যে, শীঘ্রই এসম্পর্কে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইবে।

"প্রেসিডেণ্ট হুভার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, কেবল জার্ম্মাণিকে নহে, অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যেও যে সমস্ত দেনা-পাওনা আছে তাহাও এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অনেক রাষ্ট্র, উপনিবেশ ও ডোমিনিয়নের নিকট বৃটিশের অনেক টাকা পাওনা আছে। প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাব গৃহীত হইলে, ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের জন্য আর এই সমস্ত ঋণ আদায়ের চেষ্টা করা হইবে না। ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইবে এবং তাহাদের নিকট সহযোগিতা প্রার্থনা করা হইবে।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতবর্ষ এবং অনেক উপনিবেশ আছে। ঐ সমস্ত দেশকেও প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাব অনুযায়ী সুবিধা দেওয়া উচিত বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন।' ঐ সমস্ত দেশ ইচ্ছা করিলে ১লা জুলাই হইতে ১২ মাসকাল সময়-ঋণ সম্পর্কে তাহাদের দেয় কিস্তির টাকা নাও দিতে পারেন।

"এই প্রস্তাবের ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বাজেটে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইবে। বৃটিশ করদাতাগণের পক্ষে ইহা কম স্বার্থত্যাগ নহে। কারণ ইতঃপূর্ব্বেই তাহাদিগকে গুরুতর করভারে প্রপীড়িত করা হইয়াছে। তবে ভরসা এই যে, এই স্বার্থত্যাগ বিফল হইবে না। ইহার ফলে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভাব আসিবে এবং ঐশ্বর্য্য বাড়িবে।"

অতঃপর মিঃ বলডুইন ও মিঃ লয়েড জর্জ্জ যথাক্রমে রক্ষণশীলদল ও উদারনৈতিক দলের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবেই সমীচীন হইয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

"আর্থিক উন্নতি"র চৈত্র সংখ্যার ৮৭ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম 'শ্রীবিমলেন্দু বাগচী'র স্থলে 'শ্রীঅমলেন্দু বাগচী' হইবে।

৫৫ বি, বেনুয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীরঘুনাথ সীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩৫৮

আর্থিক উন্নতি

৬ষ্ঠ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাজয়ের বুদ্ধি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—চন্দ্র আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

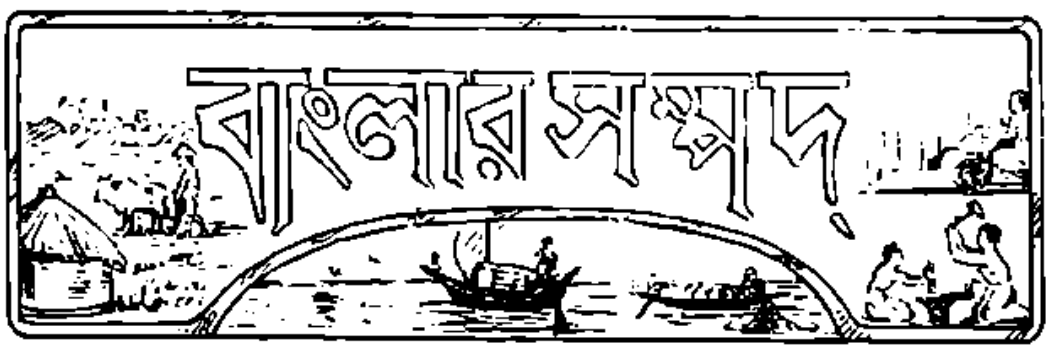

দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও মহামারী

দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও বিবিধ ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণ কিরূপে ধনে-প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন তাহার বৃত্তান্তই বর্ত্তমান আর্থিক বাংলার নিখুঁত চিত্র।

বিভিন্ন জিলার অধিবাসীদিগের আর্থিক দুরবস্থা কিরূপ চরমে উঠিয়াছে তাহা বুঝিবার পক্ষে নিম্নপ্রদত্ত বৃত্তান্তগুলি কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। *

রঙ্গপুর

(১)

কয়েকদিন ধরিয়া ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ার ফলে তিস্তকুমার, ধরলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জল ভয়ানক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং বন্যার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, উলিপুর, চিলমারী এবং রাজমারী থানার বহু গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে গরু, ছাগল প্রভৃতি ভাসিয়া যাইতেছে। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা দেখা যায় নাই। গাগলারপাড়, মাগুরারচিটা, সাজভিটা, ঘাগরারী, চাকলাপাড়া, ঠাকুরারচিটা, সারিষ্ণুরী, বাঙ্গালেরচিটা, ঘরিবেরকুটি, কাকনারপাড় প্রভৃতি গ্রামের লোকের মহা দুর্দ্দশা হইয়াছে। এইসকল গ্রামের এবং আরও হাজার হাজার গ্রামের গৃহস্থদিগকে ধান ভানিয়া খাইতে হয়। সমস্ত গ্রাম জলে ডুবিয়া যাওয়ায় কেহ ধান ভানিতে পারে না। চিড়াগুড়ি যাহা ঘরে ছিল তাহাতে গত ৮।১০ দিন চলিয়াছে ; কিন্তু অবিলম্বে সাহায্য না পাইলে লোক অনাহারে মরিবে। গরুবাছুরের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। একে দুর্ভিক্ষ তার উপর বন্যা এবং রোগের মাত্রাও বাড়িয়া চলিয়াছে। উত্তরবঙ্গে এবার যে কি ভয়ানক দৈব-বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

(২)

কুড়িগ্রাম মহকুমার পূর্ব্বাংশে খেওয়ার আলগা, কালির আলগা, পার্ব্বতীপুর, গোয়াইলপুরী, দুর্গাপুর, চিথলিয়া, আরাজী, পিপুলবাড়ী প্রভৃতি গ্রামসমূহ ব্রহ্মপুত্র, ধুবকুমার ও গঙ্গাধর নদের বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। গ্রামসমূহের অধিবাসীদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কেহ বা গৃহের চালে, কেহ বা মাচার উপর আশ্রয় লইয়াছে। কত গৃহ যে জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। গৃহপালিত পশু কতক ভাসিয়া গিয়াছে; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও খাদ্যাভাবে মরিতেছে। গরুবাছুরের জন্য একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত নাই। গৃহস্থের ঘরে অন্ন নাই। চারিদিকে হাহাকার। বন্যার জলের প্রবল প্রতাপ। এ দৃশ্য না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব।

(৩)

গাইবান্ধা মহকুমার অন্তর্গত তনপুর, কাশিনপুর, উদাবালী, ছালুয়া, কাতলামারী, ভিটাডাঙ্গা, গোবিন্দ, গজারিয়া, পটীয়া, চৌলাগিরা, রূপসপিয়া, জামিয়া প্রভৃতি প্রায় ২৭টী গ্রামের অধিকাংশ লোক কলাগাছের "ভুরায়" বাস করে। বহু ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, বহু গবাদি পশুপক্ষী মারা গিয়াছে। পানীয় ও খাদ্যের অভাব। ধান সবই পচিয়া গিয়াছে। পাটও গিয়াছে। দুইটী জীবন্ত লোককে নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। এর উপর ব্রহ্মপুত্র নদের খুব ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। কলেরার খুব প্রাদুর্ভাব। উদরাময়, জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাবল্যও আছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই রোগী। জল কমিবার আশা নাই, বরং সামান্য বৃদ্ধি পাইতেছে। গবাদি পশু মৃতপ্রায়। খাদ্যাভাব খুব বেশী। হাটবাজার হয় না। সর্ব্বত্রই নৌকা চলে। সর্ব্বোচ্চ স্থানের ঘরের মেজেতেও ১ ফুট ১৬ ফুট জল।

(৪)

শ্রীপুর, কামারজানি, হরিপুর, বোচাগাড়ী, ও চণ্ডীপুর ইউনিয়নগুলির লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। প্রত্যেকের ঘরের ভিতরে এক হাঁটু,—স্থানে স্থানে এক কোমর জল হইয়াছে। যাহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ঘরের ভিতরে একখানা চৌকির উপর আর একখানা চৌকি উঠাইয়া কোন প্রকারে সপরিবারে দিনের পর দিন গণনা করিতেছেন। যাহাদের চৌকি নাই, তাহাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাহারা স্ত্রী পরিবার ছেলেমেয়ে সহ দিবারাত্রি এক কোমর বা এক হাঁটু জলের ভিতর অনাহারে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কেহ বাঁশের মাচা পাতিয়া তাহার উপর ছেলেমেয়ে ও সামান্য তৈজসপত্রাদি লইয়া বসিয়া আছে। আউশ ধান—যাহা বর্ষার পূর্ব্বে কাটিয়া আনা হইয়াছিল—প্রত্যেকের আঙ্গিনায় স্তূপাকারে অবস্থিত ছিল। প্রবল বর্ষার জলে তাহা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তৃণাভাবে গরুবাছুর চীৎকার করিতেছে। আউশ ধানের যে অংশ কাটা হয় নাই তাহা হঠাৎ বর্ষার জল আসিয়া ডুবাইয়া দিয়াছে।

(রঙ্গপুর দর্পণ)

বগুড়া

বগুড়া জিলার শিবগঞ্জ থানার অধীন নাকিগঞ্জ, বুড়িগঞ্জ, পীরপ ইউনিয়নে, বগুড়া সদর থানার নামুজা ইউনিয়ন বোর্ডের কতক অংশে ও কাহালু থানার পাইকড় ইউনিয়ন বোর্ডের কতিপয় গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। লোকে অন্নাভাবে যা-তা খাইয়া নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। ঔষধ অভাবে অনেক লোক মারা যাইতেছে। তাহারা থাল, ঘটী, বাটী, এলুমিনিয়ম, গরু বাছুর, সমস্ত বিক্রয় করিয়া এপর্য্যন্ত চালাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ছাতুয়া, খেটনী, ভাড়াহার ও নামুজা গ্রামে ৪টী লোক না খাইতে পাইয়া ও ছেলেমেয়ের করুণ চীৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল।

এরূপ শ্রাবণ মাস—এতদঞ্চলে ধান্য-রোপণের সময়। কিন্তু কৃষকেরা খাইতে না পাইয়া জমিতে কোনরূপ কাজ করিতে পারিতেছে না। একে পেটের চিন্তা, তাহাতে আবার ভীষণ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। অনেক জমি চাষ অভাবে পড়িয়া আছে।

(২)

এই অঞ্চলে বৎসরে মাত্র একবার ফসল (আমন ধান্য) হয়। তাহাও গত দুই বৎসর যাবৎ মারা গিয়াছে। এবার সামান্য সামান্য যাহা চাষ হইয়াছিল তাহাও জলে ডুবিয়া গিয়াছে। লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। কোনও কোনও স্থানের মেয়েরা তিন চারি দিন না খাইয়া শুইয়া আছে। কেহ কেহ পুত্রসন্তানদিগকে বিলাইয়া দিয়াছে। কেহ বা অনাহার অবস্থায় ভিক্ষা করিতে যাইয়া রাস্তায় পড়িয়া মারা গিয়াছে। ইহাদের এখনও তিন মাস সাহায্যের প্রয়োজন। ইহারা তিন মাস সাহায্য পাইলে তবে আমন ধান্য পাইবে। ইহা ছাড়া হিলি, ঘোড়াঘাট, সোনাদহী, জয়পুরহাট ইত্যাদি স্থানে সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ ভয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

বগুড়ার পূর্ব্বাংশে হঠাৎ বন্যা আসিয়া তথাকার বাড়ীঘর ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে। নদী, গ্রাম ও মাঠঘাট চিনিবার উপায় নাই। সর্ব্ব স্থান জলে জলময়।

(৩)

পূর্ব্ববগুড়ার বন্যাপ্লাবিত স্থানের দৃশ্য দেখিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মাঠে শস্যের লেশমাত্র নাই। কেবল অনন্ত গভীর জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। বাড়ীগুলিতে এতই জল হইয়াছে যে, অনেকের ঘরের চাল পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করিয়াছে। অধিবাসীরা কেহ বাঁশের মাচায়, কেহ কলাগাছের ভেলার উপর, কেহ বা নৌকার উপর অবস্থান করিতেছে। অনেক গরুবাছুর হাঁস মুরগী ভাসিয়া গিয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে গরুগুলি ঘরের মেঝের উপর জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু গরুগুলির মুখে বহু চেষ্টা করিয়াও গৃহস্থেরা কোন প্রকারে তৃণ দিতে পারিতেছে না। শতকরা ৯০ জন লোক দিনের পর দিন না খাইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অনেক স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে না পারিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান মিলিতেছে না। কেহ বা মা-তঙ্গিনীর অন্বেষণ করিতে না পারিয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সাপের ভয়ে এবং ভাসিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় টিনের ছাপরার উপর উঠিয়া বসিয়া আছে। অনশনে থাকিয়া বন্যা ও বৃষ্টির জলে ভিজিয়া অনেকেই মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। শতকরা ৯০ জনেরই বস্ত্রাভাব। অনেক স্ত্রীলোক ছেঁড়াকাঁথা পরিয়া কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। (বঙ্গবাণী)

(৪)

পাবিধাকান্দি থানার ভীষণভাবে কলেরার প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় একশত গ্রামে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শবদেহগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়ায় সংক্রামক রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

১৪টি গ্রামে মোট ২৬১ জন লোকের কলেরা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫৬ জন মারা গিয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই।

বন্যার জল নামিবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দশা বাড়িতেছে। জলে দুর্গন্ধ; পরিষ্কৃত জল পাওয়া যায় না; জ্বালানি কাঠের অভাবে জল সিদ্ধ করাও সম্ভব নহে। খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে সকলে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে। কচু, কলার থোড় ও পাটের পচা পাতা খাইয়া অনেকে প্রাণরক্ষা করিতেছে। আউশ ধান একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমন ধানের যে ফলিবে সেরূপ আশা নাই। বীজ পাওয়া যাইতেছে না; কংগ্রেসের ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে। দুর্দ্দশাগ্রস্তগণের মধ্যে মাত্র শতকরা দশ জনকে সাহায্য করা সম্ভব হইয়াছে।

(ফ্রি প্রেস)

পাবনা

পাবনা জেলার মধ্যে সিরাজগঞ্জই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে বেশী। নদীর ভাঙ্গনের বেড়া ও সাঁথিয়া থানার অবস্থাও হৃদয়বিদারক। বিশেষ করিয়া বিলের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির অবস্থা বর্ণনাতীত। কেমন করিয়া যে এখানকার লোক এতদিন বাঁচিয়া আছে এবং ভবিষ্যতেই বা কেমন করিয়া বাঁচিবে তাহা চিন্তা করা যায় না।

তাহেরা বাসমারা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সাঁপিয়া খালের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু সীমাহীন জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর শ্রাবণ ধানের পাতায় ঢাকা থাকিত, এবার ধানের চিহ্নমাত্র নাই। বহু গৃহে অর্দ্ধচর্ব্বণার গরুগুলি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, জল ছাড়া আর কোন খাদ্য তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। কলমী চাপের নাল প্রভৃতি যাহা বহু নরনারী কুড়াইয়া আনিতেছে। ঘরগুলি ভাসিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তার চিহ্নমাত্র নাই। গৃহস্থ পুত্র যাবার বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে।

(সুরাজ—পাবনা)

ঢাকা

)

ঢাকা সদর মহকুমার কাসিয়াইকের থানার অধীন সাভারপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জাঙ্গালিয়াবাড়ী, বাধনাবহ, বয়রাবহ, চন্দনটেকী, মহুবাড়িয়া, চাঙ্গাবহ, গোদাত্রা, কাঞ্চনপুর, মাধালিয়া, কাদাবিয়া, চন্দ্রীতলা, বেতপবাড়ী, বেতুপুর, উঁচিটাপাড়া, আশাপুর, দেওয়ানজী, বাসবাড়ী, আটাহর, বংশীরাদি প্রভৃতি গ্রামসমূহে অতর্কিত প্রবল প্লাবনে অধিকাংশ লোকের বাড়ীঘর ডুবিয়া যাওয়ায় লোকের ভীষণ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে গৃহস্থ ও কৃষকগণের প্রকাণ্ড ঘরগুলি জলমুখে পতিত হইতেছে। নিরুপায় বাড়ীগুলির গৃহস্বগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া গৃহহীন, আশ্রয়হীন হইয়া বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। গৃহের তৈজসপত্র ভাসিয়া যাইতেছে; গৃহপালিত পশুগুলি কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। অন্যদিকে আশ্রয়হীন পিতামাতার হাহাকার, বালকবালিকাগণের অশ্রুসিক্ত ক্রন্দন এক ভীষণ শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীতে গভীর জল প্রবেশ করায় ও আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে বহু লোক অনাহারে দিনাতিপাত করিতেছে। সপ্তাহব্যাপী জলমগ্ন অঞ্চলের লোকসমূহ মরিয়া হইয়া এই ভীষণ বন্যার সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতেছে; কিন্তু এই ৭।৮ দিনের মধ্যে দুরবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হইতেছে না। একে দেশের এই ভীষণ অর্থসঙ্কটে দেশবাসী হাহাকার করিতেছিল, তদুপরি এই ভীষণ প্লাবনের তাড়নায় সকলেই এখন মনে প্রাণে মরিতে বসিয়াছে।

(২)

মানিকগঞ্জ সবডিভিশনের দ্বিগ্বর থানা ও বালিয়াখোড়া ইউনিয়নের অধীন গ্রামসমূহ বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। তাহাতে লোক এমন বিপদগ্রস্ত হইয়াছে যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামগুলি যেন জলের উপর ভাসিতেছে। প্রত্যেক বাড়ীই জলপূর্ণ, কোন বাড়ীতে কোমর জল, কোন বাড়ীতে বুকজল। গরুগুলি সব মাচার উপর মাথাজলে দাঁড়াইয়া আছে। লোকের রান্না করিয়া খাওয়ার যোগাড় নাই। কেহ রান্না করিয়া খাইতেছে দিনান্তে এক বার। অধিকাংশ লোকই অনাহারে দিন কাটাইতেছে। সবাই হাহাকার করিতেছে। একে ত লোক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, তাহার উপর আবার বন্যার কষ্ট। মাঠের বৈষয়িক ধানের অবস্থা দেখিয়া লোক দিনান্তে এক বার খাইয়াও শান্তিতে ছিল। কিন্তু ধানের মাঠ সব ডুবিয়া যাওয়াতে সবাই অস্থির হইয়া হায় হায় করিয়া রোদন করিতেছে।

(৩)

অত্যধিক জলবৃদ্ধি হওয়ায় বিক্রমপুর অঞ্চলে অনেকের বাড়ী জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গ্রামের ঘরের কাঁচা ভিটি গলিয়া পড়িয়াছে, পাকের ঘর ডুবিয়া গিয়াছে, ধান তুলিবার স্থান নাই। পন্থানদী লোকের এই দারুণ কষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া লোকের বাড়ী ঘর, দোকান পাট ভাঙ্গিয়া দিতেছে। ঘর করার জিনিষ পত্র রাখিবার স্থান কেহ পাইতেছে না। এই দুর্দ্দিনে কেহই কাহাকেও স্থান দিতে পারে না। নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা মাচা করিয়া অবস্থান করিতেছে। মাচাগুলিও মধ্যে মধ্যে জলে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। এই অর্থাভাবের দিনে লোকের এই অবস্থা বড়ই অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধানকুনিয়া বাটের ও ভূঁইকায় বাজারের বড় দোকানগুলির মালিকেরা স্থানান্তরে

বন্ধ করিবার সুবিধা না পাইয়া দোকানপাট উঠাইয়া চলিয়া যাইতেছে। লোকে স্থানে স্থানে কচুরীর স্তূপ করিয়া তাহার উপর গরুবাছুর রাখিতেছে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

ফরিদপুর

(১)

ফরিদপুরের কাটী থানা আজ বন্যার প্লাবনে বিধ্বস্ত। গোয়ালন্দ, সদর, চর ভদ্রাসন, সদরপুর, রাজবাড়ী, নগরকান্দা ভাঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত থানার অবস্থাই একপ্রকার। ফরিদপুর সহরের অবস্থাও শোচনীয়। সমস্ত রাস্তার উপর দিয়া ভীষণভাবে স্রোত বহিতেছে, এমন কি যে বগোহর রোডের উপর দিয়া কেহ কখনও জল যাইতে দেখে নাই, আজ সে রাস্তার উপর দিয়াও স্রোত বহিতেছে। সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ। বাজার জলের উপর ভাসিতেছে। ১০ ভাগের একভাগ লোকও বাজারে আসে না। কিনিবার মূল্য অত্যন্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রামসমূহের অবস্থা শোচনীয়। দুর্গাপুর বায়খোলা, চরকুকপুর, মাধবদিয়ার চর, বিল দামুদপুর, লক্ষ্মীপুর, টেপাখোলার চর, ভাটি লক্ষ্মীপুর, পাঁচচর প্রভৃতি বহু গ্রামের লোকের ও গরু বাছুরের অবস্থা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। কাহারও কাহারও ঘরের মধ্যে বুক জল—মাচা করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে। গরু বাছুর মাজা জলের মধ্যে আজ ১৫ দিন দাঁড়াইয়া আছে। অনেক গরু মরিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলি মরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত স্থানের এমন একখানা বাড়ীও নাই যাহার ঘরের ভিটি জাগিয়া আছে। অনেক লোকে ঘরে ধান থাকিতেও চাউল প্রস্তুত করার অসুবিধার জন্য উপবাস করিতেছে।

(২)

বন্যার বিপুল ধ্বংসলীলা ফরিদপুর জিলার প্রায় প্রতি স্থানেই অত্যন্ত ভীষণভাবে প্রকট হইয়াছে। রেলগাইন হইতে নামিয়া রাজবাড়ী ষ্টেশন হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল মহাপ্রলয়ের কথাই মনে পড়ে। শুধু জল আর জল! রেল লাইনের দুইদিকের গ্রামগুলি কি নিষ্ঠুর হইয়াই জলে ডুবিয়া আছে! কোন গৃহের বেড়া নাই। গৃহের ভিটি ধুইয়া গিয়াছে, গরু মানুষ দুই মরিতেছে। অনাহার, মৃত্যু, লজ্জা নিবারণের অবাবস্থা আজ ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী নটাখোলা চর, পালদা চর প্রভৃতি স্থানের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুর ঘাত করিতেছে। ভবানীপুর ভবদীয়া, সাবার, তেলীনগর প্রভৃতি স্থানের বহু নরনারী ২ ও দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিবার পর গোয়ালন্দ মিলিক কমিটী হইতে সামান্য প্রাথমিক সাহায্য পাইয়াছে। এই হইল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ফরিদপুরের আংশিক চিত্র। ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর প্রভৃতি মহকুমা হইতেও বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের দুঃখবিধায়ক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

(আনন্দবাজার)

ময়মনসিংহ

(১)

জামালপুর মহকুমার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। শতকরা নব্বই ভাগ আউশ ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাটও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ভীষণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। লোক-জনের বাড়ীঘর আসবাবপত্র ইত্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়লাভ করিবার স্থান নাই। অনেক স্থানে বাড়ীঘরের ভিতর এক বুক পর্য্যন্ত জল। গরু, মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর অবস্থা শোচনীয়। খাদ্যের অভাবে অনেক পশু মরিতেছে।

এবৎসর সময়মত বৃষ্টি হওয়ায় আউশ ধান প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এবার অন্নকষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে। কিন্তু অসময়ে বন্যা হওয়ায় লোকের বাঁচিবার আশা অন্তর্হিত হইয়াছে।

(২)

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বেজকোণা মহকুমার বিগত কয়েক মাস ব্যাপিয়া যে ভীষণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের কল্যাণে সকলেই অবগত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে বন্যার প্রকোপে সমগ্র দেশ জলমগ্ন হওয়ায় আউশ ধান প্রায় শতকরা অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। আমন ধানের অবস্থাও তদনুরূপ নিরাশাজনক। কারণ জল শীঘ্র কমিয়া যাইবে এরূপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। অর্দ্ধাভাবে অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ খাদ্যাভাবে উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছে। তদুপরি বন্যার প্রকোপে বহু গ্রামবাসী গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের দুর্দ্দশা সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মহকুমার অভ্যন্তর হইতে প্রত্যহই জনবিধ্বংসক লোমহর্ষণ কাহিনী শুনা যাইতেছে। প্রকৃতিদেবীর নির্ম্মম পীড়নে গৃহহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন জনসমূহের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

বন্যার প্রকোপে বহুবিধ দারুণ ও জটিল ব্যাধি ব্যাপক-ভাবে দেখা দিয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারীর করাল গ্রাসে দেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

(মৈমনসিংহ সমাচার)

কুমিল্লা

এই জিলার চতুর্দ্দিক হইতে বন্যার ভয়াবহ সংবাদ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অবস্থা অতীব শোচনীয়; দুর্ভিক্ষ অতি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে। নাশিরনগর থানার এলাকার অনেক বাড়ী ঘর বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এরূপ ভীষণ বন্যা শীঘ্র কেহ দেখে নাই। বন্যার জল কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, বরং বৃদ্ধি পাইতেছে। আলিম কষ্টে লোকজন কোন প্রকারে দিনপাত করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ বন্যা হওয়ায় লোকের কষ্টের আর অবধি নাই। উত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এখনও জলে মগ্ন। গৃহপালিত পশু রক্ষা করা দুরূহ হইয়াছে। আউশ ধান পাকিবার অবস্থায় জলে ডুবিয়া যাওয়ায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমন ধানের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে; অনেক স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুড়িঘর, নাটঘর, মুরাদনগর, বোয়ালী, নাশিরনগর, বড়খোলা প্রভৃতি গ্রামের লোকজন কয়েকদিন যাবৎ অনাহারে দিনপাত করিতেছে। গ্রামবাসিগণের যে কি শোচনীয় অবস্থা তাহা প্রকাশ করা যায় না। চারিদিকে জল ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। (বঙ্গবাণী)

চাকেশ্বরী কটন মিল

"দি চাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্" পূর্ব্ব বাংলার আদরের ও গৌরবের জিনিষ। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রথম কটন মিল। পূর্ব্ববঙ্গ যদিও নদীমাতৃক বলিয়া ব্যবসায়-কেন্দ্র হইবার যোগ্য, যদিও বহু ধনী ও ব্যবসায়ীর বাসস্থান এই পূর্ব্ববঙ্গে; তথাপি একটি প্রথম শ্রেণীর কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করার মত শক্তিসামর্থ্য ও উৎসাহ লইয়া ইতিপূর্ব্বে কেহ কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন নাই। চাকেশ্বরী মিল যখন স্থাপিত হয়, তখন হইতেই আমরা অতি আগ্রহে এবং কতকটা ভয়ে ভয়ে এই মিলের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কারণ এই একটি মিল সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, পূর্ব্ববঙ্গে আরো ছোট বড় মিল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; কিন্তু এই প্রথম মিলটি সাফল্য লাভ না করিলে, পূর্ব্ববঙ্গে আর কটন মিল স্থাপন করিয়া দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু চাকেশ্বরী কটন মিলের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ ও অন্যান্য পরিচালকবর্গ তাঁহাদের পরিশ্রম, ব্যবস্থা ও ব্যবসায়বুদ্ধির বলে পূর্ব্ববঙ্গের এই অতিপ্রিয় মিলটিকে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন।

১৯৩০ সনের হিসাবপত্রে দেখা যায়, এই মিলে মোট ২১,২৪৪টি টাকু ও ৪৯৬টি তাঁত চলিতেছে। দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০০০ হাজার জোড়া ধুতি ও শাড়ী এবং ৫০ খান লঙ্‌ক্লথ, টুইল ও জামার ছিট প্রস্তুত হইতেছে।

চাকেশ্বরী মিলের কাপড়ের দাম প্রতি জোড়ায় ৯০ হইতে ৸৵০ আনা পর্য্যন্ত কমানো হইয়াছে। দেশের বাজার খুবই মন্দা এবং তুলার দরও অনিশ্চিত এবং আশানুরূপ কমে নাই। তথাপি চাকেশ্বরীর কাপড় দেশবাসীর প্রিয় হওয়ায় যথেষ্ট কাপড় বিক্রয় হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে মোট ৪,২২,৮৩৩/১০ পাই লাভ হইয়াছে।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ভূম্যধিকারীর অর্থ

বঙ্গদেশের নূতন প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে গত ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভূস্বামীর প্রাপ্য কি খাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট ৮৩৪৮২০৭ টাকা মজুত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ভূম্যধিকারীরা ৪৬০১৪৭১ টাকা লইয়াছেন এবং ৩৭,৪০,৭৩২ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা আছে। ঐ টাকার জিলা অনুযায়ী হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় প্রভাসচন্দ্র মিত্র এই তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

জেলা	টাকার পরিমাণ
বাগরগঞ্জ	২,৪০,১৭০৬/৯ পাই
বাঁকুড়া	১৪৮৪০১৬/১১ ,,
বীরভূম	১০৫১৭৩৬১ ,,
বগুড়া	১০৬৭৬১৪১ ,,
বর্দ্ধমান	১১৭১২৩৮ ,,
চট্টগ্রাম	৮৬৬১৭৬/৯ ,,
ঢাকা	৫১৮৪৭৬৬/৯ ,,
দিনাজপুর	১৭২৯০৮/৭ ,,
ফরিদপুর	২২৭০৫০/১০ ,,
হুগলী	৫৩০০৬১০ ,,
হাবড়া	১০৮১৫৪/২ ,,
জলপাইগুড়ী	২৪৭২৮৵৬ ,,
যশোহর	৪১৯১৩৬/৭ ,,
খুলনা	২৬৯০১৬/৯ ,,
মালদহ	৬৬৩২৩৵০ ,,
মেদিনীপুর	৩০৬৭১৪,৬ ,,
মুর্শিদাবাদ	৫০৫৪৭৬৵১ ,,
নয়মনসিংহ	৪২৫৪৯১৪১১ ,,
নদীয়া	৯৫৯৩৭৮/৫ ,,
নোয়াখালী	৫৪২৯০৬/১০ ,,
পাবনা	২৫৭২৮০৬/৩ ,,
রাজসাহী	১৮৯৯১৩৬/৭ ,,
রঙ্গপুর	১১২২৮০৫৬ ,,
ত্রিপুরা	১৮৫৬১২৬/১ ,,
২৪ পরগণা	১৮৩৮০৫৩ ,,
মোট	৩১,৪০,৭৩২৷৵৫ পাই

(স্বাধীনী)

কাঁথি অঞ্চলে তুলার চাষ

তুলার চাষ ও চরকা প্রচলনের প্রতি দেশের লোকের আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবার এতদঞ্চলের সর্ব্বত্রই কিছু কিছু করিয়া তুলার চাষ হইয়াছে। লোকদিগকে তুলার চাষে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে সকলকে তুলার বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল, উহার ফলে প্রায় প্রতি গ্রামে কিছু না কিছু তুলার চাষ হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই তুলার গাছগুলি যেরূপ সুপুষ্ট রূপে জন্মিয়াছে, তাহাতে এবার এতদঞ্চলে অনেক পরিমাণে তুলা জন্মিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বাড়ীর তুলার চরকাকাটা সুতায় দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লইলে যত সস্তায় যেরূপ মজবুত ও টেঁকসহি কাপড় পাওয়া যায় এমন আর কিছুতেই হয় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান দারুণ অর্থ-সঙ্কটের দিনে দেশবাসী ঐ প্রকার স্বাবলম্বন দ্বারা নিজেদের বস্ত্রাভাব নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলে দেশের অর্থ-সমস্যার অনেক পরিমাণে সমাধান হইতে পারে। (নীহার—কাঁথি)

বাংলার কথা—তথ্যসঙ্কলন

মালদহ

মালদহ জেলার পরিমাণফল ১২,১৬,৬৪০ একর। সহরের সংখ্যা ৩ এবং গ্রামের সংখ্যা ২,২৩৬। মোট কর্ষিত জমি (১৯১৪ সনের হিসাবানুসারে) ৪,৬৯,৮০০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ১ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৬·১ ইঞ্চি। গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ২,২৬,৫৩১। ষাঁড় বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,৮৬,০৭৮। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,১২,১৭০।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭৭,০৮,৮৭৫ মণ। ১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১৮,৬৩,২১০ মণ।

১৯২১ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৪,০০,৫২০ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৫,০৭,৬৮৫।

প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৫৩৮।

শত করা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

মোট হিন্দুর	
মুসলমানের	
হিন্দু পুরুষের	
মুসলমান ,,	
হিন্দু মেয়ের	
মুসলমান ,,	

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৪৪। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১৬,৮১২। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ২,৬১,৫৬১। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক—১৯২৫ সনে) ২৩,২২৬। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ২,৩৮,১৩৭।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৫·৮। হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৭·১ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৫·০।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫	২৮,৪৭৮
	১৯২২	১৫,২৪৪
	১৯১৫	৫,১০২
	১৯২২	১৪১
	১৯১২	১০১
	১৯২২	৭৬

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু	
স্ত্রী	

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	
কুষ্ঠরোগী	
অন্ধ	
হিন্দু বিধবা	
মুসলমান ,,	

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	৪,৩৯,৭০৭৲
ষ্ট্যাম্প	২,৭০,৫৬২৲
আবকারি	২৯,৮১২৲
আবগারী	২,৪৬,৭০১৲
আফিং	৭২,৫১৮৲
বিবিধ	২৪,৬৩৫৲
পথকর ও পাব্‌লিক সেস্	১,১৪,৬৩১৲
মোট	১২,০৮,৬০৪৲

দিনাজপুর

দিনাজপুর জেলার পরিমাণফল ২৫,২৫,৪৪০ একর। সহরের সংখ্যা ১ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩,৬১১। মোট কর্ষিত

জমি (১৯২৪ সনে) ১০,৩১,৮০০ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ১ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭২·৩৭ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৫,৪৪,২৭১। ষাঁড়, বলদ ও পুং-মহিষের সংখ্যা ৬,৭৯,০৯০। লাঙ্গলের সংখ্যা ২,৮৫,০৩৮।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,৩০,৪৫,৭১৪ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৫১,৫৪,২০৬ মণ।

জনসংখ্যা

১৮৭২	১৪,২৯,৯০০
১৮৮১	১৪,৪২,৫২০
১৮৯১	১৪,৮২,৪৭০
১৯০১	১৫,৮৬,৮৪৫
১৯১১	১৬,৮৭,৮৩৩
১৯২১	১৭,০৪,৩৫০

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৭,৫১,৮৬১ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৮,৫৬,৮০৩। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ৪৩২।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

	শতকরা
মোট হিন্দুর	৭·৪
„ মুসলমানের	৯·১
„ হিন্দু পুরুষের	১২·৯
„ মুসলমান „	১৬·৭
হিন্দু মেয়ের	১·১
মুসলমান „	·৭

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৬৫৮। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৫২,৮০৪। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৪,৭১,৩৪৭। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৫৩,৮৪০।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৪,১৭,৫০৭।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৪·৭। হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ৩৩·৩ এবং মুসলমানের মধ্যে ৩৫·৫।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫	৪৮,৭৩৮
	১৯২২	৪০,৮৬৫
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫	১,১৯৮
	১৯২২	১৫৮
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫	৪৪৩
	১৯২২	৯৮

শিশু-মৃত্যু

(৯ম বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু	
স্ত্রী „	

ডাক্তারখানা

রোগের আশ্রিত

কালা ও বোবা	১,২২৬
কুষ্ঠরোগী	১৪১
অন্ধ	১,২১৮
হিন্দু বিধবা	৬৩,২৭৩
মুসলমান „	৬১ ৪·৭

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	১৫,১২,৭৪২
ষ্ট্যাম্প	৪,২১,৮২৫
আয়কর	৪১,৮৭৫

আবগারী	২,৮৩,৮৩৯৲
আফিং	৫১,৫৮৯৲
বিবিধ	৯,৮৪৫৲
পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস্	২,২১,৯২৪৲
মোট	২৬,২৯,৪৬৪৲

বগুড়া

বগুড়া জেলার পরিমাণফল ৮,৩৯,৭৬০ একর। সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ২,৭৭৮। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৩,৭১,৭০০ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ½ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৩·০২ ইঞ্চি। মাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ১,৭৯,২৭৮। ষাঁড়, বাঁদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,১১,৫৯৫। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,২৯,১৭৮।

১৯১৩-১৪ সনে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৩,৫২,৩০৫ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২৩,০৬,৪৬০ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	৬,৪১,২৮১
১৮৮১	৬,৮৬,১৮৫
১৮৯১	৭,৬৪,৪৬১
১৯০১	৮,৫০,৫০৪
১৯১১	৯,৮১,৫৬৭
১৯২১	১০,৪৮,৮০৬

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ১,৭৪,৪৬৬ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৮,৬৪,২৯৮। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৭৫০।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

	শতকরা
মোট হিন্দুর	১৪·১
„ মুসলমানের	৭·৪
মোট হিন্দু পুরুষের	২৩·৪
„ মুসলমান „	১৪·১
হিন্দু মেয়ের	৩·৪
মুসলমান „	·৬

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,০৩৮। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৪৯,৩৭১। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৩,১২,০৫৫।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬-১৫ বৎসরের) ১৯২৫ সনে ৩৮,৬৫৯।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ২,৭৩,৩৯৬।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৩·৮। হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৪·৪ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৯·৫।

ম্যালেরিয়ার মৃত্যু	১৯১৫	২৭,৩১৪
	১৯২২	১৯,১১৩
কলেরার মৃত্যু	১৯১৫	৩,০৩২
	১৯২২	৩৮০
বসন্তের মৃত্যু	১৯১৫	৭৫৪
	১৯২২	৩

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু

স্ত্রী „

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা

সমাজের আশ্রিত

কুষ্ঠরোগী	১৬৯
অন্ধ	৭৬৯
হিন্দু বিধবা	১৬,৬৩৪
মুসলমান ,,	৫৮,১০৪

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	৪,৬৫,৪৯৭৲
ষ্ট্যাম্প্	৩,৫৮,২৭৪৲
আবকরী	৪৫,৪৯১৲
আবগারী	১,৭৫,৮৬১৲
আফিং	১৭,২৮৭৲
বিবিধ	৩,১২০৲
পথকর ও পাব্লিক সেস্	১,২০,০৮৭৲
মোট	১১,৮৮,৩০৭৲

শ্রীসুকুমার মিত্র, যশোহর

গৃহ-শিল্পে চট্টগ্রাম

বাঙ্গালার প্রতি জেলায় অল্পবিস্তর গৃহ-শিল্প অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে চট্টগ্রামের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ঐ জেলার গৃহ-শিল্পের কিছু কিছু বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় প্রতি গ্রামে তাঁত চলে। তার মধ্যে প্রায় ২৩টি গ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ জেলায় বহু লোক কেবল তাঁত বুনিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করে। অনেকে আবার কৃষিকার্য্যের অবসরে এই কাজ করিয়া থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এ জেলায় বয়ন-শিল্প বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বহু বয়ন-কারখানা ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে এবং ঠকুঠকি তাঁতেই কম পক্ষে ছয় হাজার চলিতেছে।

তাঁতিরা বিদেশী সুতায় কাজ করে। দুখী, ঘোলা এবং বহু ভদ্রলোক হাতে কাটা সুতায় পড়েন ও কলের সুতার টানা ব্যবহার করে। চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লোসাই এবং কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি স্থানীয় তুলায় সুতা কাটে এবং সম্পূর্ণ বাঁশ দ্বারা তৈয়ারী এক প্রকার তাঁতে সেই সুতায় কাপড় বোনে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এই প্রকার ১০,০০০ তাঁত চলিতেছে। এখানে ঠকুঠকি তাঁত চলা অসম্ভব, কেন না, কুটিরগুলি এত ছোট যে ঐ তাঁত সেই সকল কুটিরে ধরেই না। ইহারা নিজেরাই তাহাদের সুতায় রং করে।

বয়নকারীদের অবস্থা সাধারণতঃ ভাল। সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া সস্তায় সুতা সরবরাহ এবং মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ইহাদের অবস্থা আরও ভাল হইতে পারে।

চট্টগ্রামের পাহাড়ে প্রচুর তুলা জন্মে। হেলি ব্রাদার্স এবং শ্রীযুক্ত পি, কে, সেনের তুলা পরিষ্কার করিবার দুইটি কারখানা আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা এবং আলীর হইতে তাঁহারা তুলা কেনেন এবং পরিষ্কার করিবার পর গাঁইট বাঁধিয়া সেই তুলা আমেরিকায় চালান দেন। এই তুলার আঁশ খাটো এবং খস্‌খসে বলিয়া পশমের সঙ্গে বেশ মিশে; এই তুলার চাহিদা খুব বেশী এবং আমেরিকা বরাবর ইহা কিনিতেছে। ইঁহারা প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ মণ তুলা চালান দেন।

ইহা ছাড়া রাঙ্গামাটি, কাটাখালি, ফয়জাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৮,০০০ লোক হাত কলের দ্বারা তুলা পরিষ্কার করে। এই ব্যবসায় যাহারা চালায় তাহাদিগকে বলে জালনিওয়ালা। ইহারাই ঐ ৮,০০০ লোককে নিযুক্ত করে। মজুরিস্বরূপ পয়সা দিতে হয় না। যে যত তুলা পরিষ্কার করে, সেই তুলা হইতে যে বীচি বাহির হয়, সেই বীচিই তাহাকে মজুরি স্বরূপ দেওয়া হয়। ইহাতে প্রত্যেক শ্রমিক মাসিক চার পাঁচ টাকা রোজগার করে। শ্রমিকদের অধিকাংশই মেয়ে মানুষ। অবসর সময়ে এই কাজ করে বলিয়া যাহা পায় তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, আর মজুরির পয়সা দিতে হয় না বলিয়া জালনিওয়ালারা বিশেষ লাভবান হয়। এই উপার্জ্জন হইতে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ গহনা গড়ে। তুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কাজ চলে এবং প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের পঁচিশ হাজার হইতে পঁয়ত্রিশ হাজার মণ তুলা হয় চট্টগ্রামে বিক্রয় হয়, নয় কলিকাতায় চালান যায়। তাহা হইলে দেখা

যাইতেছে, প্রতি বৎসর প্রায় ১২,১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলা এখান হইতে রপ্তানি হয়।

আমেরিকা ও কলিকাতায় রপ্তানির পর যে তুলা বাঁচে, তাহা স্থানীয় চরকায় ব্যবহৃত হয়। বিরলাই, পটিয়া কটিকচেরি, সাতকানিয়া এবং চাকারিয়া থানা চরকার প্রধান কেন্দ্র। এই জেলায় প্রায় ২০,০০০ চরকা চলে।

কাপাসের মূল্য প্রতি সের পাঁচ আনা হইতে আট আনা। সুতার মূল্য প্রতি সের দেড় টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা। ছয় হইতে চল্লিশ নম্বরের সুতাই বেশীর ভাগ কাটা হয়। কলের সুতা অপেক্ষা এ সুতা খুব সস্তায় বিক্রয় হয়। এক একজন কাটুনী রোজ আধ সোয়া হইতে তিন ছটাক তুলার সুতা কাটিতে পারে। বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই অবসর সময়ে সুতা কাটিয়া থাকে। চট্টগ্রাম সুতা বেনা-বেচার প্রধান বাজার।

সহরে পাটের দড়াদড়ির কাজ কিছু কিছু হয়। নৌকা এবং জাহাজে পাল খাটাইবার জন্য এই দড়ি ৩০।৪০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

শণের সুতা তৈয়ারি হয় জেলার সর্ব্বত্র। কলিকাতা, ঢাকা এবং সীতাকুণ্ড হইতে শণ আনিয়া সুতা এবং দড়ি পাকাইয়া রেঙ্গুনে চালান দেওয়া হয়।

এ জেলায় রেশম বয়ন কিছু কিছু হয়। কক্সবাজার, রামু, টেকনাফ, মহিষাখালি, চালারিয়া এবং রাজামাটি প্রধান কেন্দ্র। শুদ্ধ রেশম বয়ন খুব কম হয়। রেশম এবং কাপাস সুতার মিশ্রিত কাজই বেশী। কলিকাতা, রাজসাহী এবং মুর্শিদাবাদ হইতে রেশম লইয়া বয়নকারীরা তাহাদের প্রয়োজনমত রং করিয়া লয়। তৈয়ারি মাল রেঙ্গুন এবং আকিয়াবে চালান দেওয়া হয়। এক একখানা লুঙ্গি ১৫ হইতে ৩০ টাকায় বিক্রয় হয়।

বয়ন-কার্য্য কেবল মাত্র স্ত্রীলোকেরাই করে। মগদের পুরাতন সামাজিক প্রথা এই যে, সংসার চালাইতে যা কিছু প্রয়োজন তা স্ত্রীলোকেরাই করিবে, পুরুষরা কিছুই করিবে না। সেই জন্য কাপড় বুনিবার ভারও স্ত্রীলোকদের উপর। বাড়ীর সকলের কাপড় যোগাইয়া যদি কিছু বেশী থাকে তাহাই তাহারা বাজারে বিক্রয় করে।

সদর মহকুমার কয়েকটি গ্রামে জেলেরা জাল বোনে, তাহা ছাড়া কয়েকটি গ্রামে প্রায় ১০০০ মুসলমান পরিবার শণ এবং বাজারের কলের সুতায় বহু জাল বোনে। এই সকল জাল রেঙ্গুনে চালান দেওয়া হয়। ছোট বড় নানা প্রকারের জাল বোনা হয়; তার মধ্যে বেহাতি জালগুলি খুব বড়। ইহার ফাঁস তিন ইঞ্চি, মূল্য ১৫০ টাকা; এগুলি সাধারণতঃ সমুদ্রে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ
(জনমত)

নোয়াখালীর কথা

(১) বৃষের অভাব

আজ বহু বৎসর যাবৎ নোয়াখালী জিলাবোর্ড গো-জাতির উন্নতিকল্পে নিজ তত্ত্বাবধানে পশু-চিকিৎসালয়ে তিনটী বৃষ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল। বৎসরাধিক কাল গত হইল অকর্মণ্য দুইটী বৃষকে নীলামে বিক্রয় করার পর তৎস্থলে আজ পর্য্যন্তও কোন বৃষ আনা হয় নাই। গত নবেম্বর মাসে তৃতীয় বৃষটীকেও নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে সহরে একটী বৃষও নাই। এই বৃষ প্রতিপালিত হওয়ায় সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী দশ মাইলব্যাপী স্থানের গৃহস্থগণের যে বিশেষ উপকার হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এইসকল বৃষের দ্বারা যেসকল গো-বৎস জন্মানো হইয়াছে সেইগুলি যে এতদ্দেশীয় গরু অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল এবং ঐ সকল গাভীও যে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দুগ্ধ দান করিয়া থাকে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। জানিতে পারিলাম, খাস মহাল অফিসার পশুচিকিৎসককে দুইটী বলিষ্ঠ বৃষ আনিবার জন্য রঙ্গপুর পাঠাইয়াছেন। এই বৃষ দুইটী আমদানি করা হইলে ইহারা যে চর অঞ্চলে প্রেরিত হইবে এই ভরসা আমাদের আছে। খাসমহাল অফিসার যাহা করিলেন জিলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের কি পূর্ব্বেই তাহা করা উচিত ছিল না? এই বৃষগুলির অভাবে সহর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের গৃহস্থগণের গাভী পালন করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

(২) পানীয় জলের অভাব

নোয়াখালী সহরের বড় বড় দীঘি ও পুষ্করিণীগুলি নদীর কুক্ষিগত হওয়ার পর হইতেই সহরে জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। দুলুয়ার এগার আনি ও পাঁচ আনির পুষ্করিণী দুইটী এবং মিউনিসিপ্যালিটীর রিজার্ভার চারিটী হইতেই সহরবাসিগণ পানীয় জল পাইয়া থাকে। সহরের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা দুলুয়ার পুষ্করিণীর জলই পানীয় জলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ভাল পানীয় জলের পুষ্করিণী না থাকায় মিউনিসিপ্যালিটীর রিজার্ভারগুলিই ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের একমাত্র ভরসা। কিন্তু রিজার্ভারে যে পরিমাণ জল আসে প্রার্থিগণের অনুপাতে উহা পর্য্যাপ্ত নহে। অনেককেই অপরাহ্ণে জল না পাইয়া খালি কলসী হাতে ফিরিয়া যাইতে হয়। বিশেষতঃ, ব্রুস্ সাহেবের দীঘির কোণে যে রিজার্ভারটী আছে, ঐ রিজার্ভারের জল পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ একেবারেই পায় না। কারণ নিকটবর্ত্তী হোটেল-গুলিতে যে পরিমাণ পানীয় জলের আবশ্যক রিজার্ভারে সেই পরিমাণ জলও আসে কিনা সন্দেহ। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়াও যদি সর্ব্বসময়ের জন্য রিজার্ভারগুলি হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে পানীয় জলের অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

(৩) অর্থকষ্ট

সমস্ত বাঙ্গালাদেশময়ই অর্থকষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাবনা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, রাজসাহী সর্ব্বত্রই অর্থাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। ময়মনসিংহ ও রংপুরের ত কথাই নাই। এই সকল স্থানে অনাহার ও অর্দ্ধাহার লাগিয়াই আছে। দেশের অবস্থা যে কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। আমাদের নোয়াখালী জিলাও ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। জিলার নানা স্থান হইতেই অর্থাভাবে অনাহার ও অর্দ্ধাহারের খবর আসিতেছে। আহারের সংস্থান করিতে না পারায় আত্মহত্যার চেষ্টার কথাও শুনা যাইতেছে। সরকার ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কোন কোন থানায় কোন কোন ইউনিয়নে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্য। ইহা অভাবের তুলনায় মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই অর্থসঙ্কটের দিনে ভারত সরকার তথা বাঙ্গালা সরকারকে আজ সকল কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়াও জনগণকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। অন্যথা দেশে চুরি, ডাকাতি, লুট তরাজ যেভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রশমিত হওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। সন্ধ্যার পর হাটবাজার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেই যে ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, তাহা মনে করা ভুল। এই বৎসর জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে বিশেষ কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা করা যায় না। মধ্যবিত্ত, চাষী, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই এইবার অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল পল্লীগ্রামে কি হইতেছে প্রায়ই সে খবর সহরে আসিয়া পৌঁছায় না, যদিও বা পৌঁছায়, তবু তাহা এত বিলম্বে পৌঁছায় যে, অনেক সময় প্রতীকারের আর উপায় থাকে না। আশা করি সরকার এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ও চৌকিদারগণকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে আদেশ করিবেন।

(৪) রাস্তার দুরবস্থা

ষ্টেশনে যাওয়ার ডিঃ বোর্ডের রাস্তাটীর এবার এখনও জীর্ণসংস্কার কার্য্য হয় নাই। বোধ হয় খালের মুখে পতিত হওয়ার কারণেই রাস্তাটীর মেরামত-কার্য্য হইতেছে না। রাস্তা হইতে খালের দূরত্ব যথেষ্ট হাত যায়। এরূপ অবস্থায় উহার মেরামতকার্য্যে কতকগুলি টাকা অনর্থক ব্যয় করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই রাস্তা স্থানান্তর দিয়া সরাইয়া লওয়াই উচিত মনে করি।

আমরা জানিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান রাস্তা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার পশ্চিম দিকে কোন স্থান দিয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুত করা হইবে বলিয়া নাকি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি প্রকৃত পক্ষে রাস্তা স্থানান্তর দিয়া প্রস্তুত করাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তবে

এমন স্থান দিয়া উহা সরাইয়া নিতে হইবে, যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধা হয়, রাস্তা প্রস্তুত করিতে কর্তৃপক্ষের অধিক অর্থব্যয় না হয় এবং খালের আক্রমণ হইতেও রাস্তাটী কয়েক বৎসর টিঁকিয়া থাকিতে পারে।

যে যে স্থান দিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত করার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে সে সকল স্থান দিয়া রাস্তা হইলে রাস্তাটী অধিক দিন টিঁকিবে না, আবার নূতন রাস্তার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। শুধু বোর্ডের কতকগুলি টাকার অপব্যয় হইবে মাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে মহম্মদপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বস্তের হাট পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তাটীকে বোর্ড গ্রহণ করিলে সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এই রাস্তাটীকে অল্পবিস্তর প্রশস্ত করিয়া লইলেই অক্লেশে কার্য্য চলিতে পারে। এই স্থান দিয়া রাস্তা করিলে জনসাধারণের যেমন সুবিধা হইবে, তেমন বোর্ডেরও অধিক অর্থব্যয় হইবে না। জমি গ্রহণ করিবার ক্ষতিপূরণও বেশী পড়িবে না। অথচ এইরূপ ভাবে চলিতে থাকিলেও রাস্তাটি ৮।১০ বৎসর অনায়াসে টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

পাটের পূর্ব্বাভাষ

১৯২১ সনে বঙ্গদেশ আসাম এবং বিহার-উড়িষ্যায় কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সর্ব্বশেষ আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই তিন প্রদেশে মোট ১,৮৫৮,১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর কিন্তু ৩,৪৯২,০০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায়, এবার অনেক কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। অনুমান এই যে, এবার ৩০০ পাউণ্ড ওজনের যে গাঁইট, সেরূপ ৫,৫৯,১০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর মোট ১১,২৫৪,৮০০ গাঁইট পাট হইয়াছিল।

১৯২১ সনে বাঙ্গালায় ১,৬১৩,৭০০ একর, বিহার-উড়িষ্যায় ১৪৮,৮৩০ একর এবং আসামে ৯৫,৬০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। অনুমান এই যে, এবার বাঙ্গালায় ৫,০০২,৭০০ গাঁইট, বিহারে ৫৬৭,২০০ গাঁইট এবং আসামে ১২০,০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে।

বাঙ্গালীর নূতন ব্যবসায়

আধুনিক রাস্তায় পিচ বা এস্ফাল্ট দেওয়া হয়, তাহাতে রাস্তা মজবুত হয় ও বেশী দিন টিঁকে। ইহা এত দিন বিদেশে তৈয়ারী হইত। সম্প্রতি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট ময়মনসিংহনিবাসী রায় সতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের ভ্রাতা শ্রীকিতীশচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ মেজাজো নামক এইপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিবার এক কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই পদার্থে এস্ফাল্টের মত রাস্তায় ব্যবহার করা যায়। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত মাল কলিকাতা, আসাম ও পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়াছে। আশা করা যায়, বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া এই কারবার স্থায়ী হইবে।

(সঞ্জীবনী)

গোয়ালিয়র রাজ্যের কিঞ্চিৎ আর্থিক পরিচয়

গোয়ালিয়র রাজ্যটী আয়তনে প্রায় স্কটলাণ্ডের সমান; ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই আদিম যুগের মানুষ; তাহারা লেখাপড়া, কি বর্ত্তমান সভ্যতার বড় একটা ধার ধারে না। দেশবাসীর অক্ষর পরিচয়ের শতকরা হার ৪; ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ½ জন মাত্র। শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টার বেসরকারী ভারতীয় মূলধন একরূপ নাই বলিলেই হয়। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এই দেশীয় রাজ্যটী যথেষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই রাজ্যে প্রায় ২০০টী ফ্যাক্টরী এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান। কলকারখানাগুলি হয় বাষ্প-চালিত, না হয় বিদ্যুৎ-চালিত। কলকারখানা নানা রকমের; যথা, তুলার কল, কাপড়ের কল, চীনামাটীর কারখানা, ট্যানারি, রেলওয়ে ও মোটর ওয়ার্কশপ, তেল এবং ঘাড়ের কল, সিমেন্ট, সাবান এবং নানাপ্রকারের ছোটখাট কেমিক্যালের কারখানা।

খনিজ সম্পদ্

লোহা

গোয়ালিয়র রাজ্যটী দুইটী বড় বড় অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটী রাজ্যের উত্তর ভাগে অবস্থিত এবং ইহা একটী অখণ্ড ভূভাগ। দ্বিতীয় অংশটী দক্ষিণে; ইহা মালব উপত্যকা নামে অভিহিত। ইহা আবার চারি অংশে বিভক্ত। উত্তরের অংশটীতে বৎসরের আট মাস অসহ্য গরম, কিন্তু শীতের চারি মাস আবহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর থাকে। মালব উপত্যকা অর্থাৎ রাজ্যের দক্ষিণ অংশের মাটী কালো, তুলার আবাদের উপযোগী, এবং অত্যন্ত উর্ব্বর। এই অংশে শীত গ্রীষ্ম কিছুই নাই, সর্ব্বদাই যেন অপরাহ্নের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজমান। উত্তরাংশে খনিজ পদার্থ সেরূপ নাই। যাহা আছে তাহা খনন করিয়া তোলাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রাজধানী হইতে মধ্য রাইল পর্য্যন্ত আশে পাশে লোহার ওর দেখা যায়; এই সমস্ত ওরে ৫৫% হইতে ৬৫% পর্য্যন্ত লোহা পাওয়া যায়। মালব উপত্যকার (রয়গড় এবং বাঘ) ওরের মধ্যে ৫০% পর্য্যন্ত লোহা মিলে। এই অঞ্চলে পূর্ব্বে ৫০টী দেশীয় কার্থেসে দেশীয় প্রথায় কি সন প্রায় ২০,০০০ মণ লোহা উৎপন্ন হইত। এই দেশীয় শিল্পের স্মৃতি এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। সস্তা বিদেশী লোহা আসিয়া ক্রমে এই শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এই রাজ্যের লোহার ওরের মধ্যে খুব বেশী সিলিসিয়া থাকায় আধুনিক প্রথায় লোহা প্রস্তুত করা অসম্ভব। গোয়ালিয়রের নিকটে সাল্টোপার অঞ্চলে দুই একটী লোহা তৈয়ারীর কারখানা এখনও আছে। লৌহ-শিল্প কারেম করার আরও একটী অসুবিধা এই যে, এখানে কয়লা পাওয়া যায় না এবং জলজাত বিদ্যুৎ-শক্তিও (হাইড্রো ইলেক্ট্রিক্) পাওয়ায় এখানে অধিক।

চীনামাটী

প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র রাজ্যের মাটী লইয়া গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে, আসল চীনামাটী এখানে পাওয়া যাইবে না। তবু ফেল্‌স্পার এবং কোয়ার্টজ মাটী এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দুই মাটী ও খুব চকচকে। গোয়ালিয়র-রাজ এই জন্য ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া গোয়ালিয়র পটারিজ্ লিমিটেড্ নামক একটী কোম্পানী খুলিয়াছেন। দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটে কায়োলিন্ কাদার খনি আছে। গোয়ালিয়র পটারিজ এই খনি কিনিয়া লইয়া সেখানেও কারখানা খুলিয়াছে। বর্ত্তমানে এই দুই কারখানা হইতে এ্যাসিড-প্রুফ্ জার, মেঝের টাইল, ইলেক্‌ট্রিক ইন্‌সুলেটর, হাসপাতালের আসবাবপত্র, ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ

গোয়ালিয়র রাজ্যে গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সমস্ত চিজ্ উৎকৃষ্ট ধরণের। গোয়ালিয়র ফোর্টের মন্দির, ঘরবাড়ী, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইমারৎ-সমূহ, সমাধি মন্দির এবং রাজ্যের মধ্যে ইতস্ততঃ অবস্থিত পুরাতন বাড়ী সমস্তই এখানকার পাথরে তৈরী। এই পাথর নরম, ইহা খোদাই করাও সহজ, অথচ ইহা মোটেই নষ্ট হয় না। গোয়ালিয়র রাজ্যের পাথর সাদা, সোনালি, কাল, লাল ইত্যাদি নানা রংয়ের দুই হয়। ইহা মিস্ত্রি কারুকার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী।

সোহারা ও সাবালগড়ের নিকট ৩।৪ ফুট মোটা মার্ব্বেল পাথর পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ৪০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী সিমেন্টের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে লাইমষ্টোন্ (চুণা পাথর) পাওয়া যায়। গোর্ট্‌ল্যাণ্ড সিমেন্ট এই লাইমষ্টোন্ হইতেই পাওয়া যায়। এই কারখানায় অতি আধুনিক মেশিন্ বসান হইয়াছে। ইহা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য কারখানার নিকটেই পাওয়ার হাউস কায়েম করা হইয়াছে।

উপরি উক্ত খনিজ দ্রব্য ছাড়া গোয়ালিয়র রাজ্যে ওকার, মাইকা, রক্সাইট্, গার্ণেট্ এবং গ্যালেনাও পাওয়া যায়।

বন-সম্পদ্

গোয়ালিয়র রাজ্যে বনের পরিমাণ ১,৮০০,০০০ একর। মোট রাজ্যের ১১% সরকারী বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সবচেয়ে বড় জঙ্গলের নাম 'বন্‌ওয়েলিয়া সেরাটা'। ইহার পরিমাণ ফল ৮০০ বর্গ মাইল। এই বন হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী মালপত্র এখনও আহরণ করা হয় নাই। এই বন হইতে প্রচুর পরিমাণে ওলিয়ো-রেসিন পাওয়া যাইতে পারে। এই বনজাত ওলিয়ো-রেসিন লইয়া লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট, দেরাদুনস্থ ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট এবং স্থানীয় সিন্ধিয়া কেমিক্যাল লেবরেটরিতে গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে, উহা হইতে ৮% খাঁটি পাইনিন্ (টার্পেন্টাইন্), ৫০% রেসিন এবং ৩০% গঁদ পাওয়া যায়। গুণে এই বনজাত টার্পেন্টাইন আমেরিকান এবং ফরাসী টার্পেন্টাইনের সমকক্ষ। ওলিয়ো-রেসিনের মধ্যে বিচিত্র সম্পদ্ নিহিত রহিয়াছে। বন্‌ওয়েলিয়ার বন্য দেবদারুর বনে ভবিষ্যতে একটী লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কেবলমাত্র গোয়ালিয়র রাজ্যই যে এই ধরণের শিল্প কায়েম হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা নহে; ভবিষ্যতে গোটা মধ্য ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এই শিল্প জাঁকিয়া বসিতে পারে।

গোয়ালিয়র রাজ্যের জঙ্গলে বাহাদুরি কাঠ নাই বলিলেই হয়। দুএকটা সেগুন গাছ আছে বটে, তবে এই সেগুন ভাল জাতের নয়। কিন্তু গোটা রাজ্যে ইন্ধনোপযোগী কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তিন ধরণের কাঠ আর্থাদি এবং গ্রাসগোতে চোঁয়াইবার জন্য প্রেরিত হয়। নিম্নের তালিকায় এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইল। এই শিল্পটী কায়েম হইলে বন-বিভাগের একটি আয়ের পথ উন্মুক্ত হইবে।

	জলীয় ভাগ শতকরা	প্রতি টনে কত গ্যালন			
		কষলা	এসিটেট্ অব্ লাইম	কাঠের স্পিরিট্	আলকাতরার তেল	আলকাতরা
এ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু	১৩		৫৬	১৯·৫	১১·২	
বস্‌ওয়েলিয়া সেরাটা	২৩		৩৩	৩০·০	১০·৭	
এ্যানো সেরিনাসপেক্টুলা	১৪		১০১	৩২·৫	১৪·৬	
ঐ তিন কাঠ একত্রে	১৮		৫১·৩	৩ গ্যালন		

গোয়ালিয়রের বনে দেশলাইয়ের কাঠির উপযোগী কাঠ, লাক্ষা জন্মাইবার উপযোগী গাছ, ট্যানিন এবং তৈল-উৎপাদনকারী নানাপ্রকারের গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত গাছ এবং কাঠ কাজেও লাগান হইয়াছে। গুগ্গুলবিশিষ্ট অনেক প্রকারের ঝোপ ও গাছ এবং কাগজের মণ্ড তৈয়ারীর উপযোগী নানা প্রকারের ঘাসও পাওয়া যায়। সিম্বোপোগাম্ মার্টিনি নামক এক প্রকারের ঘাস হইতে পাম্‌রোজা তেল প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমে স্থানীয় সমবায়ী সেবরেটরী হইতে এই তেল প্রস্তুত হয়। পরে এই গবেষণার ফল গার্ডেনার্স এসেন্স এণ্ড কেমিক্যাল কোং নামক একটী বেসরকারী কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীটী বড়োদা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানীর কারখানায় আরও ২০০ প্রকারের ভেষজোপযোগী তৈলবীজ হইতে তেল বাহির করা হয়। পরে কারখানায় তেল হইতে বীজাণুনাশক তরল পদার্থ এবং নানা প্রকারের আর্নিশ তৈয়ারী করা হয়। প্রতিবৎসর তেল এবং শেষোক্ত প্রকারের জিনিষ প্রস্তুত হয় যথাক্রমে ২০০০০ এবং ৮০০০ গ্যালন।

দি গোয়ালিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্

গোয়ালিয়র সরকারের একটী আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। মধ্য-ভারতে এইটীই সব চেয়ে বড় কারখানা। কারখানাটী পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত।

চামড়ার কারখানা

দি গোয়ালিয়র লেদার ফ্যাক্টরি, ট্যানারি এবং টেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ সনে। কারখানার কলকব্জা সমস্তই আধুনিক ধরণের। কারখানায় জিন, লাগাম প্রভৃতি ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম, বুট, জুতা তাঁবু ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। সমগ্র গোয়ালিয়র রাজ্যের পুলিশ এবং সৈন্য বিভাগের যাবতীয় প্রয়োজনীয় চামড়ার জিনিষপত্র এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। অনেক দেশীয় রাজাও ইহার পৃষ্ঠপোষক। প্রায় ২০ লাখ টাকার জিনিষ এই কারখানায় উৎপন্ন হয়। লড়াইয়ের সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে এই কারখানাটী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই কারখানায় উৎপন্ন মাল প্রায় বিলাতী জিনিষের মত।

বয়ন-শিল্প

কলকারখানার কল্যাণে অন্যান্য স্থানের মত গোয়ালিয়র রাজ্যের তাঁতীগণ তথা কুটিরশিল্প-জাত কাপড়-চোপড় লোপ পাইতে বসিয়াছে। তবে যে সমস্ত তাঁতীর কাজ-শিল্পের উপর যখন এত বেশী যে মিল দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবার নহে, তাহারাই মাত্র এখন পর্য্যন্ত টিঁকিয়া আছে। গোয়ালিয়র সহর হইতে যেরূপ মাইল দূরে চান্দেরী নামে একটী সহর আছে। এই সহরে অতি সুন্দর মসলিন প্রস্তুত হয়। এই মসলিনের উপর সোনারূপার কাজ থাকে এবং উহা সূতীয় ও রেশমী উভয় প্রকারেরই হইয়া থাকে।

১৯২৩ সনে কলিকাতার বিরলা ব্রাদার্সের তত্ত্বাবধানে (ম্যানেজিং এজেন্সি) ৩৫ লাখ টাকা মূলধনে গোয়ালিয়র অগ্রগামী কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিবেঞ্চারের উপর মহারাজা ১৮ লাখ টাকা ধার দেন। মধ্যভারতে ইহা সর্ব্বৃহৎ এবং সুপরিচালিত কটন মিল। এই মিলে

৩০,০০০ মাকু এবং ৮০০ তাঁত আছে। ধোলাই করা ও ছেঁড়া সমস্তই মিলের মধ্যে সম্পন্ন হয়। মিলের মজুরের সংখ্যা ৫০০০ জন, এবং উহাদের দুইধারে খাটাইবার ব্যবস্থা আছে। দুইধারে দৈনিক ২০ ঘণ্টা কাল মিল চলে এবং দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ ৩০,০০০ পাউণ্ড কাপড়। বৎসরে ৫০ লাখ টাকার তুলা ব্যবহৃত হয়। এই তুলার (১০ হইতে ২০ নম্বর) অধিকাংশ আসে উজ্জয়িনী (মালোয়া), রাৎলাম রাজ্য হইতে। কিছু কিছু (১০ হইতে ১২ নম্বর) দিল্লী এবং আগ্রা অঞ্চল হইতেও আসে। লংক্লথ, চাদর এবং রঙীণ কাপড়-চোপড়ই বেশী উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি হোসিয়ারি তৈরীর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, এবং ইহাতে লাভও হইতেছে। মিলের উৎপন্ন বস্ত্রের অর্দ্ধেক রাজ্যের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়; বাদবাকী অমৃতসর, কানপুর এবং দিল্লীতে চালান হয়।

মিল হইতে ১৫০০ লোকের ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই সমস্ত ঘরে কলের জল এবং ইলেকট্রিক আলোর বন্দোবস্ত আছে। একটী দাতব্য দাওয়াইখানা, মাতৃমঙ্গল সমিতি, এবং স্কুলও আছে। আর ঘরবাড়ী হাসপাতাল, শিশু-চিকিৎসালয় এবং বাজার তৈরী হইতেছে।

মিল-সংলগ্ন মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপটী যেন একটী ঔদুম্বরের কারখানা। সম্প্রতি এই কারখানা হইতে ভারতীয় মালমশলা দিয়া একখানি মোটর গাড়ী তৈরী করা হইয়াছে। অবশ্য টায়ার টিউব, ম্যাগনেটো এবং কারবিউরেটার অবশ্য ভারতীয় নহে। এই চারি বস্তু ছাড়া আর সমস্তই এই কারখানায় তৈরী হইয়াছে। ভারতে এইখানি সর্ব্ব-প্রথম মোটর গাড়ী যাহা ভারতেই নির্ম্মিত হইয়াছে। কারের মেশিনটী ১৪·৭৫ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট এবং ৪ সিলেণ্ডারের; গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল।

এই মিল ছাড়া আরও ৩টী মিল এই রাজ্যে আছে। মিল ৩টী উজ্জয়িনী সহরে অবস্থিত। বিনোদ মিলের মূলধন ৫১ লক্ষ টাকা। ইহার মাকুর সংখ্যা ১৩,০০০ এবং তাঁতের সংখ্যা ৪৪০। নবম আলী মিলটী সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী। ইহার মাকু এবং তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫,০০০ এবং ২৬৪। সিপ্রা কটন মিলের মূলধনের পরিমাণ ২৫ লাখ টাকা। ইন্দোরের শুর হুকুমচাঁদ আর একটী মিল প্রস্তুত করিতেছেন উজ্জয়িনীর বাধোনগরে।

পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তা সড়ক

গোয়ালিয়র রাজ্য বন্ধুরভূমি-পূর্ণ এবং এখানে বড় বড় নদীও নাই। কৃষকগণ এজন্য আবহমান কাল বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। বড় বড় পুকুর বাঁধ দিয়া নির্ম্মাণ করা, এই সমস্ত পুকুরে জল জমে। রাজ্যের ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টে অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আছেন। ইঁহাদের তাঁবে ৭২৩টী ছোট টাঙ্ক এবং ১৪১টী বড় টাঙ্ক আছে। ৪টী বড় বড় জলাশয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে। এই সরকারী বিভাগ হইতে ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে এবং ২১ লক্ষ টাকার কাজ চলিতেছে।

গোয়ালিয়র রাজ্যে ২০০০ মাইল পাকা সড়ক আছে। জি, আই, পি, এবং বি, বি, সি, আই রেলপথ দুইটীও এই রাজ্যের ভিতর দিয়া গিয়াছে; রাজ্যের মধ্যে দুইটী রেলপথের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৬৫ এবং ১৮০ মাইল। গোয়ালিয়র লাইট রেলওয়ে নামক আর একটী স্থানীয় রেলপথ আছে। ইহার গেজ্ মাত্র দুই ফুট। এই রেল কোম্পানী অংশীদার-গণকে খুব ভাল ডিভিডেণ্ড প্রদান করিতেছে।

মোট কথা গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রকৃত উন্নতিবিধান হইতে এখনও অনেক দেরী। আরও পুঁজি চালিবার প্রয়োজন। পুঁজি চালিবার পক্ষে ক্ষেত্রও রহিয়াছে যথেষ্ট। কয়েকটী মাত্র শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও গণ্ডায় গণ্ডায় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কায়েম হওয়া আবশ্যক।

নিম্নের তালিকায় গোয়ালিয়র রাজ্যের ১৯২৫-২৬ সনের আমদানি রপ্তানির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

	আমদানি (টাকা)	রপ্তানি (টাকা)
বস্ত্র	৩৫,৮১,২৬০	১,৪৫,২৯,২০৬
চিনি	৯২,৩৩,৫৮৩	৬৭,৭০০

তৈলবীজ, ঘী ও কেরোসিন	৩১,২৭,৩১২	৮০,৮০,৩২৮
মুদিখানার জিনিষ	৩৫,৪০,১৯৫	২৭,৩৪,৫৮২
ধাতু	২২,৮০,৭৬১	১,৪৮,১২৬
তন্তু (কাপাস, রেশম, পশম)	১,৫৯,৪৭,১০৪	৩,১৬,২৯৯
খাদক দ্রব্য (আফিং ছাড়া)	৪,২০,৩৩৩	৭৭,১২৬
বাদ্য ও বাদ্য	৮০,০৪৭	১,৪৮২
রং	১,৩৫,১৬৬	৮৪২
কাঠ এবং গড়-খাড়	১৭,৫১,৪১৯	৭,৭৩,৩৫৬
পাথর ও মাটী	১,৮৬,৮০৬	২,৮৩,২২২
রেবার্ডেশারী	২৪,০৪,৮৪৬	৯৩,১৫৭
গো-মহিষ ও চামড়া	৮,৫৭,০৫৪	৪৩,১৭,৩৬৮
বিবিধ	২০,১৪,৪২৮	২,৫৩,১৩,৪০১
মোট	৪,০৯,২৪,৮২৪	৫,৬৭,১৬,৭৫২

সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য (১৯৩০-৩১ সন)

সম্প্রতি গোটা সিন্ধু প্রদেশের ১৯৩০-৩১ সনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

১৯৩০ সনে দুনিয়া জুড়িয়া দারুণ বাণিজ্য-হ্রাস সূচিত হয়। ১৯৩১ সনেও তাহার জের চলিয়াছে। সেইজন্য আলোচ্য সনেও দুনিয়াব্যাপী বাণিজ্য-হ্রাসের প্রাদুর্ভাব। সিন্ধু দেশও দুনিয়া-জোড়া বাণিজ্য-হ্রাসের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এই জাগতিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সিন্ধু দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্য বন্ধ ছাড়া বিলাতী কাপড় বর্জ্জন, অহিংস প্রতিরোধ ইত্যাদি আন্দোলনেও সিন্ধু প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

আলোচ্য সনে পূর্ব্বের সনের তুলনায় আমদানি বাণিজ্য কমিয়াছে ৪৪৭ লাখ টাকার অর্থাৎ ১৯%। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মাল আমদানি বাদ দিলে অবস্থা আরও খারাপ দেখা যায়; দেশী-সরকারী আমদানি কমিয়াছে ৭০৪ লাখ টাকার অর্থাৎ ২৯%। বস্ত্র-আমদানি-হ্রাস অর্দ্ধেক আমদানি-হ্রাসের কারণ। বিদেশী চিনি আমদানি মণিও পরিমাণে কিছু বেশী, কিন্তু মূল্যের বেলায় পূর্ব্ব সনের তুলনায় অনেক কম দেখা যায়। আলোচ্য সনে রপ্তানি-বাণিজ্যে হ্রাস দেখা যায় ৭৫৫ লাখ টাকার অর্থাৎ মোট হ্রাস ২৯%। তুলা রপ্তানি কমিয়াছে এত বেশী যে, এই একটী দ্রব্যই ৮১% রপ্তানি-হ্রাসের কারণ; বাকী ১৯% হ্রাসের জন্য পশম, কাঁচা চামড়া, সর্ষপ ইত্যাদি চিজ দায়ী। গম রপ্তানি অনেক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মূল্য কমিয়া যাওয়ায় মোটের বেলায় রপ্তানি-বৃদ্ধি বুঝিবার উপায় নাই। আলোচ্য সনে সিন্ধু প্রদেশের উপকূল বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল। আমদানি রপ্তানি দুইই বাড়িয়াছে। লবণ-শিল্প গত বৎসর বেশ ভাল ছিল; কিন্তু এই সনে কলিকাতায় লবণ রপ্তানি ২,৬২৪ টন কমিয়া মোট ১৬,৬৬৫ টনে পরিণত হইয়াছে।

নিম্নের তালিকায় সিন্ধু প্রদেশের উপকূল এবং বৈদেশিক উভয় প্রকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিগত পাঁচ বৎসরের হিসাব প্রকাশিত হইল:

জিনিষের নাম	১৯২৬-২৭				
(১) বৈদেশিক বাণিজ্য—	টাকা				
আমদানি বেসরকারী					
পণ্যদ্রব্য	২৮,০৪,৬৭,৫১১	২৬,৪০,৮১,৮৪০	৩১,৫২,৭৭,০১২	২৬,৪৭,৬১,২৯১	১৯,৪৮,০৪,৭১১
সোনা	৮,১১,৩৭৮	৮,২৭,৬৩৩	৭,৮৫,১১১	৪,৫৯,৪৮৭	৪,২১,৫১২
রূপা	১০,১২,৩২৯	৬,০১,৬১২	১৪,৬২,৮৪৮	৫৭,৫২,২৩১	২৬,৮৩,১৭৯
কারেন্সি নোট	৬,০০০		...	১০,৭৫,০০০	৭,৫২,৬১০
মোট বেসরকারী	২৮,২২,২৭,২৮৮	২৬,৫৫,৯৭,০২৪	৩১,৭৫,২৪,৭৭১	২৬,৯০,২৮,৬৬৭	১৯,৮৮,০৫,০১২

জিনিষের নাম	১৯২৬-২৭ টাঃ	১৯২৭-২৮ টাঃ	১৯২৮-২৯ টাঃ	১৯২৯-৩০ টাঃ	১৯৩০-৩১ টাঃ
সরকারী ষ্টোর্স	৩,১৯,৬১,৩৩৭	৩,৯৮,৫৬,৭৩৪	২,৫০,৫৩,৫৬৭	২,৬১,১৮,১২৭	৪,১৫,৫৯,১৭৯
মোট আমদানি	৩১,৪২,৫৬,৬২৫	৩০,৫৪,৫০,৮২৯	৩৫,২৭,৭৮,১৩৭	২৯,৫৯,৪৬,৭৯৪	২৪,০২,২৪,৪৯১
রপ্তানি বেসরকারী					
বিদেশী মাল					
পুনঃ রপ্তানি					
ভারতজাত এবং					
ভারতে প্রস্তুত	২৪,৭৬,২৯,৬৩৩	২৭,১৮,৬৭,৪৩১			
সোনা	১,৩৫০				
রূপা	১০,১৮,২৫৩			১৭,৫৫,৫০০	৫,৭৫,০৩৫
কারেন্সি নোট	...	...		৩,৫০,০০০	৫,৫০,০০০
মোট বেসরকারী	২৬,৫৬,২৯,৬৮১	২৮,৭১,৭০,৯১৭	২৯,১৯,৫৬,৫০১	২৫,৭৩,৩৬,৬৭৬	১৮,১৮,৪৮,৮০১
গবর্ণমেণ্ট ষ্টোর্স					
বিদেশে প্রস্তুত			৪,৩৮,৪১৫	২,১৭,৬৬৪	
ভারতজাত এবং					
ভারতে প্রস্তুত	৪,০৮,৫৪২			৭৩,৪৮৮	
রূপা	২৩,০০০				
কারেন্সি নোট	৫,০০০	...	২,০০০	...	...
গবর্ণমেণ্টের মোট	৬,২৮,১১১	৫,৬৩,১৫৩	৫,০২,৩৩৯	২,৯১,১৫২	২,৫৭,২৯৫
মোট রপ্তানি	২৬,৬০ ৪৪,৭৭২	২৮,৭৭,৩৪,০৭০	২৯,২৪,৫৮,৮৭০	২৫,৭৬,২৭,৮২৮	১৮,২১,০২,০২৬
মোট বিদেশী বাণিজ্য	৫৮,০৩,১১,০৯৭	৫৯,৩১,৮১,৮৯৯	৬৩,৫০,৩৭,০০৭	৫৫,৩৫,৭৪,৬২২	৪২,২০,২৬,৫৮৭
(২) উপকূল বাণিজ্য—					
আমদানি বেসরকারী					
ভারতজাত এবং					
ভারতে প্রস্তুত	১০,২০,৮৭,৩৮৯	১০,১১,০৩,৯২১	৮,৪৩,৭৫,৮২৭	৮,৩৩,২৯,৫৪৫	৯,৭৪,২৯,৮১৬
বিদেশে প্রস্তুত	৮৯,০৩,০০০	৮৫,২০ ৮৪৪	১৫,৭০,৮১১	১,৫৮,৯২,৪৭৭	৭৪,৭৫,৯১১
রূপা	১,৯১,৫২৯	১৩,১৯৮	১১,০১১	৫,১৭১	১,৮৯৬
মোট বেসরকারী					
আমদানি					
সরকারী ষ্টোর্স					
ভারতজাত এবং					
ভারতে প্রস্তুত					

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
বিদেশে প্রস্তুত	৮,১১,৯০০	১০,২১,২৭৯	১২,১৪,৮০২	১৩,৪০,৫৫২	৮,৫৮,৬৮৫
সরকারী মোট	১৫,২৫,০৬১	১৬,০৫,৮৬১	২০,৮১,৬৫৩	১৯,২১,৫৪৩	১২,২৪,০৩৫
মোট আমদানি	১১,২৭,০৬,৯৬১	১১,৮২,৪৩,৮৪৪	৯,৭০,৩৯,৩৫২	৯,৯১,৪৮,৫৩৬	১০,৬১,৩৯,৬১৮
রপ্তানি					
রেলকারী পণ্য					
ভারতজাত এবং					
ভারতে প্রস্তুত					৪,৮৮,৩৩,৭১৬
বিদেশে প্রস্তুত					৬২,৮৪,৫২০
সোনা					
রূপা			...		১,২১,৬৫০
মোট বেসরকারী	৬,০৯,৮৪,০০২	৬,০১,৭০,৫৬১	৪,৫২,১৮,৭৮৮	৪,৮৪,৪৪,৭২৬	৫,০২,৫৯,৭০৬
গবর্ণমেণ্ট ষ্টোর্স ভারতজাত					
এবং ভারতে প্রস্তুত	৪,৭৫৪	৩,০৩৬		৫,৫০১	৩,০০২
বিদেশে প্রস্তুত	৩,০৪,২৭১	২,১৬,২০৪	১,৭৯,৭০৩	৬,৮১,১৪১	৩,২৮,১৭৪
মোট সরকারী	৩,০৯,০২৬	২,১৯,৫৭০	১,৭৯,৭০৩	৬৮৬,৪৪২	৩,৩১,১৭৬
মোট রপ্তানি	৬,১২,৯৩,০২৮	৬,০৩,৯০,১৩১	৪,৫৪,৫৮,৪৯১	৪,৯১,৪২,১৬৮	৫,০৫,৭০,৮৮২
মোট উপকূল বাণিজ্য	১৭,৪০,০০,০০৭	১৭,১৬,৫০,৯৭৫	১৪,২৪,৯১,৮৪৩	১৪,৮২,৯০,৭০৪	১৫,৬৭,১০,৫৪০
মোট বাণিজ্য	৭৫,৪৩,১১,৪০৪	৭৬,৮৮,২১,৮৭৪	৭৭,৭৫,৩৪,৮০০	৭০,১৮,৬৫,৩২৬	৪৭,৯০,৩৭,১২৭

করাচী বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্য

নিম্নের তালিকায় করাচী বন্দরের বিগত পাঁচ বৎসরের আমদানি-রপ্তানির পরিচয় প্রদত্ত হইল :

পণ্যের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	
রপ্তানি	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	
ভারতে প্রস্তুত এবং ভারতজাত					
১। খাদ্য পানীয় এবং তামাক	৪৪৮৮০	৭৬৩৫৫	৫৪৪৮৩	১৯৮২৯	৩১০৩০
২। কাঁচামাল	১,৯২৬৫৪৮	১,৯৫৬৭৩	২,১৮৮০৩	২,১৪১০৭১	১,৩১৭৮৯
৩। কারখানাজাত	২৫৫০	৩১৩৬	৩৫৪০	৩৯৮৬	৩৪৪০
৪। জীবন্ত জানোয়ার	০৩৫	০৫১	০৫৪	০৬৫	০২৩
৫। সোটাল চিজ্	৫০৭	৬৫২	৪৮০	৪৭৩	৩৩৮
মোট ভারতীয় মালপত্র	২,৪৭৬৫০	২,৭১৮৬৭	২,৭২৪৬৩	২,৩৮৪৬০	১,৬৯৮৮০
বিদেশী মাল					
১। খাদ্য-পেয়-তামাক					

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯		১৯৩০-৩১
কাঁচা মাল	৬৩·০৮	৭১·৮৪		২৯·৮৯
কারখানার মাল	৪৮·৭৯	৭৮·১৩		৭৫·৯০
জীবন্ত জানোয়ার				০·০৮
ডাকযোগে পুনঃ রপ্তানি				
মোট বিদেশী মাল				
মোট রপ্তানি				
আমদানি				
১। খাদ্য-পেয়-তামাক	৭০৮·০১	৫৪৪·৭১	৭৩৯·৯০	৬১৮·০৩	৪৫০·৭৩
২। কাঁচা মাল	১৩৮·৬০	১৫৮·৯৯	১৭৩·২৭	১৭১·৪৩	১৯৮·০৬
৩। কারখানার মাল	১,৯০১·৭৩	১,৮৭৬·৪৫	২,১৮১·৫৮	১,৭২৮·৫৮	১,২৪৯·৪৮
৪। জীবন্ত জানোয়ার	০·১৭	০·০৮	০·০৬	০·০৯	০·০৪
৫। ডাকযোগে আমদানি	৫৮·১৫	৬২·৭৭	৫৭·৯৬	৫৯·৪৭	৪৮·৬৪
মোট আমদানি	২,৮০৪·৬৭	২,৬৪০·৯০	৩,১৫২·৭৭	২,৬৪৭·৬১	১,৯৪৮·০৫

আমদানি

করাচী বন্দরে কোন্ কোন্ মাল কি পরিমাণে আসিয়াছে তাহার পাঁচ বৎসরের তুলনামূলক হিসাব নিম্নের তালিকায় প্রকাশিত হইল :

মালের নাম	১৯৩০-৩১ টাকা	১৯৩০-৩১ টাকা	১৯২৯-৩০ টাকা	১৯২৮-২৯ টাকা	১৯২৭-২৮ টাকা	১৯৩০-৩১ সনের আমদানির শতকরা হিসাব
কাপড়চোপড়	১০,৩০,৮০,০০৭	৮,৯৮,১০,১১৩	১০,৫২,৮৩,২৫৭	৭,৭৮,৬৮,২৯৬	৪,১৫,০৬,২৬১	২১·১১
চিনি	৫,২৫,১৬,৪৯৬	২,৯৬,৫৩,২২১	৩,৬৪,৩০,৪৫০	৩,৪৪,৮৮,৭৯২	২,৬৫,৪৭,১১৯	১৩·৬৩
ধাতু এবং ওর	১,৫৪,২১,০৮৭	১,১১,৪৩,৭৪১	২,২৭,৭৯,৫৫৩	১,৯৫,৯৮,৬১৩	১৮৯,৬৩,৫৯৬	৯·৫১
তেল	১,২৪,২২,০৮৭	১,৩৮,৬৮,৭২৪	১,৫১,৯৬,৯২৩	১,৪৭,৭২,৫২৮	১,৭৮,৯৮,৭৮৬	৯·১৯
কলকব্জা	১৫৯,৭৫,৭০৮	১,২৪,৯৬,৩১৩	১,৪৬,১৯,৫১৭	১,৪৮,৬১,৫৫৫	১,১৮,২২,৫৫৭	৫·৯৭
অটোমোবিল	৬০,২৯,৫৫২	৮৬,৮৭,৮৮১	১,১৯,৭৮,৫১১	৮৮,০৬,৫০২	৭১,৮০,৩৯২	৩·৬৯
খাদ্যদ্রব্য অরেলম্যান ষ্টোরস্	৬১,১৯,০০৯	১,০৯,০০,৬৫৮	৯৪,১৬,২২৪	৮৬,০৪,৭২৩	৬৪,১৭,৩৮৪	৩·৩০
মদ	৬২,১২,৮৫৯	৬০,২৪,২০৯	৬৫,৪০,২০৮	৬৮,২৮,২১৪	৬৩,২৬,৪২৭	৩·২৫
রবারের জিনিষ	১৬,২৬,২৬৩	৩৮,৭০,২৭৩	৫৪,৩২,০১৯	৭৮,৯৭,৫৩২	৫৮,৫৭,৪২০	৩·০১
পশমজাত দ্রব্য	৯৪,২০,০৭৩	১,২১,২৩,৭৪৬	১,২৮,০২,৪৭৮	১,১১,৮০,৬১৫	৪৮,১৬,৪৯৭	২·১৯
ডাকে আমদানি	৫৮,১৪,৬৬০	৬২,৭০,৪৯১	৫৭,৯৬,০৯৯	৫৯,৪৭,১৮০	৪৮,৬৪,৩১৬	২·৫০
বস্ত্রপাতি	২৭,২৬,৪৬১	২৬,৩০,৭০০	৩৬,৯৫,৬৬৮	৩২,১০,৩৯৩	৪২,৯০,৯৪৬	২·২০

হার্ডওয়্যার	৪০,৬৮,১২৫	৩৮,৫৫,৭৩০	৫২,৩২,৩৩২	৪১,২০,৭২১	৩৬,১০,৬৭৭	১৮৬
কেমিক্যাল দ্রব্য	২৪,৭৯,৯৬৮	২৯,০৮,৩০৭	২৮,৭৯,০০৫	৩২,১২,৪১৭	২৮,৫২,৯৫৪	১·৪৭
তামাক	১৯,০১,০৯৭	৪০,৯০,৫৯৫	৩৩,৮৩,০৫৪	৩৯,৮০,৪০৭	২৬,১১,৯৬১	১·৩৪
কাগজ ও পেষ্ট্ বোর্ড	২৫,৫৩,৭০০	২১,০৯,৪২৭	২৮,৪০,৪৯১	৩১,৭১,৭২৮	২১,৭৪,২৫০	১·১২
ফল ও সব্জী	৫৪,৫৭,৬১৭	৩১,৯০,৭০৯	২৬,১৬,২৫৪	২৭,৬০,৮৯০	২০,৮১,২৪৬	১·০৭
নকল রেশম	২৪,৯২,৬৯৭	৩১,০৫,২৪৬	৪৭,৪৮,৮৩৬	২৪,৪৫,৯২৬	১৮,৪২,১৮৩	০·৯৫
ঔষধপত্র	১০,৮৯,২৮৬	১২,০৯,৫৯৪	১১,৫৪,৬৫৭	১৪,০৯,২৪৪	১৪,৫৯,০০২	০·৭৫
হেবার্ডেশারী ও মিলিনারি	২১,৭৪,৮৩৫	১৯,১৯,৮৭৮	২৭,৯১,০৪০	১৭,১০,০৪৩	১৪,০৫,৮১২	০·৭২
কাচের জিনিষ	১৭,১৬,৯০৯	১৫,২২,২৭৪	১৫,৭৪,১৭৮	১৪,১৭,১৮৩	১৪,০২,১৯০	০·৭২
বাইক ও উহার সরঞ্জাম	১৭,৫৫,৬৫৪	১৮,২০,৬৮৫	২৩,১৮,৬০৭	১৯,৮০,৭৪৭	১৩,৩৩,০৬৭	০·৬৯
পোষাক পরিচ্ছদ	২২,৭৫,৫৫৭	১৭,১২,৮০৭	২০,৮৭,০২৩	১৬,৯৭,৪৮৯	১২,৭৯,৭০১	০·৬৬
রং ও উহার উপকরণ	১৩,৪৩,১৭৮	১৩,০৭,২৬১	১৩,২০,৪৪৬	১২,৭৭,৪৩৭	১২,৭২,৬১৮	
সাবান	১৪,২৪,৮৫০	১৪,৫৬,৪২২	১৫,৬২,১৪২	১৬,৮১,০৭১	১২,১৪,৩৬৭	০·৬১
শক্ত এবং মহণ	১,৫২,৭৫৪	১০,০১৯	১,৫৩,৭২,২২৮	৪৯,৪২,০০৪	৮,৪৫,৯৭১	০·৪৪
রেশম ও রেশমী বস্ত্র	৭,৮৩,৯১১	৫,৯৩,৮৫৮	৯,১৮,৩৮৯	১১,১৭,০৬০	৮,২০,৭৫৮	০·৪২
অন্যান্য জিনিষ	১,৪০,৬২,৪৪৮	১,৫৫,৯৭,৪২৬	১,৬৫,২৮৫	১,৩২,৮৫,৬৯৪	১,১৮,০২,১২৫	৫·৯৬
মোট	২৮,০৪,৬১,৫১১	২৬,৪০,৮৯,৮৪০	৩১,৫২,৭৭,০১২	২৬,৪৭,৬১,২৪৯	১৯,৪৮,৪০,৭১১	১০০·০০

রপ্তানি

করাচী বন্দর হইতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে তাহার তুলনামূলক পরিচয় নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল :

জিনিষের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৮-২৯	১৯৩০-৩১ সনের রপ্তানির শতকরা
ভারতজাত এবং ভারতে প্রস্তুত	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	হিসাব
তুলা	১৩,৪৯,৪৪,২২০	১২,৬২,৬৮,২৫৩	১৪,২০,৭০,৪৯৪	১৪,৬৮,২৯,৪৬২	৯,৫৪,৯৫,৫৭৫	৪৬·২৮
গম	২,৫৭,৬৫,২৮১	৪,৩৪,৬২,০৬৮	১,৫৯,০১,৯৮৩	১৫,৪১,০২৯	১,৯১,০৭,৬৪১	১১·২৬
পশম	২,২৯,৯০,৫৭৯	২,৬০,৯৬,২০০	২,৭৮,৮৩,৫৬৯	২,২৯,১৩,৫১৪	১,৪০,৯৪,৪৪৭	৮·৪৮
চাউল	৭২,০৪,৭৫৪	৯৪,৭৭,৩১২	৯৯,৪৪,৮৭৭	৮৩,৭১,৭৭০	৭৪,৮৯,১৬১	৪·৪১
চামড়া	৭২,৫১,৬৭৯	৬৬,৫৪,৩০২	২৫,৯২,০০০	১,০৮,৬৬,৬৯১	৭২,২৪,৭০৪	৪·২৬
তিল	২,০৬,৭১,২৩৮	১,৫২,৫৯,২৫৬	১,৪৬,৪৮,৬১৭	৮৭,৪০,৪৮৭	৪৯,২৬,১৫৭	২·৯৫
গমের আটা	৭৪,৯৮,৭০৬	৭৩,০৮,১৪০	৬৭,৭৮,২০৪	৫১,৬৩,৯৮২	৩৯,০৩,০৫৩	২·৩০
হাড়	৩৭,৪২,৩০৬	৩৮,১৫,৮২৭	৫৪,০০,১২২	৫৪,৩৯,৭৭০	৩৬,০১,২১৪	২·১২
হাইড্	২৮,৭৮,৭১০	৮০,৫৬,৬৯১	৮৮,৭৭,৭৮৩	৪২,৭৪,৪৬৮	২৬,০০,৩৪২	১·৪৩

কলাই	২৭,২১,২১৬	২৯,১২,৯৫০	৩০,০৭,০৭৯	২১,০৬,৫৬৮	১৬,১৮,৩৬৯	০·৯৫
মাছ	৫ ৭১,৫৯৪	৮,৫০,৩১২	৯,৭৪,৩০৮	১০,২৩,১০৯	১০,৮৯,৬৮৮	০·৬৪
পাকা চামড়া	৮,৬৫,৫৯৫	১০,০৯,৩৩০	১০,৩১,৯০৩	১১,৯৬,৮০৯	৭,১২,৮৮৭	০·৪২
পশম	২০,৬০,২৯৮	২৮,০৮,৩৯০	১৯,২৫,৯৮৭	২১,৫১,৬৫৪	২,৪৫,৪৬১	০·১৫
অন্যান্য জিনিষ	৭১,১৯,৪৮৯	২,০০,৫৭,৫৮৯	২,৫৮,২৫,৫৫৮	৯৭,৭০,৩২৮	৭২,০৪,০৫৭	৪·২৩
ভারতজাত দ্রব্য						
মোট রপ্তানি	২৪,৭৬,২৯,৬৬৩	২৭,১৮,৬৭,৪৩১				
বিদেশী পণ্য						
পশমী জিনিষ	৪০,৬২,৯১০	৩৮,৩৩,২১৫	৫০,২১,৯৮২	৫৩,৫৯,৫৪৪	৩০,০৪,২৬৯	২৭·১০
রবারের জিনিষ	৫,৯৪২	১,২৩৫	৩৫,১১২	২৫,৪১,১৮৯	২৫,২৬,৩৬৮	২২·৬৮
পশম	৭৩,০৩,৩৪১	৫৮,৫১,৭৮২	৭১,৭৭,১৫০	৪১,৮৫,৯৪১	২১,৫৫,৫২৯	১৯·৫২
অন্যান্য চিজ্	৫০,৪৭,১০৯	৪৩,৬০,৮০৪	৫৫,৪০,৯৫০	৬৬,০৪,৮৭৩	৩৩,৫৭,৭৪৪	৩০·৪০
মোট বিদেশী মাল রপ্তানি	১,৬৭,৬৯,৫৯৫	১,৩৯,৪৮,০৩৬	১,৭৭,৭৩,১২৪	১,৬৬,৭১,৫৪৭	১,১০,৪৩,৭১০	১০০·০০
মোট রপ্তানি	২৬,৪৩,৯৯,০৫৮	২৮,৫৮,১৫ ৪৯৭	২৯,০২,৩৬,৫৮১	২৫,৫২,৩১,১৭৩	১৮,০৭,২৩,৭৬৬	

ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠ-শিল্প

টিক্ বা সেগুন কাঠ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বপ্রধান কাষ্ঠ-সম্পদ। এই সেগুন ছাড়াও আরও কয়েক প্রকারের মূল্যবান কাঠ ব্রহ্মদেশের বন-জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সরকারী গবেষণাগারে আরও কয়েকপ্রকারের কাঠ লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। এই সমস্ত কাঠ যাহাতে বিক্রী হয় ইহাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। কয়েক প্রকারের বার্ম্মিজ্ কাঠের পরিচয় প্রদত্ত হইল :

১। গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী—পিয়াডো এবং থিটিয়া-ইন্দিন্ কাঠ। এই দুই জাতীয় কাঠ ঘরবাড়ী-নির্ম্মাণে এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

২। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কাঠ—ধন এবং বিন্না অস্ত্রাদির হ্যাণ্ডেল্ এবং প্রিন্টিং ব্লকের উপযোগী।

৩। কার্পিচারের কাঠ—টোবিয়ান্ এবং বিন্মা। এই দুই কাঠ গৃহস্থালী আসবাব এবং নানাপ্রকারের কারু-কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী।

সাধারণতঃ যেসমস্ত কাঠে উই পোকা লাগে না এবং বৃষ্টির জলে যাহা শীঘ্র পচে না এইরূপ কাঠই গৃহ-নির্ম্মাণের পক্ষে উপযোগী। ব্রহ্মদেশের কাঠের মধ্যে বিলান্ কাঠই এ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই কাঠ চিনিয়া লওয়া বড়ই শক্ত। কারণ অন্যান্য খারাপ কাঠও প্রায় একই রকম দেখিতে। সম্প্রতি মেসার্স ষ্টিল্ ব্রাদার্স ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্রহ্মদেশের মফঃস্বল অঞ্চলে চালান দিয়াছেন। টেনাসেরিম্ প্রদেশেই এই কাঠ প্রচুর পরিমাণে মিলে। কিন্তু মাস্তলের জন্য বেশী বলিয়া এই কাঠ রেঙ্গুনে বা বাহিরে চালান দেওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ একটী কৃষিপ্রধান প্রদেশ মাত্র। সুতরাং দ্বিতীয় নম্বরের অর্থাৎ শিল্পকার্য্যের উপযোগী কাঠের চাহিদা ব্রহ্মদেশে বড় একটা নাই। সরকারী টিম্বার রিসার্চ্চ ডিভিশন এই ধরণের কাঠেরও বাজার খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং বিক্রয় করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন :

১। বার্ম্মা রেলওয়ে, বার্ম্মা কর্পোরেশন মাইন্স্ এবং ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানী টুল্ হ্যাণ্ডেলের জন্য ধন্ জাতীয় কাঠ ব্যবহার করিতেছে।

২। ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম্ কোম্পানী এবং অন্যান্য

অঞ্চলে কোম্পানীগুলি দিন ভেকের মত শক্ত কাঠ ব্যবহার করিতেছে।

৩। বিন্না কাঠ, রেঙ্গুনের কয়েকটী প্রেসে ফটো প্রিন্টিং ব্লকের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ কাঠের চাহিদা এত কম যে এই কাঠ আহরণ এবং বিক্রয়ের জন্য কোন কার্য্য বা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

বার্ম্মার কেরোসিন তেলের কলগুলিতে গাদায় গাদায় কাঠের বাক্সের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মদেশ হইতেই যাহাতে এই বাক্সের চাহিদা সম্পূর্ণ হয় সেজন্য চেষ্টাচরিত্রও সময় সময় করা হয় বটে; কিন্তু সুবিধা দেখা যায় না। কারণ এই সমস্ত বাক্সের জন্য পাতলা কনিফার কাঠই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু ব্রহ্মদেশে এই ধরণের কাঠ পাওয়া যায় না, আর যদিও বা স্থানে স্থানে ইহা দেখা যায় তাহা আহরণ করা দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে জাপান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর আমেরিকা এই কনিফার কাঠে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত দেশে এই কাঠ আহরণ করার এবং বাজারে ফেলার কারখানা অপূর্ব্ব। সুতরাং পাতলা কাঠের ব্যবসায়ে এই তিন দেশের সহিত বার্ম্মা কেন কোন দেশেরই আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই।

রেঙ্গুনের কাষ্টম্স্ অফিসের হিসাবপত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মদেশে সাম্পান নৌকা তৈরীর জন্য মালয় রাজ্য হইতে কাঠ আমদানি করা হইয়া থাকে। ১৯২৮-২৯ সনে এই কাঠ আমদানি কম হয় এক লাখ টাকার।

ঘরের আসবাবপত্রের উপকরণ হিসাবে কিন্তু সেগুন কাঠই সব চেয়ে সুবিধাজনক। অন্য কোন কাঠ যে সেগুনের স্থান অধিকার করিবে সে আশা অতি অল্প। তবে সৌন্দর্য্য হিসাবে প্রায় ডজনখানেক কাঠ সেগুনকে অতিক্রম করিয়াছে। সরকারী কাঠ গবেষণা বিভাগ হইতে বিক্রয় করিয়া দেখা গিয়াছে ব্রহ্মদেশে এই সমস্ত কাঠ নির্ম্মিত আসবাবপত্রের বাজার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে পারে।

আসবাবপত্রের উপকরণের উপযোগী আরও তিন প্রকারের কাঠ ব্রহ্মদেশে আছে। এই তিন প্রকারের কাঠ ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া যাইতে পারে। কাঠ তিনটীর নাম—টোখান, প্যাডক্ এবং থিট্কা। টোখান কাঠের দোষ এই যে, কাড়াই করিবার সময় তাহা অত্যন্ত চটিয়া যায়, এবং এই কাঠের উপর হাতিয়ার চালান আদৌ সহজসাধ্য নহে। তবে ইহার রং অতি চমৎকার, এবং মিলেও প্রচুর পরিমাণে। যদি এই কাঠ নরম করিবার ব্যবস্থা করা যায় তবে ইহা একটী লাভজনক পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইতে পারে।

প্যাডক্ কাঠ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও জন্মিয়া থাকে। আন্দামানি প্যাডক্ বার্ম্মিজ্ প্যাডকের চেয়ে নরম এবং উহাতে হাতিয়ার চালানও সহজ। সেইজন্য বার্ম্মিজ প্যাডক্ কাঠের ব্যবসায়ে সেরূপ জাঁকিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

থিট্কা কাঠ প্যাডক্ এবং টোখানের মত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। সরকারী কাষ্ঠ গবেষণা বিভাগ হইতে ১৯২৯ সনে ১৫০ টন থিট্কা কাঠ হল্যাণ্ডে চালান দেওয়া হয়। এবং আশায় পড়িয়া রেঙ্গুনে আরও থিট্কা কাঠ জমা করা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা আর থিট্কা সম্বন্ধে সেরূপ মনোযোগ দিতেছে না। উহারা লোহার কাঠেরই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। থিট্কা কাঠের দুষ্প্রাপ্যতাই এই ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার কারণ।

গবর্ণমেণ্ট আরও অনেক প্রকারের কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এই সমস্ত কাঠ গুদামেই পচিতেছে:

১। ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের কাজে ব্যবহৃত জিয়ো, লেজা এবং বিন্নাডু কাঠ, পিন্নাডু বা কানিয়াম্ কাঠের মত টেঁকসহিও নহে এবং এই সমস্ত কাঠের দোষও অনেক; সেইজন্য এই কাঠগুলির পরিষ্কার মিলা অসম্ভব।

২। শিল্পকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী কাঠের মধ্যে ব্রহ্মদেশে ইউ, বিন্না এবং বিমেন্ কাঠ মিলে। একে ব্রহ্মে কলকারখানা সেরূপ নাই, তাতে আমদানি কনিফার কাঠ ব্রহ্মদেশজাত পাতলা কাঠের চেয়ে ঢের সস্তা এবং বাক্স তৈরীর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক। সুতরাং এই তিন জাতীয় কাঠের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আশা একরূপ নাই বলিলেই হয়।

৩। সেগুন কাঠের চেয়েও দেখিতে সুন্দর কাঠগুলির চাহিদা খুব কম। সেই জন্য সেগুন কাঠই ব্রহ্মদেশের বাজার দখল করিয়া রাখিয়াছে। আবার সেগুন কাঠ দামেও সস্তা। সুতরাং টোঙ্গিয়ান, প্যাডক এবং থিটকা কাঠগুলি মাঠে মারা যাইতেছে। এই কাঠগুলি অবিক্রী হওয়ার আর একটী কারণ এই যে, এগুলি চেরান নিতান্ত সহজ নয়, অন্য পক্ষে রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতা এত বেশী যে এই গুলি কাটানো রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠ-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থাতো এই; তবুও ভবিষ্যতে যাহাতে এই শিল্প সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই জন্য কিভাবে উহা সংঘটিত করিতে হইবে এবং বাজারই বা কি ভাবে খোলা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ হইল:

১। গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী কাঠের মধ্যে থিঙ্গ কাঠ লক্ষ্য করিবার বস্তু। এই কাঠ শক্ত অথচ সেগুন চটিয়া, ফাটিয়াও যায় না। সেগুন কাঠের চেয়ে এই কাঠ সস্তা এবং পিঙ্কাডো কাঠের তুলনায় ইহার কাজ করা সহজ। তবে এই কাঠের দোষ এই যে, নিকৃষ্টতর থিঙ্গাডু কাঠ এবং এই কাঠ একই ধরণের। যদি এই কাঠ চিনিবার এবং গ্রাহকগণকে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করিবার কোন সহজ উপায় বাহির করা যায় তবে ভবিষ্যতে এই কাঠের ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থাগমের সম্ভাবনা।

২। শিল্পকার্য্যের উপযোগী কাঠের মধ্যে, ছাতেল তৈয়ারীর জন্য ইউ কাঠ; প্রিন্টিং ব্লক তৈয়ারীর জন্য বিন্না এবং হু কাঠ, কেরোসিন তেলের গনির রড্ তৈয়ারীর জন্য টগুরিক এবং শিল্প কাঠ রীতিমত লক্ষ্য করিবার বস্তু। যে সমস্ত কাঠ লইয়া বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশে ব্যবসায়বাণিজ্য চলিতেছে, ঐ সকল কাঠের মধ্যে ইহাদের জুড়িদার কাঠ নাই। থিট্‌কাডো কাঠের ব্যবসায়ও বেশ চলিতে পারে। চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি আসবাবপত্রের উপরের আচ্ছাদন এবং লাইন দেওয়ার পক্ষে এই কাঠ অত্যন্ত উপযোগী।

ব্রহ্মের বাহিরে এই সমস্ত ব্রহ্মদেশজাত কাঠের বিক্রয় সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোন সুলক্ষণ দেখা যায় না। কারণ এই সমস্ত বাজারে বৈদেশিক কাঠগুলিরই আধিপত্য বেশী। উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। তবুও টোঙ্গিয়ান এবং বিন্না কাঠ লইয়া রপ্তানি বাণিজ্য সুন্দরভাবে চলিতে পারে, এই জন্য যে, টোঙ্গিয়ান্ কাঠ সস্তা অথচ ইহার রং ভাল এবং ইহা দেখিতে মন্দ নয়; এবং বিন্না কাঠ প্রকৃত মেহগেনি কাঠ। অন্যান্য ক্যাবিনেট্ কাঠের রপ্তানি ব্যবসায় চলিতে পারে কিনা তাহার জন্য রীতিমত অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

দুনিয়াব্যাপী বাণিজ্য-হ্রাস

১৯৩০ সনে দুনিয়ার বড় বড় শিল্পপ্রধান দেশগুলির প্রত্যেকটীতে বাণিজ্য-হ্রাস ঘটিয়াছে। ১৯২৪ সনের গড় ব্যবসা-তুলনার 'সূচী সংখ্যা' অনুসারে প্রত্যেক সনের ব্যবসার পরিচয় দেওয়া হইল। ইহাতে ১৯৩০ সনের বাণিজ্য-হ্রাসের পরিচয় পাওয়া যাইবে :

আন্তর্জ্জাতিক উৎপাদন সূচী-সংখ্যা

(১৯২৪ = ১০০)

সন	ফ্রান্স	জার্ম্মানি	মার্কিণ
১৯২৭ সনের গড়	১০০·৯	১৯৫·১	১১১·৬
১৯২৮ "	১১৬·৬	১৪৪·৯	১১৬·৮
১৯২৯ "	১২৭·৫	১৪৭·৪	১২৫·৩
১৯৩০ " "	১১৯·৬	†১২৪·৪	†১৯২·১
বৃদ্ধি (+) কিংবা হ্রাস (−)	%	%	%
১৯২৮	+১৫·৬	−০·১	+৪·৭
১৯২৯	+৯·৪	+১·৭	+৭·৩
১৯৩০	+১·৬	−১৫·৬	−১৮·৫

উপরের এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, ১৯২৯ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে সব চেয়ে বেশী বাণিজ্য-হ্রাস ঘটিয়াছে মার্কিণ, ক্যানাডা এবং জার্ম্মানিতে : কিন্তু সূচীসংখ্যার হিসাবে দেখা যাইতেছে, শেষোক্ত দেশ দুইটী ১৯২৪ সনের তুলনায় অনেক উপরে। বিলাত এবং সুইডেনের বাণিজ্য-হ্রাস সেরূপ মারাত্মক নয়। কারণ বিলাতে বাণিজ্য-হ্রাস ছয় বৎসরের ছমাস পরে এবং সুইডেনে বৎসরের তৃতীয়াংশে। কেবলমাত্র ফ্রান্সের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন ; কারণ ফরাসী দেশে ব্যবসা বাড়িয়াছে ১·৬% ; কিন্তু ফ্রান্সের অবস্থাও ভাল নয় ; গত জুলাই মাস হইতে ফ্রান্স দেশেও বাণিজ্য-হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসরের শেষের ৬ মাসে কিরূপ গতিতে বাণিজ্য-হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইবে :

---

* বর্ষঘটের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত।

† প্রাথমিক।

(১৯১৪ = ১০০)

সন	ফ্রান্স	জার্মানি	মার্কিন
	↕		↕
১৯২৯ শেষ কোয়ার্টার	১৩০·৯	১৪১·৩	১১৪·৭
১৯৩০ ১ম কোয়ার্টার	১৩১·৩	১৩৫·৮	১১০·৫
„ ২য় কোয়ার্টার	১৩১·৩	১৩০·০	১০৯·১
„ ৩য় „	১২৮·৭	১১৭·০	৯৭·২
„ ৪র্থ „	১২৫·০	§১১৪·৭	৪৯·১
„ ডিসেম্বর	১২৪·১	§১১৪·২	§৮৮·৩

১৯৩০ সনের শেষের কোয়ার্টারে মার্কিন এবং ক্যানাডার বাণিজ্য-হ্রাস ঘটিয়াছে সবচেয়ে বেশী। বিগত ডিসেম্বরে মার্কিণের বাণিজ্য-হ্রাস ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৩·৭%। ফ্রান্স এবং সুইডেনের জানুয়ারি মাসের হিসাবও পাওয়া গিয়াছে; জানুয়ারিতে ঐ দুই দেশের সূচীসংখ্যা যথাক্রমে ১২৩·১ এবং ১০৮·৭; সুতরাং ঐ দুই দেশে ডিসেম্বরের তুলনায় আরও বেশী বাণিজ্য-হ্রাস ঘটিয়াছে।

১৯৩০ সনে দুনিয়ার মোটর-উৎপাদন

(সংখ্যাগুলি হাজার গুণ করিয়া বুঝিতে হইবে)

সন	বিলাত			মার্কিন		ক্যানাডা	
	মোট	প্রাইভেট্ গাড়ী	কমার্শিয়াল গাড়ী	মোট	প্রাইভেট গাড়ী	মোট	প্রাইভেট্ গাড়ী
১৯২৭	২১২	১৬৫	৪৭	৩,৪০১	২,৭৪১		১৪৭
১৯২৮	২১২	১৫৫	৫৭	৪,৩৪৯	৩,৮২১		১৯৭
১৯২৯	২৩৯	১৮২	৫৭	৫,৩৪৮	৪,৫৮৬		২০৭
১৯৩০	২৩৭	১৭২	৬৫	৩,৩১১	২,৮১৮		১২৫

উপরের ঐ সংখ্যা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ১৯৩০ সনে বিলাতে প্রায় ১৯২৯ সনের সমান মোটর গাড়ী তৈরী হইয়াছে। প্রাইভেট্ গাড়ীর সংখ্যা কমিলেও, কমার্শিয়াল গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়া মোট উৎপাদনের ভাগ রক্ষা করিয়াছে। মার্কিন দেশে এই সনে মোট গাড়ী উৎপাদন করিয়াছে ৩৭%এর উপর; কিন্তু ক্যানাডার কপাল ভাঙিয়াছে আরও বেশী; এই দেশে কমতির পরিমাণ ১৯২৯ সনের তুলনায় ৪১%। গোটা দুনিয়ার ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে; সেই জন্য মোটর রপ্তানি বাণিজ্যেও ভাঁটা পড়িয়াছে। সুতরাং মোটর উৎপাদনকারী দেশগুলিকে মোটর উৎপাদন কমাইতে হইয়াছে। মোটর উৎপাদনকারী বড় বড় দেশগুলির মোটর রপ্তানির পরিমাণ নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল:

* কোয়ার্টারলি ইন্‌ডেক্স্। † সাময়িক পরিবর্তন অনুসারে হিসাব। ‡ আংশিক হিসাব। § প্রাথমিক।

দুনিয়ার মোটর রপ্তানির সংখ্যা

(সংখ্যাগুলি হাজার গুণ করিয়া বুঝিতে হইবে)

সন	বিলাত				মার্কিণ		কানাডা	
	মোট	মোট তৈয়ারীর %	প্রাইভেট্	কমার্শিয়াল	মোট	মোট তৈয়ারীর %	মোট	মোট তৈয়ারীর %
১৯২৭	৩৬	১৮·৮	—	—	৩৮৪	১১·৩		৫২·১
১৯২৮	৩৪	১৫·৪	২৬	৭	৪০৮	১১·৬		৩২·৯
১৯২৯	৪২	১৭·৭	৩৪	৮	৫৪৭	১০·২		৩৮·৬
১৯৩০	৩০	১২·৫	২৩	৭	*২২৪	*৭·০		*২৯·০

তিনটী দেশেই মোট উৎপাদন এবং রপ্তানি উভয়ই কমিয়াছে দেখা যাইতেছে। বিলাত আপন এলাকার মধ্যে বিক্রয় বাড়িয়াছে বলিয়া সোয়াইয়া লইয়াছে। ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে বিলাতে মোটর আমদানির হিসাব লইলেই ইহা বুঝা যাইবে। এই দুই সনে বিলাতে মোটর আমদানির পরিমাণ, ৩৯,১০০ ও ১২,৪০০ খানি। বিলাতে মোটর গাড়ী রেজেষ্টারি করার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ১৯২৯ সনের শেষ পর্য্যন্ত এদেশে মোটর গাড়ী রেজেষ্টারি করিবার সংখ্যা ১,৪০৮,৭০০ খানি (৯৮০,৯০০ খানি প্রাইভেট্ কার সমেত); ১৯৩০ সনে মোটর রেজেষ্টারি হইয়াছে ১,৪০৫,৭০০ খানি (১,০৭৬,২০০ খানি প্রাইভেট্ কার্ সহ)। ১৯৩০ সনে মোটর লরী রেজেষ্টারির সংখ্যা ২২১,৮০০ খানি, অর্থাৎ ১৯২৯ সন হইতে ১৬,১০০ খানি কম, কিন্তু ১৯২৮ সনের তুলনায় ১২,১০০ খানি বেশী। নিম্নের তালিকায় অশ্ব-শক্তি হিসাবে কতগুলি নূতন প্রাইভেট্ গাড়ী রেজেষ্টারি করা হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :

নূতন রেজেষ্টারি করা প্রাইভেট্ গাড়ী

(সংখ্যাগুলি হাজার গুণ করিয়া বুঝিতে হইবে)

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
৮ অশ্বশক্তি	২৬	৪০	৪০
১০ অশ্বশক্তি	৫	৯	১১
১২ অশ্বশক্তি	৫৪	৫২	৫৫
১৫ অশ্বশক্তি	৯	১১	২২
১৬ অশ্বশক্তি	১০	১৭	১৮
১৭ অশ্বশক্তি	৭৭	৫৬	৩১
মোট	১৫৮	১৬৫	১৪৫
এনক্লোজ্‌ড্ কারের %	৭০·৭	৮৩·৭	৮৯·১

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে 'খোলা' গাড়ীর (বেওকার) বেওয়াজ আবার বাড়িয়াছে। কিন্তু যাবতীয় বরণের গাড়ীর চলনই সব চেয়ে বেশী।

দেশবিদেশের চাষ-আবাদ

ধান

১৯৩১ সনে মার্কিণ দেশে ৯৭·১% জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে; গত বৎসরে ধানের আবাদ হইয়াছিল ৯৮০,০০০ একর জমিতে। এ বৎসরে আন্দাজ ১৮,২২৫,০০০ সেণ্টাল ধান্য উৎপন্ন হইবে; গত বৎসরের উৎপাদন ছিল ১৮,৫৭২,০০০ সেণ্টাল।

নিম্নে ইন্দোচীনের ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সনের ধান্য উৎপাদনের তুলনামূলক তালিকা প্রকাশ করা গেল, ছাঁটাই চাউলের মিলিয়ন পাউণ্ডে হিসাব প্রদত্ত হইল :

বৎসর	কোচিন চায়না	টঙ্কিন্	আনাম	কাম্বোডিয়া
১৯৩০-৩১	৪,০৫৮	—	৯৬৮	১,৩২০
১৯২৯-৩০	৩,৭৭৯	৩,০৮১	১,৫৯০	১,০৭৩

* জানুয়ারি-নবেম্বর ১১ মাসের হিসাব।

উপরের এই তালিকায় দেখা যাইতেছে কোচিন-চীন এবং টঙ্কিনেই ধান জন্মায় সবচেয়ে বেশী। ১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় ১৯৩০-৩১ সনে কোচিন-চীনে ধান জন্মিয়াছে ১% বেশী। উৎপাদন-বৃদ্ধির কারণ জমিতে ফসল উৎপাদন বাড়িয়াছে। টঙ্কিন সম্বন্ধে যদিও এখনও কোন খবর পাওয়া যায় নাই, তবু অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা অনুসারে মনে হয়, এই প্রদেশেও উৎপাদন বাড়িবে। আনাম প্রদেশের বৎসরের শেষার্দ্ধের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ফসল বাড়িয়াছে ৯%, ১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় এই প্রদেশে জমি বৃদ্ধি হয় যদিও ২৫%, কিন্তু তবু এই প্রদেশের উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণাংশে অনাবৃষ্টি ও প্লাবনের জন্য আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হয় নাই। কাম্বোডিয়ার ধান জন্মিয়াছে ৩০% বেশী। আবাদ বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্য মাত্র, কিন্তু উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে অসম্ভব রকম।

শ্যামরাজ্যের ধান-চালের কিরিস্তি

	১৯২৯	১৯৩০		
	শেষ দফা	প্রথম দফা	দ্বিতীয় দফা	শেষ দফা
যত জমি চষা হইয়াছে	৪,৪৯৮,০০০ একর	৪,৫২৮,০০০ একর	৪,৫৯৪,০০০ একর	৪,৪৯২,০০০ একর
যত জমির ধান নষ্ট হইয়াছে	২০৫,০০০ „	৪০০,০০০ „	৪৮০,০০০ „	৫১৮,০০০ „
যে জমির শস্য কাটা হইবে	৩,৫৯৩,০০০ „	৪,১২৮,০০০ „	৪,১১২,০০০	৪,০৭৬,০০০ „
প্রত্যেক একরে কত ফসল ফলিবার সম্ভাবনা	১২ পিকল	১২ পিকল	১২ পিকল	১২ পিকল
মোট উৎপাদন	২,৫৭৫,০০০ টন	৩,১৫০,০০০ টন	২,৯৪০,০০০ টন	২,৯৪০,০০০ টন
রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত ধান	১,৩৭৫,০০০ „	১,৭২৫,০০০ „	১,৭৫০,০০০	১,৭৫০,০০০
গত বৎসরের জের	২৬০,০০০ „	২০০,০০০ „	২০০,০০০ „	২০০,০০০ „
মোট রপ্তানিযোগ্য ধান	১,৬৩৫,০০০ „	১,৯২৫,০০০ „	১,৯৫০,০০০ „	১,৯৫,০০০ „

তুলা

মিসরে এবার তুলার আবাদ কম করা হইয়াছে। গত বৎসরে আবাদ হইয়াছিল ২,১৬২,০০০ একর জমিতে। এত বেশী তুলার আবাদ মিসরে আর কখনও হয় নাই। তুলার বাজার মন্দা পড়ার জন্য এ বৎসর তুলার আবাদ কম করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে 'স্যাকেল্লারিদি' জাতীয় তুলার আবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়। নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি ব্যতীত অন্য কোথাও এই জাতীয় তুলার আবাদ করিবার উপায় নাই। এই আইন তিন বৎসরের জন্য করা হইয়াছে এবং ১৯৩২-৩৩ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এই আইন অনুসারে স্যাকেল্লারিদি তুলার আবাদ ৮৬১,০০০ একরের স্থলে ৫৮৫,০০০ একরে করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই তুলার আবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট নজর রাখেন এবং এই তুলার বীজ কৃষকদিগকে প্রদান করেন।

এ্যাংলো-ইজিপ্সিয়ান সুদানে ৫৪৩,০০০ সেণ্টাল (১১৩,৫০০ বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে উৎপন্ন হয় ৬৬৫,০০০ সেণ্টাল (১৩৯,২০০ বেল)।

মদিনা

পেরাগুয়ে দেশে ১৯৩০ সনে ১,০০৮,০০০ সেণ্টাল মদিনা উৎপন্ন হইয়াছে; ১৯২৯ সনে উৎপন্ন হইয়াছিল ১,৭৩১,০০০ সেণ্টাল। মার্কিন মুলুকে গত সনে মদিনার

আবাদ হইয়া ছিল ৩,৯৪৬,০০০ একরে ; এ বৎসর ২১·২% জমিতে মসিনার আবাদ আছে। এই সনে মসিনা উৎপন্ন হইবে আন্দাজ ১৬,০০০,০০০ সেণ্টাল। ১৯৩১-৩২ সনের মসিনার মজুদের পক্ষে ৩,০০০,০০০ সেণ্টাল কমতি পড়িবে বলিয়া মনে হয়।

উরুগোয়ের সরকারী সংবাদে প্রকাশ, ১৯৩০-৩১ সনে ঐ দেশে মোট ২,৫৭৪০০০ সেণ্টাল মসিনা উৎপন্ন হইয়াছে। উরুগোয়ে এত বেশী মসিনা আর কোন কালে জন্মায় নাই।

সর্ষপ

পোলাণ্ড দেশে ১৯৩০ সনে সর্ষপের আবাদের পরিমাণ ছিল ৬৫,০০০ একর ; ১৯২৯ সনে আবাদ ছিল ৫৮,০০০ একর। ১৯৩০ সনে সর্ষপ উৎপন্ন হয় ৬১০,০০০ সেণ্টাল, এবং ১৯২৯ সনে ৫২২,০০০ সেণ্টাল।

চীনা বাদাম

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কৃষিবিভাগ এবার স্থির করিয়াছেন যে, ৩০·৭% অতিরিক্ত জমিতে এবার চীনা-বাদাম আবাদ করা হইবে। ১৯৩০ সনে চীনা বাদাম আবাদ হয় ১,৮২৭,০০০ একর জমিতে। প্রত্যেক ষ্টেটে চীনা-বাদামের আবাদ বাড়িবে। ১৯২৯ সনের রেকর্ড শস্যের তুলনায় এই বৎসর উৎপাদনও ৭% বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রকাশ।

সেনিগালে (ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা) এই শস্যের অবস্থা খুব ভাল ছিল। ভাল বীজ নির্ব্বাচন এবং আধিম অধিবাসীদের মধ্যে বাদাম আবাদের রেওয়াজ-বৃদ্ধির জন্যই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

গম

১৯৩১ সনে ইয়োরোপে গমের আবাদ হইতেছে ৭২৫ লক্ষ একর জমিতে। ১৯৩০ সনে গমের আবাদের জমির পরিমাণ ৭২৮ লক্ষ একর। গত বৎসরের চেয়ে আলোচ্য সনে গমের অবস্থা ভাল নয়। পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরীর অবস্থা এই রকমের। অতিবৃষ্টির ফলে ফ্রান্সে গমের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মার্চ্চের প্রীষ্মের কল্যাণে অবস্থা আবার ফিরিয়াছে এবং বিশেষ কোন ক্ষতি না হইবার সম্ভাবনা। রুমানিয়ায় শীতকালীন শস্যের অবস্থা ভাল এবং বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার অবস্থা উৎকৃষ্ট।

১৯৩১ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত রুশিয়ার শস্যের অবস্থা একরূপ ছিল। কোন কোন অঞ্চলে গমের অবস্থা গত বৎসরের অবস্থার চেয়েও ভাল দেখা গিয়াছে। এই জুন পর্য্যন্ত রুশিয়ায় গম আবাদের পরিমাণ ৫৯,৯৪৬,০০০ একর।

দুনিয়ার দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দুইটী দেশের গমের অবস্থাও ভাল নয়। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৩০ সনে গমের আবাদ হইয়াছিল ১৮০ লক্ষ একর জমিতে ; কিন্তু ১৯৩১ সনে আবাদ হইয়াছে ১৩৩ লক্ষ একরে। ১৯৩০ সনে আর্জ্জেণ্টিনায় গমের আবাদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৮ লক্ষ একর ; কিন্তু ১৯৩১ সনে ১০% অর্থাৎ ১০ লাখ একর কম জমিতে গমের আবাদ হইতেছে। তবে এই দুই দেশেই আবাদের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা বেশ ভালই ছিল।

লাইব্রেরী-সম্পদে বিভিন্ন দেশ

মিঃ এড্ওয়ার্ড হার্কনেস্ নামক আমেরিকার জনৈক ধনী ব্যক্তি নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪০ লক্ষ পুস্তক-বিশিষ্ট একটী বিরাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে এই বদান্য ধনী ব্যক্তি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ কোটী ডলার দান করিয়াছেন। বিলাতে শিক্ষাকার্য্যের প্রসারতা সাধনের জন্যও ইনি বহুলক্ষ ডলার দান করিয়াছেন। কলাম্বিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন লাইব্রেরীটী দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীতে পরিণত হইবে। বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বহুকালের হইলেও সেখানে বড় জোর ১০ লক্ষ পুঁথি রহিয়াছে।

আমেরিকার মত বড় বড় ধনী আর কোন দেশেই নাই। এই ধনীরা যখন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর নেকনজর করেন তখন যন্ত্রের তাণ্ডবলীলা পড়িয়া যায়। তাই দেখা যায় বিলাতের কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের মত

প্রাচীন এবং বনিয়াদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও আমেরিকার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও অধিকতর ধনসম্পদের অধিকারী। শিক্ষাকার্য্যে কোন ধনবান ব্যক্তির অর্থসাহায্য করিবার ইচ্ছা হইলে আমেরিকান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কপাল এইরূপে প্রসন্ন হয়। ওয়াশিংটন সহরস্থ কংগ্রেসের লাইব্রেরী আমেরিকার আর একটী বাঘা লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ৩৫ লক্ষ।

আমেরিকার লাইব্রেরীগুলি পুস্তক-সংখ্যা হিসাবে শ্রেষ্ঠ তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু ভাল পুস্তকের সংখ্যা এই সমস্ত লাইব্রেরীতে খুব বেশী নাই। এসম্বন্ধে ফ্রান্সের ন্যাশনাল লাইব্রেরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এত বেশী ভাল এবং দুষ্প্রাপ্য বই এবং হস্তলিখিত পুঁথি দুনিয়ার আর কোন লাইব্রেরীতেই নাই। লাইব্রেরীটী মধ্যযুগ হইতে বর্ত্তমান আছে।

ফ্রান্সের জাতীয় লাইব্রেরীর পরেই ওজনহিসাবে বিলাতে বৃটিশ মিউজিয়ামের স্থান। ইহার পুস্তক-সংখ্যা ৩২ লক্ষ। যে সমস্ত তাকে বই সজ্জিত থাকে সেইগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৫৫ মাইল হইবে। বইগুলি যদি আবার গুছাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে মিউজিয়ামের চাকরবাকরদের ৩ বৎসর সময় লাগিবে। দুনিয়ায় এতবড় রেফারেন্স্ লাইব্রেরী আর কোথাও নাই। বৎসরে এই লাইব্রেরীতে ৩,০০০ ধরণের কাগজ এবং পত্রিকা রাখা হয়।

বিলাতে আরও দুইটী বড় লাইব্রেরী আছে। এই দুইটী কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী। কপিরাইট আইন অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রিত পুস্তকের একখণ্ড করিয়া বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং এই দুই লাইব্রেরীতে প্রেরণ করিতে হয়।

জার্ম্মানিতে বিভিন্ন সরকারী লাইব্রেরীর মোট পুস্তক-সংখ্যা ৪১,০০০,০০০ খানি। ইতালির সংখ্যাও প্রায় ঐরূপ। ইতালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীটী কিন্তু ফেরারকার। এইটী মিলান সহরে অবস্থিত এবং ইহার নাম এ্যাম্ব্রো-সিয়ানা।

কেনিয়া এবং উগাণ্ডার ব্যবসা-বাণিজ্য

(১৯৩০ সন)

সম্প্রতি কেনিয়া এবং উগাণ্ডার ১৯৩০ সনের সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এই দুই দেশের আমদানি এবং রপ্তানির মিলিত হিসাব বাহির হইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্যের হিসাবে এই দেশ দুইটীর উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য এবং যে সমস্ত মাল পুনঃ রপ্তানি হইয়াছে এই দুই বিষয়ের হিসাবই সন্নিবেশিত হইয়াছে। আলোচ্য সনে কেনিয়া এবং উগাণ্ডার মোট ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্য ১৩,৮৭১,৮৮৩ পাউণ্ড; ১৯২৯ সনে ১৮,০৬২,১২০ পাউণ্ড এবং ১৯২৮ সনে ১৭,৫১২,৪৪৮ পাউণ্ড ছিল।

দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য ছাড়করান মালপত্রের দাম আলোচ্য সনে ৬,৮২০,৭১২ পাঃ; ১৯২৯ সনে ছিল ৮,৮০৭,৯১০ পাঃ। সুতরাং ১৯৩০ সনে ১৯২৯ সনের তুলনায় এই দুই দেশের লোকজন বিদেশী মাল ১,৭৮৭,১৯৮ পাঃ মূল্যের অর্থাৎ ২০·৭৬% কম ব্যবহার করিয়াছে।

আলোচ্য সনে কেনিয়া এবং উগাণ্ডাজাত পণ্য রপ্তানির মূল্য ৫,৪৮৩,০২৪ পাঃ; ১৯২৯ সনে ৭,০২০,৬১৮ পাঃ, অর্থাৎ ১৯৩০ সনে ১৯২৯ সনের তুলনায় ২১·৯% কম। ইহার মধ্যে কেনিয়াজাত মালের দাম ৩,৪২২,৫৭১ পাঃ এবং উগাণ্ডাজাত মালের দাম ২,০৬০,৪৫৩ পাঃ।

কেনিয়া এবং উগাণ্ডা দেশের সহিত দুনিয়ার যে যে দেশের মালপত্রের উল্লেখযোগ্য আদান-প্রদান ঘটিয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহার হিসাব প্রকাশিত হইল:

দেশের নাম	দেশ মধ্যে আমদানি	দেশজাত মাল রপ্তানি	পুনঃ রপ্তানি
গ্রেট্ব্রিটেন্ ও নর্দার্ণ আয়ার্ল্যাণ্ড	২,৪৩০,৩৬৬ পাঃ	২,৩৭১,৩৮৭ পাঃ	১৭,৫৫৫ পাঃ
ভারতবর্ষ	৭২২,৭৮৫	১,৩২৯,৫০৯	৫৭,০২৮
ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা	১০৪,৮৫৯	৬৬,৯৯৩	
ক্যানাডা	১৯২,৮০৩	৫,৫০৪	

ট্যাঙ্গানিয়াকা*	৫৯৯,১২৩	১৯১,৩৮৮	৬৮৭,৪০৫
বৃটশাধিকৃত অন্যান্য দেশ		১২৫,৬৮৯	
জার্ম্মানি		৪৪, ৪৮	
বেল্‌জো-লাক্সেমবুর্গ একনমিক ইউনিয়ন	৮৪,১২৭	৩৩৪,৩১৯	
ফ্রান্স	১০১,৭৭১	৮৭,৭০৭	
ইতালি	১০৪,২৯৮	৫৫,৭৪১	
নেদারল্যাণ্ডস্	৩২৬,০১২	৮৯,২৩৬	
জাপান	৪৫৯,৪৭৭	২৪৫,৩০৮	
পার্শিয়া	১২৭,১০২		
মার্কিণ	৭৬৭,৫২২		
ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ্	২৪২,২৭৯		
অন্যান্য দেশ	২৫২	২২৪,৮০১	৫৬৮,১০৩
মোট	৬,৮২০,৭১২	৫,৪৮৩,০২৪	১,৩৬৫,১২৪

ভারতবর্ষ হইতে যে যে মাল আসিয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল (১৯২৯ সনের হিসাব পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে বুঝিতে হইবে) ঃ

চাউল ৮৩,১৫৬ পাঃ (১০২,১০৫ পাঃ) গম এবং গমের ময়দা ৪৮,২০৯ পাঃ (৫৮,৫৭৯ পাঃ); চা ২৪,০১৯ পাঃ (৪৯,১৫৬ পাঃ); কাপাসের বস্ত্র (টেক্সটাইল) ৮০,৩২৫ পাঃ (১৪২,১৬৭ পাঃ); পাটের চট, থলে ১১৬,০০০ পাঃ (১১৯,০৭৭ পাঃ)।

কাপড়-চোপড়

আমদানি বাণিজ্যে কার্পাসজাত চিজের স্থান সর্ব্বাগ্রে। ১৯৩০ সনে দেশবাসীর জন্য বস্ত্র ছাড় করান হয় ৯২৮,৪৮৪ পাঃ মূল্যের অর্থাৎ মোট আমদানির ১৩·৫৮%। এই খাতে আমদানি শুল্ক আদায় হয় ১৭৬,০৯৬ পাঃ অর্থাৎ মোট শুল্ক আদায়ের ১৫·৫%।

আমদানি কার্পাস বস্ত্রের দাম ৫·৮ পেঃ গজ; ১৯২৯ সনে এই দর ছিল ৫·৭ পেঃ এবং ১৯২৯ সনে ৬ পেঃ। কার্পাসের কম্বলের দাম প্রত্যেকখানি ১ শিঃ ৭·২ পেঃ; ১৯২৯ সনে ১ শিঃ ৮·৩ পেঃ এবং ১৯২৮ সনে ১ শিঃ ৮·৮ পেঃ।

(ক) নিম্নের তালিকায় গত বৎসরের কার্পাসজাত বস্ত্র আমদানির বিষয় বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

	১৯২৮		১৯২৯		১৯৩০	
	দাম পাঃ	বস্ত্রের হিস্যা %	দাম পাঃ	বস্ত্রের হিস্যা %	দাম পাঃ	বস্ত্রের হিস্যা %
কোরা	৫০৮,৮৭৬	২৪	৩২৪,৩৬৮	২৫	২৪৪,২২৭	২৬
ধোলাই	৯৪,৭৯৮	৭	৭০,৯১৮	৬	৬০,২৯৭	৭
ছাপান	১৩২,১০৪	১০	১৪১,৫৯০		১১২,৪১২	১২
খণ্ড খণ্ড ছাপান	২৪৫,৮২৩	২০	২৩০,৬৮২	১৮	১৭৫,১৪৮	১৯
রঙীণ	৩১০,৩১০	২৩	২৮০,৯১২	২২	১৯২,০৪৬	২১
কম্বল	২১৩,৪৯৪	১৬	২১০,২৬৮	১৭	১৪২,৩৫৪	১৫
মোট	১,৩১৪,৫০৪	১০০	১,২৭১,৭৩৮	১০০	৯২৬,৪০৪	১০০
স্বদেশে ব্যবহৃত		১৫·১২		১৪·৭৭		১৩·৫৮

* ট্যাঙ্গানিয়াকা হইতে নীত মালের অধিকাংশ বিদেশে পুনঃ রপ্তানি হয়।

(খ) নিম্নের তালিকায় গত ৩ বৎসরে কোন্ কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ কার্পাস বস্ত্র আমদানি হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :

যে দেশ হইতে আমদানি	১৯২৮ দাম পাঃ	%	১৯২৯ দাম পাঃ		১৯৩০ দাম পাঃ	%
গ্রেট ব্রিটেন ও নর্দার্ণ আয়ার্ল্যাণ্ড	৩৩৪,৭৪৩					
ভারতবর্ষ	১৬৪,৫৬৭					
বেল্‌জো-লাক্সেমবুর্গ ইকনমিক্ ইউনিয়ন	৪৫,০৪৪	৩	৫৮,৬১০	৫	৪১,৮২৫	
জার্ম্মানি	৩০,৫২১	২	৩৬,৬৩৮	৩	২১,৬৮১	
নেদারল্যাণ্ডস্	৩২২,৬৮০	২৫	২৭৫,০৯১	২২	১৮৪,৯০৮	
জাপান	২৭৫,০৭৯	২১	৫০৭,৬৬৮	২৪	২৭৮,৮৪০	৩০
মার্কিণ	৯০,৬৩৪	৭	১৬,৮৪৩	৭	৫৯,২৮০	৩
অন্যান্য দেশ	৬৮,৮৫৬	৪	৪৬,৩৪৭	৪	৩৫,৭৪০	৪
মোট	১,৩১৫,৫০৫	১০০	১,২৭১,৭৫৮	১০০	৯২৬,৪৮৪	১০০

বিলাত হইতে প্রধানতঃ সূক্ষ্ম কাপড়চোপড় আসে; এ সম্বন্ধে বিলাতের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম হইতে সাধারণতঃ কম্বল আমদানি হয় এবং কোরা কাপড় যোগায় মার্কিণ, জাপান ও ভারতবর্ষ।

ইরাকের ব্যবসা-বাণিজ্য (১৯২৯-৩০)

নিম্নের তালিকাগুলিতে ১০ বৎসরের পরিচয় দেওয়া গেল। আলোচ্য সনে আমদানি রপ্তানি এবং ভিতর দিয়া মাল চালান হয় নিম্নরূপ :

	টাঃ
আমদানি	২৩,২৭,২৪,২০৪
রপ্তানি	১২,০৯,৪১,৮৮১
ভিতর দিয়া চালান	১৬,৭৮,২২,১৫৮
	১৮,১৪,৮৪,১১০
	১০,৮৭,৮৮,০৮৫
	১০,৫৯,৫০,৮৪১
	১০,৭৮,৯৯,৪৮১
	১০,৫৭,৯১,৫০৫

আমদানি দ্রব্যের মধ্যে এবং যে সমস্ত আমদানি চিন পারস্য দেশে চালান দেওয়া হয় তাহার মধ্যে বস্ত্র, চিনি, চা এবং কলে তৈরী জিনিষই প্রধান; রপ্তানির মধ্যে খেজুর, শস্য এবং পশমই উল্লেখযোগ্য।

আমদানি, রপ্তানি এবং ভিতর দিয়া চালান

আমদানি	রপ্তানি	ভিতর দিয়া চালান
টাঃ	টাঃ	টাঃ
২৩,২৭,২৪,২০৪	১০,৩৮,০৮,০৮৫	
১২,০৯,৪১,৮৮১	১০,৫৯,৫০,৮৪১	
১৬,৭৮,২২,১৫৮	১০,৭৮,৯৯,৪৮১	
১৮,১৪,৮৪,১১০	১০,৫৭,৯১,৫০৫	

১৯২৪-২৫	১৯,১২,৪০,৯৮৯
১৯২৫-২৬	১০,৭৮,৩৭,৬:৩
১৯২৬-২৭	১০,৫৯,৬১,০৯৯
১৯২৭-২৮	১০ ৫৫,৪৭,৪৫৫
১৯২৮-২৯	৯,৪০,০৫,৪৭০
১৯২৯-৩০	৯,৮২,৩২,৮৪০

প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য

(লক্ষ টাকার হিসাব)

খেজুর	কাঁচা ও পাকা চামড়া	তুলা	নারকেল	তুলা
২১৫	২০	৫	—	—
১২৫		৩	১৫	—
১৫০		৬	১৮	—
১৪৮		১৪	৩১	—
১৮৩		—	৫৩	—
২০৫			৩১	৮
১৬৭			১০	৫
১৮০½			৮	৩
১৬১			১২	৯
১৮৮			১৯	৮

প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য

(লক্ষ টাকার হিসাব)

চিনি	কাপড়	ধাতু ও তার	ঘৃত ও পানীয়	শস্য	তেল
৩৭৮	৭৯৭	৪৮	৪৯	৩৩	১৮
৪১২	৭১৩	১৫	৪৭		৫৮
২৪১	৬৫৯	১৩	৪৭		৫৬
২৩০	৭১৫		৩০		৭৬
২৪৭	৭৬৪	৭৯	২৬		৭৪
১৩৩	৩১৪	১৫	২১		৭৩
৮২	২৯১	৫১			৭২
৮১	৩০৫	৫৩			৪৪
৭৯	২৬৭	৩৩			৩৯
৭৭	২৫৭	৪২			৪৪

যে যে প্রধান প্রধান দ্রব্য ইরাকের ভিতর দিয়া চালান গিয়াছে

(লক্ষ টাকার হিসাব)

জিনিষের নাম	১৯২৫-২৬		১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০
বস্ত্র	৩১৫	—	—	—	—
কার্পেট	১৮১	১৮১	১৯২	২০৩	১৬৮
চা	৪৯	৩৯	৪০½	৫৬	৪১
চিনি	৩৪	২১	৮	২১	২১
ধাতু ও তার	২৯	৪	৩৭	৩	৩
নাড়ী	২৫	৭	৬½	৬	
গাড়ী	১৭	২৫	৩৫½	৫২	
গাম ও রেসিন	৯	১১	১১	১২	
চামড়া	৮	৫	৯	১৯	
দেশলাই	৪	২	৩½	২	
তেল	৪	১২	১২	১৫	
পাকা চামড়া	২	২	৪	২	
কাপাসের কাপড়	—	১৯৬	১৪৭	৯০	
রেশমী কাপড়	—	৯	১৪	১৮	
পশমী কাপড়	—	৭	১০	১৭	
সূত্র	—	১	২½	২	

ভারতের প্রথম দেশীয় বণিক-সঙ্ঘ

বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্স

পূর্ব্ব ইতিহাস

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়তন যখন ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, তখন সেই ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্য-সম্পদের উপর যাঁহারা আপনাদের শ্রীবৃদ্ধির বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ছিলেন বিদেশীয় বণিক। এই প্রকার বাণিজ্য-বিস্তৃতির দ্বারা যে দেশেরই হৈত্ত সূচিত হইতেছিল তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; কেবল কতিপয় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীই এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, দেশীয় বণিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশীয় বণিক-সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতার সংঘাতে আত্মরক্ষা করিয়া চলা তাহাদের পক্ষে দুরূহ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। তাই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র এই কয়জন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী অশেষ আশা এবং উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার সমগ্র দেশীয় বণিক-সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়বান হয়েন। তাঁহাদের প্রচেষ্টাতেই বাঙ্গালার গৌরবস্থল ভারতের প্রথম দেশীয় বণিক-সঙ্ঘ "বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্স" প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর দুরদৃষ্টবশতঃ এই কাহিনী আজ অনেকেরই স্মৃতিপট হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

সে যাহা হউক, বাঙ্গালীর এই গৌরবস্থল প্রতিষ্ঠান যে আজ ৪৭ বৎসর বাঁচিয়া তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া আপনাকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারিয়াছে ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি স্বীয় উদ্যমের উপর আস্থাবান হইতে শিখিবে। বাঙ্গালীর ব্যবসা-উদ্যমের সহায়তা এবং পোষকতা করাই ছিল এই বণিক-সঙ্ঘের চরম উদ্দেশ্য। দেশীয় বণিকদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং আত্ম-কলহ দমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একতা-বোধ জাগাইবার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। কর্তৃপক্ষের নিকট নানারূপ আবেদন এবং দাবী করিয়া, দেশীয় ব্যবসায়িগণকে নানাবিধ স্বার্থহানির বিপদ হইতে রক্ষা করাও এই প্রতিষ্ঠান নিজ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় করিয়া লইয়াছে। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই দেশীয় ব্যবসায়িগণের স্বার্থ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে সেই বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। বাঙ্গালার দেশীয় ব্যবসায়িগণের স্বার্থ রক্ষণ এবং পোষণের জন্যও নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্স দিন দিন আপনাকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের কৈফিয়ৎ

যে কারণে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন হইয়াছিল তাহা ইহার প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ভারতের স্বাভাবিক সম্পদের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যে ভারতীয় বণিকগণ একতা-বন্ধনের শক্তির অভাবে নিজেদের ব্যবসা-বিস্তৃতির ক্ষেত্র সৃজন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেছেন না এবং ইহারই ফলে যে বিজাতীয় ইয়োরোপীয় বণিকগণ আপনাদের পুষ্টিসাধন করিয়া লইতেছেন,—ইহাই এই বিবৃতির মর্ম্ম। বোম্বাই প্রদেশের উদ্যমশীল বণিক-সম্প্রদায়ের

দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বিস্তৃতির এক স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালার ব্যবসায়ীদিগকে অগ্রগামী হইতে হইলে বোম্বাইয়ের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিসমূহ

বাঙ্গালার এই আদি বণিক-সঙ্ঘের যাঁহারা উদ্যোক্তা ছিলেন বা যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহার পরিপোষণ করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহারা সকলেই প্রাতঃস্মরণীয়। স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ সেন, স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এন্, এন্, ঘোষ প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণ, যাঁহারা বৃহত্তর বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম বৎসরেই এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টের পদে নির্ব্বাচিত হইয়া ইহার কর্ণধারস্বরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পরলোকগত মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের নাম প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান ইজ্জৎ

আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই বণিক-সঙ্ঘ ক্রমশঃ তাহার কার্য্য-ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া আপনাকে এরূপ শক্তিমান প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে যে ভারতীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রায় সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানেই এই বণিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ বিরাজ করিতেছেন। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে যে যে প্রতিষ্ঠানে এই বণিক-সঙ্ঘ প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহা জানা যাইবে। শুধু ইহা দ্বারাই বেঙ্গল চাম্বার অব্ কমার্সের বর্ত্তমান ইজ্জৎ পরিমাপ করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে।

১। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষৎ।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষৎ।
৩। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট।
৪। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট।
৫। ওয়াটারওয়েজ ইন্কোয়ারি কমিটী।
৬। কলিকাতা ধূম্র নিবারণী সমিতি।
৭। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট্।
৮। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে পরামর্শ-দাতা সমিতি।
৯। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে পরামর্শ-দাতা সমিতি।
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে পরামর্শ-দাতা সমিতি।
১১। কেন্দ্রীয় তুলা-নিয়ন্ত্রণ সমিতি।
১২। প্রাদেশিক তুলা-নিয়ন্ত্রণ সমিতি।
১৩। শ্রমিক শান্তিরক্ষণ সমিতি।
১৪। মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল পরিদর্শন সমিতি।
১৫। কলিকাতা পঞ্জরাপোল নিয়ন্ত্রণী সভা।
১৬। কয়লার গুল নির্ব্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি।
১৭। রেল-শুল্ক নিয়ন্ত্রণ সমিতি।
১৮। কলিকাতা টেক্‌নিক্যাল স্কুল নিয়ন্ত্রণ সমিতি।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারের প্রারম্ভে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবস্থা পরিষৎ সংক্রান্ত নির্ব্বাচন-ক্ষমতা বণ্টন করিবার জন্য যে তদন্ত কমিটি নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহার নিকট বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই বণিক-সঙ্ঘের প্রাধান্য সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন সাধারণের অবগতির জন্য তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট তখন বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার বিভিন্ন বণিক-সঙ্ঘের মধ্যে বেঙ্গল চাম্বার অব্ কমার্স শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণ এই সঙ্ঘের সভ্যদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে"।

বাঙ্গালায় ব্যবসা-উদ্যমের উদ্বোধন

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আজ বাঙ্গালীর সতর্ক হইয়া চলিবার দিন শেষ হয় নাই। এখনও বাঙ্গালায় ইয়োরোপীয় এবং

অ-বাঙালী ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় দিন দিন শক্তি-সঞ্চয় করিয়া লইতেছেন। এই শক্তি-সঞ্চয়ের ফলে ভবিষ্যতে ভারতের আসন্ন শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ব্যবসায়ীর সমস্যা ক্রমশই ঘোরতর হইয়া উঠিবে। এই আসন্ন সমস্যার বাঙালীর উৎসাদন এই বণিক-সঙ্ঘকে রক্ষা করিয়া তাহাতে বলসঞ্চার করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্র-নির্বিশেষে আজ বাঙালীর ইহা অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে।

বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারী শিল্প-বিভাগ

বোম্বাই প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারী শিল্প-বিভাগটীর কর্ম-প্রচেষ্টা ৪ ভাগে বিভক্ত :—

১। সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প-প্রচেষ্টাসমূহ অর্থাৎ ফ্যাক্টরি সমূহ,

২। কুটীর-শিল্প,

৩। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা,

৪। বিবিধ কার্য্য।

১৯০০ সনে এই বিভাগ হইতে নানা প্রকারের সাহায্য করা হইয়াছে; উদাহরণস্বরূপ বোম্বাই প্রদেশের স্বর্ণপাত-শিল্প এবং দর্জি-শিল্পের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুইটী শিল্প ছাড়া আরও কতকগুলি নূতন শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

১৯৩০ সনে এই বিভাগের নিম্নলিখিত শিল্পগুলি সম্পর্কে সরকারী অনুসন্ধান চলিয়াছে :

ট্যালো সাবষ্টিটিউট ইণ্ডাষ্ট্রি,

চীনামাটী শিল্প,

চিনি শিল্প,

দেশলাই শিল্প,

ট্যানিং শিল্প।

৯টী নূতন অথচ ছোট ছোট শিল্পসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শিল্প-বিভাগের হস্তগত হইয়াছে। দেশের যে কোন সমস্ত ইচ্ছা করিলে এই বিভাগ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন। নিম্নলিখিত ছোট ছোট শিল্পগুলির বিশেষ বিবরণী দেশের নিকট পেশ করা হইয়াছে; দেশের সমস্তগণ ইচ্ছা করিলে এগুলি যাচাই করিয়া দেখিতে পারেন :

হোসিয়ারি শিল্প,

স্লেট শিল্প,

চেষ্টা ও নানাকৃতি ঘড়ি নির্ম্মাণ (ব্রেডিং) শিল্প,

কনফেক্‌শনারি শিল্প,

জাহাজী ঘড়ি শিল্প,

ডিস্‌ইনফেক্টাণ্ট ম্যুরিয়েটেড শিল্প,

টিংচার এবং স্পিরিট শিল্প।

সরকারী শিল্পবিভাগের মতে দেশের অধীন একটী ইণ্ডাষ্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশান গড়িয়া তোলা আবশ্যক। এই এ্যাসোসিয়েশানটীর কার্য্য হইবে দেশবাসীর মনে শিল্পপ্রীতি জাগাইয়া তোলা, আর দেশবাসীর মনে শিল্পপ্রীতি দেখা দিলেই দেশে প্রকৃত শিল্পোন্নতি আবির্ভূত হইবে।

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পরামর্শ সমিতি গঠনের মুসাবিদা

স্যর আর্থার সল্টার জাতি-সঙ্ঘের (লিগ অব্ নেশনস্) আর্থিক বিভাগের ডিরেক্টার। ১৯৩০ সনের ২১শে নবেম্বর তারিখে ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতে একটী নূতন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করিবার জন্য ইঁহার পরামর্শ লইয়া ইঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক প্রগতি যে যে পথে চলিতেছে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যে যে সুবিধা কায়েম করা আবশ্যক তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করেন। জাতি-সঙ্ঘের তরফ হইতে অন্যান্য দেশের আর্থিক উন্নতির ধারা এবং পন্থাগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করাও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। স্যর আর্থার সল্টার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং লিগের তরফ হইতে আন্তর্জাতিক কর্মচারি-রূপে ভারতগবর্ণমেণ্টকে পরামর্শদানের জন্য এদেশে শুভাগমন করেন।

স্যর আর্থার সল্টার এদেশে অনুসন্ধানাদি করিয়া একখানি বিবরণী প্রকাশ করেন। বিবরণীটী ৯টী অধ্যায়ে বিভক্ত : ১। অবতরণিকা, ২। অন্যান্য দেশের নবগঠিত অর্থনৈতিক পরামর্শ-সমিতিসমূহের বিবরণ; ৩। ভারতের পক্ষে কি কি দরকার; ৪। নীতি সম্বন্ধে

পোড়ার কথা; ৫। একটী নূতন পরামর্শ-সমিতির সুবিধা—(ক) কেন্দ্রীয় পরিষদ :—(১) সদস্যপদ, (২) সদস্য নিয়োগের নিয়ম এবং সদস্যের অধিকার, (৩) সদস্যদের কার্য্যকাল, (৪) কোথায়, কোন সময়ে এবং কিভাবে কাজ করিতে হইবে, (৫) চেয়ারম্যান্ (৬) দপ্তরখানা। (খ) প্রাদেশিক পরিষদ; ৬। শাসক-সম্প্রদায়ের স্বরূপ; ৭। ব্যয়সঙ্কোচের কথা; ৮। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যোগাযোগ; এবং ৯। মন্তব্য।

সুবিধার কিয়দংশ

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বিবরণী হইতে নূতন অর্থনৈতিক পরামর্শ সমিতির সুবিধা সম্বন্ধে লিখিত অধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :

আমার মতে (ক) একটী কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরামর্শ পরিষৎ এবং (খ) প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী প্রাদেশিক অর্থনৈতিক পরামর্শ পরিষৎ গঠন করা আবশ্যক। কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করিলে আপন রাজ্যেও এই ধরণের পরিষৎ কায়েম করিতে পারেন। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই দেশীয় রাজ্যের পরিষদগুলি কেন্দ্রীয় পরিষদের অধীন প্রাদেশিক পরিষদরূপে বিবেচিত হইবে না, উহা সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হইবে।

(ক) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

সদস্যপদ

নিম্নলিখিতরূপ অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সদস্য করা হইবে :

(ক)

কৃষি,
ব্যাঙ্কিং এবং রাজস্বনীতি,
বাণিজ্য,
শ্রমিক সঙ্ঘসমূহ,
সমবায় সমিতিসমূহ,
খনিবিজ্ঞানসেবী,
শিল্প,
শ্রমিক প্রতিষ্ঠান,
আইনজ্ঞের সভা,
সরকারী চাকুরে,
রেলওয়েজ্ ও কমিউনিকেশান্স্।

(খ)

প্রাদেশিক কাউন্সিলসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ।

(গ)

নিম্নলিখিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ (প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতে একজন) :

ভারতীয় কার্পাস কমিটি,
দি ট্যারিফ্ বোর্ড,
কৃষিগবেষণার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল,
দি জুট কমিটি, দি রিসার্ভ ব্যাঙ্ক } গঠিত হইবার পর।

সদস্য-নিয়োগ এবং সদস্যদের কর্ম্মপন্থা

সদস্য নিয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা; কারণ একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিতে পারেন বা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাও থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, সাময়িক বিষয়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য হইতে প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোকজন যাহাতে নিযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সদস্য বাছাই করিবার সময়েও এইরূপ গুণ এবং অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। ব্যাপারটী শুরুতর সন্দেহ নাই। মিঃ সল্টার জেনেভাতেও এইরূপ অসুবিধা দেখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি জেনেভা সহরের একনমিক কন্সাল্টেটিভ্ নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে সকল জাতির এবং সকল প্রকারের অভিজ্ঞ ব্যক্তির স্থান হইবার কথা। জাতীয় প্রতিনিধি বাছাই করার ব্যাপারে মালিকদের তরফ হইতেই বেশীর ভাগ সদস্য আসে;

সমূহের তরফ হইতে অতি অল্পসংখ্যক সদস্যই আসিবার সুযোগ পায়; আবার যাহা ব্যক্তিগত গুণের উপর নির্ভর করিয়া বাছাই করিতে গেলে অনেক জাতি বাদ পড়িয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জেনেভায় একরূপ কর্পোরেটার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল জাতিকেই আমন্ত্রণ করা হয় বটে, কিন্তু নিয়োগের ভার থাকে লিগের হাতে। এজন্য লিগ কতকগুলি সর্ত বাঁধিয়া দিয়াছে; এই সর্তগুলি পূর্ণ হইলে সদস্য নিয়োগ করা হয়।

প্রস্তাবিত কাউন্সিল সম্পর্কেও এই অসুবিধা ঘটিতে পারে, এবং অসামঞ্জস্যও দেখা দিতে পারে; সেই জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে নিয়োগ সম্বন্ধে শেষ বাছাইয়ের ভার থাকা উচিত। কারণ প্রদেশগুলি একই ধরণের গুণবিশিষ্ট মাত্র দুইএকটী প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

সদস্য-নিয়োগ সম্পর্কে অন্যান্য জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফ হইতে যাহাতে প্রতিনিধিসমূহ নিযুক্ত হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং এই ধরণের প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যে সমস্ত সমিতি বা সঙ্ঘ এই পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে সেগুলিকেও কতকগুলি সর্ত মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে জাতীয় জীবনের এক একটী বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠা দরকার এবং ঐগুলিকে আপন আপন বিশেষত্বসমূহ জাহির করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি এমন হওয়া চাই, যাহাতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেই উহারা নির্বাচিত হইতে পারে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন এবং যতদূর পর্যন্ত প্রতিনিধিমূলক নীতি অনুসারে চালিত হয়, প্রস্তাবিত পরিষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠানও সেইভাবে এবং ততদূর পর্যন্ত প্রতিনিধিমূলক নীতিতে গঠিত হইয়া উঠিবে। ভারতের বর্তমান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা কাযের হইতে পারে নাই; এবং এখন এমন একটী প্রতিষ্ঠানও নাই যাহা হইতে উল্লিখিত সর্তগুলি অনুসারে সদস্য বাছাই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বর্তমান অবস্থা অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকেই সদস্য বাছাই করিতে হইবে; তবে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া আনিতে হইবে।

বাছাই করিবার পক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের হাতে তত্ত্বাবধানের ভার থাকা উচিত; নতুবা সদস্য-নির্বাচনে সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইলে নিয়োগ-কর্তাদিগকে গোটা মুনাফিবাজী সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিতে হইবে; এবং উহাদের সহিত প্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ রাখিতে হইবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যানকে প্রাদেশিক পরিষদের কর্তাদিগকে মুনাফিবাজী বুঝাইয়া দিতে হইবে। ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইলে বাণিজ্য সভাগুলিরও সুবিধা হইবে। কারণ ঐগুলি অন্যের দেখাদেখি প্রতিনিধি-নির্বাচন-বিষয়ক কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেই সব শেষ হইয়া যাইবে না। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে তবু তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। যাহাতে প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে প্রয়োজনীয় সদস্য ছাড়া কিছু বেশী সদস্য আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বাছাই করিয়া সদস্য নিয়োগ করিবেন। কিন্তু ইহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে; কারণ ইহাতে স্বেচ্ছাচার আসিতে পারে। ইহার প্রতিকারার্থে খুব বেশী বেশী প্রতিনিধি প্রেরিত না হইয়া যাহাতে আবশ্যক সংখ্যা অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী প্রতিনিধি প্রেরিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই হস্তক্ষেপ না হইলে সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব ব্যাপার হইবে। তবে কালক্রমে যখন পরিষদের কার্যাদিসম্বন্ধে নিয়োগ-কর্তাদের অভিজ্ঞতা জন্মিবে এবং কিভাবে সদস্য বাছাই করা উচিত তাহা যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে তখন আর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের বিশেষ দরকার হইবে না; গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ তখন যতদূর সম্ভব কমাইয়া দেওয়া হইবে যা একেবারেই থাকিবে না। তবে এ অবস্থা আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সংঘাতে যাহাতে সামঞ্জস্য

নষ্ট না হইয়া যায় সেদিকে কড়া নজর রাখিতে হইবে। শুধু বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোন গোলযোগ নাই। কেবল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়াই যত গোলযোগ, এবং সে সম্বন্ধে একটু বেশী হুঁসিয়ার হওয়া আবশ্যক। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত বেশী; এবং এইগুলির কার্য্যকরী শক্তি ঐ সংঘর্ষের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

সামঞ্জস্য বিধান কোন কোন স্থলে রীতিমত কঠিন হইয়া উঠে। জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের যে যে স্থলে কোনরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা বা মিলিত কার্য্য-শক্তি দেখা যায় না, সেই স্থলেই গোলযোগ উপস্থিত হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জেনেভাতে এই অসুবিধা দেখা গিয়াছে,—বিশেষতঃ কৃষি সম্পর্কে। ভারতেও এই অবস্থা আবির্ভূত হইবে; অথচ এই কৃষিই ভারতের জাতীয় ধনাগমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক পন্থা। সুতরাং কৃষি-গবেষণার সরকারী পরিষদের (বি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকাল্চোরাল্ রিসার্চ) তরফ হইতে একজন প্রতিনিধি লইবার দরকার হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা করিলেই সব শেষ হইয়া গেল না। ভবিষ্যতে যদি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কৃষিবিষয়ক স্বার্থ-বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্ভূত হয় তবে সেগুলির তরফ হইতেও প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এবং আরও নানাপ্রকার সাহায্য দান করা আবশ্যক। ইত্যাদিরূপে কৃষি-সম্পর্কীয় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার গবর্ণমেণ্টের হাতেই ন্যস্ত থাকা আবশ্যক। কৃষি-প্রতিনিধির সংখ্যা এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা এরূপ থাকার প্রয়োজন যাহাতে দেশের কৃষি সম্বন্ধে হু ও কু এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সমস্তই উহারা সরবরাহ করিতে পারেন। অন্যান্য কাজে যোগাযোগ লোকজনের সহিত সংখ্যার অনুপাতে যে কৃষির তরফ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে তাহা নহে। কিন্তু কৃষি-প্রতিনিধির সংখ্যা এরূপ হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের মিলিত শক্তি, প্রভাব এবং অভিজ্ঞতা এরূপ থাকা আবশ্যক যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক কর্ম্মপন্থা নিরূপণ সম্পর্কে কৃষিকার্য্য উহার তরফ হইতে দাবী দাওয়া হইতে বঞ্চিত না হয়। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে ভারতের অর্থনৈতিক পলিসি মাঠে মারা যাইবে; আর যদি তাহাই হয় তবে এইরূপ পরিষদেরই বা প্রয়োজন কি?

খাদকদের (কন্‌জিউমারস্) স্বার্থরক্ষার বেলাতেও এই ধরণের সমস্যা দেখা যাইতেছে। খাদকদের সর্ব্বনাশকর অনেক অর্থনৈতিক পলিসি অবলম্বন হইয়াছে। যুক্তি এই যে, ইহারা আদৌ সঙ্ঘবদ্ধ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে খাদকদের স্বার্থরক্ষার কিছু কিছু উপায় অবশ্যই আছে। কোন কোন শ্রেণীর উৎপাদনকারী আবার অন্যান্য উৎপন্ন মালের খাদক; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে খাদকগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে; উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রেল-পথের মালিকদিগকে লোহার রেল ক্রয় করিবার জন্য অন্যের খাদ্য হইতে হয়; আবার কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্যের জন্যাতি কিনিতে হয়। কিন্তু ইহাতে মোটা সমস্যার আংশিক সমাধান মাত্র সম্ভবপর। মোদ্দা কথা হইতেছে এই যে, জীবনযাত্রার খরচপত্র-বৃদ্ধির অস্বাভাবিক গতি হইতে খাদক বা ভোক্তাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। ভোক্তাদাতাদের নিকট হইতে ব্যবস্থাপক সভাসমূহ তাহাদের কর্তৃত্বের অধিকার পায়। সুতরাং এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের স্বার্থ-সিদ্ধি সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। কিন্তু যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত জনসাধারণ এইভাবে সংশ্লিষ্ট নহে, সেইগুলি হইতে সমস্ত বাছাই করিবার সময় ভোক্তাদিগের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে আরও বেশী নজর রাখা চাই। ইংলণ্ডে এবং জেনেভার অর্থ-নৈতিক পরামর্শ কমিটিতে সমবায় সমিতিগুলি ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করে। এই সমস্ত সমবায় সমিতি সাধারণতঃ খুচরা ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এখনও এই ধরণের সমিতি গড়িয়া উঠে নাই। ফ্রান্স দেশে মিউনিসিপ্যালিটীর তরফ হইতে প্রেরিত সদস্যগণ ভোক্তা-দিগের স্বার্থরক্ষা করিবে এরূপ ব্যবস্থা আছে। বিলাতে ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কন্‌জিউমার্স কাউন্সিল অর্থাৎ খাদক পরিষৎ আছে, অর্থনৈতিক পরামর্শ পরিষদের সহিত এই পরিষদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, দেশের আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণে এই শেষোক্ত পরিষদের

অনেক হাত আছে। ভারতবর্ষের অবস্থা এখনও ইয়োরোপের মত নয়, সুতরাং এদেশে এখন গবর্ণমেণ্টকেই সমস্ত ব্যাপার করিয়া লইতে হইবে।

যতদূর সম্ভব, প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদের তরফ হইতে একজন প্রতিনিধি থাকিলেই চলিবে, তবে প্রয়োজনমত প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রতিনিধি পরিবর্ত্তনের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা চাই।

ইণ্ডিয়ান কটন কমিটি, ট্যারিফ বোর্ড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকাল্‌চারাল্ রিসার্চ্চ, প্রস্তাবিত জুট কমিটি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—এইগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ধরা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে এক একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইলেই যথেষ্ট।

সদস্যগণ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে উপরে যে সুপারিশ এবং নীতি বাৎলান হইল উহা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা এই বিবরণীতে প্রকাশ করা যায় না। কি কি গুণ বা অভিজ্ঞতা থাকিলে সদস্য হওয়া যাইবে, এবং সদস্যদের সংখ্যাই বা কত হইবে এবং বাছাই করিবার কর্ত্তৃত্ব কাহার হাতে থাকিবে ও কি ভাবেই বা সদস্য নিযুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা এই ক্ষুদ্র বিবরণীতে সম্ভবপর নহে। ইনষ্টিটিউট্ অব্ ব্যাঙ্কার্সএর মত প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে কতদূর প্রসার বিস্তার করিবে তাহা বলা যায় না। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বেশী ব্যাঙ্কগুলির তরফ হইতে যদি একটী সমিতি গঠিত হয় এবং তাহার সহিত ইনষ্টিটিউট অব্ ব্যাঙ্কার্স মিলিত হইয়া যায় তাহা হইলে অবস্থার আরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতে সদস্য নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন আসিতে পারে। মজুরদলের তরফ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় বর্ত্তমানে যেমনভাবে যে ভাবে মজুর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রেরিত হয় সেই ভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলেই চলিবে। কেন্দ্রীয় পরিষদে আপাততঃ ৫০ জন সভ্য হইলেই চলিবে।

কি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে

পরিষদের তরফ হইতে বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুতান্ত্রিক অনুসন্ধানই করা হইবে বটে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এই অনুসন্ধান যাহাতে সুফল প্রসব করে সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া যদি অনুসন্ধান চালান হয়, তবে দুদিন পরে যখন এই রাজনৈতিক আন্দোলন কমিয়া যাইবে, তখন এই অনুসন্ধান প্রাণহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য। অপর পক্ষে নিছক থিয়োরি লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও চলিবে না। পরিষদকে এই দুই কূলের মধ্য দিয়া নৌকা চালাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় পরিষদকে নিখিল ভারতের সাধারণ স্বার্থ এবং সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে; তবে প্রাদেশিক পরিষদের কার্য্যাবলীর সমন্বয়-সাধনও ইহার একটী বড় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ভারতবর্ষে ভ্রমণের সময় মিঃ সল্টারের নিকট কতকগুলি সমস্যা প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পরিষদের সমস্যাবরূপ বিবেচিত হয়, যথা,—জমিজমা বন্ধক লওয়ার ব্যাপ্ত প্রথা; তামাকের একচেটিয়া ব্যবসার প্রবর্ত্তন; হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক্ পাওয়ারের প্রসারতা সাধন; পাট নিয়ন্ত্রণ সমিতি; বিক্রয় সমিতির প্রতিষ্ঠা; বেশলাই প্রভৃতি কয়েকটী শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান। আরও দুইটী সমস্যা আছে যাহার জন্য আরও বেশী মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ, ভারতের শিল্পগত এবং আর্থিক উন্নতি বিধান সম্পর্কে একটী সাধারণ সুপারিশ স্থির করা; ভবিষ্যতে এই সুপারিশ অনুসারে কার্য্য-পরিচালনা রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, বাসগৃহ সমস্যা, স্বাস্থ্য-রক্ষা, ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ের সুব্যবস্থা করা। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য পরিষদকে বাহিরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, নগর-নির্ম্মাণকারী ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার শিক্ষানীতিবিদ্ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি প্রাদেশিক পরিষদ হইতেই উত্থাপিত হওয়া ভাল; তবে শেষে কেন্দ্রীয় পরিষদকে সমন্বয়-সাধন করিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আর

গবর্ণমেণ্ট সকল সময় এই সমস্ত সমস্যা উত্থাপন করিতেও পারেন না। পরিষদের তাগিদ হইতেই এই সমস্ত ব্যাপার উত্থাপিত হইবে। পরিষদের সুপারিশ থাকিলে গবর্ণমেণ্ট কখনই তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ ক্ষমতা থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইবে না। বৃটিশ কাউন্সিলের ক্যাবিনেট্ মেম্বারদের মত স্বয়ংক্রিয় কোন সেফগার্ড অবশ্য এই পরিষদের থাকিবে না। পরিষদটী প্রধানতঃ বাঁচিয়া থাকিবে উহার সদস্যদের কাণ্ডজ্ঞানের উপর এবং নিয়োগ ও নির্ব্বাচনের যুক্তি-যুক্ততার উপর। যদি আরও কিছু স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন হয় তাহা হইলে (ক) গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অনুসন্ধানের আংশিক তাগিদের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (খ) কোন বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইতে হইলে অন্ততঃ কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ মেম্বারের মত লইতে হইবে। আর্থাণ কাউন্সিলে শেষোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কাউন্সিলের তরফ হইতে অনুসন্ধানের তাগিদ কিছু থাকা দরকার; নতুবা কাউন্সিলের উপর যথেষ্ট অধিকার করা হইবে। বর্ত্তমানের পরামর্শ লইবার রেওয়াজ আছে বটে, কিন্তু তাহা পরোক্ষে। সুপারিশ প্রথমতঃ সরকারই খাড়া করেন। তবে চেম্বার অব্ কমার্স বা আরও পাঁচটা প্রতি-ষ্ঠানের মতামত যাচাই করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহাতে এই সমস্ত পরিষৎ নিজে থেকে কোন সুপারিশ বাহির করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করাইয়া লইতে পারে।

এই সম্পর্কে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক কমিশন বসিয়াছে এবং সরকারী বিবরণীও রহিয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। প্রস্তাবিত পরিষদকে ঐ সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। সরকারী বিবরণীগুলি কিন্তু সমস্তই একই ধরণের নহে। কতকগুলি কার্য্যে পরিণত করার উপায়-বিবর্জ্জিত এবং কতকগুলি বস্তুতান্ত্রিক হইলেও সরকার যাহাদের পয়সার অভাবে বা ইচ্ছার অভাবে ধামা চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। পরিষদকে এই সরকারী বিবরণীসমূহের পক্ষোদ্ধারে নামিতে হইবে; এবং কার্য্যকরী সুবিধাগুলিকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিপদে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলির পরস্পরের মধ্যে ধোঁয়াধোঁচ বাধিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলির দপ্তরখানাগুলিতে ২৪ ঘণ্টা তৎপর থাকিয়া পত্রের আদান-প্রদান দ্বারা সুরাহা করিতে হইবে।

(খ) প্রাদেশিক কাউন্সিল

প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী কাউন্সিল থাকিবে। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অনুরূপই প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির গঠন থাকিবে। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিবে।

সদস্যগণের গুণাগুণ সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের অনুরূপই হইবে (কৃষি, ব্যাঙ্কিং, রাজস্ব, বাণিজ্য খাদক, সমবায় সমিতি, খনিজ্যবসেবী, শিল্প, যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, সরকারী চাকুরে, রেলওয়ে এবং অন্যান্য কমিউনিকেশান্স্)।

তবে (ক) কতকগুলি ক্ষেত্রে এই সমস্ত গুণাগুণের দরকারও নাই; উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রাদেশিক কাউন্সিলে সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধি থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

(খ) সাম্প্রদায়িক-বিধানও প্রদেশ অনুসারে ভিন্ন ধরণের হইবে (পাট বাঙ্গালার বিশেষত্ব, কার্পাস তুলা বোম্বাইএর, ইত্যাদি; কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষিই সর্ব্বোচ্চ সুবিধা পাইবে)।

(গ) প্রাদেশিক কাউন্সিলে নিশ্চয়ই অন্যান্য প্রদেশের দেশীয় রাজ্যের কোন নিখিল ভারত কমিটীর প্রতিনিধি-গণের স্থান থাকিবে না। সুতরাং প্রাদেশিক কাউন্সিল-গুলি আকারে ছোট হইবে, ৫০ জনের স্থানে গড়ে ২০ জন সদস্য থাকিলেই চলিবে।

(ঘ) প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির ঘন ঘন অধিবেশন হওয়ার দরকার; কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫ দিন অন্তর এবং অন্য সময়ে মাসে একবার করিয়া অধিবেশন বসা আবশ্যক। সভ্যগণের বাসস্থান প্রাদেশিক রাজধানীতে বা তাহার

সন্নিকটে থাকা আবশ্যক ; কারণ তাহা হইলে যাতায়াতের জন্য সময় এবং অর্থ কম ব্যয় হইবে।

এই সমস্ত পার্থক্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকিবে না, তবে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিবে। বিষয়-নির্বাচন, কার্যকারিতা এবং ক্রিয়াকারিতা সম্বন্ধে ঢের পার্থক্য থাকিবে। অনগ্রসর প্রদেশগুলিতে কাজ চলিবে ধীর এবং মন্থর গতিতে ; পক্ষান্তরে অগ্রগামী প্রদেশগুলিতে কার্য চলিবে দ্রুত গতিতে ; বিষয়-নির্বাচনে রকমফেরও থাকিবে যথেষ্ট এবং অধিবেশনও ঘন ঘন বসিবার সম্ভাবনা। পাঞ্জাব প্রদেশে আর্থিক অনুসন্ধানের বোর্ড আছে। বোর্ড হইতে স্থানীয় অবস্থাগতিক অনেক মূল্যবান্ অনুসন্ধান-কার্যও সাধিত হইয়াছে। এই বোর্ডটী প্রায় প্রস্তাবিত প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছাকাছি উপনীত হইয়াছে ; তবে ইহা সত্য যে, বোর্ডটীর দ্বারা কাউন্সিলের কার্য চলিতে পারে না। তাই বলিয়া বোর্ডটীকে উঠাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই ; ভবিষ্যতে এই বোর্ড হইতে পরিষদের স্থায়ী সেবার গ্রহণ করা চলিবে। কাউন্সিলের কার্য হইবে আরও ব্যাপক এবং নানা রকমের।

প্রাদেশিক কাউন্সিলের আর একটী বিশেষত্ব এই হইবে যে, উহাতে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত রাখা হইবে। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এইসমস্ত ব্যক্তিগত অনুসন্ধান বা গবেষণা চলিবে। পাঞ্জাব বোর্ডে এই ভাবেই কাজ চলে। এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি সুবিধা আছে। উহাতে কেবলমাত্র ধনবিজ্ঞানের ছাত্রদেরই সুবিধা হইবে না, সরকারী কর্মচারিগণও উহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় হদিস পাইবে, এবং উহার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া আসিবে। যুবক ধনবিজ্ঞানসেবিগণ অভিজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এইরূপ অনুসন্ধানের সুবিধা পাইলে ভবিষ্যতে তাহারা দেশের শাসকরূপে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে।

প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির তরফ হইতে অনুসন্ধানাবলীর মধ্যে প্রদেশের নিজস্ব সমস্যাগুলি তো থাকিবেই, অধিকন্তু, আংশিকভাবে কোন কোন নিখিল-ভারত সমস্যাও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যে সমস্ত নিখিল-ভারত সমস্যায় কোন প্রদেশের বেশী স্বার্থ জড়িত, সেইগুলি সম্বন্ধে প্রাদেশিক কাউন্সিলের তরফ হইতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনই বাধা থাকিবে না।

এই ধরণের নিখিল-ভারতীয় অথচ প্রাদেশিক বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকটীর পরিচয় দেওয়া হইল :

দেশের কৃষকগণ এবং মজুরগণ অনেক সময় আলস্যে দিন যাপন করে। উহাদের যাড়তি সময়ের কর্ম নিরূপণের জন্য বিভিন্ন কুটীর-শিল্পের উদ্ভবন এবং ঐগুলির উন্নতিবিধান সম্বন্ধে মাথা ঘামানো। এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইলে কৃষক এবং মজুরদের সম্পদ্ কিছু যে বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভূমি হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিঙড়াইয়া বাহির করিবার পদ্ধতি। প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং আমদানি বাণিজ্যের দ্রব্য বিক্রয় করিবার নীতি নির্ধারণ, ইত্যাদি।

উল্লিখিত কোন কোন ব্যাপারে প্রাদেশিক কাউন্সিলের পক্ষে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ হইতেই কাজে লাগিয়া যাওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ যেখানে উহার নিজের স্বার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপার নিখিল-ভারতীয় নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার যোগ্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য ব্যাপারে সমস্ত প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির পক্ষে মিলিত হইয়া কার্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

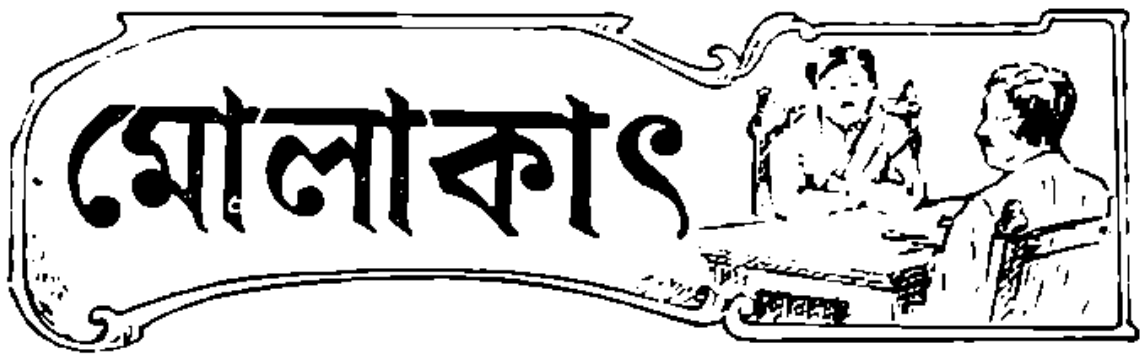

সাবানের কারখানা

[ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোপ এণ্ড কেমিক্যালস্ কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত কথোপকথন।—শ্রীসুষমা সেনগুপ্তা।]

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি তো দেখছি ইংরাজীতে এম্, এ, এ সব কলকব্জা আপনার মাথায় ঢুকল কেমন করে?

উঃ—আসল কথাটা কি জানেন, আমার বরাবরই একটা ঝোঁক ছিল যে একটা ভাল উঁচু ধরের স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। আর তার বনিয়াদ এমনি শক্ত হবে যে, যোগ্যতায় সে যেন যে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আমাদের দেশে তো দেখেছি যখনই বিদেশী বয়কটের ঢেউ আসে, তখনই নানা রকম স্বদেশী জিনিষ বাজারে বেরোয়; আবার কিছুদিন কেটে গেলেই বিদেশী জিনিষের কাটতি সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো দেশ থেকে উঠে যেতে থাকে। কেন এ রকম হয় ভেবে দেখেছেন কি কখনো?

প্রঃ—আমার তো মনে হয় বিদেশী জিনিষ সস্তা, দেশী জিনিষ দামে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তাই এমনি হয়। দিনকতক দেশ-প্রেমের ঝোঁকে লোকে বেশী দাম দিয়েও জিনিষ কেনে। শেষে অর্থসমস্যার চাপে পড়ে সে প্রেম আর বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

উঃ—সেটা একটা কারণ বটে, কিন্তু তাই বা হয় কেন? ওরা সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে প্রতিযুদ্ধে টিন ওপর মজুরি দিয়ে এত দূরে মাল নিয়ে এসে সস্তায় বেচে কি করে, আর আমরাই বা দেশী সস্তা মালমশলা ব্যবহার করে অত মজুরি দিয়েও তা পারি না কেন?

প্রঃ—এ তো অতি সহজ কথা, ওদের এখন কত বড় ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি আর এ সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজ? এ কাজে সফল হতে হ'লে প্রধান যা দরকার:—দেশী শিল্পের পোষক রাজশক্তি-তাতো আমাদের নেই। ওদের শিল্প-প্রতিষ্ঠা ওদের জাতির কাজ, এর জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ওরা ঢের সাহায্য পায়। আমাদের বর্ত্তমানে তেমন সম্ভাবনা কোথায়?

উঃ—সেটা খুব ঠিক কথা, কিন্তু তাই বলে তো আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সমস্ত বাধা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই তো দেশের শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলতে হবে। রাজশক্তি আমাদের এ কাজে সাহায্য করছে না, সহযোগ করবেও না; কিন্তু আমরাই কি বেশ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ পর্য্যন্ত শিল্পকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি? কেমন করে বাজে জিনিষ চালিয়ে খদ্দেরকে ঠকিয়ে বেশী পয়সা লাভ করবে, এই হল ব্যবসায়ীর চেষ্টা। আর খদ্দেরেরও দৃষ্টি কেবল সস্তা দরের ওপর। এত কথাকথি করে জিনিষ কিনেও খদ্দেরের মনটা খুঁতখুঁত করে—কি জানি হয়ত জিনিষটা তেমন সুবিধে দরে কেনা হয় নি।

প্রঃ—এতে আমাদের দেশের লোকের ব্যবসা-বুদ্ধির দোষ

দিচ্ছেন কেন? এটা কি অর্থনীতির একটা মোদ্দা কথা নয় যে, বিক্রেতা যতদূর সম্ভব বেশী দরে বেচতে চাইবে, আর ক্রেতা চাইবে যত সস্তায় সম্ভব তার জিনিষ কিনতে, এবং দু'দলের দর কষাকষির ফলে যেটা রফা হবে তাই হবে মার্কেট প্রাইস বা বাজার দর?

উঃ—দেখুন, অর্থনীতির "বাজার" (মার্কেট) কথাটা বলতে ঠিক তো আর আমাদের শেয়ালদা বাজার বা মেছোবাজার বোঝায় না, সেটা অন্য জিনিষ। সেখানে জিনিষের চাহিদা ও যোগান ঘিরে দর ঠিক হলেও দোকানের বাজার থেকে দরদস্তুর বলে জিনিষটা উঠিয়ে দেওয়াও সম্ভব।

প্রঃ—সেটা আপনি কি করে সম্ভব মনে করেন?

উঃ—বল্‌ছি। এর জন্য প্রধানতঃ যিনি বিক্রেতা তাঁর কতগুলি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ, তাঁর জিনিষটি খাঁটি হওয়া চাই অর্থাৎ তিনি ঠিক যে দরে যে জিনিষটি বিক্রি করবেন বলে প্রচার করবেন, সেই দরে সেই জিনিষটি দেওয়া দরকার। পণ্য খুব বিক্রি বলে ভেজিটেবল্ ঘী দিলে চলবে না। দ্বিতীয় কথা হল দর। দর একেবারে একেবারে বাঁধা এক দর হওয়া ভাল। 'যত দামে ছাড়তে পারি' এটা ঠিক ব্যবসা-বুদ্ধির কথা নয়। প্রথম যখন জিনিষটা তৈরী হ'ল তখনই তা তৈরী করবার নিছক খরচার ওপর একটা ন্যায্য লাভ রেখে কোথায় দর ঠিক করা উচিত। শুধু তাই নয়, একবার যে দর ঠিক করা হবে সেটাই এঁটে ধরে থাকা উচিত। এ রকম হ'লে বিক্রেতারও কখনই ঠকতে হয় না, ক্রেতাও বোঝে যে, ঠিক দরে ঠিক যেমনটী চাই তাই সে পেয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা এ তো গেল ঠিক দরে ভাল জিনিষ দেওয়া না দেওয়ার কথা, এতে কি জিনিষের দাম সস্তা হ'বার কোন ভরসা থাকবে?

উঃ—থাকবে বই কি? ভাল জিনিষ যদি ন্যায্য দরে বিক্রী হয় তবে সেটা বাজারে চলবেই, আর ভাল বাজার পেলে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলতে কিছুই মুস্কিল হবে না। আর শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই জিনিষ পিছু তৈরী করবার খরচ যে কমে আসবে সে কথা তো আপনি জানেনই। তারপর এর পেছনে যদি রাজসাহায্যের সোষকতা থাকে, তবে তো সোনায় সোহাগা।

প্রঃ—তা হ'লে, খাঁটি জিনিষ ঠিক দরে দিতে সুরু করলেই দেশী জিনিষের বাজারও বাড়বে এবং দামও কমবে, এই হ'ল আপনার মত।

উঃ—হাঁ, শুধু আমার মত নয়, কথাটা সত্যও।

প্রঃ—দেখ্‌ছি দেশী ব্যবসা সম্বন্ধে আপনি রীতিমত ভেবে থাকেন। শুধু দাতের খাতিরে অনেকেই ব্যবসা করেন বটে, কিন্তু সত্যিকার একটা দেশী শিল্প ভালো ভাবে গড়ে তুলব এরূপ কম লোকেই ভাবেন।

উঃ—শুধু আমার বলে নয়, এবারকার স্বদেশী শিল্প-উত্থানের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। প্রায় সব রকমের ব্যবসাদারই এখন আর শুধু স্বদেশী জিনিষ তৈরী করেই সন্তুষ্ট হচ্ছে না; উঁচুদরের জিনিষ তৈরী করাটাও এদের একটা লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে।

প্রঃ—আপনার সঙ্গে ব্যবসা সম্বন্ধে আলাপ করে আপনাদের এই সাবানের কারখানা সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ ভাবে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে; আশাকরি সে সব খবর দিতে আপনার কোন আপত্তি হবে না।

উঃ—নিশ্চয়ই না, আপনি যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

প্রঃ—আচ্ছা, প্রথম একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আশাকরি কিছু মনে করবেন না, সাবানের কারখানা তো চারিদিকেই যচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আপনিও যেচে এতেই হাত দিলেন কেন? আপনার কথার ভাবে বুঝ্‌ছি, আপনি সাবান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নন, কেবল কোন একটা ভালো দেশী শিল্প গড়ে তোলবার মতলবেই আপনি এতে হাত দিয়েছেন।

উঃ—দেখুন, সাবান জিনিষটা যখন আমার মাথায় ঢুকেছিল তখন দেশে এত কারখানা বসেনি, মাথায়

চিন্তাটা কার্য্যে রূপান্তরিত হ'তে হ'তে অনেকগুলা ফ্যাক্টরী গাঁড়িয়ে গেল। তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না, এত বড় একটা দেশের চাহিদা মেটানো তো একটা আধটা ফ্যাক্টরীর কাজ নয়। তবে মুস্কিলের কথা এই যে, অনেক সময় নিজেদের মধ্যে রেষারেষির ফলে অনর্থক কতকগুলি খরচা বেড়ে যায়। তার চাইতেও গুরুতর একটা দোষ আমাদের দেশে ঢুকেছে এই যে, অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে নিজেদের জিনিষের উন্নতির চেষ্টা না করে অনেকে বিদেশী মালে দেশী ছাপ মেরে এনে সটান দেশী মাল বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। ফলে দেশী শিল্পের উন্নতি পড়ে থাকুক, বিষম সর্ব্বনাশই হ'তে বসেছে। এটা হচ্ছে শিল্পের ক্ষতি করে ব্যবসা করা। এরকম কয়েকজন ব্যবসায়ীর ধাপ্পাবাজীর ফলে যারা শুধু দেশী আঁকড়ে ধরে আছে তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তারা না পারছে ধরে পাল্লা দিতে, না পারছে তাদের চেয়ে ভাল জিনিষ দিতে।

প্রঃ—কেন, বিদেশীর মত ভাল জিনিষ কি আপনারা তৈরী করতে পারেন না?

উঃ—পারব না কেন? তবে ঠিক ঐ দরে অমনি জিনিষ আমরা এখনো দিতে পারি না। কারুর হলেও তারা প্রকাণ্ড কারখানা ফেঁদে বসেছে। যেমন প্রচুর মাল তারা তৈরী করছে, তেমনি দুনিয়ার সব হাটে বাজারেই তাদের মাল বিক্রীও হচ্ছে। আমাদের দেশে তো এখনো উঁচুদরের মালের অত চাহিদা নেই। সাধারণ বাঙালী দেশী উঁচুদরের মাল চায় না; যারা চায় তাদের সংখ্যা এত কম যে, তাদের দরকার মত মাল তৈরী করলে আমাদের পোষায় না।

প্রঃ—আচ্ছা এই যে বল্লেন আপনাদের ব্যবসায় এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঠকাঠকির কারবার চলেছে, এর কি কোন প্রতীকার নেই?

উঃ—থাকবে না কেন? আছে। যদি এই সমস্ত ব্যবসাগুলো পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করে যত শক্তি তার দ্বিগুণ টাকা নষ্ট না করে পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবেই সব দোষের প্রতীকার হতে পারে। প্রথমতঃ, জিনিষের উৎকর্ষ-সাধনের দিক্ দিয়েও এতে সহায়তা হ'তে পারে। সঙ্ঘ থেকে একটা ভাল 'ল্যাবরেটরী' করে, সেখানে খুঁটিনাটি পরীক্ষা দ্বারা জিনিষের গুণানুসারে শ্রেণীবিভাগ করে যদি উহা বাজারে ছাড়া যায়, তা'হলে বিশেষ কাজ হ'তে পারে। সাধারণ ক্রেতারা সঙ্ঘের ছাপ দেখবামাত্র কি জিনিষ কিনছে, তা বুঝতে পারবে। এ রকম করতে পারলে বাজে জিনিষের কাটতি আপনিই কমে আসবে। দ্বিতীয়তঃ, সবাই মিলে যদি একটা ন্যায়-সঙ্গত দর ঠিক করা যায়, তবে অনর্থক দর-কষাকষি থাকবে না, আর অন্যকে দরে হটাবার জন্য চুরি' জোচ্চুরির আশ্রয়ও নিতে হবে না। তারপর সঙ্ঘটা যদি সত্যিই শক্তিশালী হ'তে পারে, তা'হলে তার নিয়ম ভঙ্গ করে কোন ফ্যাক্টরী অন্যায় কাজ করতেও সাহস পাবে না। সঙ্ঘের আর একটা মস্তবড় সুবিধে হচ্ছে এই যে, এ রকম কোন শিল্পের প্রথমাবস্থায় এরা যদি গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন রকম সাহায্যের দাবী করে, তবে সঙ্ঘের মারফৎ দাবীর জোরও হবে ঢের বেশী।

তা' ছাড়া এই সঙ্ঘ আরও একটা মস্ত বড় জিনিষ করতে পারে। ভারতীয় সাবানের বাঁচবার পক্ষেই তা একান্ত দরকার। সেটা হচ্ছে বিদেশীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা। এই বিদেশীরা যখন দেখবে যে, দেশ থেকে চালান দিলে তা এদেশে বিক্রী হচ্ছে না, তখন তারা এদেশে এসে ফ্যাক্টরী খুলবে। তারা সব মস্ত মস্ত ব্যবসায়ী, কাজ সুরু করলেই এমন প্রকাণ্ড কারখানা কায়েম করে বসবে যে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমাদের এই ছোট ছোট ফ্যাক্টরীর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। তারা তো এদেশে ফ্যাক্টরী করলেই 'ভারতে প্রস্তুত' বলে মাল চালাবে। তা হলেই দেশী শিল্পের সর্ব্বনাশ! সাধারণ ক্রেতারা মালের ঐ দেশী

পয়োজনটুকু দেখলেই খুসী; কে আর ভেতরের খবর রাখে? এর মধ্যেই একটি বিখ্যাত জাপানী সাবান কোম্পানী এই মতলব করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের কাজেরও গোড়াপত্তন সুরু হয়েছে। এই আসন্ন প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেদের দলবদ্ধ হওয়া।

প্রঃ—বেশ বেশ! এ তো খুব ভালো জিনিষ, তা আপনারা তাড়াতাড়ি এটা করে ফেলুন না কেন, যা দেখছি এতে তো সবারই লাভ।

উঃ—সবারই লাভ বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীদের একটা দোষ কি জানেন? তারা সবার লাভের চাইতে নিজের লাভটাই বোঝে বেশী। কেউই নিজের লাভ ছাড়তে রাজী নয়; কাজেই সঙ্ঘগুলি গড়ে উঠতে দেরী হচ্ছে। তবে সাবান-সঙ্ঘ গড়া সুরু হয়েছে এবং দু'একজন করে তাতে যোগদানও করছেন। এ সঙ্ঘটা যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তা হলে সব দিক্ দিয়েই ভাল হবে, এ আমি খুবই আশা করি।

প্রঃ—এ সঙ্ঘের উদ্যোক্তা কে জানতে পারি কি?

উঃ—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর প্রেসিডেন্ট, আর এই অধমই তার সেক্রেটারী।

প্রঃ—আপনিই তাহলে এর উদ্যোক্তা বলুন।

উঃ—তাও বলতে পারেন।

প্রঃ—আচ্ছা আপনাদের ফ্যাক্টরীর বিশেষত্ব কিছু আছে কি?

উঃ—বিশেষত্ব আছে কি না, তা আমাদের কর্ম্মপদ্ধতির কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমতঃ, আমাদের মালের কথা শুনুন। আমরা সাবান তৈরী করবার জন্য যে সমস্ত কলকব্জা ব্যবহার করি তা সবই হাল ফ্যাসানের, আর তা সবই তেল বা বিজলী-শক্তিতে চলে। সাবান তৈরী করবার মধ্যে সব চাইতে কঠিন ও দরকারী হচ্ছে সাবান আল দেবার ব্যাপার। আমরা সেটা 'ষ্টীম'এর সাহায্যে সেরে নেই। আমরা প্রধানতঃ জিনিষের উৎকর্ষ সাধনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকি। জিনিষ তৈরী হবার পর কোম্পানীর ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষাগারে পরখ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন মাল বাজারে ছাড়ি না, আর মাল তৈরী করবার সমস্ত ব্যাপারটা একজন বিশেষ অভিজ্ঞ রাসায়নিকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া আমাদের মাল-মশলা যতদূর সম্ভব দেশী। মশলা যেখান থেকে আরম্ভ করে প্যাকিং করা পর্য্যন্ত সবই আমাদের ফ্যাক্টরীতে হয়। বাক্সের ঢাকনা, বিজ্ঞাপন ছাপা ইত্যাদি সবই ফ্যাক্টরীর ছাপাখানায় হয়।

এই তো গেল নির্ম্মাণ-প্রণালী। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বক্তব্য হ'ল এই যে, আমাদের কোম্পানীটাই এদেশে সাবানের একমাত্র লিমিটেড্ কোম্পানী। এর ডিরেক্টার, শেয়ার-হোল্ডার ও কর্ম্মীরা সবাই বাঙ্গালী। কর্ত্তৃপক্ষদের ও কর্ম্মিদলের ভেতর এমন সহানুভূতি আর মনের মিল খুব কম জায়গায়ই দেখা যায় বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে শিক্ষানবীশরূপে নেওয়া হয়েছে। অফিসনিজেশনের কাজে আমরা মহিলা কর্ম্মীদের নিযুক্ত করেছি।

আমার ইচ্ছা আছে যে, আমাদের ব্যবসার এই প্রথম অবস্থাটা কেটে গেলে যখন থেকে আমরা লাভের অংশ বিতরণ করতে সুরু করব, তখন কুলী থেকে আরম্ভ করে সকল কর্ম্মীকে—যাঁরা আমাদের সহায়তা করবেন তাঁদের সকলকে—লাভের অংশ দেবার ব্যবস্থা করব। এ ছাড়া যাঁরা কাজ করবেন তাদের যদি কাজ করতে করতে কোন দিকে কোন নূতন বুদ্ধি মাথায় আসে, সেটা জানালে সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হবে। এতে কর্ম্মীদের মধ্যে কাজের উৎসাহ খুব বেড়ে যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা, এই ব্যবসার উন্নতির পথে কি কি প্রধান অন্তরায় আছে বলে আপনার মনে হচ্ছে।

উঃ—দেখুন বাংলাদেশে যে কোন ব্যবসা সুরু করতে হলেই সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হ'ছে টাকার অভাব। বাংলায় শিল্পের জন্য টাকা আদায় করা বড় শক্ত ব্যাপার। প্রথমতঃ, সবাই টাকা দিলেই হাতে হাতে তার লাভ পেতে চায়; দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যাপারে কোন ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া সম্বন্ধে লোকের ভয়ানক আপত্তি। অনেকের দেখেছি দেশী শিল্পোন্নতির দিকে সহানুভূতি খুব আছে, কিন্তু তাঁরা হঠাৎ কোন ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে চান না। কোন শিল্পের খানিকটা উন্নতি হলে তখন তার সাহায্য করবার লোক পাওয়া যায়; কিন্তু গোড়ায় ঝুঁকি নিতে বেশীর ভাগ লোকই নারাজ। অথচ উন্নতি করবার জন্য গোড়াতেই যে টাকার দরকার সেটা তাঁরা বোঝেন না। আর যাঁরা ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে পারেন তাঁরা ক্ষতির ভয় না ঝেড়ে ফেলতে পারলে ব্যবসায় উন্নতির আশা কম। তা ছাড়া এই ব্যবসার উদ্যোক্তাদের সবার মধ্যে মনের মিলের অভাবে যে সব অসুবিধা হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আগেই বলেছি।

প্রঃ—আচ্ছা, এই ব্যবসায় লাভের আশা কি রকম?

উঃ—লাভের যথেষ্ট আশা আছে। বেশ ভাল বাজার পেলে সুগন্ধি সাবানের ওপর খরচা বাদে শতকরা ২৫৲ টাকা হারেরও বেশী লাভ থাকতে পারে। কাপড়কাচা সাবানে এর চাইতে কিছু কম লাভ থাকে। নোটের ওপর আমার কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের এই সাবান-শিল্পের উন্নতি নির্ভর করছে প্রথমতঃ জিনিসের উৎকর্ষসাধন ও বাণিজ্যের সাধুতার ওপর, দ্বিতীয়তঃ নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও পাল্লাদেবার প্রবৃত্তি দমন করে সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘের সাহায্যে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার ওপর। এ রকম করতে পারলে বিদেশী কারখানার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারবার আমি ত কোন কারণই দেখি না।

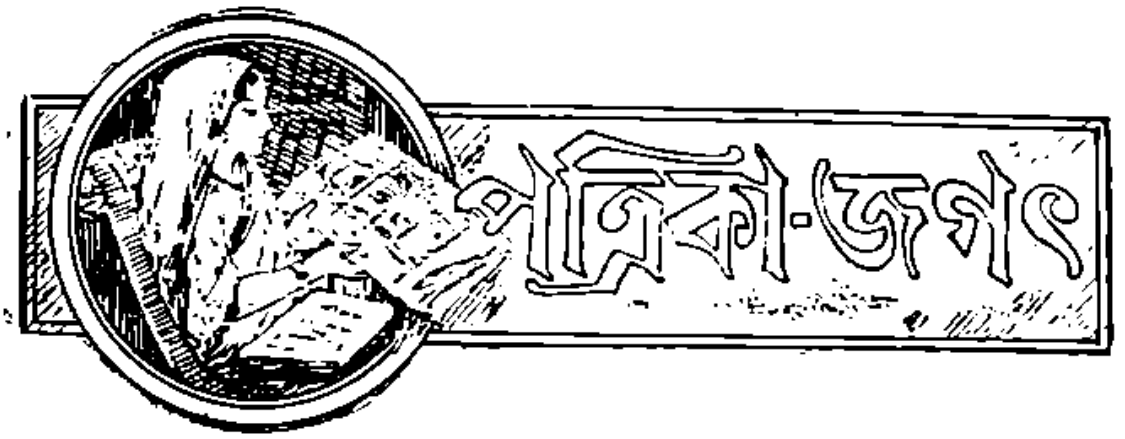

"তন্তু ও তন্ত্রী"—কলিকাতা

সূতার কথা

(১)

পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, ভারতে মিহি সূতা প্রস্তুত হইতে পারে না; এমন কি ম্যানচেষ্টার ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এই মিহি সূতা প্রস্তুত করিবার উপযোগী জলবায়ু পাওয়া কঠিন। এখন কিন্তু ভারতের মিল হইতে প্রচুর পরিমাণে মিহি সূতা তাঁতের কার্য্যের জন্য কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আমদানি হইতেছে। কেহ কেহ অবশ্য ঐ সকল সূতা বিলাতে প্রস্তুত, এবং বহুদিন হইতে ভারতের মিল সকল বিলাত হইতে যে মিহি সূতা মিলে বস্ত্র বয়ন করিবার জন্য নলীতে জড়াইয়া আমদানি করিয়া থাকে, তাহাই পুনরায় ভারতের ছিপে যাতিল আকারে পরিণত হইয়া দেশী নাম ধরিয়া বিক্রয়ার্থ আসিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে যে অতিশয় ঘৃণিত কার্য্য হইতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিহি সূতা কলে কিংবা চরকায় প্রস্তুত করিতে হইলেও অনুকূল জলবায়ুর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সকল সময়ে ইহা প্রস্তুত হইতে পারে না। পূর্ব্বে যখন ভারতে চরকায় মিহি সূতা প্রস্তুত হইত তখনও কাটুনীদের এই সম্বন্ধে বায়ুর তারতম্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইত। ম্যানচেষ্টারের বায়ু সর্ব্বদা কুয়াশাচ্ছন্ন, সেই জন্য মিহি সূতা প্রস্তুত করিবার অনুকূল। তাহারই জন্য ঐ স্থানে অতি কম খরচায় মিহি সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে, অন্য কোন দেশ এই প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অল্প খরচায় ও সহজে বায়ুকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন করিতে পারা যায়। সুতরাং এই মিহি সূতা ভারতে প্রস্তুত হওয়া অসম্ভবই বা কি? ভারতের মিলে প্রস্তুত মিহি সূতার পক্ষে মূল্যে ও গুণে বিলাতী সূতার সমকক্ষ হওয়া অবশ্য কঠিন; তথাপি এই অল্প সময়ে ভারতের মিলগুলি যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন দেখা যায়, তাহাতে ভবিষ্যতে অতি অল্পদিনেই ইহার আরো উন্নতি হইবে আশা করা যায়। অবশ্য মূল্য সম্বন্ধে এখন ভারতবাসীদিগকে অল্পবিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। একটী বিরাট শিল্পকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

অনেকে এই মিলের সূতাকে সন্দেহ করিতেছেন বলিয়া কোন কোন মিলের কর্তৃপক্ষ সাধারণকে তাঁহাদের সূতা তৈরী দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এরূপ বিজ্ঞাপন প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভারতের মিলে এখন প্রচুর পরিমাণে ৫০ ও ৮০ নং সূতা প্রস্তুত হইয়া বাজারে আমদানি হইতেছে, ৭০ ও ৮০ নং সূতাও কিছু কিছু আসিতেছে। ঐসকল সূতার মূল্য অবশ্য বিলাতী সূতা অপেক্ষা কিছু বেশী, তথাপি গুণে উহা নিকৃষ্ট নয়। উহাতে তাঁতের কার্য্য বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে এবং উহার চাহিদাও বেশ হইয়াছে।

(২)

ইংলণ্ডের বস্ত্র ও সূতার ব্যবসায়ে যে মন্দা পড়িয়াছে তাহার একটী প্রধান কারণ জাপান, চীন, ইটালী ও

আমেরিকার মিলের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও উন্নতি। পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও ভারত হইতে ঐ সকল দেশে বস্ত্র এবং সূতা রপ্তানি হইত। এখন ঐ সকল দেশে মিল হইয়া এত অধিক বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে যে, তাহারা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করিয়াও ভারতে এবং অন্য দেশে মাল রপ্তানি করিতেছে। জাপান এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ব্যবসায় কি রকম উন্নতি করিয়াছে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৯০৫ সনে জাপান ৮৪৬৫০০ পাউণ্ড তুলা খরিদ করিয়া ১০১৫০০ পাউণ্ড সূতা ও ১১৫০০০,০০০ গজ বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। আর ১৯২৯ সনে জাপান ২৬৩৫৭০০ পাউণ্ড তুলা খরিদ করিয়া ২৭১২৫০০ পাউণ্ড সূতা এবং ১৪৩৮০০০,০০০ গজ বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। এই চব্বিশ বৎসরে জাপান এই ব্যবসায়ে বহু উন্নতি করিয়া ভারতে ও চীনে এই বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় করিতেছে। ভারতে এই ব্যবসায়ে কোন জাতিই জাপান ও চীনের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহারা বস্ত্র, সূতা ও কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র-সকল এত অল্প মূল্যে ভারতে বিক্রয় করিতেছে যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই কারণে কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া এই সকল বস্ত্রের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করিতে হইয়াছে; ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

পূর্ব্বে ভারতে সূতায় কোন শুল্ক দিতে হইত না। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহার উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতের মিলসকল চীন ও জাপানের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা লাভ করিতে না পারায় ভারতের মিলওয়ালারা ভারত সরকারকে এই সূতার উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। ফলে ২৲ পাউণ্ড ওজনের সূতার উপর পাউণ্ড প্রতি /১০ দেড় আনা শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা সত্ত্বেও ভারতের মিলগুলি প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ১৯১৪ সনে ভারতে বিলাত হইতে ৪০ নং সূতা মাসিক ৫।৬ হাজার পাউণ্ড আমদানি হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় হইতে এই ৪০ নং ও ৩২ নং সূতা জাপান হইতে কিছু কিছু আমদানি হইতে লাগিল। ক্রমে বিলাতী ৪০ নং সূতাকে পরাজিত করিয়া এখন প্রতি মাসে কলিকাতায় প্রায় তিন হাজার পাউণ্ড বম্বে ও মাদ্রাজে ৫।৬ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সমগ্র ভারতে মোট প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড ৪০ নং চীনা ও জাপানী সূতা আসিতেছে। বিলাত বা অন্য দেশ হইতে এই সূতার আর আমদানি নাই। ভারতের মিলসকলও এই সূতা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। এই চীন ও জাপানের সূতা সকল সূতা অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে উত্তম টানা হইয়া থাকে, তাঁতিদের বুনিতে কোনরূপ কষ্ট হয় না, অথচ দরে সুলভ। ইহার কারণ কি? এই ৪০ নং সূতা ভারতীয় ক্যাম্বোডিয়া নামক তুলা ও আমেরিকার উৎপন্ন তুলা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারা ভারত হইতে তুলা জাহাজ ভাড়া, বীমা ও অন্যান্য নানাবিধ খরচা করিয়া লইয়া যায়। আবার মিলে সূতা প্রস্তুত করিয়া ঐরূপ খরচা করিয়া ও শুল্ক দিয়া ভারতের বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। মজুরিও ভারত অপেক্ষা কোথাও কম নহে। তবু এই ব্যবসায়ে ভারতের মিলগুলি প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না কেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন পাল

"বরিশাল"—বরিশাল

দুনিয়ার বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট

বিলাতের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সার ই. হিল্‌টন্ ইয়াঙ্ দুনিয়াব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কারবারে দেখা যায় যে, জিনিষের চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী জিনিষের মূল্য বাড়ে ও কমে। চাহিদা বেশী হইলেই লোকের জিনিষ প্রস্তুত করার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং জিনিষের মূল্যও বাড়ে। এই উৎসাহ-বৃদ্ধির ফলে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী হইলেই আবার জিনিষের দাম কমিয়া যায়। দাম কমিয়া গেলেই আবার জিনিষ-উৎপাদনের উৎসাহ কমিয়া আসে। এইরূপে জিনিষের দাম চাহিদা ও সরবরাহের সহিত বৃত্তাকারে বাড়ে ও কমে।

দুনিয়ার বর্ত্তমান দুর্দ্দশাও এই আর্থিক নীতির ফলেই ঘটিয়াছে। কিন্তু জিনিষের দাম চিরদিন এই অবস্থায় থাকিতে পারে না। আবার নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে কি কারণে জিনিষের চাহিদা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে এবং কি কারণে জিনিষের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

চাহিদা কমিয়া যাওয়ার কারণগুলি যে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করা গেল।

(১) পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর হার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এবার জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুই ঘটিয়াছে বেশী। কাজেই লোকবল কমিয়া যাওয়ায় জিনিষের চাহিদাও কতক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

(২) সকল দেশেই সৈন্যগণকে ভাল খাদ্যে ও মনের আনন্দে রাখিবার জন্য তাহাদের জীবনযাত্রা সাধারণের অপেক্ষা সুখকর করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা যুদ্ধকালে আরও বাড়ে। গত মহাসমরের পরে প্রত্যেক দেশেই সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। এই হ্রাস হওয়ার ফলে তাহাদের জীবন-যাত্রার জন্য আবশ্যক কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া গিয়াছে।

(৩) পৃথিবীতে সম্রাট বা রাজা-মহারাজাগণ বিলাস-বৈভবে জীবন যাপন করে। এই নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা সাধারণ লোকে কল্পনাও করিতে পারে না। এই সকল দ্রব্যের কাটতি ধনী রাজা-মহারাজাদের হাতে। কিন্তু গত মহাসমরের পরে অনেক সম্রাট, অনেক অনেক রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, বড় বড় সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, দেশের শাসনভার সাম্যবাদিগণের হাতে পড়িয়াছে। সাম্যবাদীরা আইন দ্বারা অনেক সম্রাট ও ধনী রাজা-মহারাজাগণকে সাধারণ গৃহীর মত জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। ফলে রবারও অন্যান্য অনেক জিনিষের কাটতি কমিয়া যাইতেছে।

(৪) বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদের জীবন-যাত্রাকে যথেষ্ট বহুল করিয়া তুলিয়াছে। নানারূপ অভাব-বোধের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই অভাব পূরণের জন্য আমাদের বহু দ্রব্য-সম্ভারের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। কিন্তু চীন ও রুশ দেশে এইসকল কৃত্রিম অভাব-বোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে। তথায় জীবন-যাত্রা সরল ও স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ করার জন্য তীব্র চেষ্টা চলিতেছে। ফলে এই সকল দেশ হইতে অনেক দ্রব্যের বাজার উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ, মিশর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক আন্দোলনের কথাও উল্লেখযোগ্য। যখনই কোন দেশে দেশবাসী আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনই প্রভূত অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এইরূপ আন্দোলনের সময়ে জনসাধারণের মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে। জীবনের ভোগ-বিলাস বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরাম-আয়েসের দিকে তাহাদের লক্ষ্য থাকে না। ফলে অনেক জিনিষের কাটতি কমিয়া যায়।

(৫) ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে টাক্সের পরিমাণ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের আয়ের উপর যে কর ধার্য্য হইতেছে, তাহার পরিমাণ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার রুশ প্রভৃতি দেশে ধনী লোকের প্রভূত ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থ দেশের উন্নতির জন্য বাজেয়াপ্ত হইতেছে। এইসকল নানা কারণে লোকের সঞ্চিত ধনের উপর আস্থা কমিয়া আসিতেছে। সঞ্চিত ধন বহুকালের জন্য উপভোগ করা যাইবে না, এইরূপ ভয় বিরাজ করিতেছে। ফলে লোকে আর বহুলভাবে ধনসঞ্চয় করিয়া রাখে না। নাবালকা ধনী লোকের সংখ্যাও বেশী নাই। ধনী লোকের উপভোগ্য দ্রব্যাদিরও চাহিদা বেশী দেখা যায় না।

(৬) গত মহাযুদ্ধের অবসানে অনেক দেশই দিবালিয়া হইয়া পড়ে। প্রভূত লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় হেতু দারিদ্র্য দেখা দেয়। নিজ নিজ অবস্থা পুনরায় সচ্ছল করার উদ্দেশ্যে শিল্প-সম্ভার বাড়াইবার জন্য অশেষ চেষ্টা চলে। অনেক স্থানে শুল্ক-প্রাচীর দ্বারা বিদেশী পণ্যের আমদানি বন্ধ করা হয়। এবং এইরূপ বিধানের ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে।

(৭) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত মুদ্রানীতির ব্যতিচার দেখা দেয়। তাহাতেও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৮) লোকের নূতন নূতন সখ বা ফ্যাশানের ফলে পুরাতন উৎপাদনকারী কলকারখানাগুলি আধুনিকতা-বর্জ্জিত হইয়া অকেজো হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্ব্বে যে নমুনার মোটরকার প্রচলিত ছিল, তাহা এখন আর লোকে ক্রয় করিতে প্রস্তুত নয়। বর্ত্তমানে ক্রসলি মোটরকারের পরিবর্ত্তে লোকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটরকার পছন্দ করে। পুরাণো শকটকারী ফোর্ড মোটরগাড়ীর ও ওভারল্যাণ্ড মোটর গাড়ীর পরিবর্ত্তে এখন শব্দহীন ড্রয়াণ্ট, ফিয়াট ক্রয় করা লোকের নূতন সখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে কৃষিপ্রসূত গম, চাউল প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদনের কোন উন্নতি হয় নাই।

এইসকল কারণে জিনিষের চাহিদা ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্য গুদামে অথবা কারখানায় মজুত রহিয়াছে, কিন্তু বাজার নাই। টাকার লেনদেন বেশী না থাকায় আবার টাকশালেও মুদ্রা-নির্ম্মাণ কমিয়া গিয়াছে। টাকা হো জিনিষপত্রের স্বত্বাধিকারের "টিকিট" মাত্র। যেমন কোন অভিনয়ে দর্শকের সংখ্যা কম হইলে টিকিট মুদ্রণও কমিয়া যায়, সেইরূপ জিনিষপত্রের স্বত্বাধিকারের দ্রুত হস্তান্তর না হইলেও টাকশালে মুদ্রা নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকে।

অথচ চাহিদা কমিয়া যাওয়ার নানা কারণ থাকা সত্ত্বেও সরবরাহের পরিমাণ কমিয়া যায় নাই। পরন্তু, প্রত্যেক দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার জন্য দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার বাড়াইতেই চেষ্টা করিতেছিল। ইহার ফলেই দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি হয় এবং টাকাপয়সা বাজার হইতে লোপ পায়।

এখন সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিব; তাহা হইলেই সমস্ত ব্যাপারখানা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

১। আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এখনও সভ্যতাহীন নানা জাতির বাস। সভ্য জাতিগণ জাতীয় অভাব পূরণের জন্য নানাস্থানে প্রবেশ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বনজঙ্গল আবাদ করিয়া অনেক জমিতে কৃষিজাত পণ্যাদি উৎপাদন করিতেছে। কাজেই, দুনিয়ার বাজারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পণ্য দেখা দিয়াছে।

২। গত মহাসমরের পর বিজ্ঞানের উন্নতি সমস্ত জগতেই দ্রুতগতিতে চলিতেছে। বিজ্ঞানের ফল কার্য্যকর করার জন্য এবং তাহাদ্বারা দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য প্রবল চেষ্টা দেখিতে পাই। কৃষি এবং শিল্পে এই বিজ্ঞানের উন্নত প্রণালী প্রয়োগ করার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সর্ব্বত্র বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনে বিশেষ উদ্যম লক্ষিত হয়। এই বর্জ্জননীতি সফল করার জন্য অনেকস্থানে শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি হইয়াছে। ষ্টেট অথবা সরকারপক্ষ হইতেও নিজ নিজ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ সাহায্য প্রদান করা হয়। কোথাও অনুন্নত প্রতিষ্ঠানকে অর্থ-সাহায্য দান করিয়া সঞ্জীবিত করা হইয়াছে; কোথাও বা জাহাজ ও রীয়ারে চালান দেওয়ার সহায়তা করা হইতেছে। এইরূপভাবে জিনিষ যাহাতে দুর্মূল্য না হয় এবং বিদেশের খরিদ্দারগণ যাহাতে লুব্ধ হইয়া নিজ নিজ দেশ হইতে মালপত্র খরিদ করার জন্য আসে, তাহার চেষ্টায় বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। যুদ্ধের সময়ে জিনিষপত্রের দাম চড়া দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছে যে, অল্পমূল্যে জিনিষ সরবরাহ করিতে পারিলে লাভবান হওয়া যাইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক দেশ শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য বহুলভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। সকলেই এইরূপ প্রতিযোগিতায় অনেক মাল জমাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সব জিনিষের আর ভাল বাজার পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষতঃ, কৃষিজাত দ্রব্য, যাহা দুনিয়ার লোকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ প্রায় স্থির হইয়া আছে। এখন উহার অতিরিক্ত উৎপাদনে আর লাভ নাই। অতিরিক্ত মূল্যে যে লাভ হইয়াছিল তাহা যাহারা মূলধন যোগাইয়াছে, যাহারা মালপত্র চালানের ব্যবসা করিয়াছে এবং যাহারা কারবারে মধ্যবর্ত্তিতা করিয়াছে, তাহারাই প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে। যাহারা উৎপাদন করে, অথবা যাহারা উহা ক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের ঘরে সে লাভের অংশ যায় নাই।

"সিলিকোসিস্ : রেকর্ডস্ অব্ দি ইন্টারন্যাশন্যাল্ কন্ফারেন্স হেল্ড্ অ্যাট্ জোহানস্‌বার্গ অন্ ১৩—২৭ অগাষ্ট ১৯৩০"। ইন্টারন্যাশন্যাল্ লেবার অফিস্, জেনেভা, ১৯৩০। ৬৯২ পৃঃ। মূল্য ১৮ শিঃ বা ৪ ডলার। (সিলিকোসিস্ রোগ সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গ সহরে ১৯৩০ সনের আগষ্ট মাসের ১৩ই হইতে ২৭শে তারিখ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহার বৃত্তান্ত ; আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় এক্ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যক পুস্তক)।

জাতিসঙ্ঘের তাঁবে প্রকাশিত এই বিরাট গ্রন্থখানি গোটা পৃথিবীর একটী অত্যন্ত ভীষণ রোগের সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ ; এ বিষয়ে দুনিয়ার প্রায় সকল জাতির বিশেষজ্ঞেরাই টনক নড়িয়াছে। আর তাঁহাদেরই সকলের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে অর্জ্জিত সত্য এই কেতাবে স্থান পাইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের কার্য্য-প্রণালী ও কীর্ত্তিকলাপ আমাদের দেশে এখন অবিদিত নাই, দুনিয়ার শান্তিরক্ষাই ইহার প্রধান ও বিশেষ কর্ত্তব্য এবং গত প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ইহা সে কর্ত্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহারই সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘ। শ্রম শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের পর্য্যালোচনাই ইহার কর্ত্তব্য। অনেকগুলি মূল্যবান্ কেতাবই এই সঙ্ঘের তাঁবে প্রকাশিত হইয়াছে। আঃ শ্রম-শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের হদস করিবার জন্য ইয়োরোপে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অনেকগুলি অধিবেশনই হইয়া গিয়াছে ; গত বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গ সহরে এইরূপ একটি অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মিঃ ই জে কেলান (আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের ডিপ্লোম্যাটিক অংশের প্রধান কর্ম্মচারী, ইনিই ছিলেন এই সিলিকোসিস সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মসচিব), অনারেবল এইচ্ ডাব্‌লিউ হ্যাস্‌লক, এম-পি (দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের ডাক ও তার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ইনিই সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন), ডাঃ ই এস মিডলটন (গ্রেটব্রিটেনের ফ্যাক্টরীসমূহের মেডিক্যাল ইন্‌স্পেক্টর ও গ্রেটব্রিটেনের প্রতিনিধি), ডাঃ এস ডাব্‌লিউ ক্রিশার (ইংলণ্ডের খনি সমূহের মেডিক্যাল ইন্‌স্পেক্টর), অধ্যাপক আর্থার জে হল (শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক, সিলিকা ও অন্যান্য ধূলিকণার জন্য যেসকল যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সে বিষয়ে মেডিক্যাল রিসার্চ্চ কাউন্সিল যে কমিটী স্থাপিত করিয়াছে তাহার সভাপতি), অধ্যাপক ই এইচ কেট্‌ল্ (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের মেডিক্যাল স্কুলের রোগতত্ত্বের অধ্যাপক), প্রফেসর ডাঃ বোমে এবং প্রফেসর ডাঃ কোহেলস্ (জার্ম্মাণির মিউনিক সহরের জাতীয় শ্রমশিল্প বিভাগের চিকিৎসক), অধ্যাপক ডাঃ গিওভ্যানি লোরিগা (ইতালীর ফ্যাক্টরীসমূহের প্রধান মেডিক্যাল ইন্‌স্পেক্টর, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের শ্রমিক স্বাস্থ্য কমিটির সভ্য) ; ডাঃ গ্রাণ্ট ক্যানিংহাম (ক্যানাডার অন্টারিও সহরের শ্রমিক স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ), ডাঃ ডাব্‌লিউ আর এইচ ক্রানেনবার্গ (নেদারল্যাণ্ডস্ দেশের শ্রমিক পরিদর্শন

বিভাগের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা, আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘের শ্রমিক স্বাস্থ্য কমিটির সভ্য), ডাঃ অ্যালবার্ট ই রাসেল (যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী), ডাঃ চার্লস বাডহাম্ (অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রের নিউ সাউথ ওয়েল্স প্রদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রমিক স্বাস্থ্য অংশের মেডিক্যাল অফিসার), ইত্যাদি ইত্যাদি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল, অতএব সেই রাষ্ট্রের তরফ হইতেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য ; বস্তুতঃ, সেখানকার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ এল, সি, আরভিন্ (শ্রমিকগণের যক্ষ্মারোগ বিভাগের—মাইনার্স্ ফাইসিস মেডিক্যাল বিউরোর—অধ্যক্ষ) এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন খনির মালিকদের ও মজুরদের প্রতিনিধি, চিকিৎসক সঙ্ঘসমূহ ও স্বাস্থ্যাবাসগুলির হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসালয়, এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিবৃন্দ, মেডিক্যাল বিউরো, ফাইসিস্ বোর্ড, চিকিৎসাবিষয়ের রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, কন্সালটিং এঞ্জিনিয়ার, স্যানিটেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, টেক্‌নিক্যাল অফিসার, আর্কিটেক্ট, কেমিষ্ট, প্যাথলজিষ্ট প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে শ্রমশিল্প, বিশেষতঃ খনির শ্রমশিল্পবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্ঘ মাত্রেরই কৌতূহল ও ঔৎসুক্য রহিয়াছে, এবং এই জন্যই রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট, খনির মালিক ও খনির মজুর, চিকিৎসক ও সমাজসেবী সকলেরই সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। এই বিষয়ে এবং অনুরূপ বিষয়ে সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘ সারা দুনিয়ার যে অশেষ উপকার করেন, সে কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিলিকোসিস এক প্রকারের যক্ষ্মারোগ ; ফুসফুসে সিলিকন্ ডায়অক্সাইড প্রবেশ করিলে এই অসুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; বর্ত্তমানকালে ইহার প্রাদুর্ভাব সভ্য জগতের একটি বিশেষ গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্যই বিভিন্ন দেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিশারদগণ একত্র মিলিত হইয়া এই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের রীতিমত আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়া ইহার কারণ, প্রকৃতি ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জোহানস্‌বার্গ নগরের অধিবেশনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফলল।

সিলিকোসিস গ্রন্থখানির ভূমিকায় আন্তর্জ্জাতিক মজুর সঙ্ঘের সম্পাদকেরা বলিয়াছেন যে, এই রোগটির বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে সঙ্ঘ সকল সময়েই অবহিত আছেন। বহুদিন হইতেই কেবল মজুরদের সম্বন্ধে নহে, সাধারণ মানবজাতি সম্বন্ধেই ইহার গুরুত্ব তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অবশ্য মজুরদের আন্তর্জ্জাতিক সমিতিগুলিই প্রথমে এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব মজুরসঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই এইসকল বিষয়ে বিশেষ করিয়া আলোচনা ও পত্রব্যবহার চলিতে থাকে। সঙ্ঘের কার্য্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ বাটলার যখন দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তথাকার বিশেষজ্ঞদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই এই বিষয়ে জোহানসবার্গ সহরে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন করিবার প্রস্তাব উঠে। সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার চেম্বার অব্ মাইন্‌স্ এই সম্মেলনের জন্য অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাই এই সম্মেলনের অধিবেশন করিবার প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা গিয়াছে। বিখ্যাত হ্যাণ্ড্ সর্থনিয় মাইনার্স্ থাইসিস্ বিউরো বা খনিমজুরের যক্ষ্মারোগ-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান বিভাগের চেষ্টায় যেসকল তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞদের আলোচনার সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্মেলনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ইহার অনুরূপ গবেষণা-কার্য্য বিভিন্ন দেশেই হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। ১৯২৯ সনে কার্য্যহেতুক রোগসম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন কয়াসী দেশের লিয়োঁ সহরে হইয়া গিয়াছে ; ইংরাজী ভাষাভাষী দেশসমূহে ও জার্ম্মানিতে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা

ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। এই ভাবেই জোহানসবার্গ অধিবেশনের গবেষণা-কার্য্যের অনেকটা সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যাহা হউক ১৯৩০ সনের ১৩ই আগষ্ট বুধবার জোহানসবার্গ সহরে এই সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমে আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘের ডিপ্লোম্যাটিক্ সেক্শনের অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ ই. জে. ফেলান্ সঙ্ঘের একটি বিশেষ অংশের অর্থাৎ মজুরদের স্বাস্থ্য, পীড়া ও ব্যাধ্যাত্মক রোগ নিবারণ বিভাগের কার্য্য-প্রণালী ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইনি সঙ্ঘের একজন কর্ম্মচারী, মজুরদের পীড়াসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, ইতালীয়ান পণ্ডিত ডাঃ ক্যারোৎসির কথা উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ, তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি ও প্রতিভা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে পারদর্শী বিজ্ঞগণের সহায়তায় তিনি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল হাইজিন্ বা মজুরদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বহুবিস্তৃত গবেষণা-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। এখন তিনি শ্রমশিল্প ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপিডীয়া অব্ অকুপেশান্ আণ্ড্ হেল্থ্) নামে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। ইহার প্রথম খণ্ডেই প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠা থাকিবে। ইহা হইতেই এই পুস্তকের আয়তন ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘের ষ্ট্রো কর্ম্মসচিব মিঃ এলবার্ট টমাসের যশ এখন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারই উৎসাহে সঙ্ঘের গভেষণা ক্রমশই মানবজাতির বিভিন্ন শ্রমিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ যত্নবান হইতেছেন। ইহার কর্ম্মচারীরা বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করিয়া তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মিঃ বাটলারের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়। সিলিকোসিস সম্বন্ধে ঐ দেশে যে অনেক বহুমূল্য ও অজস্র তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন, এবং আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিকট এইসকল তথ্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিবার প্রয়োজনও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এবং এইজন্যেই এখানে সিলিকোসিস সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব করা হয়। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্র জেনেভার সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ ফেলান এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এখনও ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলিই লীগ অব্ নেশান্স্ ও ইন্টারন্যাশানাল্ লেবার অফিসের কার্য্যে সহযোগিতা করিয়া থাকেন, ইয়োরোপের বাহিরের রাষ্ট্রগুলি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আন্তর্জ্জাতিক সিলিকোসিস্ সম্মেলনের অধিবেশন সেইজন্যই একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কারণ ইয়োরোপের বাহিরে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই প্রথমবার লীগ অব নেশান্স্ কর্তৃক আহূত সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সুদূর আফ্রিকার সুধীবৃন্দ যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে উৎসাহ দেখাইতেছেন ইহাই বিশেষ আনন্দের কথা। জেনেভা ইহাতে বিশেষ প্রীত হইয়াছে।

মিঃ ফেলানের দীর্ঘ বক্তৃতা হইতে আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলনগুলির আদর্শ, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং মজুর-সঙ্ঘের রোগ-নিবারণকল্পে আরব্ধ প্রচেষ্টাগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়; এইরূপ সম্মেলনে যে সকল রাষ্ট্রেরই যোগ দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

ইহার পর দক্ষিণ আফ্রিকার পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের মন্ত্রী অনারেব্ল্ মিঃ এইচ্ ডাব্লিউ ক্রাম্প্সন্ সম্মেলনের অধিবেশন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া প্রতিনিধিদের সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন দেশে সিলিকোসিস রোগের ভীষণ বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই সাংঘাতিক পীড়ার জন্য বহুসংখ্যক রোগীকে দারুণ কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং খনিশিল্পগুলিকে ১৯১১ সন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১৫,০০৬,০০০ পাউণ্ড মজুরদিগকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়াছেন, রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিধি সম্বন্ধে

অন্যূন নয়টি আইন পাশ করিয়াছেন, এবং এ অঞ্চলের চিকিৎসকদের চেষ্টায় এই রোগের প্রাদুর্ভাবও কিছু পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। আশা করা যায়, সিলিকোসিস সম্মেলনে উপস্থিত রোগতত্ত্ববিদ্‌গণের সমবেত চেষ্টা ও যত্নের ফলে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

পরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাইনার্স্ থাইসিস্ মেডিক্যাল বিউরোর ডাঃ আর্‌ভিন্ সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। অন্যান্য আবশ্যক কার্য্যের পর তিনি তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির অভিভাষণে সমস্ত আলোচ্য বিষয়টির সকল অংশেরই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, রোগটির প্রকৃতি-নির্ণয়, চিকিৎসা ও নিবারণের সম্বন্ধে প্রস্তাব-সম্বলিত চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য ছিল; খাতুর খনির মজুরেরা নিঃশ্বাসের সহিত সিলিকা-চূর্ণ দ্বারা দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এই ভাবেই তাহাদের সিলিকোসিস্ রোগ জন্মায়। সুতরাং কলোর খনির ন্যায় ধাতুগুলির খনিতেও প্রচুর বায়ুসঞ্চালনের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া দেওয়া উচিত। অথচ এই সামান্য ব্যাপারে অবহেলার জন্যই এই কয়বৎসরে স্বাস্থ্য ও সম্পদের যে কত বেশী ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তবে আনন্দের কথা এই যে, বর্ত্তমানকালে এই সমস্যাটির গুরুত্ব অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং রাষ্ট্র এ বিষয়ে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন।

১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে সম্মেলনের সাধারণ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতিনিধিগণের লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাঁহাদের মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে। সিলিকোসিসের উৎপত্তির কারণ ও নিবারণ সম্বন্ধে গবেষণাই ছিল আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গ্রেট ব্রিটেনের ফ্যাক্টরীসমূহের মেডিক্যাল ইন্‌স্পেক্টর ডাঃ ই, এল, মিলটন্ ব্রিটিশবীপের অবস্থা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। মজুরের কর্ম্মস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ধূলিনিবারণের প্রণালী সম্বন্ধে নানাপ্রকারের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে থাকে। সমবেত বিশেষজ্ঞগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য সম্মেলনের নিকট উপস্থাপিত করেন।

১৬ই আগষ্ট তারিখে অধিবেশনের তৃতীয় দিনে খনিতে জলের ব্যবহার ও তাহার ফলে সিলিকোসিস নিবারণের পন্থা, সিলিকাচূর্ণের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়; ১৮ই আগষ্ট তারিখে সিলিকোসিসের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞেরা এই দিনই অনেক মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করেন। পরীক্ষাগারে এ বিষয়ে নানাপ্রকারের যে সকল পরীক্ষা চলিতেছে তাহার ফলে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাও উল্লিখিত হয়। পঞ্চম দিনের অধিবেশনে কি করিয়া বিভিন্ন রকমের ধূলি ফুসফুসে ঢুকিয়া পড়ে ও তাহার ফলে স্বাস্থ্যের কিভাবে ক্ষতি হয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সম্বন্ধে ডাঃ গার্ডনার, ডাঃ বুয় প্রভৃতির মন্তব্য সত্যই খুব মূল্যবান্।

১৯শে আগষ্ট তারিখে ডাঃ এ, ই, রাসেলের সভাপতিত্বে ষষ্ঠ দিনের অধিবেশন হয়, সিলিকোসিস্ রোগ-নির্ণয়ই ছিল এই দিনের আলোচ্য বিষয়। ডাঃ আর্ভিন এই দিনের আলোচনা শুরু করিয়া দেন। অনেক চিকিৎসকই এই দিন আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। সপ্তম দিনের অধিবেশনেও এই আলোচনাই চলিতে থাকে; সাধারণ যক্ষ্মারোগের সংজ্ঞা, সিলিকোসিসের বিশেষত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সত্যই সাধারণের গোচরে আসে। ২০শে আগষ্ট তারিখে সিলিকোসিস্ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরবর্ত্তী অবস্থা, রোগীদিগের সংখ্যা, যক্ষ্মার সহিত এই রোগের সম্বন্ধ, চিকিৎসার প্রণালী, এ সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ও বিভিন্ন দেশে মজুরদের যে ভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া হয় তাহার বিবরণ, ইত্যাদি কয়েকটী ব্যাপারই ছিল এ দিনের আলোচ্য বিষয়। ২৩শে আগষ্ট তারিখে রোগ নিবারণ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাবের আলোচনা চলিতে থাকে ও সে বিষয়ে অনেকগুলি সংশোধিত প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

একাদশ (২৪শে আগষ্ট) এবং দ্বাদশ (২৬শে আগষ্ট) দিনের অধিবেশনে সব্ কমিটিগুলির রিপোর্ট ও প্রস্তাবগুলির বিষয়ে আলোচনা হয়। ২৭শে আগষ্ট তারিখেই সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হইয়া যায়, সমবেত বিশেষজ্ঞগণ, চিকিৎসকগণ, সভাপতি, সদস্যগণ, প্রতিনিধিবর্গ, ইত্যাদি সকলকেই ধন্যবাদ দিয়া সম্মেলনের কার্য্য শেষ করা হয়।

সম্মেলনের নিকট অনেকগুলি বহুমূল্য তথ্য-পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির বক্তব্য বিষয়ের সার মর্ম দিতে চেষ্টা করিব। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা যাইবে।

ট্রান্‌স্‌ভাল্ চেম্বার অব্ মাইন্‌সের (খনি সঙ্ঘের) বিশেষ পরামর্শ-দাতা ফ্রাঙ্ক জি, এ হুবার্টস্, ভ্যান রাইন ডিপ লিমিটেডের সাধারণ ম্যানেজার এ, ই, পেন, এবং সরকারী খনি এঞ্জিনিয়ার হ্যান্স পিয়ো, দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটারস্‌র‍্যাণ্ড খনিগুলির অবস্থার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং আদি হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেখানে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়া একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পাঠ করেন, খনিকর্ম্মের যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাবের প্রকৃতি ও তাহার নিবারণকল্পে যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্যই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ট্রান্‌স্‌ভাল্ চেম্বার অব্ মাইন্‌স্ ট্রান্‌ভিং কমিটি অন্ ডাষ্ট্‌স্ নামক খনির ধূলা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য যে স্থায়ী কমিটি আছে তাহার প্রধান রাসায়নিক ও কর্ম্মসচিব এ, এল্ ন্যাকুইউনে এবং উক্ত চেম্বারেরই সিনিয়র ডাষ্ট্ ইন্‌স্পেক্টর, জে, বুইট খনির বাতাসে ধূলির উৎপত্তির কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন; ইহা বেশ সহজ সরল ভাষায় লিখিত এবং অনেকগুলি সুনির্ব্বাচিত তথ্যের গুণে ইহা খুবই মূল্যবান্ হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাংলো-আমেরিকান করপোরেশনের কর্ম্মসচিব মিঃ জেম্‌স্ বয়ড্ তথাকার উইটওয়াটারস্‌র‍্যাণ্ড খনিসমূহে খনির বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে বিবরণ দিয়াছেন। ইহার সিদ্ধান্তগুলিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের খনিসমূহের প্রধান ইন্‌স্পেক্টর এম্ কাহুসন্ এবং কেন্দ্রীয় খনিগুলির সহকারী কন্‌সালটিং এঞ্জিনিয়ার ওয়াল্টার হট্ তাঁহাদের প্রবন্ধে খনিতে ধূলি নিবারণের উপায় এবং খনির বাতাসে ধূলিকণা ছড়াইয়া পড়িলে কি করিলে নিশ্বাসের সহিত তাহা ফুসফুসে পৌঁছিতে না পারে তাহা এবং তদ্বিষয়ক কয়েকটী বিধি সম্বন্ধে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯০২-০৩ সনের খনির লোকের যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধীয় কমিশনের সিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সত্যসত্যই বিশেষ উপকারী। খনিগুলিতে মজুরদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকার হইতে যেসকল বিধি ও উপবিধি প্রণীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধে রহিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটারস্‌র‍্যাণ্ডের খনিবিদ্যার অধ্যাপক জি, এ, ওয়াটারমেয়ার এবং ট্রান্‌স্‌ভাল চেম্বার অব্ মাইন্‌স্ বিভাগের ডাষ্ট আণ্ড ভেন্টিলেশন অফিসর জে, জি, রাদ্ খনিসমূহে বায়ু-চলাচলের সমস্যা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দিয়াছিলেন।

সম্মেলনের সভাপতি, মাইনারস্ থাইসিস্ বেডিক্যাল সিণ্ডিকেটের অন্যতম এল, জী, আরস্কিন্, দক্ষিণ আফ্রিকার চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণা বিভিন্নের মজুরদের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ এ ম্যাক্‌রোবার্টস্ এবং গভর্ণমেণ্ট মাইনিং এঞ্জিনিয়ার হ্যান্স পিয়ো, উইটওয়াটারস্‌র‍্যাণ্ডের স্বর্ণখনিতে সিলিকোসিস রোগের প্রাদুর্ভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। র‍্যাণ্ড্ খনিসমূহে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯৯ সন অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ার যুদ্ধের আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত খনি-কার্য্যের সমস্ত আধিভূতিক ইতিবৃত্ত (এই সময়ে সিলিকোসিস রোগের প্রকৃতি ও বিষয় সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞ ছিলেন), ১৯০১ হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্ত সিলিকোসিস রোগের নিবারণের জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল তাহার বিবরণ, ১৯১১ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যেসকল সরকারী আইন করা হইয়াছিল তাহাদের তালিকা এবং বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা, এই চারিটী অংশে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিভক্ত। র‍্যাণ্ডের স্বর্ণখনির অদ্ভুত ইতিহাস ও তাহারই সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট বুয়ার যুদ্ধের কথা কে না শুনিয়াছেন? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এবং বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক জগতে র‍্যাণ্ডের স্বর্ণখনির আবিষ্কার এক নূতন যুগ আনিয়া দিয়াছে, আর এই খনি-শিল্পের অসাধারণ দ্রুত উন্নতি এবং বিস্তারলাভও সত্যসত্যই বিস্ময়কর। ১৮৮৬ সনেই র‍্যাণ্ডে প্রথম স্বর্ণখনির আবিষ্কার হয়। ১৮৮৯ সনে একশতটি

খনিতে কাজ চলিতেছিল, এবং ১২,০০০ বার হাজার খেতাঙ্গ এবং ১০০,০০০ এক লক্ষ এশিয়াবাসী মজুর কাজ করিতেছিল; ১৯১০ সনের শেষে খেতাঙ্গ মজুর ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার অশ্বেতাঙ্গীয় মজুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ১৯১৬ সনে ২১০০০ খেতাঙ্গ এবং ১,৫৫,০০০ অশ্বেতাঙ্গীয় মজুর কার্য্য করিতেছিল। বর্ত্তমান সময়ে ১০০০০ খেতাঙ্গ ও ১,৪৭,০০০ মজুর ভূগর্ভে খাটিতেছে। স্বর্ণখনিগুলির সমৃদ্ধি ও প্রসার যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, তেমনি সিলিকোসিস্ রোগের সমস্যাটিও নানাভাবে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এবং তাহার নিবারণ ও চিকিৎসার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজনও সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

জোহানসবার্গ সহরে অবস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকার চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরের মজুরদের স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষজ্ঞ এ, হ্যাড্রোগোইড্যাটো সিলিকোসিস্ বা ডাই, খাইসিস্ রোগের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকগুলি চিত্র প্রভৃতি দিয়া তিনি সমস্ত জিনিষটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐ গবেষণা মন্দিরেরই রোগ-তত্ত্ব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এ, সাদারল্যাণ্ড, ষ্ট্রাচান ও এন, ডাব্লিউ সিমসন উইটওয়াটারস্ র‍্যাণ্ড, খনিসমূহে সিলি-কোসিস্ রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য দিয়াছেন। যদিও কেবলমাত্র চিকিৎসকগণের কাছেই এই প্রবন্ধটির গভীর তথ্য বোধগম্য হইবে, তথাপি সাধারণ পাঠকেরাও এ বিষয়ে অনেক কিছু বুঝিতে পারিবেন। রোগাক্রান্ত ফুসফুসের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহার পরেই আসিতেছে সিলিকোসিসের রোগতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষণা-পূর্ণ একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ। ডাঃ আর্ভিন্, ডাঃ সিমসন ও ডাঃ ষ্ট্রাচান সিলিকোসিসের ক্লিনিক্যাল প্যাথলজির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। সিলিকোসিসের আদি উৎপত্তি, অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সিলিকোসিস্ বীজাণুর পরীক্ষা, সিলিকোসিস রোগের বিস্তারতত্ত্ব, সিলিকোসিস রোগে মৃত্যুর কারণ ইত্যাদিই ইহার বর্ণিতব্য প্রসঙ্গ; ডাঃ আর্ভিন্ ও ডাঃ ষ্ট্রুয়ার্ট সিলিকোসিসের রেডিয়োতত্ত্ব ও লক্ষণতত্ত্বের (রেডিয়োলজি ও সিম্পটোমাটোলজি) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন; এই দুরারোগ্য ব্যাধির বিভিন্ন অবস্থা ও দশার সহিত উহার সম্বন্ধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আক্রান্ত ফুসফুসের অনেকগুলি আলোকচিত্র ও রেডিয়ো চিত্রের প্রতিকৃতি এই প্রবন্ধের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সিলিকোসিস তত্ত্বের খুব বিশদভাবে আলোচনার পর অন্যান্য দেশে ইহার প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। সেগুলি হইতে আন্তর্জাতিক জীবনে ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারা যায়।

প্রথম প্রবন্ধটির নাম অষ্ট্রেলিয়ার সিলিকোসিস্, ইহার লেখক হইতেছেন ডাঃ কীথ্ আর মুর, এম, বি, বি, এস, ডি, পি, এইচ, ইনি অষ্ট্রেলিয়ার কমনওয়েল্থ্ ডিপার্টমেণ্ট অব্ হেল্থ্ ডিভিশন অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাইজিনের ডিরেক্টর অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের মজুরদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় অংশের অধ্যক্ষ; অষ্ট্রেলিয়ায় সিলিকোসিস্ রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্পূর্ণ ইতিহাস ইনি দিয়াছেন; অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনিগুলির আবিষ্কার ও উন্নতির চমকপ্রদ ইতিহাসের কথা অনেকেই অবগত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনিগুলির ন্যায় ইহারাও কয়েকটি বিষয়ে অর্থ নৈতিক জগতে যুগান্তর আনিয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণ খনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঞ্চলগুলিতে যক্ষ্মারোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল, আর এই ব্যাধির সম্বন্ধে গবেষণাই এই প্রবন্ধটিতে রহিয়াছে। নিউ সাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া নরদারণ্ টেরিটারি, ওয়েস্টার্ণ অষ্ট্রেলিয়া এবং ট্যাসম্যানিয়া এই কয়টি প্রদেশের বিবরণই বিভিন্নভাবে দেওয়া হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, যেসব মজুরেরা মাটির নীচে কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেই সিলিকোসিস্ ও যক্ষ্মা ব্যাধির প্রকোপ হয়; সেইজন্যই মধ্যে মধ্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ-কল্পে কয়েকটী সরকারী আইনও প্রণীত হইয়াছে। খনিগুলিতে স্বাধীনভাবে বায়ু-চলাচলেরও উপায় করিয়া

দেওয়া হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই মাইনার্স্ থাইসিস্ অ্যাক্ট্ রহিয়াছে এবং খনি-মজুরদের টিউবার-কিউলোসিস রোগের চিকিৎসার যথেষ্ট আয়োজন রহিয়াছে।

"বেলজিয়ামে সিলিকোসিস্" লিখিয়াছেন ব্রাসেলস্ নগরের ডাঃ ডি সিল্ভার্ট : বেলজিয়াম সরকারও এই ব্যাধির নিবারণ করে অনেক সুব্যবস্থা করিতেছেন এবং এই দেশেও এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

অন্টারিয়ো নগরে অবস্থিত ক্যানাডা রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রমিক-স্বাস্থ্য অংশের অধ্যক্ষ ডাঃ জে, সি, কানিংহাম্ তাঁহার চিন্তাপূর্ণ "ক্যানাডার সিলিকোসিস্" প্রবন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়াছেন। এই বিষয়ের গুরুত্ব তিনি ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে খনি-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। স্বর্ণ খনি প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই আছে, অন্টারিয়োতে নিকেল, কুইবেকে অ্যাসবেস্টস্ এবং বৃটিশ কলাম্বিয়া, অন্টারিয়ো ও কুইবেকে তাম্রের খনিতে কার্য্য চলিতেছে। খনির মজুরদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য অন্টারিয়োর স্বাস্থ্য-বিভাগে এবং ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেল্থ্ ডিপার্টমেণ্টে পৃথক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। নানা প্রদেশের গবর্ণমেণ্টই খনি-মজুরদের যক্ষ্মারোগ ও সিলিকোসিস্ রোগের জন্য শ্রমিকদের ক্ষতি-পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে; অন্টারিয়ো, অ্যালবার্টা, নভাস্কোশিয়া, বৃটিশ, কলাম্বিয়া, সাস্ক্যাচিওয়ান, মানিটোবা প্রভৃতি প্রদেশে অনেকগুলি ওয়ার্কমেন্স্ কম্পেনসেশান আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। মজুরদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব, রোগতত্ত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধটিতে রহিয়াছে।

"জার্ম্মানিতে সিলিকোসিস্" নামক একটি নাতিবৃহৎ প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; অধ্যাপক বর্গমে বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মানিতে সিলিকোসিস্ সমস্যার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। এই পীড়াটির চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কথাই বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মানিতে এ বিষয়ে অনেক গবেষণাই হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর খনি-মজুরদের অবস্থা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোনরূপ সত্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধে রহিয়াছে। ফ্রিটনিকের অধ্যাপক কোহেলস্ এবং ঐ সহরেরই চিকিৎসক ডাঃ ক্যাহেলে ধূলা এবং সিলিকোসিস্ রোগগ্রস্ত ফুস্ফুসের প্রকারভেদ সম্বন্ধে সন্দর্ভ দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবন্ধটি জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের ব্যাভেরিয়া প্রদেশে ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল—এনটুজেনোলজিক্যাল গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ষ্টাণ্ডটোন্, সিলিসিওসটক্, গ্রানোইট ষ্টোন, পোর্সিলেন, ষ্টামোট, শেল, লাইমষ্টোন, সিমেণ্ট, ম্যাকাডাম, প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মজুরদের মধ্যে সিলি-কোসিস্ রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে বহু গবেষণা-লব্ধ তথ্য এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান খনি-পরিদর্শক (হিস্ ম্যাজেষ্টিস্ মেডিক্যাল ইন্স্পেক্টর অব্ মাইন্স্) ই, এস, সিম্পসন্ গ্রেট ব্রিটেনে সিলিকোসিস সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড প্রবন্ধ দিয়াছেন। প্রায় একশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সন্দর্ভে এই রোগের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদই রহিয়াছে। বিলাতের অনেকগুলি শ্রমশিল্পের বিষয়ে অনেক কিছুই এই প্রবন্ধ হইতে শিখিতে পারা যায়। প্রবন্ধকার অনেক ঘুরেই এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সাধারণের অবগতির জন্য তাহাদিগকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কয়েকজন শ্রমিকের সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিবরণ এবং তাহাদের রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অনেকগুলি সংখ্যামূলক (ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল্) বিবরণ ও গবর্ণমেণ্ট এবং খনির মালিকদের রোগনিবারণকল্পে নানা ব্যবস্থার বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে রহিয়াছে। এটি বিশেষভাবে পড়িবার যোগ্য।

ইতালীর কার্ষ্টারীগুলির প্রধান স্বাস্থ্য-পরিদর্শক অধ্যাপক গিওভানি লোরিগা ইতালীতে সিডেরোকো-নিয়োসিস্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছেন। সিলিকা, মাইকা, সাল্ফার, ক্লে, অ্যাস্বেস্টস্, সিমেণ্ট, চুণ ও প্লাস্টার, প্রভৃতি নানাবিভাগের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানাপীড়ার প্রকোপ, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে। টিউবারকিউলোসিস্ রোগের প্রতিবিধান-কল্পে

ম্যাঙ্গা সহরে যে চিকিৎসালয় আছে তাহার অধ্যক্ষ ডাঃ সিয়োকোনোবিয়াচিজ লিখিত মাইন্‌স্ কারখানার নিউমোকোনিওসিস্, ডাঃ ডোমেনিকো লোজিসেট্টোর পালমোনারী অ্যাস্‌বেস্‌টোসিস্ (অ্যাস্‌বেসটস্ কারখানার মজুরদের ফুস্‌ফুসের রোগ), ডাঃ সিয়োক্যানিমুলার অ্যাসবেস্‌টস্ কারখানার মজুরদের নিউমোকোনিওসিস্ রোগের সম্বন্ধে মন্তব্য এবং ক্যাগারা সহরের সিভিল হাসপাতালের রেডিওলজি গবেষণাগারের অধ্যক্ষ চাভালুইস্টুরাগোর লিখিত ক্যাগারা মাইন্‌স্ কারখানার মজুরদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত-পূর্ণ প্রবন্ধ—এই সকল সন্দর্ভ বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজনীয় সত্যে ভরপুর। জেন্‌ সহরের ক্যান্টরী পরিদর্শক বিভাগের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শদাতা ডাঃ ডাব্‌লিউ, আর, এইচ, ক্যানেবার্গ নেথারল্যাণ্ডস্ দেশে সিলিকোসিস্ প্রবন্ধে নানা তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। তরুণ যুবক শ্রমিকগণের মধ্যে এই রোগের বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত খুবই প্রয়োজনীয়। এই প্রবন্ধেও অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও এক্সরে চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র লীগ অব্ নেশান্‌সের সভ্য না হইলেও আন্তর্জাতিক মজুর-সঙ্ঘের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠযোগ আছে, সেইজন্যই ঐ দেশের প্রতিনিধিরা জোহানসবার্গ সিলিকোসিস্ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের অন্যতম ডাঃ অ্যালবার্ট ই, রাসেল (ইউনাইটেড ষ্টেটস্ পাবলিক্ হেল্‌থ সার্ভিসের কর্মচারী) ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে সিলিকোসিস সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছিলেন ; ইহাও বিশেষভাবে সুলিখিত ও বহু তথ্যে পরিপূর্ণ ; অনেকগুলি প্রশ্নচিহ্নের মজুরদের মধ্যেই এই ব্যাধির বিস্তার দেখা যায়। আর যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত উনপঞ্চাশটি রাষ্ট্রের অনেকগুলিতেই শ্রমিকদের সাহায্য ও ক্ষতিপূরণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে এইসকল বিষয়ের যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ রহিয়াছে।

গ্রন্থের শেষে প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠায় রক্ষিণ আফ্রিকায় সিলিকোসিস রোগের বিভিন্ন বিষয়ের বিশদ পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে, উইটওয়াটারস্‌র‍্যাণ্ডের শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তথাকার স্বাস্থ্যনিবাস, ইত্যাদি বহু বিষয়েরই বহু তথ্য ইহাতে রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক মজুরসঙ্ঘ এই বিরাট গ্রন্থখানি ছাড়াও আরও একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি রহিয়াছে।

এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে সিলিকোসিস রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা হয়। আশা করা যায়, আন্তর্জাতিক মজুরসঙ্ঘ এ সম্বন্ধে এবং অনুরূপ ব্যাধি সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচনা করিবেন এবং তাহাতে সমগ্র শ্রমিকগোষ্ঠীর তথা সমস্ত মানবজাতিরই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ

১। "দি এগ্রিকালচার্যাল প্রব্লেম" (কৃষি-সমস্যা), এফ্ এন্ ব্লাণ্ডেল। পিত্ ম্যাক্স ওয়াট্, লণ্ডন। ৯০ পৃঃ।

২। "দি ল্যাণ্ড, এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ন্যাশনাল ইকনমি" (জমি, কৃষি ও জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা), সি টার্ণার। জে মেন, লণ্ডন। ১৯২৯। ৮৬ পৃঃ।

৩। "ডাস্ ডাহচে আগ্রার প্রব্লেম" (জার্মাণির কৃষি সমস্যা)। ওয়াল্ টিট্চ্ প্রভৃতি। ১৯৩০। ৪০পৃঃ।

৪। "ইয়াঙ্ প্ল্যান উণ্ড আগ্রারপোলিটিক" (ইয়াঙ্ প্ল্যান ও কৃষি-রাজনীতি), জর্জ্জ সোল্মসেন। পারে, বার্লিন। ১৯২৯। ৪০ পৃঃ।

৫। "এগ্রিকালচারাল রিসর্স ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স" (যুক্তরাষ্ট্র কৃষি-সম্বোর), অল্ভি ব্ল্যাক। ম্যাকগ্র হিল, নিউইয়র্ক। ১৯২৯। ৫১১ পৃঃ।

৬। "আমেরিকা চ্যালেঞ্জড্; এ প্রিফেস টু এ পয়েন্ট অব্ ভিউ" (আমেরিকার নেতৃত্ব প্রতিহত; এক মতবাদের উপক্রমণিকা), লিউস এক্কার। ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক। ১৯২৯। ৩২১ পৃঃ।

৭। "ষ্টাডিজ্ ইন্ ওয়ার্লড্ ইকনমি। নং ১। দি কনডিশনস্ অব্ এনডিওরিং প্রসপারিটি+দি ইণ্টার ন্যাশনাল ইমপ্লিকেশানস অব্ বিজনেস ডিপ্রেশন" (দুনিয়ার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে গবেষণা। ১নং। স্থায়ী ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি কি হইতে পারে—ব্যবসা মন্দার আন্তর্জ্জাতিক তাৎপর্য্য—ব্যবসা বিস্তারের কৌশল)। ১৯৩১। কার্ণেগী এনডাওমেণ্টের ইণ্টারন্যাশনাল কমিশনিসেনের তাঁবে প্রকাশিত; নিউইয়র্ক। মূল্য ৫ ডলার।

প্রাচুর্য্য কি বর না অভিশাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্

দুনিয়াব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দিলেও কৃষিজাত ও কারখানাজাত পণ্যের অনটনহেতু এরূপ হইয়াছে এ কথা বলিতে আজ শুনা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, গোলা-ভরা ধান, গম প্রভৃতি থাকিতেও দেশে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। বিনিময়ের ফল এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এরূপ সস্তা হইতে কখন দেখা যায় নাই। এই সেদিন লণ্ডন সহরে এগারটী প্রধান প্রধান দেশের প্রতিনিধিরা মিলিয়া এক বৈঠকে আলোচনা করিয়াছেন, কি করিয়া সস্তা পণ্যের, বিশেষতঃ খাদ্যের, আর্থিক দুর্গতি রোধ করা যায়। অবশ্য ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে রোম নগরেও এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিয়াছিল। সেখানেও আলোচনার বিষয় ছিল দুনিয়াব্যাপী প্রচুর কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের বিষয়ক ফল ও প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ। সেখানে পশ্চিমের বোঝা পুবের স্কন্ধে চাপানোরও প্রস্তাব হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যে সব দেশ প্রচুর গম উৎপাদনের জন্য দুর্গতি সহ্য করিতেছে, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এশিয়ার দেশসমূহে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্যে খাদ্যহিসাবে চাউল (ধান) অপেক্ষা আটা, ময়দা ইত্যাদির (গম) উৎকর্ষতা বুঝাইতে চেষ্টিত হউক, তাহা হইলেই গমের চাহিদা বাড়িবে। অবশ্য এ যুক্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন যে, তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া এশিয়ার দেশগুলি ধান ছাড়িয়া গম খাইতে আরম্ভ করিলে, নিজেরাই যে গম উৎপাদন করিতে চাহিবে না তা কে বলিতে পারে? পরে এই দেশগুলাই যে গম রপ্তানি করিবে না সে কথাই বা কে বলিতে পারে? তখন আবার উল্টা সুর ধরিতে হইবে।

খাদ্যের দুর্গতি না হইয়া এখন টাকার দুর্গতি হইয়াছে। তাহাতে গোলা-ভরা ধান রহিয়াছে, পাট জন্মিয়াছে, আমেরিকায় গম রহিয়াছে, আভার রহিয়াছে, অথচ কিনিবার লোক নাই। সুতরাং প্রাচুর্য্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। ধরা যাক যেন বসুন্ধরা প্রসন্ন হইয়া একই পরিশ্রমে ও খরচায় দ্বিগুণ ফসল দিতে লাগিলেন। ফল কি হইবে? মান্ধাতার আমলে যদি বসুন্ধরা সুপ্রসন্ন হইতেন, তাহা হইলে অবশ্য ভালই হইত; কেন না অল্প পরিশ্রম করিয়াই প্রচুর ফসল পাওয়া যাইত। কিন্তু এই আধুনিক সভ্যতার যুগে ত তাহা হইবে না। পুরাকালে লোকে সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি নিজেরাই উৎপাদন করিত এবং অভাবের বৈচিত্র্যও ছিল অল্প। কিন্তু এখন কৃষিকর্ম্ম ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের ছাতা চাই, জুতা চাই, কাপড় চাই, তেল চাই, নুণ চাই, আলো চাই ইত্যাদি; আবার কেহ বা কেবল ধান চাষ করে, কেহ বা তুলা চাষ করে, কেহ বা পাট চাষ করে, কেহ বা মুরগী শূকর পোষে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ সকল কৃষিজীবীকেই আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষক চাষ করে টাকার জন্য, সেই টাকার বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। সুতরাং যদি বসুন্ধরা অত্যন্ত কৃপা করিয়া কৃষিজাত পণ্য (যেমন ধান, গম) দ্বিগুণ করেন, অথচ খরচের পরিমাণ সেই একই থাকে, তবে খাদ্যদ্রব্যের অর্দ্ধেক অংশও বিক্রয় করিতে হইলে, ধান গমের দর নিতান্ত সস্তা করিয়া বেচিতে হইবে। ফলে বীজ ক্রয়, লাঙ্গল টানা, গরু ক্রয় প্রভৃতি এমন কি নিতান্ত আবশ্যক অনেক দ্রব্য (যেমন তেল, নুণ প্রভৃতি) ক্রয় করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া জমি বন্ধকী টাকার সুদ, জমিদারের খাজানা, লোন-অফিসের কিস্তি প্রভৃতিও দেওয়া চলিবে না। ফলে জমির দর পড়িয়া যাইবে এবং জমিতে যে টাকা লাগান হইয়াছে বা জমি বন্ধক

রাখিয়া যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে সে সমস্ত নষ্ট হইবে। যাহারা কারখানা-শিল্পে নিযুক্ত আছে তাহাদেরও কোন সুবিধা হইবে না। যদি কৃষককুল কারখানাজাত পণ্য খরিদ করিতে না পারে তাহা হইলে কারখানা-শিল্পে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। খাদ্য সস্তা হইতে পারে, কিন্তু বেকার মজুরের হাল কি দিয়া ঐ সস্তা খাদ্য কিনিবে? মজুরি শুধু এই এক কারণেই কমিবে না। কৃষিতে লাভ নাই বলিয়া অনেক কৃষকই কারখানায় মজুরি করিতে ছুটিবে। ফলে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। পুনরায় সমতায় আসিতে অনেক সময় লাগিবে।

দরের বিপর্য্যয় হওয়াতেই এই দুর্গতির সৃষ্টি। এইখানেই পুরাকালের সহিত এ যুগের তফাৎ। সে যুগে নিজের অভাব নিজেকেই মিটাইতে হইত বলিয়া বিনিময়ের দরকার ছিল না। এখন টাকা বিনিময় করিয়া সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিতে হয়। সুতরাং বিনিময়-শক্তির উঠা-নামার উপর উৎপাদকের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক হইলেই সেই পণ্যের বিনিময়-শক্তি নষ্ট হইবে। অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষা অধিক কোন পণ্য উৎপাদন করিলে সেই পণ্যের দর পড়িয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন করিলে কোন লাভ হয় না। কেন না, উৎপাদক ঐ বাড়তি পণ্য নিজ ভোগে লাগাইতে পারে না এবং যদি তাহা বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার ক্রয়-শক্তিও কমিয়া যায়।

আজকাল কৃষি একটা বিশিষ্ট শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও "শিল্প" বলিলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বুঝাইত; এখন কৃষিকে শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যান্য শিল্পের সহিত কৃষিশিল্পের বড় মিল আছে। যন্ত্র-শিল্পের মত কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কারখানা-শিল্পের মত কৃষি-উৎপাদনও যথেচ্ছভাবে বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু যদি খাদ্য দ্রব্যাদি লোকবল-বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা অত্যধিক বাড়তি যায়, তাহা হইলে কৃষিজাত পণ্যের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবেই যাইবে এবং প্রাচুর্য্য সুখের কারণ না হইয়া দুঃখের কারণই হইবে। শুধু যে কৃষিশিল্পই কতিগ্রস্ত হইবে এরূপ নহে, অন্যান্য শিল্পেও বিপর্য্যয় দেখা দিবে। যাঁহারা শ্রম, সরঞ্জামী ও পুঁজির অধিপতি তাঁহারা যদি বাড়তি উৎপাদন করেন, তাহা হইলে শুধু তাঁহাদেরই বিনিময়-শক্তি ব্যাহত হয় না, তাঁহারা অন্যান্য লোকের বিনিময়-শক্তিও ব্যাহত করেন। কেন না, যদি তাঁহারা বিক্রয় করিতে না পারেন, তবে কিনিতেও পারিবেন না; যদি তাঁহারা অপরের নিকট হইতে খরিদ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অপরে তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করিতেও পারিবে না; আবার ইঁহারাও বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না বলিয়া খরিদ করিতেও পারিবেন না।

প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিদ্ ম্যালথাস্ আঁকজোক করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, মনুষ্যসমাজে দারিদ্র্য চিরকাল থাকিবে, যেহেতু খাদ্য-সংস্থান যে হারে বাড়ে, তাহা অপেক্ষা উচ্চ হারে জনসংখ্যা বাড়ে। তাহার পর লোকবল দ্বিগুণ হইয়াছে, অথচ খাদ্য আছে প্রচুর। খাদ্য-সংস্থান বাড়াইবার জন্য যে সব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, ম্যালথাসের পক্ষে সে সব কল্পনা করাও সম্ভব হয় নাই। আর একটা বিষয়ও লক্ষ্য করা হয় নাই। তাহা এই যে, খাদ্য-সংস্থান যত অগ্রসর হইতে থাকে, লোকবলও তত কমিয়া আসে। অর্থাৎ জীবনযাপনের ধারা যত উৎকর্ষতা লাভ করে, জন্মহার তত কম হইতে থাকে। এখনো জনবল বাড়িতেছে, কিন্তু জন্মহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। যদিও একশত বৎসরে লোক-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়াছে, তথাপি জন্মহার এরূপ কমিয়া যাইতেছে যে, পুনরায় দ্বিগুণিত হইতে হয়ত পাঁচশত বৎসর লাগিবে। ম্যালথাসের সময়ে হয়ত প্রাচুর্য্য কখন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, তাই হয় ত এই 'পেসিমিষ্টিক্' মত শুনা গিয়াছিল। অনেক কাল ধরিয়া লোকের ধারণা ছিল যে, জলীয় আবহাওয়া না হইলে শস্য জন্মে না; সুতরাং সেরূপ স্থানসমূহে চাষ করা হইয়া গেলে, শস্য উৎপাদন আর বাড়ান চলে কি করিয়া? বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে সে বাধা অতিক্রম করা গিয়াছে। যে সব বীজ উষ্ণ জলিতে ও উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মাইবে সেরূপ বীজের

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম কানসাস্, পশ্চিম নেব্রাস্কা ও পূর্ব্ব কোলোরেডো প্রভৃতি ৩০০ মাইল বিস্তৃত মরুভূমি-সদৃশ স্থানসমূহেও যন্ত্রপাতির সাহায্যে গম ফলানো হইতেছে। আমেরিকার বাড়্তি গম এইখান হইতেই আসে। অল্প সময়ের মধ্যে ফসল পাওয়া যাইবে এরূপ বীজ আবিষ্কার করিয়া ক্যানাডা প্রচুর গম উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক স্যর উইলিয়াম ক্রুক্স বলিয়াছিলেন যে, ১৯০১ সন নাগাদে পৃথিবীতে গমের অনটন হইবে। যে সব জমিতে গম চাষ করা চলিতে পারে, সেরূপ সব জমিতেই চাষ চলিতেছে; সুতরাং জুট্টা, ঘাস প্রভৃতি যে সব জমিতে আবাদ করা হয় সে সব জমি গমের চাষে না লাগাইলে মুস্কিল। তখন সব দেশগুলাই গম খরিদ করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করিবে। তিনি তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, ঘোড়া গরুর স্থানে "ট্রাক্টর" দখল করিবে। ট্রাক্টর ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া, যে সব জমিতে ঘোড়া গরুর জন্য ঘাস বিছালি আবাদ করা হইত, সে সব জমি খালি পড়িয়াছে। সেই ১৯০১ সন আসিয়াছে, অথচ কোন দেশেই গম খরিদ করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না, বরং সব দেশেই শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া আমদানির পথে বাধা দেওয়া হইতেছে। এখন গমের অনটনের কথা কোথাও শুনা যাইতেছে না, পক্ষান্তরে যাহাতে অনটন হয় তাহাই লোকে চাহিতেছে। রুশিয়া, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ক্যানাডা ও এমন কি যুক্তরাষ্ট্রেও আরও কত অধিক গম জন্মান যাইতে পারে তাহা বলা দুঃসাধ্য।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় ইয়োরোপ প্রদেশে গম চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ½ কমাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু গম উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চাষের বহর বাড়ান হয়। সে সময়ে খাদ্য সম্বন্ধে লোকের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, যতই গম উৎপাদন বাড়ান যাউক না কেন, অভাব থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখন দেখা গেল যে, মোট গম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াই গিয়াছে। রোমের ইন্টার-ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ এগ্রিকাল্চারের মতে যুদ্ধের পর ইয়োরোপে গম চাষের পরিমাণ ১৩,২৫০,০০০ একর কমানো হয়; অথচ যুক্তরাষ্ট্রে ২৫,০০০,০০০ একর ও ক্যানাডায় ৮,০০০,০০০ একর বাড়ে; অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের গম চাষের পরিমাণ ১৩,২৫০,০০০ একর কম হইলেও, অন্যদিকে গম চাষের পরিমাণ ৩৩,০০০,০০০ একর বাড়িয়া যায়। গমই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন ইহার উপর নির্ভর করে। তাই গমের কথাই বেশী করিয়া বলিতেছি। গম সম্বন্ধে যাহা সত্য অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য। ইন্টার-ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ এগ্রিকাল্চারের হিসাব অনুযায়ে যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র দুনিয়ায় ২০০,০০০,০০০ একর জমি গমের চাষে ছিল, যুদ্ধের পর উহা বাড়িয়াছে। হিসাব নিম্নরূপ—

বৎসর	জমির পরিমাণ
১৯০৯-১০ (গড়)	১৯৮,০০০,০০০ একর
১৯২৬	২০১,০০০,০০০ "
১৯২৭	২০৩,০০০,০০০ "
১৯২৮	২৪৫,০০০,০০০ "
১৯২৯	২৪০,০০০,০০০ "
১৯৩০	২৪৭,০০০,০০০ "

১৯৩০ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে প্রায় ২৫% বাড়িয়াছে।

ইয়োরোপে গম উৎপাদন বাড়িবার হেতু এই যে, যুদ্ধের পর সমস্ত দেশগুলাই পুনরায় কৃষির উন্নতিতে মন দেয়। যুদ্ধের পর দেশে দেশে আর্থিক অনটন এরূপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, যে সব পণ্য দেশের মধ্যেই সহজে উৎপাদন করা চলে সে সব পণ্য আমদানি করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অধিকন্তু, ইয়োরোপের প্রায় সব দেশই যুদ্ধের পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে দেশের প্রয়োজনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমদানি করিত। কিন্তু যুদ্ধের পর এই সব দেশগুলা ব্যাঙ্কস্থ বিষয়ে পরদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অপেক্ষা স্বাধীন হওয়া অধিক কাম্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাই সস্তা দরের বিদেশী মালের আমদানি রোধ করিবার জন্য শুল্ক-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এদিকে আমেরিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশগুলা যুদ্ধের সময় গম

চাষের জমির পরিমাণ বেশ অনেকখানি বাড়াইয়াছিল; যুদ্ধশেষেও তাঁহারা চষা জমির পরিমাণ খাটো না করিয়া বাড়াইতেই লাগিলেন। ফল ফলিও নামিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চষা জমির পরিমাণ বাড়িতেই ছিল। আমেরিকায় সব চেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে—মোট ১,০০০,০০০,০০০ বুশেল; ১৯২৪ সনে প্রায় ৭,০০,০০০,০০০ বুশেল পাওয়া যায়; ইহার তিন বৎসর পরে উৎপাদনের পরিমাণ ১০০,০০০,০০০ বুশেল হইয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কখনও এত বেশী উৎপাদন হয় নাই। এই সময়ে আমেরিকা, কানাডা এবং আর্জ্জেন্টিনারও চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে; অষ্ট্রেলিয়ায় চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্বের দ্বিগুণ বাড়ান হইয়াছে।

দর পড়িয়া যাইতে পারিলেও উৎপাদন-বৃদ্ধির উৎসাহ দেখিলে একটু ধাঁধার মত লাগে। দর পড়িলেই যে উৎপাদন বাধা পাইবে, এ ধারণা ভুল। বরং ঠিক উল্টাও হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল ওয়ারের পর তুলার দর অর্দ্ধেক পড়িয়া যায়, অথচ উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। মুনাফার মাত্রা যত কম হইয়া আসে, মোট মুনাফার পরিমাণ একই রাখিবার জন্য পণ্যের উৎপাদন তত বাড়িয়া যায়। যদি বুশেল প্রতি ৩ আনা লাভ হয়, তবে ১০০০ বুশেলে ২০০৲ মোট মুনাফা পাওয়া যাইবে; কিন্তু যদি দর পড়িয়া যায় ও বুশেল প্রতি মাত্র ৵০ আনা লাভ হয়, তবে ঐ ২০০৲ মুনাফা পাইতে হইলে ২০০০ বুশেল বিক্রয় করিতে হইবে। যুদ্ধের পর দর পড়িয়া যাইতে থাকায় লোকে কি করিয়া উৎপাদন-খরচা কমাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল; ফলে ট্র্যাক্টর, ট্র্যাক্টর-টুল, কম্বাইন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এই সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে প্রত্যেক মজুরের কার্য্যশক্তি ৫।১০ গুণ বাড়িয়া গেল এবং উৎপাদন-খরচাও অনেক কমিল। এইগুলির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। কানাডা, আর্জ্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়াও এই যন্ত্রপাতি কৃষিকর্ম্মে লাগাইল; পরে রুশিয়াও এই পন্থা অবলম্বন করিল ও রুশিয়ার সস্তা শ্রমের আওতে দেখা দিল। এইভাবে কৃষিজাত পণ্যের পরিমাণ প্রচুরভাবে বাড়িয়া গিয়া সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সঙ্কটের হাত এড়াইবার জন্য বিদেশী প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করিতে শুল্ক-প্রাচীর উঠান হইল; কিন্তু ফল কিছু সুবিধাজনক হইল না। আমেরিকা আর এক উপায় স্থির করিল। এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যাক্ট বা কার্টিলিজ্‌ বিল্‌ অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করা হইল। কিন্তু ইহাতেও কিছু সুফল দেখা গেল না; তবে একথা বুঝা গেল যে, আইন করিয়া বাড়তি পণ্যজনিত দুর্গতি রোধ করা যায় না, বা সাধারণের টাকা দিয়া সরকার যদি পণ্যের মোটা অংশ ধরিয়া রাখে তাহা হইলেও পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তাই বাড়তি পণ্য-জনিত দুর্গতি রোধ করিবার জন্য উপায়-অনুসন্ধান চলিতেছে। এখন আবার একদল বলিতেছেন, চাষের জমির পরিমাণ খাটো করা ছাড়া উপায় নাই; তাই গম-উৎপাদক, তুলা-উৎপাদক, রবার-উৎপাদক, পাট-উৎপাদক প্রভৃতি সকলকেই ঐ সব বিভিন্ন পণ্য আবাদ করিবার জমির পরিমাণ সঙ্কোচ করিতে বলা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়? যদি চাষী কম জমিতে গম উৎপাদন করে, তবে বাকী জমিতে সে কি চাষ করিবে? সে কথা কে তাহাকে বলিবে? অধিকন্তু গমের বদলে অন্য কোন পণ্যই সে ঐ পরিত্যক্ত জমিতে আবাদ করুক না কেন, সেই নূতন পণ্য কি আবার সেই পণ্য-বিশেষের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবেনা? পাটের জমিতে ধান বুনিলে, ধান পণ্যের কি প্রাচুর্য্য হইবে না? তা ছাড়া সব পাটচাষীই কি আবাদী জমির পরিমাণ খাটো করিবে? হয় ত এমন অনেক পাটচাষী, গমচাষী আছে যাহারা এই মন্দা বাজারেও লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। সকল কৃষিজাত পণ্য সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। ইহারাও কি জমির পরিমাণ খাটো করিবে? যদি তা না হয়, তবে কোন কোন চাষী আবাদী জমির পরিমাণ খাটো করিবে, কোন কোন চাষী করিবে না অথবা যাহারা এ দুঃসময়েও লাভ করিতেছে তাহাদের অল্প মুনাফা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আইন করিয়া জমির পরিমাণ অল্প করিবার কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন; কিন্তু দুনিয়ার সব দেশেই যদি এরূপ আইন না হয়, তবে তাহাতে ফল কি হইবে?

বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিলে বাড়্তি সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকের চোখে উদ্ভিদ জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া (অর্গ্যানিক্-কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি) ছাড়া আর কিছু নহে; তাঁহার চোখে উদ্ভিদ্ হইতেছে 'সেলুলোজ' ও 'কার্বোহাইড্রেট্'এর সমষ্টি। গরু যখন শাক্-সব্জী খায়, বৈজ্ঞানিক বলেন যে কার্বোহাইড্রেট্স্, প্রোটীন্ ও ফ্যাটএ পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমাদের খাদ্য প্রোটীন্, ফ্যাট্ ও কার্বোহাইড্রেট্সের সমষ্টি। আমরা খাদ্য গ্রহণ করিবার পরও অনেকটা কার্বোহাইড্রেট্ বাড়্তি থাকে। রাসায়নিক দেখেন যে, আমরা যে শস্যকে বাড়্তি জানিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি তাহা ষ্টার্চ, সুগার, অ্যালকোহল প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানের আধার; তিনি ইহাও জানেন যে, উদ্ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত সেলুলোজ হইতে রঙ, কাগজ প্রভৃতি তৈরী করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি এইভাবে এইসব রাসায়নিক উপাদানগুলি উৎপাদন করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ বাড়্তি শস্যের পরিমাণ স্থির থাকা চাই ও বেশ সস্তা হওয়া চাই। বাড়্তি শস্যের যোগান একরূপ থাকা চাই এই কারণে যে, তাহা হইলে কাঁচা মালের উপর নির্ভর করিয়া রাসায়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে: এবং উহা সস্তা হওয়া চাই এই কারণে যে, এই উপায়ে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট্ শিল্পকে যৌগিক-রাসায়নিক শিল্পের (সিন্থেটিক্-কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি) সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। যৌগিক-রাসায়নিক শিল্পের মারফৎ আমরা সস্তায় এরূপ অনেক রাসায়নিক উপাদান (বেসিক্ কেমিক্যালস্) পাইতেছি যাহা জৈব-রাসায়নিক-শিল্প হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। এইভাবে বাড়্তি কৃষিজাত দ্রব্য বেশ কাজে লাগিতে পারে। যদি আমাদের কল্পিত কার্বোহাইড্রেট্ শিল্প, যৌগিক-রাসায়নিক শিল্পের সহিত ধরে টক্কর দিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সমস্যাটা "বাড়্তি লইয়া কি করা যায়" না হইয়া "কিভাবে আরও বাড়্তি উৎপাদন করা যায় ও আরও সস্তায় তাহা হয়" এইরূপ দাঁড়াইবে।

সুতরাং বাড়্তি কমানোর কথা না ভাবিয়া, বাড়্তিটা কি নূতনভাবে কাজে লাগান যায় তাহা দেখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

নবীন চীনের শিল্প-সাধনা

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

কৃষি এবং কুটীর-শিল্পের লীলাভূমি গোটা প্রাচ্য জগৎ আজ শিল্পগত সভ্যতার (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলিজেশান্) অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের কিন্তু আর এই সভ্যতার উপর তেমন টান নাই, ষ্টীম্ ইঞ্জিনের উপর পশ্চিমে যেন কেমন একটু বিরক্তির ভাব দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-সাধনার এই ভাঁটার সময়ে প্রাচ্যের শিল্প-সাধনা-প্রীতি যে বেশ একটু তাজ্জব ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণশীল প্রাচ্যের এইরূপ ষ্টীম্ ইঞ্জিন-প্রীতির কারণ অবশ্য আছে। সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কারণ এই যে, কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে লোক-সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে, শুধু জমির উৎপন্ন ফসলে আর সকলের পোষাইতেছে না। মানুষের বংশ-বৃদ্ধির হারের সহিত জমির উৎপাদিকা শক্তি তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম। কর্ষণোপযোগী জমির পরিমাণও সীমাবদ্ধ। প্রাচ্য জগৎ এই বর্দ্ধিত লোক-সংখ্যার সংস্থানের জন্য বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে। এই বিষম সমস্যার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়-স্বরূপ ধনবিজ্ঞানসেবিগণ বাৎলাইতেছেন—কলকারখানার প্রচলন করিতে হইবে। জমি হইতে উদ্বৃত্ত লোকজনকে কল-কারখানার গণ্ডীর মধ্যে আনিতে

পারিলে আর জমির উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে না। প্রাচ্যের অগণিত জন-সাধারণের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাচ্যের মনীষিগণ এতদিন ধরিয়া প্রচার-কার্য্য চালাইয়া আসিলেও কালের কুটিল গতিতে এখন প্রাচ্য জগতে এমন এক শ্রেণীর ভাবুক আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা পশ্চিমের তথাকথিত যন্ত্র-প্রীতিকেই প্রাচ্যের পক্ষে আধ্যাত্মিক দাওয়াই বলিয়া প্রচার করিতেছেন। প্রাচ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রসমূহও এই ধনবিজ্ঞানসেবী এবং নব্য দার্শনিকদের সুরে সুর মিলাইয়াছে। এজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের শিল্প-বিভাগগুলি নানাপ্রকার সুবিধা কায়েম করিতেছে। দেশে পুঁজি নাই, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই আছে, তবুও নাছোড়-বান্দা রাষ্ট্রগুলি আজ 'কোর্ড'-লিখিত সুসমাচার হস্তে অপায়ের জনসাধারণের পরিত্রাণের নিমিত্ত দণ্ডায়মান।

পাশ্চাত্য জগতের এই শিল্প-সাধনার মূলে ছিল ব্যক্তিগত ধনলিপ্সা। কোন কোন মনীষী বিলাতের এই বণিক-বৃত্তির বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে লেখনী-চালনা করিয়াছেন। তবে কি প্রাচ্যও এইরূপ ব্যক্তিগত ধনলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়াই কলকারখানা কায়েম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সোটা ইয়োরোপ এবং আমেরিকার এই শিল্প-প্রীতির ফলে যে অনাচার ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে কি প্রাচ্য একটুও অবহিত হয় নাই? সমসাময়িক রুশিয়ার দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকিতেও কি প্রাচ্য যন্ত্রদানবের যূপকাষ্ঠে আপায়ের জনসাধারণকে বলি দেওয়ার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে? প্রাচ্যের যন্ত্র-সাধনার মূলে কিন্তু এইরূপ কোন মোহ নাই। প্রাচ্য সমাজ-জীবনে পুঁজিবাদের (ক্যাপিটালিজ্‌ম্) পক্ষপাতী নয়—পুঁজিবাদকে মাত্র ধন-উৎপাদনের কলকৌশলরূপে প্রাচ্য গ্রহণ করিতে চাহে। জাগ্রত চীন আজ দুনিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে আপন আসন কায়েম করিতে চাহে। সেইজন্য চীনের আজ বাষ্পশক্তি এবং বিদ্যুতের দরকার। কুটীর-শিল্প, এবং রিকশা গাড়ীর স্থানে আজ মহাচীন গাদায় গাদায় মাল উৎপাদন এবং মোটর গাড়ী কায়েম করিবার পক্ষপাতী। কারণ চীন বুঝিয়াছে, এইগুলি না হইলে দুনিয়ায় মান সম্মান বা প্রতিপত্তি লাভের কোন উপায় নাই। চীন মুলুকের বৈশিষ্ট্যই এই যে, কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। এই মহা অনর্থের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি তাহা ভাবিয়া চীন আজ দিশাহারা। সেইজন্য যন্ত্রশক্তিকে আজ চীন দেবতার মত বরণ করিয়া লইতে প্রয়াসী, ফলত ইহাদ্বারা শুরুভারের কিছু লাঘব হইবে। কিন্তু যন্ত্র-শক্তি যেমন দেবতার মত সহায়ক হইতে পারে, তেমনি আবার দানবের মত রক্ত-শোষণও করিতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে যন্ত্রশক্তির দ্বিতীয় রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। চীন এই অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিবার পক্ষপাতী নহে; চীন চায় তাহার শিল্প সাধনায় আপন বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিতে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন পথে চীনের শিল্প-সাধনা চলিবে।

কল-কারখানার যুগ দুনিয়ায় আরম্ভ হইয়াছে গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে। তৎপূর্ব্বে শিল্প-কৌশল হিসাবে চীনের সহিত পাশ্চাত্য জগতের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বরং কোন কোন বিষয়ে চীনই ছিল শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ১৭৯৩ সনে বিলাত যখন চীনের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়, চীন তখন ব্যাপারটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। তখনকার দিনে চীনের এই ঔদ্ধত্য নিতান্ত অমূলক ছিল না। বিলাতে তখন নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি মাত্র গজাইয়া উঠিতেছিল বর্ত্তমান চীনেরই মত। কতকগুলি বিলাতী শিল্পের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল। চীনারা তখন যে শিল্প-কৌশলের অধিকারী ছিল বিলাতবাসী তখনও তাহা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এই বিদ্যায় বিলাতের সংস্থান পাতবনী হইয়া উঠিতে প্রায় এক শতাব্দী কাটিয়া যায়।

চীনের স্বপক্ষে এই যে, ঐ যে দেড়শত বৎসর আগে—যন্ত্রশক্তির চলন হইবার পূর্ব্বে—যে হালচালে শিল্পকার্য্য চলিত তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় তিন-তিনটা যুগ ধরিয়া ক্রমাগত শিল্প-বিপ্লব ঘটিতে থাকে। এখনও চীনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পুরাতন শিল্পরীতিই রক্ষিত হইয়াছে; তবে ইহা সত্য যে, শিল্পসাধনার এই

বাদ্ধাতার যুগ চীন মুল্লুকে ক্রমেই কাটিয়া আসিতেছে। এখনো চীন দেশে সেই ছোট ছোট মালিক জনকয়েক কারিকর লইয়া ছোট ছোট কারখানা চালায়; কৃষিকার্য্যের সহিত কুটীর-শিল্প এখনও সেখানে বিজড়িত; অল্পদিন পূর্ব্বেও চীনে হাজার হাজার 'গিল্ড' ছিল। এমন কি ১৯২৩ সনেও দেখা গিয়াছে, দশ লক্ষ লোকের বাসস্থান পেইপিং-এ ৩৩টী গিল্ডের সভ্য সংখ্যা ১০৬,০০০ জন। বিদেশী দর্শক কোন চীনা সহরে পদার্পণ করিলে দেখিবেন, গলির দিকে মুখ-বিশিষ্ট সারি সারি বাড়ী এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই কারখানা। এই সমস্ত কারখানার কারিকরগণ হয় লোহা পিটাইতেছে না হয় কাঠ খোদাই করিতেছে। কারিকর মালিক সবাই এক সঙ্গে কাজ করে, একত্রে খায়দায়, আবার শিক্ষা-নবিশগণ মনিবের বাড়ীতেই শুইয়া থাকে। এই সমস্ত কারখানার কাজ কঠিন পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ, আর এই সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজন প্রস্তরের মত ধৈর্য্য। কাজকাম সমস্তই চলে ঢিলে ঢেলায় আর বিলম্বগতিতে। দৈহিক শ্রমেরই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োজন, স্নায়ুর উপর আদৌ চাপ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে চীনে এই বাদ্ধাতার আমলের শিল্প-প্রথার সহিত আর এক শ্রেণীর প্রথা পরিলক্ষিত হইতেছে। ছোট ছোট মালিকানা স্বত্বের এক হস্তশিল্পের দেশ চীনে প্রায় এক পুরুষ ধরিয়া নয়া শিল্পকৌশল কায়েম করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে চীনমুল্লুকে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে বটে; কিন্তু শিল্পবিপ্লবের এখানে এখনও সৈশবাবস্থা কাটে নাই। দোটা পাঁচ-ছয় সহর বাদ দিলে বাকী চীনে এখনও বাদ্ধাতার আমলই চলিতেছে। চীনের নয়া শিল্পগুলির মধ্যে তুলা-শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে এই দেশে ১৩০টী তুলার কল চলিতেছে। ১৮০০ সনের বিলাতের তুলনায় এই সংখ্যা কম হইলেও কার্য্যকারিতা-হিসাবে এই চীনা কলগুলি ১৮০০ সনের বিলাতী কলের চেয়ে উচুদরের চিজ্। চীনের মোট কাপড়-উৎপাদন বিলাতের ১৮১০ সনের উৎপাদনের কাছাকাছি। মোটা জনতের তুলনায় চীন মাথাপিছু মাত্র ১/৮ অংশ লোহা-সরঞ্জাম ব্যবহার করে। শিল্প-প্রধান ইয়োরোপ বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এই লৌহব্যবহার নগণ্য মাত্র। কাপড়ের কল ছাড়াও চীন মুল্লুকে আরও কয়েক শত বাষ্পচালিত কল দেখা যায়; ২২০টী বৈদ্যুতিক শক্তি এবং আলোকের প্লান্ট, ২০০টী ময়দার কল, ৩০০টী তেলের কল, ১৯০টী দেশলাইয়ের কারখানা চীন দেশে চলিতেছে। এইগুলি ছাড়া আরও হাজার দেড়হাজার কলকারখানা চীন দেশে কায়েম করা হইয়াছে, যেগুলিকে আধুনিক কলকব্জার বলা যাইতে পারে। চীনদেশের কারখানা মজুরের সংখ্যা উর্দ্ধপক্ষে ২০,০০,০০০ হইবে। অনেকের মতে এই সংখ্যা আরও কম।

চীনের শিল্প-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে। চীনের আধুনিক কল-কারখানা-সমূহ মাত্র কতকগুলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। শিল্প-প্রচেষ্টার দিক্ হইতে চীনদেশকে তিনটী অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বন্দরসমূহ, দ্বিতীয়তঃ রেলপথ-সমৃদ্ধ অঞ্চল এবং তৃতীয়তঃ অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলসমূহ। বন্দরগুলিতে মোটা মোটা পুঁজি চালিয়া কলকারখানা চালান হইতেছে; রেলপথযুক্ত ভূভাগে পুঁজিপাটার সমাবেশ সেরূপ না হইলেও উহার ক্রমোন্নতি দেখা যায়। অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলসমূহে পুঁজিপাটার সম্পূর্ণরূপে অভাব। সম্প্রতি চীনের কলকারখানা সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণী পাওয়া গিয়াছে উহাতে প্রকাশ, ১৯২০ সন হইতে ১৯৩০ সনের মধ্যে চীনদেশে যে ১২০০টী আধুনিক ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮২৭টী (অর্থাৎ সমস্ত কলকারখানার দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক) ৪টী বড় বড় সহরে অবস্থিত। এক সাংহাই সহরেই ৩৪৫টী নয়া ফ্যাক্টরী রহিয়াছে; উহা সহরে ১১০টী, হাঙ্কাওএ ৩৮টী এবং ডাইরেনে ৩৪টী। চীনদেশের মোট কলকারখানার সংখ্যা ১,৯১৫টী। ইহার মধ্যে এক সাংহাই সহরেই ৪৫% অবস্থিত। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে এই দেশে ৮১০টী কোম্পানী রেজেষ্টারী হয়; ইহার মধ্যে ৫৮০টীর অর্থাৎ শতকরা ৪৭টীর আস্তানা এই বিরাট চীন সহরে।

যে সমস্ত কারণে চীনদেশের শিল্প-প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মাত্র কয়েকটী বড় বড় সহরে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে, তাহা খুঁজিতে হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথম তৃতীয়াংশের ইয়োরোপের অবস্থার প্রতি নজর দিতে হইবে। কারণ তখনকার ইয়োরোপের সহিত বর্ত্তমান চীনের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। চীনদেশের শিল্প-প্রচেষ্টার এইরূপ দশা ঘটিবার কারণ-স্বরূপ চীনের অন্তর্বিপ্লব, রাজনৈতিক আন্দোলন, মাল চালানের অসুবিধা, পুঁজির অভাব, কারেন্সির বিশৃঙ্খলতা, দেশরক্ষার দুর্বলতা, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। চীনের উন্নতির পথে আর একটী প্রধান বাধা বৈদেশিক বাণিজ্য-স্বার্থ। একে তো চীন দেশের খনিজ সম্পদ্ খুব বেশী নয়, যাহা আছে তাহারও প্রধান প্রধানগুলি আবার বিদেশীদের হাতে। রেলপথ, জাহাজ ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান সহায়ক অনুষ্ঠানগুলিও বিদেশীদের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং নবীন চীন ঠিক পরাধীন ভারতবর্ষেরই মত তাহার শিল্প-সাধনায় বিষম বেগ পাইতেছে।

রাষ্ট্রের গৌণ ব্যয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি এ, এফ্ আর্ ইকন এস্ (লণ্ডন)

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পোষণের খরচ

শুধু পার্থিব ভোগবাসনা পূরণ করিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক অভাবও আছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি বেশী নির্ভর করে নর বা নারীর ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর, কিন্তু তাই বলিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হইলে চলে না। আত্মিক পুষ্টিরও আর্থিক ভিত্ হইতেছে শ্রম ও অর্থ। এখন প্রশ্ন এই যে, এই শ্রম ও অর্থব্যয় গভর্ণমেণ্ট্ করিবে, অথবা ব্যক্তি নিজে করিবে। বর্ত্তমান জগতে সকল দেশেই যে এক নীতি অনুযায়ী কাজ হইতেছে তাহা নহে। প্রত্যেক দেশের অতীত অবস্থা এই বিষয়ে উহার বর্ত্তমান নীতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। ইংরেজদিগের উপনিবেশগুলি এবং আয়ার্ল্যাণ্ড আমেরিকার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পুষিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে কিছু না কিছু ব্যয় করিতে হয়। কোনও রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের ধর্ম্মচর্চ্চা উদারক করে, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সাহায্য করাই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ, দুনিয়ার বেশীর ভাগ রাষ্ট্রই রাজনৈতিক মতলবে জনগণের ধর্ম্মচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করে এবং তজ্জন্য ঐ খাতে কিছু না কিছু ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার খরচটা রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যয়ের সহিত জুড়িয়া দেওয়ারই রেওয়াজ আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই লোকের মাথায় এই ভাব খেলিতেছে যে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পোষণের জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় অনাবশ্যক।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-পোষণের খাতে ব্যয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতেই হইতেছে। এই খরচটা হয় ভারতবর্ষে যে সকল ইয়োরোপীয় নরনারী, সৈন্য ও কর্ম্মচারী থাকেন তাঁহাদের আত্মিক পুষ্টির জন্য।

এই ব্যয়টা হয় ভারত গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে কোন দায়িত্ব নাই। এই খরচের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন দরকার হয় না। এই খাতে ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াছে।

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে	ব্যয় হইয়াছে	১৪,৮২,০০০ টাকা
১৮৭১-৭২		১৫,৮০,০০০
১৮৮১-৮২		১৬,২২,০০০

১৮৯১-৯২	১৬,১৭,০০০	১৯২৩-২৪	২৯,২৭,৩৪৩
১৯০১-২	১৬,৯১,০০০	১৯২৪-২৫	৩১,২৯,৫৩০
১৯১১-১২	১১,৬৭,৩১২	১৯২৫-২৬	৩১,৭৫,৮৪৯
১৯১৩-১৪	১৯,১৫,৬৭৭	১৯২৬-২৭ ,,	৫২,৪৯,৭৩৬ ,,
১৯১৪-১৫	১৯,০৮,২৮৩		
১৯১৫-১৬	১৯,৬৫,৬৮৬		
১৯১৬-১৭	১৯,২৮,০৫৯		
১৯১৭-১৮ ,,	১৯,৯০,০৪৩		

১৯২১ খৃষ্টাব্দের সুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটিশ ভারতে মোট ২,৪৯২,২০৪ জন খৃষ্টান নরনারী আছে। মোট ব্যয়টা যদি ইহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে এই বাবদ মাথা পিছু ব্যয় হইয়াছে ১।১০ পাই।

পরবর্ত্তী দশ বৎসরেও এই খাতে ব্যয় বাড়িয়াছে।

১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে	ব্যয় হইয়াছে	২০,৫১,৮৭৮ টাকা
১৯১৯-২০		১৯,১৬,১০৩
১৯২০-২১		২৫,৩৯,৪৪৮
১৯২১-২২		৩০,৫০,৪৬৭
১৯২২-২৩		২৯,৭২,২৭৫

ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীনতার নীতি অবলম্বিত হইবে বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন ঘোষণা করিয়াছেন এবং দেশের অধিকাংশ নরনারীও যখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নহে, তখন সম্প্রদায়-বিশেষের আত্মিক পুষ্টির জন্য গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে ব্যয় করা অর্থশাস্ত্রিগণ যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না।*

বাস্তু-সমিতি (৪)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, পি-এইচ্-ডি

(৩) বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশ

যথাবিত্ত গৃহস্থেরা যাহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া গৃহের মালিক হইতে পারে এই মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহের বাস্তু-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বাস্তু-সমিতিগুলির কার্য্যাবলী বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের নিকট এই উপরিলিখিত উদ্দেশ্য একেবারেই অজ্ঞাত। বাস্তু-সমিতিগুলির প্রচলন জাতির আত্মনির্ভরশীলতার প্রমাণ দেয় এবং ইহা ইংরাজী-ভাষাভাষীদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়, কারণ গ্রেটবৃটেন ব্যতীত ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে যে কয়টী বাস্তু-সমিতি আছে তাহারা রাষ্ট্র-সাহায্যের উপর নানাভাবে নির্ভর করে।

ইতালিতে যে সমস্ত সমবায় সমিতি আছে তাহারা শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে ভাড়া দেয়। এই সমিতিগুলির কিন্তু ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার নাই।

উক্ত প্রণালীর একমাত্র ব্যতিক্রম 'ইতালিয়ান্ ন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ কো-অপারেটিভ্ বিল্ডিং সোসাইটিজ্'এর কার্য্যাবলীতে দেখা যায়। এই সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহ সভ্যগণের মধ্যে বিক্রয় করিবার রীতি আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে দোষাবহ প্রথা প্রবেশ করিয়াছে, সেজন্য

* ইকবেল কমিটির রিপোর্টে স্যর পুরুষোত্তমদাসের মতামত।

ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাহার নিরাকরণার্থ আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সমিতি বৃদ্ধদের অংশের উপর সুদ প্রদান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা পায় এবং গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণাদি রেলে অর্দ্ধেক ভাড়ায় আনয়ন করিতে পারে।

ইয়োরোপে গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় আইনে 'ভাড়া' শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হওয়ায় মনে হয় যে, স্থানীয় বা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের হাতেই গৃহের মালিকানা স্বত্ব থাকে। গ্রেটবৃটেনে গৃহনির্ম্মাণ ব্যক্তিগত কার্য্য ছিল, পরে গবর্ণমেণ্ট ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্ট উহা হইতে পুনরায়ত্ত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে ইয়োরোপে এখনও গৃহনির্ম্মাণ কতকটা সরকারের হাতেই আছে। ভাড়াটিয়াদের রক্ষা করিবার জন্য এবং অনুন্নোদিত বাস্তু-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যার্থ ইয়োরোপের সরকারেরা বহু আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে সরকার এই বিষয়ে যে কতটা হস্তক্ষেপ করেন, তাহা প্রতীয়মান হয়।

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের গৃহ-নির্ম্মাণ-বিষয়ক যে পুরাতন নিয়মাবলী ছিল তাহা যুদ্ধের পর গৃহ-নির্ম্মাণ সমস্যার সমাধানে বহু সহায়তা করিয়াছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের আইনের দ্বারা বেলজিয়ামের গবর্ণমেণ্ট জেনারেল সেভিংস্ এবং পেন্সন্ ফণ্ডকে ভাড়াদের টাকা সস্তায় গৃহ ক্রয় ও নির্ম্মাণে ব্যয় করিবার জন্য অনুমতি দেন এবং যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা ৬২,১২২টি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট সস্তায় গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দ্বারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রীতি ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী অনুসৃত হয়। ঐ জাতীয় বাস্তু-সমিতি স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তু-সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেয়, অগ্রিম অর্থ সাহায্য করে এবং জমি কিনিয়া সস্তায় গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ক্ষুদ্র বাস্তু-সমিতির নিকট বেচে, তাহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় অংশে অংশে বিস্তর ক্রেতাকে বিক্রয় করে। সামান্য অবস্থার লোকের জন্য সস্তায় গৃহ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যেই এই সাহায্য প্রদান করা হয়। গবর্ণমেণ্ট ২% সুদে জাতীয় সমিতিকে অগ্রিম টাকা ধার দেয়; জাতীয় সমিতি পুনরায় ঐ সুদে অনুমোদিত সমিতি-সমূহকে অগ্রিম টাকা ধার দিয়া থাকে। ইতালিতে বাস্তু-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়;—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য গৃহ ও সামান্য আয়ের লোকের জন্য গৃহ। বেলজিয়ামে এই প্রভেদ নাই।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের গৃহ-সমস্যা বেলজিয়ামের মত নয়। প্রকৃত পক্ষে, উত্তর ফ্রান্স ও পূর্ব্ব ফ্রান্সের কতকাংশ ছাড়া ফ্রান্সের নগরসমূহে লোকেরা সাধারণতঃ ফ্লাটে বাস করাই পছন্দ করে। এক একটি গৃহে ১০ হইতে ৩০টি পরিবার বাস করিতে পারে। এই কারণে ফ্রান্সের বাসগৃহের আদর্শ ইংল্যণ্ডের আদর্শের অনুরূপ নহে। সারিবদ্ধ গৃহ ফরাসীরা পছন্দ করে না; কোন ফরাসী বাড়ী তৈরী করিলে নিজেদের পছন্দসই বাড়ী তৈরী করে। সারিবদ্ধ গৃহের একটি চাহিদা নাই। সুতরাং তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ফ্রীহোল্ড জমি গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে। যুদ্ধের পরে ফ্রান্সে দুই প্রকার আইন কায়েম করা হইয়াছে: (১) সাবসিডি বা সরকারী সাহায্য ও (২) সস্তায় গৃহ নির্ম্মাণকারী সমিতিকে ঋণদান।

(১) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে, সাধারণ জনহিতকর সমিতিকে ও সস্তায় গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে উৎসাহ দান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন। ঐ সব গৃহ যে সমস্ত পরিবারে ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক তিনটির অধিক সন্তান বর্ত্তমান, সেই সমস্ত পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হইবে। সাহায্যের পরিমাণ অবস্থানুসারে কম-বেশী হইলেও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

(২) এই ঋণদান আবার দুই ভাগে বিভক্ত: (ক) সরকারী লক্ষ ফণ্ড সাধারণ জনহিতকর সমিতিকে ও সস্তায় বাড়ী নির্ম্মাণকারী সমিতিকে বিক্রয়যোগ্য গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২% সুদে ও ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত গৃহের জন্য

২½% সুদে টাকা ধার দিতে পারে। এই সমস্ত ঋণ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বিশেষ কমিশনের তত্ত্বাবধানে "জাতীয় আমানত ও ঋণদান সমিতি" কর্তৃক বিতরিত হইয়া থাকে। প্রথমে ১০ লাখ ফ্রাঁ ঋণদান করা হইয়াছিল; ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ঐ ঋণের পরিমাণ ৫০ লাখ ফ্রাঁ হইয়াছিল।

(খ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সিবো আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট জাতীয় পেন্সন ফণ্ড হইতে ঋণ-সমিতিকে অগ্রিম ঋণদান করেন। সরকার সমিতিকে ২% সুদে ধার দেন; সমিতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বন্ধক করিবার জন্য ঐ টাকা ৩½% পর্য্যন্ত সুদে ধার দেয়।

রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় আমানত ও ঋণদান সমিতিও উল্লিখিত ঋণ প্রদান করিয়া থাকে; তবে ইহাতে মজুর ও স্বাস্থ্য বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীন বিশেষ কমিশনের সুপারিশ দরকার হয়। প্রথমে ১০ লাখ ফ্রাঁ ঋণ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ১৯২৩ সনে উহা ৩৫ লাখ ফ্রাঁ দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর ঋণ আছে তাহা আমানত ফণ্ড সস্তা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সমিতি বা অফিসের হস্তে প্রদান করে।

উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলি ছাড়া আরো সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলির কাজ হইল একটি অথবা কতকগুলি জিলার দাবী চাহিলে মজুরশ্রেণীর জন্য স্বাস্থ্যকর গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সাহায্য করা। এই সব প্রতিষ্ঠান হাতে-কলমে বাড়ী তৈয়ার ত করেই, মিউনিসিপ্যালিটি সমূহকেও গৃহ-নির্ম্মাণের ভার প্রদান করে। ফলে বাগান-ঘেরা শহরে সাময়িকভাবে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত বন্দরোপী এই সব জায়গায় স্থান পাইয়াছে। সেখানে স্বাস্থ্য ও অর্থ-নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এক বহুৎ লোকসিস্কে কাজ যোগাড় করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

শিল্প-কারখানার মালিকগণও নানা স্থানে বিশেষত বিস্তৃত প্রদেশসমূহে সম্মিলিতভাবে মজুরদের জন্য সস্তায় গৃহ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন।

কোন কোন বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গৃহ-সমস্যার সমাধানার্থে বাস্তু ঋণদান ফণ্ড তৈয়ারী করিয়া অল্পে অল্পে পরিশোধের জন্য নানা কোম্পানীকে দীর্ঘ মিয়াদে ঋণদান করে। ঐ সব কোম্পানী নিজেদের টাকা না ভাঙ্গিয়া কিংবা সরকারের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। কোনরূপ বন্ধকী দলীলের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সম্পত্তি কোনরূপে ভারাক্রান্ত করা চলে না। অধিকন্তু, ঐ ফণ্ড হইতেও সরাসরি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। ঐ সব বাটী পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীসমূহের অথবা অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট কিংবা শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়। টাকাটা এক সঙ্গে অথবা অল্পে অল্পে শোধ করা চলে।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে আর একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার নাম "অল্প খরচে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাধারণ ফণ্ড"।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান টাকা যোগাড় করে আর এই প্রতিষ্ঠান তাহা সুবিধামত খরচ করে। এইরূপে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাটী-নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইতেছে। অনেক শিল্পপতিও বাটী-নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য পাইতেছে।

কোন কোন রেল কোম্পানী বাটী-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া থাকে, নিজেরাও কর্ম্মচারীদিগকে টাকা ধার দিয়া বাটী-নির্ম্মাণে সাহায্য করে। এই প্রকারে নির্ম্মিত গৃহের একটা সুবিধা এই যে, সরকার হইতে সাময়িকভাবে কর মাপ করা হয়।

জার্ম্মাণি

জার্ম্মাণিতে ব্যাঙ্ক-সমিতি বেশী নাই। কারণ তৎপরে রেলিট্সেন ও রাইফেইসেন নামক সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশ ঘুরিয়া ঋণ-সমিতি ও ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া এ দিকে অনেক সহায়তা করিয়াছে। যুদ্ধের অবসানে গৃহ-সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেন। বিষম সমস্যা এই ছিল যে, বাটী-নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইবে, এবং সেই সম্পত্তি হইতে যে আয় হইবে, এই উভয়ের মধ্যে বিষম বৈষম্য বর্ত্তমান। এই

অফলপ্রসূ ব্যয় কিরূপে পূরণ করা যায়? অবশ্য সরকারী সাহায্য অপরিহার্য্য ছিল; কিন্তু এই সরকারী সাহায্যের কতকাংশ এইরূপে আদায় করা হইয়াছিল।—যে সমস্ত বাড়ী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে, সেগুলির উপর একটি কর বসান হইল। কারণ ঐ সব গৃহের বাসিন্দাগণ ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল; কাজেই এই সব বাসিন্দারা অনাদায়ী ব্যয়-ভারের জন্য অংশতঃ দায়ী। বলা বাহুল্য এই প্রণালী সকলের মনঃপূত হয় নাই। যাহাদিগকে কর দিতে হইত তাহারা এই প্রণালীকে সুনজরে দেখে নাই; বিল্ডিং ষ্টেটও বাধা দান করিয়াছিল। কারণ তাহাদের মত এই ছিল যে, গৃহের উপর কর বসান ষ্টেটের কার্য্য; ষ্টেটের কাজে কেডারেশনের হস্তক্ষেপ অন্যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুনের আইনে গৃহ-কর বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। ১০% করের অর্দ্ধেক ষ্টেট ও অর্দ্ধেক মিউনিসিপ্যালিটী পাইবে ধার্য্য থাকে। তিন বৎসর কাজ করিবার পর ১৯২৩ সনে এই আইন রহিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে কোন কালেই গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য কর হইতে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায় নাই, এবং (কেডারেল) গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার অর্থ-সাহায্য করিতে হইয়াছে।

কিন্তু অনুদ্দিষ্টকল্প সমিতির (পাবলিক ইউটিলিটি এসোসিয়েশন্‌স) কর্ম্ম-প্রণালী অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে।

যৌথ, রাষ্ট্র ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণকে অংশীদার-রূপে গ্রহণ করিয়া "বিল্ডিং সিণ্ডিকেট" নামে সীমাবদ্ধদায়িত্ব-সম্পন্ন নানা যৌথ কোম্পানী গঠিত হয়। একটি সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উহার পুঁজিপাটা ৫০ লাখ মার্ক হইতে ১০ কোটি মার্কে উন্নীত হয়। এগুলিকে প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সময়ের বাস্তু-সমিতির পরবর্ত্তী সংস্করণ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য সভ্যগণকে অল্প মূল্যে বাসস্থান যোগান। অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিল্ডিং প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনও (বাস্তু-উৎপাদক সমিতি) গঠিত হইয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কার্লসরুহের জার্ম্মাণ বিল্ডিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (জার্ম্মাণ বাস্তু-কারিগরের সম্মেলন) পূর্ব্বোক্ত সাধারণ সমিতিকে ৫০ লাখ মার্ক প্রদান করিবার সঙ্কল্প করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণীর অফিস খুলে।

সাধারণ সমিতির অন্তর্গত সোসাইটিসমূহ সভ্যগণকে কখনো বাটী বিক্রয় করে, কখনো বা ভাড়া দেয়। বাস্তু-স্থাপনের জন্য সমবায় সমিতিসমূহ সভ্যগণের আর্থিক পরিশ্রম দ্বারা উদ্যান-সংলগ্ন ছোট ছোট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই উদ্যান-সংলগ্ন গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী গ্রেটবৃটেনে আরম্ভ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহা ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে এবং জার্ম্মাণিতে সব চেয়ে বেশী প্রসার লাভ করে। এ সব সমিতিতে মূল-ধনের উপর ৫% সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। অবশিষ্ট লভ্যাংশ বিতরিত হয় না। পরন্তু সমিতির কার্য্য-বিস্তারের জন্য নিয়োজিত হয়।

হল্যাণ্ড

হল্যাণ্ডে বাসগৃহের অভাব কখনো তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই। কারণ যুদ্ধের সময়ও নেদারল্যাণ্ডসে গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয় নাই। যদ্দচ বাড়ীর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নির্ম্মিত গৃহের সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু সরকারী সাহায্য স্থায়ীভাবে পাওয়া গিয়াছিল।

নেদারল্যাণ্ডসের বাস্তু-সমিতিসমূহ আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ এবং তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন চাই। গবর্ণমেণ্ট সুদের চলতি হারে সম্পত্তি বন্ধক লইয়া মজুর-শ্রেণীর গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ঋণদান করেন। বৎসর বৎসর টাকা শোধ করিয়া বন্ধক খালাস করিতে হয়। এই সমিতির সভ্যগণ নিজেরা বাটী খরিদ করিতে পারে না এবং লোকসান হইলে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কতক দূর পর্য্যন্ত দায়ী থাকেন।

(ক্রমশঃ)

ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচনে সতর্কতা

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ব্যাপকতা লাভ করিলেও, আমাদের দেশে কেবল ব্যবসায়ীদিগকেই বিশেষভাবে ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। জন-সাধারণের মধ্যে চেকের সাহায্যে দেনা-পাওনা চুকাইবার রেওয়াজ এদেশে একরূপ নাই বলিলেই চলে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে লোকে আর সহজে ব্যাঙ্কে, বিশেষতঃ স্বদেশী ব্যাঙ্কে, টাকা আমানত রাখিতে চাহে না। এইসব ব্যাঙ্ক-ফেলই ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রসারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্ক ফেইলিয়া হইলে প্রধানতঃ আমানত-কারীদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; সুতরাং টাকা জমা রাখিবার সময় ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একটু সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে এবং তাহা ব্যাঙ্ক-প্রসারের পরিপন্থী হইয়া থাকে।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে সাধারণতঃ নিজের কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না; যে ব্যাঙ্কে সে টাকা আমানত রাখিয়াছে, সেই ব্যাঙ্ক যদি চেক্ ভাঙ্গানোর সময় কোন গোলমাল না করিয়া টাকা দিয়া দেয়, তাহা হইলেই সে খুসী থাকে; অর্থাৎ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সে শুধু দেখে যে, তার ব্যাঙ্কটী নিরাপদ কি না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, যে ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা হইয়াছে, সে ব্যাঙ্কটী নিরাপদ কিনা জানা যাইবে কিরূপে? অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের ফেল পড়িতে দেখিয়া এরূপ প্রশ্ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার পূর্ব্বে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা চলতি কথায় ব্যাঙ্কগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শতসহস্র ব্যক্তি ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচনের সময়ে এই শ্রেণী-বিভাগের কথা মনে রাখেন না। বৃহৎ আফিসঘর, কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখিলেই সাধারণতঃ লোকে সেই ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া বসে। ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণও লোককে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইতে শিক্ষা দেন না। ছয়মাসের বা বৎসরের শেষে সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাঙ্ক একটী হিসাব প্রকাশ করে। আমানতকারিগণ সাধারণতঃ এইসব রিপোর্ট লক্ষ্যের মধ্যেই আনেন না। এই হিসাবের মধ্যে আমানতের হিসাব যদি কিছু বাড়িয়া থাকে, তবে সে দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইহার অধিক কিছু লোককে জানাইবার চেষ্টা করা হয় না। ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইলেও সে দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। সুসময়ে লোকে যেমন নির্ব্বিচারে ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচন করে, তেমনি আর্থিক মন্দা উপস্থিত হইলে আবার সকল ব্যাঙ্কেই সন্দেহের চোখে দেখে। অনেক ক্ষেত্রে বিপদ্ তদন্তের ফল অনেক ব্যাঙ্ককে লিকুইডেশনে যাইতে হইয়াছে। এইসব নানা কারণে, ব্যাঙ্ক-পরিচালনার মধ্যে একটা "চুপ-চুপ" ভাব আসিয়াছে।

যদি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করা যায়, ব্যাঙ্কের শক্তি কতখানি বা দুর্ব্বলতা কতখানি বুঝিয়া লইবার মত করিয়া লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক-ফেলের সংখ্যাও কমিয়া আসিবে। একথা এখন বলিবার হেতু আছে। স্বদেশীর হিড়িকে নিত্যই নূতন নূতন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যে কয়টা টিঁকিয়া যাইবে বলা শক্ত। সুতরাং দেখিতে হইবে, যে ব্যাঙ্ক নিরাপদ নয় তাহাতে টাকা জমা রাখিয়া লোকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ব্যাঙ্কের পক্ষে শক্তিশালী ও নিরাপদ হইতে হইলে কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, তাহা বলা যতটা সহজ কিন্তু ব্যাঙ্ক সেই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেছে কিনা সে কথা বাহিরের লোকের পক্ষে জানা ততটা সহজ নহে। তবু সে কথা জানিয়া লইতে চেষ্টা করা উচিত। ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী সাধারণের কাছে নিতান্ত রহস্যময়। সুতরাং লোকে যদি একটুকরা কাগজ লইয়া ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে

প্রস্তুত থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, লোকের মনে দেশের বাণিজ্যিক সততা সম্বন্ধে আস্থা বা বিশ্বাস আছে। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, ব্যাঙ্ক আমানতি টাকা তহবিলে জমা করিয়া রাখে না। ব্যাঙ্ক সেই আমানতি টাকা নানাভাবে খাটায় বা কর্জ্জ দেয়; অতএব ব্যাঙ্ক যদি বিশেষ বিবেচনার সহিত গচ্ছিত টাকা না খাটায়, তাহা হইলে আমানতকারীর পক্ষে টাকা পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। সাধারণ লোকের মনে হয়ত এই ভুল ধারণাই আছে যে, ব্যাঙ্ক বুঝি নগদ টাকাকড়ি নিজের তহবিলেই জমা করিয়া রাখে।

ব্যাঙ্কিং এর সোড়ায় ব্যাঙ্কার আমানতকারীর প্রতিনিধি (এজেণ্ট)রূপে গচ্ছিত টাকা রাখিত। ঐ গচ্ছিত টাকার মালিক সে হইতে পারিত না; কিন্তু এযুগে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার উপর মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে; আজকাল ব্যাঙ্ক আমানতি টাকা ক্রয় করে ও তাহার বদলে ঐ পরিমাণ টাকা দাবী করিবার স্বত্ব বিক্রয় করে। যে টাকাগুলি আমানতকারী জমা রাখিয়াছে সেই টাকাগুলিই ব্যাঙ্ক ফিরাইয়া দেয় না, সেই পরিমাণ টাকা ফিরাইয়া দেয় মাত্র। তথাপি এখনো এমন লোক দেখা যায় যে, টাকা গচ্ছিত রাখিবার সময় উহাতে বিশেষ চিহ্ন দিয়া লেয় এবং আশা করে যে, ঐ চিহ্নিত টাকাগুলিই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাবী করিলে পাইবে। ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমানতকারীদের মধ্যে সকলেই একসাথে গচ্ছিত টাকা দাবী করিয়া বসে না, আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়াও দৈনিক কিছু উদ্বৃত্ত তহবিলে থাকিয়া যায়। তাই ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ সেই উদ্বৃত্ত মজুত টাকা সুদ বিনিময়ে কর্জ্জ দিয়া কিছু মুনাফা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। ক্রমশঃ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারারা টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করেন, তাঁহারাও নগদ টাকা হাতে না লইয়া, সেই ঋণের পরিমাণ টাকা সেই ব্যাঙ্কেই জমা দিয়া চেক্ কাটিয়া টাকা উঠাইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ব্যাঙ্ক এখন হিসাব-রক্ষক (বুক-কিপার) বা চেক-খালাস-ভবন (ক্লিয়ারিং হাউস্) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রায় সকল দেশে এবং এদেশের বাণিজ্যিক মহলেও পণ্য-বিক্রয় করিয়া চেক্ গ্রহণ করা হয় এবং এই চেক্ আবার ব্যাঙ্কে জমা দিয়া অপরের পাওনা মিটাইবার সময় আবার চেক্ কাটা হয়। আজকাল চেকতন্ত্রী ব্যাঙ্ক-আমানত বিনিময়ের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে ব্যাঙ্কের নিকট নগদ টাকা দাবী করিতে পারিলেও তাহা দাবী না করিয়া চেক্ কাটিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। মনে কর একজন ১,০০,০০০ টাকায় মাল বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কে সেই টাকা জমা রাখিয়াছে; মনে কর সে পরদিনই আসিয়া সেই টাকা দাবী করিল। যদি নগদ টাকা পাইয়াই ব্যাঙ্ক তাহা তহবিলে জমা করিয়া রাখে তবেই ব্যাঙ্কের পক্ষে সব আমানতকারীর পাওনা নগদ টাকায় একসঙ্গে মিটানো সম্ভব হয়।

ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা বিভিন্ন বিবাদে কর্জ্জ দেয়। সুতরাং সব ঋণ একই সাথে শোধ করা চলে না। ধর যদি এক জন চাষীকে ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে, তবে ঐ চাষী যে শস্য বুনিয়াছে, যতদিন না তাহার ফসল পায়, ততদিন তাহার নিকট হইতে টাকা পাওয়া যাইবে না। যদি মেয়াদ বেশি হয় তবে অন্ততঃ আংশিক পণ্য বিক্রয় না করিলে সে দেনা শোধ করিতে পারিবে না। তাই বলিতে হয় যে, যদি সমস্ত ব্যাঙ্কের সমস্ত আমানতকারী একই সাথে টাকা দাবী করিয়া বসে, তবে সব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক নিরাপদ কিনা জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ টাকা ব্যতীত যে সম্পত্তি (অ্যাসেট্) আছে তাহা লইয়া সে কি করে। যদিও একথা সত্য যে, সব আমানতকারীর টাকা ব্যাঙ্কের পক্ষে একসাথে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়; তথাপি যদি ব্যাঙ্ক ঠিকভাবে ঋণ দিয়া থাকে বা টাকা খাটাইয়া থাকে, তবে প্রয়োজন হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে অধিকাংশ আমানতকারীর দাবী মিটাইতে পারে। তা ছাড়া যদি আমানতকারীদের বিশ্বাস থাকে যে, ব্যাঙ্ক এরূপভাবে দাবী মিটাইতে পারিবে, তাহা হইলে তাহারা বেশী দাবীও করিবে না। পক্ষান্তরে যদি ব্যাঙ্ক এরূপভাবে টাকা খাটাইয়া থাকে বা কর্জ্জ দিয়া থাকে যে, প্রয়োজনমত সেগুলিকে টাকায় পরিণত করা যাইবে না; তাহা হইলে আমানতকারীদিগের দাবী মিটানো সে ব্যাঙ্কের

পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং আমানতকারিগণও ইহার আভাষ পাইলে বেশী করিয়া দাবী করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র হইতেছে নগদ টাকা; তাহার পরই সহজে টাকায় পরিণত করা যায় এরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ "লিকুইড্ অ্যাসেট্স্"। সুতরাং "লিকুইডিটি" হইল ব্যাঙ্ক নিরাপদ কিনা জানিবার প্রধান উপায়। "অ্যাসেট"কে নগদ টাকায় পরিণত করিবার উপায় তিনটী: (১) ব্যাঙ্ক যদি টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে তাহা হইলে নগদ টাকা আবশ্যক হইলে যেমনদারকে টাকা পরিশোধ করিতে বলিতে পারে, (২) ব্যাঙ্কের হাতে বণ্ড থাকিলে ব্যাঙ্ক তাহা বিক্রয় করিতে পারে; অথবা (৩) ব্যাঙ্ক অপর কোন ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সম্পত্তি বা অ্যাসেট্স্ জমা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক তাহার অ্যাসেটকে এরূপভাবে টাকায় পরিণত করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ককে মেটলিয়া হইতে হয়। সুতরাং ব্যাঙ্ক-নির্ব্বাচন কালে দেখিতে হয় যে, ব্যাঙ্কের অ্যাসেট্স্ লিকুইড্ কিনা। কিন্তু কি করিয়া তাহা জানা যাইবে?

ব্যাঙ্ক কিরূপে পরিচালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে অনেক কথাই বলা চলে; কিন্তু ব্যাঙ্ক সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিতেছে কিনা বাহির হইতে বুঝা শক্ত। সুতরাং বাহিরের লোকের পক্ষে ব্যাঙ্ক-পরিচালক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানা থাকা আবশ্যক। ব্যাঙ্ক আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশ করে তাহা দেখিয়া ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান ধারণা জন্মে, কিন্তু তাহা খুবই অসম্পূর্ণ। তাই ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বিষয়ে জানা কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্কের কারবার প্রধানতঃ অপর ব্যক্তির টাকাকড়ি লইয়া; অতএব ব্যাঙ্ক-পরিচালকের প্রধান কর্ত্তব্য আমানতকারীর টাকা নিরাপদ রাখা; ব্যাঙ্কারের ভোলা উচিত নয় যে, সে পরের টাকা লইয়া কাজ করিতেছে। যখনি ব্যাঙ্কার মনে করে যে, সে নিজের টাকা লইয়া কারবার করিতেছে, তখনি বিপদের সূত্রপাত হয়। ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বিষয়ে বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, তাহার উদ্দেশ্য কি—নিজের স্বার্থ, কি আমানতকারীর স্বার্থ কোন্‌টার প্রতি তার লক্ষ্য? তাহার অপর লক্ষ্য রাখা চাই অংশীদার-দিগকে আমানতকারিগণের স্বার্থ বজায় রাখিয়া উপযুক্ত মুনাফা দেওয়া। দেখা গিয়াছে যে, যেসব ব্যাঙ্ক অংশীদারদের মুনাফা দিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহারাই ফেল হইয়াছে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক সমগ্র সমাজের সেবা। সমাজ-সেবা বলিলে এই বুঝায় যে, ব্যাঙ্ক উদারভাবে টাকা ধার দিবে। কিন্তু এইরূপ করিলে ব্যাঙ্কের 'অ্যাসেট্' আর 'লিকুইড্' থাকে না। যদি ব্যাঙ্ক 'লিকুইডিটি' নষ্ট না করিয়া প্রচুর টাকা স্থানীয় লোকদের কর্জ্জ দিতে না পারে, তবে ব্যাঙ্ক উদার-নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলা চলে না। ব্যাঙ্ক ফেল হইলে সমাজের যে ক্ষতি হয় অন্য কোন কারণে তাহা হয় না। টাকা বেপরোয়াভাবে কর্জ্জ দিতে দিতে হঠাৎ কর্জ্জ বন্ধ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া সতর্কতার সহিত কর্জ্জ দিতে পারা সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর। বিভিন্ন মিয়াদে কর্জ্জ দেওয়ার উপর ব্যাঙ্কের নির্ব্বিঘ্নতা বা লিকুইডিটি নির্ভর করে। বিভিন্ন উপ-জীবিকায় বিভিন্ন লোককে ব্যাঙ্কের টাকা কর্জ্জ দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ঋণ-পরিশোধ বেশ একটানাভাবে পাওয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক যদি একটি ধান্য শিল্পে বা কৃষিজাত পণ্যে টাকা কর্জ্জ দেয়, তাহা হইলে ঋণের প্রকৃতির বিভিন্নতা না থাকায় জন্য ব্যাঙ্ক নিরাপদ হইতে পারে না। স্থায়ী পুঁজিতে টাকা লাগান ব্যাঙ্কের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ নহে। যদি দেশে এইরূপভাবে বিভিন্ন মিয়াদে টাকা কর্জ্জ দিবার বা খাটাইবার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক বিদেশে টাকা খাটাইতে পারে। ব্যাঙ্ক তাহা হইলে বণ্ড বা বিক্রয়যোগ্য দলীল (ওপন্-মার্কেট পেপার) বা ব্যাঙ্কের ধার-স্বীকার-পত্র (ব্যাঙ্ক অ্যাক্সেপ্টেন্সেস্) প্রভৃতি খরিদ করিতে পারে।

এত কথা বলিয়া বুঝানো হইতেছে এই যে, সুবিজ্ঞ ব্যাঙ্ক-পরিচালক একটু "কঠিন" লোক হইয়া থাকেন। অর্থাৎ "না"-ই হইতেছে তাঁহার মুখের বুলি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তিনি "হাঁ" বলেন। অনেকের মতে সমাজের উন্নতির জন্য ঋণ-গ্রহীতাদিগের অনুরোধ রাখাই

ব্যাঙ্ক-পরিচালকের কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ ব্যাঙ্ক যখন ফেল হয় তখন সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। কেন না ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই আমানতকারী, ইক্‌-ছোড়ার ও ঋণ-গ্রহীতা এই তিন শ্রেণীকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

ক্রেডিট অতিমাত্রায় করতলগত করার চেষ্টাই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে স্বাভাবিক। প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাই ভাবেন যে, ঋণের টাকা তিনি লাভজনক ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। তাই প্রত্যেক ব্যাঙ্ক-পরিচালককেই খরিদ্দারের চাপ সহ্য করিতে হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েও যথেষ্ট প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া দূরদর্শী কোন ব্যাঙ্কার যদি ঋণ দিতে অস্বীকার করেন, তবে অপর কোন অবিবেচক ব্যাঙ্কার সেই টাকাটা দিয়া দেন এবং এইরূপ অবিবেচক ব্যাঙ্কার মনে করেন যে, তিনি বড় বেশী আধুনিক ও যিনি ঋণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তিনি "বোকা প্রাচীন" বা 'ওল্ড ফুল' এবং তিনি এইরূপে টাকা কর্জ্জ দিয়া সমগ্র সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতেছেন।

আর এক কথা। যেসব লোক স্বল্পভাবে কারবার চালায়, তাহারা অসম্বিধ খরিদ্দারকে বাজে মাল চালাইবার জন্য সাধারণতঃ অত্যন্ত অধিক বিনয়ী হইয়া থাকে। অবিবেচক ব্যাঙ্ক-পরিচালকও সাধারণতঃ অত্যধিক বিনয়ী হইয়া থাকে এবং সেইজন্য ব্যাঙ্কের খরিদ্দারগণও মনে করেন যে, সেই ব্যাঙ্কারই তাঁহাদের পরম হিতৈষী বন্ধু, কেন না ব্যাঙ্কার তাঁহাদের মন যোগাইয়াই চলেন। তেমনি যে সব ব্যাঙ্ক-পরিচালক সহজে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহেন না, তাঁহাদের ব্যবহারে খরিদ্দারের মনে একটু বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। খরিদ্দার তখন তাঁহাকে 'কঠিন', 'কুলীদজীবী' 'হৃদয়হীন' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকেন। এই সব খরিদ্দার অভিযোগ তোলেন যে, ব্যাঙ্ক এরূপ উৎকৃষ্ট সিকিউরিটি চাহে যে, সেরূপ সিকিউরিটী থাকিলে তিনি ব্যাঙ্কের খাতকই হইতেন না।

কিন্তু যখন বন্যা আসে ও ব্যাঙ্ক ফেল হইতে সুরু করে, তখন খরিদ্দারগণ বুঝিতে পারেন যে, যে সব ব্যাঙ্কারের মুখের বুলি ছিল "স্বাগতম্" তাঁহারা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্যই অত অধিক পরিমাণে বিনয়ী হইয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, তথাকথিত হৃদয়হীন ব্যাঙ্ক-পরিচালকই ঋণ-গ্রহীতার প্রকৃত বন্ধু। অর্থাৎ যে ব্যাঙ্ক-পরিচালক ঋণ-গ্রহীতাকে পুনঃ পুনঃ ঋণ করিতে সাহায্য না করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করেন, তিনিই ঋণ-গ্রহীতার হিতাকাঙ্ক্ষী।

অনেকে বলিবেন, এ কথা কারবারী লোকের পক্ষে জানা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ আমানতকারীর এ সব জানিয়া কি লাভ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তুমি ঋণগ্রহীতাই হও আর আমানতকারীই হও, তোমার জানা আবশ্যক ব্যাঙ্কার সাবধানী লোক কি না। ইহা জানিবার একটা উপায় হইতেছে আমানতকারীর প্রতি ব্যাঙ্কের ব্যবহার দেখা। ব্যাঙ্ক যদি তোমার আমানতি টাকা লইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখায়, তাহা হইলে নমস্কার করিয়া বিদায় লইবে। কিন্তু এই ব্যগ্রতার লক্ষণ কি? ইহার একটা লক্ষণ এই যে, ছোটখাট ব্যাঙ্ক বা নূতন ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে সামান্য টাকা কোনরূপ 'চার্জ' না করিয়া জমা রাখিয়া চেক-হিসাব খুলিতে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার চড়া দিয়া থাকে—বাজার-চলতি সুদের হার অপেক্ষা অধিক সুদ দিয়া থাকে। সাধারণ ব্যাঙ্ককে আমানত-কারীর জন্য অনেক কাজ অমনিই করিয়া দিতে হয় বলিয়া ও একসাথে নানা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয় বলিয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে নামমাত্র সুদ ছাড়া বেশী দেওয়া সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্ককে হিসাবপত্র রাখিবার জন্য সাধারণতঃ ১% হইতে ১½% খরচা করিতে হয়; ব্যাঙ্ক যদি উৎকৃষ্ট বণ্ড বা উৎকৃষ্ট সিকিউরিটি রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেয় তবে বেশী সুদ পাইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে যদি একটু চড়া সুদ আমানতকারীকে দিতে হয় তাহা হইলে আর ইক্‌-ছোড়ারের মুনাফা দিতে পারে না। আমানতি টাকার উপর কত সুদ ব্যাঙ্ক দিবে তাহা নির্ভর করে ব্যাঙ্ক কত সুদে টাকা ধার দিয়াছে তাহার উপর। আসল কথা এই যে, স্থানীয় অবস্থার দরুণ যে সুদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত তাহার বেশী দেওয়া ব্যাঙ্কের উচিত নয়।

এখানে প্রতিযোগিতার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু

প্রত্যেক বাণিজ্যিক কেন্দ্রেই ব্যাঙ্কসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 'ক্লিয়ারিং হাউস' কায়েম করে; এই ক্লিয়ারিং হাউস স্থির করিয়া দেয় যে, সদস্য ব্যাঙ্কগুলি কত পর্য্যন্ত সুখে নিঃশঙ্কচিত্তে দিতে পারে; সুতরাং সদস্যদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার কথাই উঠে না। তবে কথা এই যে, সব সময়ে সব ব্যাঙ্ক 'ক্লিয়ারিং হাউসের' সদস্য হয় না। সেরূপ ব্যাঙ্কে টাকা জমা না রাখাই ভাল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে আমানতকারীর প্রতি, দ্বিতীয়তঃ চেক্-হোল্ডারের প্রতি এবং তৃতীয়তঃ ঋণ-গ্রহীতার প্রতি। ব্যাঙ্কের চতুর্থ ও শেষ কর্ত্তব্য হইতেছে ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিগণের প্রতি। ব্যাঙ্ক-ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিগণ যদি মনে করেন যে, তাঁহারা রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিবেন ত সে বড় ভয়ানক কথা। নিজেদের স্বার্থকে বড় করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট যদি কটকা খেলায় মাতিয়া অল্প সময়েই বোটা মুনাফা মারিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিপদের কথা। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা সমগ্র সমাজের "ট্রাষ্টি"-বিশেষ। ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট স্থানীয় সকল লোককেই জানেন। তিনি লোকের সুখ-দুঃখের সন্ধান রাখেন। সুতরাং অনন্যকর্ম্মা প্রকৃত ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের স্থান সমাজের শীর্ষদেশে। তাই যে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করেন, কটকা খেলিতে চান, সেরূপ ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের হাতে টাকা জমা দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নহে।

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যার "আর্থিক উন্নতি"র ৩১৬-৩১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণ" নামক প্রবন্ধটি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, পি-এইচ-ডি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সার-সঙ্কলন। ইহা ভ্রমবশতঃ উল্লেখ করা হয় নাই। আঃ উঃ সম্পাদক।

৪৫ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীঅমূল্যধন পাল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩৩৮ | আর্থিক উন্নতি | ৬ষ্ঠ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

শত্রুক্ষয়ের বৃষ্টি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

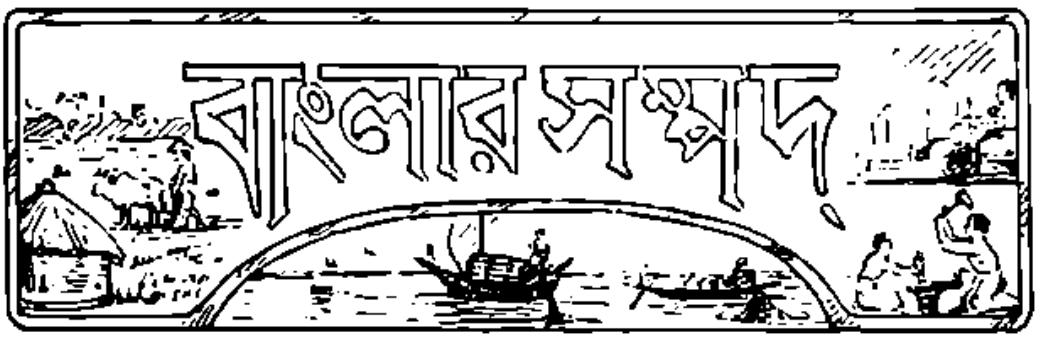

বাংলার গোজাতি

বঙ্গদেশের কৃষি-বিভাগ হইতে গৃহপালিত পশুগণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশে গাভীর সংখ্যা ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬০০ এবং ষাঁড়ের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৯। গাভীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজসাহী বিভাগে, তৎপরে ঢাকা বিভাগে। চট্টগ্রাম বিভাগে গাভীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। রাজসাহী বিভাগে ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৯টী বা প্রায় ২২ লক্ষ গাভী আছে। ঢাকা বিভাগে ২১ লক্ষ ৬ হাজার ৭৪৮টী গাভী আছে। চট্টগ্রাম বিভাগে মাত্র ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭ শত ১০টী গাভী আছে। বঙ্গদেশের জেলাগুলির মধ্যে ময়মনসিংহ জেলারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক গাভী আছে। এই জেলায় সর্ব্বসমেত ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১টী বা স্থূলতঃ ১০৫০ লক্ষ গাভী আছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ও দার্জ্জিলিং জেলায় গাভীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। ১৯২৬ সনের পশুগণনার পর ১৯৩০ সনে এই পশুগণনা হইয়াছে।

১৯২৬ সনের সহিত তুলনায় বঙ্গদেশের চারিটী জেলা ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। শুধু ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জেলায় গাভীর সংখ্যা সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর সমগ্র বঙ্গদেশে ১৯২৬ সনে যত গাভী ছিল ১৯৩০ সনে তদপেক্ষা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৪ শত ৮৯টী গাভী কম ছিল। গাভীর সংখ্যা-হ্রাস জাতির পক্ষে যে বিশেষ অমঙ্গলের কথা তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বঙ্গদেশের সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে রংপুর ও ঢাকায় সরকারী কার্য্যে গো-জাতির উন্নতি-বিধানের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, কেবল তাহাতেই বঙ্গদেশের গোজাতির বিশেষ উপকার সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। মোট কথা বাঙ্গালী জাতির ধ্বংসের পথ রোধ করিতে হইলে

বঙ্গদেশের গো-জাতির উন্নতি-সাধনের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা উচিত। আমরা বর্ত্তমানে দেশে তাদৃশ চেষ্টার কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না।

ষাঁড় ও গাভী ব্যতীত বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্যে ও গাড়ী টানাইবার জন্য যে সকল বলদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সংখ্যা ৮৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত ৬৪ এবং গো-বৎসাদির সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ২ হাজার ৯ শত ৩৯। সুতরাং বঙ্গদেশে সর্ব্বসুদ্ধ গোজাতির মোট সংখ্যা ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮ শত ৭২টী মাত্র।

গো-চর জমির অভাবে এইসকল পশু কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই ইহাদের সংখ্যার অনুপাতে কার্য্যশক্তি বিরাট অল্প। এই জন্য প্রায় ৮৪ লক্ষ বলদের দ্বারাও বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্য সুসম্পাদিত হয় না, বহু স্থলে মহিষের সাহায্যে চাষ করিতে হয়। কৃষি-বিভাগের গবেষণায় প্রমাণ হইয়াছে যে, কাঁচা ঘাসই গোজাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাইটামিনবহুল খাদ্য। দেশে গো-চর জমির পরিমাণ বাড়াইবার কোনও উপায় অবিলম্বে অবলম্বিত না হইলে বঙ্গদেশের গো-জাতির উন্নতি অসম্ভব। (ক্রমশঃ—চাকা)

পাট-চাষের শেষ পূর্ব্বাভাষ (১৯৩১)

জেলার নাম	যত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে তাহার আনুমানিক পরিমাণ		মোট যত পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আনুমানিক পরিমাণ (৪০০ পাউণ্ডের গাঁট হিসাবে)	
	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
		প্রেসিডেন্সী বিভাগ		
২৪-পরগণা	৬৯,০০০	৪৫,০০০	২১৮,০০০	১৪৪,০০০
নদীয়া	৫৬,০০০	৩০,০০০	১৩৩,০০০	৯৮,০০০
মুর্শিদাবাদ	৩৩,০০০	১৪,০০০	৬৯,০০০	৪৪,০০০
যশোহর	১০৩,০০০	৪৬,০০০	৩০৬,০০০	১৪৭,০০০
খুলনা	৩৫,০০০	২১,০০০	১১৯,০০০	৬৮,০০০
	২৯৬,০০০	১৫৮,০০০	৮৭৫,০০০	৪৯৯,০০০
		বর্দ্ধমান বিভাগ		
বর্দ্ধমান	৩,০০০	২,০০০	৯,০০০	
মেদিনীপুর	৮,০০০	৪,০০০	২৪,০০০	
হুগলী	২৯,০০০	২০,০০০	৮৯,০০০	৬৯,০০০
বাঁকুড়া	৭,০০০	৪,০০০	২১,০০০	১৩,০০০
	৪৭,০০০	৩০,০০০	১৪৩,০০০	১০১,০০০
		রাজসাহী বিভাগ		
রাজসাহী		৬৮,০০০		
দিনাজপুর		৪৯,০০০		
জলপাইগুড়ী		২৬,০০০		

দার্জিলিং	৪,০০০		১৩,০০০	৬৫,০০
রঙ্গপুর	৫২০,০০০		১,০৫৬,০০০	৬২৬,০০০
বগুড়া	১০৩,০০০		৩৩২,০০০	১৭০,০০০
পাবনা	১৫৫,০০০		৪৬৫,০০০	১১৮,০০০
মালদহ	৩৮,০০০		৫০,০০০	৫৫,০০০
কুচবিহার	৩১,০০০	১৬,০০০	৮০,০০০	১৭,০০০
	৮৪১,০০০	৪৪৪,৪০০	২৬০৬,০০০	১,৪১৬,৫০০

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা	৩৭৮,০০০	২১৫,০০০		
ময়মনসিংহ	৭৪৯,০০০	৩১৫,০০০		
ফরিদপুর	৩১৪,০০০	১৪৪,০০০		
বাখরগঞ্জ	৫২,০০০	৩০,০০০	১৯৪,০০০	
	১,৪৯৩,০০০	৮০৪,০০০	৫,১১৬,০০০	২,৪৫৮,০০০

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম	৩০০	৩০০	১,০০০	১২,০০
ত্রিপুরা	৩০৮,০০০	১৪০,০০০	১,০০৪,০০০	৪৩৮,০০
নোয়াখালী	৬৪,০০০	২৮,০৯০	২১৮,০০০	৮৩,০০০
ত্রিপুরা ষ্টেট	৩,০০০	১,০০০	৩,০০০	৩,০০০
	৩৭৪,৩০০	১৬৯,৩০০	১,২২৬,০০০	৫২৮,২০০
	৩,০৬২,৩০০	১,৬১৩,৭০০	৯,৯৬৬,০০০	৪,০০২,৭০০

বীরভূমের জল-প্রণালী

বীরভূম কৃষিপ্রধান স্থান। এখানকার শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। জেলায় কতকগুলি জল-প্রণালী হওয়ায় চাষের অধিকতর সুবিধা হইয়াছে। আরও অনেকগুলি জল-প্রণালী হইলে কৃষিকার্য্যের যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। এই স্থলে জল-প্রণালীগুলির নাম ও তথায় খরচ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) রামপুর হাটকী জল-প্রণালী। ইহা সমবায় সমিতির খরচে খনিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ৪,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হয়। প্রণালী তৈয়ারী করিতে মোট ৬,০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। এই প্রণালী ময়ূরাক্ষী নদীর শাখা কোপা নদী হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(২) বাহিরা জল-প্রণালী। ইহাও সমবায় সমিতির খরচে খনিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ৪০০ বিঘা জমিতে সেচ হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে ২,৫০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। এই প্রণালী বক্রেশ্বর নদী হইতে তৈয়ারি করা হইয়াছে।

(৩) বক্রেশ্বর জল-প্রণালী। ইহা গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক সেচ-সম্বন্ধীয় আইন-অনুসারে খনিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ভিন

হাজার বিঘা জমিতে সেচ হইবে। মোট ৪২১০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

(৪) কাশিয়া নালা জল-প্রণালী ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জমিদার ও প্রজাদের খরচে খনিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ৫,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইতেছে। ইহাতে মোট ৯,৬০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত তিনটি জল-প্রণালী অচিরেই খনিত হইবে।

(১) তালুকখালি জল-প্রণালী ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ আইন অনুসারে খনিত হইবে। ইহাদ্বারা ২,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবে। ইহাতে ব্যয় হইবে ৩০,০০০৲ টাকা।

(২) ঠাকুরপুরা জল-প্রণালীও উক্ত আইন অনুসারে খনিত হইবে। ইহাতে প্রায় ৬,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবে। ইহাতে ৪৪,৪৬৮৲ টাকা খরচ পড়িবে।

(৩) বাঘনীগ্রাম জল-প্রণালী ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ আইন অনুসারে খনিত হইবে। ইহাতে ৬,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবে। খরচ পড়িবে ৪৮,০০০৲ টাকা। ইহা ময়ূরাক্ষী নদী হইতে তৈয়ারি হইবে।

ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি জল-প্রণালী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এগুলি হইলে যে চাষের পক্ষে কত দিক্ দিয়া কত সুবিধা হইবে তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন।

প্রস্তাবিত জল-প্রণালীগুলির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) বাঁশলই নদীর প্রস্তাবিত জল-প্রণালী। ইহা তৈয়ারি করাইলে ৪৫,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবে।

(২) ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর পাড়ের প্রস্তাবিত জল-সেচন প্রণালীদ্বারা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রায় ২,০০,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবে।

(৩) কোপাই নদী হইতে প্রস্তাবিত জল-প্রণালীদ্বারা ৬০,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবে।

(৪) অজয় নদীর প্রস্তাবিত জল-প্রণালীদ্বারা ৮০,০০০ বিঘা জমিতে সেচ হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীগৌরীহর মিত্র
(বীরভূমবার্ত্তা—লিউড়ী)

বীরভূমের কয়েকটী গৃহ-শিল্প

বীরভূমের শিল্পের খ্যাতি এক সময়ে বহুদূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেইসকল শিল্পের অধিকাংশই এখন আর নাই; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। নিম্নে তাহাদেরই কয়েকটীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য প্রকাশ করিতেছি।

(১) বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় প্রায় চারি শত ঘর তাঁতি রেশম বয়ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। তাঁত চলে প্রায় ৮০০ খানি। পশ্চিমা স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য লম্বা সাড়ী, চাদর, পাগ্‌ড়ী, কোট এবং সাহেবী পোষাকের জন্য থান প্রভৃতি সাধারণতঃ এখানে বোনা হয়। এখানকার তাঁতিরা রংএর কাজ জানে না। মুর্শিদাবাদের গরদের তুলনায় এখানকার কাপড় নিকৃষ্ট। সূতা প্রায়ই মালদহ হইতে আসে। কখন কখন নিকটবর্ত্তী গাঙ্গাইল, অরপুর, ডাঙ্গাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতেও সূতা সংগৃহীত হয়। এই সকল গ্রামে তুঁতের চাষ হয় ও পলু পোকা পালিত হইয়া থাকে। এখানে রেশমের গুটা দ্বারাও সূতা কাটা হয়। বোলপুরের অন্তর্গত পলুটিয়া হইতে তিলপাড়া পর্য্যন্ত মুর নদীর উভয়কূলে যেসকল গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের লোকেরাও পলু পালন করে এবং রেশমের সূতা কাটে। ঐ সূতার কিছু অংশ তাহারা বিক্রয় করে ও বাকী সূতার স্থানীয় তাঁতিদের দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করাইয়া মুর্শিদাবাদে ও কলিকাতায় চালান দেয়।

প্রত্যেক বয়নকারী যদি আর তিন জন স্ত্রীলোক কি বালকবালিকার সহায়তা পায়, তবে প্রতিদিন দশ ঘণ্টা খাটিয়া দৈনিক আট হইতে দশ হাত রেশম বুনিতে পারে। ইহাতে তাহার দৈনিক আয় এক টাকা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। সাধারণতঃ, কোন তাঁতি পরিবার বাদে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে না। ইহারা মোটেই কঠিন পরিশ্রমী নয়; যে কোন সামান্য কারণেই ইহারা কাজ বন্ধ করিয়া অবকাশ ভোগ করে।

মহাজন এই সকল গ্রামের বাজারে বেশ গদি বিছাইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার উপার্জ্জন ত এই; কিন্তু মহাজনের

চুঁড়ি থালা মোটা। তাঁতি আজন্ম তাঁত বুনিতেছে, কিন্তু তাহার সূতা কিনিবার পুঁজি নাই; মহাজন সূতা যোগায়, তাঁতি শুধু বুনি পায়। তারপর মহাজন কাপড় সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে চালান দেয় এবং বেশ সুবিধামতে বিক্রী করে। রেশম-শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ শিল্পীর দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব। দারিদ্র্যবশতঃ তাহারা নিজেরা সূতা কিনিতে পারে না এবং তৈয়ারি মাল মহাজন করিয়া সুবিধাজনক স্থানে পাঠাইয়া অধিক দাম আদায় করিতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার অভাবে তাহারা এসকল বিষয়ে চিন্তা করে না।

(২) তাঁতিপাড়া, কহিন্দা এবং কালীপুর গ্রামে তসর বোনা হয়। তাঁতিপাড়ায় প্রায় পঁচিশত পরিবার তসর বোনে, আবার কখন কখনও কাপাসের সূতাও বোনে। কহিন্দা আর কালীপুর গ্রামে তাঁত চলে প্রায় চারিশত, তার অর্দ্ধেকে কেবল তসর তৈয়ারি হয়। রেশম তাঁতিদের অপেক্ষা তসর তাঁতিদের অবস্থা কিছু ভাল। সাঁওতালগণ জঙ্গলে তসর কীট পালন করে এবং তাহারাই ডুমকা, চাঁইবাসা, রামতারার বাজারে 'কোয়া' বিক্রয় করে।

(৩) একমাত্র তাঁতিপাড়া ও পুরিতে প্রায় দুইশত চাষার উত্তম বুট এবং জুতা তৈয়ারি করে। অনেক মাল কলিকাতাতেও চালান হয়। হুবরাজপুরের চাষারগণ জুতাও তৈয়ারি করে আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঢোল, তবলা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রও তৈয়ারি করে। নলহাটিতেও জুতার কারখানা আছে। সুরুল ট্যানারিতে সূচিদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

(৪) এই জেলার আর একটি বিশেষ শিল্প আলতা-নির্ম্মাণ। আলতা পরা আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা। ইলাম বাজার গ্রামে পূর্ব্বে প্রায় দুইশত ঘর লোক আলতার কল্যাণে প্রতিপালিত হইত। এখন মাত্র কয়েক ঘর লোক এই ব্যবসায় করে। পূর্ব্বাপেক্ষা আলতার চলন বাড়িয়াছে বলা যায় না। তবে 'তরল' আলতার মালিকদের দেখিয়া মনে হয় আলতার চাহিদা খুব প্রবল। অথচ 'প্রকৃত' আলতা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

(৫) গালা আর আলতা একই পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরিপুরের মুসলমানেরা বোলপুর বেলহুত, সুরুল, হাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আসিয়া কুলগাছে গালার চাষ করে। বৈশাখমাসে গাছ হইতে গালা সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত গালা হইতে ডাল ও কীটগুলি খোলসুদ্ধ বাছাই করিয়া গালা-অংশ শুকাইয়া কয়েকবার জলে ধৌত করে। ধৌত জল যত্নে রাখিয়া দেয়; এই জলই ওস্তাদের হাতে পড়িয়া আলতারূপ প্রাপ্ত হয়। তারপর গালা-অংশটাকে খলিয়াতে পুরিয়া আগুনের তাতে গলাইয়া চাপ দিয়া আসল গালা বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই গালাই আমরা আফিস-আদালতে ব্যবহার করি, আর খলিয়ার মধ্যে যে অপরিস্রুত অংশ থাকিয়া যায় উহা হইতে পুতুল, খেলনা, বালা, চুড়ি, ফুল, ফল জন্তু, 'কাগজ চাপ' প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গালার খেলনাগুলির রং অতি সুন্দর, চাহিদাও খুব আছে। কিন্তু কারিকরের ভাগ্যে দৈনিক ছয় আনা, আট আনার বেশী হয় না। কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুলের প্রতিযোগিতায় গালার পুতুল কাবু হইয়া পড়িতেছে।

(৬) হুবরাজপুর ও তাঁতিপাড়ায় অনেকগুলি সোণার কারবার আছে। ইহাদের মধ্যে ঢাকা হইতে যেসকল কারিগর আসিয়াছে তাহাদেরই গড়ন ভাল, সুতরাং অবস্থাও ভাল।

(৭) আমাদেরই চোখের সামনে দেশের চিনির কারবারটা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। এ জেলাতেও চিনির কারবার পূর্ব্বে বেশ বিস্তৃত ছিল; এখনও কুকুটিয়া নামক গ্রামে সেই পুরাতন প্রথায় খেজুররস দ্বারা সামান্য কিছু চিনি তৈরী হয়। এই পদ্ধতিতে গুড় হইতে মাত্র শতকরা পঁচিশ অংশ চিনি বাহির হয়; দাম পড়ে সের প্রতি বার আনা কি চৌদ্দ আনা। এমনি করিয়া এই কারবার আর কতদিন টিঁকিবে?

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ নাগ
(জনমত—এলপাইগুড়ী)

কন্টাই সোপ ওয়ার্কস

কাঁথি সহরের সেরপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ তেওয়ারী

ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গিরি নামক দুইজন উৎসাহী যুবক "কন্টাই সোপ ওয়ার্কস" নামে একটী সাবান তৈয়ারীর কারখানা খুলিয়া সম্প্রতি নানাপ্রকারের সাবান তৈয়ারী করিতেছেন। আমরা ইঁহাদের তৈয়ারী কয়েক প্রকারের কাপড় কাচা সাবান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সাবান-গুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছে। উহাতে সহজে ও অল্প খরচে কাপড় পরিষ্কার হয়। মূল্য বাজার-প্রচলিত সাবান অপেক্ষা কম। আমরা সকলকে এই সাবান ব্যবহারদ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইঁহাদের এই উদ্যম প্রশংসার্হ।

(নীহার—কাঁথি)

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুতের আলো

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে চট্টগ্রাম ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আলোর সুইচ জ্বালাইয়া দিয়া এই সহরের লোকের বহু দিনের অভাব দূরীভূত করিয়াছেন।

(ঢাকা-প্রকাশ)

ট্রেনের অসুবিধায় মাছের ব্যবসায় ক্ষতি

পূর্ব্বে আকসামের ১২নং ডাউন ট্রেনে আশুগঞ্জ ও আখাউড়া হইতে বিস্তর মাছ আনিয়া সিতাকুণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেক ষ্টেশনে নামাইয়া নিকটবর্ত্তী বাজারসমূহে অপরাহ্ণে বিক্রয় করা হইত। উক্ত ট্রেন পূর্ব্ব হইতে দেরীতে ছাড়ায় ঐ মাছের ব্যবসায় বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ঐ ট্রেন পূর্ব্বের সময়ে ছাড়ার জন্য পুনঃ পুনঃ বিস্তর আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে যে টাইম টেব্‌ল্ বলবৎ হইবে তাহাতে ১২নং ডাউন গাড়ী অপরাহ্ণ ২টা ৪০ মিনিটে সাকসার হইতে ছাড়িয়া প্রায় সন্ধ্যার দেরী পৌঁছিবে; তখন বাজারের সময় অতীত হইবে। ইহাতে মাছের ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। প্রতি মাসে রেলওয়ে কোম্পানীরও কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হইবে।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

পাটের বাজার

ঢাকা

গত সপ্তাহে পাটের বাজার স্থির ছিল, দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। চাহিদার অনুপাতে বর্ত্তমান আমদানি কম। পাটের তারতম্য অনুসারে দর ৩৸৵০ আনা হইতে ৪।০ আনার মধ্যে। এপর্য্যন্ত ১,৪০,০০০ মণ পাট আমদানি হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে হইয়াছিল ২,৩০,০০০ মণ।

নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে পাট চারি টাকা আট আনা হইতে পাঁচ টাকা আট আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। পাটের খুব চাহিদা আছে।

(সঞ্জীবনী—ঢাকা)

চাঁদপুর

চাঁদপুরেও পাটের বাজার কিছু চড়া হইয়াছে। তথায় এখন ৪৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে।

রঙ্গপুর

রঙ্গপুরের পাটের দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানীয় বাজারে গত কয়েকদিন যাবৎ ৪৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত পাটের মণ বিক্রয় হইতেছে।

(জনমত—জলপাইগুড়ী)

কলিকাতা

এই সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার বেশ তেজী ছিল। মিল কতক পরিমাণ মাল খরিদ করিয়াছে এবং বিদেশে রপ্তানিওয়ালাগণও বেশ দর দিয়া অনেক মাল খরিদ করিয়াছে। মফঃস্বলের আমদানি কম হইবার জন্যই দর চড়িতেছে। বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, দর আরও কিছু চড়িবে।

পাকা পাট উৎকৃষ্ট দর ৩১।০ আনা হয়। কটকা বাজারের দর ৩৸৵০ আনা।

১লা আগষ্ট হইতে ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই বৎসর মোট ৫৫০০০০ গাঁট পাট আমদানি হইয়াছে, তন্মধ্যে মিল ২৬০০০০ গাঁট খরিদ করিয়াছে। গত বৎসরে এই সময়ের মধ্যে মোট ৯৫৭০০০ গাঁট আমদানি হইয়াছিল, তন্মধ্যে মিল ৬০৮০০০ গাঁট খরিদ করিয়াছিল এবং ৩৪৯০০০ গাঁট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। প্রতি গাঁটে পাকী ৫/ মণ থাকে।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় ৩৯৩৪০০/ মণ পাট মজুত আছে। গত বৎসর এই সময়ে ২২৬০০০/ মণ মজুত ছিল।

(৪ঠা সেপ্টেম্বর)

ময়মনসিংহের বাজার দর

পাটের মূল্য যাহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বর্ত্তমানে আবার মণ-প্রতি চারি আনা কমিয়াছে। ভাল চাউল প্রতিমণ ৪৸০, চুন ৶০ কি ৶৬ সের, ঘৃত ১৸০ আনা সের, তৈল টাকায় ৵৩ সের। সব জিনিষের মূল্যই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে।

(ময়মনসিংহ-সমাচার)

বঙ্গে বিলাতী সূতার বস্ত্র আমদানি

সন	মূল্য
১৯২৬-২৭	২৭২৯১৬০০৮৲
১৯২৭-২৮	২৮১০৮০৬৩৪৲
১৯২৮-২৯	২৪১০২০০৭২৲
১৯২৯-৩০	২১৩৮৯২৫১৲
১৯৩০-৩১	৮৬৪০৭৭১১৲

আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শতকরা হিস্সা

বাঙ্গালার প্রতি ১০০ টাকার আমদানি ও রপ্তানি মালের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী মালের হিস্সা নিম্নরূপ :

আমদানি মাল

সূতার বস্ত্র	১৮·১৪
কলকব্জা	১৫·১৯
লোহ ও অমিশ্রিত লোহ	৪·১২
চিনি	৩·৯৩
তৈল	৩·৮৮
বস্ত্র ও সরঞ্জাম	৩·৭৯
মশলা	৩·৬৭
মোটরকার প্রভৃতি	২·৯৭
গাইল্লা ধাতুদ্রব্য	২·৯৬
খাদ্যদ্রব্য	২·৯৫
পশু, ডাল ও মরদা	২·৯৩
রাসায়নিক দ্রব্য	২·৮৭
যন্ত্র	২·৮৬
ডাকে পাঠান দ্রব্য	২·৭৯
কাগজ ও পিজবোর্ড	২·৭৭
নবেল	২·৭৬
রেলগাড়ী	২·৭৫
ঔষধ	২·৭৪
পশমী দ্রব্য	২·৭৩
তামাক	২·৭২
রবার	২·৭১

রপ্তানি মাল

সা	১৮·১৪
পাট	১৫·১৯
চামড়া (কাঁচা ও পাকা)	৪·১২
বীজ	৪·০৬
লাক্ষা	৩·৮২
ধাতু ও খনিজ দ্রব্য	৩·৩৬
পশু, ডাল ও মরদা	২·৯০
বাকি	১·৫১

রঙ্গপুরে কলেরার প্রকোপ

গত বৎসরের অজন্মা রঙ্গপুর পাথাটা থানার শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় উক্ত থানায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গত বৎসরের অভাবজনিত কষ্ট দূর হইতে না হইতে এ বৎসর আবার ভীষণ বন্যায় সমগ্র থানার ধান ও পাট প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আউশ ধান যাহা কিছু কৃষকের ঘরে

আসিয়াছিল তাহাও মাসাধিক কাল জলমগ্ন থাকায় পচিয়া গিয়া অখাদ্য হইয়াছে। পেটের জ্বালায় চাষীরা ঐ সকল পচা ধানের ভাত খাইয়া ও জলমগ্ন কূপের দূষিত জল পান করিয়া দলে দলে কলেরাতে আক্রান্ত হইতেছে। ইতিমধ্যেই একমাত্র শাখাটা থানার ২৫টা গ্রামে অর্দ্ধ শতাধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। প্রত্যহই নূতন নূতন লোক আক্রান্ত হইতেছে। পাচিয়ারপুর গ্রামের অবস্থা বড়ই ভীষণ ও সঙ্কটজনক হইয়াছে। এই এক গ্রামেই ১৮ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং এখনও ১০।১২ জন লোক রোগযন্ত্রণায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে।

কোন্ গ্রামে কত জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে তার তালিকা নিম্নরূপ :

গ্রাম	সংখ্যা
উল্লা দোনাতলা	১৫
তেলিয়ান	২৫
বোয়ারপাড়া	১১
পাচিয়ারপুর	২৫
নলিয়ারপাড়া	৭
কামালেরপাড়া	৬
হাপানিয়া	১২
গোয়েরপাড়া	১০
গাছাবাড়ী	১
জীবাই	৮
তারাকল	৮
শিমলতাইর	২
বাধিনারপাড়া	১৫
জটিয়ারপাড়া	৩
আদদিয়রপাড়া	৮
ধৈকরেরপাড়া	৩
বসরেরপাড়া	১৫
চাঁদপাড়া	৪
কাটুর	৩
কন্দপাড়া	৭
কাধারপাড়া	১০
বৈচড়া	২
বাজিতনগর	৬

শেখ সাহ মোহাম্মদ আলী (১১।১।৩১)
(রঙ্গপুর-দর্পণ)

রাস্তাঘাটের অবস্থা

বর্ত্তমান দুনিয়ার কোনও দেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখিয়া তথাকার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহাদের সুখসমৃদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ই বা কীদৃশ এবং আধুনিক সভ্যতার কোন স্তরেই বা তাহারা অবস্থিত, সে সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। চরিক্ষ, প্লাবন, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নৈমিত্তিক উৎপাতের বিবরণে বাঙ্গালা দেশের পত্রিকাগুলি কখনও কখনও প্লাবিত হয় বটে ; কিন্তু রাস্তাঘাট-সংক্রান্ত অভাব-অসুবিধা ম্যালেরিয়া ব্যাধির ন্যায় বাঙ্গালার নিত্যকার উৎপাত। অথচ ইহার প্রতীকার অথবা প্রতিষেধ দুর্ভিক্ষ-প্লাবন-কলেরা-বসন্তাদির ন্যায় বহুব্যয়সাধ্য কিংবা সরকারের সহায়তাসাপেক্ষও নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে দেশবাসীরই হাতে। কিন্তু বাঙ্গালার যে-কোন অঞ্চল হইতে বৎসরের যে-কোন সময়ে প্রকাশিত যে-কোন একখানি সাপ্তাহিক কি দৈনিক পত্রিকা খুলিলেই রাস্তাঘাট-সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগের কথা চক্ষে পড়িবার সম্ভাবনা শতে পনর আনা। এস্থানে আর একটী কথা বলিয়া লইলেও বোধ হয় ভুল হইবে না যে, প্রকৃত অভাব-অসুবিধার এক পাই অংশও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। নিম্নে বিভিন্ন জিলার এইরূপ কয়েকটী অভিযোগ তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে :

(ক) রাস্তা

নোয়াখালী

কেন্দী টাউনের মধ্য দিয়া ছাগলনিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রাস্তার যে অংশ ট্রাঙ্ক রোড্ ও রেলওয়ে ষ্টেশন রোড্ পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা দিয়া চব্বিশ ঘণ্টা অবিশ্রান্তভাবে লোকজন, মোটর গাড়ী ও গরুর গাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে। ঐ রাস্তার কিয়দংশ কেন্দী কোর্ট কম্পাউণ্ডের মধ্যে পড়িলেও সম্পূর্ণ রাস্তাটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের শাসন ও রক্ষণের অধীন।

বর্ত্তমান সময়ে রাস্তায় বহু গর্ত্ত হইয়া তাহা কর্দ্দমপূর্ণ হওয়ায় ঐ রাস্তা দিয়া গাড়ী চলা দূরের কথা, মানুষ চলাও অসম্ভব হইয়াছে। ইহা কাছারী, কলেজ, স্কুল, রেলওয়ে ষ্টেশন ও পোষ্ট অফিসে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। রাস্তার দুর্গতিতে সহরবাসীর যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা চক্ষে না দেখিলে অনুভব করা অসম্ভব। সহরে রাত্রে আলোর বন্দোবস্ত নাই। ষ্টেশন হইতে রাত্রে বাজিগণ বাজারে বা সহরের যে কোন অংশে যাইতে যে কি বিপদেই পতিত হয় তাহা ভুক্তভোগীরাই শুধু বুঝিতে পারে। রাস্তার কণ্ট্রাক্টার অনেকদের লোক দ্বারা রাস্তার স্থানে স্থানে খোয়া ও মাটী দিয়া মেরামতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে, টাকা নাই বলিয়া ইঞ্জিনিয়ার বাবুর আদেশে এই প্রকার করা হইতেছে। করভার-প্রপীড়িত প্রজা-সাধারণ হইতে আদায় করা রোড সেসের টাকা রাস্তার কার্য্যে ব্যয় করার জন্য নাই বলিলেই কর্ম্মকর্ত্তাদের দায়িত্ব শেষ হয় কি? মোটর গাড়ীর অজস্র ছড়াছড়ি, চারিদিকে হরদম দৌড়াদৌড়ি—তাড়া খরচের বিরতি নাই, অথচ রাস্তার কার্য্যে টাকা থাকে না! ইহার তাৎপর্য্য ও গুঢ় রহস্যটা কর্ম্ম-কর্ত্তারা বলিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি? আমরা আশা করি কেন্দ্রী টাউনের একমাত্র রাস্তাটির মেরামত-কার্য্য যাহাতে শীঘ্রই সম্পন্ন হয় কর্ত্তারা তাহার বন্দোবস্ত করিতে মনো-নিবেশ করিবেন।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

ফরিদপুর

এ বৎসর ফরিদপুর সহরের প্রায় সমুদয় রাস্তাই বর্ষার জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। প্রবল স্রোতে কয়েকটি স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়াও গিয়াছিল। সে জন্য অনেকদিন লোককে অতিকষ্টে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। কারণ ভগ্ন স্থানগুলির উপর বাঁশের সেতু নির্ম্মাণে অত্যন্ত বিলম্ব করা হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত রাস্তার জল নামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও লোকের চলাচলের অসুবিধা দূর হয় নাই। স্রোতে পাকা রাস্তাগুলির "রাবিশ" ধুইয়া যাওয়াতে অনেক স্থানে এরূপ "খোয়া" উঠিয়া রহিয়াছে যে, প্রতি পদক্ষেপে পদতল বিদ্ধ হইয়া যাইতে চায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই খালি পায়ে চলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও নগ্ন পদেই স্কুলে যাতায়াত করে। তীক্ষ্ণাগ্র ইষ্টকখণ্ডসমূহ রাস্তার সর্ব্বত্র চলাচল করা কিরূপ কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। রাস্তাগুলির উপর দিয়া দুই এক বার রোলার টানাইয়া দিলেই কিন্তু সাধারণের এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। কার্য্যটি এমন কিছু শক্ত নহে বা অত্যধিক ব্যয়সাধ্যও নহে। অথচ স্থানীয় জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর এ দিকে লক্ষ্য নাই। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

(সঞ্জর—ফরিদপুর)

বরিশাল

(১) এবৎসর বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তাগুলি রীতিমত মেরামত না হওয়ায় বহুস্থানে বর্ষার জল জমাট হইয়া চলাচলের অসুবিধা হইয়াছে। কালীবাবুর নূতন বাজারের রাস্তায় বহু লোক ও গাড়ীঘোড়া গমনাগমন করে, বিশেষতঃ, বাজারের ও কলেজের লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে। উক্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে বর্ষার জল জমিয়া কাদা হইয়া থাকে, মধ্যস্থান একটু শুকনা থাকে, ঐস্থানটুকু দিয়া লোকেরা যাতায়াত করে, যখন সাইকেল কিংবা গাড়ী আসে, তখন পথিকের কাদায় পড়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। অনেকের গায়ের জামা-কাপড়ে কাদা লাগিয়া থাকে। পুরাতন বাজারের রাস্তার কতক স্থানের অবস্থাও ঐরূপ। আমরা আশাকরি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এই সকল রাস্তা প্রশস্ত করিয়া ভালরূপ মেরামত করিয়া দিয়া লোকের অসুবিধা বিদূরিত করিবেন।

(কালীপুরনিবাসী—বরিশাল)

(২) বাটাজোড় হইতে বামুরা পর্য্যন্ত জিলাবোর্ডের যে রাস্তাটী আছে, শোলকের পর হইতে তাহার অবস্থা অতীব সাংঘাতিক। লক্ষণকাঠী হইতে শোলকের মধ্যের রাস্তা একটা জায়গায় বন্যার সময় জল নিকাশের জন্য কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে আজপর্য্যন্ত এমন কি একটী চাড় দেওয়ার বন্দোবস্তও হয় নাই। শোলকের অনেক

ছোট ছোট ছেলে এখনকার স্কুলে আসে। তাহাদের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই জলপ্লাবনের পূর্ব্ব হইতেই সোজার কাছাকাছি ও বামুরা পর্য্যন্ত রাস্তার অনেক জায়গাই পার্শ্বস্থ খালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোন কোন জায়গায় অতি অপ্রশস্ত একটু ধ্বংসাবশেষ যাহা ছিল তাহা দিয়াই জনসাধারণ অতি কষ্টে যাতায়াত করিত। কিন্তু এই প্লাবনে সেটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সুতরাং লোকের পক্ষে যাতায়াত করা যে কতদূর অসম্ভব ও বিপদজনক হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। এ দিকে আমরা কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(বরিশাল—বরিশাল)

ময়মনসিংহ

জামালপুর সহরের রাস্তা-ঘাটগুলি অত্যন্ত কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর এই সব রাস্তাঘাট-গুলির অবস্থা এতদূর শোচনীয় ও কদর্য্য আকার ধারণ করে যে, ইহা দিয়া চলাচল করা একরকম অসম্ভব। যে সহরে মিউনিসিপ্যালিটীর অস্তিত্ব বজায় আছে, সেখানকার রাস্তা যে এতদূর কদর্য্য হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণায় আসিতে ছিল। তারপর জামালপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যাইবার রাস্তাগুলি ততোধিক বিশ্রী। বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কদর্য্য রাস্তা-ঘাট থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল না। এই বিষয়ে আমরা জামালপুর মিউনিসি-প্যালিটীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(শান্তিবার্ত্তা—ময়মনসিংহ)

ঢাকা

ঢাকার রজনী চৌধুরীর বাগানে বহু ভদ্রলোকের বাসস্থান। নূতন বাড়ী প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টেক্সের বিল বাড়িয়া হালির হয়; কিন্তু রাস্তার অভাবে উক্ত পল্লীর অধিবাসীদিগকে যে কি প্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা কল্পনাতীত। রাস্তাটি মিউনিসিপ্যালিটীকে দেওয়া সত্ত্বেও উহার উন্নতির সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। রাস্তা সর্ব্বদাই জল ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ থাকে। কাজেই জুতা পায়ে দিয়া দূরে থাকুক, জুতা ছাড়িয়াও হাঁটুর উপরে কাপড় না তুলিয়া উক্ত রাস্তা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত ত একপ্রকার নাই বলিলেই হয়; মাত্র একটি আলো আছে, তাহাও মধ্যে মধ্যে জ্বলে না। কাহারও বেয়ারাম হইলে ডাক্তার পাওয়া যায় না; কারণ জল ও কাদার জন্য ডাক্তার আসিতে রাজি হয় না। পল্লীর এই দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য মিউনিসি-প্যালিটীর কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। অভিযোগের প্রতিকার অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়।

খুলনা

এ অঞ্চলের রাস্তাগুলির দুরবস্থা ক্রমেই চরমে উঠিতেছে। পুনঃ পুনঃ আবেদন করা সত্ত্বেও ইউনিয়ন বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের দৃষ্টি এদিকে মোটেই পড়িতেছে না। ধলাগ্রাম খেয়াঘাট হইতে একটী রাস্তা ভৈরবের তীর দিয়া সিদ্ধিপাশা ও তথা হইতে সোনাতলায় গিয়াছে। ধরিতে গেলে, এই রাস্তাটী এ অঞ্চলের একটী প্রধান রাস্তা। বহুলোককে এই রাস্তা দিয়া সিদ্ধিপাশা স্কুলে, আমতলা বাজারে, সোনাতলা বাজারে এবং সিদ্ধিপাশা হইতে ফুলতলা বাজারে যাইতে হয়। একদল ভৈরবের জলের তোড়ে ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য এই রাস্তার কিয়দংশ নদীর মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই বহুলোককে বর্ত্তমানে অন্য রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বা নৌকা করিয়া যাইতে হয়। এতদ্ব্যতীত এই রাস্তারই অনেক অংশ, বিশেষতঃ যে অংশটী বুচীপাড়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে সেই অংশটী, জঙ্গল ইত্যাদির দ্বারা এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, সকল পথচারীকেই এই স্থানে দুর্গন্ধে ও অপরিচ্ছন্নতায় অস্থির হইতে হয়। আমরা লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। (প্রবাসী—কলিকাতা)

মুর্শিদাবাদ

২০শে ভাদ্র তারিখের বান্ধবে বাদসাহী সড়কের (বড় রাস্তার) দুরবস্থার কথা বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় কয়েক

দিনের রৌদ্রে পথঘাট শুষ্ক হইলেও উহা মেরামত করা হয় নাই। উল্লিখিত ভগ্ন স্থানগুলি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। তাহাতে দৈবাৎ গরুবাছুর বা মনুষ্যাদি পতিত হইলে নিশ্চয় তাহাদের হস্তপদাদি ভগ্ন হইবে। নগরে বাহাদুরী সড়কের অবস্থা এইরূপ। খড়গ্রাম থানার সন্নিকটবর্ত্তী হাটপাড়ার সেতুর অবস্থাও বিশেষ শোচনীয় হইয়াছে। প্রথমে সেতুতে উঠিতেই এক ভয়ঙ্কর গর্ত্ত। তাহাতে গরু বা মনুষ্যাদি পতিত হইলে তাহাদের হস্তপদাদি তো ভগ্ন হইবেই, তাহা ছাড়া কাঠ, মাটী ও ইষ্টকের ঘর্ষণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষতও হইবে। সেতুর উপরে দুই পার্শ্বে যে লৌহের বেড়া বা রেলিং আছে, তাহার অবস্থা আরও শোচনীয়। উভয় দিকের রেলিংএ যে সকল লৌহের খুঁটি ছিল তাহার মধ্যে কয়েকটী দেখিতে পাওয়া যায় না। সেতুর উপরে যে সকল কাঠের তক্তা পাড়া আছে তাহার মধ্যে কোন কোনটী একেবারেই আঁটা নাই। উল্লিখিত রাস্তা ও সেতুর দোষে কেহ যদি আহত হয় তাহা হইলে তাহার জন্য কে দায়ী হইবে? যাহা হউক, রাস্তা ও সেতুর যাহাতে আশু সংস্কার হয় তজ্জন্য জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(কাশীবান্ধব—কান্দী)

হুগলী

হুগলী জেলা বোর্ডের অন্তর্গত জনাই-নসিবপুর রোডের কাপাসহাঁড়িয়া শাখা রাস্তাটী জনাই হইতে বেগমপুর, কাপাসহাঁড়িয়া ও সাহানা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া নবগ্রাম চাঁপুর রোডে বড়ার বাজারের নিকট মিলিত হইয়াছে। উল্লিখিত রাস্তাটী এ অঞ্চলের মধ্যে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় রাস্তা। উক্ত রাস্তা একদিকে শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি প্রভৃতি বড় বড় জায়গায় এবং অন্য দিকে জনাই, চণ্ডীতলা প্রভৃতি স্থানে যাইবার একমাত্র রাস্তা। সেওড়াফুলি একটী বিশিষ্ট ব্যবসায়-কেন্দ্র। এই অঞ্চলের লোককে উক্ত রাস্তা দিয়া উল্লিখিত জায়গাগুলিতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতে হয়। এই সমস্ত জায়গা পান-চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রত্যহ পানের গাড়ী এবং আলু, পাট ও পান-চাষের উপযোগী মালমশলা-বোঝাই বহু গরুর গাড়ী এই রাস্তায় যাতায়াত করে। এতদ্ভিন্ন সাহানা, কাপাসহাঁড়িয়া, নিজানপুর প্রভৃতি গ্রামের লোককে এই রাস্তা দিয়া বড়ার বাজার, পোষ্ট আফিস ও স্কুলে যাইতে হয়। এই রাস্তাটীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, লোক-চলাচল, এমন কি গরুর গাড়ীর যাতায়াতও একরূপ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। রাস্তার দুরবস্থার জন্য ছোট ছোট বালকেরা স্কুলে যাইতে পারিতেছে না। রাস্তার অনেক জায়গায় পাড়নের ইট পর্য্যন্ত নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয় জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। গ্রামবাসিগণ উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট গত কয়েক বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি অনেক আবেদন করিয়াছে; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গত ৩১শে আগষ্ট বঙ্গবাণীতে দেখিলাম —আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বেনারস রোড সংস্কারের জন্য হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করাইয়াছেন। সুতরাং এখন আশা করি, অবিলম্বে এই রাস্তাটীর সংস্কার হইবে।

(বঙ্গবাণী—কলিকাতা)

মেদিনীপুর

কাঁথি কেনেলের পূর্ব্ব পার্শ্বে পূর্ত্ত-বিভাগের সেরপুর কুলন পুলটির কতকগুলি তক্তা না থাকায় এখন ঐ পুলের উপর দিয়া সাধারণের যাতায়াত করা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ পুল দিয়া প্রতিনিয়ত বহু লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কেনেল দিয়া যে সকল নৌকা যাতায়াত করে তাহার দাঁড়ীদিগকে ঐ পথে গুণ টানিয়া যাতায়াত করিতে হয়। রাত্রে ঐ পথে গুণ টানিয়া যাতায়াত করিবার কালে ঐ সব দাঁড়ীদের ঐ ভগ্ন স্থানে পড়িয়া বিশেষ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় শীঘ্রই যাহাতে পুলটির সংস্কার হইতে পারে, আশা করি, স্থানীয় পূর্ত্ত-বিভাগের কর্তৃপক্ষ উহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের এই সঙ্কট দূর করিবেন।

(নীহার—কাঁথি)

(খ) খেয়াঘাট

(১) বদরগঞ্জ (রঙ্গপুর) হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ কুণ্ডু লিখিয়াছেন, "বদরগঞ্জ খেয়াঘাটে পারার্থী জনসাধারণের প্রতি যে জুলুম চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। আশা করি জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ ইহার আশু প্রতীকার করিয়া জনসাধারণের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইবেন।

বদরগঞ্জ এই জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে থানা, পোষ্ট অফিস, জমিদারের কাছারী, রেজেষ্ট্রী অফিস, ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্ট অফিস প্রভৃতি অফিসের অভাব নাই। এখানে বৎসরে প্রায় ৪।৫ লাখ মণ পাট কেনাবেচা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ধান, চাউল, গুড়, সরিষা, কলাই প্রভৃতিও প্রভূতপরিমাণে আমদানি রপ্তানি হয়। প্রধানতঃ তিনটী পথে এই সব মালপত্র আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। একটী রঙ্গপুর হইতে বদরগঞ্জ এবং দ্বিতীয়টী তারাগঞ্জ হইতে বদরগঞ্জ ও তৃতীয়টী পদমগঞ্জ হইতে বদরগঞ্জ। প্রথম ও দ্বিতীয় পথেই বদরগঞ্জ ঘাট ও তৃতীয় পথে চাঁদামারী ঘাট পড়ে এবং এই দুইটী ঘাটই বর্ত্তমানে একজনের অধীন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ঘাটে মাল-বোঝাই গাড়ী প্রতি যাতায়াতে ৵৫ আনা লওয়া হইত। তৎপর সেই রেট বাড়াইয়া ।০ চারি আনা, পরে ।১০ আনা এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে ৸৵০ আনা করা হয়। তখন ইহা লইয়া বেশ একটু আলোচনা হয় এবং এখানকার স্থানীয় মহাজনবৃন্দের চেষ্টা ও অনুরোধ এবং জনসাধারণের আপত্তির ফলে ৵৫ হারে মাশুল আদায় করা হইতে থাকে। সেই হইতে এতাবৎ এই হারই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ বৎসর পুনরায় কাহারও কাহারও নিকট ৸৵০, ৸৵০ করিয়া আদায় করা হইতেছে।

লোক পারাপারের রেট পূর্ব্ব হইতে ৵১০ হিসাবেই ছিল এবং মাঝে মাঝে কখনও বা ৵০ আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু এবার সেই মাত্রা আরও কিছু বাড়াইয়া লোক প্রতি ৵১০—৵০ হিসাবে আদায় করা হইয়াছে; কেন না লোকের এবার বড়ই সুবৎসর! যদি বা কখন কোন হতভাগা প্রতিবাদ করিতে গিয়াছে, তখনই সে নানারূপ কুবাক্যদ্বারা ও অন্যান্য নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে।

এখানে প্রত্যহ একটী বাজার বসে এবং তাহাতে ২ ক্রোশ ২।০ ক্রোশ দূর হইতে দরিদ্র গৃহস্থেরা দুধ বেচিতে আসে। এই সব বিক্রেতারা এই দুর্দ্দিনে দুধ বেচিয়া সাংসারিক অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করে। এমন কি কেহ কেহ দুধ বেচিয়া চাল কিনিয়া খাইয়া প্রাণে বাঁচে। এ বৎসর সব জিনিষের বাজার মন্দা হওয়ায় দুধের দরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর যে পাতিল ।০ আনায় বিক্রয় হইত এ বৎসর তাহা ৵১০, ৵০ আনায় বিক্রয় হয়। প্রতি সের ৵০, ৵১০ স্থলে ৵১০, ৵১৫ পয়সায় বিক্রয় হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, বাজারে দুধের আমদানি নাই, দুধের বাজার নদীর অপর পারে বসিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, খেয়াঘাটের অত্যাচারই ইহার একমাত্র কারণ। গৃহস্থ এক পাতিল দুধ বেচিয়া হয়ত ৵১০, ৵০ পায়, তাহার সবই যদি খেয়ায় দিতে শেষ হইয়া যায়, তবে সে কি লইয়া গৃহে ফিরিবে? ঘাটের ঘরের সামনে একখানা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাইনবোর্ড টাঙ্গান আছে। যাহারা ঘাটে পারাপার হইয়াছেন, তাঁহারাই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সেই সাইন বোর্ডখানার উপর অংশে "—— শ্রেণীর খেয়াঘাট" লেখা আছে। কিন্তু কোন শ্রেণীর খেয়াঘাট তাহার উল্লেখ নাই। এতাবৎ যে হারে মাশুল আদায় করা হইয়াছে সে রেট ত প্রথম শ্রেণীর পরই, বরং দ্বিতীয় শ্রেণীরও বেশী আদায় করা হইয়াছে ও হইতেছে। (রঙ্গপুরদর্পণ—রঙ্গপুর)

(২) নোয়াখালী জিলা বোর্ডের বিভিন্ন স্থানের খেয়াঘাট ও খোঁয়াড়ের নীলামলব্ধ আয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। ইহা ব্যতীত খেয়াযাত্রী চরের চাষী প্রজাগণ সেস্ বাবদও বোর্ডকে বহু টাকা দিয়া থাকে। কিন্তু বোর্ডের কর্তৃপক্ষ এই চাষী প্রজাগণের সুখ-সুবিধার জন্য যৎসামান্য অর্থব্যয় করিতেও কেন যে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাহা আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারি না। বোর্ডের সভ্যগণ তো

এই মূক প্রজা-সাধারণেরই প্রতিনিধি। সুতরাং নিজেদের সুখ-সুবিধার দিকে একটু কম দৃষ্টিপাত করিয়াও যদি তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত মনিবদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একটু বেশী দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলেই ভাল হয়।

এই জিলার বোর্ডের প্রায় প্রতি থানায় কম পক্ষেও দুইটী করিয়া রাজপ্রাসাদতুল্য বাংলা আছে এবং এই বাংলাগুলি কোন বন্দর বা বিশিষ্ট লোকালয়ের সন্নিকটেই অবস্থিত। এইসকল বাংলাতে বোর্ডের সভ্যগণ অথবা সরকারী উচ্চ রাজকর্মচারিগণ বিনা মাশুলে থাকিতে অধিকারী। এইগুলির মেরামত ও রক্ষার খরচ বাবদ বোর্ডকে প্রতি বৎসর বহু টাকা ব্যয় করিতে হয়। জনসাধারণের দেয়ের টাকা হইতেই যে, এই টাকা ব্যয়িত হয় তাহা বলাই বাহুল্য। লোকালয়ের সন্নিকটে বড় কর্তাদের সুখ-সুবিধার জন্য যদি বোর্ড প্রতি বৎসর এতগুলি করিয়া টাকা অনর্থক ব্যয় করিতে পারে, তাহা হইলে চর অঞ্চলে খেয়াযাত্রী প্রজা-সাধারণের জন্য কেন সামান্য এক একখানা বিশ্রামাগারও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে না তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

খেয়ার নৌকার মাঝিগণ যাত্রিগণকে এক প্রহর কি দেড় প্রহর রাত্রিতে নৌকা হইতে চরে নামাইয়া দেয়। চর অঞ্চল, চর ঝুমিলি, চর ল্যাংটা, চর কচ্ছপিয়া, চর মাটিন ও চর আহাজমারা প্রভৃতি স্থানে রাত্রি না থাকায় লোককে শস্য-ক্ষেত্রের 'আইল' ধরিয়া গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিতে হয়। অন্ধকার রাত্রিতে 'আইল' ধরিয়া যাত্রা করিলে পথিকগণ পথহারা হইয়া বিপথে চলিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং বর্ষায় ভিজিয়া এবং শীতের দিনে শীতে অবসন্ন হইয়াও তাহাদিগকে নদীর তীরে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। শীতবস্ত্রে এবং ওয়াটারপ্রুফে দেহাবৃত মোটরবিহারী ভদ্রলোকগণ যে নদীতীরে অবস্থিত কটিবস্ত্রপরিহিত দরিদ্র প্রজাগণের এইসব দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করেন তাহা তাঁহাদের কার্যকলাপ দেখিলে মনে হয় না। যদি ইহাদের দুঃখকষ্টের সামান্য অনুভূতিও তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে চার পাঁচ শত টাকা ব্যয়ে এক একখানা বাংলা তুলিয়া দিতেও তাঁহারা এত কার্পণ্য করিতেন কিনা সন্দেহ। প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ যদি তাহাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেন তাহা হইলে তাহাদের দুঃখ জানাবার আর স্থান কোথায়? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা অচিরে খেয়াযাত্রীর সুখ-সুবিধার প্রতি মনোযোগী হইয়া প্রকৃত প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন। আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত যাত্রি-সমিতির দৃষ্টিও এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। খেয়ার নৌকার অন্যান্য অসুবিধার কথা স্থানাভাবে আলোচনা করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ আলোচনার ইচ্ছা রহিল। (দেশের বাণী—নোয়াখালী)

ভারতে নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী (১৯৩০-৩১)

এপ্রিল ১৯৩০ হইতে মার্চ্চ ১৯৩১ পর্য্যন্ত যে বৎসর চলিয়াছে, সেই বৎসরের মধ্যে ভারতে মোট ৭৩৪টী কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হয় এবং এই কোম্পানীগুলির মিলিত মূলধনের পরিমাণ ২২ কোটী টাকা; ইহার পূর্ব্ব বৎসর মোট ৮৪২টী কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হয় ও মিলিত মূলধন ছিল ৬২ কোটী টাকা। আলোচ্য বৎসরের রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীগুলির মধ্যে বাংলা দেশের "ইণ্ডিয়ান্ এগ্রিকাল্চার অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল্ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন"ই সর্ব্বাপেক্ষা কোম্পানী। ইহার মূলধন ১ কোটী টাকা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশে কি হারে কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইতেছে তাহা নীচে দেখান হইল :—

	রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানী		মিলিত মূলধন		কোম্পানী প্রতি
	সংখ্যা	সূচীসংখ্যা (১০০ = যুদ্ধপূর্ব্ব)	পরিমাণ (টাকা)	সূচীসংখ্যা (১০০ = যুদ্ধপূর্ব্ব)	মূলধন (টাকা)
১৯১৩-১৪ (যুদ্ধপূর্ব্ব	৩৫৮	১০০	৬৬,৯১,৫০,০০০		১৮,৭৯,০০০
১৯২৪-২৫	৪১৬	১১৫	২১,২৩,২৫,০০০		৫,০৯,০০০
১৯২৫-২৬	৪৭২	১৩০	৩০,০৬,০৮,০০০		৬,৩৭,০০০
১৯২৬-২৭	৫২৯	১৪৯	১২,৩৯,০৯,০০০		৩,৬৭,০০০
১৯২৭-২৮	৬২৬	১৭৬	১৭,৫৭,০৪,০০০		২,৮১,০০০
১৯২৮-২৯	৭২৫	২০৪	২৭,৩৭,৮১,০০০		৩,৭৮,০০০
১৯২৯-৩০	৮৪২	২৩৭	৬১,৬৬,২৭,০০০		৭,৩২,০০০
১৯৩০-৩১	৭৩৪	২০৬	২১,৭৬,০৯,০০০		২,৯৬,০০০

১৯২৯-৩০ সনের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩০-৩১ সনে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীর সংখ্যা শতকরা ১৩টী কমিয়াছে। রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীগুলির শ্রেণী-বিভাগ নিম্নে দেখানো হইল :—

কোম্পানীর শ্রেণী-বিভাগ	১৯২৯-৩০		১৯৩০-৩১	
	সংখ্যা	মূলধন (হাজার টাকা)	সংখ্যা	মূলধন (হাজার টাকা)
ব্যাঙ্কিং ও ঋণ—				
১। ব্যাঙ্কিং				
২। ঋণ				
৩। লগ্নি ও ট্রাষ্ট				
৪। নিধি				
বীমা—				
১। জীবন, অগ্নি, নৌ বীমা				
২। প্রভিডেন্ট বীমা				
৩। অন্যান্য				
যানবাহন—				
১। সমুদ্র পথ				
২। রেল ও ট্রাম				
৩। ডক্, বন্দর, গুদাম, ইত্যাদি		২৩৮,৮১		
৪। অন্যান্য				
ব্যবসা ও মাল্যুফ্যাক্চারিং—				
১। পরস্পর ব্যবসায় সঙ্ঘ				
২। মুদ্রণ, পুস্তক-প্রকাশ, ইত্যাদি				
৩। রাসায়নিক ও আনুষঙ্গিক পণ্য				
৪। লৌহ, ষ্টীল ও জাহাজ তৈরী				
৫। ইঞ্জিনিয়ারিং				
৬। টানারি ও চর্ম-ব্যবসায়				
৭। ক্যাম্বিস্ ও রবার-ব্যবসায়				
৮। পাবলিক্ সার্ভিস্ কোম্পানী				
৯। ক্লে, সিমেন্ট, ইত্যাদি				
১০। কাচ				
১১। বয়ন ইত্যাদি				
১২। এজেন্সী				
১৩। চা বাগান ইত্যাদি				
১৪। তামাক				
১৫। সাবান, বাতি, ইত্যাদি				
১৬। পিতল ও তামার বাসন				
১৭। অ্যালুমিনিয়ম বাসন				
১৮। দিয়াশলাই				
১৯। অন্যান্য				

কল ও প্রেস—				
১। তূলার কল				
২। জিনিং, প্রেসিং, ইত্যাদি				
৩। পাট-কল				
৪। জুট-প্রেস				
৫। পশম, রেশম, ইত্যাদির কল				
৬। কাগজের কল				
৭। চালের কল				
৮। ময়দার কল				
৯। কয়াঙ-কল				
১০। তেল-কল				
১১। অন্যান্য কল ও প্রেস				
চা-বাগান ইত্যাদি—				
১। চা				
২। কফি ও সিন্‌কোনা	৩৫			
৩। রবার				
৪। অন্যান্য				
খনি—				
১। কয়লা				
২। সোনা				
৩। লোহা				
৪। মার্বল				
৫। ম্যাঙ্গানিজ				
৬। অভ্র				
৭। পেট্রোলিয়াম্				
৮। অন্যান্য				
জমিজমা—	৮		১৯	৭৬,০৪
চোলাইখানা	—	—	—	—
চিনির কারখানা	—	—	৪	৩৪,০০
হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৩৩	১,১৩,৭১	২৬	৭৫,০৬
অন্যান্য কোম্পানী	১৩	২,৪১,৫২	১৪	৮,৬০
	৮৪২	৬১,৬৬,২৭	৭৩৪	২১,৭৬,০৯

উপরের হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীর কোম্পানীর মূলধন পূর্ব্ব বর্ষের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে :—

(১)	লম্বি ও ট্রাষ্ট	+১২ লাখ টাকা
(২)	জমিজমা	+৬৩ লাখ টাকা
(৩)	পাট-কল	+৫৪ লাখ টাকা
(৪)	মোটর ট্রান্সপোর্ট	+৪৬ লাখ টাকা
(৫)	লৌহ-ষ্টিল	+৪৪ লাখ টাকা
(৬)	ব্যাঙ্কিং	—২৯,১৯ লাখ টাকা
(৭)	অগ্নি বীমা	— ৬,১৭ লাখ টাকা
(৮)	অন্যান্য	— ২,৪১ লাখ টাকা
(৯)	জীবনবীমা	— ১,৮১ লাখ টাকা
(১০)	চুনা-শিল্প	৯৩ লাখ টাকা
(১১)	সমুদ্রপথ	৬১ লাখে টাকা
(১২)	এঞ্জেন্সি	৫৭ লাখ টাকা
(১৩)	ইঞ্জিনিয়ারিং	— ৫৬ লাখ টাকা

এবং নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার কম দেখা যায় :—

নিম্নে দেশ-হিসাবে কোম্পানীগুলির হিসাব দেখান হইল :—

	১৯২৯-১৯৩০		১৯৩০-১৯৩১	
	সংখ্যা	হাজার টাকা	সংখ্যা	হাজার টাকা
বাংলা	৩৬৪	৩৩,৭৫,৯৩	২৯৯	১০,৫১,০৫
মাদ্রাজ	৯৯	১২,০৯,২২	১০৯	১,৩৪,৪১
বোম্বাই	১০৫	৮,১২,৬৩	১০৩	৪,০৪,৪৮
যুক্তপ্রদেশ	৩২	১,৭৯,৬৪	১৮	৭৯,১৫
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫	৩২,৫৯	১৩	২১,০৩
পাঞ্জাব	৫৭	১,৪৭,৬০	৪৬	৯৯,৪৬
দিল্লী	১৯	৫৯,২১	২৯	৫৮,৫৫
বার্ম্মা	২০	৬৩,১০	১৮	১,৩৩,৩০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৭	১৭,৯০	৫	৯৫
আসাম	১৩	২৪,৪০	১৩	২২,৩৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		২০	২	৩০,০০
আজমীর মারওয়ার			—	—
বেলুচিস্থান	—	—	—	—
কুর্গ	—	—	১	৫০
বাঙ্গালোর		১,০০	১	১,৫০
মহীশূর	৬	২৪,২০	৬	৯,২০
বড়োদা	২	৬,১০	৩	১৭,৯৯
হায়দ্রাবাদ	৮৩	১৯,০০	৪৭	৮৩,৪৪
হায়দ্রাবাদ	১৭	১,১১,৫৪	১১	২৯,১৮
মোট	৮৪২	৬১,৬৬,২৭	৭৩৪	২১,৭৬,০৯

দেখা যাইতেছে যে, বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বার্ম্মার মোট টাকা অধেকী ইহ কোম্পানীতে

খাটিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানীগুলির মূলধনের তরফ হইতে বাংলার স্থান সর্ব্বনীর্ষে, দ্বিতীয় স্থান বোম্বাইয়ের, তৃতীয় মাদ্রাজের ও চতুর্থ মার্কার। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে জিবাঙ্কুর প্রথম, হায়দ্রাবাদ দ্বিতীয় ও বড়োদা তৃতীয়। আলোচ্য বর্ষের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলির মধ্যে বাংলাদেশের কোম্পানীগুলিই অধিক মূলধন বাড়াইয়াছে। একটা হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

দেশ	নিট হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ (১৯৩০-৩১) (হাজার টাকা)
বাংলা	+২,০৬,৫৫
মাদ্রাজ	+ ১০
বোম্বাই	— ১০,৫৫
যুক্ত প্রদেশ	+ ১১,৯৩
বিহার ও উড়িষ্যা	+ ১,০০
পাঞ্জাব	+ ৫,৫৮
দিল্লী	+ ৬৩,৫০
বার্মা	+ ৪৬,৯৫
মহীশূর	+ ৫০
জিবাঙ্কুর	+ ৩,২০
মোট	+৩,১৬,৪৬

চায়ের অবস্থা

উপর আসাম

এপ্রিল মাসে চায়ের অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। ফলন ভাল হইবার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য ফলন কিছু খারাপ হইতে পারে।

মধ্য আসাম

এপ্রিল মাসে ফলন খুব খারাপ; তবে নিকট ভবিষ্যতে ভাল ফলন হইবার সম্ভাবনা; জলহাওয়ার অবস্থা শুষ্ক-উপযোগী।

নিম্ন আসাম

এপ্রিল মাসে ফলন সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। ভবিষ্যতে ভাল ফলিবার আশা। এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফলনের হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু কম।

উত্তর কাছাড়

এপ্রিল মাসের ফলন খুব খারাপ। ভবিষ্যতে ফলন সন্তোষজনক হইবে বলিয়া মনে হয়। এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত খুব সামান্য।

দক্ষিণ কাছাড়

এপ্রিল মাসের ফলন সাধারণ অবস্থার কাছাকাছি; ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ; শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলনের ক্ষতি; শিলাবৃষ্টি হইয়াছে, তবে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই; লাল মাকড়সার উপদ্রব দেখা গিয়াছে।

পূর্ব্ব ডুয়ার্স

এপ্রিল মাসে ফলন প্রায় স্বাভাবিক; জলহাওয়া কালোপযোগী; বৃষ্টিপাত সন্তোষজনক, সুতরাং ফলনের অবস্থাও বিশেষ ভাল।

পশ্চিম ডুয়ার্স

এপ্রিল মাসে ফলন যথেষ্ট কম; প্রবল শিলাবৃষ্টি-পাতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং চায়ের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। বৃষ্টিপাত খুবই কম।

শ্রীহট্ট

এপ্রিল মাসের ফলন খুব কম, তবে অদূর ভবিষ্যতে ভাল ফলিবার কথা; শিলাবৃষ্টিপাতের সংবাদ শুনা যায়। তবে ক্ষতি সেরূপ হয় নাই। এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফলনের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় খুব কম।

দার্জ্জিলিং

এপ্রিল মাসের ফলন খুব কম। অদূর ভবিষ্যতেও ভাল ফলিবার আশা নাই। প্রবল শিলাবৃষ্টির জন্য চায়ের খুব ক্ষতি হইয়াছে। ব্লিপস্ ব্লাইট দেখা যায় এবং লাল মাকড়সার উপদ্রব আছে।

তরাই

গত এপ্রিলের ফলন বৎসামান্য মাত্র এবং অদূর ভবিষ্যতেও ভাল ফলিবার আশা কম। শুকনা এবং গরম আবহাওয়ার জন্য ফলনে বাধা জন্মিয়াছে। লাল মাকড়সার উপদ্রব আছে।

ব্রহ্মদেশের কৃষক

ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ জন। বহু বাঙ্গালী ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী এবং চীনারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করাতেই লোক-সংখ্যা এরূপ দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কৃষকেরা প্রত্যেকে ৪০.৫০ একর পর্য্যন্ত ভূমি কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। পঁচিশ একরের কম জমির কৃষককে এখানে কৃষকই বলা হয় না। অধিক জমিতে ধান্য উৎপাদনপূর্ব্বক ইহারা নিজেদের খাওয়ার উপযুক্ত ধান্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া সুখে কাল কাটাইত। কিন্তু ইটালি, জাপান ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্যের চাষ হওয়াতে, সেই সকল দেশে আর ব্রহ্মদেশ হইতে ধান্যের চালান যাইতেছে না; কাজেকাজেই আজ দুই বৎসর পর্য্যন্ত ধান্যের দর পূর্ব্বের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাই বর্ত্তমান সময়ে এখানকার লোকের দশা বাঙ্গালাদেশের পাটচাষীদের ন্যায় হইয়াছে। অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, আজকাল অনেকেই কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দিতেছে। যাহারা কৃষিকার্য্য করিবে, তাহারাও নিজেদের ব্যবহারোপযোগী অল্প পরিমাণ জমি মাত্র চষিবে; দ্বি-চতুর্থাংশ জমি কৃষকাভাবে পতিতই থাকিবে। কাজেই গবর্ণমেণ্টের ভূমিসম্পর্কীয় রাজস্বও অনেক কমিয়া যাইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও চীন হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ লোক আসিয়া যদি এতদ্দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক এ সমস্ত জমিতে কৃষিকার্য্য না করে, তবে এই সকল জমি আবার জঙ্গলে পরিণত হইবে।

বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা আসিয়াই এখানকার অধিকাংশ পতিত ও জঙ্গলপরিপূর্ণ জমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিয়াছে। সেই সকল কৃষকদিগকেই এখন ব্রহ্মবাসীরা অরাজক রাজ্যের প্রজার ন্যায় তাড়াইয়া দিতেছে। যে সকল ব্রহ্মবাসী ইংরাজগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর ভারতীয়দের বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতেছে না। যাহারা বিদ্রোহী নহে তাহারাই ভারতীয়দের বড় ক্ষতি করিতেছে। তাহারাই নিষ্কৃপভাবে ভারতীয়দের জায়গা-জমি ও ধন-দৌলতাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার ভারতীয় ব্রহ্মদেশ হইতে পলাইয়া আসিতেছে, আবার হাজার হাজার লোক তথায় যাইয়া পলাতকদের স্থান পূরণ করিতেছে; তবে পলাতকদের সম্পত্তিগুলি উহারা পাইতেছে না। বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য ব্রহ্মদেশীয় আরাকানী মগ স্থায়ী বাসিন্দারূপে অবস্থান করিতেছে; তাহাদের মধ্যে 'মোমাং' ও 'মানরাজ' নামে দুইটী সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারও বর্ত্তমান; কিন্তু বাঙ্গালীরা কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে তাহারা ব্রহ্মবাসীদিগকে এইসকল স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থান আপনারাই দখল করিয়া লইবে।

ব্রহ্মবাসীরা এখন যে হাজার হাজার চট্টগ্রামবাসী কৃষক-দিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেছে, সেই চট্টগ্রামবাসীরা সকলেই চট্টগ্রামের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। চট্টগ্রামের অধিকাংশ মুসলমানদিগকে ব্রহ্মদেশে ইংরাজীতে চিটা-গনিয়ন নামেই অভিহিত করা হয়, ইহারাও মূর্খতানিবন্ধন সর্ব্বত্রই পরিচয় দিয়া থাকে, আপনাদিগকে "বাঙ্গালী" বলিতে জানে না। এই চট্টগ্রামবাসী মুসলমানেরা অনেক পুরুষ ধরিয়া ব্রহ্মদেশে জায়গাজমি ক্রয় ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে এবং তথাকার স্থায়ী বাসিন্দারূপে অবস্থিতি করিতেছে। বর্ত্তমানে ইহাদের প্রায় সকলকেই পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে।

শ্রীনলিন মজুমদার (সঞ্জীবনী)

হাঙ্‌লং হিল্ সহরের আর্থিক তথ্য

এই সহরটি উত্তর কাছাড় জিলার (নর্থ লেক্‌ভিমেন্ট্ প্রভিন্স) একমাত্র সহর। ইহা বেশী দিনের সহর নহে, পনের কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। সহরে একটি বাজার আছে। বাজারের অধিকাংশ দোকানদারই বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়া এখানে দোকান করিয়াছে।

এতদঞ্চলে পাঞ্জাবী দোকানদারের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় এবং তাহারা বেশ বড় বড় ধনী। তাহা ছাড়া বেশী কাপড়ওয়ালারও অতি নগণ্য দুই একটি দোকান আছে। চাল, ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া হাসপাতালের বিলাতী সমস্ত জিনিষই দোকানে পাওয়া যায়। তবে দাম বড় বেশী। কার্পাস ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া এই সব অঞ্চলের লোকের হাতে যখন টাকা আসে তখন তাহারা এইসব আপাত চাকচিক্যময় জিনিষের মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহা ক্রয় করিয়া সর্ব্বান্ত হয়। সিগারেট ও চা বিক্রয়ের কথা আর কি বলিব—আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই সিগারেট! অবশ্য এগুলি বেশী দামের নয়—সেই লাল রঙের মার্কা "পনেরোয়ে পাঁচটা।" মদ এবং আফিংএর দোকান এখানে আছে। এ অঞ্চলের লোক খুব আফিং খায়। ইহারা উহাকে "কানি" বলে। এ অঞ্চলে পথে-ঘাটে চারি পাঁচ টাকার যে কাজ হাসিল না হইবে, দুই চারি আনার আফিং দ্বারা তাহা হাসিল হইবে। আসাম গভর্ণমেণ্ট কানি-খোরদের কানির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় ইহারা নানাপ্রকার অসদুপায়ে উহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এখানে প্রতি সপ্তাহে একদিন হাট বসে। হাটে বহু দূর হইতে অনেক লোক জিনিষপত্র কেনা বেচা করিতে আসে। শীতকালে ইহারা যখন কার্পাস, তিল, মরিচ প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে তখনই সম্বৎসরের জিনিষপত্র একেবারে কিনিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা আশ্বিন হইতে চৈত্র বৈশাখ পর্য্যন্ত ছয় মাস বাজারে যাতায়াত করে, আর বর্ষার কয়েক মাস একেবারেই বাজারে আসে না। বাজার হইতে সাধারণতঃ ইহারা লবণ ও তরিতরকারী কিনিয়া লইয়া যায়, আর বিশেষ কোনও জিনিষের প্রয়োজনই বোধ করে না। এখানকার ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় ছয় মাসই চলে।

এ অঞ্চলে কার্পাস যেমন উৎকৃষ্ট, তিলও তেমনি। কিন্তু উৎকৃষ্ট হইলেও ইহারা সে উৎকৃষ্ট জিনিষের মূল্য তো পায়ই না, এমন কি সাধারণ মূল্যও পায় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। দুই তিন দিনের পথ হইতে ইহারা ঐ সব জিনিষ আমদানি করে। একটা লোক উর্দ্ধতম ত্রিশ সের কি এক মণের বেশী জিনিষ আনিতেই পারে না। আর এই এতদূর পথ হইতে অতি কষ্টে জিনিষ আনিয়া তাহারা যা পায়, তাহা শুনিলে আপনারা অবাক হইবেন। এখানে কার্পাস ও তিলের মণ ৫৲ ৬৲ টাকার বেশী নয়। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন তাহারা কি পায়! জিনিষ আনিবার মজুরিটা পর্য্যন্ত তাহারা ঠিক ঠিক পায় না। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, তাহারা কি কষ্টে সারাটা জীবন অতিবাহিত করে।

বাঙ্গালায় যেমন বিদেশী কোম্পানী পাটের বাজার ঠিক করে, এখানেও ঠিক সেই রকম। এই যে এত বড় দেশটা এটি বেলী ব্রাদার্সের কামধেনু। তাহাদের প্রতিনিধিরা তাহাদের হেড্ অফিস হইতে দর ঠিক করিয়া দিবার পর তবে জিনিষের দর হবে। আর যাহারা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া জিনিষ উৎপন্ন করে তাহাদের একটি কথাও বলিবার অধিকার নাই। আর দোকানদারগুলি এই কামধেনুর দোহক। দুগ্ধ উপভোগ করা স্থানীয় লোকদের অদৃষ্টে নাই। এই সমস্ত বড় বড় জিনিষের ব্যবসার উক্ত কোম্পানীর একচেটিয়া। অপর কোন স্থান হইতে অন্য কোন বণিক্ গিয়া যে উহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া জিনিষ কিনিবে তাহারও কোন উপায় নাই। কোন নূতন কোম্পানী আসিলেই উহারা ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগকে হাত করিয়া লয়। শেষে উক্ত নূতন কোম্পানী উহাদিগকে সুনাফা দিয়াই সাধারণতঃ জিনিষ কিনিয়া থাকে। এমন কি বাঙ্গালা দেশে যেসমস্ত কাপড়ের কলওয়ালা আছেন তাঁহাদেরও ঐ অবস্থা। কিন্তু দেশী কলওয়ালারা একটু চিন্তা করেন কিনা জানি না, যে, প্রতি বৎসর বেলী ব্রাদার্স কত টাকা কমিশন বাবদ নিজেদের দেশে লইয়া যাইতেছে। ভারতীয় কল-ব্যবসায়ীদের কথা দূরে থাকুক, যদি কেবল বাঙ্গালা দেশের কল-ব্যবসায়িগণ একত্রে একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে এত বড় একটা লাভ-জনক ব্যবসায় বিদেশী কোম্পানীর হাতে যায় না, দেশের পয়সা দেশেই থাকে। তাহা ছাড়া কোম্পানী দ্বারা অধিকতর উৎকৃষ্টজাতীয় কার্পাস-বীজ এইসব লোকের মধ্যে বিতরিত হইলে কোম্পানী অধিকতর উৎকৃষ্ট কার্পাসও পাইতে পারেন। নিজের দেশের

ব্যবসায় নিজের দেশের লোকের হাতে থাকিলে চাষী ও মধ্যস্বত্বভোগী উভয়েরই স্বার্থ ঠিক ঠিক রক্ষিত হয়। রেলী ব্রাদার্সের হেড্ অফিস চট্টগ্রামে। ইহাদের লাম্‌ডিংএ একটি প্রকাণ্ড গুদাম বা আড়ৎ আছে। এ অঞ্চলের যাবতীয় জিনিষপত্র উহারা এই স্থানে মজুত করিয়া নানাস্থানে প্রেরণ করে। দেশীয় দোকানদারদের এমন ক্ষমতা নাই যে, জিনিষ কিনিয়া কিছুদিন ধরিয়া রাখিবে। তাহারা এক দিকে জিনিষ কিনিতে লাগিল আর একদিকে তাহা চালান দিতে লাগিল। কেহ কেহ বা কোম্পানীর নিকট হইতে অগ্রিম টাকাও আনে। দেশের ব্যবসায়ের কি শোচনীয় দুরবস্থা!

সহরটি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিদিত। ইহার উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৫০০ কি ৩০০০ হাজার ফুট। কাজেই বারমাসই এখানে অল্পবিস্তর শীত থাকে। তবে শীতকালে শিলং, চেরাপুঞ্জী, মসুরী প্রভৃতির ন্যায় এখানে অত বেশী শীত নয়। শীতকালে ঐ সব স্থান হইতে অনেক সাহেব এখানে আসিয়া বাস করে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবেও ইহা শিলং বা অন্য কোন পার্ব্বত্য সহর অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তবে তাহাদের আয়তন বৃহৎ ও ইহার কম, এই মাত্র তফাৎ। সহরে সাহেবদের জন্য একটি বেশ বড় হোটেল, ডাকবাংলা, ডাকঘর, হাঁসপাতাল, বিচারালয়, রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট চার্চ্চ এবং উভয় মিশনের বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী-নিবাস, এস, ডি, ও'র বাংলা, এ, বি, আর কোম্পানীর অফিস, গভর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীর দেশীয় অফিসারদের বাসা, বাঙ্গালী অফিসারদের ক্লাব ও তৎসংলগ্ন একটি লাইব্রেরী এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির ও কালীবাড়ী আছে। ইহা ব্যতীত আর বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য স্থান নাই। এখানে গভর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীর অফিসার ও দোকানদার ছাড়া অন্য কাহাকেও বাস করিতে দেওয়া হয় না।

সহর হইতে একটু নীচে নামিয়া হাফ্‌লং যাইবার পথে গভর্ণমেণ্টের একটি পরীক্ষামূলক (এক্সপেরিমেণ্টাল্) বাগান আছে। এই অঞ্চলে কিরূপ কমলালেবু হইতে পারে, নানা স্থান হইতে কমলার কলম আনাইয়া তথায় তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। বাগান দেখিয়া উহার ফল সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইল না, কারণ কমলার ফুল পুষ্ট ও টক, আর গাছও বেশ তেজী নয়, শুকনা শুকনা ভাব। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বৃষ্টির অভাব। তাহা ছাড়া এখানকার মাটীও তত সুবিধার নয়—চুণের ভাগ বড় কম। পাহাড় হইতে ঝরণার জল ধরিয়া পাইপের দ্বারা দিয়া আনিয়া সহরের পানীয় জলের অভাব দূর করা হয়। এ অঞ্চলে পাহাড়ের উপরের সমস্ত স্থানই ভাল, কিন্তু পাহাড়ের নীচের স্থানগুলি অতি অস্বাস্থ্যকর—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্রভৃতির আকর। আবার নীচের বাজারগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও দোকানদারদের দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়।

শ্রীঅমূল্য চরণ ঘোষক
(উদ্বোধন)

ত্রিবাঙ্কুরের বহির্ব্বাণিজ্য (১৯৩০-৩১)

১৯৩০-৩১ সনে ত্রিবাঙ্কুরের বন্দরসমূহের মোট বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের মূল্য ১৯৯·৯৫ লাখ টাকা; ইহার মধ্যে বেসরকারী পণ্যদ্রব্যের দাম ১৯৩·৬৭ লাখ টাকা এবং সরকারী ষ্টোরের দাম ৬·২৮ লাখ টাকা। বেসরকারী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে আমদানির মূল্য ২৩·১০ লাখ টাকা, রপ্তানির ১৭০·৫৮ লাখ টাকা। নিম্নের তালিকায় বন্দর-হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় প্রকাশিত হইল :—

বন্দর	আমদানি (লাখ টাকা)	রপ্তানি (লাখ টাকা)
এলেপ্পি	১৭·৮৪	১৬৩·০২
কুইলন	৪·৭৭	০·২৫
কোলচেল্	০·০১	৭·৩১
ত্রিভান্দ্রাম্ সি কাষ্টম্স্ (অন্যান্য বন্দরসমূহ)	০·৬৮	
	২৩·১০	১৭০·৫৮

এলেপ্পি—কাঁচা তামাক (৩৮৪ লাখ টাকা), তুলার কাপড় (৩·১২ লাখ টাকা), ধাতু (২·৯০ লাখ টাকা),

মেশিনারি কলকব্জা (১·৯৬ লাখ টাকা), কাগজ ও পেষ্ট্ বোর্ড (১·১৫ লাখ টাকা) প্রভৃতি প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য। তামাক ছাড়া সমস্ত জিনিষই প্রধানতঃ বিলাত হইতে আসিয়াছে। তামাক আমদানি হইয়াছে সিংহল হইতে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নারিকেলের ছোবড়াজাত বস্তু (১০৯·৭৬ লাখ টাকা), মরিচ (২৪·১৩ লাখ টাকা), কাঁচা রবার (১১·৭৯ লাখ টাকা), কেন্দু-বাদাম শাঁস (৬·০০ লাখ টাকা), চা (৫·৫০ লাখ টাকা), শুক্না আদা (২·২৯ লাখ টাকা), হলুদ (১·১৯ লাখ টাকা)।

ছোবড়া-জাত দ্রব্যের প্রধান প্রধান খরিদ্দার :—

	লাখ টাকা
বিলাত	৬৩৮৯
মার্কিণ	১১·৯০
জার্ম্মাণি	৭·০৩
হল্যাণ্ড	৬·৬০
বেলজিয়াম	৪·০৯
অষ্ট্রেলিয়া	৩·৪৯
ইতালি	২·১২
নিউজিল্যাণ্ড্	২·০৭
অষ্ট্রিয়া	১·৫৫
সিংহল	১·৩১
আফ্রিকা	১·০৯

মরিচ প্রধানতঃ চালান গিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে (২০·৪৭ লাখ টাকা), বিলাতে (১·৩৫ লাখ টাকা); কাঁচা রবার বিলাতে (৫·৫৭ লাখ টাকা) সিংহলে (৫·২৭ লাখ টাকা); কেন্দু বাদাম শাঁস মার্কিণে (৫·৬৪ লাখ টাকা), বিলাতে (৪·৫৯ লাখ টাকা); আদা এবং হলুদ বিলাত মার্কিণ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় চালান গিয়াছে।

কুইলন—কাঁচা তামাক (৪·৭২ লাখ টাকা) সিংহল হইতেই প্রধানতঃ আসিয়াছে। পক্ষান্তরে সিংহল বীপে ইট এবং টালি (·১৫ লাখ টাকা) এবং কাঠ (·০৯ লাখ টাকা) রপ্তানি হইয়াছে।

কোলম্বো—এই বন্দরে সিংহল হইতেই প্রধানতঃ মাল আমদানি হইয়াছে এবং এই আমদানি সেরূপ উল্লেখযোগ্য নহে। রপ্তানির মধ্যে মার্কিণে ইন্‌সেনাইট্ (৫·৫০ লাখ টাকা), ফ্রান্স মার্কিণ এবং বিলাতে মোলাজাইট্ (১·২০ লাখ টাকা), বিলাতে এবং মার্কিণে ডালের ভস্ত (·৫১ লাখ টাকা)।

ত্রিভান্দ্রাম্ সি কাষ্টমস্—আমদানির মধ্যে বিলাত হইতে (·৩১ লাখ টাকা) সিমেণ্ট এবং বিলাত ও বেলজিয়াম হইতে (·১১ লাখ টাকা) ধাতুই প্রধান।

বৃটিশ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য (১৯৩০)

১৯৩০ সনে আমদানি, রপ্তানি এবং পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ ৪৪২ কোটী টাকা, ১৯২৯ সনে ৫১৮ কোটী টাকা এবং ১৯১৩ সনে লড়াইয়ের আগে ৪২৬ কোটী টাকা। বেসরকারী আমদানির দাম ১৮৫ কোটী টাকা। ১৯২৯ সনের তুলনায় এই খাতে ৬৪ কোটী টাকা হ্রাস দেখা যাইতেছে। ভারতীয় দ্রব্য রপ্তানি ৭০ কোটী টাকা কমিয়া ২৫২ কোটী টাকায় এবং পুনঃ রপ্তানি ২ কোটী টাকা কমিয়া ৫ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত সন সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানের জন্য মৌলৎ আমদানি হয় ২৯ কোটী টাকায় এবং রপ্তানি ১ কোটী টাকা কমিয়া ৪ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। স্বর্ণপাত আমদানি এক কোটী টাকা কমিয়া যায়; সভারেণ এবং অন্যান্য স্বর্ণমুদ্রা আমদানি হয় ৯ কোটী টাকায়; এই শেষোক্ত খাতেও আমদানি হ্রাস পাইয়াছে, তবে সামান্য মাত্রায়। পক্ষান্তরে রূপা আমদানি ১২ কোটী হইতে ১৩ কোটী টাকায় উঠিয়াছে। আমদানি কাগুজি নোটের মূল্য ২৪ লাখ টাকা, ১৯২৯ সনে ৮ লাখ টাকা মাত্র ছিল।

১৯১৩ সন হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরের পণ্যদ্রব্য এবং ধনদৌলৎ আমদানি নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল :—

সন	পণ্যদ্রব্য কোটি টাকা	দৌলৎ কোটি টাকা	মোট কোটি টাকা
	৪২৬	৪৮	৪৭৪
	৩৬৯	৩১	৪০০
	৩০৭	২৩	৩৩০

১৯১৬	৩১৮	১৭	৩৯৫
১৯১৭	৩৮৮	৩৫	৪২৩
১৯১৮	৪১৮	৪	৪২২
১৯১৯	৪৯২	১২	৫০৪
১৯২০	৬১৫	৩৪	৬৪৯
১৯২১	৫০৫	৬১	৫৬৬
১৯২২	৫০১	৫২	৫৮৮
১৯২৩	৫৬৮	৬৮	৬২৬
১৯২৪	৬২৬	৭৪	৭০০
১৯২৫	৬৩৩	৮৬	৭১৯
১৯২৬	৫৬৩	৬৮	৫১১
১৯২৭	৫৭৩	৩৮	৬১১
১৯২৮	৫৮৬	৪২	৬২৮
১৯২৯	৫৭৮	৩৯	৬০৯
১৯৩০	৪৪২	৩০	৪৭২

উপরের এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, ১৯২৯ সনে পণ্যদ্রব্য এবং দৌলৎ সমেত মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৬০৯ কোটী টাকা এবং আলোচ্য সনে ৪৭২ কোটী টাকা; সুতরাং আলোচ্য সনে পূর্ব্ব সনের তুলনায় ১৩৭ কোটী টাকার বাণিজ্য হ্রাস ঘটিয়াছে।

১৯১৩ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে পণ্যদ্রব্যের আমদানি-বৃদ্ধি মাত্র ২ কোটী টাকা অর্থাৎ ১%, রপ্তানিবৃদ্ধি ১১ কোটী টাকা (৫%) এবং পুনঃ রপ্তানি বৃদ্ধি ১০ লাখ টাকা (১৫%)।

প্রদেশ-হিসাবে বাণিজ্যের পরিচয়

নিম্নের তালিকা দুইটিতে ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে প্রদেশগুলির আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের (পুনঃ রপ্তানি সমেত), পরিচয় দেওয়া হইল :—

আমদানি

		১৯৩০	১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে বৃদ্ধি (+) কিংবা হ্রাস (−)	
		(লাখ টাকা)	(লাখ টাকা)	শতকরা
বাঙ্গালা		৬১,৪৩	−২৫,৭৭	−২৯·৫
বিহার ও উড়িষ্যা				
বোম্বাই	৮৪,৩১	৬১,৪৩	−২২,৯০	−২৭·২
সিন্ধু	২৮,৪৮	২১,০৬	− ৭,৪২	−২৬·১
মাদ্রাজ	২৬,৯৬	২২,৪৬	− ৪,৫০	−১৬·৭
বার্ম্মা	২১,৫৪	১৮,৩০	− ৩,২৪	−১৫·০
	২৪৬,৬১	১৮৪,১৮	−৬২,৮৩	−২৫·৭

রপ্তানি (পুনঃ রপ্তানি সমেত)

বাঙ্গালা		৯৭,০১		
বিহার ও উড়িষ্যা				
বোম্বাই	৭৯,২৭	৬২,৭৭	−১৬,৫০	−২০·৮
সিন্ধু	২৭,০৪	২১,০৪	− ৬,০০	−২২·২
মাদ্রাজ	৪৫,৮২	৩৬,৩৪	− ৯,৪৮	−২০·৭
বার্ম্মা	৩৬,৫৯	৩৯,৬২	+ ৩,০৩	+ ৮·৩
মোট	৩২৮,৯০	২৫৭,০৮	−৭১,৮২	−২১·৮

আলোচ্য সনে আমদানি বাণিজ্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয়; মোট আমদানি হ্রাস প্রায় ২৮%। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশেই আমদানি কমিয়াছে। যথা, বাঙ্গলা (—২৫,৭৭ লাখ টাকা), বোম্বাই (—২২,৯০ লাখ টাকা), সিন্ধু (—৭,৪২ লাখ টাকা), মান্দ্রাজ (—৪,৫০ লাখ টাকা) এবং বার্ম্মা (—৩,২৪ লাখ টাকা)। আমদানি-হ্রাসের কারণ কার্পাসজাত বস্ত্রের আমদানি-হ্রাস এবং অন্যান্য বৈদেশিক পণ্য দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস। বাঙ্গালা এবং বোম্বাই প্রদেশে গম, চিনি এবং লোহালক্কড় আমদানিও কমিয়াছে।

আমদানি বাণিজ্যের মত রপ্তানি বাণিজ্যও পূর্ব্ব সনের তুলনায় আলোচ্য সনে যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। এক মাত্র বার্ম্মা ছাড়া সব প্রদেশেরই রপ্তানি কমিয়াছে; বার্ম্মার রপ্তানি-বৃদ্ধি হইয়াছে ৩,০৩ লাখ টাকার। বাঙ্গালার রপ্তানি-হ্রাসের মূল্য ৪২,৮৭ লাখ টাকা; লাক্ষা, চা এবং পাটের চাহিদা কম হওয়ায় এই সমস্ত জিনিষ কম রপ্তানি হইয়াছে; পাট-জাত দ্রব্য রপ্তানিও কমিয়াছে।

বোম্বাই হইতে রপ্তানি কমে ১৬,৫০ লাখ টাকার; বীজ, খাদ্যশস্য রপ্তানি কম হইয়াছে, কার্পাস রপ্তানিও কিছু কমিয়াছে। সিন্ধু এবং মান্দ্রাজের রপ্তানি-হ্রাসের মূল্য যথাক্রমে ৬০০ এবং ৯৪৮ লাখ টাকা। সিন্ধু হইতে তুলা এবং গম কম রপ্তানি হইয়াছে এবং মান্দ্রাজ চামড়া এবং চিনাবাদাম কম পাঠাইয়াছে।

মাসিক আমদানি

নিম্নের তালিকায় ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনের প্রত্যেক মাসের বেসরকারী আমদানির তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে বৃদ্ধি (+) কিংবা হ্রাস (—)	
	হাজার টাকা	হাজার টাকা	হাজার টাকা	শতকরা
জানুয়ারি	২৬,৮৫,৯৮	২২,৯৩,৮৩	—৩,৯২,১৫	—১৪·৬
ফেব্রুয়ারি	১৯,৮২,৬০	১৭,৩০,১৪	—২,৫২,৪৬	—১২·৭
মার্চ্চ	২২,২৪,৫৮	২০,৮৭,৬৩	—১,৩৬,৯৫	— ৬·২
এপ্রিল	২৪,৫৩,৬৫	১৮,০৫,৮৭	—৬,৪৭,৭৮	—২৬·৪
মে	২১,২৩,১৭	১৭,৮৯,৬৭	—৩,৩৩,৫০	—১৫·৭
জুন	১৮,৫১,৭৭	১৩,৮৬,৩৭	—২,৬৫,৪০	—১৬·১
জুলাই	১৯,০৬,০৫	১৩,৬৮,৪৭	—৫,৩৯,৫৮	—২৮·৩
আগষ্ট	২০,৩৩,৭৬	১২,৭৪,৪৪	—৭,৫৯,০২	—৩৭·৩
সেপ্টেম্বর	১৯,২১,৮৬	১১,১৭,৯৬	—৮,০৪,৯০	—৪১·৯
অক্টোবর	১৯,২৩,৫৮	১২,৭৮,২৬	—৬,৪৫,৪২	—৩৩·৬
নবেম্বর	২২,৫০,০৬	১১,৯১,১৪	—১০,৫৮,৯২	—৪৭·১
ডিসেম্বর	১৭,০৩,১০	১১,৫৬,৫৪	—৫,৪৬,৫৬	—৩২·২
মোট	২৪৮,৬১,২৬	১৮৪,৭৮,৩২	—৬৩,৮২,৯৪	—২৫·৭

বিভিন্ন দ্রব্য আমদানির পরিচয়

পূর্ব্ববর্ত্তী সনের তুলনায় আলোচ্য সনে খাদ্য, পানীয় এবং তামাক আমদানির মূল্য ১৪,৭৩ লাখ টাকা কমিয়া মোট ৩১,২৭ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। গম এবং চিনির খাতেই এই আমদানি-হ্রাস। কার্পাস তুলা

বেশী আমদানি করা হইয়াছে (+১০৪ লাখ টাকার)। অন্যান্য কাঁচা মাল এবং শিল্প দ্রব্য ছাড়া অপর পণ্য আমদানির মূল্য ৬৮ লাখ কমিয়া ২২,২৮ লাখ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সব চেয়ে বেশী আমদানি কমিয়াছে শিল্পঘটিত দ্রব্যের। এই খাতে আমদানি-মূল্য ১৭৫,২৩ লাখ টাকা হইতে ১২৭,৩৫ লাখ টাকায় নামিয়াছে। বস্ত্র, ধাতু, মেশিনারি এবং হার্ডওয়্যারের আমদানি কমিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জীবন্ত জানোয়ারের আমদানিও কমিয়াছে ৮ লাখ টাকা মূল্যের; মোট জানোয়ার (জীবন্ত) আমদানির মূল্য ৪৭ লাখ টাকা।

আমদানি চিজ্ হ্রাস-বৃদ্ধির পরিচয়

১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে আমদানি-দ্রব্যের হ্রাস-বৃদ্ধির মোটামুটি পরিচয় নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

বৃদ্ধি	টাকা
কেরোসিন তৈল	২৮,৩১,৯৯৬
মিনারেল্ অয়েল (কেরোসিন ছাড়া)	২১,১৭,৪১৯
তুলা	১,০৪,৫৮,৯৪৮
বুট এবং জুতা	১৩,১৪,৭৮১
এনিলাইন্ ডাইজ্	৩১,৮৩,৩৫৪
খেজুর	১৪,১৭,৬৮৬
সম	৭,৫৯,৫০,২০৭
স্পিরিট	৫৭,১০,৫৭৫
বোতলভরা খাদ্য	৪২,৫৯,৪৭৮
পেটেন্ট ফুড	১৪,৪১,৬৭২
খনী পাথর	৪৯,২৮,০৯১
রেশম	২৩,৪৭,১৬১
কাগজ	৫৪,৭৪,০৮০
চিনি	৪,৫৬,৭৬,৮৭৬
সিগারেট	৫৪,৪৬,৬০২
ছাতা ও উহার সরঞ্জাম	১৪,৩০,২৯২
ঔষধপত্র	১৭,১৪,৬৮২
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি	২১,৪৪,২৯৭
কাচ ও কাচের বাসন	৭২,৪৩,০৮৮
মাটীর বাসন এবং পোর্সেলিন্	১৮,৪০,০১৪
হার্ডওয়্যার	১,১৪ ৮৫,৫৩২
রং ও পেন্ট	২১,৭৯,৪৩৩
ছুট মেশিনারি	৩৮,৯৪,৭০১
ইস্পাতের বার	১,০৬,২৯,৪৮০
লোহা ও ইস্পাতের পাত	৩,২২,৫৪,১০৪
টিন (কাঁচা)	১৮,৬২,২৯৮
তুলার কাপড় (কোরা)	১০,২৪,৬৩,২৮৯
" শাদা	৪,৯৮,৩৭,৯০৯
" ছাপা	৫,৭ ,৮১,২৭৪
মোসিয়ারি (কার্পাস)	২২,০৬,৬১৬
হোসিয়ারি এবং মিলিনারি	১৮,২৯,২৬৯
রেশমী কাপড়	৮৮,৮২,৬০৯
পশমী কাপড়	১,০৬,৮৩,৩১৮
" শাল	১২,১৯,৫৯৬
মোটর গাড়ী	১,৪৪,৯৮,২৫৯
কার্পাস সুতা	২,৮৭,৭৯,৯৪১
সাবান	৩১,৫৭,৪৪৬

১৯৩০ সনে ভারতে বস্ত্র আমদানির পরিমাণ ১২,৪৪০ লক্ষ গজ, মূল্য ২৯,৯০ লাখ টাকা। ১৯২৯ সনের তুলনায় এই সনে আমদানি-হ্রাস দৈর্ঘ্য হিসাবে ৬,৫৬০ লক্ষ গজ এবং মূল্য হিসাবে ২১,৫২ লাখ টাকা। শাদা, কোরা এবং ছাপীর এই তিন রকমের কাপড়ের আমদানিই প্রধান এবং এই তিনটীই হ্রাস পাইয়াছে। কোরা কাপড়ের আমদানি ৩৬:৫০ লাখ গজ হ্রাস পাইয়া ৫৬০০ লাখ গজে পরিণত হইয়াছে এবং মূল্য ১০,২৫ লাখ টাকা কমিয়া ১১,৩৬ লাখ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বিলাত এবং জাপান হইতে আমদানি কমিয়াছে যথাক্রমে ২৪,১০ লাখ এবং ১০,৯০ লাখ গজ। শাদা কাপড়ের আমদানি ৪৭,৭০ লাখ গজ হইতে ৩৫,০০ লাখ গজে নামিয়াছে এবং মূল্য নামিয়াছে ১৩,৬৭ লাখ হইতে ৮,৬৮ লাখ টাকায়। বিলাত হইতে শাদা কাপড়ের আমদানি-হ্রাসই ইহার প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে জাপান হইতে শাদা কাপড়ের আমদানি বাড়িয়াছে। ১৯২৯ সনে জাপান শাদা কাপড় পাঠায় মাত্র ৯০ লক্ষ গজ; কিন্তু ১৯৩০ সনে

পাঠাইয়াছে ২৬০ লক্ষ গজ। জর্মাণ এবং জাপান কাপড়ের আমদানি কমিয়াছে ১৪,৩০ লক্ষ গজ, মূল্য-হ্রাস ০,৬১ লাখ টাকা। নানা প্রকারের সুতার আমদানি ৪৬৪ লাখ পাউণ্ড (৬৫৪ লাখ টাকা) হইতে ৩২০ লাখ পাউণ্ডে (৭,৬১ লাখ টাকা) নামিয়াছে। সুতার বেলায়ই বিলাতের অবস্থা বিশেষ কাহিল। চীন দেশ হইতে সুতার আমদানি কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। নকল রেশমের সুতার আমদানি কমিয়াছে ২০ লাখ পাউণ্ড, দাম কমিয়াছে ৪১ লাখ টাকা। তুলার এবং নকল রেশমের কাপড়ের আমদানি ৪৭০ লাখ পাউণ্ড হইতে ৫৪০ লাখ পাউণ্ডে উঠিলেও মূল্য ২,৮৪ লাখ হইতে ২,৫৫ লাখ টাকায় নামিয়াছে। পশমী কাপড়ের আমদানি ১৩০ লাখ গজ (২,৩৭ লাখ টাকা) হইতে ৮০ লাখ গজে (১,৩০ লাখ টাকা) নামিয়াছে। বিদেশ হইতে তুলার আমদানি বাড়িয়াছে—বৃদ্ধির পরিমাণ ২৩,৫০০ টন (মূল্য ৩,৪৫ লাখ টাকা) হইতে ৩৭,১০০ টন (মূল্য ৪৫০ লাখ টাকা)। কেনিয়া উপনিবেশ, এবং মিসর হইতেই বেশী তুলা আসিয়াছে। এই দুই দেশ হইতে তুলা আমদানির পরিমাণ ১৯২৯ সনে এবং ১৯৩০ সনে ১৯৮০০; ২০০ এবং ২১,০০০, ৮,৬০০ টন। ১৯৩০ সনে লোহাসংকড় আমদানির পরিমাণ ৬৯৯,০০০ টন (১২,৬৮ লাখ টাকা) পক্ষান্তরে ১৯২৯ সনে আমদানি হইয়াছিল ১,০৭১,০০০ টন (১৮,৮৫ লাখ টাকা)। কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতি আমদানি ১৬ কোটী টাকা, অর্থাৎ পূর্ব্ব সনের তুলনায় ২ কোটী টাকা কম। আলোচ্য সনে ভারতবর্ষে রুশিয়া হইতে কেরোসিন তেল আমদানি বাড়িয়াছে; এইজন্য মোট আমদানিও বেশী হইয়াছে। ১৯৩০ সনে তেল আমদানির পরিমাণ ১০৮০ লাখ গ্যালন, মূল্য ৫,৯২ লাখ টাকা; এবং ১৯২৯ সনে ১০৩০ লাখ গ্যালন, মূল্য ৫৬৫ লাখ টাকা। পারস্য দেশ হইতেও তেল আমদানি কিছু বাড়িয়াছে; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া এবং জর্জ্জিয়া হইতে আমদানি কমিয়াছে। বীট ব্যতীত অন্য চিনি আমদানির পরিমাণ ১০০০০ টন বাড়িয়া ৮২৪,০০০ টন, কিন্তু মূল্য ৫৭৫ লাখ কমিয়া ১৪২৫ লাখ টাকা হইয়াছে। বীটের চিনির পরিমাণ-হ্রাস ৯৯,০০০ টন হইতে ৬৪,০০০ টন, মূল্য হ্রাস ১,৭৮ লাখ হইতে ৯১ লাখ টাকা। খাদ্য শস্য, কলাই এবং ময়দা আমদানির খাতে সব আমদানির রফা ঠাণ্ডা; আমদানি-হ্রাস ৭১০,০০০ টন (মূল্য ১০ কোটী টাকা) হইতে একেবারে ১৯১,০০০ টন (মূল্য মাত্র ২৪ কোটী টাকা)। আলোচ্য সনে মোটর গাড়ী আমদানির সংখ্যা কমিয়াছে ৭,০১৫ খানা, এবং মোট আমদানির সংখ্যা ১২,০১৭ খানা। ইহার মধ্যে বিলাত, মার্কিণ এবং ইতালি যথাক্রমে ৩,২০৫, ৪,৬২১ এবং ৯৩১ খানি যোগাইয়াছে। ১৯২৯ সনে এই তিন দেশের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৭২১, ১১,১৫৮, এবং ১,১৯৯ খানি। একমাত্র ক্যানাডা হইতেই মোটর গাড়ীর আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে—২,৪১৫ খানি হইতে ২৮৩৩ খানি। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বোতল-ভরা খাদ্য (—৪৩ লাখ টাকা), মূল্যবান প্রস্তর (—৪৯ লাখ টাকা), সিগারেট্ (—৫৪ লাখ টাকা), কাচ ও কাচের জিনিষ (—৭২ লাখ টাকা) এবং হার্ডওয়ার্ (—১১৫ লাখ টাকা) আমদানি কমিয়াছে। এনিলাইন্ ডাইজ্ আমদানিও কিছু কমিয়াছে।

মাসিক রপ্তানির পরিচয়

পৌনঃ ছাড়া তামাম চিজের রপ্তানি এবং পুনঃ রপ্তানির পরিচয় নিম্নের তালিকায় প্রকাশিত হইল :—

	ভারতীয় পণ্য রপ্তানি				বিদেশজাত দ্রব্য রপ্তানি			
	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)		১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)	
	হাজার টাকা	হাজার টাকা	হাজার টাকা	শতকরা	হাজার টাকা	হাজার টাকা	হাজার টাকা	শতকরা
জানুয়ারি	২৯,৭৫,৩৩	২৬,৩৬,২৬	−৩,১৯,০৭	−১১·০৭	৫৮,৫৫	৪৩,৮৪	−১৪,৫১	−২৪·৮৭
ফেব্রুয়ারি	২৭,৯১,৯৪	২৪,৩৯,৭৪	−৩,৫২,২০	−১২·৬১	৫৬,৮৯	৪০,৬৪	−১৬,২৫	−২৮·৫৬
মার্চ্চ	৩১,৩৯,০৮	২৭,৪৩,৪৫	−৩,৯২,৬৩	−১২·৫২	৫৪,৯০	৬৩,২৬	+ ৮,৩৬	+১৫·২৩
এপ্রিল	২৭,৩৭,০১	২৪,০৪,৩৭	−৩,৩২,৬৪	−১২·১৫	৭৪,৪৫	৫৩,১৪	−২০,৩১	−২৭·৪৫
মে	২৫,৭২,৮২	২১,৪৩,১৫	−৪,২৯,৬৭	−১৬·৭	৬৪,৮২	৪১,৪০	−২৩,৪৮	−৩৬·২২
জুন	২৬,১১,৫১	২০,১৪,৩৫	−৫,৯৭,১৬	−২২·৮৬	৪৯,৫৩	৪৬,৯০	− ২,৬৩	− ৫·৪২
জুলাই	২৪,৯৮,৬৩	২০,৫৬,৮২	−৪,৪১,৮১	−১৭·৬৮	৬৪,৪২	৩৯,২৩	−২৫,১৯	−৩৯·১
আগষ্ট	২৬,৭৩,৫৮	১৭,২৬,৫৪	−৯,৪৭,০৪	−৩১·৪২	৬৩,০১	৫৭,৫১	−২৫,৫০	−৪০·৪৭
সেপ্টেম্বর	২৫,৭৮,০৬	১৯,১৬,৫৩	−৬,৬১,৫৩	−২৪·৬৬	৪৯,২২	২৩,৮৫	−২৫,৫৭	−৪১·৯৫
অক্টোবর	২৫,৬২,৫৯	১৭,৮৮,৩৩	−৭,৯৪,২৬	−৩০·৯৯	৬০,৪৫	৪৬,২২	−১৭,২৩	−২৭·১৬
নবেম্বর	২৬,৭৯,৭৪	১৮,৭৯,৭৪	− ৯,৯৯,৭৫	−৩৭·৩৫	৫৪,১৭	৪৭,৭৯	− ৬,৩৮	−১১·৭৮
ডিসেম্বর	২৩,৩৭,৪১	১৬,৪১,৮৩	−৬,৯৫,৫৮	−২৯·৭৭	৭২,৮৯	৩৪,২৭	−৩৮,৬২	−৫২·৯৮
মোট	৩২১,৫৪,৪৪	২৪১,৮১,১১	−৮৯,৭৩,৩৪	−২১·৬৮	১,৩৫,১০	৪,২৭,৭৯	−২,০৭,৩১	−২৮·২

আলোচ্য সনের প্রথম চারি মাসে মাল রপ্তানি শেষের মাসগুলির চেয়ে বেশী হইয়াছে। মার্চ্চ মাসে রপ্তানি সব চেয়ে বেশী এবং ডিসেম্বরে সব চেয়ে কম। বৎসরের শেষের মাসগুলিতে রপ্তানি হ্রাস পাইবার কারণ এই যে, এই মাসগুলিতে কার্পাস ও পাট এই দুই চিজের তৈরী জিনিষ-পত্র, বীজ, লাক্ষা, চামড়া কম রপ্তানি হইয়াছে।

চিজ্ হিসাবে রপ্তানির পরিচয়

খাদ্য, পানীয় এবং তামাক রপ্তানি ১৩৪ লাখ টাকা বাড়িয়া ৬৬,৮৬ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। গম, চাউল, এবং ফল রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু চা রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। কারখানার উপযোগী কাঁচা মাল এবং তৈরী মাল ছাড়া অন্যান্য ধরণের মাল রপ্তানি ৪৯,৪৪ লাখ টাকা কমিয়া ১১,৫৩ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। রপ্তানি হ্রাস প্রাপ্ত মালের নাম সুতা, বীজ, লাক্ষা, খইল, চামড়া ও চর্ম্ম ইত্যাদি। কারখানার তৈরী মালের মধ্যে কাপাস ও পাটজাত দ্রব্য, টান করা চামড়া এবং চর্ম্ম কম রপ্তানি হইয়াছে। এই খাতে রপ্তানি-হ্রাসের পরিমাণ ২১ কোটী টাকা; এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ ৬৪ কোটী টাকা।

রপ্তানির হ্রাস-বৃদ্ধি

১৯২৯ সনের সহিত তুলনা করিয়া আলোচ্য সনে প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলির হ্রাস এবং বৃদ্ধির পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

বৃদ্ধি	টাকা
চাউল	৩,৪০,৮৪,২৯২
গম	১,৬১,৯৫,১৫৯
কফি	১,৪০,৬৮,৯১২
জোয়ার এবং বাজরা	২১,৮১,৬৩৮
মসলা এবং লঙ্কা	৭৬,৫৭,৪৩০
চা	৩,৩৪,১২,০২০
কাঁচা চামড়া	১,২৮,৪০,৬৬৩
রেড়ী	১৩,১৮,৩৭০
কার্পাস	৫০,৫০,৯৪৭
বাদাম	৭,৪০,৫১,৭০০
সর্ষপ	৬৮,৮৭,৭০০
তিল	৪৯,৯৮,৪৩৬
কাঁচা পাট	১৪,১৭,১১,২৭৭
কাঁচা কার্পাস	১১,৮১,৯১,২২৮
কয়লা	২৩,৬০,৪৬৫
ম্যাঙ্গানিজ্ ওর	৪৭,৬৪,৮২০
খইল	৬,৪২,৬৮,৮১৭
তুলার কাপড়	১,৬১,৮৭,৬৯৭
লাক্ষা	৩,৭৩,২৯,৬০১
চামড়া, স্কিন	১,৩৩,৭৯,৫৪৭
পশম	২,৩০,৯৯,০৬৮
রবার	৩৭,২০,২১৬
ট্যান করা চামড়া	২৭,৯৬,২১৪
স্কিন	৮০,৮৮,০৪৪
পাট, গানিব্যাগ	৪,৫৬,০১,৮৩১
পাটের কাপড়	১০,৫৪,৭৪,২১৬

আলোচ্য সনে কাঁচা পাট এবং পাটের তৈরী মাল দুইয়েরই রপ্তানি কমিয়াছে; রপ্তানি ৮৩ কোটী হইতে ৫৩ কোটী টাকায় নামিয়াছে। মোট ৩০ কোটী টাকার রপ্তানি কমিয়াছে। কাঁচা পাট রপ্তানি ৩০ কোটী টাকা মূল্যের ৮৫৭,০০০ টন হইতে ১৫৯ কোটী টাকা মূল্যের ৬২৬,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে। জার্মানি এবং বিলাত উভয় দেশেই পাট রপ্তানি কমিয়াছে। জার্মানি এবং বিলাতে যথাক্রমে ৮০,০০০, এবং ৭১,০০০ টন রপ্তানি কম হইয়া মোট রপ্তানি ১৭৭,০০০ টন এবং ১০৯,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে। গানিব্যাগ রপ্তানি ৫০৪০ লক্ষ, মূল্য ২২ কোটী টাকা হইতে ৪৮০০ লক্ষ এবং মূল্য ১৭ কোটী টাকায় নামিয়াছে। বিলাত, চীন, চিলি এবং কিউবা বাদে সব দেশে রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০, ১৭০, ১৫০ এবং ৮০ লক্ষ এবং মোটের রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪০, ৪১০, ২২০ এবং ২৮০ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে দরের দাম সস্তা হওয়ায় জার্মানি, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া বেলজিয়াম এবং নেদারল্যাণ্ডস্ অনেক বেশী দরে কিনিয়া লইয়াছে। গানি ক্লথ অর্থাৎ চট ২৩০০ লক্ষ গজ কম রপ্তানি হইয়া মোট ১৪,০৮০ লক্ষ গজ জাহাজ বোঝাই হইয়াছে। দামও ১১ কোটী টাকা কমিয়া ২০ কোটী টাকার পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং আর্জ্জেন্টিনা যথাক্রমে ৯৭১০ লক্ষ এবং ২১৫০ লক্ষ গজ চট কিনিয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য সনে এই দেশে চট রপ্তানি কমিয়াছে যথাক্রমে ৯০০ লক্ষ এবং ১২০০ লক্ষ গজ হিসাবে। ভারতীয় তুলা ৭০২,০০ টন (৫৬ কোটী টাকা) হইতে ৭২৭,০০ টনে (৫৫ কোটী টাকা) উঠিয়াছে। চীন দেশে চট রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের ৮২০০০ টন হইতে আলোচ্য সনে ১২৪,০০০ টনে উঠিয়াছে। বিলাত, নেদারল্যাণ্ডস্, ফ্রান্স, এবং স্পেন দেশে তুলা রপ্তানি বৃদ্ধি এবং জাপান, ইতালি ও বেলজিয়ামে হ্রাস পাইয়াছে। সুতা সম্বন্ধে ১৯২৯ সনে কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছিল বটে; কিন্তু আলোচ্য সনে আবার ভাঁটা পড়িয়াছে; ওজন ২৯০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২৩০ লক্ষ পাউণ্ডে এবং মূল্য ২২৫ লাখ টাকা হইতে ১৬৬ লাখ টাকায় নামিয়াছে।

কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানি ব্যবসায়ের অধোগতি পূর্ব্ব বৎসরেরই মত। আলোচ্য সনে রপ্তানি ১৩৬০ লাখ গজ (৫১৭ লাখ টাকা) হইতে ১০৩০ লাখ গজে (৩৫৫ লাখ টাকা) নামিয়াছে। পক্ষান্তরে চাউল রপ্তানি ২,০০০,০০০ টন (২৮,৫৫ লাখ টাকা) হইতে ২,৫১৯,০০০ টনে (৩২,২৩ লাখ টাকা) উঠিয়াছে। চীন দেশ

হইতে বেশী টান পড়ায় রপ্তানি এইরূপ কমিয়াছে। পূর্ব্ব সনের ৬৫,০০০ টনের স্থানে আলোচ্য সনে ৬৫৭,০০০ টন চাউল চীন দেশে গিয়াছে। বিলাত, বেলজিয়াম, ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট, সিংহল, সুমাত্রা এবং জাভা দ্বীপেও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে; পক্ষান্তরে জার্ম্মানি ও নেদারল্যাণ্ডসে রপ্তানি কমিয়াছে। গম রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া একেবারে ১৪,০০০ টন (২৪ লাখ টাকা) হইতে ১৯৪,০০০ টনে (১,৯৩ লাখ টাকা) উঠিয়াছে; বিলাত একাই গ্রহণ করিয়াছে ১৭৭,০০০ টন। অন্যান্য খাদ্য শস্যের রপ্তানি কমিয়াছে। বিলাত আলোচ্য সনে আর সেরূপ ক্রয় করে নাই; এজন্য চা রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে ২৩০ লাখ পাউণ্ড, মূল্য ৩,৩১ লাখ টাকা; মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩১৭০ লাখ পাউণ্ড; মূল্য ২৩,৪০ লাখ টাকা। কফি রপ্তানি কিন্তু খুব বাড়িয়াছে। ১০৩,০০০ হন্দর (৮৭ লাখ টাকা) হইতে একেবারে ৩১২,০০০ হন্দরে (২২৮ লাখ টাকা) উঠিয়াছে; এর মধ্যে বিলাতে ৯৯,০০ হন্দর এবং ফ্রান্সে ১১০,০০০ হন্দর। তৈল বীজের ব্যবসায় কিন্তু একেবারে মাটী; জাহাজ-বোঝাই কমতি ১৩,৪৯,০০০ টন হইতে ১,০১২,০০০ টন এবং মূল্য-হ্রাস ৩০,১০ লাখ হইতে ২০,০৯ লাখ টাকা। যসিনা রপ্তানি ১১,০০০ টন বাড়িয়া ২৫০,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে। মূল্য কিন্তু ৮ লাখ টাকা কমিয়া ৫,৭০ লাখ টাকায় পরিণত হইয়াছে। চিনাবাদামের খাতে রপ্তানি-হ্রাস ৮১৬,০০০ টন (১৯,০৫ লাখ টাকা) হইতে ৫৯০,০০০ টন (১১,৬৪ লাখ টাকা)। চিনাবাদাম খরিদকারী বড় বড় দেশের মধ্যে জার্ম্মানি ১২৬,০০০ টন কমাইয়া ১৩৮,০০০ টন, ইতালি ৬১,০০৯ টন কমাইয়া ৫৪,০০০ টন এবং ফ্রান্স ১৪,০০০ টন কমাইয়া ১৮৫,০০০ টন গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে নেদারল্যাণ্ডস্‌এ চিনাবাদাম রপ্তানি ১৯২৯ সনের তুলনায় ১০০০ টন বাড়িয়া ১৪৯,০০০ টনে পরিণত হইয়াছে। চামড়া এবং স্কিন রপ্তানিও কমিয়াছে। কাঁচা চামড়া রপ্তানি হ্রাস ৫৭,৬০০ টন (৮৭৬ লাখ টাকা) হইতে ৪৮,২০০ টন (৬১২ লাখ টাকা) এবং টানা করা চামড়া রপ্তানি হ্রাস ২০,৪০০ টন (৭৯৫ লাখ টাকা) হইতে ১৯,৪০০ টন (৩,৮৩ লাখ টাকা)। লাক্ষার চাহিদাও ১১৮,০০০ হন্দর কমিয়া ৫৭৯,০০০ হন্দর এবং মূল্য ৩৭৪ লাখ কমিয়া ৪০১ লাখ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ব্যালান্স্ অব্ ট্রেড্

নিম্নের তালিকায় ভারতের ট্রেডের পরিচয় প্রদত্ত হইল:

	১৯২৮ (লাখ টাকা)	১৯২৯ (লাখ টাকা)	১৯৩০ (লাখ টাকা)
ভারতীয় মাল রপ্তানি (রেলওয়ে)	+৩২৯,৫১	+৩২১,৫৫	+২০১,৮১
বিদেশী মাল পুনঃ রপ্তানি (ঐ)	+৮,৫৩	+৭,৩৫	+৫,২৮
বিদেশী মাল আমদানি (ঐ)	−২৪৫,৯০	−২৪৬,৯৪	−১৮৩,২৭
ব্যালান্স অব্ ট্রেড্ (ঐ)	+৯২,১৪	+৮১,৯৬	+৭৩,৮২
সোনা (প্রাইভেট্)	−২১,০৯	−১৭,৮৩	−১৫,৮০
রূপা (ঐ)	−১৯,৪৪	−১০,১৮	−১২,২৫
কারেন্সি নোট (ঐ)	−১৪	+২	−১৬
(প্রাইভেট) যৌথ সম্পর্কে ব্যালান্স অব্ ট্রেড্	−৩৫,৬৭	−২৭,৯৯	−২৮,২১
মোট ব্যালান্স অব্ ট্রেড্	+৫৬,৭৭	+৫০,৯৭	+৪৫,৬১
কাউন্সিল বিল, ষ্টার্লিং খরিদ এবং বিলাতে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য টাকা দান			
লণ্ডনে প্রেরিত ষ্টার্লিং ভারতে বিক্রয়			

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিসমূহ চালান		—২৫	—৯
গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সিকিউরিটির ভারতের উপর সুদ	—৩১	—৩৩	—৩০
কাণ্ড পরিশোধের খালাস	—৩৫,৫১	—৩২,০২	—৫,৫০

বৃটিশ ভারতের বন্দরসমূহে বিদেশ এবং বৃটিশাধিকৃত দেশগুলি হইতে আগত জাহাজসমূহের মোট টনেজের (রেজিষ্টার্ড টনেজ) পরিমাণ ১৯০০ সনে ৮,১৮৪,১৭২ টন এবং ঐ বন্দরসমূহ হইতে মাল লইয়া বিদেশে গমনকারী জাহাজসমূহের টনেজের পরিমাণ ৮,৩০৫,০৭০ টন। পক্ষান্তরে ১৯২৯ সনে আনীত ও প্রেরিত মালের টনেজের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,২২০,৮৪৩ টন এবং ৮,৮৩০,৪১০ টন। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে মাল আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কে টনেজ-হ্রাস পরিমাণ যথাক্রমে ৪% এবং ৬%।

মাল সম্পর্কে টনেজের পরিচয়

নিম্নলিখিত তালিকায় ১৯১৩, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে আমদানি এবং রপ্তানির মোট টনেজের তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

	১৯১৩ (যুদ্ধের আগেকার অবস্থা)		
বিলাতী জাহাজ (বৃটিশ ভারত সমেত)	৬,২৭৭,৮৫১	৬১৩,৬৭০	৫,৩৫৬,২১৮
বিদেশী জাহাজ	১,৯৩৫,৪৬৬	২,৬৯৭,৭৪০	২,৯৪৮,৮৫৫
মোট	৮,২১৩,৩১৭	৮,৮৩০,৪১০	৮,৩০৫,০৭৩

টনেজ সম্পর্কে ১৯৩০ সনে ১৯১৩ সনের তুলনায় ১% বৃদ্ধি এবং ১৯২৯ সনের তুলনায় ৬% হ্রাস দেখা যাইতেছে। ১৯১৩ সনে বৃটিশ টনেজ (বৃটিশ ভারত সমেত) ৭৬%, বিদেশী টনেজ ২৪% ১৯২৯ সনে বৃটিশ টনেজ ৬৯%, বিদেশী টনেজ ৩১% এবং ১৯৩০ সনে বৃটিশ টনেজ ৬৪% এবং বিদেশী টনেজ ৩৬%।

বিলাতী শিল্পের অবস্থা

বিভিন্ন শিল্প-সম্পর্কিত ৫৯৭টা বিলাতী কোম্পানীর ১৯৩১ সনের প্রথম তিন মাসের লাভ-ক্ষতির হিসাব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৫২৬টা কোম্পানীর হিসাব (কতকগুলি কোম্পানীর ১৯২৯ ও ১৯৩০ সনের হিসাব সমেত) নীচে দেওয়া যাইতেছে:

নিট লাভালাভ (ডিবেঞ্চার সুদ বাদ দিবার পর)

	কোম্পানীর সংখ্যা	কোন বৎসর প্রকাশিত		বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)	
		১৯২৯ (পাউণ্ড)	১৯৩০ (পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	%
প্রথম তিন মাস	৫১৬	৬,০৮,৮৮,৪৯৭	৬,২০,২১,৩৩৭	+১১,৩২,৮৪০	+১·৯
দ্বিতীয় ,,	৫৭৮	৭,৩৪,২৪,৪১১	৭,৯৭,১৭,৩৯৩	+৬২,৯২,৯৮২	+৮·৬
তৃতীয় ,,	৩১৯	২,৫২,৩২,৪৮৬	২,৫৬,২৬,৫১২	−১৮,০৫,২৮৪	−৮·৪
চতুর্থ ,,	৫০৯	৩,১২,৭২,৩৭৭	৩,২১,৭৪,৮৭৭	−৭০,৯১,৭০০	−১৮·১
	১,৯৩২	১৯,৮৮,১৭,৭৭১	১৯,৭৫,৩৯,৯০৯	−১২,৭৭৮৬২	−০·৬
		১৯৩০	১৯৩১		
প্রথম তিন মাস		৭,৫৮,১৬,৪৭৪	৬,৭৭,৩৬,২২৬		

১৯৩০ সনের চতুর্থ তিন মাসের তুলনায় ১৯৩১ সনের প্রথম তিন মাসের অবস্থা ভাল, কিন্তু গত বৎসর এই তিন মাসে এর চেয়ে অবস্থা অনেক ভাল ছিল, দ্বিতীয় তিন মাসের অবস্থা রীতিমত ভাল ছিল।

৫৯৭টা কোম্পানীর কয়টা কোন্ শিল্পের অন্তর্গত এবং বিভিন্ন শিল্পের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ ১৯৩১ সনের প্রথম তিন মাসে কিরূপ ছিল তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

নিম্নের তালিকা হইতে বৃটিশ শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ ও পাওয়া যাইবে। নিম্নোক্ত তালিকা প্রকাশিত হইবার পর কুর্ণাড জাহাজ কোম্পানী, ইউনাইটেড মোলাস ও মরিস্ মোটরের লাভ-ক্ষতির হিসাব পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় এবৎসরের প্রথম তিন মাসে হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪·২%।

শিল্পের নাম	কোম্পানীর সংখ্যা	মিটু মুনাফা		বৃদ্ধি(+) বা হ্রাস(−)
		১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	
		পাঃ	পাঃ	%
তাঁতিখানা		১৭,৯১,৫৫৬	১৮,০৪,১৯৬	+০·৯
খাল ও ডক		৫,৬১,২৭৫	৪,০৮,৭০৪	−২৭·৯
বিজলী বাতি ইত্যাদি		৬০,৪৭,৭৫০	৬৫,০০,৫১১	+৭·৫
টাকাকড়ি জমিজমা, ইত্যাদি		১০,৮৬,৪৮৯	৯,৫৪,১৪৫	−১০·৫
গ্যাস		৩৪,৭৭,৯১১	৩৬,০৮,২২৮	+৩·৭
হোটেল ইত্যাদি		২,৯৮,৯৮৭	২,৫২,৫১৪	−১৫·৫
লোহা কয়লা ও ইস্পাত		৩১,১০,৯৫৯	২৭,৬০,৭৬৪	−১১·২
মোটর ও সাইকল্		২৮,৭৮,৬৩৯	২৪,৭৪,৪৪৪	−১৪·০
নাইট্রেট্		৭৪৮১০	১,৫৪,১২৮	−৩৩৭·৯
তৈল		৩,০০,০৮৩	১,৯৯,৩৪৭	−৩৩·৫
রবার ইত্যাদি		৫,৩৮,৬০৭	৫৬,৪১৭	−১১০·৫
জাহাজ		১১,৪১,০১৯	৩,০৪,৫৪৮	−৭৩·৩
দোকান ও ষ্টোর	৩৬	৫৮,১৫,৪২৬	৫৫,০৩,৪১৯	−৪·৪
চা	৩	৮০,৯৯৫	৬১,৪৮৩	−১৯·০
টেলিগ্রাফ	৩	৪ ৫৩,৯৩০	৪,২৭,৫০৫	−৫·৮
বয়ন-শিল্প	২৮	৫৬,৯৫,১৮৬	২৪,৫০,০২৩	−৫৫·০
ট্রামওয়ে ইত্যাদি	৭	৫,৪৭,৮৯৪	৬,০৬,৫৪২	+১০·৭
সস্য	৭০	৪২,১৩,৫৯৬	৪৩,১৫,৩০৭	+১·৯
জলের কল	১৬	৭,৫২,৯০০	৭,৬৬,৭৬৪	+১৮
অন্যান্য	২১৩	৩,৮০,৫৫,৮৭৮	৩,৩৪,২০,৫২৪	−১১·৮
মোট	৪৯৭	৭,৭৮,৭৯,৭৭৩	৬,৭৮,১২,৪৮৭	−১২·৯

১৯২৫ সন হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত সময়ের মিটু মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধির বহরটা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ঃ

	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১
	%	%	%	%	%	%	%
প্রথম তিন মাস	+৯·১	+৭·৬	−৪·০	+১৫·২	+১·৫	+১·৯	−১০·৬
দ্বিতীয় ,,	+১১·১	+৮·৩	−৫·৭	+১·৩	−০·৭	+৮·৬	
তৃতীয় ,,	+৪·৮	+২·৮	+২·৪	+৯·৭	−৩·০	−৬·৪	
চতুর্থ ,,	+৮·৪	+৩·৮	+০·৩	+৩·১	+১·৪	−১৮·১	
বাৎসরিক	+৮·৭	+৬·৩	−৩·০	+৭·২	+০·০	−০·৬	

গত পাঁচ কোয়ার্টার ধরিয়া লিট্ মুনাফা বিভিন্ন খাতে কি ভাবে বিতরিত হইয়াছে তাহা নীচের অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে।

	লিট্ মুনাফা	সাধারণ লভ্যাংশ		বিশেষ লভ্যাংশ		মৌজুত ইত্যাদি	
১৯৩০	পাঃ	পাঃ	%	পাঃ	%	পাঃ	%
প্রথম তিন মাস	৪,২০,২১,৫৩৭	৩,৮৪,০৮,২৮২	৬১·৯	১,২২,৫৩,৪২০	১৯·৭	১,১৩,৭৯,৪৩৫	১৮·৪
দ্বিতীয় ,,	৭,২৭,১৭,৩২৩	৪,৫০,৪৫,১০৫	৫৮·৫	১,৯৮,৪৮,৩৭৫	২৪·৯	১,৪৮,২৩,৯১৩	১৮·৬
তৃতীয় ,,	২,৩৬,২৬,৫০২	১,৪৮,৩০,৪৫৭	৬২·৮	৪৪,৮৯,২২৫	১৮·৯	৪৩,২৬,৮২০	১৮·৩
চতুর্থ ,,	৩,২১,৭৪,৬৭৭	২,০৭,৬৬,২২৯	৬৪·৪	৬৫,৬৪,৭৯০	২০·৪	৪৮,৪৩,৫৮৮	১৫·১
	১৯,৭৫,৩৯,৯০৯	১১,৯০,৫০,১৪৩	৬০·২	৪,০১,১৫,৯১০	২১·৯	৩,৫০,১৩,৮৫৬	১৭·৯
১৯৩১							
প্রথম তিন মাস	৩,৭৭,৩৬,২২৬	৪,২০,৪৩,২৪৩	৬২·১				

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, মৌজুতের পরিমাণ কিছু কমিয়া গেলেও প্রথম তিন মাসে মোটামুটি বেশী লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে। অবশ্য শুধু উপরের অঙ্ক দেখিয়া বিভিন্ন শিল্প অথবা কোম্পানী সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই কথা আজ বলা চলে যে, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনেও বিলাতী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ অংশীদারদের একেবারে নিরাশ করে নাই।

আহাজী ব্যবসায়ে ক্ষতি

কুনার্ড যাহাজ কোম্পানী বেশ বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান। দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া এ কোম্পানীও বিশেষ লাভের আশা করে নাই। কিন্তু যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল অবস্থা তার চেয়েও খারাপ দাঁড়াইয়াছে। নীচের তালিকা হইতে তার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

		১৯২৯	১৯৩০
		পাউণ্ড	পাউণ্ড
মূল আয়		৩৬,২৮,৯০৫	২৬,৬২,৫৯১
ব্যয়		১৫,৬৬,৩৮৫	২৪,১১,৭৪৫
ডিস্‌কাউন্ট ও কমিশন	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
ডিবেঞ্চার সুদ ইত্যাদি	২,৪১,০৫২	২,৪২,৮৮১	২,২২,০৫০
লিট্ মুনাফা	৫,৫০,৪৭৮	৮,০৯,৬০৯	১৮,৬০১
পূর্ব্বের জের	১,১০,৬৮৯	১,৮৮,৩৯৭	৩,৯৫,২৬৬
বিশেষ লভ্যাংশ	১,৩৫,০০০	১,৩৫,০০০	১,৩৫,০০০
কতবার 'কাভারড্' হইয়াছে	৪·১	৬·০	
সাধারণ পুঁজিপাটা			
অর্জ্জিত পাউণ্ড			
শোধিত পাউণ্ড			
অর্জ্জিত %			
শোধিত %			
মৌজুত			...
জের	১,৮৮,৩৯৭		২,৭৮,৮৬৭

ইউনাইটেড্ মোলাস্ কোম্পানী

১৯৩০ সনে এই কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানী ওয়েষ্ট ইণ্ডীজের আখে আমেরিকা ও ইয়োরোপের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে মিটিবে না মনে করিয়া আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচী হইতে ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত যোগান আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাই কোম্পানীর কাল হইয়াছে। উৎপাদকদের কাছ থেকে খাদকদের কাছে বহিয়া লইবার জন্য ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হয় জাহাজের জন্য, আর ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হয় নজুত করিয়া রাখিবার যথোচিত ব্যবস্থা করার জন্য। আমেরিকায় এই চিনের বাজার একেবারে পড়িয়া যাওয়ায় ও অন্যান্য কারণে (মোলাসের দর-হ্রাস তন্মধ্যে একটি) কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া ১০,৩৭,৪২০ পাউণ্ড বরবাদ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইয়াছে। কী শুদ্ধ মোট আদায় তিন বৎসরে নিম্নরূপ হইয়াছিল :

১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
পাঃ	পাঃ	পাঃ
২,৬৩,৪৪৮	১২,৯৬,২৯৭	৪,৪৪ ২৯৭

আর কোম্পানী চালাইবার খরচা, জাহাজের ভাড়াসহ :

৩০,১৬৫	৪২,২৬০	৬১,৮৯২
৬৬,১৭০	১০৬,৮৭৯	১৫৫,২৭৯

ডিবেঞ্চার সুদ, আয়কর, বিশেষ লভ্যাংশ একত্রে নিম্নরূপ :

১,৩১,০২১	৯,৮২,১৪৭	১,০০,৮০

মরিস মোটরস্ লিমিটেড্

ছনিয়াব্যাপী দুর্যোগ সত্ত্বেও মরিস মোটর কোম্পানী ১৯৩০ সনে ভাল ফল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। গোটা বৎসরে মুনাফা, বাণিজ্য এবং সুদ সমেত আদায় হইয়াছে ১৩,০৩,৩০৮ পা, ১০ শি, ৪ পে (সম্পত্তির ভাঙ্গন ও অন্য সমস্ত বিপদের জন্য অংক বাদ দিয়া)। কন্টিন্‌জেন্সি রিজার্ভ অর্থাৎ অসময়ের জন্য মৌজুতের পরিমাণ ৫,১৭,০২০ পা, ১৮ শি, ৯ পে, ইহার মধ্যে সরকারী সিকিউরিটির ভাঙ্গনবৃদ্ধির দরুণ ১,১৪,৩৮২ পা, ৮ শি, ৭ পে আছে। ১৩ লাখ পাউণ্ডের উপর যে অংক উপরে দেওয়া হইয়াছে তার সঙ্গে যোগ করিতে হইবে গত বৎসরের আনীত জের বাবদ ১,১৮,৭৪৩ পা, ৩ শি, ৪ পে এবং ইনভেষ্টমেণ্ট বিক্রয়-লভ্য ৯,৪০৭ পা, ৫ শি, ১ পে। সুতরাং মোটটা দাঁড়ায় ১৪,৩১, ৪৬৮ পা, ১৮ শি, ৯ পে। ইহা হইতে বিশেষ লভ্যাংশ বাবদ ২,২৫,০০০ পা, ও আয়কর বাবদ ২,৫৭,৩১৩ পা, ১৭ শি, ৬ পে বাদ দিলে উদ্বৃত্ত থাকে ৯৪৯,১৫৫ পা, ১ শি, ৩ পে। রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ লাখ পাউণ্ড ও ১০% লভ্যাংশ বিতরণ ঘোষণা করা হইয়াছে। ৩৯১,০৪১ পা, ৪ শি, ১ পে পেটেণ্ট ইত্যাদির জন্য ও ১ লাখ পাউণ্ড আয়করের জন্য নজুত রাখা হইয়াছে। আগামী বৎসরের জের থাকিবে ২,৫৮,১১১ পা, ১৭ শি, ২ পে।

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	পা	পা	পা
নিট্ মুনাফা	১০,৫৬,৮৫৩	১০,৩৯,১১৮	১০,৫৫,৪০২
বিশেষ লভ্যাংশ	২,২৫,০০০	২,২৫,০০০	২,২৫,০০০
কতবার কাভার্ড্	৪·৬৯	৪·৬২	৪·৬৯
সাধারণ লভ্যাংশ পরিমাণ			
অর্জ্জিত%			
শোধিত%			
ওভটইল, পেটেণ্ট ইত্যাদি			
রিজার্ভ ফণ্ড	২,০০,০০০		
আয়কর-রিজার্ভ			
জের			

বৃটিশ উৎপাদন-সূচীসংখ্যা

১৯২৪ সনকে ১০০ ধরিয়া ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনের উৎপাদন-সূচীসংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১
জানুয়ারি-মার্চ্চ	১০৫·৭	১০৮·৩	১০৯·৬	৮৪·৮
এপ্রিল-জুন	১০৩·৭	১১১·০	১০০·২	
জুলাই-সেপ্টেম্বর	৯৫·৪	১০৮·২	৯০·৭	

অক্টো-ডিসেম্বর	১০৪·২	১১৪·৮	২২·৭	...
গড়	১০২·৫	১১০·৬	২৮·৫	

১৯৩০ সনে উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছিল বুঝা যাইতেছে। আরও বুঝা যাইতেছে যে, ১৯৩১ সনের প্রথম তিন মাসে উৎপাদন যত কমিয়াছে গত তিন বৎসরের আর কোন সময়ে তত কমে নাই।

ইংলণ্ডের মাছ ধরা ও মাছ আমদানি

১৯৩০ ও ১৯৩১ সনের প্রথম তিন মাসে কত ওজন ও মূল্যের মাছ বৃটিশ জাহাজে ও বিদেশী জাহাজে আমদানি-রূপে আসিয়াছে তার তালিকা কৃষি ও বৎস্য মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা এই :

	ওজন (হন্দর)		মূল্য (পাউণ্ড)	
	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩০	১৯৩১
ইংরেজরা ধরিয়াছে—				
ইংলাণ্ড ও ওয়েল্‌স্			৫২,৪৫,২৮৩	৫১,১৯,৩৪৪
স্কটল্যাণ্ড			৯,২৩,৪৫০	৮,৩৭,৮৭৪
শেলফিস্			৭৫,৪৬০	৬৩,৭৪৩
মোট	৩৮,১৯,০১৭	৩৭,০৮,২২৭	৬২,৪৪,১৯৩	৪০,২০,৯৮৩
বিদেশীদের ধৃত	৩,৫৯,৩৪০	৩,২৩,৩২৪	২,৪৯,৪৫০	২,৭২,৩৯৭
আমদানি	৮,০৬,০১৮	৬,৪৩,৪২৭	১০,২৬,১৪৩	৮,৭৫,৫৩২

গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের অবস্থা অল্প খারাপ হইয়াছে। মাছ খাওয়া বিষয়ে ইংরেজদের খাতিরটা বলিতে হইবে। ইংলাণ্ডে এই বৎসরে প্রায় তিন মাসে হন্দর প্রতি ২২ শি, ১০½ পে পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল ২৩ শি, ৭ পে। স্কটল্যাণ্ডে ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনের দর যথাক্রমে ১৭ শি, ১ পে ও ১৬ শি, ৭½ পে। বিলাতে মাছ বা মাছজাতীয় চিজ বেশী পাঠাইয়াছে নরওয়ে, ডেন্মার্ক ও হল্যাণ্ড। ইংলাণ্ডে মাছ রপ্তানিও করে। ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনের প্রথম তিন মাসের রপ্তানির নমুনা : ৩২৩,৪৪৪ ও ৩৫৭,১২৩ হন্দর, দাম ৩০৫,৮০২ ও ৩৬১,৪০৯ পা. স্টার্লিং মাছ পাঠানো হইয়াছে যথাক্রমে ১২,৭১,৫৭৬ পা ও ৮৭১,৪৪৮ পা মূল্যের। পোল্যাণ্ড ও জার্মানি প্রধান খরিদ্দার—ঐ চিজ কিনিয়াছে ১৭৬,০৮২ পা, ও ৯২,০৪৮ পা মূল্যের। ক্যানড্ ফিস—১২,৩৭,৪১৭ ও ৮৬৯,৪১৫ পা মূল্যের।

কোন্ দেশ কত চা খায়

১৯২৯ সনে কোন্ দেশ মাথা পিছু কত চা খাইয়াছে তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

যুক্তরাজ্য	৯·২০ পা
অষ্ট্রেলিয়া	৮·১৫ ,,
ক্যানাডা	৪·১০ ,,
নিউজীল্যাণ্ড	৭·৯০ ,,
হল্যাণ্ড	৩·১০ ,,
যুক্তরাষ্ট্র	০·৭৫ ,,
জার্মানি	০·১৮ ,,
ফ্রান্স	০·০৮ ,,
রুশিয়া	০·৩০ ,,
ভারতবর্ষ	০·১৮ ,,

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, দুনিয়ায় এখনো

যথেষ্ট চায়ের বাজার আছে, সুতরাং চা-ব্যবসায়িগণের নিরাশ হইবার কারণ নাই। উপরোক্ত দ্রব্যাদি হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশগুলি গড়ে লোক-পিছু ৪'১০ পাঃ করিয়া চা খাইতে আরম্ভ করিলেও এখনো অনেক চায়ের দরকার হইবে। কফির চাষ বাড়িলেই যে চা খাওয়া কমিয়া যাইবে তা নয়। কারণ দুধ্যাদি খুব অধিক পরিমাণে কফি আমদানি করিলেও চা কম খায় নাই।

পুঁজিনিষ্ঠ জার্ম্মাণ গণতন্ত্র

জার্ম্মাণির "ইনষ্টিটুট ফুরের কোন যুক্তিযুক্ত কোনতত্ত্ব" নামক প্রতিষ্ঠান ১৯২৪-২৮ সনে ঐ দেশে যত পুঁজিপাটা সঞ্চিত হইয়াছে একটা হিসাব করিয়া তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ধনাঢ্য সঙ্ঘের চেয়েও পুঁজিপাটা সঙ্ঘের তথ্য বেশী ঠিকভাবে জানা সম্ভবপর। ইহার মতে পুঁজিপাটার (টাকাকড়ি ব্যতীত) রূপ নিম্নরূপ :

	কোটি মার্ক
	৮২০
	১২০
	২৭০
	১১৫০
	৯৯০
মোট	৩৯০০

এই ৩৯০০ কোটি মার্ক পুঁজিপাটার কোন্ শিল্পের হিস্যা কিরূপ তাহা নীচের তালিকায় দেখানো যাইতেছে।

খাদ্য উৎপাদন	৬০২'৫	কোটি মার্ক
বস্ত্র নির্ম্মাণ	৫০৪'৯	"
অন্যান্য খাদন শিল্প	৩৮৩'০	
উৎপাদন-সহায়ক শিল্প	৫৮৯'২	"
বিদ্যুৎ, গ্যাস্ ও জল	২৯৫'৮	"
যানবাহন	৬১৩'২	
ঘরবাড়ী	৫৪০'৮	"
শিক্ষা ও হিতসাধন	২৪০'৮	"
সরকারী চাকুরী	১৩৪'০	"

যুক্তরাষ্ট্রে ঘরের উত্থানপতন

পাইকারী ঘরের সূচী-সংখ্যা

	১৯২৬=১০০'০
	মার্ক
	১৯৩০
সমস্ত জিনিষ	৯০'৮
ক্ষেত্রজাত দ্রব্য	৯৪'৭
খাদ্য দ্রব্য	৯৩'৯
হাইড ও চামড়ার দ্রব্য	১০৩'২
বস্ত্র-শিল্প	৮৬'৫
জ্বালানি ও উজ্জ্বাতীয় দ্রব্য	৭৭'৪
ধাতু ও ধাতব দ্রব্য	১০০'৬
ঘরবাড়ী-নির্ম্মাণের দ্রব্য	৯৫'৩
কেমিক্যাল ও ড্রাগ	৯২'২
আসবাব ও সজ্জা (ঘরের)	৯৬'৪
বিবিধ	৭৮'২
কাঁচা মাল	৮৯'৩
আধা-শিল্পজাত দ্রব্য	৯০'৬
তৈয়ারী দ্রব্য	৯২'০
কৃষি দ্রব্যাদি	৮৯'৮

যুক্তরাষ্ট্রে রেলওয়ে খরচা ৮৭½ কোটি ডলার

যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহ গত ৮ বৎসর ধরিয়া কিরূপ টাকা খাটাইয়াছে তার হিসাব এই :—

		ডলার
১৯২৩		১০৫,৯১,৪৯,০০০
১৯২৪		৮৭,৪৭,৪৪,০০০
১৯২৫		৭৪,৮১,৯১,০০০
১৯২৬		৮৮,৫০,৮৬,০০০
১৯২৭		৭৭,১৫,৫২,০০০
১৯২৮		৬৭,৬৬,৬৫,০০০
১৯২৯		৮৫,৫৭,১১,০০০
১৯৩০	(অনুমান)	৮৭,৫০,০০,০০০

উত্তমর্ণ ফরাসী দেশ

বর্তমান সময়ে অনেক দেশেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই দুর্দিনেও ফ্রান্স অন্য দেশকে ঋণ দান করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না। উপনিবেশগুলির উন্নতি-সাধনের কথাও তাহার মাথায় খেলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে এ বৎসর নিম্নলিখিত ঋণগুলি দেওয়া হইয়াছে :—

	কোটি ফ্রাঁ
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১৫৭·০
ইন্দো-চীন	১২৫·০
মাদাগাস্কার	৭০·০
ফরাসী টোগোল্যাণ্ড	৬·৫
ক্যামেরুন্	১·৫
নিউ কালিডোনিয়া	১·৫

মরক্কো, টিউনিস্, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়াকেও ঋণ দিবার কথা চলিতেছে, অথবা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। উপনিবেশগুলিকে মাত্র ৩·৬ কোটি পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এখনো ফ্রান্সে প্রভূত অর্থ খাটাইবার জন্য পড়িয়া আছে।

১৯৩১ সনের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফ্রান্স ইংলণ্ডকেও অনেক টাকা ধার দিয়াছে।

দুনিয়ায় রেঁড় উৎপাদন

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নষ্ট চিজ্ বাদ দিয়া কত কোটি পাউণ্ড রেঁড় সূতা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব এই :—

সন	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	ফ্রান্স	জাপান	দুনিয়ার উৎপাদন		দুনিয়ার পাদন
						মোট	বৃটিশ %	
১৯১১						১৪·১	১৭·২	—
১৯২০						১৭·৩	১৫·৩	—
১৯২১						২১·২	১১·৬	—
১৯২৬						২৬·৭	১৪·৫	২৭·৫
১৯২৭						৫৪·৭	১৫·০	৩২·৮
১৯২৮						৪০·৩	১৩·২	৩৯·৮
১৯২৯						৩৮·১	১২·১	৩৬·৮

দুনিয়ায় ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে রেঁড় উৎপাদন কমিয়াছে ১·৪ কোটি পাউণ্ড। দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ছাড়া কোন দেশের উৎপাদন কমে নাই। উহাদের ক্ষতি যথাক্রমে ২·২ কোটি পাউণ্ড ও ·৬ কোটি পাউণ্ড। জাপানের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে, ইতালির বাড়িয়াছে ·৬ কোটি পাউণ্ড। ফ্রান্স ও জার্মানির কিছু কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯২৩ সনের তুলনায়ও ইংলণ্ডের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে।

বৃটিশ উৎপাদনের সূচীসংখ্যা

১৯২৪ = ১০০

	১৯২৮	১৯২৯
১। খনি ইত্যাদি	৮৯·২	৯৬·৮
২। লোহা ও ইস্পাত শিল্প		
৩। বাস্তব শিল্প		
৪। ইঞ্জিনিয়ারিং ও জাহাজ নির্মাণ	১১৩·১	১২১·০	১১৮·৭
৫। বয়ন-শিল্প	৯৯২·৯	৯৮·৫	৭৯·৩
৬। রাসায়নিক শিল্প	১১০·৩	১১৫·৮	১০১·২
৭। কাগজ ও ছাপা	—	—	—
৮। চামড়া, বুট ও জুতা	১০২·০	৯৮·৫	১০১·৪
৯। খাদ্য-পেয়-তামাক	১৯১·৯	১০৬·০	১০৪·৯
১০। গ্যাস ও বিজলী	১২৬·০	১৩৫·৮	১৩৯·৭
২ হইতে ১০ পর্য্যন্ত	১০৯·৪	১১৫·৫	১০৬·৩
১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত	১০৪·৫	১১১·৮	১০৩·৩

বিলাতী বহির্ব্বাণিজ্যের হেরফের

আমদানি রপ্তানি বাবদ টাকা পয়সার লেনদেন (পণ্য, সুদ, অন্য দেশে কাজ ইত্যাদি সুদ) কিরূপ হয় তাহা বিলাতী বোর্ড অব্ ট্রেড্ জার্ণ্যালে প্রকাশিত বিবরণী হইতে কতকটা আন্দাজ করা যায়।

যুক্তরাজ্যের অন্যান্য দেশের সহিত সম্বন্ধজনিত আয়-ব্যয়ের পরিমাণ (ধার দেওয়া ও ঋণ শোধ করা ধরা হয় নাই) :

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩১
	(কোটি পাউণ্ড)		
পণ্য আমদানির আধিক্য বশতঃ	৩৫·২	৩৮·২	৩৮·৭
সোনারূপার আমদানি (+) রপ্তানি (−)			
পণ্য ও সোনারূপা আমদানির আধিক্যবশতঃ	৩৫·৮		
সমুদ্রপার হইতে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত আয় (অনুমান)			
জাহাজী ব্যবসা হইতে নিট্ জাতীয় আয়	১৩·০	১৩·০	
সাগর পারে টাকা খাটাইয়া নিট্ আয়	২৭·০	২৭·০	
অন্যান্য বিভাগের সুদ ও কমিশন হইতে নিট্ আয়	৬·৫	৬·৫	৫·৫
অন্যান্য দিক্ হইতে নিট্ আয়	১·৫	১·৫	১·৫
মোট	৪৯·৪	৫০·৪	৪৩·১
সুতরাং উপরি লিখিত হিসাবসমূহে মোট ক্রেডিট্ ব্যালান্স			

ইংরেজদের বাৎসরিক ব্যয়ের হিসাবনিকাশ

গত মার্চ্চ মাসের ইকনমিক জার্ণ্যাল পত্রিকায় এক ব্যক্তি ইংরেজরা ১৯২৪-২৭ সনে কি কি বাবদ কত টাকা বৎসর পড়ে খরচ করিয়াছে তার হিসাব দিয়াছেন। তাহা এই :

	কোটি পাউণ্ড
খাদ্য	১২১·৭
ঘরভাড়া	৪১·৪
কাপড়চোপড়	৪৩·৬
প্রত্যক্ষ কর	৩৭·৫
মদ	৩১·৮
ভ্রমণ	২৪·০
তামাক	১১·৬
আমোদপ্রমোদ ও খেলা	৮·৫
ব্যাধি, দুর্ব্বিপাক ও বীমা	৮·৩
বস্ত্র	৪·২
পাঠ	৩·৭৫
বিবিধ	১৪·০
সঞ্চয় (নূতন বাড়ী ও আসবাব সুদ্ধ ৯·৬)	৪০·০
হিসাব পাওয়া যায় না	১৮·৫০
মোট	৪১৮·৮

ডানলাপ্ রবারের হিসাব

ডানলাপ্ কোম্পানীর ব্যবসার নিট্ মুনাফা ১৯৩০ সনে দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১১,৬০,৪৭৮ পাউণ্ড। গত বৎসর ছিল ২২,২৬,৬১২ পা। অর্থাৎ লাভের অঙ্ক প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। অংশের দর পড়িয়া গিয়াছে। ঘনিষ্ঠব্যাপী ভাঁটাতেই কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি হইতেছে। গত তিন বৎসরের লাভক্ষতির হিসাব এই :

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	পা	পা	পা
মুনাফা	১০,৫০,১৪৪[১]	২২,২৬,৬১২	১১,৬০,৪৭৮
জের	২০,১৮,৫৮০[২]	৮,০১,২৭৮	৭,৮২,৩২৮
	৩১,২৮,৭২৪[১]	৩০,২৭,৮৯০	১৯,৪২,৮০৬

১ ওপর্ক্ষর ও ডিরেক্টারের ফী বাদ দিয়া।

২ সেনারেল রিজার্ভের ১৫ লাখ পাউণ্ড সুদ্ধ।

ঋণদার		২,২০,৮৮৮	২,১১,২৬৪
ডিরেক্টারের ফী		৮,১২০	৮,০০০
ঋণের সুদ		৪,২১,০১৯	৩৯৯,৭৮৯
বন্ড রিডার্ড		২,২৫,৭৬১	১,০০,০৩১
বিশেষ লভ্যাংশ		২,২৪,০১১	২,২০,৮২৫
সাধারণ লভ্যাংশ			
অর্জ্জিত	৩·৪%		২·৫%
প্রোথিত	২০%		৬%
ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ			
জেনারেল রিজার্ভ			
ধাতের জের			

ইংরেজের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

নীচের দুইটি তালিকায় ১৯১৩, ১৯২৮, ১৯২৯ ও ১৯৩০ সনের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা দেখানো হইতেছে।

(ক) বিভিন্ন দেশ হইতে ইংল্যাণ্ডে আমদানি

	১৯২৮	১৯২৯		
	(হাজার পাউণ্ড)			
রুশিয়া	৪০,২৭১	২১,৫৭৮	২৬,৭৮৭	৩৪,২৪৫
ফিন্‌ল্যাণ্ড		১৩,২৪০	১৪,৯৪৫	১২,৬৭১
এস্তোনিয়া		২,২৭২	২,৪৯৭	১,৯৯২
লাত্‌ভিয়া		৫,৭৪৮	৫,৪৬৭	৪,৮৩৬
সুইডেন	১৪,২১৩	২২,০৫০	২৫,৭০৯	২২,৪৮৫
নরওয়ে	৭,৪০৭	১২,০১৩	১৪,১৪৯	১১,৯১৬
ডেন্মার্ক	২৪,০৫৩	৪৩,০৬১	৫৬,২১১	৫৪,১০৮
পোল্যাণ্ড		৫,৭৮১	৬,৯০৮	৭,৯৫৭
জার্ম্মাণি	৩০,৯৯৮	৬৩,৭২৬	৬৮,৮১৮	৬১,৩৪১
নেদারল্যাণ্ডস্	২৭,৯১৩	৫৮,৭২২	৬০,৩০২	৫২,৫২২
বেলজিয়াম	২৩,৪২৬	৪৩,৮৭৬	৪৪,২৯৭	৫৮,৫৮৯
ফ্রান্স	৪৯,৪৯৮	৬৭,২৫২	৬৩,৪৭৪	৫৪,৬৪৯
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	১১,০৭০	১৪,৫৬১	১৩,৭৪১	১২,৬৪০
পর্ত্তুগাল	৩৮৯৫	৪,৬৯২	৫,৪২৯	৪,৬৫৩
স্পেন	১৫,৯৭৬	১১,৭৮৪	১২,০৬৩	১৯,৪৯১
ইট্যালি	৮,১৩১	১৫,৮১৫	১৬,৮৭৭	১৫,০৬৯
অষ্ট্রিয়া	৭,৭০৬	২,৩১৯	২,৭৮২	৩,০৬৮
হাঙ্গেরি		৫৬৮	৭২০	৯৯৬
চেকোশ্লোভাকিয়া		৮,১৮৯	৬,৬৭৬	৬,৩২৩
গ্রীস ও ক্রীট	২,১০২	৩,২৬২	২,৭৪২	২,১৮৬
রুমানিয়া	২,০৩৭	১,৭৬৩	২,৯৬৫	৪,৭২৭
তুরস্ক	১,১৬৫	১,১৮৫	৮০৩	৫৫৯
অন্যান্য	৭৪	২,০৩৯	২,৩৩৪	২,৩৫৮
মোট ইয়োরোপ	৩২০,০৬২	৪৪৫,৩৭৪	৪৬৬,৫৮৬	৪৩৪,০৪১
এশিয়ার তুরস্ক	৪,২৫১	১,৩৭০	১,৪৯২	১,২১২
মিশর	২১,৩৯৫	২৬,৩৩৭	২৩,৪৮৩	১৩,২১০
ইরাক্		১,৭২৭	১,৬৭৮	১,১৩০
পারস্য	৪৩০	৯,০৪৫	৯,১৪৮	৮,৭১৪
চীন	৪,৬৭২	১১,২৭৪	১২,১৫৭	৯,৯১৪
জাপান	৪,৩৮৯	৮,৭৩৪	৯,১৩৩	৮,০৬৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৪৩,৮৫৪	১৯০,৮২৬	১৯৮,১৭৬	১৪৪,৪৮৬
কিউবা	৩,৯১৫	১০,২৪০	৭,৯৩৪	৬,৮৭১
মেক্সিকো	১,৮৮০	২,৩৬৯	২,৬৩০	২,৮৮৯
কলাম্বিয়া	১,০৮৯	২,২৭৬	২,১০৬	১,৩৯৯
পেরু	১,৫৭৮	৯,৭১০	৬,৫৬২	৪,৪৮১
চিলি	৪,৩৫৯	৯,১০৪	১০,৯১	৭,৩৭১
ব্রাজিল	১০,০০৮	৪,৬৮৫	৭,২৯৩	৮,১৩২
উরুগুয়ে	২,৭৪৯	৭,০২৮	৫,৬৫১	৭,৫৮২
আর্জ্জেন্টিনা	৪২,৪৮৫	৭৬,৭৮৯	৮২,৪৪৭	৫৬,৭৪৪
অন্যান্য দেশ	৯,৫৪০	১৭,৪১৮	১৫,০২৪	১২,৮০১
মোট ইয়োরোপের বাহিরে	২৫৭,১৫৪	৩৮৬,৬৪০	৫২৫,৫৫৭	৩০৬,৬৪৭
আইরিশ ফ্রী ষ্টেট		৪৫,১৪৭	৪৫,০৮৭	৪২,৯৫৩
পশ্চিম আফ্রিকা	৫,১৭৩	১১,৪৫৮	১১,৫৮৬	৮,১৭১

* তালিকায় দেখানো হয় নাই।

† ১০ লাখ পাউণ্ড বিশেষ রিজার্ভে স্থানান্তরিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা	১২,৪৯৫	২৪,১৪৬	২৪,৩০৯	২০,২৭৪
ভারতবর্ষ ও সিংহল	৫৬,২১৮	৭৮,২৪৬	৭৭,৯৯৫	৬৪,৪৭৬
ট্রেঃসেটেলমেণ্ট	১৫,৮৮০	১০,১১৭	১৪,১৭৩	৯,১১৪
অষ্ট্রেলিয়া	৫৮,০৬১	৫৪,৬৬৩	৫৫,৬৮৫	৪৬,৪৫৩
নিউজীল্যাণ্ড	২০,৩৩৮	৪৭,২৭৪	৪৭,৭২৭	৪৪,৯৫৯
ক্যানাডা	৩০,৫৮৮	৫৭,১৪৩	৪৮,৪১০	৩৫,১৯০
ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্	২,১১৬	৪,৫৫৯	৪,৩২৭	৫,১৩৯
অন্যান্য	১০,৭৪২	৩০,১২৭	৫০,৭৪৩	২৪,২৯১
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১৯১,৫১৬	৫৬২,৫৮৪	৩৫৮,৮৪২	৩০৪,১৪২

(খ) বিভিন্ন দেশে ইংলণ্ডের রপ্তানি

		১৯২৮	১৯২৯	
		(পাউণ্ড হাজার)		
রুশিয়া		২,৭১৬	৩,৭৪৩	৬,৭৯০
ফিন্‌ল্যাণ্ড		৩,৬০১	৩,৫৬৩	২,৪১৫
এষ্টোনিয়া		৬০১	৪৬৬	৩৮৮
লাট্‌ভিয়া		১,২৯৩	১,৪৯৮	১,১৫২
সুইডেন		৯,৭১২	১০,৫৪৮	১০,০৭৩
নরওয়ে		৭,৯২৮	৯,৮৫৮	১২,৯০১
ডেন্মার্ক		৯,৭১০	১০,৬৭৮	১০,২৬৯
পোল্যাণ্ড		৫,২৫৭	৬,৫০৪	৩,৫৬৪
জার্মানি	৪১,৩০৭	৪০,৯৪৭	৫৬,৯৬৭	২৬,৮৩০
নেদারল্যাণ্ডস্	২২,৭৯৪	৩১,২০৬	৩১,৮৫৮	২৪,৬৪১
বেলজিয়াম	১৩,৫২৮	১৭,৫৯৫	২০,১৬৩	১৫,৬২৯
ফ্রান্স	৩২,০৯৬	৩২,০৮৫	৩৮,৭০৩	৩১,৭৩০
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	৪,২১২	৭,৯২১	৬,৪২৪	৫,১৮৭
পর্তুগাল	৬,০৫৫	৮,০২৯	৮,১৪৫	৭,৪৭৬
স্পেন	৯,৭২৮	১১,৭২৮	১০,৮২৫	১০,৫৯৬
ইতালি	১৪,৬৪০	১৪,৪০৯	১৬,১৫৩	১৩,৯১৪
অষ্ট্রিয়া	৪,৪৮১	২,৭০৬	২,৫২১	২,০৪৪
হাঙ্গেরি		১,০০০	১,০৫৯	
চেকোস্লোভাকিয়া		২,১১৮	২,১০১	
গ্রীস্ ও ক্রীট্	২,৫৩৭	৪,৮৭৭	৬,৯৪১	
রুমানিয়া	১,৯৪৭	২,৯৮৯	২,৩১৭	১,৯৪৭
তুরস্ক	২,৪১৪	২,০১৬	১,১৯৮	১,৪৭২
অন্যান্য দেশ	৫৬৮	৩,২০২	৩,৪৬৭	২,৬৮১
মোট ইয়োরোপ	১৯৫,১০৮	২২৫,১২২	২৩৫,৫০১	২০৩,২৪৭
এশিয়াস্থ তুরস্ক	৫,২৯১	৭২২	৬১৮	২২৬
পিপার	৯,৮০৫	১১,১৮৬	১২,৫১৬	৯,৮০৮
ইরাক্		২,৬৮১	২,৪২৬	১,৬৯০
পারস্য	৭২৫	১,৬২৯	২,২১১	২,৬২৫
চীন	১৪,৮৪৫	১৫,৭১৪	১৪,০২৯	৮,৫৭২
জাপান	১৪,৭৮৩	১৪,৭৮৮	১০,৬৩০	৮,৩৭৪
যুক্তরাষ্ট্র	৩০,৪৭৮	৪৭,৯৪৭	৪৬৮০৩	২৯,৫৯২
কিউবা	২,২১৪	১,৬৪৯	২,০২৭	১,৮৮৩
মেক্সিকো	২,৩০৩	২,৮০০	২,৫৩৮	২,৪৪৪
কলাম্বিয়া	১,৬২৭	৩,৬১৪	৩,২৪১	১,৫৫৩
পেরু	১ ৪৮৮	১ ৯৫৪	২,০০৭	১,৪৪১
চিলি	৬,০১০	৫,১৩৮	৯ ১৯৬	৫,৯৮৩
ব্রাজিল	১২,৬৬১	১৬,০৩৪	১৩,৫৮৩	৭,৯৫৫
উরুগুয়ে	২,৯১৬	৩,১০৬	৩,৭২৩	৩,৫৬১
আর্জেন্টিনা	২২,৬৪১	৩১,৪১০	২৯,০৭৪	২৫,২৭০
অন্যান্য	৭,২১৫	১০,৬৭১	১১,৮৫৪	৮,৭১১
ইয়োরোপের বাহিরে মোট	৫৪১,৮০০	৫৭০,৭৮৯	১৬৯,০৯৬	১১৯,২০৩
আইরিশ ফ্রী ষ্টেট	৫৫,০৮০	৩৬,০৭৮	৩৪,৪৯৮	
পশ্চিম আফ্রিকা	৬,৬০১	১৪ ৮২৭	১২,৩১৮	১০,৭০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২২,১৮৫	৩১,৪০৩	৩২,৫০৮	২৬,৪৬৪
ভারত ও সিংহল	৭৪,৪৫৮	৮৯,৮৬২	৪৪, ৪৭	৪৬,২৪৩
ষ্ট্রেট সেটেল্‌মেণ্ট	৫,৮০৬	১১,৪৩৪	১২,২৭২	৭,৪৬৪
অষ্ট্রেলিয়া	৫৪,৪৭০	৫৫,৭২৫	৪৪,৩৭৫	৩১,৭৩৮
নিউজীল্যাণ্ড	১০,৮০৮	১৯,২৮৮	২১,৬৯৩	১৭,৮৭৮
ক্যানাডা	২৪,৭১৫	৩৪,৪৬৬	৫৫,০০৮	২৮,৯০৪
ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্	২,৩৩৯	৫,১১১	৫,০৪৩	৪,৭৪৯
অন্যান্য	১৩,৭৮৫	৩০,৫৭২	৩১,২৮৩	৩৮,৭৪৫
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১৯৫,৩০৭	৩২১,৬৬৮	৩২৪,৪৫১	২৩৮,১০৩

ইংরেজরা ১৯৩০ সনে প্রায় ১০৪৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমদানি ও ৫৭ কোটি পাউণ্ডের কিছু বেশী মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল। উপরে পুনঃ রপ্তানির হিসাব দেওয়া হয় নাই। ঐ খাতে দ্রব্যের মূল্য ছিল প্রায় ৮·৭ কোটি পাউণ্ড। ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে ইংরেজের আমদানি দ্রব্যের মোট মূল্য কমিয়াছে ১৪%। বৃটিশ রপ্তানি দ্রব্যের মোট মূল্য কমিয়াছে ২০%। কিন্তু শুধু ইয়োরোপের সহিত আমদানি রপ্তানির সম্পর্ক কমিয়াছে যথাক্রমে ৭% ও ১৩%।

উপরে আমদানি রপ্তানিকে তিনটি শ্রেণীতে সাজান হইয়াছে। এই শ্রেণী তিনটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, (ক) ইংলণ্ড সব চেয়ে বেশী আমদানি করে ইয়োরোপীয় দেশসমূহ হইতে, আর ইয়োরোপের বাহিরের দেশগুলি হইতে যত আমদানি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থ দেশসমূহ হইতেও প্রায় তত আমদানি করে। রপ্তানি ১৯১৩ সনে ইয়োরোপের বাহিরের দেশগুলিতে সব চেয়ে বেশী এবং ইয়োরোপীয় দেশে ও সাম্রাজ্যে প্রায় সমান সমান হইলেও ১৯৩০ সনে টেক্কা দিয়াছে সাম্রাজ্য, আর পিছনে পড়িয়াছে ইয়োরোপের বাহিরের দেশসমূহ; (খ) আমদানি করে দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে বেশী যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে। বাণিজ্যের ভাঁটা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। তারপর ভারতবর্ষ, তারপর জার্ম্মানি হইতে। কিন্তু গত বৎসর জার্ম্মানি ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী বেচিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৫০ সনে ইংলণ্ড হইতে ভারতে রপ্তানি অনেক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি ইংলণ্ডের মালের এত বড় বাজার দুনিয়ায় আর নাই। ফ্রান্স দ্বিতীয় হইলেও অনেক নীচে। ফ্রান্সের বিলাতী দ্রব্য ক্রয় বাড়িয়াছে। তার নীচে আইরিশ ফ্রীষ্টেট, আর্জ্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার স্থান।

আমদানি-রপ্তানিকে যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে তার প্রত্যেক শ্রেণীর হিস্যা নীচে দেখানো যাইতেছে :—

	আমদানি		বৃটিশ রপ্তানি	
	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯	১৯৩০
	%	%	%	%
ইয়োরোপীয় দেশসমূহ	৩৮·২	৪১·৫	৩২·৩	৩৪·৬
অন্যান্য দেশ	৩২·৪	২৯·৪	২৩·২	২১·০
বৃটিশ সাম্রাজ্য	২৯·৪	২৯·১	৪৪·৫	৪৩·৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ড ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডেই বেশী বেনাবেচা করিতে সমর্থ হইতেছে, অন্যত্র দুই খাতেই তাহার হিস্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বাঁশের পাল্প ও কাগজ-শিল্প

ভারতবর্ষস্থ সরকারী বনবিভাগের গবেষণাগারের ১৯২৯-৩০ সনের বার্ষিক বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে বাঁশের পাল্প সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে; নিম্নে ঐ সমস্ত তথ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌এর পেপার পাল্প সেক্‌শান্‌

আলোচ্য সনে সোটা বংসর ধরিয়া কাগজ এবং পাল্পের প্ল্যাণ্টের কাজ চলিয়াছে। অনেক বাঁশের কাগজ প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা এবং সিমলাস্থিত গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং প্রেসে দেওয়া হইয়াছে। এই কাগজে সরকারী বনবিভাগের গবেষণা-সম্বন্ধীয় রিপোর্ট এবং ব্রহ্মদেশের বাঁশের পাল্প সম্বন্ধে লিখিত রিপোর্টের অতিরিক্ত কপিগুলি ছাপান হইয়াছে। ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ এবং কলেজের অফিসের জন্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কাগজও প্রস্তুত করা হয়।

মিঃ হেট্‌ আরাকানস্থ মেলোকাল্লা বাঁশের তিন টন কোরা মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই কাগজ তৈরী করা হইয়াছে এবং তাঁহার উপদেশ পাইলেই ইহা তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবে।

টিটাগড় পেপার মিলের মিল্‌ভিউড্‌ বাঁশ

এই সরকারী গবেষণা মন্দিরে অত্যন্ত খারাপ ধরণের এক চালান মিল্‌ভিউড্‌ বাঁশ পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। এই বাঁশ হইতে নির্ম্মল শাদা কাগজ তৈরীর চেষ্টা চলে এবং পরীক্ষা সফলও হয়। ১৯২৮-২৯ সনের রিপোর্ট এই কাগজেই ছাপান হয়।

প্রকাশিত পুস্তকাদি

ব্রহ্মদেশে বাঁশের পাল্প-শিল্প কায়েম করার সুবিধার্থ জলপথের মোসাবিদার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সম্প্রতি এই প্রস্তাবিত জলপথের মোসাবিদার সচিত্র বিবরণী "দি বার্ম্মা ব্যাম্বু পাল্প সার্ভে" নামে মিঃ ডাব্লিউ হেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানি ভারতে এবং বিদেশে সর্ব্বত্রই সমাদর লাভ করিয়াছে এবং এইজন্য আরও কয়েকখানি অতিরিক্ত পুস্তক ছাপান দরকার হইয়া পড়ে।

নূতন নূতন কাগজের কল

১৯২৪ সনে রাজমহেন্দ্রিতে একটী কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কল প্রতিষ্ঠার পর হইতে এপর্য্যন্ত কোন কাজই হয় নাই। সম্প্রতি একটী নূতন কোম্পানী ঐ কলটীর ভার গ্রহণ করিয়াছে। এই নবগঠিত কোম্পানীর নাম "অন্ধ্র পেপার মিল্‌স্‌ কোং লিমিটেড্‌"। এই কার্য্যের অনুরোধরক্ষার্থ শ্রীযুক্ত এম, পি, ভার্গব আলোচ্য বর্ষে কল চালাইবার পক্ষে পরামর্শাদি প্রদানের জন্য দুই দুইবার কলটি পরিদর্শন করিয়াছেন। বাঁশ হইতে কাগজ তৈরীর পক্ষে কলটীর অনেক দোষ ছিল এবং আবশ্যকীয় যন্ত্রাদিরও অভাব ছিল। কলটীকে যথোপযুক্তরূপে গঠন করিবার জন্য একটী মোসাবিদাও স্থির করা হইয়াছে। মোসাবিদাটী কোম্পানীর বিবেচনাধীন রহিয়াছে। মোসাবিদাটী কার্য্যে পরিণত হইলে আশার

মোগাবেরী ডিভিশনের রেকাপাল্ পাহাড়ের বিরাট বাঁশ-বনকে কাজে লাগান যাইবে।

উড়িষ্যার অঙ্গুল অঞ্চলের সংরক্ষিত বন-জঙ্গলে বিস্তর বাঁশ আছে। এই বাঁশ হইতে মণ্ড এবং কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার মেসার্স টিটাগড় পেপার মিল্‌স্ কোং লিমিটেড্ অল্পদিন হইল কাঁকিনাড়ায় একটী আধুনিক প্ল্যাণ্ট্ প্রস্তুত করিয়াছে। অঙ্গুলের বাঁশবন সম্বন্ধে মিঃ রেটের রিপোর্টে অনেক হদিস বাৎলান হইয়াছিল এবং এই নবগঠিত প্ল্যাণ্টটী তাহারই ফল।

বার্ম্মার আরাকান এবং টেনাসেরিম অঞ্চলে বাঁশের পাল্ বা মণ্ড প্রস্তুতের জন্য লণ্ডনের দুইটী পুঁজিওয়ালা কোম্পানী মাথা ঘামাইতেছে। সম্প্রতি এই দুই কোম্পানী একযোগে পাল্ প্রস্তুতের জন্য মোসাবিদা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মোট কথা, ভারতবর্ষে কাগজ এবং বাঁশের পাল্ শিল্প বেশ জাঁকিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাঞ্জাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য পুরস্কার ঘোষণা

লায়োলের পরলোকগত স্যর গঙ্গারাম, কে-টি, সি-আই-ই, এম-ভি-ও, আর-বি ১৯২৫ সনে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হাতে ২৫,০০০৲ টাকা অর্পণ করেন। এই টাকা হইতে প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর ৩০০০৲ টাকার পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা করেন। পুরস্কার-প্রার্থী ব্যক্তিকে পাঞ্জাবের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য নূতন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করিতে হইবে এবং উহা লাভজনক হওয়া চাই। গোটা দুনিয়ার লোক এই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। সরকারী চাকুরেরা পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। প্রথম বারে ৬৪ জন প্রতিযোগী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র ১৪ জন প্রতিযোগিতার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। অতঃপর এই সমস্ত পরীক্ষার্থীর নথিপত্র ঘাঁটিবার জন্য ৪টী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং ম্যানেজিং কমিটি শেষ সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৩১ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রিয় সহরের ২১৪ নং চেরিংটন্ রোডের ডাঃ সি, এ, বার্ক্কার এম-সি-ডি, সি-আই-ই পুরস্কার পান। বর্ত্তমানে কোয়েম্বাটুরে যে নয়া আখ উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা ইঁহারই কৃতিত্বের ফল এবং এই জন্যই তিনি উক্ত পুরস্কার পাইয়াছেন। এই নব উদ্ভাবিত আখ পাঞ্জাবের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচিত হইয়াছে এবং পাঞ্জাবের চলতি আখের চেয়ে এই আখ অধিকতর রস প্রদান করিতেছে। পাঞ্জাবে এই কোয়েম্বাটুর আখের চেওয়াজ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে, এবং দুই চারি বৎসরের মধ্যে দেশীয় আখ আর পাঞ্জাবে রহিবে না বলিয়া লোকের দৃঢ় ধারণা। পরবর্ত্তী পারিতোষিকের জন্য ডিরেক্টার অব্ এগ্রিকালচার, লায়োল—এই ঠিকানায় ১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

ভারতীয় চিনি-শিল্প সম্পর্কে ট্যারিফ্ বোর্ডের সুপারিশ

১৯৩০ সনের মে মাসে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় চিনি-শিল্পের সহায়তার জন্য সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন আছে কিনা, এবং থাকিলেই বা তাহা কিভাবে হইবে তৎসম্বন্ধে ট্যারিফ বোর্ডকে অনুসন্ধান করিতে বলেন। বোর্ডের উপর নিম্নলিখিত ৩টী বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার পড়ে :—

(১) চিনি-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ইণ্ডিয়ান ফিস্কাল্ কমিশনের রিপোর্টের ৯৭ প্যারার অনুযায়ী কিনা? এই সম্পর্কে আখ-আবাদকারী, জাগারী ইত্যাদি গুড়-প্রস্তুত-কারক, দেশীয় প্রথায় চিনি-প্রস্তুতকারক ক্রিষ্ট্যালাইন্ চিনির কারখানার মালিক, ইত্যাদি সকলেরই খোঁজ খবর লইতে হইবে।

(২) কোন্ কোন্ চিনি সম্বন্ধে সংরক্ষণের প্রয়োজন, এবং কতদূর পর্য্যন্ত সংরক্ষণ চলিতে পারে?

(৩) এই সংরক্ষণ-নীতির ফলে আখজাত দ্রব্য ব্যবহার-কারী অন্যান্য শিল্পের কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

সরকারের এই নির্দ্দেশ অনুসারে ট্যারিফ বোর্ড হইতে অনুসন্ধানাদি করা হয়। সম্প্রতি ইহার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবরণীটী নিম্নলিখিত ৯টী অংশে বিভক্ত :—(১) দুনিয়ার চিনি-শিল্পের হালচাল; (২) ভারতীয় চিনি-শিল্প; (৩) কিস্থাল কমিশনের সর্ত্তসমূহ; (৪) চিনি-শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা; (৫) শাদা চিনির তৈরী খরচ ও বিক্রয়-মূল্য; (৬) আমদানি মূল্য; (৭) কতদূর সংরক্ষণ করা উচিত এবং কিভাবে সংরক্ষণ করা উচিত; (৮) চিনির খাদন; (৯) অন্যান্য কি উপায়ে সাহায্য করা যাইতে পারে; এবং (১০) সংক্ষিপ্ত সার। বিবরণীর উপসংহারে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে কয়টী শাদা চিনির কারখানা আছে তাহার সংখ্যা এবং পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে।

মন্তব্য ও সুপারিশ

টারিফ বোর্ডের মন্তব্য এবং সুপারিশের সারমর্ম্ম এই : (১) বর্ত্তমানে দুনিয়া জুড়িয়া চিনি-শিল্পের ভাঁটা দেখা যাইতেছে। খাদন অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধিই ইহার একমাত্র কারণ। উৎপাদন-বৃদ্ধি তো হইতেছেই, অধিকন্তু দুনিয়ার বড় বড় চিনি-প্রস্তুতকারী দেশগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি গুদামজাত রহিয়াছে। আরও একটী কারণ এই যে, অনেক দেশে সংরক্ষণ-শুল্কের জন্য চিনি বিক্রয় করা যায় হইয়া উঠিয়াছে।

(২) রুশিয়া ছাড়া দুনিয়ার চিনি-উৎপাদনকারী দেশগুলি জোট বাঁধিয়া উৎপাদন সম্বন্ধে "রেষ্ট্রিক্‌শান" বা সংযম নীতি অবলম্বন করিতেছে; অর্থাৎ প্রত্যেক দেশ কি পরিমাণে চিনি উৎপাদন করিতে পারিবে এবং কি পরিমাণেই বা বিদেশে রপ্তানি করিবে তৎসম্বন্ধে সমঝোতা স্থাপন করিয়া দর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

(৩) রুশিয়ার অন্যান্য শিল্পের মত চিনি-শিল্পও সরকারের হাতে। রুশিয়ায় চিনি প্রস্তুত হয় প্রায় ২০ লাখ টন। সুতরাং চিনি বিক্রয় এবং রপ্তানি সম্বন্ধে রুশিয়া কি নীতি অবলম্বন করে তাহা না দেখিয়া দুনিয়ার জোট-কারী দেশগুলির পক্ষে চিনির দরদস্তুর স্থির করা সম্ভবপর নয়।

(৪) ভারতে চিনির দরদস্তুর স্থির হয় দুনিয়ার হালচালের উপর। ১৯১৩ সনে চিনির উপর রাজস্ব আদায় হইত ৫%; ১৯৩০ সনে এই কর ৩% করা হইলেও দেখা যাইতেছে চিনির দর কমিয়াই আসিতেছে। ১৯২১ সনে দর বৃদ্ধি সব চেয়ে বেশী হয়—প্রায় ৪০৲; বর্ত্তমান সনে দর সব চেয়ে কম—৭৸৹ আনা মাত্র।

(৫) কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে আখের আবাদ একই ভাবে রহিয়াছে। গত ২০ বৎসর আখের আবাদের পরিমাণ গড়ে ২,৮৪০,০০০ একর।

(৬) ভারতবর্ষে আখ-জাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়ই সর্ব্ব-প্রধান; কি সন ভারতে ২৫ হইতে ৩০ লক্ষ টন গুড় ব্যবহৃত হয়।

(৭) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আখ হইতে সরাসরি শাদা চিনি উৎপন্ন করিবার উপযোগী ২৯টী ফ্যাক্টরি আছে। গুড় হইতে শাদা চিনি তৈরীর রিফাইনারি বা সংশোধনাগার রহিয়াছে ১৪টী। এই সমস্ত ফ্যাক্টরি এবং রিফাইনারিতে বৎসরে ১০০,০০০ টন শাদা চিনি তৈরী হয়। এ ছাড়া দেশীয় প্রথাতেও চিনি তৈরী হয়। এই দেশীয় প্রথার নাম বেল-প্রথা। এই প্রথাতেও চিনি তৈরী হয় কি সন ২ লাখ টন। ১৯২০ সনে যে শর্করা কমিটি বসে, সেই কমিটি এই বেল প্রথার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য "সেন্ট্রিফুগাল" ব্যবহারের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ফলে বেল প্রথার অনেক উন্নতি হইয়াছে।

(৮) ১৯২০ সনের শর্করা কমিটি ফ্যাক্টরিগুলির উন্নতি-বিধানের জন্য অনেক হদিস বাৎলায়। এই হদিস কার্য্যে পরিণত করার ফলে ফ্যাক্টরিগুলিতে আখের রস নিষ্কাশন ৮৮৫% হইতে ৯%এ উঠিয়াছে।

(৯) ভারতীয় ফ্যাক্টরিসমূহের কুলিদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, কুলিদের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক।

(১০) কোয়েম্বাটুরের শর্করা গবেষণা মন্দির হইতে কয়েক প্রকার নূতন আখ উৎপাদন করা হইয়াছে। এই নবজাত আখগুলি উত্তর ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। এই নয়া আখগুলির আবাদ করিলে উৎপাদন ৫০% বাড়িবার সম্ভাবনা।

(১১) শাদা চিনি আমদানির জন্য একাল পর্য্যন্ত

দেশে গুড় ব্যবহারের এবং আখের আবাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না।

(১১) বর্ত্তমানে জাভা হইতে গুড়ও আমদানি হইতেছে; আবার আমদানি সাদা চিনি সংযোগেও গুড় প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে এদেশের গুড়-শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

(১৩) বর্ত্তমানে সাদা চিনি আমদানি হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টন। লড়াইয়ের আগের চেয়ে এই আমদানি ৩১৫,০০০ টন বেশী।

(১৪) কিস্যাণ কমিশন তিনটী দর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছে। বর্ত্তমানে চিনি-শিল্প সম্বন্ধে এই তিনটী দর্ত্তই বেশ খাটে। সুতরাং চিনি সম্বন্ধে সংরক্ষণের দরকার আছে।

(১৫) চাষ-আবাদের দিক্ হইতে বিচার করিলেও চিনি-শিল্পের সংরক্ষণের দরকার আছে। আখের আবাদ আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। এর জন্য সাদা চিনি আরও তৈরী করা দরকার। সাদা চিনি শিল্পের প্রসার না ঘটিলে গুড়ের বাজার একেবারে মাটী হইয়া যাইবে। ইহার ফলে চাষীদের দুর্দ্দশা ঘটিবে, চাষ-আবাদে যাহাতে দুর্যোগ দেখা দিবে এবং বর্ত্তমানে উন্নততর আখ চাষের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাও সমূলে বিনষ্ট হইবে।

(১৬) যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলে খাণ্ডেসারী প্রথায় চিনি তৈরী হয়। আখের সদ্ব্যবহারের জন্য এবং কৃষকদিগকে বাঁচাইবার জন্য রোহিলখণ্ডে এই স্বদেশী প্রথার এখনও দরকার আছে।

(১৭) গুড় উৎপাদনের খরচ কমাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; বিশেষতঃ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশে এই জন্য উন্নত প্রণালীর আবাদ—কোয়েম্বাটুর গবেষণাগার-সম্মত উন্নত ধরণের আখের চাষ করার দরকার।

(১৮) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আখের আবাদ এবং গুড়ের দাম দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ফ্যাক্টরিতে আখ আনিয়া বিক্রয় করিলে তার দাম ৷৷০ আনা। সংরক্ষণযুগের শেষ হইলে এই দাম ৷৷৵০ আনায় নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(১৯) বর্ত্তমানে ভারতীয় ফ্যাক্টরিজাত চিনির বিক্রয় মূল্য মণপ্রতি ৯৲৯ পাই।

(২০) সংরক্ষণের শেষের দিকে এই দাম ৭৸৯ পাইএ নামিয়া যাওয়ার কথা।

(২১) সংরক্ষণের আমলে এই দুই দামের মাঝামাঝি অর্থাৎ কি মণ ৮৸১ পাই দরে বিক্রয় করা উচিত।

(২২) ভারতজাত আখ তত ভাল নয়; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল। এই জন্য গড়ে মণপ্রতি ।০ আনা দর কমিয়া যায়। সুতরাং দর বাঁধিয়া দিবার সময় এদিকেও খেয়াল রাখা আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দর আরও একটু চড়াইয়া ৮৸১ পাই করা উচিত।

(২৩) জাভা দ্বীপের উৎপাদন খরচা, এবং ঐ দ্বীপের বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কলিকাতায় আমদানি জাভা চিনির দর নামিয়া ৪৲ টাকা হইবে।

(২৪) কিছুদিন আগে দর এতদূর নামিয়া গিয়াছিল যে, জাভা চিনি ৫।০ আনা দরে বিকাইয়াছিল; অবশ্য শুল্কের হার ইহার সহিত ধরা হয় নাই। অবস্থা আরও কাহিল হইবার সম্ভাবনা, কারণ জাভা ইচ্ছা করিলে কলিকাতায় চিনির দর ৩।০ আনায় নামাইতে পারিবে।

(২৫) জাভাসহ বিক্রয়-মূল্য যদি ৮৸১ পাই ধরা যায় এবং কলিকাতার বন্দরে নামান চিনির দর যদি কি মণ ৪৲ টাকা হয়, তাহা হইলে সংরক্ষণের আমলে চিনির দাম হওয়া উচিত মণপ্রতি ৫৸১ পাই অর্থাৎ হন্দর প্রতি ৭৷৵০ পাই।

(২৬) গবর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে বিচার করিলে কোন প্রকার বাউটি বা সরকারী সাহায্য দেওয়া সম্ভবপর নয়। যদি খাণ্ডেসারী চিনি প্রস্তুতকারীদিগকেও মোসাবিলার মধ্যে ধরা যায়, তাহা হইলে সাহায্য (বাউটি) দেওয়ার বেলায় বড়ই অসুবিধা হইবে। কারণ বাউটি কিভাবে দেওয়া যাইবে এবং ফ্যাক্টরি বাউটির যোগ্য কি না ইত্যাদি নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অবশ্য কেবল যদি ফ্যাক্টরি-গুলিকেই বাউটি দেওয়া হয় তাহা হইলে খাণ্ডেসারী চিনি-ওয়ালাদের উপর অবিচার করা হয়।

(২৭) চিনি-শিল্পের সাহায্য করার জন্য বাউটির চেয়ে কর বসাইবার ব্যবস্থা করাই ভাল। এই শিল্পের প্রাথমিক অবস্থায় ইহার পক্ষে কিছু কিছু সুবিধা অধিকন্তু; আবার

রোহিলখণ্ডের বেল প্রথায় তৈরী চিনির দিকেও নজর রাখা আবশ্যক। আমদানি চিনির উপর কর বসাইলেই লেঠা চুকিয়া যাইবে। এই জন্য প্রথম ৭ বৎসর হন্দর প্রতি ৭।০ আনা এবং পরবর্ত্তী বৎসরগুলির জন্য ৬।০ হিসাবে শুল্ক বসানো আবশ্যক; তাহা হইলে সমগ্র সংরক্ষণের আমল ধরিয়া ৬৸৵০ পাই হিসাবে পড়তা পড়িবে।

(২৮) ১৫ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ আবশ্যক।

(২৯) চিনি-উৎপাদনকারী বড় বড় দেশগুলি মোট বাঁধিয়া কোন্ দেশ কি পরিমাণ চিনি রপ্তানি করিবে তাহা স্থির করিয়া লইয়াছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ করের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইল তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। তবে যদি ভবিষ্যতে এই আন্তর্জ্জাতিক সমঝোতা ভাঙ্গিয়া যায় এবং কোন দেশ ৪৲ টাকার চেয়েও কম দরে কলিকাতা বন্দরে চিনি নামায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হন্দর প্রতি আরও ৷০ আনা কর বাড়াইয়া দিতে হইবে।

(৩০) এইরূপ কর বসাইবার ক্ষমতা স-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের থাকিবে; তবে কতদিন ধরিয়া কর বলবৎ থাকিবে ইত্যাদি ব্যাপার ব্যবস্থা-পরিষৎ কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলেই ভাল হয়।

(৩১) সকল প্রকার চিনি এবং সিরুরির উপর এই কর বসিবে।

(৩২) বোলাগুড়ের উপর এখন যে কর ধার্য্য আছে তাহার জন্য মেথিলেটেড স্পিরিটের উপর ট্যারিফ অনৈক্য দূরীভূত করার জন্য মেসার্স ক্যারেও এণ্ড কোম্পানী আন্দোলন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে সুপারিশ করার মত কিছু নাই। কোম্পানী পরে দরখাস্তখানি ফিরাইয়া লইয়াছে। কারণ কর না থাকিলেও বোলাগুড়ের বর্ত্তমান দর অনুসারে মেথিলেটেড স্পিরিট প্রস্তুতকারীদের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না।

(৩৩) আমদানি করা খারাপ চিনি এবং গুড়ের উপর ডিউটী বসাইলে ভারতজাত গুড়ের দরের বিশেষ কোন তারতম্য হইবে না; কারণ বর্ত্তমানে এই দর যোগান এবং চাহিদা-নীতি অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

(৩৪) গুড়ের দরের সাধারণতঃ কোন প্রকার পার্থক্য দেখা যায় না। আমদানি চিনির দর যেমনই হউক না কেন, তাহাতে গুড়ের দরের বিশেষ কোন তারতম্য হয় না বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং বিদেশী চিনির উপর কর ধার্য্য হইলে গুড়ের দরের তারতম্য উপস্থিত হইবে এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন।

(৩৫) প্রস্তাবিত হার খুব বেশী নয়; চিনি শিল্পের মত একটী প্রয়োজনীয় শিল্পের বেলায় অন্যান্য দেশে যে ধরণের সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইয়াছে ইহাও তদনুযায়ী।

(৩৬) এইরূপ ডিউটী বসাইবার ফলে চিনির দর আগের দরের চেয়ে বেশী হইবে না; এবং ১৯১৫ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত ভারতে যে দরে চিনি বিকাইয়াছে তাহার চেয়ে দর কম হইবে।

(৩৭) সহরের লোকই প্রধানতঃ চিনি খায়; গুড়ের চলন পাড়াগাঁ অঞ্চলে। চিনির উপর শুল্ক বসাইবার জন্য গুড়ের দর বাড়িবে না; সুতরাং চিনির উপর শুল্ক বসাইলে গরীব কৃষকদের কোন আর্থিক ক্ষতি হইবে না।

(৩৮) যে সমস্ত শিল্পে চিনি ব্যবহৃত হয় চিনি-শুল্কের জন্য সেগুলির কোনই অসুবিধা হইবে না।

(৩৯) বর্ত্তমানে আখ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য এদেশে যে খরচ হইতেছে তাহা খুব বেশী নয়। আখ এদেশের একটী বড় ফসল। এই হিসাবে আক্কা এবং হাওয়াই দ্বীপে অনেক বেশী খরচ করা হইতেছে। সুতরাং আখের গবেষণার জন্য আরও খরচ করা আবশ্যক। আর এইরূপ খরচই যদি না করা হয় তবে যে জন্য সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা তাহার কোনই সার্থকতা থাকে না। সংরক্ষণের পূর্ব্বে এইরূপ খরচের ব্যবস্থা করা চাই।

(৪০) আখের গবেষণার জন্য "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ"এর হাতে কি সন ১০ লাখ টাকা দেওয়া দরকার। প্রস্তাবিত সংরক্ষণ-নীতি কার্য্যে পরিণত হইলে চিনির ক্যাটেরিগুলি যাহাতে আদেশমাত্র আপন আপন হিসাবপত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয় সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট বা ভারপ্রাপ্ত যে কোন কর্ম্মচারীর নিকট আনয়নকরণে পেশ করে এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(৪১) ভারতীয় সর্করা কমিটি ব্যবস্থা করেন যে, প্রস্তুত চিনির দামের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত আখের দাম ধরিতে হইবে; এবং কৃষকগণ যাহাতে এই দাম পায় তাহা করিতে হইবে। তব পক্ষে মণ প্রতি ৮/০ আনা আখের দাম দিতেই হইবে। আমরা এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে কৃষকগণের প্রথম বৎসরে দাম আরও এক আনা চড়াইয়া দিতে হইবে।

(৪২) যাহাতে চিনির ফ্যাক্টরিগুলি আখের দামের এইরূপ চার্ট ফ্যাক্টরির সম্মুখে কোন প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। বড়লাট বা কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যাহাতে ফ্যাক্টরিগুলির উপর এইরূপ হুকুম চালাইতে পারেন এমন ব্যবস্থা করা দরকার।

(৪৩) আখ-আবাদকারী কৃষকদের জমির উপর যাহাতে ফ্যাক্টরিগুলি কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সর্করা কমিটি সেরূপ সুপারিশ করেন। এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

(৪৪) ফ্যাক্টরিগুলির সম্বন্ধে লাইসেন্স লইবার প্রথা এবং প্রত্যেক ফ্যাক্টরির জন্য এক একটী অঞ্চল স্থির করিয়া রাখা সমর্থন-যোগ্য নহে।

(৪৫) সরকারের পক্ষে ঋণস্বরূপ দেওয়ার জন্য কিনিবা চিনি শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করা সমর্থনযোগ্য নহে, তবে প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দান করিতে পারেন।

(৪৬) ফিস্কাল্ কমিশনের ২৯২ প্যারায় প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। চিনি-শিল্প যদি সংরক্ষিত হয় চিনি-শিল্পে মোতায়েন কোম্পানীগুলি যাহাতে সত্বর নির্দ্দেশিত সর্ত্তগুলি মানিয়া চলে সে দিকে নজর দিতে হইবে।

(৪৭) ডিরেক্টার সভায় যাহাতে ভারতীয়দিগের উপযুক্তরূপ স্থান থাকে এবং নব গঠিত কোম্পানীগুলিতে ভারতীয় পুঁজি নিয়োগের অবসর থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার, এইজন্য চিনি শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা-বাঞ্ছিত যদি কোন প্রকার আইনকানুন করা দরকার হয় ভারত গবর্ণমেণ্টের তাহা করা উচিত।

(৪৮) যে সমস্ত ফ্যাক্টরি এই সকল আইনকানুন অবজ্ঞা করিয়া চলিবে সেগুলিকে ঋণ, গ্রাণ্ট, অর্থসাহায্য অথবা অন্য কোন সুবিধাই প্রদান করা উচিত নয়।

পিগ লোহা হইতে ষ্টেভিনিউ আদায় রহিত করা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ্ বোর্ডের রিপোর্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত

ভারতবর্ষে লোহালক্কড় প্রস্তুতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানী তিনটী; এই তিনটী কোম্পানীর নাম, দি টাটা আইরন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, দি ইণ্ডিয়ান্ আইরন্ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানী এবং দি বেঙ্গল আইরন্ কোম্পানী। সম্প্রতি এই তিনটী কোম্পানী একজোট হইয়া লোহালক্কড়ের দাম আমদানি মূল্যের সমান রাখিবার জন্য তদ্বির-তদারক করিতেছে। সুতরাং কোনরূপ বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা না করিলেও শতকরা ১০% আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির ফলে লোহালক্কড়ের দাম দেশের মধ্যে বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। ইহাতে একটী অসুবিধা হইতেছে। মেশিনারী প্রস্তুতকারকদিগকে বিদেশজাত ঢালা লোহা ব্যবহার করিতে হয়। আমদানি শুল্কের জন্য ভারতীয় মেশিন-প্রস্তুতকারকগণ বিদেশাগত মেশিনারির সহিত ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। সুতরাং পিগ লোহার উপর আমদানি শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য এই তিনটী কোম্পানী ট্যারিফ বোর্ডের নিকট আবেদন করিয়াছে।

ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট নিম্নলিখিত ২১টী অধ্যায়ে বিভক্ত:—(১) পূর্ব্ব পরিচয়; (২) তদন্ত করিবার কারণ; (৩) ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ; (৪) ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দাবী; (৫) সমস্যার দুই দিক্; (৬) আন্তর্দ্দেশিক দাম; (৭) জোট হইবার নীতি; (৮) মূল্যের উপর শুল্ক দূর করিবার ফলাফল; (৯) মেশিনারি প্রস্তুতকারকদিগের কি হইবে; (১০) জোট বাঁধা কোম্পানী-গুলির নীতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা; (১১) লোহালক্কড় প্রস্তুতকারকদিগের কি হইবে; (১২) ইস্পাত-শিল্প সংরক্ষণের ফলাফল; (১৩) দি টাটা আইরন্ এণ্ড্ ষ্টীল্ কোম্পানী গড়ে কিরূপ দাঁও পাইয়া

থাকে; (১৬) বর্ত্তমানে শুল্ক দূর করিবার অসুবিধা; (১৭) মাইসোর আইরন ওয়ার্কস্; (১৮) লোহাকড়ের উৎপাদনের খরচা; (১৯) কিরূপ দাম পাওয়া যায়; (২০) মাইসোর আইরন ওয়ার্কস ভারতের কি উপকার করিয়াছে বা করিতে পারে; (২১) একচেটে হওয়ার নীতি সম্পর্কে অভিযোগাবলী; (২২) অনুসন্ধানের ফলাফল; (২৩) প্রাপ্তি স্বীকার।

ট্যারিফ্ বোর্ডের অনুসন্ধানের ফল

ইতিপূর্ব্বে ইস্পাত-শিল্প সংরক্ষণের জন্য যে সোপারিশ স্থির করা হইয়াছে। সিং আইরন আমদানির শুল্ক উঠাইয়া দিলে তাহার কোন ক্ষতিই হইবে না। তবে ইহাও সত্য যে এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে মেসিন প্রস্তুতকারীদের বিশেষ কোন লাভ হইবে না। আমদানি শুল্ক ধার্য্য থাকিলেও মেশিনওয়ালাদের আমদানি মেশিনের সহিত প্রতিযোগিতায় বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। পক্ষান্তরে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করিয়া লইলে আইরন কোম্পানীগুলির আয় কমিয়া যাইবে এবং টাটা আইরন এণ্ড ষ্টীল্ কোম্পানীর বাৎসরিক আয় প্রায় ১ লাখ টাকা কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ টাটা কোম্পানীর বিগত বর্দ্ধঘটের মুখে শুল্ক প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা বর্ত্তমানে অসম্ভব ব্যাপার। আবার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মাইসোর আইরন ওয়ার্কস্এর অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। এই লোহার কারখানাটী অতি সুনামরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। মাইসোর আইরন্ ওয়ার্কস্ পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীগুলির সহিত এক জোট হয় নাই; সুতরাং ইহার কাজের অসুবিধা হইলে দেশবাসীই তাহার ফল ভোগ করিবে। জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে মহীশূরের কারখানার আরও অনেক উপকারিতা দেখা যায়; কারণ এই কারখানায় বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরীর উপযোগী এমিটোল্ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং শুল্ক-প্রত্যাহার সম্বন্ধে আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, বাস্তবিক পক্ষে এখন পর্য্যন্ত এমন কোন অবস্থার আবির্ভাব হয় নাই, যাহার জন্য এইরূপ একটী ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করা যাইতে পারে। ১৯৩৩-৩৪ সন বা তাহার পূর্ব্বে ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কে ট্যারিফ্ বোর্ড কমিটি বসিবার কথা। যতদিন এই তদন্ত না আরম্ভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পিগ লোহার উপর আমদানি শুল্ক ধার্য্য থাকিলে লোহা-ক্রয়কারীদের বিশেষ কোন অসুবিধা না হইবারই কথা। যখন এই তদন্ত করা হইবে তখন যদি এমন অবস্থা দেখা যায় যে, আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দিলেই ভাল হইবে, তবে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত

১৯৩১ সনের ১৩ই জুন তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট ট্যারিফ্ বোর্ডের সিদ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছেন।

ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎ—অন্ধকার?

শ্রীযুক্ত হবার্ট ডাব্লিউ ব্রক কলিকাতার রোটারি ক্লাবের এক অধিবেশনে "ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেকার সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় অনেক ভাববার কথা আছে। সেই জন্য বক্তৃতাটীর সার মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত ব্রক ব'লছেন যে, গত লোকগণনায় জানা গিয়েছে যে ভারতের বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ কোটি ১৫ লাখ। ১৯২১ সনে ভারতের লোক-সংখ্যা ছিল ৩২ কোটি ১০ লাখ। বৃদ্ধি হয়েছে ৩ কোটি—প্রতি বছরে ৩০ লাখ হিসাবে। ইংলণ্ড ওয়েলস্ ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা যত, গত ১০ বছরে তার চু অংশ লোক ভারতে বেড়েছে। ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সমবেত লোক-সংখ্যার চেয়েও বেশী। লোকসংখ্যা ও' এই হারে বাড়ছে। কিন্তু তাদের খাওয়াবার পরাবার উপায় কি? গত কয়েক বছরে ক্যাটরী শিল্প বাড়াবার জন্য নানা চেষ্টা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সহরগুলা, শ্রীযুক্ত ব্রকের মতে, সহরে যে সংখ্যাধিক্য দেখা যাচ্ছে তাদেরই কোন মতে কাজ জোটাচ্ছে, মফঃস্বলের লোকের কাজ জুটছে না। ভারত যেসব তৈরী মাল আমদানি

করে, সেগুলা যদি তারতেই তৈরী হ'তে পারে তা হ'লে, ব্রুক্ মনে করেন যে, বড় জোর আরও দশ লাখ লোকের কাজ জোটানো সম্ভব হবে। কিন্তু, তাতে ত' বছরে যে ত্রিশ লাখ লোক বাড়ছে, তাদের সকলের কাজ আদবেই জুটবে না। এই কারণে তিনি বলেন যে, শুধু ফাক্টরী-শিল্পই নয়, তারতের আর্থিক উন্নতির জন্য আমদানি-করা জিনিষগুলা তারতেই তৈরী করার জন্য ফাক্টরী ত চাই-ই, তা ছাড়া যে দিকে যা কিছু করা যেতে পারে তা বিনা বিলম্বে করা দরকার।

শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রুক বলেন যে, এর একটা প্রধান বাধা হচ্ছেন গ্রাম্য মহাজনের দল। গ্রাম্য মহাজনেরা বেশী হারের সুদে টাকা ধার দেন, তাতে চাষীরা আরও ঋণে জড়িয়ে পড়ে, কাজেই তাদের ক্রয়-শক্তি কমে যায়। তাদের ক্রয়-শক্তি কমাতে তারা শিল্প-জাত মাল কিন্‌তে পারে না। বর্ত্তমানে কৃষির অবস্থা শোচনীয়। তার ফলে চাষীদের মোট ঋণ ১৪০।২০০ কোটি টাকা বেড়ে প্রায় ৮০০ কোটিতে দাঁড়াবে ব'লে শ্রীযুক্ত ব্রুক মনে করেন।

প্রধান প্রধান মালগুলার আন্তর্জ্জাতিক দাম আজকাল খুব কম। এই দাম ক'মে যাওয়ার জন্যই আজ তারতীয় চাষীর দুর্দ্দশা। তার দুর্দ্দশার ফলে গভর্ণমেণ্টের আয় কমে গেছে। শিল্প-বাণিজ্যেরও অবস্থা সঙ্গীন। প্রধান প্রধান মালগুলার বর্ত্তমান অল্প দামই যদি স্থায়ী দামে পরিণত হয়, তা হ'লে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা কাটবে না। সেইজন্য শ্রীযুক্ত ব্রুক বলেন যে, বর্ত্তমান অল্প দামের হার যাতে স্থায়ী না হয়, তাই করাই তারতের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল।

তারতের চাষীদের অবস্থা ভাল না হ'লে তারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল হবে না। আবার, তারত ইয়োরোপের একটা বড় বাজার। তারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না হ'লে ইয়োরোপের দুর্দ্দশা ঘুচ্‌বে না। ইয়োরোপের ও তারতের উন্নতি একই সূত্রে গাঁথা। এই কথাটা বিশেষ ক'রে বোঝা দরকার।

নিখিল-জগৎ বাণিজ্য-আদালত

যুদ্ধের পর হ'তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার শুল্ক-মেশিন অনেক উঁচু করেছে। তার ফলে বিদেশীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইচ্ছামত মাল বেচ্‌তে পারছে না। যার দেনদার তাদের দেনা শোধ দিতে হবেই অথবা সুদ পাঠাতে হবেই। কিন্তু মাল পাঠানোতে বাধা হওয়ায়, তারা সোনা পাঠাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেশী সোনা জড় হওয়ায় 'স্পেকুলেশন' বেড়েছে।

এ দিকে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও এক একটা শিল্পে এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান সারা শিল্পের ওপর প্রায় একাধিপত্য করছে বল্‌লেই চলে। প্রত্যেক শিল্পের কার্য্যকলাপ বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলা বিশেষরূপে দর শাসন ক'রছে। এবং তাদের নির্দ্দিষ্ট দরের নীচে কাউকে বেচ্‌তে দিচ্ছে না। যদি কেউ বেচে, তার সঙ্গে দরের যুদ্ধ ঘোষিত হয়। এক এক শিল্পের ভাগ্য এইরূপভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত হওয়ায়, এবং দেশের বাহির হ'তে প্রতিযোগিতা না থাকায়, উৎপাদনের পরিমাণ খুব বাড়ছে। অথচ বিক্রয় সেই পরিমাণ বাড়ছে না। মার্কিণ শিল্পীরা তাঁদের জমানো টাকা থেকে বিজ্ঞাপনের জন্য যথেষ্ট খরচ করলেন। তাতে অবস্থা ভাল হ'লেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। কিস্তিবন্দি-প্রণালীতে কেনা-বেচা চলিত হ'ল। কিন্তু যতদূর জানা যায়, অনেক সময়ে নিয়মিতভাবে কিস্তির টাকা আদায় হয় না। বিদেশেও সব শুল্কের পাঁচিল উঁচু ক'রছে, কাজেই বিদেশে মাল বেচার ক্ষেত্রও ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছে।

এই সব কথা আলোচনা ক'রে শ্রীযুক্ত হাইন্ টমসন্* বলেন যে, শুল্ক ইচ্ছামত বাড়ালেই হবে না। তার ফলাফল কি রকম হয় সে বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা করা দরকার। অবশ্য এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ট্যারিফ্ কমিশন আছে। কিন্তু, কোন শুল্ক বাড়ানো উচিত কিনা, তা বিচার করবার সময় ট্যারিফ কমিশন আমেরিকার কথাই বেশী ক'রে ভাবে।

* অ্যাটার্ণি-অ্যাট্-ল, ওয়াশিংটন, আমেরিকা।

শ্রীযুক্ত টমসনের মতে তা করলে আর চল্‌বে না। বিদেশের ওপর প্রভাবটাও দেখ্‌তে হবে। জার্ম্মাণদের ক্রয়-শক্তি কমাতে তারা ডেন্মার্কের মাখন আমদানি কমিয়ে দিলে। তাতে ডেন্মার্ক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪ লাখ পাউণ্ডের জায়গায় ৮০ লাখ পাউণ্ড রপ্তানি বাড়িয়ে দিলে। রপ্তানি-বৃদ্ধি দেখে মাখনের উপর যে শুল্ক আছে, তা পাউণ্ড-প্রতি আড়াই সেণ্ট থেকে ৬ সেণ্টে বাড়িয়ে দেওয়া গেল। এতে মার্কিণ চাষীদের বহুতো সুবিধা হ'ল। কিন্তু ডেন্মার্ক এই ধাক্কা খেয়ে স্থির ক'রলে যে, সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলার বীজের কেক্ কিন্‌বে না, তার বদলে জার্ম্মাণি থেকে ফ্ল্যাক্সের বীজের কেক্ কিন্‌বে। এর ফলে, মার্কিণ চাষীরা যেমন একদিক্ থেকে লাভ ক'রলে, অপর দিকে তেমনই তাদের লোকসান হ'ল।

সেইজন্য, শ্রীযুক্ত টমসন্ প্রস্তাব করছেন যে, সারা জগৎ জুড়ে একটা বাণিজ্য আদালত স্থাপন করা হ'ক। যখনই কোন আমদানি-শুল্ক স্থাপন করা বা বাড়ানো হবে, তখন তার ফলে কোন্ দেশের কিরকম ক্ষতি হ'তে পারে, কোন্ দেশ কি রকম প্রতিশোধ নিতে পারে, আর এই সব আলোচনা ক'রে শুল্ক স্থাপন করা বা বাড়ানো উচিত কিনা, তা আদালত জানাবেন। আদালতের রায় ও সিদ্ধান্ত সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই আদালতের মতামত যে কোন দেশকে মানতে বাধ্য করা হবে তা নয়। কিন্তু বিশেষ শুল্ক স্থাপন বা বাড়ানোর আন্তর্জ্জাতিক ফলাফল বুঝে কোন দেশ সম্বন্ধে আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে না। তার ফলে, খোকার মত অথবা সকল দিক্, বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিক ফলাফল, ভাল ক'রে বিবেচনা না ক'রে শুল্ক-বৃদ্ধি করার প্রবণতা অনেকটা বাধা পাবে।

শ্রীযুক্ত টমসন্ এই সম্পর্কে আরও বলেন যে, বাণিজ্য-রাজ্যের ধুরন্ধরদের আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। বাণিজ্যের উত্থান-পতন ভোক্তাদেরই ক্রয়-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কাজেই তাঁদের কার্য্য কলাপ যাতে ভোক্তা-দের ওপর অত্যাচারে পরিণত না হয়, বরং তাঁরা যাতে ভোক্তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেতে পারেন তার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ছাত্রাবাসে বাঙ্গালী ছাত্রের জীবন-যাত্রার প্রণালী

[নীচের কথাবার্ত্তা হইতে কোন কলেজ হষ্টেলের বাসিন্দা ছাত্রদের জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। এই কথোপকথন বহুদিন পূর্ব্বে কোন হষ্টেল-কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে হইয়াছিল।]

প্রঃ—আপনার এই হষ্টেলটি কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

উঃ—১৯১৪-১৫ সনে।

প্রঃ—এখানে কয়টি ছাত্রের থাকিবার স্থান করা হইয়াছে?

উঃ—৫২টির। এই হষ্টেলটি চারতলা। আমাদের আর যে সব হষ্টেল আছে সেগুলির কোনটিই চারতলা নহে। এর একতলায় ৭টি, দোতলায় ৭টি, তিনতলায় ১৮টি, চারতলায় ১৬টি ঘর আছে।

প্রঃ—আপনাদের ঘরের সংখ্যা ৪৮টি এবং ছাত্র আছে ৫২টি মাত্র। সমস্ত হষ্টেলটার অবস্থান দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি?

উঃ—বুঝাইতেছি। একতলায় ৭টি ঘরে ৭টি ছেলে থাকে। তার পাশে লাইব্রেরী, পানের ঘর, লোকজন আসিলে তাদের বসিবার ঘর, রান্নাঘর, ছেলেদের ড্রয়িংরুম। রান্নাঘরে একদিকে রান্না হয়, অন্যদিকে ছেলেরা বসিয়া খায়। ড্রয়িংরুমে বেঞ্চ পাতান আছে, রবিবার দিন প্রার্থনা হয় ও অন্যান্য সময়ে ছেলেরা সভা সমিতি করে; আর অন্যদিকে পিংপং ও ক্যারোম খেলিবার বন্দোবস্ত আছে। বাহিরে খুব বড় উঠান। উঠানে ব্যাডমিন্টন খেলিবার তিনটি কোর্ট আছে। সেই ব্যাডমিন্টনের কোর্টের উপরেই বাস্কেট বলও খেলা হয়। পশ্চিম দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া স্নানের ঘর। খুব বড় চৌবাচ্চা, দুইটি কল, তাছাড়া ছেলেদের কাপড় রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পাঁচটি পায়খানা ও পাঁচটি প্রস্রাবের স্থানও দেখা যাইবে। এই গেল একতলা। দোতলায় ৭টি ঘরে ৭টি ছেলে থাকে, আর তার পাশে হষ্টেল-কর্ত্তৃপক্ষের পরিবার লইয়া থাকিবার ব্যবস্থা আছে। দোতলায় আলাদা একটি পায়খানা ছাত্রের জন্য ও রোগীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। তিনতলায় ১৮টি ঘরে ২০টি ছেলে থাকে—দুইটি ঘরে দুইজন করিয়া থাকে। তাছাড়া স্নানের ঘর। চারতলায় ১৮টি ঘরের ১৬টিতে ১৮টি ছেলে থাকে—দুইটিতে দুইটি করিয়া, আর বাকী দুইটি ঘর কর্ত্তৃপক্ষের সহকারীর থাকিবার ও অফিসের জন্য।

প্রঃ—আপনারা কি ধরণের ছেলে হষ্টেলে গ্রহণ করেন?

উঃ—দেখুন, আমরা সাধারণত মফস্বলের ছেলেদের কথাই আগে ভাবি। যতদূরের ছেলে হয় ততই তার থাকিবার ব্যবস্থার কথা আগে ভাবা উচিত। সব ছেলেকে চোখে দেখিয়া পছন্দ করা সম্ভব নহে। যে সব ছেলে পরীক্ষায় ভাল করিয়াছে শুধু যে তাদের লই তা নয়, যারা খেলাধূলায় ভাল, অথবা যারা অন্য কোন প্রকার উৎকর্ষ দেখাইয়াছে—তা শারীরিক হোক্ বা মানসিক হোক্—তাদেরও লইয়া থাকি। খেলাধূলার বন্দোবস্ত ত প্রত্যেক হষ্টেলে আছেই, তাছাড়াও বিভিন্ন হষ্টেলের মধ্যে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা প্রতি বছর হইয়া

থাকে। আমাদের হষ্টেলের কোন কোন ছেলে যেমন বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তেমনি ফুটবল ইত্যাদি খেলায়ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। মোট কথা, আমাদের লক্ষ্য থাকে সেই সব ছেলের দিকে যারা হষ্টেলের সমষ্টি জীবনকে সকল দিক্ দিয়া পুষ্ট করিতে সমর্থ।

প্রঃ—হষ্টেলে অস্বাস্থ্যতা বা অন্যপ্রকার সমস্যা দেখা দিলে কি করেন?

উঃ—চুরি প্রভৃতি দোষের জন্য কখনো শাস্তিস্বরূপ হষ্টেল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। সাধারণত হষ্টেলের ছেলেরা নিয়ম মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত। অন্যতর কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে ছেলেকে না তাড়াইয়া উপায় নাই।

প্রঃ—আপনার হষ্টেলের আয়ব্যয়ের অবস্থানটা কিরূপ?

উঃ—আগে হষ্টেলের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল। হষ্টেল প্রতিষ্ঠার ৪।৫ বৎসর পরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা ছেলেদের হাতে আসে। তাতে খরচটা দুই খাতে বিভক্ত হয়। প্রথম খাতে সীটরেন্ট বাবদ্ ৭৲৭৸০ টাকা লওয়া হয়। তাহাড়া বিজলী বাতি, ডাক্তার, লাইব্রেরী প্রভৃতির জন্য কিছু কিছু লওয়া হয়। পূর্ব্বে খাওয়ার খরচটা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু 'মেস' হওয়ার পর হইতে ১৩৲১৪৲৫ টাকা পড়ে অর্থাৎ বিভিন্ন মাসে বিভিন্নরূপ খরচ হয়। মোট খরচ প্রায় ২৩৲২৪ টাকা।

প্রঃ—আপনারা প্রত্যেক ছেলের নিকট সীটরেন্ট ইত্যাদি বাবদ যে টাকা লন তাতে প্রতি মাসে ৩৫৲৲'৪০৲ টাকা উপার্জ্জন করেন। এটাকে লাভ বলিতে হইবে।

উঃ—না মহাশয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন এই হষ্টেলটা তৈরী করিতে প্রায় ১¾ লাখ টাকা খরচ হইয়াছে। এই টাকা ধারস্বরূপ লওয়া হইয়াছে। আমরা প্রতি বৎসর সীটরেন্ট ইত্যাদি বাবদ্ যা পাই তাতে কার্য্যে বৎসরের সুদটাই শোধ হয়। সুতরাং লাভের জন্য হষ্টেল খোলা হয় নাই একথা বলা চলে।

প্রঃ—ছেলেদের খাইবার ব্যবস্থা কিরূপ?

উঃ—সকাল বেলা জলখাবার দেওয়া হয় না। দুপুরে ও রাতে ভাত আর বিকালে ৬ খানা করিয়া লুচি দেওয়া হয়। বিকালে রুটির বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। পীড়িত হইলে রুটির ব্যবস্থা নাই। ভাত বলিতে বুঝিতে হইবে ডাল, ভাত, ভাজা, তরকারী, মাছের ঝোল। ডিম ও মাংস মাঝে মাঝে দেওয়া হয়।

প্রঃ—ছেলেরা নিজেরা সকালে কিছু খায় কি?

উঃ—কোন কোন ছেলে খায় না। কিন্তু অনেকে আবার নিজেরা চায়ের ও পাউরুটীর বন্দোবস্ত করিয়া লয়। তাতে এক এক জনার ৫।৭৲ টাকা খরচ হয়।

প্রঃ—সুতরাং অনেক ছাত্রই ৩০।৩২৲ খরচ করে। বাড়ী থেকে সাধারণত তাদের কত টাকা আসে?

উঃ—অল্প কয়েক জনের ৩০৲ টাকা মাত্র আসে। ৩০৲ হইতে ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত আধা-আধি ছেলের আসে। ৪০৲ টাকা অনেকের আসে। ৫০৲ টাকা অল্প কয়েকজনের আসে। পকাশের বেশী কচিৎ কাহারো আসে। খরচের পরিমাণও বিভিন্নরূপ। এমন ছেলে আছে জানি যাহার বাড়ী হইতে ৩০।৩২৲ টাকা আসে এবং সকালে না খাইয়া সে মাসে ৫।৭৲ টাকা করিয়া জমায়। আবার ৫০৲ টাকা যার আসে মাসের শেষে তার এক পয়সাও হাতে থাকে না, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

প্রঃ—ছেলেদের সামাজিক জীবন কিরূপ?

উঃ—ছেলেরা সাধারণত খেলাধূলা ও পড়াশুনা লইয়াই থাকে। খুব বেশী পড়ে না। বাহিরের বই পড়ার অভ্যাস আছে তা লাইব্রেরী দেখিলে বুঝা যায়। কাগজ একখানি হাতে পেলিয়া চালায়। মাসে মাসে সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা করে। পূজার পূর্ব্বে বা অন্য সময়ে অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করিয়া পূর্ব্বতন ছাত্রদের সহিত মিলিত হয়, আমোদ প্রমোদ ও খাওয়া দাওয়া করে। চাঁদা তুলিয়া এইসব উপলক্ষে খরচ করে ও যাহাদের নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা আছে এই সূত্রে তার সুযোগ পায়।

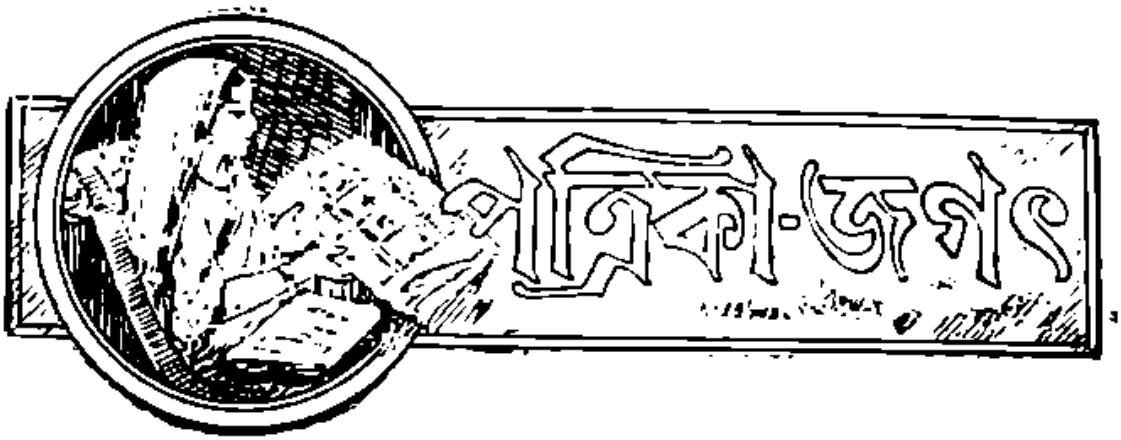

"পঞ্চায়েৎ"—ঢাকা

বীমার বাজারে ব্যভিচার

"ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যখন সহস্র সহস্র স্বদেশ-প্রেমিক স্ত্রী-পুরুষের আত্মত্যাগের ফলে স্বদেশী প্রব্যের পক্ষে একটা সুন্দর মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি স্বার্থপর লোক সরলপ্রাণ কৃষক ও গরীবকে ঠকাইয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লইতেছে। তাহারা বঞ্চননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক শ্রেণীর "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" কোম্পানীর জাল বিস্তার করিয়াছে। এবং ইহার মধ্যে গরীব, সরলপ্রাণ এবং নিরক্ষর কৃষকগণ ধরা দিতেছে। তাহাদিগকে ফাঁদে ফেলিবার উদ্দেশ্যে এইসকল কোম্পানীর এজেন্টগণ নিজেদের পকেট পূর্ণ করার জন্য স্বদেশী মনোভাবের অপব্যবহার করিয়া দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিতেছে। যাহাদের (কৃষকদের) জন্য এমন চালাকির সহিত ফাঁদ পাতা হইয়াছে তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য আহমদাবাদের "প্রভিডেন্ট সোসাইটী তিজিলেন্স কমিটী" যে উচ্চ ধরণের কাজে হাত দিয়াছেন তজ্জন্য ঐ কমিটীর কর্মীদিগকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার নির্দ্দেশানুসারে গঠিত ঐ কমিটীর রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, বঞ্চননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" কোম্পানী-গুলি স্বদেশী বীমা অনুষ্ঠানের সম্মুখে একটা অভিসম্পাৎ-বিশেষ এবং ইহা কৃষকদের সম্মুখে একটা ফাঁদ। সুতরাং যত সত্বরে উহারা নষ্ট হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

আমি আশা করি যে, চালাকির সহিত স্থাপিত এই জালে পতিত না হওয়ার জন্য "তিজিলেন্স কমিটী" কেবল মাত্র সরলপ্রাণ কৃষকদিগকে সতর্ক করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন না, অধিকন্তু যাহারা ইতিমধ্যেই ঐ জালে আবদ্ধ হইয়াছে—তাহাদের প্রদত্ত টাকার যত বেশী অংশ আদায় করিয়া দেওয়া যায় তার জন্যও চেষ্টা করিবেন।

এই সকল বাজে কোম্পানীর জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করাও পাপ। আমি মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রসমূহের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন উহাদের বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া সহায়তা না করেন।"

ভারতীয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল উপরি উক্ত মর্ম্মে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। কংগ্রেস নিযুক্ত "প্রভিডেন্ট সোসাইটী তিজিলেন্স কমিটী" বহু কোম্পানীর ভিতরের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া এবং বীমা বিষয়ের উপদেষ্টা এক্‌চুয়ারিগণের মতামত শুনিয়া এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" কোম্পানী প্রাথমিক ভর্ত্তির ফি ৪৷৹ টাকা, বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকা এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারীশদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যে অনধিক ১৲ টাকা হিসাবে মাসিক লইয়া বীমা চুক্তির অনুকরণে চুক্তিপত্র দিতেছেন উহা বীমা বিজ্ঞানসম্মত নহে এবং উহার ফলে প্রত্যেকটী কোম্পানী অদূর ভবিষ্যতে তাদের দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। এই বিষয়ে গত ৩০শে জুলাই তারিখের "হরিজন" পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী কি লিখিয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য।

বীমা কোম্পানীগুলির আইনকানুনগুলি সমস্তই বীমা-বিজ্ঞান-সম্মত এবং অভিজ্ঞ এক্‌চুয়ারিগণের দ্বারা অনু-

বোধিত। বহুকাল হয় বীমা কোম্পানীগুলি মানুষের মনে তাদের নির্ভরিতা সম্বন্ধে যে ভাব সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার ষোল আনা সুবিধা ভোগ করার জন্য বীমা আইনের বাইরে প্রভিডেন্ট সোসাইটীর আইন মত রেজেষ্ট্রারী হওয়া সত্ত্বেও "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" কোম্পানীগুলি সর্ব্বদা আপনাদিগকে বীমা কোম্পানী বলিয়া পরিচিত করিতেছে। ফলে ইহাদিগকে প্রকৃত বীমা কোম্পানী মনে করিয়া অনেকে ঠকিবেন। তারপর এই সকল বাজে কোম্পানী বীমা কোম্পানী বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় ইহারা নষ্ট হওয়ার পর অশিক্ষিত লোক আসল বীমা কোম্পানীর প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। পল্লীতে পল্লীতে ক্রমশঃ জীবনবীমার ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় প্রতিপালকের অকাল-মৃত্যুর পর বহু নাবালক নাবালিকা ও বিধবাদিগকে রক্ষার যে ব্যবস্থা হইতেছিল তাহাও কতকটা উহার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

মানুষ না বুঝিয়া অন্যায় করিলে এবং অন্যায় বুঝিয়া অনুতপ্ত হইলে তাহাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু অন্যায়-কারী যদি অপরে অন্যায় বুঝাইয়া দেওয়ার পরেও অন্যায় কর্ম করিতে থাকে, তবে তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" কোম্পানীর পরিচালকগণ বীমা বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতা লইয়া এবং এক্‌চুয়ারিগণের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া নিজেদের খেয়ালমত যে চুক্তি প্রবর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন তাহা খুবই অন্যায় হইয়াছে। এখনও দেশবাসী তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে, যদি তাঁহারা ঐ রকম "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়া এক্‌চুয়ারিগণের মত লইয়া নূতন কোনও বীমার ব্যবস্থা করেন। এক্‌চুয়ারিগণের মতের বিরুদ্ধে যদি তাঁহারা "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" চালাইবার জন্য জেদ করেন তবে দেশ ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না এবং প্রতারক বলিয়া চিনিয়া রাখিবে। এই সকল বাজে কোম্পানীর এজেন্টগণ যেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে নিজ নিজ কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক বর্জ্জন করেন। তাঁদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মাসিক ১৲ টাকা মাত্র দিয়া তাঁদের গরীব মক্কেলগণ প্রকৃত জীবন বীমা কোম্পানীতে বীমা করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা "হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ অফিস", ঢাকা—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ-লেখকের সহিত পত্র-ব্যবহার করিলে কিংবা দেখা করিলে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে যে, মাসিক ১৲ টাকা খরচ করিয়া কিংবা আরও ২।১ টাকা বেশী দিয়া তাঁদের স্বাস্থ্যবান মক্কেলগণ বাংলা দেশের মধ্যে প্রাচীনতম, ৪০ বৎসরের পুরাতন একটা কোম্পানীতে ৫০০৲ টাকার জীবন বীমা করিতে পারেন। ইহার বার্ষিক প্রিমিয়াম বাজারে সব চেয়ে কম বলিয়া গরীব লোকদের পক্ষে খুব পুরাতন ও শক্ত কোম্পানী হিসাবে এখানে ৫০০৲ টাকার জীবনবীমা করা সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলের বিষয় হইবে। প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর মরিলেও যেখানে চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহাই প্রকৃত বীমা কোম্পানী, ইহা যেন বীমাকারী জনসাধারণ মনে রাখেন।

• • • • •

সব দিক্ ভাবিলে যাদের একটু বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাহারা শক্ত ও পুরাতন বীমা কোম্পানীর ৫০০৲ টাকার চুক্তি ত্যাগ করিয়া "ফ্রি ইন্‌সিওরেন্স" নামক প্রভিডেন্ট কোম্পানী নির্ব্বাচন করিয়া ঠকিতে যাইবেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

"তন্তু ও তন্ত্রী"—কলিকাতা।

দুগ্ধের ভেজাল

দুগ্ধ শিশু ও রোগীর প্রধান খাদ্য এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকামী মানবমাত্রেরই ইহা অত্যাবশ্যক খাদ্য। ইহা যাহাতে বিশুদ্ধ হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত উচিত। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক লোকে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত নানারূপ মিষ্টান্ন ব্যবহৃত হয়। এই নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সুস্বাদু ও উপযুক্ত আহার্য্য দ্বারা প্রতিপালিত গাভীর দুগ্ধ ভেজালবিহীন হইলেই তাহাকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাদের গাভী থাকিত কেবল-মাত্র তাহারাই দুগ্ধ বিক্রয় করিত। অধুনা দুগ্ধ একটী পণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে দুগ্ধ সহরে আমদানি করা হয়। দূর দেশ হইতে আনিবার সময়ে যাহাতে দুগ্ধ নষ্ট না হইয়া যায় তজ্জন্য ইহাতে কয়-

ম্যালডিহাইড, বোরিক এ্যাসিড প্রভৃতি স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। দুগ্ধব্যবসায়িগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায় দুগ্ধে জল মিশ্রিত করে, কখনও বা দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইয়া সেই দুগ্ধ বিশুদ্ধ বলিয়া বিক্রয় করে। সময় সময় গোদুগ্ধে মহুয়া বালি ও চিনি, ছাগদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ প্রভৃতি মিশ্রিত করে।

ভেজাল ধরিবার উপায়

দুগ্ধব্যবসায়িগণ অনেক সময় দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। অনেক সময় এই জলে কলেরা, টাইফয়েড বসন্ত প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের জীবাণু মিশ্রিত থাকে। এইরূপ দুগ্ধ পান করিলে ঐ সমস্ত রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জল মিশ্রিত আছে এইরূপ সন্দেহ হইলে একটী নেসলার গ্লাসে কিছু দুগ্ধ লইয়া উহা একটী বরফজল-মিশ্রিত কাচপাত্রের মধ্যে রাখিতে হইবে এবং ঐ দুগ্ধের মধ্যে একটি তাপমান যন্ত্র রাখিতে হইবে। যখন উহার তাপ ১৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হইবে তখন ঐ দুগ্ধের মধ্যে একটী দুগ্ধমান যন্ত্র দিতে হইবে। এই দুগ্ধমান যন্ত্র হইতে দুগ্ধের গুরুত্ব জানা যাইবে। গো-দুগ্ধ বা মহিষ-দুগ্ধ বা গোদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ মিশ্রিত দুগ্ধের গুরুত্ব ১০২৮ হইতে ১০৩৫ পর্য্যন্ত হয়। মহিষদুগ্ধের গুরুত্ব গোদুগ্ধের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছু বেশী ও ছাগদুগ্ধের গুরুত্ব গোদুগ্ধের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছু কম।

ব্যবসায়িগণ মহিষদুগ্ধে কিছু জল মিশ্রিত করিয়া, গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া গোদুগ্ধের গুরুত্বের সমান করিয়া বিক্রয় করে। এরূপ অবস্থায় দুগ্ধমান-যন্ত্র দ্বারা ভেজাল ধরা পড়িবে না। এই অবস্থা হইলে উহাতে কি পরিমাণ তৈলজাতীয় জিনিষ আছে তাহা যদি পরীক্ষাদ্বারা বাহির করা যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত গুরুত্বের সহিত অনুপাতে তৈল পদার্থের পরিমাণ মিল যাইবে না, বেশী হইবে। কারণ মহিষদুগ্ধে তৈলজাতীয় পদার্থ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে। ইহা হইতেই ভেজাল প্রমাণ হইবে। মহিষ দুগ্ধ রোগীর ও শিশুর পক্ষে পরিপাক করা বড় শক্ত। সুতরাং এইরূপ ভেজাল দুগ্ধ উহাদিগকে পান করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইলে উহা ঘন হয়। এই নিকৃষ্ট দুগ্ধের সহিত কিছু খাঁটি দুগ্ধ ও জল বা কেবলমাত্র জল মিশ্রিত করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করা হয়। এইরূপ স্থলে দুগ্ধমান যন্ত্র দ্বারা ভেজাল ধরা যায় না। এই স্থলে একটী লেক্‌চার বিম টিউব-এ ১৫ সি-সি দুগ্ধ লইতে হইবে এবং তাহাতে ৩ সি-সি সমভাবে মিশ্রিত হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিড ও এ্যামাইল এ্যালকহল দিয়া ভালভাবে ঝাঁকাইতে হইবে। উহা ঘনীর মত হইয়া যাইবে। তার পর এক-এক সি-সি করিয়া ৯ সি-সি স্যালফিউরিক এ্যাসিড দিতে হইবে এবং প্রত্যেক বার ভালভাবে ঝাঁকাইতে হইবে। এবার উহা আবার তরল আকার ধারণ করিবে। যদি তরল হইয়া না যায় তবে কিছুক্ষণ টিউবটী ফুটন্ত জলের মধ্যে রাখিতে হইবে। তরল হইয়া গেলে উহা সেন্ট্রিফুগাল যন্ত্রে দুই তিন মিনিট ঘুরাইতে হইবে। এবার সমস্ত তৈল-জাতীয় জিনিষ উপরে উঠিবে। এ টিউব-এ যে দাগ আছে তাহা হইতে শতকরা কত ভাগ তৈল-জাতীয় পদার্থ আছে তাহা জানা যাইবে। খাঁটি গোদুগ্ধে শতকরা অন্যূন ৩৫ ভাগ ও খাঁটি মহিষদুগ্ধে অন্যূন শতকরা ৬ ভাগ তৈল জাতীয় পদার্থ থাকে।

দুগ্ধে জল-মিশ্রিত করিয়া ঘন করিবার জন্য উহাতে ময়দা, বালি, এরারুট, সাগো, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। এই স্থলেও দুগ্ধমান যন্ত্র দ্বারা ভেজাল ধরা পড়িবে না।

এইরূপ স্থলে একটী পাত্রে কিছু দুগ্ধ লইয়া তাহাতে পোটাসিয়াম আইওডাইডের সহিত আইওডিন মিশ্রিত করিয়া তাহাতে জল দিয়া গুলিয়া তাহারই একটু লইতে হইবে। যদি ইহাতে ময়দা বালি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে তবে উহার রং নীল হইয়া যাইবে। আর একটী টেষ্ট টিউব-এ প্রায় ১০ সি-সি দুগ্ধ লইয়া তাহাতে ১ সি-সি হাইড্রোক্লোরিক দিয়া তাহাতে আন্দাজ ·১ গ্রাম রোলোর সাইনস দিয়া ৩৫ মিনিট ধরিয়া যদি ফুটানো যায়, তাহা হইলে চিনি বা বাতাসা মিশানো থাকিলে ইহার রং গোলাপী হইয়া যাইবে।

দুগ্ধ ভাল রাখিবার জন্য উহাতে ফরম্যালডিহাইড, বোরিক এ্যাসিড প্রভৃতি দেওয়া হয়। তিন চারি ফোটা ফরম্যালডিহাইড এক কলসী দুগ্ধের মধ্যে দিলে উহা তিন

চারি দিন ভাল থাকে। এই সমস্ত দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। জলের সহিত ম্যাঙ্গেনেট রং গুলিলে তাহা লাল হইয়া যায়। উহার মধ্যে যদি সালফার ডাইক্সাইড প্রবেশ করানো যায় তবে উহার রং আবার শ্বেতবর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে দুগ্ধে ফরম্যালডিহাইড দেওয়া আছে এইরূপ দুগ্ধ উহাতে দিলে উহার রং আবার লাল হইবে।

বোরিক এ্যাসিড আছে এরূপ সন্দেহ হইলে একটু দুগ্ধ একটী পোরসুলেন পাত্রে লইয়া শুকাইতে হইবে। পরে ভাল পুড়াইয়া ছাই করিয়া উহাতে ২।৩ ফোটা সালফিউরিক এসিড্ দিয়া তাহাতে কিছু এ্যালকোহল দিয়া আগুন ধরাইয়া দিতে হইবে। যদি আগুনের রং সবুজ হইয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে ইহাতে বোরিক এ্যাসিড আছে।

দুগ্ধের মধ্যে যে কঠিন পদার্থ আছে, তাহা দুগ্ধের জলীয় পদার্থের সহিত মিশিয়া তরল আকার ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে শতকরা কত ভাগ তৈল-জাতীয় পদার্থ আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর একটী প্লাটিনাম বাটি কেমিক্যাল ব্যালান্স-এ ওজন করিয়া লইয়া তাহাতে আন্দাজ ৫ গ্রাম দুগ্ধ দিয়া ওজন করিতে হইবে। এই ওজন ও পূর্ব্ব ওজনের বিয়োগ ফল হইতে দুগ্ধের আসল ওজন পাওয়া যাইবে। এই দুগ্ধ একটী ষ্টীম বাথ-এ রাখিয়া শুকাইতে হইবে পরে উহা ষ্টীম ওভেন-এ রাখিয়া শুকাইয়া ডেসিকেটর-এর মধ্যে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ওজন করিতে হইবে। এই ওজন ও প্রথম ওজনের বিয়োগ-ফল হইতে দুগ্ধের মধ্যে সমস্ত কঠিন পদার্থের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। দুগ্ধের ওজন হইতে শতকরা কত ভাগ কঠিন পদার্থ আছে তাহা জানা যাইবে। তাহা হইতে তৈল পদার্থের পরিমাণ বাদ দিন। তৈল পদার্থ ছাড়া কত কঠিন পদার্থ আছে তাহা জানা যাইবে। ইহার পরিমাণ গোদুগ্ধের বেলায় ৮·৫ হইতে কম নয়। মহিষ দুগ্ধের বেলায় ৯ ভাগের কম নহে এবং গোদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ মিশ্রিত হইলে তাহার ৯ ভাগের কম নয়। ইহার কম হইলে বুঝিতে হইবে জল-মিশ্রিত আছে আর খুব বেশী হইলে বুঝিতে হইবে মরদা, চিনি প্রভৃতি কঠিন পদার্থ মিশ্রিত আছে। সুতরাং এই পরীক্ষা হইতেও ভেজাল প্রমাণ করা যায়। আবার এই পরীক্ষায় যে কঠিন পদার্থ পাওয়া গেল তাহা পুড়াইয়া ছাই করিয়া তাহার পরিমাণ জ্ঞাত হইয়াও ভেজাল প্রমাণ করা যায়। দুগ্ধের গুরুত্ব ও শতকরা কত ভাগ তৈলজাতীয় পদার্থ আছে তাহা জ্ঞাত হইলে রিকমণ্ড্স্ স্কেল নামক এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা তৈল ছাড়া কঠিন পদার্থ কত আছে তাহা মোটা-মুটি জ্ঞাত হওয়া যায়।

এই পরীক্ষা ছাড়াও ইহার মধ্যে শতকরা কত ভাগ প্রোটিন আছে, কত ভাগ এ্যালডিহাইড আছে, এবং শতকরা কত ভাগ ল্যাকটোন আছে তাহা পরীক্ষায় জানা যায় এবং তাহা হইতে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা ও ভেজাল প্রমাণ করা যায়। ঐ সমস্ত জানিবার প্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়া এ স্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

দুগ্ধের গুরুত্ব, তৈলজাতীয় পদার্থের পরিমাণ ও তৈল-জাতীয় ছাড়া কঠিন পদার্থের পরিমাণ হইতেই ভেজাল প্রমাণ করা যায়। প্রত্যেকটীর সঙ্গে অন্যটীর আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে। গুরুত্ব বেশী হইবে অথচ তৈল-জাতীয় পদার্থ কম হইবে, এরূপ হইতে পারে না। কঠিন পদার্থ বেশী হইবে অথচ তৈলজাতীয় পদার্থ কম হইবে এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং যদি সমস্তগুলি অনুপাতে না মিলে তবে ভেজাল আছে বুঝিতে হইবে।

ফরম্যালডিহাইড, বোরিক এ্যাসিড ছাড়াও অনেক সময় দুগ্ধ ঠিক রাখিবার জন্য হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ফ্লুওরাইড, সালিসাসিক অ্যাসিড, সোডিয়াম বেনজয়েট, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ইহাদিগকে জানিবারও বিশিষ্ট উপায় আছে। তবে এ সমস্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীঈশচন্দ্র নন্দী।

১। ষ্টাটিষ্টিক্যাল ইয়ার বুক অব্ দি লীগ অব্ নেশানস্ (জাতি মহাসঙ্ঘের তাঁবে প্রকাশিত আর্থিক তথ্য-সঙ্কলন), ১৯০০-০১। জেনেভা, ১৯০১। পৃষ্ঠা ২৯২।

প্রতি বৎসর জাতি মহাসঙ্ঘের আর্থিক বিভাগ হইতে এইরূপ একখানি বহুতথ্য-সঙ্কলিত কেতাব বাহির করা হয়। কেতাবখানি ইংরেজী ও ফরাসী দুই ভাষায় লিখিত। ইহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ স্থান পায় :

(১) ভূমিকা। সিক্কা, ওজন প্রভৃতির পরস্পর বিনিময় পরিমাণ : (ক) ওজন (বিভিন্ন দেশের তুলনা), (খ) অঙ্গ-বদলের উপায়, (গ) বিনিময় তুলনা, (ঘ) বিভিন্ন দেশের সিক্কার তুলনা।

(২) আয়তন ও লোকবল। লোকবলের কথা : (ক) দুনিয়ার আয়তন ও লোকবল (পুরুষ ও স্ত্রীভেদে), (খ) লোকবলের বয়স বিচার (সংখ্যা এবং শতকরা), (গ) পেশা অনুযায়ী লোকবল (ঐ); লোকবলের গতিবিধি : (ক) বিবাহ-সংখ্যা, (খ) মৃত্যু-সংখ্যা, (গ) হাজার করা জন্ম, মৃত্যু, লোক-বলের বৃদ্ধি ও বিবাহ (১৯২১-৩০), (ঘ) শিশু-মৃত্যুর হার (১৯২২-৩০), (ঙ) উপনিবেশ (১৯২৪-২৯)।

(৩) বেকার ও শিল্পদ্বন্দ্ব : (ক) বেকারের সাধারণ তথ্য (১৯২৭-৩১), (খ) বিভিন্ন শিল্প অনুযায়ী তথ্য (১৯২৭-৩০), (গ) শিল্প-দ্বন্দ্ব (১৯২৪-৩০)।

(৪) উৎপাদন, খাদন ও পশুপালন। প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশুর হিসাব (১৯২৬-২৯)। মাছ ও কৃষিজাত পণ্য : (ক) মাছ (১৯২১-২৯), (খ) তিমি শিকার (১৯২০-৩০)—কত তিমি ধরা হইয়াছে, তিমির তৈল। কৃষি-সম্পর্কে তথ্য : (ক) গম (১৯২১-১৯৩০।৩১), (খ) রাই (ঐ), (গ) মেস্‌লিন (১৯২১-৩০) (ঘ) বার্লি (১৯২১-১৯৩০।৩১) (ঙ) ওট্ (ঐ), (চ) স্পেল্ট (১৯২১-৩০), (ছ) ভুট্টা (১৯২১-১৯৩০।৩১), (জ) চাউল (ঐ), (ঝ) আলু (ঐ), (ঞ) চিনির বীট (ঐ), (ট) আখ (১৯২১-১৯২৯।৩০), (ঠ) বীট চিনি (১৯২১-১৯৩০।৩১), (ড) আখ চিনি (ঐ), (ঢ) তামাক (ঐ), (ণ) কফি (ঐ), (ত) কোকো (১৯২১-২৯), (থ) চা (ঐ), (দ) হপ (১৯২১-১৯৩০।৩১), (ধ) রবার (১৯২৩-১৯৩১), (ন) তুলার বীজ (১৯২৩-১৯২৯।৩০), (প) মসিনা (১৯২১-১৯৩০।৩১), (ফ) শণের বীজ (১৯২১-১৯৩০।৩১), (ব) সরিষা বীজ (১৯২১-১৯৩০), (ভ) তিসি (১৯২২-১৯৩০।৩১), (ম) কোপ্রা (১৯২২-২৯), (য) বাদাম (১৯২১-১৯২৯।৩০), (র) সোয়াবিন (১৯২২-২৯), (ল) পাম ও পাম তেল (ঐ), (ব) জলপাই তেল (১৯২১-১৯৩০।৩১), (শ) তুলা (ঐ), (ষ) ফ্লাক্স (ঐ), (স) শণ ও মানিলা শণ (ঐ), (হ) পশম (১৯২৩-২৯), (ং) পাট (১৯২১-৩০), (ঃ) কাঁচা রেশম (১৯২০-১৯২৯)। খনিজ ও শিল্পগত দ্রব্য : (ক) কৃত্রিম রেশম (১৯২২-৩০), (খ) কাঠের মণ্ড (১৯২৩-২৯), (গ) কাগজ ও কাগজের বোর্ড (১৯২৫-২৯), (ঘ) সিমেন্ট (১৯২৩-২৯), (ঙ) সুপ (১৯২১-২৯), (চ) কয়লা (১৯২২-৩০), (ছ) লিগ্‌নাইট্ (১৯২২-৩০), (জ) কয়লা ও লিগনাইট (কয়লা ধরিয়া ১৯২২-৩০), (ঝ) কয়লার খাদন (১৯২৯-৩০), (ঞ) বিদ্যুৎ (১৯২৩-৩০), (ট) পেট্রোলিয়াম (১৯২১-৩০), (ঠ) স্বাভাবিক গ্যাস্ (ঐ), (ড) লোহার ওর্ (ঐ), (ঢ) পিগ লোহা ও কেরো এলয়জ (ঐ), (ণ) ইস্পাত (ঐ), (ত) তামার ওর (ঐ)—কাঁচা, ধাতুর পরিমাণ, (থ) তামা (১৯২১-৩০), (দ) সীসার ওর্ (১৯২১-২৯)—কাঁচা ধাতুর পরিমাণ, (ধ) সীসা (১৯২১-৩০), (ন) দস্তার ওর (১৯২১-২৯)—কাঁচা ধাতুর পরিমাণ, (প) দস্তা (১৯২১-৩০), (ফ) টিন ওর্ (১৯২১-৩০), (ব) টিন (ঐ), (ভ) অ্যান্টিমনি,

(১৯২১-২৯), (ঝ) পাইরাইট্‌স্ (ঐ), (ঞ) বৌক্সাইট (১৯২১-৩০) (ট) এলুমিনিয়াম (১৯২১-২৯), (ঠ) নিকেল (১৯২১-৩০), (ড) সোনা (১৯২২-৩০), (ঢ) রূপা (১৯২৩-৩০), (ণ) নাইট্রেট অব্ সোডা ও নাইট্রেট অব্ লাইম (১৯২১-৩০), (ত) সালফেট অব্ এমোনিয়া (১৯২১-২৯), (থ) সিয়ানামাইড অব্ ক্যাল্‌সিয়াম (১৯২১-৩০), (দ) প্রকৃতিজাত ফস্‌ফেট (১৯২১-২৯), (ধ) বেসিক্ স্লাগ (ঐ), (ন) সুপারফস্‌ফেট অব্ লাইম্ (১৯২১-৩০), (প) পটাস (ঐ), (ফ) প্রকৃতিজাত গুয়ানো (১৯২১-২৯), (ব) সালফেট অব্ কপার (১৯২১-৩০), (ভ) গন্ধক (ঐ), (ম) উৎপাদনের সূচী-সংখ্যা (১৯২৪-৩০)।

(৫) বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদি ; (ক) কটন-স্পিনিং স্পিণ্ড্‌ল (১৯২০-৩০), (খ) আমদানি রপ্তানির দাম (১৯২৩-৩০), (গ) আমদানি রপ্তানির ওজন (ঐ), (ঘ) পণ্যের শ্রেণী অনুযায়ী আমদানি রপ্তানি (১৯১৮-২৯), (ঙ) দুনিয়ার বাণিজ্য (ডলারে, ১৯২৭-২৯), (চ) জাহাজ (১৯২৮-৩০), (ছ) যে সব বাণিজ্য জাহাজ তৈরী হইতেছে (১৯২০-৩০), (জ) মত টন বাহির হইয়াছে (১৯২০-৩০), (ঝ) সাগরের ওপারে গিয়াছে (১৯২১-৩০), (ঞ) ভাড়ার সূচীসংখ্যা (১৯২০-৩০), (ট) মোটর গাড়ীর সংখ্যা (১৯২৯), (ঠ) রেলওয়ে : লাইনের দৈর্ঘ্য (১৯২৯-২৯), (ড) ঐ : যাত্রীর সংখ্যা (১৯২৩-২৯), (ঢ) ঐ ; মাল (১৯২৯-৩০)।

(৬) সরকারী আয়ব্যয়, শিক্ষা-বিষয়ক তথ্য, দর ; (ক) আয়-ব্যয়ের চুম্বক (১৯২৮-৩০), (খ) সরকারী ঋণ ইত্যাদি (ঐ), (গ) নোটের প্রচলন (১৯২২-৩০), (ঘ) সোনা ও বিদেশে স্থিত সম্পত্তি বাবদ্ মৌজুদ্ (ঐ), (ঙ) বাট্টা, ঋণ ও বাদন (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের) (ঐ), (চ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-সমূহের আমানত (১৯২০-২৯), (ছ) সঞ্চয় (১৯২২-৩০), (জ) পুঁজিপাটা বাঁচানো (১৯২৩-৩০), (ঝ) বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার (১৯২৬-৩০), (ঞ) বাট্টার বাজার দর (ঐ), (ট) অংশের সূচীসংখ্যা (১৯২৪-৩০), (ঠ) মত হইতে শতকরা আদায় (ঐ), (ড) মজুরির সূচীসংখ্যা (১৯২৯-৩০), (ঢ) বিনিময়ের হার (ঐ), (ণ) পাইকারী দরের সূচীসংখ্যা (১৯১৩-৩০), (ত) খুচরা দরের সূচীসংখ্যা (১৯১৪-৩০)।

ইহা ছাড়া বর্তমান সংখ্যার বিশেষত্ব হইতেছে ৭টি মাপ। নির্ঘণ্ট ত আছেই।

প্রতি বৎসর জাতি মহাসঙ্ঘ হইতে (১) উৎপাদন ও বাণিজ্য, (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ভের এবং (৩) সরকারী আয়ব্যয় (কখনো কখনো (৪) শিক্ষা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য-সম্বলিত পুথি বাহির হয়। এই সব বাৎসরিকীতে যে খবর থাকে তার চুম্বক মাত্র ষ্টাটিষ্টিক্যাল ইয়ার-বুকে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এই চুম্বকের দাম অনেক ও ইহা প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীর নিকট অপরিহার্য্য বস্তু। জাতি মহাসঙ্ঘের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে প্রশংসার কথা এই যে, প্রতি বৎসর এটাকে উন্নত করার চেষ্টা করা হয় এবং যতদূর সম্ভব নূতন তথ্য যোগাড় করিবার অবিরাম চেষ্টা চলে।

২। মেমরেণ্ডাম অন্ প্রডাক্‌শন আণ্ড ট্রেড্ (দুনিয়ার উৎপাদন ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী) ১৯২৫ সন হইতে ১৯২৯-৩০ সন পর্য্যন্ত। লীগ অব্ নেশান্‌সের আর্থিক বিভাগের তাঁরে প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ, জুন ১৯৩১। স্থান জেনেভা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৯। দর ৩ শি ৩ পে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে এইরূপ একখানি কেতাবের (১৯২৩ হইতে ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত) সমালোচনা করা হইয়াছে (১৩১-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখানে শুধু ২।১ টি বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

১৯২৫ সনের তুলনায় ১৯২৯ সনে দুনিয়ার লোক বাড়িয়াছে ৪%, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালের উৎপাদন বাড়িয়াছে ১১% এবং বাণিজ্য বাড়িয়াছে ১৯%। ১৯৩০ সনের যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে দারুণ আর্থিক দুর্দ্দশা বশতঃ বাণিজ্য ও কাঁচা মালের উৎপাদন কম হইয়াছে অনেক। ১৯২৫ সন হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত দুনিয়ার লোকবল বৎসরে গড়ে ১% করিয়া বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনে দুনিয়ার লোকবল ছিল ১৯৮·২৩ কোটি, ১৯২৯ সনে ধরা হইয়াছে ১৯৯·০৬ কোটি। চীন বাদে ১৫৪·৬৮ কোটি। বিভিন্ন মহাদেশের হিসাব এই ঃ রুশিয়া বাদে ইয়োরোপ ৩৭·০০ কোটি ; রুশিয়া সুদ্ধ ইয়োরোপ ৪৩·৫ ; উত্তর আমেরিকা ১৩·২৫ ; ল্যাটিন

আমেরিকা ১১·৫৫ ; আফ্রিকা ১৪·৪৪ ; এশিয়া (রুশিয়া বাদে) ১০৫·৮০ ; ওশেনিয়া ·৯৭ ।

যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন-সংক্রান্ত সূচী-সংখ্যা কেতাবে স্থান পাইয়াছে সেগুলি এই :

খাদ্যদ্রব্য

প্রধান খাদ্যশস্য	অন্ন খাদ্যশস্য	মাংস
গম	চাউল	গোমাংস
রাই	আলু	ভেড়ার
বার্লি	বীট চিনি	শূকর
ওট্	আখ চিনি	ভেড়া
ভুট্টা		

কাঁচা মাল

বয়ন দ্রব্য	কাঁচা রবার	ধাতু
তামাক	তুলা	কাঠের মণ্ড	পিগ্ লোহা
সজী তৈলদ্রব্য	ফ্ল্যাক্স	রেয়ন তৈরীর মণ্ড	ইস্পাত
তুলাবীজ	শণ	রাসায়নিক মণ্ড	তাম্র
মদিনা	ম্যানিলা শণ	সিমেন্ট	সীসা
লরিবা	পাট	অ্যালনি	দস্তা
শণ	পশম	কয়লা	টিন
তিসি	কাঁচা রেশম	লিগ্নাইট্	এলুমিনিয়াম
		সোডিয়ম্ ক্লোরেট	পেট্রোলিয়াম	নিকেল
		রাবার	রূপা
		কোপ্রা	
		পাম ও পাম কার্নেল তেল	
		রুলপাই তেল	

রাসায়নিক দ্রব্য

প্রাকৃতিক ফস্ফেট
পটাশ
গন্ধক
প্রাকৃতিক গুয়ানো
চিলির নাইট্রেট অব্ সোডা
নাইট্রেট্ অব্ লাইম
সাইনামাইড্ অব্ ক্যালসিয়াম
সালফেট্ অব্ এমোনিয়া
সুপারফস্ফেট অব্ লাইম্
বেসিক্ স্ল্যাগ
সালফেট অব্ কপার

১৯২৫ সনের মূল্যকে ১০০ ধরিয়া ১৯২৯ ও ১৯৩০ সনে (ক) উৎপাদন, (খ) খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন, (গ) কাঁচামালের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে কি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য ১৯৩০ সনের অঙ্ক আনুমানিক।

১৯২৫ = ১০০

	মোট উৎপাদন		খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন		কাঁচা মাল উৎপাদন	
	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯	১৯৩০
ইয়োরোপ (রুশিয়া বাদে)	১১৯	১০৯	১১২	১০৬	১৩০	১১৪
ইয়োরোপ (রুশিয়া সহ)	১১৭	১১০	১১০	১১১	১৩১	১১৯
উত্তর আমেরিকা	১০৫	৯৭	৯৭	৯৪	১১৪	১০০
ল্যাটিন	১০৮		১০৩		১২২	
আফ্রিকা	১১৪		১১৪		১১৫	
এশিয়া (রুশিয়া বাদ)	১০৭		১০২		১১৬	
ওশেনিয়া	১০৮		১০৮		১০৮	
দুনিয়া	১১১	১০৭	১০৫	১০৪	২২০	১১৪

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, ১৯২০ ও ১৯২১ সনে দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা কতটা খারাপ হইয়াছে। মোট উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বিভিন্ন মহাদেশ নিজেদের মধ্যে কি ভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মোটটাকে ১০০ ধরিতে হইবে।

দুনিয়া = ১০০

	খাদ্যদ্রব্য		কাঁচা মাল		মোট উৎপাদন	
	১৯২৪	১৯২৯	১৯২৪	১৯২৯	১৯২৪	১৯২৯
ইয়োরোপ (রুশিয়া বাদে)	২৯·০	৩১·০	২৮·০	৩০·৩	২৮·৬	৩০·৭
ইয়োরোপ (রুশিয়া সুদ্ধ)	৪১·৯	৪৪·২	৩১·৫	৩৪·৬	৩৮·০	৪০·২
উত্তর আমেরিকা	২৫·৮	২৩·৮	৪০·৭	৫৮·৬	৩১·৫	৪২·৯
ল্যাটিন	৯·৬	৯·৫	৫·২	৫·৩	৭·১	৭·৭
আফ্রিকা	২·৭	৩·০	৩·১	২·৯	২·৯	৩·০
এশিয়া (রুশিয়া বাদ)	১৮·৩	১৭·৮	১৬·৯	১৬·৩	১৭·৭	১৭·২
ওশেনিয়া	১·৭	১·৭	১·৬	১·৩	২·০	২·০

১৯২৯ সনে একমাত্র ইয়োরোপে সর্ব্বত্র বৃদ্ধি দেখা যায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকা দুনিয়ার মোট উৎপাদনের ৭১% ও ৭০% এবং খাদ্যদ্রব্যের ৭০% নিজেদের কুক্ষিগত রাখিয়াছে। অর্থাৎ ৬৮।৬৭ কোটি লোক কি না দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তির হাতের কাছে দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ রহিয়াছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী লোক এশিয়াবাসী হইলেও তাদের ভাগে পড়িতেছে প্রায় এক-দ্বাদশাংশ। বলা বাহুল্য ভারতের ভাগ্যে মোটা হিস্যা ধরিলেও ভারত কত দরিদ্র তা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

৩। থার্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন্ দি এবলিশন অব্ ইম্পোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট প্রহিবিশানস্ অ্যাণ্ড রেষ্ট্রিকশানস্। প্রসিডিংস অব্ দি কনফারেন্স। (আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কে বাধা ইত্যাদি রহিত করিবার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী)। ১৯৩০ সনের ২২শে মার্চ্চ প্রকাশিত হইয়াছে জেনেভা জাতি মহাসঙ্ঘের ঔবো ৩০ পৃঃ।

১৯২৭ সনের ৮ই নবেম্বর তারিখে আমদানি রপ্তানির বাধা রহিত করিবার জন্য এক সম্মেলন আহূত হয়। ১৯২৮ সনের ১১ই জুলাই এক অতিরিক্ত সমঝৌতা খাড়া করা হয়। তদনুসারে স্থির থাকে যে, ১৮টি রাষ্ট্র ১৯২৯ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সমঝৌতা মঞ্জুর করিলে বা যোগ দিলে উহা কার্য্যকরী হইবে। দুঃখের বিষয়, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ১৭টি মাত্র রাষ্ট্রের সম্মতি পাওয়া গিয়াছিল। জার্ম্মাণি ১৯২৯ সনের ২৩শে নবেম্বর যোগদান করে। ফলে আরো একটি সম্মেলন ডাকা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই সম্মেলন প্যারিতে ৫ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর (১৯২৯) পর্য্যন্ত বসে। ভূতপূর্ব্ব ওলন্দাজ প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কোলিজিন ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব্বে যে সব রাষ্ট্র সমঝৌতা মঞ্জুর করিয়াছিল তাদের মধ্যে বুলগেরিয়া, চিলি ও শ্যাম ব্যতীত অন্য সকলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল।

সম্মেলনে যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নাম: অষ্ট্রিয়া—ডক্টর আলফ্রেড স্যুয়েনবের্গের*, হাইনরিখ্ স্যিড্। চেকোশ্লোভাকিয়া—ডক্টর বিনসেন্ট ইব্‌ল।

বেলজিয়াম—মুসেস ব্রুনেট্*, সুয়েডেন

ডেন্মার্ক—ওব্ এজেল; হেরমান আন্সের বের্গহোফ্, ফ্রাণ্টসে ক্রিষ্টোফার বিয়ারো বোয়েক* (সহঃ প্রতিনিধি)

ইজিপ্ট—মাহমুদ ফক্‌রি পাশা, লিনাণ্ট ব হেরেসিস

এথোপিয়া—চার্লস মবার্ট পুঙ্গ

ফিন্‌ল্যাণ্ড—হ্যারি হোল্মা, মাউনো নোর্ডেবর্গ (সহঃ প্রতিনিধি)

ফ্রান্স—এলবেল,* আর্ণাল (সহঃ প্রতিনিধি)

জার্ম্মাণি—সুডহিন্‌, ইম্‌হোফ্‌, আন্তোল্‌ফ রেইনহার্ডেন*

গ্রেটবৃটেন ও উত্তর আয়ার্লাণ্ড—সার সীড্‌নি চ্যাপম্যান, ব্রিকিথ্‌স্‌

হাঙ্গেরি—অ্যালফ্রেড্‌ ভি নিক্‌ল,* ডি পেশি (সহঃ প্রতিনিধি)

ভারতবর্ষ—স্যর অতুল চাটার্জ্জি, ই জে টার্ণার (সহঃ প্রতিনিধি)

ইতালি—এ জি নোলা, কারাবেল

জাপান—নোবুমি ইতো,* কাদোহ্যাকি

লাত্‌বিয়া—হিলিস্‌ গুষান্‌স্‌, হানিস্‌ মিরেজিস্‌

লুক্সেমবুর্গ—আলবার্ত কাম্‌স*

নেদারল্যাণ্ডস্‌—এক ই পাতুয়া*

নরওয়ে—সিগার্ড বেস্টভলোন*

পোল্যাণ্ড—মিয়েচৎসিল্ল সোকোলোহ্বস্‌কি, হ্যাচ্‌স কেবিয়েস্‌কিয়েহ্বিচ্‌ৎস, ক্রাহ্‌লুস্‌কি, আডাম্‌ বেনিস্‌. টি লাইকোহ্বস্‌কি (অভিজ্ঞ)

পর্ত্তুগাল—ডি কালহাইরোস্‌ ই মেনেজেস্‌*

রুমানিয়া—ইউজেন নেকুলসি,* সেবার পোপেস্‌কো

সুইডেন—অটো হিলবার্গ হিল্‌পের

সুইট্‌জারল্যাণ্ড—হ্বান্টার ট্রুকি,* ডিটোরেন্টে

তুরস্ক—শাহির জেকাই বে

যুক্তরাষ্ট্র—চার্লস্‌ ই হাহেন*

যুগোস্লাভিয়া—ইলিয়া চৌরোস্কাভিচ্‌*

তারকাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ ও ইতালির পক্ষে ডি মাজোনি এক প্রটোকোল সহি করেন। এই প্রটোকোলের দোষা কথাটা এই যে, আর্ম্মাণ ও নরওয়ে সরকার ১৯২৯ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সমঝৌতা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইল; চেকোস্লোহ্বাকিয়া ও পোল্যাণ্ড ১৯৩০ সনের ৩১শে মের পূর্ব্বে মঞ্জুর করিলে তাহারাও ৩০শে সেপ্টেম্বরের (১৯২৯) সমঝৌতা মঞ্জুর করিয়াছে ধরা হইবে; ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে সমঝৌতা কার্য্যকরী হইবে। পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোহ্বাকিয়া ৩১শে মের (১৯৩১) পূর্ব্বে মঞ্জুর না করিলে ১৯৩০ সনের ১লা জুলাইয়ের পর সমঝৌতা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে না।

বৈঠকের শেষে অবস্থাটা সভাপতির ভাষায় নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে:—৬টি দেশ বিনা সর্ত্তে প্রোটোকোল সহি করিয়াছে; ১টি দেশ সহি করিয়াছে কিন্তু কতকগুলি সর্ত্তে; ২টি দেশ সসর্ত্ত মঞ্জুর করিয়াছে—২৩শে ডিসেম্বর সহি করিবে। মোট ১৭টি হইল। ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেন সহি করিলে ১৯টি পাওয়া যাইবে।

১। "ভোর মোডের্ণ ইন্‌ডাষ্ট্রীয়ালিস্‌মুস্‌" (শেষের বিশ্লেষিটক ১) গুণ্ডিসে ওয়ুন ইণ্ডিয়াস্‌ ভোর নাশিওনালো-য়েকোনোমি। (আধিকার পুঁজিনিষ্ট দুনিয়া। ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণার ধারা)। ডক্টর হের্‌বের্ট ফোন য়েকেরাথ প্রণীত। ওষ্টাব্‌ কিশার, য়েনা। ১৯৩০। পৃঃ ৬+৪৫৪।

২। "দি চ্যালেঞ্জ অব্‌ রুশিয়া" (রুশিয়া যুদ্ধংদেহি আহ্বান করিতেছে), শেরউড্‌ এডি। ফারার অ্যাণ্ড রাইন্‌হার্ট, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩১। পৃঃ ১০+২৭৮।

৩। "ইকনমিক কনসিকোয়েন্সেস্‌ অব্‌ পাওয়ার প্রডাক্‌শন" ("শক্তি" উৎপাদনের আর্থিক ফলাফল), কেড হেণ্ডারসন। আলেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন। ১৯২১। ২২০ পৃঃ। ৬শি।

৪। "ইওর অব অ্যাণ্ড ইওর পে। এ পিক্‌চার অব্‌ দি ওয়ার্ল্ড ইন্‌ ওয়ইচ্‌ উই ওয়ার্ক।" (তোমার কাজ কি, আর পাওই বা কি। যে দুনিয়ায় আমরা কাজ করিতেছি সে দুনিয়াটা কেমন।) ক্যাথেরিন্‌ এইচ্‌ পোলাক ও টম টিপেট্‌। ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩১। পৃঃ ১৪+৩৪৮।

৫। "দি ফরেন রিলেশন্স অব্‌ দি ফেডারেল ষ্টেট্‌" (যৌথ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্বন্ধ), হ্যারোল্ড ভারিষ্ট ষ্টোক্‌। অনস্‌ হপ্‌কিনস্‌ প্রেস, বাল্টিমোর। ১৯৩১। পৃঃ ৭+২৪৫।

৬। "দি ইণ্টারন্যাশনাল আস্‌পেক্টস অব্‌ ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন" (ভারতীয় লোক-চলাচলের আন্তর্জাতিক দিক্‌ নির্দেশ), ডাঃ দত্তাত্রেয়ম্‌।

৭। "এগ্রিকালচারাল পলিসি ইন্‌ ফ্রান্স" (ফ্রান্সের কৃষি-নীতি)। নিউইয়র্কের পোলিটক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টারলি হইতে মুদ্রিত। ১৯৩০।

৮। "দি মেনেস্‌ অব্‌ ওভারপ্রডাক্‌শন। ইট্‌স কজ, এক্সটেণ্ট অ্যাণ্ড রিমেডি।" (অতি-উৎপাদনের বিভীষিকা মূর্ত্তি। কারণ, প্রসার ও প্রতীকার)। জোবিদ ভামলিন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চাপম্যান অ্যাণ্ড হল, লণ্ডন। ১৯৩০। পৃঃ ১০+২০২।

বাস্তু-সমিতি (৫)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, পি-এইচ্-ডি

ইতালি

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সমবায় বাস্তু-সমিতিগুলিকে গৃহনির্ম্মাণের দ্রব্যাদি যানবাহনে আনিবার জন্য রিবেট দেয় ও আমদানি মালের উপর কোন প্রকার কর চাপায় না। এ ছাড়াও ঐ সমিতিসমূহ, বিশেষত সরকারী কর্ম্মচারীদের লইয়া গঠিত বিভিন্ন সমিতি আরো অনেক সুবিধা ভোগ করে। যথা.

(ক) রাষ্ট্রীয় আদালত ও থানার জন্য গৃহ-নির্ম্মাণের সমস্ত টাকাটা ঋণস্বরূপ দিতে অঙ্গীকারবান্। ঋণের টাকা ৫০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধিতব্য ; সুদের পরিমাণ ৪·৬০%।

(খ) ৪·৬০% সুদের মাত্র ১·৬০% বাটীর মালিকরা প্রদান করে, অবশিষ্ট ৩% গবর্ণমেণ্ট সোজাসুজি পূর্ব্বোক্ত খাতের হাতে দিয়া দেয়।

(গ) গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের বেতন ও পেন্সন হইতে ঐ ১·৬০ সুদ আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

(ঘ) প্রথম ২৫ বৎসর বাটীর উপর কোন ট্যাক্স বা কর ধার্য্য করা যায় না।

৫০ বৎসরের আগে কোন কর্ম্মচারী ইচ্ছামত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না।

নরওয়ে ও সুইডেন

সুইডেনে অসংখ্য "স্বকীয় বাটী ঋণ সমিতি" নামক প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের প্রধান কাজ জমি ক্রয় করা ; পরে এই সমস্ত জমি এক একটি পরিবারের জন্য বাটী নির্ম্মাণ অথবা চাষবাস করিতে ব্যবহৃত হয়। বাটী নির্ম্মাণ বা চাষের যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য সমিতি সভ্যগণকে টাকা ধার দেয়। টাকাটা আসে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত "স্বকীয় বাটী ঋণ সমিতি"র নিকট হইতে। এই সমস্ত সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটী। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের শেষে সমিতির তহবিলে ১০ কোটি ক্রোণার জমা ছিল।

বড় বড় শহরে অনুরূপ সমিতি কাজের আছে। এই সব সমিতি বাড়ি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র, পল্লী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে টাকা যোগাড় করে।

বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া ইকহল্মের বাস্তু-সমিতিসমূহ বহু পরিবারের আশ্রয়দান জুটাইবার জন্য সারি সারি (ব্যারাক ধরণের) বাটী নির্ম্মাণ, ক্রয় অথবা তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ প্রায় ১০০টি সমিতির প্রত্যেকটি একটি করিয়া বাটীর মালিক ছিল। এইরূপ সমিতির প্রত্যেক সভ্য পূর্ব্বে টাকা দিয়াছিল বলিয়া বাটীর একটি অংশে (ফ্ল্যাট) স্থায়িভাবে বাস করিতে অধিকারী। কিন্তু অন্য কাহাকেও উহা ভাড়া দিলে যাহার তাহার থাকিবে। কোন সমিতি পরিদর্শন বা নির্ম্মাণ করিয়া বাটীর অধিকারী হইলে এবং প্রত্যেক সভ্যকে বাসগৃহ যোগাইতে সমর্থ হইলে আর নূতন সভ্য গ্রহণ করে না, পুরাতন সম্পত্তির দেখাশুনা করিতে থাকে।

যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরে এই ধরণের সমিতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। এক্ষণে ইকহল্মে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ৪০০ হইতে ৫০০র মধ্যে এবং সমিতির নির্ম্মিত বাটীতে প্রায় ৪০,০০০ লোক বাস করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসরে অন্যান্য শহরেও অনুরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছে।

এইরূপ ধরণের সমিতি এক্ষণে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করিয়াছে। হাতে যথেষ্ট টাকা আসিলেই এই সব সমিতি সারি সারি বাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে এবং সভ্যগণ ইচ্ছা করিলেই বাটীর অংশের জন্য আবেদন করিতে পারে।

বাটীর সমস্ত অংশ সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইবার পর একটি উপসমিতি গঠিত হয় ও ঐ সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, "ইকহল্মের সঞ্চয় ও ব্যাঙ্ক-সমিতি" এইরূপ বহু বিভাগে বিভক্ত হইয়া ৩,০০০ পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

এই সমিতি নিম্নলিখিত উপায়ে টাকা সংগ্রহ করে: সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কোন ব্যাঙ্ক হইতে সম্পত্তির মূল্যের ৫০% থেকে ৬০% টাকা ধার করা হয়। ইহার উপরে বাকী ২০% অথবা ৩০% অর্থাৎ ৮০% হইতে ৯০% পর্য্যন্ত টাকা গৃহীর প্রতিশ্রুতির উপর গবর্ণমেণ্ট ধার দেন; সেজন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হয় ও ঐ টাকা ৩০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধিতব্য। বাকী অবশিষ্ট ১০% টাকা বাটীর অংশ গ্রহণকারী সভ্যগণের দেয়। এই সব সমিতি সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের কার্য্যও অনুষ্ঠান করে।

নরওয়েতে ব্যাঙ্ক-সমিতির অনুরূপ প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেও চলে।

স্পেন

স্পেনের অধিকাংশ সমবায় ব্যাঙ্ক-সমিতিসমূহকে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বা ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন। দুইটি ব্যতিক্রম হইতেছে:

(১) সঞ্চয় ও ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক।

(২) জাতীয় ঘুরঘুটে প্রতিষ্ঠান।

প্রথম প্রতিষ্ঠানটিতে গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে ৪ কোটি পেশেতা চাঁদা উঠিয়াছে এবং উহা অনেক বাটী নির্ম্মাণে লাগিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টির বর্ত্তমান মূলধন ৪০০ কোটি পেশেতা,—উহা সভ্যগণকে সস্তায় বাস্তু নির্ম্মাণ করিতে সাহায্য করে। এই প্রতিষ্ঠান স্বয়ং বাটী নির্ম্মাণ ত করেই, অধিকন্তু মফঃস্বলের বৃদ্ধ বয়সের পেন্সনের জন্য যে চাঁদা উঠে তাহা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-সমিতিকে ধার দেয়,—ঐ সব ব্যাঙ্ক-সমিতির ব্যবস্থা হইল বাটী নির্ম্মাণ। সস্তায় বাস-গৃহ নির্ম্মাণ ও ক্রয়ের জন্য এই সমিতি জীবন-বীমার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সস্তায় গৃহনির্ম্মাণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টের টাকাটা সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার এই সমিতি লইয়া থাকে। এজন্য সামান্য কমিশনও পায়।

সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে একমাত্র স্পেনের প্রতিষ্ঠান দুইটি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া দেশের গৃহ-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। স্পেনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, একমাত্র স্পেনেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাস-গৃহ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাইয়ের রাজকীয় ঘোষণাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য গৃহ-নির্ম্মাণের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

এই নিয়মের ফলে বিভিন্ন প্রধান শহরে ও ৩০ হাজারের অধিক অধিবাসি-বিশিষ্ট শহরে লোকেরা উপকৃত হইবে। সমবায় সমিতি বা ইউনিয়নের সভ্যগণ, সরকারী অর্দ্ধসরকারি কর্ম্মচারী, গ্রন্থকার, শিল্পীও এই নিয়মের দ্বারা উপকৃত হইবে; তবে যাঁহারা এক লক্ষ অধিবাসি-বিশিষ্ট শহরে বা উপকণ্ঠে বাস করেন মাত্র তাঁহাদের জন্য বাটী নির্ম্মিত হইবে।

যাঁহাদের আয় সীমাবদ্ধ ও যাঁহাদিগকে প্রধানত বেতন বা পেন্সনের উপর নির্ভর করিতে হয়, মনোনীত হইলে তাঁহারা বাটী ভাড়া লইতে বা ক্রয় করিতে পারেন। মনোনীত সমবায় সমিতি, কাউন্টি কাউন্সিল বা অন্যান্য কর্পোরেশনও বাটী লইতে পারে।

ঘোষণা সফল করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দশ কোটি পেশেতা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথম বন্ধকী সর্ত্তে জমির মূল্যের ৫০%এর অনধিক এবং গৃহ নির্ম্মাণ খরচার ৬০%এর অনধিক ধার দিতে প্রস্তুত থাকেন। সুদ ৫%। ঋণটা ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধিতব্য। ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহের জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হয় না এবং অন্য অনেক সুবিধাও পাওয়া যায়।

নির্ম্মিত গৃহের অর্দ্ধেক অংশ ভাড়া দেওয়ার জন্য রাখিতে হইবে; ক্রীত গৃহের কিছু অংশ ভাড়া দেওয়ার জন্য রাখিলেই চলে। গৃহ-স্বামী মনোনীত ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু ভাড়া বা ঘর বাড়ানো চলিবে না।

একটি পরিবারের উপযোগী গৃহের নির্ম্মাণ-খরচ ৬০,০০০ পেশেতার বেশী নহে। ব্যবসা হিসাবে নির্ম্মাণকারী ১২%এর

বেশী লাভ করিতে পারিবে না। আর দৈবী বিপদ্ ও তত্ত্বাবধান খরচের জন্য ৩% পাইবার অধিকারী। গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত সমবায় ও ব্যবসায়ী সমিতি যদি বাটীর অর্দ্ধেক নিজ ব্যয়ে তৈয়ার করে, তবে ঐ সব সমিতি নিম্ন খরচের বিভিন্ন পরিমাণ টাকার জন্য ৩০% সুদের "লোন সার্টিফিকেট" বাহির করিতে পারে। ৫% সুদের জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী থাকেন।

সরকারী অসামরিক কর্ম্মচারী ও অন্যান্য চাকুরেরা নিজ নিজ বেতনের ২৫% আলাদা করিয়া রাখিতে বাধ্য। তাহা বাটী নির্ম্মাণের খরচ শোধ করিতে যাইবে। সমবায় সমিতি ঐ টাকা আদায় করিতে পারে। দেয় টাকা শোধ হইলে স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছানুসারে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতে পারে না বলিয়া সরকার হইতে ঘোষণা করানো যাইতে পারে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড

ইংরেজী ধরণের ব্যাঙ্ক-সমিতি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে নাই। গৃহ-সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা জার্ম্মাণ অঞ্চলে একরূপ, ফরাসী অঞ্চলে আবার অন্যরূপ। এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমবায় সমিতিরূপে গণ্য করা চলে। এই সমিতি নিম্নলিখিত দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে: (১) কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া; (২) কিছু অংশ সরকার হইতে কম সুদে বন্ধকী ব্যবস্থায় ধার লইয়া। এই সব সমিতির নিজেদের কণ্ট্রাক্টর ও গৃহ-শিল্পী আছে। এগুলির কর্ম্মক্ষেত্র একটি জেলা বা শহরের ক্ষুদ্র অংশে আবদ্ধ থাকে। প্রয়োজন হইলে ও সুবিধা পাইলে এই সমিতি নির্ম্মিত গৃহ বিক্রয় করে বটে, কিন্তু এইরূপ বিক্রয় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

কল কারখানা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, ফরিদপুর

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে কল কারখানা অধিক ছিল না। যাহা ছিল, তাহাও একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। কিন্তু নানা কারণে উহা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের অনুরূপ কল কারখানা উহার স্থান অধিকার করিতেছে। নূতন নূতন কল কারখানা স্থাপনের জন্য জাতির আকাঙ্ক্ষাও দিন দিন বাড়িতেছে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্রই দেশময় বহু কল কারখানা স্থাপিত হইবে। কিন্তু উহার দ্বারা প্রকৃত উন্নতি হইবে কি না, তাহা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সূচনা কালে দূরদর্শিতা সহকারে কার্য্য না করিলে, পরে অনুতাপ করিতে হইতে পারে।

বিদেশী কলকব্জা এবং বিদেশের আদর্শে স্থাপিত কারখানা নানা কারণে আমাদের দেশের পক্ষে সম্যক উপযোগী নহে। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শীতের আধিক্যবশতঃ কাজ করিবার সময় অল্প। দেশের লোকসংখ্যা কম। অথচ সমস্ত পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এই নিমিত্ত যাহাতে অল্প সময়ে ও অল্প লোকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সুবিধা দেখিয়াই আমরা উহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি বটে; কিন্তু এ সুবিধা আমাদের পক্ষে প্রার্থনীয় কি না, তাহা বিচার করা উচিত।

আমাদের দেশ জনবহুল। কাজ করিবার সময়ও আমাদের প্রচুর। শৈত্যাধিক্য প্রভৃতি এমন কোন প্রাকৃতিক বাধাও এদেশে নাই, যাহাতে কাজ করিবার পক্ষে

আমাদের কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে। এ দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী। ইহারা বৎসরে তিন চারি মাস কাল বসিয়া থাকে, উপযুক্ত কাজ পায় না। এরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্য কলকব্জা স্থাপন করিয়া দশ জনের কাজ একজন দ্বারা এবং দশ দিনের কাজ একদিনে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলে, দেশে বেকার-সমস্যা প্রবলতর হইবে।

উদাহরণস্বরূপ ধরিয়া লওয়া যাউক যে, কোন গ্রামে ১০০ জন কৃষক বাস করে; উহাদের প্রত্যেকের ঘরে দশ বিঘা করিয়া চাষের যোগ্য জমি আছে। ঐ গ্রামের কোনও ধনী যদি একখানা কলের লাঙ্গল আনাইয়া এক মাসের মধ্যে সমস্ত জমি চাষ করিয়া দেন, তাহা হইলে ঐসকল কৃষক করিবে কি? ইহাতে ঐ ধনীর লাভ হইতে পারে; কিন্তু কৃষককুলকে অবশ্যই বেকার থাকিতে হইবে। বহু কলকব্জা স্থাপনের ফলে অনেক পাশ্চাত্য দেশেও এক্ষণে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। এই অসুবিধা নিবারণকল্পে এদেশে বৃহৎ কলকারখানা অপেক্ষা কুটীর-শিল্পই সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতি দ্বারা দেশ আশানুরূপ অগ্রগামী হইবে না। বরং উহাতে জাতির এক প্রধান অংশকে নিরন্ন হইতে বাধ্য করা হইবে। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়াই মহাত্মা গান্ধি "মিল" স্থাপন অপেক্ষা চরকা প্রচলনের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

বিদেশী কলকব্জাসকল ধন-কুবেরের দেশেও সাধারণতঃ যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশেও যৌথ ভাবেই উহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু নিতান্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, যৌথ ব্যবসার পরিচালনে আমরা এখনও তাদৃশ পারদর্শিতা দেখাইতে পারি নাই। আমাদের ছাপাখানা ব্যাঙ্ক অকালে ধ্বংস হইয়াছে; ছাপাখানা ও মহাজনসিংহ চ্যানারি অধিক দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই; সম্মিলন প্রভৃতি চা কোম্পানী শৈশবেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; কে. ডি. সেনের স্থাপিত চিত্র-শিল্পের কারখানা উৎসন্ন গিয়াছে; ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস মাড়োয়ারীর হস্তগত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। পটারি ওয়ার্কস ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে; বিনাইদহ রেল কোম্পানীর অবস্থা কাহিল। যেগুলি চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই ঋণ-ভারে অবনত। গত মার্চ্চ মাসেও বাঙ্গালীর ৮টী লিমিটেড কোম্পানী অকালে কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালী কত কালে এ বিষয়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবে, কে জানে? এরূপ অবস্থায় অনুরূপ কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। অনিশ্চিত লাভের আশায় অগ্রসর হইতে গিয়া দেশের শক্তি ও সম্পদ্ ক্ষয় করা আমাদের মত দরিদ্র জাতির পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

কলকারখানায় কাজ করিতে হইলে, উহার প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানীর নিয়মপদ্ধতি মানিয়া চলিতে হইবে। নিয়ম প্রণালী মাত্রই স্বাধীনতার সঙ্কোচক। সুতরাং উহার ফলে দেশবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইবে না। আমরা বহু দিবসাবধি নানা প্রকারে শৃঙ্খলিত হইয়া আছি; ইহার উপর সমাজের জন্য আরও একটী শৃঙ্খলের ব্যবস্থা করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে কি?

কলকারখানার পক্ষে সুসময় ও দুঃসময় দুই-ই আছে, ভবিষ্যতেও অবশ্যই থাকিবে। বহু সময়ে বহু কারণে উহার কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। যখন ও যে কারণেই হউক, একটী কল কি কারখানা অচল হইলে, এককালে বহু দরিদ্র দেশবাসীর মর্ম্মান্তিক ক্লেশ উপস্থিত হইবে। বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে একাধিকবার ইহার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত হইবে কি?

কলকব্জা স্থাপনের প্রধান সার্থকতা রপ্তানিতে। ফলে উৎপন্ন নিজ দ্রব্য রপ্তানি দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি যে ভাবে সম্পদশালী হইয়াছে, আমাদের পক্ষে তাদৃশ উন্নতিলাভ সহজসাধ্য নহে। প্রথম কারণ, পাশ্চাত্য দেশগুলি বহু পূর্ব্ব হইতে এ ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, আমরা এতকাল পরে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার বাজারে উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়া উঠিব না। দ্বিতীয় কারণ আমরা পরাধীন জাতি; সরকারী

সাহায্যাদি লাভ করিয়া দ্রুত অগ্রগামী হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে অল্পই আছে। তৃতীয় কারণ, ইংল্যাণ্ডের যেমন ভারত আছে, আমাদের তেমন কোন অধীন দেশ বা উপনিবেশ নাই, যেখানে অবাধে পণ্যপ্রকল্পের রপ্তানি চলিতে পারিবে। ভারতে বস্ত্র রপ্তানির অবাধ সুযোগ হ্রাস হওয়ায়, ল্যাঙ্কাশায়ার এখনে কিরূপ দুর্দশায় পড়িয়াছে, তাহাও এস্থলে চিন্তনীয়।

কল কারখানা স্থাপনের পরিণামে অধিকাংশ দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে কি না তাহাও দেখা আবশ্যক। আমাদের দেশে বিদেশী কলকব্জা স্থাপনের ফলে দরিদ্রের দুর্গতি-বৃদ্ধিরই ইতিহাস আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তেলের কলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবাসী বড় আশা করিয়া তেলের কল স্থাপন করিয়াছিল। উহার প্রতিযোগিতায় গ্রামের "কলু" জাতি বেকার হইল; গ্রামের উৎপন্ন সরিষা কাজে লাগাইবার সুলভ উপায় দূর হইল; কৃষকেরা সরিষার চাষ কমাইতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে চারি আনা সেরের সরিষার তেল এক্ষণে আমাদিগকে আট আনা দরে কিনিতে হইতেছে। কাপড়ের কল স্থাপনে দেশের তাঁতী মরিয়াছে; জোলারা মরিতে বসিয়াছে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য বস্ত্র বৃহৎ কলকব্জা দ্বারাই অনুরূপ কুফল ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

কলে উৎপন্ন জিনিষ ব্যতীত যে প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না, এমনও নহে। এক সময়ে আমাদের হস্ত-নির্ম্মিত মসলিন জগতে অদ্বিতীয় ছিল। ভারতীয় শাল, মলিদা, গরদ; রেশমের শাড়ী, চাদর ইত্যাদি বিদেশী কলে প্রস্তুত হয় না; অথচ পাশ্চাত্য কলের জিনিষের তুলনায় উহা নিকৃষ্ট নহে। বিলাতের সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে বাঙ্গালী শিল্পীর হস্ত-নির্ম্মিত পিতল কাঁসার বাসন অতি উচ্চ স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছিল। দেশীয় সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্য-সম্ভার যদি এরূপ গৌরবজনক ও লাভজনক হইতে পারে, তবে বিদেশী কলকব্জার সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা কি?

বিদেশী যন্ত্রপাতিগুলি সাধারণতঃ বহুমূল্য এবং অর্থ-নীতির দিক্ দিয়াও আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল। আমরা নানা প্রকারে দেশের রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়া বিদেশীর উদর পূর্ণ করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা নির্ধন ও নিরন্ন হইতেছি। ইহার পর অধিক সংখ্যায় পাশ্চাত্য কলকব্জা আমদানি দ্বারা দেশের অর্থে বিদেশীর ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে অগ্রসর হইলে, দেশের দৈন্য আরও বাড়িবে না কি?

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমান যুগে অনেক কার্য্যই পাশ্চাত্য কলের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এ কার্য্যগুলি বর্জ্জন করিতে পারিলে সুবিধা হইত। তাহা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে। এজন্য এ দেশেই কলকব্জা-নির্ম্মাণের আয়োজন করা উচিত। চেষ্টা করিলে, এখনও দেশে অনেক কলকব্জা প্রস্তুত হইতে পারে। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু কয়েকটী অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রও দেশীয় শিল্পীর সাহায্যেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেসকল যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইবে, তাহা যাহাতে বিদেশী কলকব্জার অনুরূপ না হইয়া ভারতীয় বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

এস্থলে ভারতীয় যন্ত্রপাতির বৈশিষ্ট্যের কথার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দেশীয় যন্ত্রগুলির উৎকর্ষ এই: (১) যন্ত্রগুলি সাদাসিধে অর্থাৎ উহার কোন অংশ জটিল নহে। সে জন্য উহা নির্ম্মাণ, মেরামত ও পরিচালন করা সহজ। উহা (২) অল্প স্থানে (৩) অল্প ব্যয়ে (৪) অল্প লোকের সাহায্যে নির্ম্মিত ও চালিত হইতে পারে। (৫) উহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কোচের আশঙ্কা খুবই কম। (৬) উহা শিল্পীর নৈপুণ্য-প্রকাশের বিশেষ অনুকূল। এবং (৭) মূল্যের দিক্ দিয়াও সুলভ।

এইসকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া, যাহাতে দেশে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইতে পারে, সে দিকে কংগ্রেসের প্রখর দৃষ্টি ও বিশেষ সাহায্য অবিলম্বে আবশ্যক। দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালী যতদূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এ বিষয়টী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। এ দিকে মনোযোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত দেশের পরমুখাপেক্ষিতা কখনও দূর হইবার আশা নাই।

পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে দেশের গৌরবও হ্রাস পাইবে। কারণ প্রায় সমস্ত বিদেশী কলকব্জাই শিল্পীর কৃতিত্বের পরিপন্থী। পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশে ঐ সকল

কলকারখানা যত অধিকসংখ্যায় স্থাপিত হইবে, ততই দেশের শিল্পীরা শক্তিসামর্থ্য ও কৃতিত্ব লাভের সুযোগ হারাইয়া কুলিতে পরিণত হইবে। প্রকৃত পক্ষে চরকায় সূতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বুনিতে বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা শিল্পীর যেমন ধন-সম্পদ্ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ সুবিধা আছে, পাশ্চাত্য "মিলে" কাপড় বুনিতে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে বহুসংখ্যক বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশময় কুলির সৃষ্টি করিলে, তাহাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না। এ দেশ কুটীর-শিল্পের গৌরবময় লীলাভূমি। কলকারখানার দ্বারা এ দেশ ধনিক ও শ্রমিকের দেশে পরিণত হইবে। শেষে পাশ্চাত্যের ন্যায় ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব মিটাইতে আমাদিগকেও যথেষ্ট শক্তিক্ষয় করিতে হইবে। কলের চাপে আমাদের জাতীয় শিল্প ও কুটীর-শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। এই সকল শিল্পীর অবনতির ফলে দেশের আর্থিক ক্লেশও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ কলের কুলির উপার্জ্জন কখনই শিল্পীর আয়ের সমান হইবে না। একজন কুলি পরাধীনভাবে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া মাসিক ১৫।২০ টাকার অধিক উপায় করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি যে কোন শিল্পী স্বাধীনভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম করিয়া অনায়াসেই মাসে ৩০।৩৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

ইহা ছাড়া বৃহৎ কলকারখানার আরও একটী দোষ আছে। উহাদ্বারা পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি নষ্ট হয়। নৈতিক চরিত্র দূষিত হইবার আশঙ্কাও যথেষ্টই থাকে। সুতরাং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বৃহৎ কলকারখানার স্থাপন দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে যাওয়া অপেক্ষা দেশীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাতীয় কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি করিয়া, যাহাতে দেশ ও জাতি সম্পদশালী হইতে পারে তাহার উপায় অন্বেষণ করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।*

সমাজতন্ত্রবাদী বার্ণার্ড শ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল, এফ্-আর-ই-এস্

ধনি-দরিদ্র-ভেদ নির্ম্মূল

আয়-সাম্যের বিপক্ষের যুক্তিগুলা দেখা গেল। এবারে স্বপক্ষের যুক্তিগুলা কি রকম দেখা যাক্।

এর স্বপক্ষে প্রথম যুক্তিই এই যে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে, এই ধরণের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। পেশা বা পদমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে সকলেই একই আয় পাবে এমন বন্দোবস্ত জগতে আগে কখনও কায়েম হয় নি, তা সত্য। কিন্তু এক একটী পেশা ধ'রে আলোচনা ক'রলে প্রত্যেক পেশাতেই আয়ের একটা মোটামুটি সমতা দেখা যায়। পুলিশের কন্‌ষ্টেবল্, সৈনিক, ডাক্তারিখন, মজুর, ছুতার মিস্ত্রী, রাজ মিস্ত্রী, বিচারক, পার্ল্যামেণ্টের সভ্য—এদের প্রত্যেকের আয় সমান নয় বটে, কিন্তু শ'এর মতে, সকল সৈনিক, সকল বিচারক, সকল পার্ল্যামেণ্টের সভ্য সমান আয় পান, এটা মোটামুটি বলা চলে। এই রকমে,

*কলকারখানা পাশ্চাত্য কি পাশ্চাত্যের অনুরূপ হইলেই নিন্দনীয় নহে। বর্ত্তমান সভ্যতা সমস্যা-বহুল সভ্যতা। এই সব সমস্যাকে ভয় না করা ও ইহাদের সমাধানের চেষ্টা করা ইহার একটি লক্ষণ, একথা মনে রাখিতে হইবে। যাহা হোক্, আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা দেখিতে আশা করি।—আঃ উঃ সম্পাদক।

এক একটী পেশার অন্তর্গত লোকেরা, একেবারে না হোক্, মোটামুটি একটা সমান আয় পেয়ে দুনিয়ার বুকে তাদের কাজকর্ম্ম চিরটা কাল চালিয়ে আসছে। চিরকালই দেখা যাচ্ছে যে, এক-একটা পেশাতে মোটামুটি একটা নির্দ্দিষ্ট মাহিনা বা রোজগারের হার চলিত। এই মাহিনা বা রোজগারের হার নির্দ্দিষ্ট হয় কিরূপে? প্রত্যেক পেশার অন্তর্গত লোকেরা যে মাপের জীবনযাত্রা চালাতে চায়, বা যে ধরণের জীবন-যাত্রা চালানো তাদের মধ্যে রীতি দাঁড়িয়ে গেছে, তার দ্বারা। ডাক্তার ৪৲ কি ১৬৲ টাকা কি হাঁকেন। কেন তিনি ৪৲ টাকার কম বা ১৬৲ টাকার বেশী হাঁকেন না, তা জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি ব'লবেন যে, ডাক্তার-দের মধ্যে যে রকম খাওয়া-পরা থাকার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে তাতে ঐ রকম কি হাঁকাই দস্তুর।

আয়-সাম্যের বিরুদ্ধে বলা হ'য়ে থাকে যে, ধনি-দরিদ্রের ভেদ সমাজ থেকে একেবারে নির্ম্মূল হ'তে পারে না। আজ যদি পেশা-নির্ব্বিশেষে সকলের আয় সমান করা যায়, কয়েকদিন বাদে গরীব ও ধনীর পুনরাবির্ভাব হবেই হবে। ধনি-দরিদ্রের পৃথক্ অস্তিত্ব সমাজের কেন মজ্জাগত।

সমান আয় চলিত করার পরও ২।১ জন হয়তো সাধারণের চেয়ে ধনী হ'য়ে প'ড়তে পারে। অনকয়েক হয়তো সাধারণের চেয়ে গরীবও হ'তে পারে। গরীব থেকে ধনী হওয়ার চেয়ে, ধনী থেকে গরীব হওয়াই বেশী দেখা যায়। সুতরাং গরীব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু এ সমস্ত কথা আলোচনা না ক'রলেও চলে। কারণ, 'রেডি-মেড্' পোষাক তৈরীর সময়ে দর্জ্জি যেমন দৈত্য বা বামনের কথা না ভেবে সাধারণ সাইজের লোকের কথা ভেবেই পোষাক তৈরী করে, তেমনি আমরাও, সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধাজনক সমাজের আর্থিক গড়নের কথা ভাব্‌বার সময়, যারা অসাধারণ বোকা (যারা সকলের সমান আয় পেয়েও গরীব হ'তে পারে) অথবা যারা অসাধারণ ধূর্ত্ত (যারা সকলের সমান আয় পেয়েও বড়লোক হবে), তাদের কথা না ভাব্‌লেও পারি। ডাক্‌পিয়নের কথা ধরা যাক্। তাদের মাহিনা ত' একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের মধ্যে উঠা-নামা করে। সুতরাং তাদের আয় মোটামুটি সমান ত' বটে। কিন্তু, তাদের মধ্যে লক্ষপতি দুই বা ক'টা, পথের ভিখারীই বা হয় ক'জন? তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী তাদের আয়-সাম্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয় কি? সুতরাং, আয়-সাম্যের প্রবর্ত্তন হ'লে ২।১ জন বড়লোক বা গরীবের আবির্ভাব হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু মোটামুটি এটা বলা যেতে পারে যে, ধনী ও দরিদ্র ব'লে বর্ত্তমানে সমাজে যে দুটী পরস্পর-বিরোধী আর্থিক দলের সৃষ্টি হয়েছে, তা আর থাকবে না, খাওয়া-পরা, থাকা, আমোদ-প্রমোদ করার মধ্যে বর্ত্তমানে সমাজের আর্থিক স্তর-ভেদে যে বিষম বৈষম্য দেখা যায়, তা লোপ পাবে। এখন যেমন ডাক্‌পিয়ন বা বিচারক, বা সৈনিক বা নাবিকদের স্ব স্ব পেশার মধ্যে আয়ের মোটামুটি সাম্য, কিন্তু পরস্পরের পেশার তুলনায় বিষম বৈষম্য, এই বৈষম্য লোপ পাবে,—ডাক্‌পিয়ন, বিচারক, মজুর, সৈনিক, নাবিক, সবারই আয় সমান হবে।

"সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ-জীবনে আয়-সাম্যের শুধু প্রবর্ত্তন নয়, স্থায়িভাবে প্রবর্ত্তন খুবই সম্ভব। বন্দোবস্তটা খুবই সোজা এবং সহজেই যোগদাত্ত বটে। কে কত পাবে, তা নিয়ে সমাজের বুকে এই যে অবিশ্রান্ত তসড়া মারামারি, আয়-সাম্যের ফলে তা লোপ পাবে। অসংখ্য মানুষের মধ্যে এই নীতি ইতিমধ্যেই চলিত আছে—তবে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, সমগ্র সমাজ যোগে নয়। আর, এর সব চেয়ে সুবিধা এই যে, এতে যোগ্যতর ব্যক্তিরা কেবল তাদের যোগ্যতার দাবীর জোরেই সমাজে প্রাধান্য ও মর্য্যাদা অর্জ্জন ক'রতে পারবে।

যোগ্যতার মাপকাঠি টাকা নয়

আধুনিক সমাজে সব চেয়ে খাতির পায় তারা যাদের টাকা বেশী। যাদের টাকার জোর নেই, তাদের যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু টাকা নেই ব'লে তাদের ক্ষমতা কম, সেই জন্য খাতিরও কম।

প্রত্যেক দেশেই বড় বড় উদ্ভাবক আছেন, যাঁরা হয়তো এমন সব জিনিষ উদ্ভাবিত করেছেন যাতে সারা জগৎ উপকৃত

হয়েছে যা ক'তে পারে, আধিকর্ত্তা আছেন, যাঁরা হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বিরাট বিরাট ভূখণ্ড আবিষ্কার ক'রে স্বজাতি ও আবিষ্কৃত জাতির যথেষ্ট উপকার করেছেন। সেই রকম প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বড় বড় খোদ্দা বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ইত্যাদি আছেন। দেশ হয়তো এঁদের কাজের জন্য একটা মোটা টাকা দিল, অথবা একটা ভাতার বন্দোবস্ত ক'রে দিল। যে টাকা বা যে রকম ভাতা এঁদের দেওয়া হয়, তা ধনী শিল্পী বা ব্যবসায়ীর রোজগারের তুলনায় কিছুই নয় বল্লেই চলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাঁরা একটু ছুটোমি খাটিয়ে, অথবা একটু বুদ্ধির জোরেই, চাহিদা বা উৎপাদনের গতি অনুধাবন ক'রে ক্রোর ক্রোর টাকা রোজগার করছেন, সমাজে তাঁদের মাথায় ক'রে রাখে, এমন কি তাঁদের পায়ে রীতিমত লুটায় বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, উদ্ভাবকের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সমাজ একটা ভাতা বা একটা মোটা টাকার দানের বন্দোবস্ত ক'রেই সন্তুষ্ট হয়। সমাজের এই সব প্রকৃত উপকারক ও কল্যিবাজ ধনীর দল যে পৃথক ধরণের খাতির ও মর্য্যাদা পায়, আধুনিক সমাজে টাকার প্রভাবে মানুষের প্রকৃত যোগ্যতার কিরূপ বিচার হয়, তা বোঝবার পক্ষে এই বৈষম্য বিশেষ সহায়ক।

আয়-সাম্য দরকার এই জন্যই। সকলের আয় সমান হ'লে, অর্থের তারতম্যে সমাজে যে অনিষ্টকর ও কৃত্রিম ব্যক্তিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে তা লোপ পাবে, প্রকৃত গুণ ও যোগ্যতা অনুসারেই লোকে তখন সমাজে মর্য্যাদা লাভ ক'রতে পারবে। "বড় লোক, সাধারণ লোক ও ছোট লোক তখনও সমাজে থাকবে। কিন্তু যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, তাঁরাই বড় লোক ব'লে গণ্য হবেন। যে সমস্ত নিরেট-মস্তিষ্কগুলা বাপের কাছে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড পেয়েছে ও তাদের বা-মের আদরে অধঃপাতে গেছে, তারা আর বড়লোক ব'লে গণ্য হবে না। আর ছোট লোক বলে গণ্য হবে কারা? যারা গরীব হ'য়ে জন্মেছে ব'লে বড় হবার সব সুযোগ হ'তে বঞ্চিত—তারা নয়, কিন্তু যাদের চরিত্র, মন ও কার্য্য-কলাপ নিন্দনীয়—তারাই। এই জন্য নির্দ্দোষরাই আর্থিক সাম্য চায়, কারণ তা না হ'লে তাদের বড় বড় পদ অধিকার করবার সম্ভাবনা থাকে না, আর এই কারণেই প্রকৃত মহাত্মারা সমান আয়ের পক্ষপাতী।"

কাজের প্রেরণা

সকলের আয় যদি সমান হয় তবে কাজের প্রেরণা থাকবে কি? আধুনিক জগতে টাকার লোভে লোকে বেশী খাটে। কাজেই, আয় সমান হ'লে, খাটবার একটা বিশেষ আবশ্যক প্রেরণা সরিয়ে ফেলা হবে। এটা কি বাঞ্ছনীয়?

কিড্‌দ বলেন যে, একজনকে আর একজনের চেয়ে বেশী খাটতেই হবে, তার কোন মানে নেই। বরং আদর্শ সমাজে সকলেরই সমান খাটবার বন্দোবস্ত থাকবে। জাতির অভাবগুলা মেটাবার জন্য যা খাটুনি দরকার, তা সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। কেউ স্বেচ্ছায় বেশী খাটে, আপত্তি নেই। কিন্তু টাকার লোভ দেখিয়ে বেশী খাটুনি আদায় করার মত কুবন্দোবস্ত আর কিছুই হ'তে পারে না।

খাটুনি সমানভাবে ভাগ করার আর এক দিক্ হচ্ছে যে কুড়েমি একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। কাজ না ক'রে যে কেউ নিজেকে গরীব ক'রে রাখবে, তাও করতে দেওয়া হবে না। যেমন দারিদ্র্যকে, তেমনি আলস্যকেও জোর ক'রে সমাজ থেকে বিদায় দেওয়া হবে।

আধুনিক ফ্যাক্টরী বা কলকারখানায় এক সঙ্গে হাজার হাজার লোক কাজ করে। মজুররা ইচ্ছামত কাজ আরম্ভ বা বন্ধ ক'রলে ফ্যাক্টরী চালানো অসম্ভব। একই সঙ্গে কাজ আরম্ভ ও বন্ধ করা চাই। এই জন্য আধুনিক ফ্যাক্টরীতে কাজ করার প্রণালী সমানভাবে কাজ বণ্টন করার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

বলা যেতে পারে যে, সকলের আয় একই হ'লে প্রথম শ্রেণীর কাজ আদায় সম্ভব নাও হ'তে পারে। অর্থাৎ, সকলেই যদি সমান আয় পায়, তা হ'লে একজন আর একজনের চেয়ে ভাল কাজ ক'রবে কেন? কিড্‌দ বলেন যে, আধুনিক জীবনে উচ্চশ্রেণীর কাজ টাকার লোভেই হয় না; বরং, যারা শ্রেষ্ঠ কাজ করে, তারা কাজ করে নিজেদের অন্তর্নিহিত

প্রেরণার জোরে ও অন্যান্য বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। আর্থিক প্রলোভন তাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ।

ঘৃণ্য ও হেয় কাজগুলা কি ক'রে করানো যাবে? প্রিয় ও অপ্রিয় দুই শ্রেণীর কাজই আছে। এ সব কাজ সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে?

প্রথমতঃ, আজকাল এমন সব অনেক হেয় ও অপ্রিয় কাজ আছে যা ভবিষ্যতে আদবে নাও থাকতে পারে। যেমন ফয়লার খনিতে কাজ করা। জলস্রোত হ'তে উৎপন্ন বিদ্যুতের যোগান বাড়লে কয়লা-শক্তির ব্যবহার উঠে যাবে, সুতরাং ফয়লার খনিতে কাজ করাও উঠে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ, আজকাল যে সব কাজ অত্যন্ত অপ্রিয় তা বিজ্ঞানের ও যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা সহজ ও আরামজনক ক'রে তোলা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, যা আমরা অনেক সময়ে নোংরা কাজ মনে করি তা প্রায়ই হেয়জ্ঞান করা হয় কাজটারই জন্য তত নয়, যতটা সেই কাজে রত লোকগুলাকে সমাজে ছোট জ্ঞান করার রীতি দাঁড়িয়ে গেছে ব'লে। ডাক্তারদের ও নার্সদের অনেক কায় ঝি-চাকরদের কাজের চেয়েও নোংরা, কিন্তু ঝি-চাকরদের স্থান সমাজে ছোট ব'লেই, লোকে ডাক্তার-নার্স হ'তে চায়, ঝি-চাকর হ'তে চায় না। সুতরাং, একটা বিশেষ শ্রেণীর কাজে রত থাকার জন্যই একজনকে যদি হীন চক্ষে দেখা না হয়, তা হ'লে আজ-কাল যে সব কাজ অনেকটা অপ্রিয়, তা অনেকটা প্রিয় হ'য়ে আসবে।

চতুর্থতঃ, জগতে এমন কাজ খুব কমই আছে, যার প্রতি আকর্ষণ কোন না কোন লোকের নেই। যে সব কাজ এক জনের পক্ষে খুবই কষ্টকর ও অপ্রিয়, তা আর এক জনের কাছে প্রিয় ও লোভনীয় হ'তে পারে।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের অপ্রিয়তা ও পরিশ্রমের তারতম্য সমান করার এক সুন্দর উপায় আছে। সেটা হচ্ছে অবসর কালের তারতম্য করা। যে কাজ অত্যন্ত অপ্রিয়, যাতে খাটুনি অত্যন্ত বেশী, তাতে কর্ম্মীদের বেশী অবসর দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু যে কাজ আরামে ও অল্প পরিশ্রমে করা যায় তাতে খাটুনির সময় বাড়িয়ে ও অবসর সময় কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'কারনেসে' (লোহা গালাবার চাপর) কাজ ক'রতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের দরকার। কিন্তু সরকারী ছবির গ্যালারী পাহারা দেওয়ার কাজ তার তুলনায় বেশ আরামজনক। ছবির গ্যালারীতে যে পাহারা দেবে তাকে প্রত্যহ যদি ১০ ঘণ্টা কাজ ক'রতে হয়, আর যে 'কারনেসে' কাজ ক'রবে তাকে যদি দৈনিক ৪ ঘণ্টা কাজ ক'রতে হয়, তা হ'লে, দুই শ্রেণীর কাজের আয় সমান হ'লেও, কাজের সময়ের—সুতরাং অবসর কালের—তারতম্য থাকাতে, কোন শ্রেণীর মজুরের প্রতিই অবিচার দেখানো হবে না, এবং দুই শ্রেণীর কাজের জন্যই মজুর যোগানো সম্ভব হবে।

সুতরাং সমাজে আয়-সাম্য প্রচলিত থাকলেও, সকল শ্রেণীর কাজের জন্য মজুর যোগাড় হ'তে পারে এরকম বন্দোবস্ত করা সম্ভব; এবং আয়-সাম্যের ফলে উচ্চশ্রেণীর কাজ করবার প্রেরণা সমাজ হ'তে বিলুপ্ত হবে এমন কোন আশঙ্কাও নেই।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক খবরাখবর

১। বিলাতে স্বর্ণমান পরিত্যাগ

বিলাতের "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডে"র উপর একটী নির্দ্দিষ্ট দামে সোনা বেচবার দায়িত্ব চাপানো আছে। গত কয়েক মাস অন্য দেশের কাছ হ'তে বিলাতের যত পাওনা, অন্য দেশের কাছে বিলাতের দেনা তার চেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে। বিলাতের শিল্প-বাণিজ্যের অবনতিই এর একটী প্রধান কারণ। যাই হোক্, পাওনার চেয়ে দেনা বেশী হওয়ায়, অন্য দেশে সোনা পাঠিয়ে বিলাতকে দেনা মেটাতে হচ্ছে। গত জুলাই মাস থেকে এ পর্য্যন্ত (২০শে সেপ্টেম্বর) ২০কোটি পাউণ্ড দামের সোনা বিলাত থেকে বেরিয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সোনার বহির্গমন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই জন্য বিলাতের সরকার ঘোষণা করেছেন যে, "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডকে" আপাততঃ সোনা বিক্রীর দায়িত্ব হ'তে মুক্তি দেওয়া হ'ল। "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডে" এখন ১০ কোটি পাউণ্ড দামের সোনা আছে। এই সোনাটুকুও যাতে বেরিয়ে না যায়, তারির জন্যই বর্ত্তমান ঘোষণা। বিলাত সরকার ও ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ডের বিদেশে যে সব দেনা আছে সে সব দেনার শোধে কোন বাধা থাকবে না। ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে বিদেশে যে সব দেনা করেছে তা শোধ দিতেও যথাসম্ভব সাহায্য করা হবে। কিন্তু বিলাতের লোকেরা তাদের টাকা যাতে বিদেশে না সরায় ও বিদেশীরা বিলাতে তাদের পাওনা টাকা একই সঙ্গে যাতে তুলতে আরম্ভ না করে তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এক টাকা = ১ শিলিং ৬ পেন্স
"ষ্টার্লিং ; ইহার অর্থ

টাকার দর আগে ছিল ১ শিলিং ৬ পেন্স, ("সোনা" অথবা "ষ্টার্লিং")। আগে পাউণ্ড নোট (ষ্টার্লিং) ও সোনার দরের একটা নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বহির্ব্বাণিজ্যেও সেই জন্য ১টী টাকার বদলে নোট বা ১ শি. ৬ পেন্স দরের সোনা পাওয়া যেতো। সম্প্রতি বিলাত পাউণ্ডের সঙ্গে সোনার সম্পর্ক তুলে দিয়েছে। তার ফলে পাউণ্ডের দরের অবনতি হচ্ছে। যত পাউণ্ড নোট দিলে আগে এক আউন্স* সোনা পাওয়া যেতো, এখন তার চেয়েও বেশী পাউণ্ড নোট দেওয়া দরকার। পাউণ্ডের এই অবনতির ফলে ডলার ও ফ্রাঁর দাম পাউণ্ডের তুলনায় চড়েছে। অর্থাৎ, বিলাতকে বিদেশী জিনিষ কিনতে হ'লে আগেকার তুলনায় বেশী দর দিয়ে কিনতে হবে। এর ফলে বিলাতের শিল্পগুলা একরকম সংরক্ষণ ভোগ করতে পারবে।

যখন বিলাত স্বর্ণমান রদ ক'রলো, তখন প্রথমে ভারতে অর্ডিন্যান্স (এই বছরের ৬ নং অর্ডিন্যান্স) জারি ক'রে টাকার সঙ্গে সোনা ও পাউণ্ড দুইয়েরই সম্পর্ক রদ্ করা হয়। অর্থাৎ এক টাকার বদলে ১ শি. ৬ পেন্স দরের সোনা বা ষ্টার্লিং দেবার যে দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর, ৭নং অর্ডিন্যান্সে এই নিয়ম হয় যে, টাকার বদলে ১ শি. ৬ পে ষ্টার্লিং দেওয়া হবে, কিন্তু ঐ দরের সোনা দেওয়া হবে না। ফলে টাকার সঙ্গে সোনার যে সম্বন্ধ ছিল সেটা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তার সঙ্গে ষ্টার্লিংএর যে সম্বন্ধ ছিল তা পুনরায় বলবৎ করা হ'ল। সোনার তুলনায় পাউণ্ডের দর কমেছে, সুতরাং টাকার দরও কমেছে ; অর্থাৎ সোনার দর চড়েছে। বিলাত ছাড়া অন্য দেশ থেকে জিনিষ নিতে হ'লে আমরা টাকায় যে বর্ত্তমান ষ্টার্লিং দর সেই হিসাবে কিনবো। সুতরাং ষ্টার্লিংএর দর কমাতে একই জিনিষ কেনার জন্য আগেকার চেয়ে বেশী দাম লাগবে। কিন্তু বিলাতে ষ্টার্লিং চলতি, আর ষ্টার্লিংএর সঙ্গে টাকার যে সম্বন্ধ ছিল তা এখনও আছে। কাজেই বিলাতী জিনিষের দর বাড়লো না,

*৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স = ১ আউন্স সোনা।

আগেকার মতই রইলো। বিলাত ছাড়া অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা (অর্থাৎ টাকা) সস্তা হ'য়ে পড়ায়, তারা আগেকার চেয়ে ভারতীয় দরেই ভারতীয় জিনিষ কিন্‌বেও, সেই দরে ভারতীয় রপ্তানিকারকের পকেটে বেশী টাকা আস্‌বে। এই জন্য ভারতীয় চাষীরা বেশী মাল বেচ্‌তে পারবে ব'লে মনে হয়।*

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

বাস্তিয়ার আর্থিক মতামত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, হাজারিবাগ

জীবনী ও গ্রন্থ

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বেয়নে গ্রামে ফ্রেডেরিক বাস্তিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পঁচিশ বৎসর বয়সে বৃহৎ সম্পত্তির মালিক হইয়া চাষ কার্য্যে মন দেন, কিন্তু সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে লেখাপড়ায় জীবন উৎসর্গ করেন। নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে ফরাসী অর্থবিজ্ঞানশাস্ত্রবিদের, বিশেষতঃ জে বি সের লেখার সহিত পরিচিত হইয়া তিনি ঐ বিদ্যার অনুশীলনে নিজের বাকী জীবন উৎসর্গ করেন।

১৮৪৪ খৃঃ "জুর্ণাল দেজেকোনোমিস্তে" নামক পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ বাহির হয়। উহার নাম, "ইংরেজ ও ফরাসী জনগণ বিলাতী ও ফরাসী সংরক্ষণের ফলে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা।" স্পেন ও ইংলণ্ড ভ্রমণের ফলে তিনি এটি লেখেন। ইংলণ্ডে "শস্য-বিধি-বিরোধী সঙ্ঘের" নেতাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া সংকল্প করেন যে, দেশে ফিরিয়া ইঁহাদের পথ অনুসরণ করিবেন। ১৮৪৫ খৃঃ "কবডেন ও সঙ্ঘ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই "মহৎ আন্দোলনে"র গুণ কীর্ত্তন করেন। এই সময়ে তিনি পর পর কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া পূর্ব্বোক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরে এগুলি "সংরক্ষণের তত্ত্ব" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সনে ইহার ইংরেজী বাহির হয়। ১৮৪৫ সনে বাস্তিয়া প্যারিতে আসেন। সেখানে "অবাধ বাণিজ্য সমিতি"র সম্পাদক হন ও "অবাধ বাণিজ্য" নামে এক কাগজ চালাইতে থাকেন। ১৮৪৮ সনে আইন সভার সভ্যরূপে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে লড়িতে প্রবৃত্ত হন। পরে সম্পত্তি ও আইন, ন্যায় ও ভ্রাতৃভাব, শান্তি ও স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার অনেকগুলি অনূদিত হইয়া "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিষয়ে প্রবন্ধাবলী" নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক "আর্মনিসেকোনোমিকো"র প্রথম ভাগ মাত্র তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ করিয়া যাইতে পারেন (১৮৫০)।

"আর্থিক সামঞ্জস্যে" মূল্য

"আর্মনিসেকোনোমিকো" কেতাবে কোন অধ্যায়েই উৎপাদন-বিষয়ে আলোচনা দেখা যায় না; বাস্তিয়ার মতে বিনিময়ের অনুশীলনই অর্থবিজ্ঞান। অভাব, চেষ্টা, অভাব-পূরণ এই হইল আর্থিক চক্র। আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের বিনিময়ে কিছু দিয়া তবেই মানুষ সাধারণতঃ সন্তোষ পায়। এইখানে মূল্যের কথা উঠে। ক্যারির মত মূল্যের সংজ্ঞাকে ভিত্তি করিয়া বাস্তিয়া তাঁহার তত্ত্ব গড়িয়াছেন।

যে সকল মূল্যতত্ত্ব পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, বাস্তিয়া প্রায়

* ১পি ৬পে বনাম ১ পি ৪ পে ব্রটেনের তর্ক আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রটেন সোনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে না ষ্টার্লিংএর সঙ্গে, তাও প্রশ্ন বটে। আমরা বিশেষজ্ঞগণের আলোচনা প্রার্থনা করি। —ঃ সম্পাদক।

তাহার সকলগুলিরই সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রয়োজনীয়তা, বিরলতা, শ্রম, আহরণের দুরূহতা, নির্দ্ধারণ, বিচার প্রভৃতিকে মূল্য-নিরূপণের ভিত্তি করা ভ্রম-প্রসূত। সে-র প্রয়োজন-তত্ত্ব ও রিকার্ডোর শ্রম-তত্ত্বে দ্রব্যের উৎপাদনকে মূল্যের হেতু নির্দ্দেশ করায় ভুল হইয়াছে। প্রয়োজনীয়তা দ্বিবিধ—স্বতঃপ্রণোদিত ও কৃষ্টিকর। প্রকৃতির দেওয়া পদার্থসমূহ ও শক্তিসমূহ (যাহার বিনিময়ে কিছু আদায় করা যায় না) প্রথম শ্রেণীর। মানুষের জন্য মানুষের সেবা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার বিনিময়ে সেবা চাই। যদি বলা যায় যে মূল্য পদার্থে-গত, তবে বলিতে হয় যে, প্রকৃতির স্বতঃপ্রণোদিত দানও মূল্য-যুক্ত। তাহা হইলেই আবার বলিতে হয়, জমিদারেরা প্রকৃতির যে অযাচিত দান ভোগ করিতেছেন তাহাও সম্পত্তি। কিন্তু বাস্তিয়া তাহা মনে করেন না। তাহা হইলে, যে-সব সেবার ফল কোন বস্তু নয়, সে-সব সেবাকে ভুল করিয়া অকলপ্রদ বলিতে হয়। মূল্য নিরূপণের পক্ষে অভাব ও তাহার পূরণই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনীয়তাকে দ্রব্যের অপরিত্যাজ্য অংশ বিবেচনা না করিলে উহাকে মূল্যের ভিত্তি বলিলে দোষ হয় না। বাস্তিয়া বলেন, যেহেতু রিকার্ডো সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট দ্রব্যাদি বাদ দিয়াছেন, সেই হেতু প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহার শ্রম-খরচাতত্ত্বও ঠিক নয়।

বাস্তিয়া শ্রম-তত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা-তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রম-খরচাতত্ত্ববাদীদের মত তিনি বলেন যে "চেষ্টা" (effort) হইতেই মূল্যের উদ্ভব, কিন্তু তিনি "চেষ্টা" শব্দটি "শ্রম" অপেক্ষা ব্যাপক ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও তিনি এ শব্দটিতে ঠিক কি বুঝিয়াছেন বলা কঠিন। সেবা বা পণ্য বিনিময় করিবার সময় চেষ্টা বা কষ্টোদ্ভূত প্রয়োজনীয়তার প্রতিই লক্ষ্য থাকে, কারণ প্রাকৃতিক শক্তি-পুঞ্জ স্বতঃ লভ্য। তাহা হইলে সঞ্চিত শ্রমের মূল্যের উঠানামাটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তাহার উত্তরে বাস্তিয়া বলিতেছেন, চেষ্টার অর্থ; যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা নয়, গ্রাহক বা ক্রেতার পক্ষে যে চেষ্টা বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা। অ্যাডাম্ স্মিথ কর্তৃক শ্রম-খরচা তত্ত্বের পরিবর্ত্তে শ্রম-বিনিময় তত্ত্ব গ্রহণের ফলে তিনি এই ধারণা লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার কাছে ইহার মানেই দেখা। তাই তিনি বলেন "মূল্য হইতেছে দুইটি সেবার মধ্যে বিনিময়ের সম্বন্ধ।" যে চেষ্টা বাঁচিল তাহা (বা সেবা) কোন এক ব্যক্তির কর্ম্মফল; অন্য এক ব্যক্তির অভাব আছে ও সন্তোষ ভোগ করে; সুতরাং প্রথম সেবার বদলে অন্য সেবার আকারে কিছু মূল্য দেওয়া দরকার হয়।

শ্রম ও পুঁজির সুদ; জমির মূল্য

মূল্য বস্তু না হইলেও বস্তুতে পরিণত হইতে পারে। তখন উহা সঞ্চিত হইয়া অর্থাৎ পুঁজিপাটা হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, "মূল্য যখন সেবা হইতে ফলে রূপান্তরিত হয়, তখন সেবারূপে যেসকল বিপদ্ ইত্যাদি ইহার ছিল, ফলরূপেও সেসকল বর্ত্তমান থাকে। এই মূল্য বাড়িতে পারে আবার কমিতে কমিতে অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পণ্যের মধ্যে (অর্থাৎ পুঁজিতে) যে মূল্য নিহিত থাকে, তাহার ঝোঁক পতনের দিকে।" বাস্তিয়া বলেন, "এক বৎসর পরে বিক্রয় করিবার জন্য যে লোক আজ পাত্র তৈরী করিতেছে, সে তৈরী পাত্রে মূল্য দিয়া যেয়; এই মূল্য সেবার মূল্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়—কিন্তু সেবার বর্ত্তমান মূল্য দ্বারা নহে, এক বৎসর পরে ইহার যে মূল্য হইবে তাহার দ্বারা।" শিল্পে প্রতিদিনই উন্নতি সাধন হইতেছে বলিয়া, এক বৎসর পরে ঐ পাত্র অপেক্ষাকৃত সস্তায় তৈরী হইতে পারে। সুতরাং, বাস্তিয়ার মতে, শ্রমের বর্ত্তমান সেবার তুলনায় পুঁজির (অর্থাৎ সঞ্চিত সেবার) অসুবিধা বেশী। এবং সমাজ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়—এরূপ উন্নতি পথে সমাজ সর্ব্বদা অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বাস্তিয়া মনে করেন—শ্রমের তুলনায় পুঁজিকে ততই অধিক ক্ষতি গ্রস্ত করিতে হয়। সুতরাং শ্রমজীবীদের অসন্তোষের কোনই কারণ নাই।

খাজানাও অতীত সেবার ফলমাত্র। রিকার্ডোর মতে মাটীর আদিম ও অবিনশ্বর শক্তি-সমূহ হইতেই খাজানার উৎপত্তি; বাস্তিয়া বলেন, একথা সত্য নহে। এগুলি প্রকৃতির দান বলিয়া ইহাদের জন্য কোনরূপ দক্ষিণা আদায় করা যায় না। অতীত সেবাই—যেমন, জঙ্গল পরিষ্কার

করা, নালা-কাটা, বেড়া লাগান, সার দেওয়া প্রভৃতি—জমির মূল্য নির্দ্দেশ করে। প্রাচীন কালে শ্রমিকের জন্যাতি উন্নত প্রণালীর ছিল না বলিয়া ঐ সব সেবাদানের জন্য এখনকার চেয়ে অধিক শ্রম লাগিত। জমিদারের আয় জমির উৎকর্ষের বর্ত্তমান মূল্য অনুযায়ী হয়। জমিদারকে ইহার অধিক দেওয়ার চেয়ে লোকে বরং নতুন জমি লইয়া তাহার উন্নতি করিয়া লইবে। রাস্তিয়া বলেন, "ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে অনবরত প্রচার কিরূপ ভিত্তিহীন। অপর যে কোন বস্তুর মূল্যের সহিত জমির মূল্যের কোন পার্থক্য নাই।"

শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট না থাকিবার কোন হেতু নাই। উৎপাদন ক্রমাগত সহজ এবং প্রচুর হইতেছে। শ্রমিকের অংশ ক্রমাগত বাড়িয়া যায়। ইহা হইতে রাস্তিয়ার দুইটি সিদ্ধান্ত এই :—

(১) পুঁজিপতি ও নিয়োগকর্ত্তার শ্রেণীতে শ্রমিকের উন্নীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

(২) মজুরি বাড়িতে থাকে।

উপসিদ্ধান্ত :—বেতনভোগী মজুরের অবস্থা হইতে নিয়োগকর্ত্তার শ্রেণীতে উঠা ক্রমশই কম বাঞ্ছনীয় ও অধিকতর সহজ হয়।

পুঁজিপতি খাদনের সময় স্থগিত করিয়া রাখে,—রাস্তিয়ার মতে, একমাত্র এই কাজের জন্যই পুঁজিপতি বেতন বা সুদ পাইবার যোগ্য। ইহাতে স্বার্থ-সামঞ্জস্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। পুঁজিপতির অংশ শ্রমের অংশের তুলনায় কমিয়া যায় বটে, কিন্তু পুঁজি বাড়িয়া যায় বলিয়া পুঁজিপতির মোট অংশ বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে সমাজের মোট উৎপাদন যদি যথাক্রমে ১০০০।২০০০।৩০০০।৪০০০ হয়, তবে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ইহা নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ হইবে—

	মোট উৎপাদন	পুঁজির অংশ	শ্রমের অংশ
প্রথম বারে		৫০০	৫০০
দ্বিতীয় ,,	২০০০	৮০০	১২০০
তৃতীয় ,,	৩০০০	১৩৫০	১৬৫০
চতুর্থ ,,	৪০০০	১২০০	২৮০০

পুঁজির অংশ ৫০% হইতে, ৪০%, ৩৫%, ৩০%এ নামিয়া যায় ও শ্রমের অংশ ৫০% হইতে ৬০%, ৬৫%, ও ৭০%এ উঠে।

রাস্তিয়ার মতে, পুঁজির অংশ তুলনায় যে কমিয়া যায় তার একটা প্রমাণ এই, উন্নতিশীল সমাজে সুদের হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে, কিন্তু মোট অংশটা বাড়ে, তাহা না হইলে, অল্প পরিমাণ হইতে সমাজের চেয়ে বেশী লাভ হইলে পুঁজিপতিগণ কতকটা নষ্ট করিয়া বা ভোগ করিয়া ফেলিতেন।

রাস্তিয়া একথা বুঝিতে পারেন নাই যে, পুঁজি ও শ্রমের সম্মিলিত উৎপাদন কম হওয়ার দরুণ পুঁজির মোট মুনাফার অংশটাও কম হইতে পারে। মনে করা যাক্ যে, বিশিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি হইতে এক সময়ে ১০০০ পাওয়া যায় ও অন্য এক সময়ে মাত্র ৮০০ পাওয়া যায়। আরো মনে করা যাক্ যে, প্রথম বারে পুঁজির অংশ ৫০০ ও দ্বিতীয় বারে ৪০০। এক্ষেত্রে পুঁজির মোট অংশ কম হইলেও শ্রমের অংশের তুলনায় অধিক। রাস্তিয়ার অনুমান সত্য হইলে এ অনুমানটিই বা সত্য না হইবে কেন?

রিকার্ডো ও রাস্তিয়ার কত প্রভেদ! রিকার্ডোর মতে বাঁচা মাল ও খাদ্য সংস্থানের জন্য বাড়িয়া চলে ও সাথে সাথে খাজনাও বাড়ে,—খাজনার এই বৃদ্ধি কটনে সঙ্কোচ ঘটায়। কিন্তু ক্যারির মত রাস্তিয়া ভাবিতেন যে, শ্রম এবং পুঁজির অংশ (জমি মুক্ত) বাড়িয়া চলে, আর মজুরিটাই অধিক তাড়াতাড়ি বাড়ে।

সরকারী হস্তক্ষেপ

রাস্তিয়া বলেন, সরকারের কর্ত্তব্য অতি সহজ। একটি মাত্র ক্ষেত্রে সরকারের শক্তিপ্রয়োগ নীতিসঙ্গত। সুবিচার স্থাপনের জন্য "সুশৃঙ্খলা, নিরপেক্ষতা, ও ন্যায় রক্ষার্থেই কেবল" সরকারী হস্তক্ষেপ আবশ্যক। "ইহা ছাড়া অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিবেক, বুদ্ধি, ব্যবসা—এক কথায় মানবের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়।"

ক্যারি ও রাস্তিয়া

রাস্তিয়া অনেক বিষয়ে যে, ফুনোয়ের, ক্যারি, লিষ্ট,

প্রভৃতির নিকট ঋণী। "সানরক্ত প্রণালী" সম্বন্ধে উভয়ের (ক্যারি ও বাস্তিয়া) লেখায় এতখানি সাদৃশ্য দেখা যায় যে, ক্যারির শিষ্যবর্গ বাস্তিয়াকে "সাহিত্যের ঘরে চুরি" করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করেন। স্বার্থই, উভয়ের ভাব ও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে; উভয়ের লেখা পাঠ করিলেই ইহা বোঝা যায়। অনেকে বলেন যে, উভয়েই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অনুশীলন করিতে করিতে একই সত্যে উপনীত হইয়াছেন। এই মামলার নিষ্পত্তি করা সহজ নয়। তবে ইহা সত্য যে, ক্যারির "প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি" ও "পাষ্ট, প্রেজেন্ট, অ্যাণ্ড্ ফিউচার" যথাক্রমে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়; আর বাস্তিয়ার "আরমনি সেকোনোমিকে।" ১৮৫০ খৃঃ বাহির হয়।

সমালোচনা

বাস্তিয়ার লেখায় অনেক ত্রুটি আছে; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জমির মূল্য সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি ভ্রমপূর্ণ; তিনি মনে করিতেন যে, জমির মূল্য, পরিষ্কার করিবার খরচ, বেড়া লাগাইবার খরচ প্রভৃতির সমান হয়; কিন্তু একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যেহেতু, এক্ষণে অনেক জমির মূল্য এই খরচার চেয়েও কম।

তাঁহার মূল্যতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে "চেষ্টা" ও "সেবা" শব্দ দুটি আমাদের বিশেষ কোন সাহায্য করে না। "সেবা" শব্দটি "শ্রম" শব্দ হইতে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইলেও কতখানি ব্যাপক অর্থে ইহা ব্যবহার করা হইবে? "চেষ্টা"র মূল্যই বা নিরূপিত হয় কি ভাবে?—এই সব প্রশ্নের বাস্তিয়া কোন সন্তোষ-জনক উত্তর দেন নাই। অধিকন্তু, তিনি প্রয়োজন-মূল্যের কথা কিছুই বলেন নাই, কেবল বিনিময়-মূল্যের কথাই বলিয়াছেন।

ফ্রান্সের দরিদ্র বা অসুখী নাই, একথা বাস্তিয়া বলেন না; তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার অভাবই তাহাদের দুঃখের কারণ; কিন্তু তাহাদের স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত ও পুঁজিপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, এও তাঁহার মত। বাস্তিয়ার লেখার সমর্থক থাকিলেও শিষ্যের অভাব হয় নাই। জার্মানির অনেকেই তাঁহার কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু জার্মানির এই শিষ্যমণ্ডলী অনেক অংশে বাস্তিয়াকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা যে বর্ত্তমান ব্যবস্থাকেই শুধু ভাল বলিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা কোনরূপ সামাজিক সমস্যার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ শিক্ষা দিয়াছেন যে, সুখ-শান্তির জন্য আত্ম-ত্যাগ প্রয়োজন এবং তাহা হইলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু বাস্তিয়া বলিতে চান যে, মানুষ শৃঙ্খলা ও বিজ্ঞান-সম্মত-ভাবে আত্ম-স্বার্থের অনুসরণ করে নাই বলিয়া জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

কৃষক ও সমবায়

জনৈক সমবায়ী

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির তরফ থেকে যে নীতিতে পল্লী-সমিতিগুলিকে অর্থ যোগান দরকার সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেই মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এইটাই হ'ল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির সব চেয়ে বড় কাজ। এরই অভাব ঘটলে সমবায় সমিতিগুলির টিঁকে থাকা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

সাধারণ চাষী, যাদের ঋণভার থেকে মুক্তি দেবার জন্যই এই আন্দোলন, তাদের দিকটা দেখা যাক্; এদের তিন রকমের ঋণ দরকার হয়। পূর্ব্বকার জমে-উঠা যে সব ঋণ র'য়েছে, সেগুলি শোধ দেবার জন্য দীর্ঘ মিয়াদে বেশী টাকা এক সঙ্গে দিতে হবে। মজুরি খেটে, ফসল থেকে

এবং পুরোনো ঋণের যে সুদের টাকা এখন বেঁচে যেতে থাকবে, এখন নিশ্চিন্তে এখন সে ধীরে ধীরে পাঁচ দশ বা পনর বছরে স্বচ্ছন্দে শোধ করবে। তারপর লাঙ্গল গরু বলদাদি, ছোটখাট ঋণশোধ, ঘরবাড়ী তৈরী বা কোন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম বাবদ যে সব টাকা দরকার হয়, তার জন্য অল্প দিনের—এই দুই, তিন বা চারি বছরের মিয়াদে, ঋণ পেতে পারে। তা ছাড়া চাষের আনুষঙ্গিক বিবিধ খরচ, বীজ, সার সেচ বা মজুর, এসব বাবদ সামান্য কিছু ঋণও তার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু এই টাকাটি তাকে বছর না ঘুরতেই জমির ফসল উঠ্‌লে শোধ করে দিতেই হবে। পরের বছরের জন্য এ টাকা ফেলে রাখা কখনই হতে পারে না।

এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ঋণ অর্থাৎ অনেক দিনের মিয়াদে পরিশোধনীয় ঋণ, সাধারণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যোগান দেওয়া সম্ভবপর নয়। আজকাল অনেক আলোচনার ফলে সবাই ভাব্‌ছেন, এই উদ্দেশ্যে আলাদা করে ল্যাণ্ড মর্টগেজ (জমি বন্ধকী) ব্যাঙ্ক বসানো দরকার।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এই শেষোক্ত দুই প্রকার ঋণ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে। এখন দেখা যাক্ তার নিয়মকানুনগুলি কিরূপ হওয়া দরকার।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রমাগতই বলে আস্‌ছেন যে, চাষের সময়টায় যে টাকাটা কৃষকের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তার জন্য প্রচুর টাকা মজুদ থাকা দরকার। মরশুমের সময়ে কয়েক কিস্তিতে দরকারমত কৃষককে টাকা দিতে হবে, এবং ফসল উঠে গেলে তার দাম হাতে আসামাত্রই এই ঋণ পুরোপুরি আদায় করে নিতে হবে। এই "পুরো-পুরি আদায়" কথাটার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে কারণ সঙ্গে সঙ্গে যদি টাকাটা আদায় না হয়ে যায়, তবে পরের বছরের মরশুমে, দু' বছরকার জমানো পাওনা আদায় হবার আশা খুবই কম। তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে না নিলে, সেই অর্থ নিশ্চিতই অনর্থক ব্যয়ে অপচয় হয়ে যাবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সকল সমবায়-কর্ম্মীরই এই কথাটি খুব ভেবে দেখা দরকার।

এখন, চাষের খরচা এবং চাষকালীন কৃষকের সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করবার জন্য এই যে ঋণ দেওয়া হবে, সেটা একেবারে না দিয়ে যে দরকারমত কয়েক কিস্তিতে দেওয়া উচিত, তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এর কারণ স্পষ্ট। প্রথমতঃ, এক সঙ্গে সবটা টাকা পেলে সেটা অপব্যয় ক'রে উড়িয়ে দেবার সম্ভাবনাই বারো আনা। কাজেই চাষের শেষ দিকে যখন টাকার টানাটানি হবে, তখন বাধ্য হয়েই তাকে সেই গ্রাম্য মহাজনের কাছে হাত পাত্‌তে হবে। আবার সেই সর্ব্বগ্রাসী সুদ এবং তার পুরোনো চিরকালের ইতিহাস! তার পক্ষে তবে আর সমবায়ের ফল কি হল? মিতব্যয় এবং শিক্ষার ফলে আপনা থেকে এই অসুবিধা দূর হয়ে যাবে, সে আশা করে ব'সে থাকা ঠিক নয়। অনতি-বিলম্বে যেটা একান্ত প্রয়োজন তার বেশী একটি পয়সা ঋণ নেওয়াও চাষীর নিজের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

কাজেই আমাদের মত এই যে, প্রত্যেক সমিতি এবং তার সভ্যদের ব্যয়-নির্ব্বাহোপযোগী যে টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ঠিক করে দেবেন, সেই সঙ্গে কয় কিস্তিতে, কি বাবদ, কত টাকা, কবে দিতে হবে, সেটা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া দরকার এবং কখন কোন্ কোন্ সময়ে এই টাকা চাষীকে দেওয়া হবে তাও পরিদর্শক ও পরিচালকবর্গ অনুসন্ধান ক'রে এবং বিচার ক'রে নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখবেন।

এর বিরুদ্ধে একটু কথার আছে এই যে, এই সব ছোট ছোট ঋণ বারে বারে নানা সময়ে দূর দূর পল্লীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্যাটি দূর করবার একটি উপায় হচ্ছে সেক্রেটারী বা ম্যানেজার বা ডিরেক্টরের মারফতে এই ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা। আর হতে পারে স্থানীয় বিশ্বাসযোগ্য মহাজন বা ব্যাপারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে চেক্‌যোগে ঋণ বিতরণ করা।

মাদ্রাজ ব্যাঙ্কিং কমিটি একটি কথার উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন,—সে হচ্ছে টাকা দরকার হওয়ামাত্র, দেরী না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা যেন দেওয়া হয়ে যায়। কারণ, ঠিক কাজের সময়টিতে টাকা না পেলে, সেই মহাজনের কাছেই যেতে হবে এবং পরে টাকাটা হাতে এলে উপকার না হয়ে অপকারই হবে বেশী।

কমিটি আরও বলেছেন যে, যতটা দরকার তত যেন ঠিক ততটাই দেওয়া হয়, বেশী যেমন নয়, কমও তেমনি একটি পয়সা হবে না। যেমন মনে করা যাক্, কৃষির চাষে যদি বুনবার সময়ে টাকা দিয়ে, ঘরে তুলবার সময়ে সাহায্য না আসে, তবে তেমন ঋণ পেয়ে কৃষকের কখনই চলবে না। এ অবশ্য আর বেশী যুক্তি দিয়ে বুঝাবার দরকার হয় না।

অনেক কর্ম্মীর মত যে, সব সমিতিই ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে যায়; কথাটা সাধারণভাবে সত্য না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, কর্ম্মচারী ও প্রভাবশালী সভ্যগণ অনেক সময়েই তাঁদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে, ব্যাঙ্কের টাকা বহুলাংশে নিজের স্বার্থে নিয়োগ করে থাকেন। এবং যখন নিজেরা সেই টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ দিয়ে উঠতে পারেন না, তখন স্বভাবতঃই অন্যান্য অনাদায়ী পাওনার উপরেও জোর তাগিদ দিতে পারেন না। অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের পরিচালক বা সম্পর্কিত এমন সব ব্যক্তি এসব অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হন, যে সরকারী সুপারভাইজারেরাও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সাহস পান না। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের ১৯২২ সনের ২ নং সার্কুলার একান্তভাবে মেনে চলা। কোন্ বিশেষ সময়ের জন্য কোন্ সময়ে ঠিক কত টাকা দরকার কড়াকড়ি ভাবে সেই হিসাবমত টাকা ঋণ দেওয়া হ'লে এসব কাণ্ড কখনই ঘটতে পারে না।

এই গেল একটা দিক্, এটা না হয়, ওটা না হয়, এসব সাবধান হবার কথাগুলি। এছাড়া কৃষকসমাজের উন্নতি কল্পে এমন সব করণীয় বহু কাজও ব্যাঙ্কের রয়েছে; কোন সেন্ট্রল ব্যাঙ্কে গিয়ে যদি খোঁজ নেওয়া যায় যে, অন্তর্ভুক্ত সব সমিতি এবার বর্ষার সময় তাহাদের প্রাপ্য ঋণ ঠিকমত পেয়েছে কিনা, বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা যাবে যে, অমুক অমুক সমিতি পূর্ব্বেকার কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি বলে এবার তাদের ঋণ দেওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কিস্তির টাকা কেনই বা শোধ দেওয়া হয়নি এবং এই ঋণ দেওয়া বন্ধ হ'লে সভ্যদের কি অবস্থা হবে, সে খোঁজ কর্তৃপক্ষ রাখেন কিনা সন্দেহ। দেখা যাক্ সে ক্ষেত্রে ফল কি দাঁড়ায়; যদি চাষের বাজ-নির্ব্বাচনের জন্য ঋণ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তবে নিঃসন্দেহই তারা স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে টাকা বা ধান কর্জ্জ করে। তবে লাভ হ'ল কার? কৃষকের ত নয়ই, সমিতিরও নয়। কারণ মহাজনদের থেকে চড়া সুদে কর্জ্জ নেওয়ায়, সমিতি ইতিমধ্যে যে ঋণ তাদের দিয়ে ফেলেছে, তার আদায়ই আদায় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এবং ওরকম জড়িয়ে পড়লে, তার থেকে পাওনা আদায় করার আশাও করা অনুচিত।

অবশ্য যদি এমন হয় যে, কোনো বিশেষ সমিতির অবস্থা আশাজনক হ'লে তাকে একেবারে তুলে দিতে হয়, সে আলাদা কথা; কিম্বা সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক লোপ পেয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিতেই হবে; কিন্তু এরূপ চরম নীতি প্রয়োগ যতদিন না হচ্ছে, ততদিন তাকে সরবরাহ করা বন্ধ করে দেওয়া কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন সমিতিকে ৫.৬ এমন কি ১০ বছর পূর্ব্বে ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, এমন দৃষ্টান্ত চের দেখা যায়। ইতিমধ্যে চাষীদের যে কি অবস্থা হয়েছে তার খবর কেউ নেওয়া দরকার মনে করেনি। আসল কথা, যে টাকাটা কর্জ্জ হিসাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা আদায় না করে অনিশ্চিত আশায় ঘরের টাকা বের করে দিতে ব্যাঙ্কগুলি বড়ই কুণ্ঠিত হয়। এবং সেটাকাটা কোনো এক প্রকারে উঠে এলে সম্পর্কটি ঘুচে গেল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই সমিতিগুলির পূর্ব্বেকার ঋণ এবং স্থানীয় মহাজনের নিকট গৃহীত নূতন ঋণ এই দু'য়ের চাপে পড়ে পুরোনো ঋণ শোধ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসকল তথাকথিত সমবায় ব্যাঙ্ক ও পল্লী-সমবায় সমিতির মধ্যে "অ-সহযোগ" এবং অবিশ্বাস এত বেশী দেখা যায় যে, ক্রমেই সংশ্লিষ্ট সমিতি ও অবশেষে মূল সংগঠনই ধ্বংস হয়ে যায়। এসব ঘটবার কতগুলি সাধারণ কারণ থাকা খুবই সম্ভব, যথা:—গোড়াতেই সংগঠনের দৈন্য; অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারবার, সভ্যদের সমবায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে অবহেলা, পরিদর্শনের ত্রুটি, ইত্যাদি। ভবিষ্যতের চেয়ে বর্ত্তমানের প্রতিই আমাদের বেশী নজর রাখা কর্ত্তব্য। কোন্

সমিতি সংস্কার বা পুনর্গঠনের অতীত সে সম্বন্ধে ঠিক সিদ্ধান্ত ব্যাঙ্কের অবিলম্বে করা দরকার। যা কিছু সিদ্ধান্ত হয়, সে অনুসারে কর্ত্তব্য যা তা দ্রুতগতিতে করতে হবে, অবশ্য সমিতিটিকে সামলে নেবার জন্য কিছু দিনের মত ছাড়া সময় এবং সুযোগ দিতে হবে।

এখন এই সব সমিতির সংস্কার করা সম্বন্ধে অনেক কথা এসে পড়ে। সাধারণতঃ যা-করা হবে তা এই—ব্যাঙ্ক থেকে সমিতিকে তার দেনা মিটিয়ে দেবার সময় হয়ত কিছুদিনের মত পেছিয়ে দিল। নতুন ক'রে ঋণ দেওয়া অবশ্য ঐ পুরোনো হিসাব না মেটা পর্য্যন্ত বন্ধই থাকল। অধিকন্তু, কমিটী থেকে দু'চার জন সভ্যকে বাদ দিয়ে, নতুন কয়েক-জনকে ঢোকান হল, পরিদর্শকের মন্তব্যের ওপরে নির্ভর ক'রে। এই নতুন সভ্যগণ যে পূর্ব্বেকার সভ্যদের থেকে কিছু উৎকৃষ্ট হবেন, তা জানবার বিশেষ প্রয়োজন হ'ল না। এতেই ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে সবর দিলেন, চাই কি উদারতার আতিশয্যে কিছু নতুন ঋণও মঞ্জুর হয়ে গেল। আসল সমস্যাটা কিন্তু এতে চাপাই থেকে গেল। যে সমিতি একবার দেনা মিটাতে পারে নি, ভবিষ্যতেও যে আবার তাই করবে না, তার নিশ্চয়তা কি? আরও বছর তিনেকের মত তাগিদ্ পিছিয়ে দেওয়া, এতে তো আর হাঙ্গাম নেই, দিলেই হল। অথচ এতে ব্যাঙ্কের বার্ষিক অনাদায়ের পরিমাণও কাগজে কলমে বেশ কম দেখায়, বার্ষিক রিপোর্টটিও অংশীদারদের কাছে বেশ মনোজ্ঞ করে রচনা করা যায়। এই মিয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া মানে সমিতির ও তার সভ্যদের পরিশোধের তারিখ কিছু পিছিয়ে দেওয়া।

সত্যিকার সুব্যবস্থা করতে হলে, ব্যাঙ্কের নিশ্চিতভাবে জানা দরকার যে, যে-সব কারণে সমিতি পূর্ব্বে একবার নিয়ম-ভঙ্গ করেছিল, সে-সব কারণগুলি দূর হয়েছে কি না। ঐ অঞ্চলের যিনি পরিদর্শক তাঁকে বেশ ভাল ক'রে দেখে বুঝে নিতে হবে যে, এই নতুন বন্দোবস্ত অনুযায়ী, পূর্ব্বেকার কিস্তি, নতুন পাওনা এবং ইতিমধ্যে গ্রামা মহাজনদের নিকট যদি কিছু দেনা হ'য়ে থাকে, এ সব নিয়মিতভাবে দেবার সামর্থ সভ্যদের হবে কি না। যদি এ সব দিক্ দিয়ে সমিতির অবস্থা আশাপ্রদ মনে হয়, তবেই তাকে পুনর্জ্জীবন দান করবার চেষ্টা সঙ্গত হবে ব'লে মনে করা যায়, নতুবা নয়। এবং সেই সঙ্গে কৃষকদেরও আশ্বাস দিতে হবে যে, তাদের বাস্তবিক প্রয়োজন যে টাকা, তা তাদের সমিতি থেকে অবশ্যই দেওয়া হবে।

এখন দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ সম্বন্ধে কি হ'তে পারে দেখা যাক্। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের মিয়াদে কৃষকের ঘরবাড়ী মেরামত, চাষের যন্ত্রপাতি, বা বলদ, যে সবের আয়ু অধিক অথচ যেগুলি ভবিষ্যতেও কাজ দিতে থাকবে, সেই সব বাবদ যে টাকা দরকার।

অনেকের মতে, চাষের মরশুমের সময়টায় এই ঋণ দেওয়া ঠিক নয়। যখন চাষের উপস্থিত ব্যয় মিটাইবার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে, সে সময়টায় এই সব ভবিষ্যৎ সংস্থান এবং দামাজিক ব্যয় সম্পর্কে না ভাবাই ভাল। এসব খরচ মিটাবার জন্য তার উচিত, কিছুদিন অপেক্ষা করে চাষের অবস্থা দেখে লাভ-লোকসান এবং আর্থিক অবস্থা খতিয়ে সেই অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া। ধরা যাক্, একজনের আট বিঘা পাটের জমি আছে। যদি ভাল জন্মায়, এর থেকে তার চল্লিশ মণ পাট অনায়াসে উঠে আসতে পারে। আট টাকা দরে বিক্রীতেও তাতে তার ৩২০৲ টাকা আমদানি হবে। এর থেকে ৮০৲ টাকার মত তাকে সমিতিকে দিতে হবে, যেখান থেকে তার চাষের ব্যয় এবং খাওয়া খরচের জন্য এই পরিমাণ ঋণ করতে হয়েছিল। এ ছাড়া খাজানা এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়ও করতে হবে। পরের ক'মাসের খাবার জন্যও তাকে কিছু টাকা রাখতে হবে। মনে করা যাক্ এসব দিক্ মিটিয়ে তার হাতে ১২০৲ টাকা আন্দাজ থাকল। তখন সে সমিতিকে গিয়ে বলতে পারে, "আমার নিজের হাতে ১২০৲ টাকা রয়েছে; আমাকে যদি আর ৩০০৲ টাকা সমিতি থেকে দেওয়া হয়, আমি এখনই জনার্দ্দন বেপারীর পাওনা সুদে আসলে মিটিয়ে দিতে পারি; এবং এর পরে আমার চাষের আয় থেকে আর সুদ যা বেঁচে যাবে, তা মিলিয়ে অনায়াসেই সমিতির ঋণ শোধ করে দিতে পারি। অথবা সভার একটা জমি বিক্রিয়ে যাচ্ছে, সেটা পেলে

চাষের ভারি সুবিধা হয়; আরও ৪০০৲ টাকার মত পেলে জমিটা খরিদ করা যায়। এই নতুন জমির আয় আর এমনি যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে খরচ খরচা বাদ দিয়ে তা থেকে সমিতির দেনা মিটিয়ে দিতে আমি স্বচ্ছন্দে পারি।" এভাবে অগ্রসর হলে সমিতি প্রত্যেকটি আবেদন ভাল করে বিচার করে, নির্দ্ধারণ করতে পারেন,—কাকে কত দেওয়া যেতে পারে। এরূপ হলে সমিতিগুলির আর্থিক সমস্যা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আজকাল অবশ্য যেভাবে এই দেনা পাওনা চ'লে থাকে তার একটু নমুনা দিচ্ছি। এই সমিতি হয় ত পুরোনো দেনা, সভ্যদের সংস্থান, এবং নতুন চাষের বাবদ এক সঙ্গে ৮৪০৲ টাকা ব্যাঙ্কের কাছে দাবী করল; ব্যাঙ্কের সুপারভাইজার যিনি আবেদন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে মন্তব্য দেবেন, তিনি একটু ছাঁটাই করে সে জায়গায় ৭২০৲ টাকার জন্য অনুমোদন করে দিলেন, কারণ ব্যাঙ্কের মাইনে খাচ্ছেন কিছু একটু না করলে চলে না। অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই হয়। আবেদনটি তারপর ডিরেক্টার বোর্ডে পেশ হলে তাঁরা যদি মনে করেন যে, স্থানীয় সুপারভাইজার মহাশয় মোটেই কড়া রকমের নন্, তবে আরও কিছু ছাঁটাই হয়; এর উপরে যদি সেক্রেটারী জানান যে, তহবিলে টাকার খাঁকতি আছে তবে তো একদম কাঁচি চালিয়ে ছাঁটাই চলে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, তহবিলে টাকা প্রচুর, অঙ্কেই ডিপজিট হচ্ছে, তবে একটু ভালভাবেই মঞ্জুর হয়ে যেতে পারে। অথচ যার জন্য এই টাকাটা যাচ্ছে তাদের জানবারও অবকাশ হবে না যে, কেন কি কারণে টাকা সম্পূর্ণ বা আংশিক মঞ্জুর হয়ে আসে। কারণটা সম্পূর্ণভাবে অপরিজ্ঞাতই থেকে যায় এবং যা মঞ্জুর হয় বিনা যুক্তিতে তাই নিতে হয়। কিন্তু শুধুই কি এই? আরও আছে। ঋণ তো মঞ্জুর হল। গ্রামের তিনজন প্রধান, সমিতির পঞ্চায়েৎ সহরে এলেন টাকাটা নিতে। সেখানেই ঠিক হয়ে গেল, নিজেরাই বা কতটা টাকা নিয়ে নেবেন এবং কতটা বাকী সভ্যদের দেওয়া হবে। কাল-নেমির লঙ্কাভাগ! এর মধ্যে যাঁর প্রতিপত্তি বেশী, তিনি হয় ত ইতিমধ্যেই মোটা রকমের কর্জ্জ নিয়েছেন, যা ঠিক সময়ে শোধ দেওয়া হয় নি। তার প্রয়োজনও বাস্তবিক তত নেই, অন্যান্য সভ্যের যতটা রয়েছে। কিন্তু তাতে কি? তিনি হলেন গ্রামের মাতব্বর; সিংহের বখরা যে তাঁরই! তারপর গ্রামে ফিরে গিয়ে সভ্যদের বললেই হল যে, ব্যাঙ্ক দাবীর পুরো টাকা মঞ্জুর করল না, কাজেই তাদের সবাইকে এবার দেওয়া যাবে না। কিন্তু মাতব্বরের হৃদয় তো আর পাষাণ নয়; ব্যাঙ্ক যখন সাহায্য দিচ্ছে না তাই বলে কি তাদের একটা কিছু বিহিত না করলে চলে! না হ'লে আবার সেই নরদেহী পিশাচ মহাজনের কবলে পড়তে হবে যে! কাজেই মাতব্বর তাঁদের এবারকার মত ধান কর্জ্জ দিয়ে রক্ষা করলেন। দরিদ্র গ্রামবাসী অবশ্য জানতেও পেল না যে, তাদেরই প্রাপ্য টাকায় কেনা এই ধান।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিতে এই যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বর্ত্তমানে হয়েই চলেছে, এর প্রতিবিধান করবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। এর জন্য দুটি দিকে নজর রাখতে হবে। এক নম্বর, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে একবার কর্জ্জ ক'রে, আবার মহাজনের খাতায় কেউ না হয়, এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে শস্য কর্জ্জ করা বন্ধ হয়। বর্ত্তমানে এদিকে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ ও পরিদর্শকগণের দৃষ্টি পড়ে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মচারীদের বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার যে, যে বাবদ ঋণ দেওয়া হয়েছে, টাকাটা ঠিক ঠিক সে উদ্দেশ্যে খরচ হল, না অন্য কাজে অপব্যয়ে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ম্যাক্লাগান কমিটি এই জিনিষটিতে খুব জোর দিয়েছেন, যদিও দুঃখের বিষয় এই যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি সে সম্বন্ধে নিতান্তই ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন।

(ভাণ্ডার)

৩৫ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা অরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীঅমূল্য দাস, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক—১৩৩৮ আর্থিক উন্নতি ৬ষ্ঠ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—চক্র আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

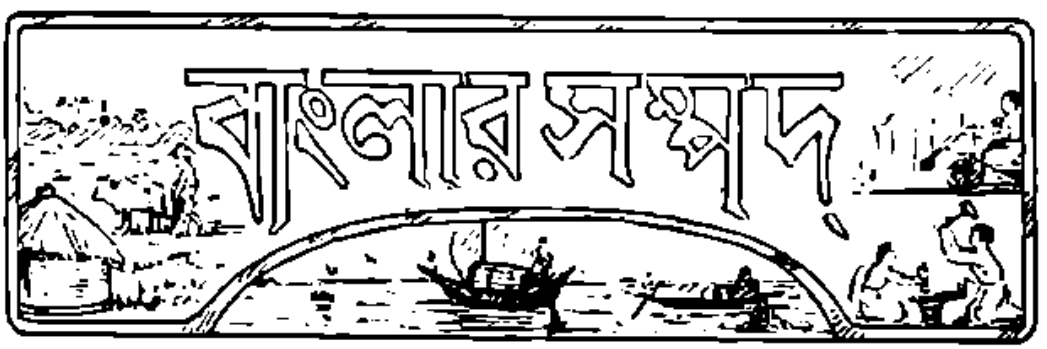

বরিশালে ভদ্রলোককে চাষী বানাইবার উদ্যম

গবর্ণমেণ্ট বরিশালের অন্তর্গত ভোলা মহকুমার কোন চরে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দ্বারা চাষ আবাদের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বরিশালের কালেক্টর ১১ জন হিন্দু ও ৯ জন মুসলমান মধ্যবিত্ত যুবককে নির্ব্বাচিত করিয়া মেঘনাদনদের তীরে ১০০ বিঘা করিয়া চাষের উপযোগী জমি দিয়াছেন। এই জমি ভোলা মহকুমার সদর হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ স্থান স্বাস্থ্যকর ও জিনিষপত্র সস্তা। তথায় মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়। নির্ব্বাচিত স্থানের দৃশ্য সুন্দর।

ঐ স্থানে বৎসরে তিনটা ফসল উৎপন্ন করা যাইবে। জমি উর্ব্বরা। যে সকল যুবককে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে তাঁহারা সুস্থ ও বলবান। তাঁহাদের অর্থের প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। ইহা দেখিয়াই লোক বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ গ্রাজুয়েট, কেহ রাজবংশজাত; তন্মধ্যে একজন ঢাকাবাসী, একজন ফরিদপুরবাসী এবং অপর সকলে বরিশালবাসী।

এইসকল নবীন চাষীরা ১৯টা পুকুর কাটিয়াছেন, অনেক জমি সমতল করিয়াছেন। তাঁহারা ১১ খানা বড় ঘর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিবেন। বাড়ী তৈয়ার করিতে পরস্পরের সাহায্য পাইবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেহ ইহার সভ্য হইতে পারিবে না। চাষের জমি ইহার ৩ মাইল দক্ষিণে।

কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার সমবায় সমিতিকে বিনা সুদে তিন বৎসরের জন্য ৫০০০ টাকা ঋণ দিয়াছেন। বরিশাল সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ঐ সমিতিকে ১০ হাজার টাকা ঋণ দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমবায় সমিতি

চরাইবার জন্য যে জমি পত্তন দেওয়া হয়, তাহা অপর কাহাকেও না দিয়া সমিতিকে দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কালেক্টর খাস মহলের জমি সমিতিকে দিয়াছেন।

২০টা বাড়ী, রান্নাঘর প্রভৃতির জন্য আরও ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এইসকল যুবকদিগের মধ্যে একজন ডাক্তার। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৫০ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। চরে প্রায় ১০ হাজার রাবণ আছে; তন্মধ্যে জমির মজুরের সংখ্যা ২০০০ জন। ঐ স্থানে একটা স্কুল খোলা হইয়াছে। তাহার ছাত্র-সংখ্যা ১০০ জন, ইহা ব্যতীত পোষ্ট আফিস, ক্লাব, বাজার, মন্দির প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। একটা ডিসপেন্সারী খোলা হইবে। বসতি স্থানে গবর্ণমেণ্ট ১০০ পুকুর কাটিয়াছেন এবং জেলাবোর্ড ও খাসমহল কয়েকটা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (বাংলার বাণী)

বাংলার গৃহ-শিল্প

১। চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম সহরে ২০টি কারখানায় প্রায় তিন শত লোক কাঠের কাজ করে। মিস্ত্রিদের বেতন ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের মাল তৈয়ারি হয়। জিনিষগুলি বেশ মজবুত, কিন্তু কলিকাতার জিনিষের মত দেখিতে তত সুন্দর নয়।

আজকাল ডাঁড, মাকু ইত্যাদি খুব তৈয়ারি এবং বিক্রয় হইতেছে।

এই জেলায় বহু সাম্পান নৌকা তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া ছোট বড় আরও কয়েক প্রকারের নৌকাও আছে। এক একখানা বালাম, আধ-বালাম, গাড়ু নৌকা প্রায় ২৫০ কি ৩০০ মণ মাল টানিতে পারে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য জালিয়ানো নামক এক প্রকার খুব বড় নৌকা ব্যবহৃত হয়। বৎসরে প্রায় ১৬০,০০০ টাকা মূল্যের নৌকা তৈয়ারি হয়।

চট্টগ্রাম জেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে এখনও জাহাজ তৈয়ারি হয়। এ সংবাদ বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন, অন্ততঃ আমি তো জানিতাম না। জাহাজ তৈয়ারি এ জেলার অতি প্রাচীন শিল্প। কর্ণফুলি নদীতীরে চাকতাই হইতে চালিসহর পর্য্যন্ত কয়েকটি গ্রামে প্রায় ২০০ পরিবার বংশানুক্রমে এই কাজ করিয়া আসিতেছে। মিস্ত্রিগণ দক্ষতানুসারে দৈনিক ১৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

জাহাজ তৈয়ারির পূর্ব্বে মাটীতে নক্সা আঁকিয়া ঐ নক্সা অনুসারে এক কাঠের ফ্রেম গড়া হয়; সেই ফ্রেম দৃষ্টে জাহাজ গড়া হইতে থাকে।

জাহাজ তৈয়ারির কার্য্য নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে হইয়া থাকে :—

১। মিস্ত্রি ও কাঠের কাজ।

২। তক্তা সাজানো।

৩। মাস্তুল এবং পাল খাটানোর বন্দোবস্ত।

৪। তামা এবং পিতলের পাত মোড়া।

৫। কারুকার্য্য, যথা কাচ লাগান, কেবিন তৈয়ারি, ইত্যাদি।

৬। রং করা এবং চিত্র আঁকা।

বড় রকমের একখানা জাহাজ প্রস্তুত করিতে ১৫০।২০০ লোকের প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। সহকারিরূপে বহু বালকও নিযুক্ত করা হয়।

বোম্বাই, সিংহল, মালাবার উপকূল এবং কোকনদে এই সকল জাহাজ খুব বিক্রয় হয়। চট্টগ্রামের বহু ব্যবসায়ী নিজেদের জন্য অথবা বিক্রয়ের জন্য ছোট বড় সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ তৈয়ারি করে। এই সকল জাহাজ ৮৯ হইতে ৬৫৬ টনের পর্য্যন্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ এ, আর ডুভালের জন্য "টাইগ্রস্" নামক ৬৪৬ টনের একখানি জাহাজ তৈয়ারি করা হইয়াছিল। এই জাহাজখানি তৈয়ারি করিতে খরচ হইয়াছিল ৬০,০০০ টাকা, আর বিক্রয় করিয়া পাওয়া গিয়াছিল ৮০,০০০ টাকা।

আমরা শুনিয়াছি, প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইএ যে জাহাজ তৈয়ারি হইত তাহা ইংলণ্ডে তৈয়ারি জাহাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। তাহাতে সবই ছিল; সেই পূর্ব্ব গৌরবের শেষ রশ্মি এখনও মিলাইয়া যায় নাই। উদ্যম থাকিলে আবার সবই হইতে পারে।

কয়েকটি গ্রামে প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের অতি সুন্দর চাটাই বা ধাড়ি তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া পার্ব্বত্য জাতিসমূহ তুলা ও শস্য রপ্তানির জন্য বহু ঝুড়ি বোনে।

সীতাকুণ্ডে ছাতার বাঁট তৈয়ারির একটি কারখানা আছে। লোকে চন্দ্রনাথ এবং নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে সেড় টাকা হাজার দরে ঐ কারখানায় বাঁটের উপযোগী বাঁশ যোগায়। সীতাকুণ্ডে সুন্দর বেতের লাঠি তৈয়ারি হয়। এক এক গাড়ির দাম ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা।

চট্টগ্রামের শীতল পাটি ব্রহ্মদেশ ও কলিকাতায় খুব বিক্রয় হয়। সাত ফুট লম্বা ৫ ফুট চওড়া এক একখানা পাটির দাম এক হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত।

এই জেলায় শোলার কাজ বেশ ভাল। ইহা বিবাহ ব্যাপারে এবং তাজিয়া সাজাইতে প্রয়োজন হয়।

কুরুপ নামক এক প্রকার পাতা হইতে বাঁট-যুক্ত এবং বাঁট-বিহীন ছাতা তৈয়ারি হয়। বাঁটবিহীন ছাতাগুলি 'মাথাল' জাতীয়। প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের কুরুপ পাতা বিক্রয় হয়।

গ্রাম্য কামার ছাড়া সহরে লোহা ঢালাই কারখানা আছে। এই কারখানায় আকষাড়া কল প্রস্তুত এবং মেরামত হয়।

সহরের একটি কারখানায় চেউতোলা টিন দ্বারা বালতি, ছেওয়াসগিরি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। আটটি কারখানায় পিতলের হুকা গড়া হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এই হুকা বিক্রয় হয়।

পকালাইশ, বিবিরহাট ও আমজারবাগ চামড়া রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। এইসকল স্থানে প্রায় ৪০টি চামড়ার গুদাম আছে। এইসকল গুদাম হইতে বিস্তর চামড়া কলিকাতা, ঢাকা এবং ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়।

সহরের একটি কারখানায় স্থানীয় মুচির দ্বারা জুতা তৈয়ারি করা হয়। চামড়া পাকা করার কাজও জেলার বহু স্থানে চলে। ক্রোম চামড়াও কিছু কিছু হয়।

মাটির পাত্র জেলার সর্ব্বত্র তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া ইট ও টালির কারখানা আছে। টালি খুব ভাল নহে। তবে গ্রাম্য লোকে ইহা বেশ কেনে।

চট্টগ্রামে জামা কাপড় সেলাইয়ের কাজ খুব বিস্তৃতভাবে চলে। ধান কাটিবার সময়ে চট্টগ্রামের বহু লোক আকিয়াবে যায়; এইসকল লোকের জামা ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার জন্য বহু সেলাইওয়ালা কল লইয়া তথায় যায় এবং বেশ উপার্জ্জন করে। এখানে নানারূপ ও রঙ্গের বহু টুপি তৈয়ারি হয়।

এই জেলায় বহু গৃহস্থ শতীর পালো প্রস্তুত করে।

চট্টগ্রামের সাবানের কারখানায় সাবান তৈয়ারি হয়।

পটিয়া থানার কাগজীপাড়া গ্রামে কাগজ তৈয়ারি হয়। দেখিতে তেমন সুন্দর না হইলেও, গবর্ণমেণ্ট আফিসে, জমিদারি-দপ্তরে এবং স্কুলে এই কাগজ পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, কেন না এই কাগজে পোকা ধরে না। স্থানীয় কলেক্টার আফিসে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবহৃত কাগজ এখনও অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। অনেক জমিদারি কাছারিতে এই কাগজ এখনও ব্যবহৃত হয়।

দুঃখের বিষয়, এমন একটি উৎকৃষ্ট শিল্প উন্নত এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

এই জেলায় চিনা এবং খোলা গুড়-তৈয়ারি হয়। স্থানীয় এক প্রকার যন্ত্রের দ্বারা আকষাড়াই হয়। কিন্তু বিদেশী কল আসিয়া এই স্থানীয় যন্ত্রকে তাড়াইবার উপক্রম করিয়াছে।

জেলায় সর্ব্বত্র ঘানিতে তৈল তৈয়ারি হয়। লোকে ঘানির তৈল বেশী পছন্দ করে, কিন্তু সস্তা কলের তৈল ঘানির তৈলকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতেছে।

দুইটি কারখানায় চালমুগরা ও রেড়ির তেল প্রস্তুত হয়।

মৃতকল্প শিল্পগুলি যাহাতে আবার বাঁচিয়া ওঠে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুরাতন যন্ত্রপাতি ও পুরাতন পদ্ধতি বদলাইয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী না করিলে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে শিল্পগুলি দাঁড়াইতে পারিবে না। সরকারি শিল্পবিভাগ এই বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং উপদেশ দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

চট্টগ্রামে চামড়া পাকা করার কাজ খুব ভাল চলিতে পারে। কাঁচা মাল যথেষ্ট আছে, তৈয়ারি মাল বিক্রয়ের জন্য রেঙ্গুনের বাজার খোলা। এখানে চামড়ার কারখানা খুলিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা।

কাগজ তৈয়ারির উপকরণ এখানে প্রচুর। কাগজের কারখানার ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্রখোলা এবং রাঙ্গামাটী অঞ্চলে কোন কলকারখানা নাই। মাটী, টিন ও লোহার বাসনপত্র অন্য স্থান হইতে এখানে আমদানি করা হয়। এই জাতীয় শিল্প এই দুই স্থানে বেশ ভালভাবে চালান যায়।

জেলার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ছোট ছোট অনেক বয়ন কারখানা খুলিবার অবসর আছে।

২। ময়মনসিংহ

বস্ত্র-বয়ন ব্যাপারে ময়মনসিংহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মোটা, মাঝারি এবং সরু কাপড় এ জেলায় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং বাঙ্গালার নানাস্থানে বিক্রয় হয়। টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ মহকুমায় দুইটী বাজিতপুর আছে। এই দুইটি স্থানই বস্ত্র-বয়নের প্রধান আড্ডা। ১০ নম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫০।৩০০ নম্বরের সূতা ব্যবহৃত হয়। বহু ঠকঠকি তাঁত প্রচলিত হইতেছে এবং বয়ন-কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পূর্ব্বে জগৎবিখ্যাত ঢাকা মস্‌লিন এবং "আব-ই-রোয়ান" তৈয়ারি হইত। এখন এই শিল্প মরিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে।

গারো পাহাড়ে তুলা জন্মে। সেই তুলার সূতা কাটিয়া নেত্রকোণার গারোগণ তাহাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য পাঁচ হাত লম্বা দুই হাত চওড়া কাপড় বোনে।

নেত্রকোণা ও জামালপুর মহকুমায় কিছু কিছু এণ্ডি উৎপাদন এবং বয়ন করা হয়। আসামের এণ্ডি অপেক্ষা এখানকার এণ্ডি নিকৃষ্ট।

জেলার নানাস্থানে কাপালিরা পাট ও শণের দড়া-দড়ি তৈয়ারি করে এবং চট বোনে।

কিশোরগঞ্জ মহকুমায় হাছু নদীর তীরে পনীর তৈয়ারি হয়; প্রস্তুতকারক ঢাকার লোক; স্থানীয় লোকে প্রস্তুত করিতে জানে না।

এই মহকুমায় খুব ভাল কাঠের কাজ হয়, নানাবিধ সুন্দর দ্রব্য এমন কি চশমার খাপ পর্য্যন্ত তৈয়ারি হয়।

ইসলামপুরের কাঁসার কাজ প্রসিদ্ধ, কাগমারিরও নাম আছে। বহু লক্ষ টাকার মাল অন্যত্র চালান যায়।

বেথনা নদীর ধারে ধারে বালিয়াড়ি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় বহুলীদের নিকট বিক্রয় করে। এই সকল মুক্তা কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়।

এ জেলায় প্রচুর আক জন্মে এবং তাহা হইতে গুড়, চিনি তৈয়ারি হয়। বস্তার মধ্যে গুড় পুরিয়া দুইটি বাঁশ দিয়া চাপিয়া চিনি করা হয়। এ চিনির রং হয় লাল আর আকের রসের গন্ধও ইহাতে থাকে; আট টাকা মণ, দরে স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রয় হয়।

পাঁচটি মেশলাইয়ের কল আছে। তার মধ্যে একটিতে কেবল কাঠী তৈয়ারি হয়।

৩। ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলায় বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের অবস্থা মন্দ নহে। বয়নকারিগণ মহাজনের কবলগত নহে। মোটা কাপড়, নানাপ্রকারের ছিট, মশারির থান, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। মিহি কাজ এ জেলায় হয় না। কুষ্টিয়া-খালির বাজার হইতে সূতা কেনা হয়। প্রায় ৪০টি গ্রাম বস্ত্র-বয়নের প্রধান কেন্দ্র। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিলাসখাঁ, মধ্যপাড়া, গদানগর ও মাধারিপুরে কয়েকটি ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। মাধারীপুরের কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্যগুলির অবস্থাও খারাপ। মধ্যপাড়ার কারখানায় এখন এণ্ডি, মুগা ও মিশ্রিত সূতা বয়ন হইতেছে।

ফরিদপুর শহরের কলের মোজা লোকে খুব কেনে। এ জেলায় গুড় ও চিনি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হয়। চিনি তৈয়ারির প্রথা পুরাতন। এক প্রকার দেওলা দ্বারা চিনি পরিষ্কার করা হয়।

অতি সাধারণ রকম শাঁখার কাজ সামান্য কিছু হয়। পাটিয়ালগণ শীতল পাটি তৈয়ারি করে। শ্রীহট্টের পাটি অপেক্ষা এই পাটি নিকৃষ্ট হইলেও ইহার বেশ চাহিদা আছে। এ জেলায় উল্লেখযোগ্য আর কোন শিল্প নাই।

৪। পাবনা

রাজসাহী বিভাগে পাবনা জেলাই বস্ত্র-বয়নে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। ভাল কাপড়ের জন্য বাজারে সর্ব্বত্র পাবনা জেলার নাম আছে। এই জেলায় সর্ব্বত্র বস্ত্রবয়ন হইয়া থাকে। অন্যূন ১০০টি গ্রামে ব্যাপকভাবে তাঁত চলে; তার মধ্যে ২৫টি গ্রামে একশতের অধিক তাঁতে কাজ হয়। তিন শত হইতে ছয়শত তাঁত চলে এমন গ্রামও অনেকগুলি আছে। একমাত্র হালুয়া গ্রামেই তাঁতের সংখ্যা ১৭০০; এই গ্রামটি সিরাজগঞ্জ মহকুমায়।

মোটের উপর এই জেলায় দশ হাজারের উপরে তাঁত চলে, তার মধ্যে ৩০০০ ঠক্‌ঠকি তাঁত। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সূতায় প্রায় আশী লক্ষ টাকার মাল প্রতি বৎসর তৈয়ারী হয়। স্বদেশীর ফলে এ জেলায় বস্ত্র-বয়নে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু সূক্ষ্ম সূতার কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। তাঁতীদের অপেক্ষা বয়নকারীদের অবস্থা ভাল। সামাজিক মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য অনেক মুসলমান জোলা তাঁত ছাড়িয়া হাল ধরে; এটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর মনোভাব বলিতে হইবে।

কাপালিক নামক এক জাতি পাটের দড়ি ও চট বোনে। পাবনা সহরে ৯টি, ও সহর হইতে তিন মাইল দূরে হিমাইতপুরে একটী, মোট ১০টি মোজা গেঞ্জির কল চলে। এই সকল কলে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ গুজন মাল তৈয়ারি হয়।

প্রায় ৬০০ জালিয়া কৈবর্ত্তগণের সূতা কাটিয়া নৌকায় জাল তৈয়ারি করে, আর তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অবসর সময়ে জাল বোনে।

কুম্ভকারেরা মৃৎপাত্র, খেলনা এবং প্রতিমা গড়ে। বর্ষাকালে মৃৎপাত্র ও খেলনা নৌকায় করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করে এবং মূল্যস্বরূপ ধান্য লইয়া বেশ লাভ করে।

জেলার সর্ব্বত্র বেতুয়ারা বেতের ঝাঁপা ঝাঁপা গড়িয়া থাকে।

কালিয়া হরিপুর রেল ষ্টেশনের নিকট প্রায় ১০০ লোক শীতলপাটি তৈয়ারী করে; কিন্তু এই ব্যবসাটি ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কাঁদাপাড়া গ্রামের প্রায় ২৫ ঘর মুসলমান কাগজ তৈয়ারি করে। তাহাদিগকে 'কাগজী' বলে। প্রতি দিস্তার দাম ১৪ আনা। মাড়োয়ারিগণ হিসাবের খাতার জন্য এই কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ
(শ্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

বাবুর হাট—মাধবদি

মাধবদিতে একটি বড়বাজার আছে। এখানে প্রতি সোমবার এক প্রকাণ্ড হাট বসিয়া থাকে। এই অঞ্চলে এত বড় হাট আর নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে এখানে বহু লোকজন সওদা করিতে আসে। নানাবিধ তাঁতের ধুতি, শাড়ী, গামছা, ছিট, খান প্রভৃতি এখানে প্রচুর আমদানি ও বিক্রী হয়। কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বঙ্গদেশের অনেক বড় বড় সহরের পাইকারগণ কাপড় কিনিতে এখানে আসে। প্রতি হাটে এখানে ৪০।৫০ হাজার টাকার কাপড় বিক্রী হয় বলিয়া অনুমিত হয়। এই হাটটকে বাবুরহাট বলে। মাধবদির জমিদার পরলোকগত সতীপ্রসন্ন গুপ্তের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত এই হাটের মালিক। একণে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশী কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়াতে এই হাটের আরও বেশী উন্নতি হইয়াছে। এই হাটে এত অধিক পরিমাণ কাপড় বিক্রী হওয়াতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের গৃহস্থেরা কাপড় প্রস্তুত করিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতেছে। বাস্তবিক বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হওয়াতে এই অঞ্চলের লোকেরা বেশ সচ্ছল হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষ বাড়ীর ছেলে মেয়ে সকলে মিলিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। কেহে শস্যাদির কাজ করিয়াও তাহারা যে সময় পায় তাহাতে কাপড় বুনিয়া থাকে। এই সকল গ্রামে দিবারাত্রি তাঁতের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের লোক এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকে না; সর্ব্বদাই তাহারা তাঁতের কাজে ব্যাপৃত থাকে। এইজন্য মাধবদিকে বঙ্গদেশের ম্যাঞ্চেষ্টার বলা যায়। কাপড়ের দামও এখন খুব সস্তা। একখানা ৯গজ×৪৪ ইঞ্চি ধুতি আজকাল ৵০—৸৯ আনায় পাওয়া

যায়। ৮ হাত × ৪৪ ইঞ্চি ধুতি একখানা ৸৹—৵৹ আনায় পাওয়া যায়। অন্যান্য কাপড়ও সেই অনুপাতে সুলভ। ছিটের থান দুই আনা গজ দরে বিক্রী হয়। বলা বাহুল্য এই সকল কাপড়ই নকল খদ্দর নামে পরিচিত। মিলের মোটা সুতা দ্বারা এগুলি তৈরী হয় বলিয়া লোকে ইহাকে খদ্দর বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বে বিলাতী মিলের সুতা খুব চলিত এখনে দেশী সুতাই তাঁতীরা ব্যবহার করে। কারণ বিলাতী সুতা বেশী পাওয়া যায় না। হাটের উন্নতির জন্য মালিকগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু মাধবদিতে যাতায়াতের ভাল রাস্তা না থাকায় ব্যবসায়িগণের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এ বি রেলওয়ের জিনাদি ষ্টেশন হইতে মাধবদি ৫ মাইল। যদিও পাঁচ দোনা পর্য্যন্ত মিলা বোর্ডের রাস্তা আছে, সে রাস্তার অবস্থাও ভাল নয়। জিনাদি বা নরসিংদি হইতে মাধবদি পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে লাইন্ হইলে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা হইতে পারে। নদী-পথেও এখানে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা। ভৈরব লাইনের ভাজার চর ষ্টেশন এখান হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে। সেখানে যাইবার ভাল রাস্তা নাই। মালপত্র সাধারণতঃ কুলীর মাথায় নিতে হয়।

(পল্লীবন্ধু—নারায়ণগঞ্জ)

পাবনায় বাসাভাড়া

লোকের আর্থিক অবস্থা যে পরিমাণে খারাপ হইয়া আসিতেছে পাবনা সহরে বাটীসমূহের ভাড়া সেই অনুপাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে এই ভাড়ার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু ভাড়াটিয়াদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, নিরপেক্ষ দর্শকদের চোখেও নিতান্ত বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুত আশুতোষ ভৌমিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই বিষয়টীর আলোচনার জন্য একটী জনসভা হইয়া গিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে এরূপ ভাড়া-বৃদ্ধি যে নিতান্ত অসঙ্গত, সভাতে প্রত্যেকেই একথা স্বীকার করেন। একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল। বাটীর মালিক-গণ বিবেচনাপূর্ব্বক যাহাতে ভাড়া কমান এ জন্য অনুরোধ করিয়া কমিটী প্রত্যেককে চিঠি দিয়াছেন। গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে কমিটীর একটী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য মালিকগণকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ৪জন ব্যতীত অন্য কোন মালিকই এই সভাতে উপস্থিত হন নাই। (সুরাজ—পাবনা)

বাংলার কথা—তথ্য-সঙ্কলন

রাজসাহী

রাজসাহী জেলার পরিমাণ ফল ১৮,১৫,৪২০ একর।

সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৪,৪৮৫।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৯,০০,৮০০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ১ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৮·০৪ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ২,৭১,৭২২।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৩,৬৯,২৩৩।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৭৮,৬২৩।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৮০,১৬,৪৬০ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৬১,২১,৩৫২ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	১৪,২১,৮৮৫
১৮৮১	১৪,৪৯,০৩৩
১৮৯১	১৪,৬৯,৬৩৪
১৯০১	১৪,৯০,৫৮৪
১৯১১	১৪,৮০,৪৮৭
১৯২১	১৪,৮৯,৬৭৫

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৩,১৮,৩৮৫ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১১,৪০,২৫৬। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ৪৬০।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

	শতকরা
মোট হিন্দুর	১১·৬

মোট মুসলমানের	৩·৭
হিন্দু পুরুষের	১৯·১
„ মুসলমান „	৭·১
„ হিন্দু মেয়ের	৩·৩
„ মুসলমান „	·২

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,২৫৭। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৪২,৯৯৪। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স-সম্পন্ন (৬-১৫ বৎসরের) বালক-বালিকার সংখ্যা ৪,০৭,৩১৫। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬-১৫ বৎসরের) ১৯২৫ সনে ৪০,১৬০।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৬৭,১৫৫।

স্বাস্থ্য

হাজার করা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৪·৯।

হাজার করা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৬·৯ এবং মুসলমানের মধ্যে ২১·৯।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫	৩৯,৮৩৭
	১৯২২	৩৯,২৯১
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫	৫,২২১
	১৯২২	২,৪০৭
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫	২৩৭
	১৯২২	৬৬

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু

স্ত্রী „

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	৮৮৯
কুষ্ঠরোগী	১১৫
অন্ধ	১,০৩১
হিন্দু বিধবা	৪০,১৮৯
মুসলমান বিধবা	৯৮,২৫৩

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমির রাজস্ব	১০,১৯,৪৯১৲
ষ্ট্যাম্প্	৪,৫৩,৭৫৩৲
আবকর	৬৬,২৬২৲
আবগারী	২,৪১,১৪৫৲
আফিং	২৯,৬৮০৲
বিবিধ	৬৪,৮১৬৲
পথকর ও পাবলিক সেস্	২,৮৫,৮২১৲
মোট	২১,৬০,৯৪৮৲

পাবনা

পাবনা জেলার পরিমাণ ফল ১১,৮৪,৬৪০ একর।

সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ২,৫৩৭।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৮,৩৫,১০০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ৯ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৯·৬৭ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ২,১৭,২৬৬।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,৫০,১৩৭।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৪৭,৫৯৩।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭১,৫২,০০০ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৯,৩২,৩৬৪ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৮১	১৩,১১,৬৪৯
১৮৯১	১৩,৬১,২২৩
১৯০১	১৪,২১,৩২৪
১৯১১	১৪,২৮,৫৮১
১৯২১	১৩,৮৯,৪৯৪

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৩,৩৪,৩০২ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১০,৫৩,৫৭১। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৮২৮।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

	শতকরা
মোট হিন্দুর	১৫'৬
„ মুসলমানের	৩'৬
হিন্দু পুরুষের	২৮'৯
মুসলমান „	৬'৪
হিন্দু মেয়ের	৪'২
মুসলমান „	·৩

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৫১৭। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৫৩,১১৩। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬-১৫ বৎসরের) বালক-বালিকার সংখ্যা ৩,৭৯,১৮৫।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬-১৫ বৎসরের) ৫০,০১৫। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,২৯,১৭০।

স্বাস্থ্য

হাজার করা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৭'২।

হাজার করা মৃত্যুর হার (১৯২৩ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৭'৫ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৯'২।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫	৩৫,৬৭০
	১৯২২	২৩,৭০০
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫	৬,৭১০
	১৯২২	২১৮
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫	৬৭৮
	১৯২২	৩

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু

স্ত্রী

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	১,২২৪
কুষ্ঠরোগী	১৯২
অন্ধ	১,১৮৩
হিন্দু বিধবা	৪৮,৭২৫
মুসলমান বিধবা	৮৯,৮৮১

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	৪,০৩,১৬২৲
ষ্ট্যাম্প্	৫,২৭,৬৬৭৲
আয়কর	১,০০,২৩২৲
আবগারী	২,০০,৬০৬৲
আফিং	২৪,১৩০৲
বিবিধ	১৫,৯৩০৲
পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস্	১,০৭,৮২৫৲
মোট	১৪,০৯,৬০৫৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের আর্থিক অবস্থা কত খারাপ হইয়াছে তা নির্ণয় করিবার একটি উপায় হইতেছে দুই বৎসরের আমদানি রপ্তানির তুলনা করা। নীচের তালিকায় একটা খতিয়ান করা যাইতেছে।

১। এপ্রিল হইতে মার্চ্চ অবধি বার মাস

	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	বৃদ্ধি বা হ্রাস	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাঃ	%
রপ্তানি	৩১০৮০	২৪০৪৬	—৯০৩৪	—২৯·১
পুনঃ রপ্তানি	৭·১০	৫·১৪	—১·৯৯	—২৭·৯
মোট রপ্তানি	৩১৭.৯০	২২৪·৬০	—৯২·৩০	—২৯·০
আমদানি	২৪০৮০	১৬৪·৮০	—৭৫·৯৭	—৩১·৫
আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী	—	—		

১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় এ বৎসর মোট রপ্তানিতে ৯২ কোটির উপর ও আমদানিতে প্রায় ৭৬ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা বিদেশে ৯০।৯২ কোটি টাকার কম মাল বেচিতে সমর্থ হইয়াছি, আর ভারতের বাজারে বিদেশীরা প্রায় ৭৬ কোটি টাকার মাল বেচিতে পারে নাই। কাহার উৎপাদনের ও মৌজুতের পরিমাণ কিরূপ ছিল তার বিচার না করিয়াও মোটামুটি বলা চলে, ভারতীয় বাণিজ্যের দরুণ দুনিয়া গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ১৬৫ কোটি টাকার উপর হারাইয়াছে। এই ১৬৫ কোটি টাকা এক লোকের হাত হইতে অন্য লোকের হাতে চলাচল করিবার অবসর না পাওয়ায় লোকের ক্রয়-ক্ষমতা অনেক কমিয়াছে। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা পণ্যের বাজারে এ বৎসর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের অনেক কম উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

এই গেল শুধু পণ্য আমদানি রপ্তানির খতিয়ান। এখন একবার বাণিজ্য তৌল করিয়া দেখা যাক্।

	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
ভারতীয় পণ্য রপ্তানি (বেসরকারী)	+৩৩০·১৩	+৩১০৮০	+২২০·৪৬
বিদেশী পণ্য পুনঃ রপ্তানি	+ ৭·৮৩	+ ৭·১০	+ ৫·১৪
বিদেশী পণ্য আমদানি	—২৪১·৪৯[১]	—২৩৮·২৪[১]	—১৬৮·৬২[১]
পণ্য বাণিজ্যের ছের	+৮৯·৪৭	+৭৮·৯৮	+৫১·৯৮

১ রেলওয়ে দ্রব্যের মূল্য বাদ (যথাক্রমে ১৮২ কোটি, ১৮৫ কোটি ও ১২১ কোটি টাকা।

সোনা (বেসরকারী)	—২১·২০	—১৪·২২	—১২·৭৫
রূপা	—১৩·০৪	—১১·৮৯	—১১·৫৪
সিক্কা নোট	— ·১২	— ·০৯	— ·০৩
সোনারূপার জের (বেসরকারী)	—৩৪·৫৬	—২৬·২০	—২৫·৪৩
মোট দৃশ্য বাণিজ্যিক জের	+৪২·১১	+৪২·৬৮	+৩৭·৪৫
কাউন্সিল বিল, ষ্টার্লিং ক্রয় ও যুক্তরাজ্যে সরকারের প্রেরণ বাবদ্			
ভারতে বিক্রীত লণ্ডনের উপর ষ্টার্লিং হস্তান্তর			
সরকারী জামিনপত্রের হস্তান্তর			
ভারত সরকারের জামিনপত্র সম্পর্কে			
ভারতের উপর সুদপত্র	— ·০৬	— ·০৩	— ·০১
মূল প্রেরণের জের	—৪১·৩৯	২১·০১	+ ·০৮

২। এপ্রিল হইতে জুলাই

১৯৩০-৩১ সনের আমদানি রপ্তানির তুলনা পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে। এখন এ বৎসরের গত ৪ মাসের হিসাব দেখা যাক্।

	১৯৩০	১৯৩১	হ্রাস বা বৃদ্ধি		১৯৩০	১৯৩১	হ্রাস বা বৃদ্ধি	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%				
মোট রপ্তানি	৮৮·০৯	৫২·৬৯	—৩৫·৪০	—৪০.২				
আমদানি	৬০·৪৯	৪৬·৮১	—১৩·৬৮	—২৬·				
রপ্তানি	৮৬·১৯	৫১·১০	—৩৫·০৯	—৪০·৭	আমদানির চেয়ে			
পুনঃ রপ্তানি	১·৯০	১·৪৯	— ·৩১	—১৮·০	রপ্তানি বেশী	২৪·৬০	—	—

এই চারি মাসের বাণিজ্য চৌল দাঁড়ায় :—

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
ভারতীয় পণ্য রপ্তানি (বেসরকারী)	+১০৪·২০	+৮৬·১৯	+৫১·১০
বিদেশী পণ্য পুনঃ রপ্তানি	+ ২·৮২	+ ১·৯০	+ ১·৪৯
বিদেশী পণ্য আমদানি	— ৮০·৮৮	—৬৩·০০	—৪৬·৫১
পণ্য বাণিজ্যের জের	+২৫·৯৪	+২৫·০৯	+ ৬·১৮
সোনা	৫·৬৬	— ৬৮৪	— ·৩৫
রূপা	৩·২২	— ৪·২১	— ১·২৬
সিক্কা নোট	— ·০৩	— ·০৭	— ·০১
সোনারূপার জের	— ৯·৬১	— ১১৮৩	— ·২২
মোট দৃশ্য বাণিজ্যিক জের ,,	+ ১৬·৩৩	+১৫·২৬	+ ৫·২৬
কাউন্সিল বিল, ষ্টার্লিং ক্রয় ও যুক্তরাজ্যে সরকারের প্রেরণ বাবদ্ ,,			

ভারতের বিক্রীত সওদার উপর			
ষ্টার্লিং হুণ্ডীর উপর			
সরকারী জামিনপত্রের হুণ্ডীর			
ভারত সরকারের জামিনপত্র সম্পর্কে ভারতের উপর সুদপত্র	— ·১১	— ·১১	— ·১০
সপ্ত স্নেহদের ভেদ	— ·৬৮	— ৩·৪২	+ ৪·১২

দেখা যাইতেছে, গত ৪ মাসে অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। বাকী ৮ মাসে অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক্ আরো বেশী খারাপ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি খারাপ নাও হয় এবং এই চারি মাসের হিসাবকে গড় ধরা যায়, তবে এই বৎসরের শেষে রপ্তানি কিঞ্চিদধিক ১৫০ কোটি টাকা ও আমদানি ১৪০ কোটি টাকা হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সনে এক রপ্তানি বত ছিল, ১৯৩১-৩২ সনে আমদানি রপ্তানি যোগ করিয়া তত হইবে না। জিনিষ-পত্রের দর অনেক হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া শুধু মূল্যের দিক হইতে এই তুলনা যথেষ্ট না হইলেও ইহা যে ভারতীয় বাণিজ্যের অতিশয় অবনতির দ্যোতক তাহে সন্দেহ নাই। ১৯২৯ সনের ৪ মাসের তুলনায় ১৯৩১ সনের ৪ মাসে রপ্তানি অর্দ্ধেকেরও কম। আর আমদানি ৪৩% মাত্র। ১৯৩১ সনের ৪ মাসে বাণিজ্যিক পণ্যের ভেদ কত কম তাও প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইতে একটা কথা এই বলা যায় যে, আমাদের আমদানি যে পরিমাণ কমিয়াছে (কারণ যাহাই হোক্), রপ্তানি তার চেয়েও ঢের বেশী কমিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌গণের এই কথাটা তলাইয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

তুলা সন্দেশ

১৯৩০-৩১ সনের তুলার ফসলের শেষ পূর্ব্বাভাস বাহির হইয়াছে। অতিরিক্ত অনুমানও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য-তালিকাগুলি সংগ্রহ করা গেল।

বোম্বাই।—এ বৎসর তুলা ফসলের মোট আয়তন ৬০,৪২,০০০ একর (দেশী রাজ্যসমূহে ২২,১৬,০০০ একর)। আর মোট ফলন ১১,৮৯,০০০ বেল (দেশী রাজ্যে ৪,৪৯,০০০ বেল)। গত বৎসরের তুলনায় আয়তন ১১% ও ফলন ৯% কম। বিভিন্ন প্রকার তুলার হিসাব এই:

	একর	বেল
উমরা—		
খান্দেশ		
বরী ও নগর		
গোলরা		
বাগলা-সিন্ধু—		
সিন্ধু-পাঞ্জাব	২,১৬,০০০	
আমেরিকান্ (সিন্ধু)	৬৫,০০০	
ব্রোচ্	৪,৭৪,০০০	
কুম্‌রা ধারওয়ার	১৩,৪৪,০০০	
পশ্চিমা ও উত্তরা	২,৫২,০০০	৩২,০০০

মাদ্রাজ।—এ বৎসরের আয়তন ২১,১৭,০০০ একর (গত বৎসরের তুলনায় ১৬% কম), ফলন ৩,১৭,০০০ বেল (গত বৎসর ছিল ৪,১৩,০০০ বেল, সুতরাং এ বছর ১৯% কম)। হিসাব এই:

	একর	বেল
ভিজেবেল্লি	৫,১৭,০০০	১,৩৩,০০০
সালেম	১,৮৮,০০০	৩৩,০০০
কাম্বোডিয়া	২,৯৪,০০০	১,১১,০০০
পশ্চিমা ও উত্তরা	৯,৪০,০০০	১,১০,০০০
কোকনদা	১,৯০,০০০	২৮,০০০
অন্যান্য	১৮,০০০	২,০০০

হায়দ্রাবাদ।—অনুমিত মোট আয়তন ৩৫,২১,০০০ একর (গত বৎসর ছিল ৩৫,৩৮,০০০ একর), মোট ফলন ৩,৮২,০০০ বেল (গত বৎসরের তুলনায় ১৪% কম)। হিসাব এই:

	রেল	হায়দ্রাবাদ-গাওরনি	৯,৭১,০০০	১,১৪,০০০
উমৃগা—		পশ্চিমা ও উত্তরা	৩,৬১,০০০	২১,০০০
বর্মী ও নগর	২,৪৩,০০০	কোকনদা	৩৬,০০০	৪,০০০

ভারতীয় তুলার শেষ পূর্ব্বাভাস

	১৯৩০-৩১ (অনুমান)		১৯২৯-৩০		১৯২৮-২৯	
	আয়তন হাজার একর	ফলন হাজার বেল	আয়তন হাজার একর	ফলন হাজার বেল	আয়তন হাজার একর	ফলন হাজার বেল
বোম্বাই	৬০,৪২	১১,৮৯	৭২,৯৪	১৩,০৮	৮০,৪৬	১৪,৪৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৪৭,৮৭	১০,৬২	৫১,৭৫	১১,৪৩	৫০,৭৮	১০,৩৪
পাঞ্জাব	২৪,৯১	৭,৮৮	২৫,৮৬	৭,৯৯	২৮,৪৪	৬,১৯
মাদ্রাজ	২১,১৭	৪,১৭	২৫,০৭	৫,১০	২৪,৯৫	৫,২৮
যুক্ত প্রদেশ	৮,৪৩	৩,২১	৯,২৯	২,৮৯	৭,১৫	২,৫৬
ব্রহ্ম দেশ	৩,১৮	৮৭	৩,৫৫	৯৭	৩,১৮	৫৮
বাঙ্গালা	৭৭	১৯	৭৮	২১	৭৯	১৮
বিহার উড়িষ্যা	৬৯	১৪	৬৯	১৩	৭৮	১৪
আসাম	৪১	১৫	৪১	১৫	৪৪	১৭
আজমীঢ় মাড়বাড়	৩১	১১	৩৪	১১	৪৪	২১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৩	৩	১৭	৪	১৭	৪
দিল্লী	৪	১	৩	১	২	১
হায়দ্রাবাদ	৩,৫,২৭	৩,৮২	৫৫,৩৮	৪,৪৭	৪০,১৯	৮,৯৪
মধ্য ভারত	১২,৮৪	২,০৫	১৩,৮৮	২,০২	১২,৮৭	২,৫২
বড়োদা	৭,৩১	১,৪০	৭,৭১	১,২৭	৭,৯০	৬৯
গোয়ালিয়র	৬,১৯	১,০৪	৬,৩৩	৮৯	৬,৪৫	১,০৭
রাজপুতানা	৫,১০	৭৩	৫,০৭	৬৭	৪,৭১	১,২০
মহীশূর	৭২	১০	৬৯	৯	৭৬	২০
মোট	২,৫৩,১৬	৪৮,২০	২,৫৯,২২	৫১,২৫	২,৭০,৫৩	৫৭,৮২

কাঁচা তুলা ব্যবহারের কর্দ্দ

৩১শে আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে

	১৯৩০ হাজার বেল (১ বেল = ৪০০ পা)	১৯২৯ হাজার বেল (১ বেল = ৪০০ পা)
স্থানি—		
যুক্তরাজ্য		
ইয়োরোপ (যুক্তরাজ্য বাদ)	১,৫০৫	১,৪২৯
চীন	৫৫৫	৪৫৬
জাপান	১,৪০৯	১,৭২২
অন্যান্য দেশ	১১৩	৯৩
মোট	৩,৮৬৮	৩,৯৩৩
দেশে খাদন—		
মিল		

স্থানীয় বা প্রাইভেট			কলদের নিষ্ক্রিয়তা	৩,১৯১
বাইরে	৭৪০	৭৪০	অনুমিত পূর্ব্বাভাস	৫,১১৫
			বেশী (+)	
	৩,১২৩	২,৭৪২	বা কম (−)	+ ১,৮৬৮

কাঁচা তুলা রপ্তানি (হাজার বেল)

(১)

(১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে আগষ্ট অবধি)

	১৯২৯-৩০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৫-৩৬
যুক্তরাজ্য	২৮৬	২৩৩	২১৫	৮৫	১৪৩
ইয়োরোপ	১,৫০৫	১,৪২৯	১,২৭৭	৮৩১	১,০৫৫
চীন	৫৫৫	৪৫৬	২৬৪	২৪৩	৫২১
জাপান	১,৪০৯	১,৭২২	১,৩২৬	১,৫৮২	১,৯৯৫
অন্যান্য দেশ	১১৩	৯৩	৫৮	৭৯	৭১
মোট	৩,৮৮৮	৩,৯৩৩	৩,১৪০	২,৮৩০	৩,৭১৫

(২)

(১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩১

	১৯৩০-৩১
যুক্তরাজ্য	১৭১
ইয়োরোপ	৬২৬
চীন	৩৫১	৩০১
জাপান	১,২১৭	৯৪০
অন্যান্য দেশ	৩২	৬৫
	২,৪০৫	২,১৪৭

দেশী মিলে কত তুলা যায় (হাজার বেল)

(১লা সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)

	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯
বোম্বাই প্রদেশ	৫৭৩,৫৯৪	৭০০,৯০৪	৫২১,৭১২
মাদ্রাজ „	১০৫,৯০৫	১০৫,২২৮	৯৭,১৯৫
যুক্ত প্রদেশ	১২০,৭০৯	১১৫,৫০২	৯০,১৫৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫৯,৯১৩	৬২,৫৬১	৫৯,২৪৪
বাঙ্গালা	৪৫,৪৮০	৪৯,৪০৭	৪০,৪২৯
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৩৭,৫৫৯	৩৪,৬৪২	২৬,২৮২
বাকী বৃটিশ ভারত	১০,০৪৬	১১,৮৮৪	১০,৬৫৬
হায়দ্রাবাদ	১০,৯৮৫	১০,৩৭৬	৯,২৯৩
মহীশূর	২১,৩৭৯	২২,৫৭১	২১,৪১৭
বড়োদা	৩১,৭৬৯	২৮,৪০৫	২৩,২৪৩
গোয়ালিয়র	২১,৮৯১	২১,০১৯	১৭,৯০৩
ইন্দোর	৪৩,৭২৮	৪০,৭৭৯	৩৭,৭২০
অন্যান্য দেশী রাজ্য	৩৪,৮১৬	৩১,০৭২	২৭,৭৭৫

সরিষা ও মসিনার ফসল

১৯৩০-৩১ সনের সরিষা ও মসিনার ফসলের শেষ পূর্ব্বাভাস বাহির হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, এ বৎসর মোট ৬৫·১৩ লক্ষ একরে সরিষা (তন্মধ্যে বিশুদ্ধ ৩১·৮৩ লক্ষ ও মিশ্রিত ৩২·৩০ লক্ষ একরে); ও মোট ৩·২০ লক্ষ একরে মসিনা, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ ২৩·৭৬ লক্ষ ও মিশ্রিত ৬·৪৪ লক্ষ একরে) জন্মিয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে সরিষার এই পরিমাণ যথাক্রমে ৫২·০৭ লক্ষ ও ২৮·০২ লক্ষ একর। আর তার আগের পাঁচ বৎসরের গড় ৬০·৯৩ লক্ষ ও ৩৩·৯২ লক্ষ একর। মসিনার ছিল ২৮·০২ লক্ষ ও ৩৩·৯২ লক্ষ একর। ১৯৩০-৩১ সনে সরিষার ফলন ৯·৭৭ লক্ষ টন (বিশুদ্ধ ৫·৫৪ লক্ষ ও মিশ্রিত ৪·২৩ লক্ষ), ও মসিনার ফলন ৩·৭৮ লক্ষ টন (বিশুদ্ধ ২·৭৪ লক্ষ ও মিশ্রিত ১·০৪ লক্ষ)। পূর্ব্ব বৎসরের ফলন সরিষার ১০·২৫ লক্ষ ও মসিনার ৩৮ লক্ষ টন ছিল। পূর্ব্বেকার পাঁচ বৎসরের গড় ৯·৩৭ লক্ষ ও ৩·২৫ লক্ষ টন।

একমাত্র যুক্তপ্রদেশে মিশ্রিত সরিষা ও মসিনা উৎপন্ন হয়। মিশ্রিত ও বিশুদ্ধ ধরিয়া এই দুই ফসলেই যুক্তপ্রদেশের স্থান সর্ব্বোচ্চ। সরিষার প্রধান ক্ষেত্র ক্রমানুসারে পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা, আসাম, বোম্বাই; কিন্তু বিশুদ্ধ সরিষা ধরিলে বোম্বাইয়ের নীচে যুক্তপ্রদেশের স্থান। ১৯৩০-৩১ সনে ঐ সব দেশের শস্য-ক্ষেত্রের আয়তন ৯·১৮ লক্ষ, ৭·৬৯ লক্ষ, ৬·৫৭ লক্ষ, ২·৯০ লক্ষ, ২·০৫ লক্ষ একর; আর ফলনের পরিমাণ ১·৪৬ লক্ষ, ১·৩৯ লক্ষ, ১·৪৭ লক্ষ, ৫০ হাজার, ২৬ হাজার টন। মসিনার প্রধান ক্ষেত্র মধ্য প্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা, বোম্বাই, বাঙ্গালা। ঐ সব দেশের ক্ষেত্রের পরিমাণ ৮·০৬ লক্ষ, ৬·৫৪ লক্ষ, ১·২৫ লক্ষ ও ১·১৬ লক্ষ একর (বৃটিশ ভারতের বাহিরে হায়দ্রাবাদ ২·৫১ লক্ষ একর); আর ফলনের পরিমাণ ৭১ হাজার, ৯৪ হাজার, ১৩ হাজার, ১৯ হাজার (হায়দ্রাবাদে ১৬ হাজার) টন।

যুক্তরাজ্যের অবস্থা

	সরিষা		মসিনা	
	আয়তন একর	ফলন টন	আয়তন একর	ফলন টন
বিশুদ্ধ	২৩৬,০০০		৩১১,০০০	
মিশ্রিত	৩,২০০,০০০		৬৪৩,০০০	

বিশুদ্ধ সরিষার ক্ষেত্র হিসাবে পাঞ্জাব, বিহার উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা, আর বিশুদ্ধ মসিনার ক্ষেত্র হিসাবে বিহার উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশ প্রধান।

বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সরিষা ও মসিনা

(হাজার টন)

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
সরিষা—					
যুক্তরাজ্য	৯				
ফ্রান্স	১৪				
বেলজিয়াম	৫				
জার্ম্মাণি	১৫				
নেদারল্যাণ্ড	১১	৯			
ইতালি	৪০	২১			
জাপান		১			
অন্যান্য দেশ	২	১	১	১	১
মোট	৯৪	৬৮	৭৭	৪৪	৩৩
মসিনা—					
যুক্তরাজ্য					
অষ্ট্রেলিয়া					
ফ্রান্স					
জার্ম্মাণি					
নেদারল্যাণ্ড					

স্পেন	৫	৪	৭	৭	৯
ইতালি	২৯	৪১	২৮	২৮	৩৩
বেলজিয়াম	১৭	৬	২	১১	১৩
অন্যান্য দেশ	৬	১১	২৭	২১	৩৪
মোট	১৯২	২২৩	১৫৭	২৪৮	২৫৭

৬০ কোটি মণ ভারতীয় কয়লা (১৯৩০ সন)

আসাম, বেলুচিস্থান, বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইল কয়লার খনির স্থান। ইহার মধ্যে বিহার উড়িষ্যার স্থান সকলের উপর। মোট ২,২৬,৮৩, ৮৬১ টন কয়লার মধ্যে এক বিহার উড়িষ্যা হইতে ১,৩১, ১৫,০০৭ টন উঠে। এই প্রায় দেড় কোটি টনের মধ্যে আবার ১ কোটি ৬ লক্ষ টনের উপর কয়লা মানভূম জেলার ঝরিয়ার। ঝরিয়ার পরে হাজারিবাগ জেলার বোকারো কয়লার খনি ২১½ লাখ টনের উপর কয়লা যোগাইয়াছে। ইহা ছাড়া মানভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি, পালামৌ, সম্বলপুর, সাঁওতালপরগণা জেলায় বাকী কয়লা উঠিয়াছে রাণীগঞ্জ (কতকটা), গিরিডি, কয়লপুর, ডালটনগঞ্জ, রামপুর ও জয়ন্তী কয়লার খনি হইতে। ভারতের মোট ১৪টি খনির মধ্যে ৮টি (রাণীগঞ্জের কতকাংশ ধরিলে ৯টি) এই প্রদেশে অবস্থিত।

কয়লায় বাঙ্গালার স্থান দ্বিতীয়, ১৯৩০ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ৬৩,১৮,৫২৮ টন। একটি মাত্র কয়লার খনি-রাণীগঞ্জ—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, সাঁওতালপরগণা ও মানভূম জিলা ব্যাপিয়া বর্ত্তমান; কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে উৎপন্নের পরিমাণ ৬৩,০৮ ০৩০ টন।

বিহার উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশেই প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় কয়লার প্রায় সবখানি। অর্থাৎ ভারতীয় কয়লা বলিলে বুঝিতে হইবে বর্দ্ধমান ও মানভূমের কয়লা।

ইহার পর মধ্যপ্রদেশ ৯,৫২, ৩৭১ টন, আসাম ৩, ৫৮,০৩৫ টন, পাঞ্জাব ৫০,৬১৯ টন ও বেলুচিস্থান ১১,৩০৩ টন কয়লা যোগাইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দ্বারা জেলার পেঞ্চ ভ্যালি কয়লার খনির স্থান তৃতীয় হইলেও এখান হইতে মাত্র ৭,৪০,০৯১ টন কয়লা উঠিয়াছে। এই প্রদেশের অন্য খনির নাম বল্লারপুর, উহা চন্দা জেলায় অবস্থিত। আসামের দুইটি খনির মধ্যে—মাকুম ও নাজিরা—মাকুম বড়, ৩,০৭,৪১৪ টন কয়লা যোগাইয়াছে। পাঞ্জাবের সল্ট রেঞ্জ কয়লার খনি কোহাট, মিয়ানবালি ও শাহপুর নামক তিন জেলা ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও উৎপাদনের পরিমাণ কম। বেলুচিস্থানের কয়লার খনি কোয়েটা-পিশিন ও সিবি জেলায় অবস্থিত।

চিনামাটী

ত্রিপুরা, ভাগলপুর, সাঁওতালপরগণা, মধ্য-প্রদেশ, জয়পুর, দিল্লী, মহীশূর, গোয়ালিয়রে চিনামাটীর খনি বাহির হইয়াছে। উপরোক্ত স্থানের কয়েকটী খনি হইতে চিনা-মাটী খনন করিয়া ধুইয়া এবং শুকাইয়া বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে। কলকব্জার সাহায্যে ধৌত করা হয়। ফেল্‌স্পার নামক পাথর পচিয়া চিনামাটীর উৎপত্তি। ভারতবর্ষে প্রতি মাসে ইয়োরোপ হইতে ১৫০০ টন অর্থাৎ (৩০০০ মণ) চিনামাটী আমদানি হয় এবং প্রতি টন ৫০।৬০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। কাগজ কল রংকল এবং সাবান কলে বহু পরিমাণ চিনামাটী খরচ হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে চিনামাটীর খনি থাকা সত্ত্বেও বিদেশ হইতে বিক্রয়ার্থ আমদানি হয়। সামান্য টাকা মূলধন লইয়া এই কার্য্য করিয়া বহু অর্থ লাভ করা যায়।

ভাগলপুরে কয়েকটী চিনামাটীর খনি আছে। উহা বিদেশী মাটী অপেক্ষা বহুগুণে ভাল; তথাপি দেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু ধনী আছেন, তাঁহারা অল্পকালে চিনামাটীর খনির কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারেন এবং বহু বেকার লোকের অন্নসংস্থান করিতে পারেন। কতকগুলি খনি অর্থাভাবে অর্দ্ধেক কার্য্য করিয়া বন্ধ থাকায় বহু লোক বেকার অবস্থায় অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। ভারতবাসীর বেকার অবস্থা এইরূপ সামান্য কার্য্য আরম্ভ করিলেও অনেকটা দূর হইতে পারে। (ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

মধ্য প্রদেশের বন বিভাগ

১৯২৯-৩০ সনের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, উক্ত

দিকের জেলাগুলিতে কৃষির অবস্থা ভাল ছিল এবং সর্ব্বত্র লাকার ঘর পড়িয়া গিয়াছিল। তথাপি মূল আদায় ৪৪'৪২ লক্ষ হইতে ৫৯'১৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। এত বেশী আদায় আর কখনো হয় নাই। আর মূল খরচ ৪০'৪৩ লক্ষ হইতে ৩৯'৭৫ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। এ বৎসরের প্রকৃত উদ্বৃত্ত ২৬½ লক্ষ টাকা, গত বৎসর ছিল ১৬ লক্ষ টাকা। এই প্রকার ভাল ফলের কয়েকটি কারণ এই: উত্তর বিভাগে নব প্রবর্ত্তিত নীতি অনুযায়ী কাজ; রেলওয়ে ও গ্রান্ড ক্যানেল কাউন্সিলে (অবসরপ্রাপ্ত) 'দক্ষিণ বিভাগীয়' আয়াপিরি সেগুন কাঠের টান; বেয়ারে জ্বালানি ও কাঠ বিক্রয়; বনবিভাগের পরিবর্ত্তে মাঝে অনেক লোকের কাঠের কারবার।

যুক্তপ্রদেশে কৃষি-গবেষণা

১৯৩০ সনের ৩০ জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে যুক্ত প্রদেশে কৃষি-গবেষণার অবস্থা নিম্নরূপ:

আখ:—শাজাহানপুর কেন্দ্রে বৎসর ধরিয়া গবেষণার কাজ চালাইবার পর উন্নত ধরণের আখের আয়তন বিশেষভাবে বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছে। হারদই নামক জেলায় ১৯২০ সনের ৮০৮ একর জমি ১৯৩০ সনে ১২,৪৬৭ একরে পরিণত হইয়াছে। আখ-উৎপাদনকারী প্রধান ১৯টি জেলার আয়তন ১৯২৮-২৯ সনে ছিল ১,৪০,২১৬ একর; ১৯২৯-৩০ সনে উহা ২,৮১,১৩৪ একর দাঁড়ায়; এবং ১৯৩০-৩১ সনে ৪,৫৪,৪৮৪ একর দাঁড়াইয়াছে। চাষীরা নূতন উদ্ভাবনার সাহায্য গ্রহণ করে না যুক্তপ্রদেশে এ কথা অপ্রমাণিত হইতেছে। ১৯৩০-৩১ সনে উন্নত ধরণের ক্ষেত্রের মোট আয়তন ৫,১৪,৬৯১ একর। আর চাষীরা এইরূপ আখের চাষ করিয়া ৫'৬৭ কোটি টাকা অধিক পাইতেছে।

তুলা।—তুলা সম্বন্ধে গবেষণার ফলে উন্নত ধরণের ফসল এখনো পাওয়া সম্ভব হয় নাই। স্থির হইয়াছে যে; ভবিষ্যতে এই বিভাগ গবেষণা ও প্রচার-কার্য্যের জন্য আগ্রার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব্ কমার্সের সহিত একযোগে কাজ করিবে। কৃষি অফিস ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত স্থির করিয়াছেন যে, সেচিত ভূমিতে সি ৪০২ এর প্রসারের চেষ্টা করা হইবে, চাষী যেখানে স্থির করিবে সেখানে এ ১৯ প্রসার করিবে, ছয় প্রকার ভাল তুলার মধ্যে একটা বাছিয়া লওয়া হইবে। তুলা সম্পর্কে সমস্যা এই: (১) বর্ত্তমান ফসলের কি করিয়া উন্নতি করা যায়, (২) ২০ কাউন্ট সূতা বুননের জন্য উৎকৃষ্টতর ধরণের ফসলের চাষ, (৩) পাট দাম বর্ষের একপ্রকার পোকা তুলা ফসল নষ্ট করিতেছে, কি করিয়া ইহাদের উচ্ছেদ সাধন হয়। সি ৪০২ ভাল তুলা, ইহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ১৯২৯-৩০ সনে কানপুর ও সীতাপুর জেলা হইতে এই ধরণের ভিজা ও অপরিষ্কার ৯২৫ মণ তুলা ১০,২০০৲ টাকা খরচ করিয়া বিভাগ ক্রয় করিয়াছিল। তুলা হইতে সিল্ক ও বীজ বাহির করিয়া বেচাতে লাভ হইয়াছে ৩,১৪৫ টাকা; ইহা ছাড়া ১৫৪৲ মূল পরিশোধ হইয়াছে। ১৯৩০-৩১ সনে ২০০০ একরে সি ৪০২ বপন করা হইয়াছে, কানপুরের কোন কোন কলওয়ালা উহা কিনিতে রাজী হইয়াছে।

চাউল।—এই বৎসরে এ বিভাগ ১০০০৲ টাকায় ১৫৫৭ মণ উন্নত ধরণের চাউল কিনিয়া সিলিহিট্, বেরিলি, শাজাহানপুর, হারদই ও সীতাপুর জেলায় বিক্রী করিয়াছে। বিক্রয়ের প্রথা নগদ অথবা সেচ ও রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর সংযোগে তাকাবি প্রণালীতে।

বীজ বিতরণ।—১৯২৮-২৯ সনে ৫,৭২,৩৮৪ মণ ও এ বৎসর ৬,৩৮৮৭৪ মণ বীজ বিতরিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৪৯,০৫৩ মুক্তিকের প্রতীকারের জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে ভারতবাসী

আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদে অধিকসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইতেছে, একথা প্রমাণ করিবার জন্য বিলাতের "ব্লিউপোর্ট" যুক্ত প্রদেশের একটি হিসাব দিয়াছেন। ঐ প্রদেশে ৪৮টি জেলা আছে। নিম্নে তথাকার হিসাব প্রদত্ত হইল:—

	১৯২২		১৯৩১	
	বৃটিশ	ভারতীয়	বৃটিশ	ভারতীয়
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট	৪৩	৫	২৭	২১

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	৫৭	১	৩৫	১৩
সিভিল সার্জ্জন	৪২	৪	১৩	৩৫
জেলা জজ	২৩	১৩	১৭	৩১
জেলা ইঞ্জিনিয়ার	১১	৬	৭	২০
মোট	১৭৪	২৯	১০০	১২০

ত্রিবাঙ্কুরে শিল্প-গবেষণা এবং শিল্প-পরীক্ষাকার্য্য

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ১৯২৯-৩০ সনের শাসন বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল :—

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ লেবরেটরি

এই সরকারী গবেষণা-মন্দিরে সিমাইটুকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ব্বের মতই চলে ; ওয়াচ্‌সালা এবং উহার আশে পাশের অঞ্চল হইতে আটটী নমুনা লইয়া পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, এই চিজে গন্ধকের ভাগ এত বেশী যে উহা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা চলে না। ট্রাভাঙ্কোর সুগার্স লিমিটেডের অ্যাগারি সলিউশনের রিফাইন কার্য্যে কার্ব্বন-কিস ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহৃত কার্ব্বন তরল চিনির রং নষ্ট করিবার পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারও করা হয়। রিসার্চ্চ লেবরেটরির প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য্যের ফলস্বরূপ অ্যাগারি সলিউশনের রিফাইনকার্য্য কার্ব্বন দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে এই মত প্রচার করা হয়। রিফাইনের উপযোগী নানা প্রকার কার্ব্বন লইয়া পরীক্ষা করা হয় এবং ভবিষ্যতে কার্য্যে লাগাইবার জন্য তুলনামূলক ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট হইতে নারিকেলের খোলের কয়লা প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া যায় কিনা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, নারিকেলের খোল হইতে প্রায় ৩৫% কয়লা মিলে। কয়লা করিবার খরচ টন প্রতি ৩৮ টাকা করিয়া পড়ে। ত্রিবাঙ্কুর-জাত সিমাবন হইতে তৈল বাহির করিয়া দেখা যায় যে, এই তেল তুলো সিমাবনের তেলের মত। এক্‌সাইল্‌

৩ .

কমিশনার সাহেবের অনুরোধে তাঁদের হাড়ির ছেজাল ধরিবার জন্য দুইটী প্রণালী আবিষ্কার করা হইয়াছে। সাইনেসপ্রাপ্ত তাড়ি-বিক্রেতারা অনেক সময়ে তাড়ির সহিত ছেজাল মিশাইয়া থাকে, উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিংএর জন্য ২৭টী অর্ডার আসে ; এই ২৭টী অর্ডারই সাপ্লাই করা হইয়াছে। টেম্পারি ডিপার্টমেণ্ট হইতে ২৪টী কালির নমুনা এবং ৪০ প্রকার গুড়ার নমুনা আসে ; কালির গুড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া কতটুকু গুড়ার কয় ছোপাত কালি হইবে ইত্যাদি পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বেসরকারী ব্যক্তিদের অনুরোধে ৮২ রকমের জিনিষের নমুনা লইয়া গবেষণা করা হয় এবং বিশ্লেষণ করিয়া সমস্ত ফলাফল জানাইয়া দেওয়া হয়। কেমিক্যাল্ শিল্প সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুরজাত কাঁচামাল কাজে লাগাইবার জন্য এবং দেশের মধ্যে কাটতি হইতে পারে এইরূপ নানা প্রকার ছোট ছোট শিল্প সম্বন্ধে নানা হদিস এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বাৎলান হইয়াছে। একটী ক্ষেত্রে জনৈক দেশলাইওয়ালা জিজ্ঞাসা করেন,মাচের কাঠির আহুটারেন্সো কিরূপে নিবারিত হইতে পারে। নানাপ্রকার কেমিক্যাল দ্রব্য ঘাঁটিয়া এবং কাঠিগুলির জলন-ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাৎলান হইয়াছে।

এক্‌সপেরিমেণ্ট্যাল ট্যানারি

ত্রিবাঙ্কুরের এক্‌সপেরিমেণ্ট্যাল ট্যানারিতে নানা প্রকার চামড়া লইয়া গবেষণা করা হইয়াছে। দেশের মধ্যে যে সমস্ত পাকা চামড়ার টান আছে সেই ধরণের চামড়া টান করার দিকে ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মত আলোচ্য বছরেও ক্রোম্ ট্যানিংএর চেয়ে বার্ক ট্যানিংএর দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে বেশী। সাধারণতঃ ট্যাম্‌যাকাম্ বার্ক লইয়া কাজ চালান হইয়াছে। অর্ডার-মাফিক ক্রোম্ চামড়াও টান্ করা হইয়াছে। ট্যাম্‌যাকাম্ বার্ক হইতে আভ্যারাম টান করা লেদারের রং কোয়ালিটি বিশিষ্ট চামড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। নেলি বার্ক হইতেও চামড়া টান করা হইয়াছে।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ গ্রন্থাগার

মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে মোট ৫৩,৭২৫ খানা গ্রন্থ আছে। ইহার মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা জগতের আর কোন গ্রন্থাগারে নাই। এই লাইব্রেরীতে সবাই পড়িতে পারে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ছাড়া আর কয়েকটী ছোট গ্রন্থাগারও আছে। এই সকলের মোট গ্রন্থসংখ্যা এক্ষনে প্রায় ২৫ হাজার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ২৫৩।

মিসরীয় ছাত্রের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বর্ষ	১৩১৪ জন
দ্বিতীয় বর্ষ	৭০৮ জন
উচ্চশ্রেণী	১১০২ জন
মধ্যশ্রেণী	৫১৫ জন

(খালেদ—কলিকাতা)

মিসরে সূতা আমদানি

১৯১৩ ও ১৯৩০ সনে মিসরে সূতা আমদানির হিসাব নীচে দেখানো যাইতেছে :

কোন্ দেশ হইতে	১৯১৩			১৯৩০		
	পরিমাণ মেট্রিক টন	মূল্য ১০০০ পা. ই	মোট মূল্যের %	পরিমাণ মেঃ টন	মূল্য ১০০০ প'. ই	মোট মূল্যের %
যুক্তরাজ্য	৮৯৯	৮৬	৩৮'৯	২৭	৬	৪'২
ভারত	৭৩১	৫০	২১'৪	১,২০০	১০১	৭০'৬
ইতালি	৯৪০	৮২	৩৫'২	২৪২	৫০	১১'০
সকল দেশ হইতে	২,৬৯৪	২৩০		১,৪৩০	১৪৩	

উপরের অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে, মিসরের তুলার বাজারে ভারত নিজেকে কিরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যুক্তরাজ্য ও ইতালি যাহা যোগাইয়াছে তাহা ভারতের ভাগে আসিয়াছে। মিসরে প্রধানতঃ ৪ হইতে ১২ কাউন্ট পর্য্যন্ত সূতার ব্যবহার বেশী। ইতালি সাধারণতঃ ৬, ৮ ও ১০ কাউন্টের সূতা বেশী যোগাইয়া থাকে।

মিসরে আমদানি কমিবার হেতু বর্ত্তমান আর্থিক দুর্যোগ, অন্য কারণ নাই। ১৯২৬ হইতে ১৯২৯ অবধি তিন বৎসরে মিসরে গড়ে ২,৯০০ মেঃ টন সূতা আমদানি হইয়াছে, মূল্য ৩৮৪ লক্ষ পা. ই।

জাঞ্জিবারের বাণিজ্য

১৯৩০ সনে জাঞ্জিবারের মোট বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ৩'৯২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে আমদানির মূল্য ১'৯৪ কোটি

আর রপ্তানির মূল্য ১'১৮ কোটি। আমদানি দ্রব্যাদির মোট ওজনের পরিমাণ ৭৪,০০০ টন, আর রপ্তানি দ্রব্যাদির মোট ওজন ৪৪,০০০ টন। মোট ১,১৮,০০০ টন।

তুলার পীস্‌গুড্‌স।—২৭'৫৮ লক্ষ টাকার তুলার পীস্‌-গুড্‌স আমদানি হইয়াছে,—পর বৎসরের চেয়ে ৭'২৩ লক্ষ টাকা কম। নীচের তালিকা হইতে বিভিন্ন জিনিষের ওজন ও মূল্য দেখান যাইতেছে :

	পরিমাণ	মূল্য
	হাজার গজ	হাজার টাকা
রঞ্জিত	১,৪৭০	৪,৫৭
মুদ্রিত	২,৮৭৪	১০৭২
আনব্লিচ্‌ড	২,১৬৭	৫,৫৮
ব্লিচ্‌ড	১,২৫৯	৩,৭৮
তুলার জিনিষ		২,৯৫
মোট		২৭,৫৮

চাউল।—৩'৬১ লক্ষ হন্দর চাউল আমদানি হইয়াছে, ১৯২৯ সনে ৪'২১ লক্ষ হন্দর হইয়াছিল।

সিংহলের রপ্তানি বাণিজ্য (১৯৩০)

চা

সিংহলদ্বীপ হইতে মোট চা (কাল এবং সবুজ) রপ্তানির পরিমাণ ১৯৩০ সনে ২৪১, ৪২৭, ০৪৭ পাউণ্ড; ১৯২৯ সনে ২৪১,৪২২,৬১৭ পাউণ্ড। সুতরাং আলোচ্য সনে রপ্তানি-হ্রাস এক কোটি পাউণ্ডেরও উপর।

নিম্নের তালিকায় দশ বৎসরের চা-রপ্তানির হিসাব দেওয়া হইল :—

সন	মোট রপ্তানি পাউণ্ড	স্থানীয় নীলাম পাউণ্ড	স্থানীয় গড় দর টাঃ সেণ্ট
১৯২১	২১৬,০৮৮,৯৪৪	১০৫,২৭৭,৩১০	·৯৯
১৯২২	২২৭,০৯১,৮৮২	১১৩,২৭১,১৭৮	·৯৪
১৯২৩	২৫৬,৪৭৮,০৮৮	১১৭,৯৪০,৪৬৯	·৮৫
১৯২৪	২৫১,৫২২,৬১৭	১৩২,৮০৫,৬৭৪	·৮১
১৯৩০	২৪১,৪২৭,০৪৭	১১৯,৭৭৩,৮২৭	·৭৫

১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনের সারা বৎসরেই বাজারের অবস্থা একই রূপ; জিনিষের দরেরও সেরূপ উত্থানপতন নাই।

৪ঠা মার্চ্চ তারিখে সর্ব্বোচ্চ দর উঠে; এই সময়ে দর দাঁড়ায় ৯০ সেণ্ট; বৎসরের শেষে যে দুইবার বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে লণ্ডনির দর দাঁড়ায় ৬৬ সেণ্ট। পক্ষান্তরে ১৯২৯ সনে সর্ব্বোচ্চ এবং লণ্ডনির দর দাঁড়াইয়াছিল ১টাকা এবং ৫৯ সেণ্ট।

আলোচ্য সনে গড়দর ৭৫ সেণ্ট অর্থাৎ ১৯২৯ সনের তুলনায় ৬ সেণ্ট কম। এই দর-হ্রাস কিন্তু জগৎ-জোড়া তাঁটার বাজারে সিংহলের পক্ষে রীতিমত সন্তোষজনকই বলিতে হয়।

আলোচ্য সনে চায়ের গুণের দরও সারা বৎসর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; তবে বৎসরের শেষের দিকে রেষ্ট্রিকশান নীতি অবলম্বন করায় কিছু কিছু নিকৃষ্ট চাও বাজারে দেখা দিয়াছে। এই নিকৃষ্ট চায়ের দর দাঁড়ায় ৫০ সেণ্ট, ১৯২৯ সনে ৫২ সেণ্ট।

সিংহল হইতে কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই অধিক চা রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৯ সনের তুলনায় রপ্তানি-বৃদ্ধি ৭৯ লাখ পাউণ্ড। বিলাত ২৭৯ লাখ পাউণ্ড কম চা গ্রহণ করিয়াছে; মিসর ২৯ লাখ পাউণ্ড কম, এবং নিউজিলাণ্ড ১৭ লাখ পাউণ্ড কম ও অষ্ট্রেলিয়া ১০ লাখ পাউণ্ড কম।

অষ্ট্রেলিয়ার রপ্তানি-হ্রাসের কারণ, এই দ্বীপে বৃটিশের-উপর পক্ষপাত-নীতি বর্জ্জিত হইয়াছে এবং আত্মস্থানীণ চাহিদা বাড়িয়াছে। এই দুই কারণ ছাড়া আরও একটী কারণ আছে, অষ্ট্রেলিয়ার এখন ছাড়া চায়ের আদর বাড়িয়াছে, নিউজিলাণ্ডের বেলাতে তেমন কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সুতরাং নিউজিলাণ্ডের সম্পর্কে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে সিংহল হইতে চা রপ্তানি করিয়াছে ১৭৪ লাখ পাউণ্ড। ১৯২৮ সনের তুলনায় রপ্তানি-হ্রাস আরও কম দেখা যায়, কারণ এই সনে চা রপ্তানি হইয়াছিল ৫৭৯ লাখ পাউণ্ড।

রুশিয়ায় সোভাভূমি কালো চা রপ্তানি করিয়াছে ১০ লাখ পাউণ্ড। রুশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয় এবং ভবিষ্যতে উন্নতির আশাও কম; সুতরাং সিংহল হইতে ঐ দেশে চা রপ্তানি বৃদ্ধির কোনই আশা নাই, অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন।

১৯৩০ সনের শেষাশেষি লণ্ডনের ষ্টকে চায়ের অঙ্ক ২৬১,৫০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯২৯ সনের এই সময়ের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি দেখা যায়। ভারত এবং সিংহল দুই দেশ হইতে কম চালান আসিয়াছে। অর্থনৈতিক ভাঁটার জন্যই চায়ের খাদন এইরূপে হ্রাস পাইয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডন ষ্টকের অঙ্ক:—

১৯২৮	২২০,৫২২,৫৪৩ পাউণ্ড
১৯২৯	২৮০,৪২৬,৯২৮ "
১৯৩০	২৬১,৬০০,৬৪৮ "

জাহাজ-ভাড়া।—আলোচ্য সনে জাহাজ-ভাড়ার বিশেষ কোন তারতম্য উপস্থিত হয় নাই এবং যে-কোন স্থানে মাল চালান দিবার জন্য জাহাজ পাওয়া গিয়াছে।

রপ্তানি শুল্ক।—আলোচ্য সনে রপ্তানি শুল্কের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুল্কের হার পাউণ্ড প্রতি ৩ সেণ্ট; তবে টি সেসের হার বাড়িয়া প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ১০ সেণ্ট হইতে ১৪ সেণ্ট হয়। টি রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের খরচপত্র চালানের জন্য ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে এই সেস্ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রবার

১৯৩০ সনে রবারের দাম যৎপরোনাস্তি কমিয়া যায়। উৎপাদন-খরচ যথাসাধ্য কমাইয়া দিয়াও দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনরূপে উৎপাদন খরচটা উঠিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসানও গিয়াছে। কতকগুলি রবার এষ্টেটের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় যে, কাজকর্ম্ম বন্ধ করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। রবারের ক্ষেত্রের পরিমাণ এইরূপে কমিয়া গেলেও কিন্তু উৎপাদনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। নিম্নের তালিকাতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে:—

সিংহল হইতে মোটরকার রপ্তানি ১৯২৯ সনে ৮০,৪১৬ টন।

	১৯৩০ "	৭৫,৬২০ "
হ্রাস···		৪,৮৭৬ "

বছরের প্রথমে দর উঠে ৩৫ সেণ্টে; এবং প্রথম দুই মাসে বেশ চাহিদা দেখা যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে ৪০।৪১ সেণ্ট পর্য্যন্ত দর উঠে, কিন্তু তারপর হইতে ক্রমাগত দর নামিতে থাকে।

মে মাসে বৃটিশ এবং ডাচ রবারওয়ালারা ছোট বাঁধিয়া উৎপাদন একেবারে বন্ধ করিয়া মালের ষ্টকের খোঁজ খবর লইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এতেতেও রপ্তানি বা মূল্য কোনটাই বাড়ে না।

বাজারের অবস্থা কিন্তু ক্রমে শোচনীয় হইতেই থাকে। সেপ্টেম্বরে দর ১৭ সেণ্টে নামিয়া যায়। তখন ডাচ্ ওষ্টেই ইণ্ডিজের গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ঘোষণা করেন যে, আর তাঁহাদের পক্ষে কোন প্রকার বাধা প্রদান নীতি (রেষ্ট্রিক্‌শান) ধরিয়া থাকা চলে না।

অক্টোবর মাসে দর সর্ব্বনিম্ন দাঁড়ায়, এই সময়ে দর হয় ১৪৪।১৫ সেণ্ট। এর পর অবস্থা আবার একটু চাঙ্গা হইয়া ২২ সেণ্ট দাঁড়ায়, কিন্তু তাহা মাত্র ক্ষণকালের জন্য। বৎসরের শেষে হয় ১৮৪।১৯ সেণ্ট। গোটা বৎসর ধরিয়া ক্রিপের চেয়ে রিব্‌ড্ স্মোক্‌ড্ শিটের উপর পাউণ্ড প্রতি ½ সেণ্ট প্রিমিয়াম দেওয়া হয়।

মাশুলের হার।—বিলাতের ভাড়া ১৯৩০ সনের ২২শে মার্চ্চ তারিখে ৬৫ শিঃ হইতে ৪৭ শিঃ ৬ পেঃ এ নামিয়া যায়। মার্কিণের ভাড়া ১লা মে তারিখে ৪৫ শিঃ হইতে ৪৭ শিঃ ৬ পেঃএ উঠে।

রপ্তানি শুল্ক।—রবার রপ্তানি শুল্ক পাউণ্ড প্রতি ২½ সেণ্ট ছিল। আলোচ্য সনে আরও ½ সেণ্ট বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই বাড়তি শুল্ক রবার-গবেষণার জন্য গভর্ণমেণ্টের সেস্ স্বরূপ ধার্য্য হয়।

১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে কোন্ কোন্ দেশে কি পরিমাণ রবার রপ্তানি হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহার তুলনা-মূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

গন্তব্য দেশ	১৯৩০	১৯২৯
	টন	টন
বিলাত	১৭,৮৮৬	১৮,২৮৮
কন্টিনেন্ট্ (ইয়োরোপ)	৯,৭১৬	৭,৯০৪
অষ্ট্রেলিয়া	১,৩১৬	২,৮৪৬
আমেরিকা	৪৬,৭১৩	৪০,৯২৬
জাপান	২৯০	৩৯২
অন্যান্য দেশ	১২১	১২০
মোট	৭৫,৬০২	৮০,৪৭৬

নারিকেলজাত দ্রব্য

১৯৩০ সনে নারিকেলজাত দ্রব্য বেশী রপ্তানি হইয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে কোপ্রা এবং নারিকেল তৈল রপ্তানি কম হওয়ায় কিছুই সুবিধা দেখা যায় না। ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে মোটের উপর নারিকেল-জাত দ্রব্য কমই রপ্তানি হইয়াছে। নারিকেল হিসাবে রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ ৮ কোটী কম নারিকেল। এক মোটা নারিকেল ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রকার নারিকেলজাত দ্রব্যের মূল্য আলোচ্য সনে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে।

জিনিষের নাম	রপ্তানি		
	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
নারিকেল	১৭,১১৭,০২৮	১৯,৪৩৭,৬১১	১৯,৭৪১,৬৩৫
ডেসিকেটেড্ নারিকেল (পাঃ)	৮৮,৬৪২,৫৩৪	৭৭,৩২৮,১১৩	৭৮,৬৫৭,৩২৪
কোপ্রা (হন্দর)	১,৯৭৮,১৩৭	২,০১৩,৪৮১	১,৮১৬,৪৮১
নারিকেল তৈল ,,	৭৮০,০৩৪	৮৭৪,৫৭৮	৭৬১,৭২৯
কোকোনাট পুনাক	২৯৩,১৩০	৩২৮,৭১৮	২৭৬,৩৮২
ব্রিদ্ল্ কাইবার ,,	১৮১,৮০৬	১৯৮,৩৫৮	১৬৭,৯০৭
ম্যাট্রেস্ কাইবার ,,	৩৮৬,৯৭২	৩৯৮,৪৭০	৩০৮,০৭১
কয়ার ইয়ার্ণ ,,	৯৪,৬০৬	১০৯,২৮১	১০১,২১৪

১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে ১৯৭,০০০ কোপ্রা কম রপ্তানি হইয়াছে।

গন্তব্য দেশ	১৯৩০ হন্দর
বিলাত	৯,৮৫৩
জার্ম্মাণি	৩৪২,৮৮৫
ইতালি	৬১৪,৭২২
নরওয়ে	২৩৪,৯৯৬
হল্যাণ্ড	১১,৫০০
বেলজিয়াম	৮৫,০০০
ডেন্মার্ক	১৪৪,৫০০
ফ্রান্স	৩২,০০০
ইউ, এস, এ	২০,৩৫২
ইয়োরোপীয় তুরস্ক	১৩,০০০
এশিয়াটিক তুরস্ক	১২,৯৯৯
মিসর	৪৪,০০০ ৩১,৫৪২
ভারতবর্ষ	১,৬৪১ ১,৫৬১
অন্যান্য দেশ	৪০,৬৫৭ ১৮,১৯১
মোট	২,০১৩,৪৮১ ১,৮১৬,৪৮১

বাজার দর সারা বছর ধরিয়া কমিতে থাকে। আরম্ভে কি ক্যাণ্ডির দর ছিল ৬৩'১৫ টাকা এবং শেষের দিকে দর দাঁড়ায় ৩৯'৭৫ টাকা। জার্ম্মাণি এবং হল্যাণ্ড দেশে চিনা-বাদাম এবং সোয়াবিন রপ্তানি বেশী হওয়ায় কোপ্রা রপ্তানি কমিয়াছে। ১৯২৯ সনে মার্কিণ দেশে আদৌ রপ্তানি হয় নাই ; তবে ১৯৩০ সনে ১০০০ টন চালান গিয়াছে এবং ইতালি দেশেও রপ্তানি বাড়িয়াছে।

নারিকেল তৈল

আলোচ্য সনে ১১২,৮৪৯ হন্দর রপ্তানি কম হইয়াছে।

গন্তব্য দেশ	১৯২৯ হন্দর	১৯৩০ হন্দর
বিলাত	২৩১,২০৬	১৪১,১১৫
ডেন্মার্ক	৪,৯৬৫	৪,২০৪

ইতালি	১৪০,৮২০	১৩০,১১৪
সুইডেন	২০,০৮৯	৯,১৬৮
নরওয়ে	২০,৮৯৭	২২,৮৮৪
ক্যানাডা	১৭,৩৩৩	১৪,৮৩০
আমেরিকার অন্যান্য দেশ	৬৩,৭১৫	৭০,৫৮২
মিসর	৬৮,০৬৫	৮৮,০৯৭
আফ্রিকা	৪৭,৮০০	৩৩,৫৮৯
ভারত	১৩৯,৫৯৯	৭৩,৭৫৯
অন্যান্য দেশ	৫৬,৮৭৩	৮৫,৭১৮
মোট	৮৭৪,৫৭৮	৭৬৬,৭২৯

মার্গারিন ইউনিয়ন এবং লিভার ব্রাদার্স এই দুই কোম্পানী মোট বাঁধিয়া সিংহল হইতে বিলাতে নারিকেল তৈল রপ্তানির দফা ঠাণ্ডা করিয়াছে। এই শেষোক্ত কোম্পানীটী হল্যাণ্ড এবং জার্মাণির মার্গারিন্ ইউনিয়নের প্রস্তুত কোপ্রা তেল আমদানি করিয়া সিংহলের নারিকেল তেলকে ক্রমে বিলাত-ছাড়া করিতেছে। ভারতবর্ষও সিংহল হইতে নারিকেল আমদানি কমিতেছে।

বর্ষের প্রারম্ভে টনপ্রতি নারিকেল তেলের দাম ছিল ৩৯০৲ টাকা। সারা বৎসর ধরিয়া দর কমিতে কমিতে বৎসরের শেষে দর ২৮০৲ টাকা দাঁড়ায়।

ডেসিকেটেড্ কোকোনাট্।—১৯২৯ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে ডেসিকেটেড্ কোকোনাট রপ্তানি বৃদ্ধি,১,৩২৯,২৮১ পাউণ্ড. দরও সমান থাকে সারা বৎসর ধরিয়া। অষ্ট্রেলিয়া দেশে এই চিজ্ আমদানি নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং সরকার-তহবিলের জন্য আমেরিকায় আমদানি বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই দেশ ছাড়া দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আমদানি বাড়িয়াছে।

গন্তব্য দেশ	১৯২৯	১৯৩০
	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বিলাত	৩০,১১২,৫৮৭	৩১,৪০৭,৮০৫
মার্কিণ	৬,০৬৯,৮০০	৫,৩৭৩,৬৪০
ক্যানাডা	৩,০৯৪,৭৮০	২,৬৭৭,৪৮৫
জার্মাণি	১২,২৮৯,৫০৫	১৪,১২২,৬০২
হল্যাণ্ড	৫,১০৭,১৪৩	৫,৪৯৫,৭৬৫
স্পেন্	২,৭৩৭,৯৮৩	৩,০৯৭,৪৫০
ইতালি	১,৮৮১,৫৯০	২,১২৫,৭০০
ফ্রান্স	১,৮৩০,৮৮৫	২,০৯৩,১৯৫
অষ্ট্রেলিয়া	৪,৪০০,৬৪২	১,৩১১,৯৮৫
নিউজিলাণ্ড ...	১,১৬৮,৫৭১	১,১০০,৮৩৮
অন্যান্য দেশ	৮,৩৩৪,৫৮৯	৮,৬২৯,৯২৯
মোট	৭৭,৩২৮,১১৩	৭৮,৬৭৭,৩৯৪

কোপ্রার মত এই চিজেরও বাজার-দর নামিয়াছে। বৎসরের প্রারম্ভে ১৬ সেণ্ট্ হইতে শেষে ১০৷ সেণ্টে পরিণত হইয়াছে।

নারিকেল।—১৯২৯ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে ৩০৪,০২৪টী নারিকেল বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

গন্তব্য দেশ	১৯২৯	১৯৩০
	সংখ্যা	সংখ্যা
বিলাত	৭,৬৮০,৯৩৮	৬,৩৭৯,৩৩৫
মিসর	৫,৬৮৯,২৭৭	৫,৩১০,৫৮৩
জার্মাণি	৩,২৬৮,৯৪০	৪,৮৬০,৯১৬
হল্যাণ্ড	১,৬৭২,২৪০	১,৬৮৭,৫৮০
বেলজিয়াম	৬৪৮,৫৫০	৭৪৭,৫০৫
ইতালি	২৭০,৯২৫	৪৮৮,৪৪৫
অন্যান্য দেশ...	২৪০,৭৭১	২৭৭,২৪১
মোট	১৯,৪০৭,৬১১	১৯,৭৪১,৬৩৫

জার্মাণিতে রপ্তানি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ১৯২৯ সনের রপ্তানির সহিত তাল রক্ষা হইয়াছে।

সমগ্র বৎসর ধরিয়া নারিকেল কম ফলিয়াছে। বৎসরের শেষের দিকে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য ফলন আরও কমিয়া যায়।

খোসা ছাড়া নারিকেলের দাম বৎসরের প্রথমে ৬০৲ টাকা (হাজার করা); বৎসরের মাঝামাঝি ৫০৲; ইহার পর দর কিছু চড়ে, কিন্তু বৎসরের শেষে আবার ৫০৲ টাকা দাঁড়ায়।

কোকোনাট পুনাক্।—১৯৩০ সনে ৪২,০৩৮ হন্দর কম হইয়া মোট ২৭৬, ৩৮৩ হন্দর আমদানি হয়।

গন্তব্য দেশ	১৯২৯	১৯৩০
	হন্দর	হন্দর
	১৭,১৩৫	১২৫,০৮৯
	২২১,২৭৮	১৩০,৯৬৮
	৯,৬০৭	২০,৩২৫
মোট	৩২৮,৭১৮	২৭৬,৫৮২

১৯২৯ সনে ইতালি কিছু না লইলেও আলোচ্য সনে ৩,০০৫ হন্দর গ্রহণ করিয়াছে এবং হল্যাণ্ড ৮,৬০০ হন্দর বেশী আমদানি করিয়াছে।

ব্রিস্‌ল্‌ কাইবার

	১৯২৯	১৯৩০
	হন্দর	হন্দর
জাপান	৮৮,৫২৯	৬৫,৩১৮
বিলাত	১১,৩৪৮	৭,৪৭০
বেলজিয়াম	৪৩,৯৬১	৪২,৪৭৮
ফ্রান্স	২৬,০৩৬	২১,৫৪২
জার্ম্মাণি	১৭,৫৯৩	১৮,৬৫৮
হল্যাণ্ড	৭,৯৫৩	৮,৩৭৮
অন্যান্য দেশ	৩,৯১১	৪,০৬৩
মোট	১৯৮,৩৫৯	১৬৭,১০৭

বৎসরের প্রারম্ভে দর প্রতি হন্দর ৯।৪০ টাকা হইতে ৬।৫০ টাকায় পরিণত হয়।

ম্যাট্টেস কাইবার।—১৯২৯ সনের চেয়ে ১০,৩৯৯ হন্দর রপ্তানি কম।

গন্তব্য দেশ	১৯৩০
বিলাত	১৫,৬৫১
আফ্রিকা	৫৭,৮৭২
জার্ম্মাণি	২২,২১৫
মার্কিণ	২১,২৮০
অষ্ট্রেলেসিয়া ...	২৩,৩০৫
ভারত	১৮,১০২
জাপান	২৪,৩৯১
অন্যান্য	২৬,৪৮১
মোট	৩২৮,৪৭০

বৎসরের প্রারম্ভে কি হন্দর ১।৪০ টাকা দর হইতে অক্টোবরে দর ৮৷৫ সেণ্ট, বৎসরের শেষের দিকে দর চড়িয়া ১।৩৫ টাকা হয়।

নারিকেলের ছোবড়া।—১৯২৯ সনের তুলনায় ৮,০৬৭ হন্দর রপ্তানি-বৃদ্ধি। প্রধান প্রধান কয়েকটী দেশের পরিচয়:—

গন্তব্য দেশ	১৯২৯	১৯৩০
	হন্দর	হন্দর
	৩২,৭৬০	৩২,২৯৪
	২৬,৭০৫	২৭,৫৬৬
	৪২,৮১৬	৪১,৫৫৪
	১০৯,২৮১	১০১,২১৯

প্লাম্বেগো

সিংহল হইতে প্লাম্বেগো রপ্তানি করিয়াছে। ১৯২৯ সনে রপ্তানির পরিমাণ ১২,৬৩৮ টন, মূল্য ২,৭২৯,৬৩৯ টাকা; ১৯৩০ সনে ৮,৬২৩ টন, ১৭৭৫,৩১৭ টাকা। টন প্রতি ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনের দর ২১৪।২৯ এবং ২০৩।৫২ টাকা।

রপ্তানি-হ্রাসের কারণ এই যে, আমেরিকা ৩,৫৪০ টন কম মাল লইয়াছে।

গন্তব্য দেশ	১৯২৯
	টন
মার্কিণ	৩,১৯২
জার্ম্মাণি	১,৪৮৭
বিলাত	১,৪০৮
জাপান	১,৩১৭
অষ্ট্রেলিয়া	৩৯১
বৃটিশ ভারত	২৮৯

ইতালি	২১৩	৩২৯
বেলজিয়াম	১২৫	১৫৫
মোট	৮,৪২২	১২,৫৩৯

সিংহলে মোট ৫২টী প্রাথেগো খনি আছে, তবে অধিকাংশই ছোট ছোট। অদূর ভবিষ্যতে মূল্য-বৃদ্ধির কোন আশা নাই; তবে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের জোয়ার আরম্ভ হইলে গ্রাথেগোর দর চড়িতে বাধ্য।

সিনামন কুইল ও চিপ্

আলোচ্য সনে এই দুই বস্তুর কম রপ্তানি হইয়াছে। চিপ্ রপ্তানিই কমিয়াছে বেশী। রপ্তানি হ্রাস প্রায় ২২%।

কুইল।—বিলাত আলোচ্য সনে প্রায় দ্বিগুণ রপ্তানি করিয়াছে, পক্ষান্তরে স্পেন, ইতালি, মিসর এবং আরও কয়েকটী ছোট খাটো খরিদ্দার ছাড়া মাল রপ্তানি মোটের উপর কমই হইয়াছে।

নিম্নে তুলনামূলক সংখ্যা দেওয়া হইল :—

১৯৩০	৪,০২৭,৮৪৯ পাউণ্ড
১৯২৯	৪,১৯৭,৪৮১ পাউণ্ড
হ্রাস	১৮৫,৬৩২

কুইলের দরও আলোচ্য সনে কমিয়াছে সারা বৎসর ধরিয়া। ২নং হাফার্গ মালের দর ৫০ সেণ্ট হইতে ৩৪ সেণ্টএ নামিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর মালের দরও কমিয়াছে।

চিপ্।—মোটের উপর এই দ্রব্য রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ ২৬০,০৫৯ পাউণ্ড। বিলাত, বেলজিয়াম, স্পেন, এবং জার্মানি সকলেই আমদানি কমাইয়াছে।

১৯২৯	১,১৭০,৭৬০ পাউণ্ড
১৯৩০	৯১০,৭০১
হ্রাস	২৬০,০৫৯

বৎসরের গোড়ার দর ৭০৲ টাকা; অক্টোবরে ৩৫৲। নবেম্বরের প্রারম্ভে ৪০৲ টাকা। শেষ পর্য্যন্ত এই দরই টিকিয়া থাকে।

কোকো

বৎসরের প্রারম্ভে ১লা নম্বর কোকোর দাম ৪৫৲—৫০৲ টাকা। চাহিদা মন্দা। আগষ্ট মাসে অত্যন্ত কম দরে বিক্রী হইতে থাকে; কিন্তু ইহাতে চাহিদা সেরূপ দেখা যায় না। বৎসরের শেষে ১নং কোকোর দাম ২৪৲—৩০৲ টাকা।

১৯৩০ সনে মোট রপ্তানির পরিমাণ, ৭৩,৫৭১ হন্দর। ১৯২৯ সনে ৭৯,০৭১ হন্দর।

গন্তব্য দেশ	১৯৩০	১৯২৯
	হন্দর	হন্দর
বিলাত	১৩,৫৭৬	১৫,২৪৫
জার্মানি	৫,৪২৮	৩,৪২৮
অষ্ট্রেলিয়া	৪,৩৮১	৪,৮৩১
মার্কিণ	৩,২৫৯	৭,২১৬
আমেরিকার অন্যান্য দেশ...	১৩,৬৩৪	১০,৮০২
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	২৫,৭৮২	২৭,৩৭০
অন্যান্য দেশ	১০,৫০৮	১০,০৭৯
মোট	৭৬,৫৭৫	৭৯,০৭১

কাবাব চিনি

বৎসরের প্রারম্ভে পরিষ্কৃত কাবাবচিনির দর ২—২-১০ টাকা। এপ্রিল মাসে দর চড়ে; কাঁচা কাবাবচিনির দর এই মাসে পাউণ্ড প্রতি ১০ হইতে ১৫ সেণ্টে উঠে। জুলাই পর্য্যন্ত দর এইভাবে চলে; কিন্তু তারপর হইতেই নামিয়া যায়। বৎসরের শেষ দর দাঁড়ায় ১৷৬৭ টাকা হইতে ১৷৮৫ টাকা পর্য্যন্ত।

১৯৩০ সনে মোট রপ্তানি ৩১০,৭৮৮ পাউণ্ড, অর্থাৎ ১৯২৯ সনের চেয়ে ৮,০০০ পাউণ্ড কম।

গন্তব্য দেশ	১৯৩০	১৯২৯
	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বিলাত	৬০,৭৮০	৭৭,৬৯৮
জার্মানি	৭০,৬০৪	৫৬,০৪৪
ডেন্মার্ক	২০,৮৮৬	১৮,২৩১

সুইডেন	২৮,০০৫	
মার্কিণ	৩৮,৭৫৫	
জাপান	১৬,০৬০	
অন্যান্য দেশ	৬৮,৬১৮	১০,০৪১
	৩১০,৭৮৮	৩১৬,৪৩২

সিট্রোনেলা তেল

১৯৩০ সনে রপ্তানির বহর ৫৪১ টন, ১৯২৯ সনে ৪৩১ টন। বৎসরের প্রারম্ভে দর ১.২২ টাকা; চাহিদাও বেশ দেখা যায়। মার্চ্চ মাসে ফসল কম হইবার জন্য এপ্রিল মাসে দর ১।৪৩ টাকা দাঁড়ায়। তারপর দর কমিতে থাকে এবং জুন মাসে ১ টাকায় পরিণত হয়। সেটা ডিসেম্বর মাসে দর ১।০৮ টাকা; এবং শেষ পর্য্যন্ত—৮৮ টাকা মাত্র।

গন্তব্য দেশ	১৯৩০	১৯২৯
	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বিলাত	৩০২,৬৬৫	৩১১,০৩৪
ফ্রান্স	২০,৮১০	২৮,৪২১
জার্ম্মাণি	১৩৫,০৯৩	১২৬,০৬৬
হল্যাণ্ড	৪৭,০১০	৫৮,৮২৪
ইতালি	৩৬,১৯৪	৩২,৬৯৫
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড	৫৯,২৭০	৭৯,৮৬৯
মার্কিণ	৪৬২,২৬৪	৪২৫,২১৭
ক্যানাডা ও এন্ এফ্	১১,৩২২	৯,১১৫
আমেরিকার অন্যান্য দেশ	২৬,৬৮৪	৩২,০২২
ভারত	৬৭,৯৩০	৩১,৬০৭
চীন	১,৯০০	১৩,৯১৪
অন্যান্য দেশ	৪৪,৪৪১	৪০,২৭২
মোট	১,২১২,১০৭	১,১৮৯,৪০৬

১৯৩০ সনে সিংহলে চাউল আমদানি

১৯৩০ সনে সিংহল উপনিবেশে সর্ব্বসুদ্ধ ৬,২৩১,৬১৫ বাগ চাউল আমদানি হইয়াছে। ১৯২৯ সনের তুলনায় আমদানি ৩৫,০০০ বাগ কম। পরিমাণে তো কম হইয়াছে, দামের বেলাতে অবস্থা আরও কাহিল। আলোচ্য সনের প্রারম্ভে পয়লা-নম্বরের চাউলের দর বস্তাছাড়া বুশেল প্রতি ৫'২৫ টাকা ছিল। দাম ক্রমেই কমিতে থাকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ৪'৭০ টাকা দাঁড়ায়। মার্চ্চ মাস হইতে দর আবার চড়িতে থাকে এবং সে মাসের মাঝামাঝি ৫'১০ টাকা দাঁড়ায় এবং এই মাসের শেষেই দর ৫'৬০ টাকায় পৌঁছে। রেঙ্গুন ওয়ারহাউসে চুক্তিদের ধর্ম্মঘটের জন্যই এই দরের তারতম্য উপস্থিত হয়। দর আরও বাহাতে না বাড়িয়া যায় সেইজন্য ২রা জুন তারিখে সিলোন গবর্ণমেণ্ট কলম্বোর চাউলের উপর আপন হিস্যার প্রহণ করে; কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের জন্য। ইহার পরেই রেঙ্গুনের ধর্ম্মঘটের অবসান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দরও নামিয়া ছয় মাসের শেষে ৫'১০ টাকায় পরিণত হয়। পরবর্ত্তী তিনমাসে গড় দাম দাঁড়ায় ৫'০৫ টাকা, এবং পরে আবার চড়িতে থাকে। ইহার পরে দর আবার চড়ে বটে; কিন্তু বছরের শেষের দিকে অসম্ভবরূপে নামিয়া ৪'২৫ টাকায় পরিণত হয়। ভবিষ্যতে চাউল আমদানি সম্বন্ধে অবস্থা আশাপ্রদ। দুনিয়ার সমস্ত চাউল-উৎপাদনকারী দেশেরই ধানের অবস্থা ভাল। সুতরাং মোটা ১৯৩১ সন ধরিয়াই চাউলের বাজার নরম থাকিবার কথা।

নিম্নে তালিকায় সিংহলে চাউল আমদানির পরিচয় দেওয়া হইল :—

		বাগের সংখ্যা
ভারতবর্ষ		১,৪৯১,২৮৫
বার্ম্মা		৪,৩৪১,৪৪৫
অন্যান্য দেশ		২১৮,৯৬৫
	মোট	৬,২৩১,৬১৫

রাষ্ট্রীণ দ্বীপের বাণিজ্য

১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে এই দ্বীপের বাণিজ্যের পরিমাণ নিম্নরূপ :

	আমদানি	
	সোনারূপা	সোনারূপা ও মুক্তা
	পা	পা
১৯২৮-২৯	৩,৮৩,৪১১	৪,১০,৮৪৯
১৯২৯-৩০	৫,৭৪,০২৯	৫,৮৫,৮৭২
শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি	+৬৭·১	+৪২·৬

	রপ্তানি			
	সোনারূপা	মুক্তা	সোনারূপা ও মুক্তা	পণ্যাদি
	পা	পা	পা	পা
১৯২৮-২৯	১,৭৫,৬৮৫	১,৩৪,০৯২	৩,১০,০৭৭	৬,৮৩,৭৪৮
১৯২৯-৩০	১,৯৩,৯২২	১,৪১,২৭৮	৩,৩৫,২০০	৫,৫১,০৮৫
শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি	+১০·৪	+৫·১	+৮·১	−১৯·২

এই দ্বীপে ভারতবর্ষ হইতে কত টাকার কোন্ কোন্ জিনিষ আমদানি হইয়াছে তাহার তালিকা :

	পরিমাণ		মূল্য	
	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০
			পা	পা
ছাগ ও ভেড়া				১১৩
ঘরবাড়ী তৈয়ারীর দ্রব্য—				
কাঠ				
অন্যান্য				
খাদ্য শস্য—				
চাল			৩৯৬,২৯৫	৩৩৫,৪৪৭
বীজ			১,৬০৭	৮০০
গম	টন	৩২৩	৮,৬৭৮	৩,৮৩১
আটা		১,৮২২	৩৩,৭১১	২৭,৬০৫
অন্য শস্য			৭,১৬৬	৭,০০৩
রঞ্জন করিবার দ্রব্য			১,১৭৫	৮৮৭
জ্বালানি				
কাঠকয়লা			৬,৬৬৮	
তৈল (কেরোসিন ছাড়া)			১০,৫৪৮	

	মণিমুক্তা	২৯,৫১৫	১১,৬২৩
	সোনারূপা	৩৪৮,৮২৬	৪৫০,০৪৮
'প্রতিশন'			
	কফি		১৭,৬৪৮
	ফল (খেজুর ছাড়া)		৭,৮৪৪
	ঘী	গ্যালন	১৭৯
	সস্তা ঘী	হন্দর	১,৩২৩
	মসলা		২৯,৩৮৪
	আখের চিনি		৭০৮
	নরমচিনি		৫৪,৭৮৭
	চা		৪৩,৪৬০
বহন-শিল্প			
	পরিধেয়		
	তুলার জিনিষ		
	পশমের জিনিষ		
	সোনারূপার সুতা		
	টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ		
বিবিধ			
	মোটর কার	৩,৮৪৬	
	ছুরি কাচি	১৫,৬২০	
	ঘড়িঘড়া	১৮,০০০	
	গৃহস্থালীর জিনিষ	২৩,২০৩	

অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক বিপদ

অষ্ট্রেলিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথ্, বা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও বহু বিষয়ে স্বাধীন। শুল্কনীতি, সংরক্ষণ, উপনিবেশ ইমিগ্রেশন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই নিজের মতানুসারে চলে; এমন কি অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ান্ হইতে পারেন। পৃথিবীব্যাপী মন্দা বাজার অষ্ট্রেলিয়াকে অভিভূত করিয়াছে। তাহাদের বাজেটে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের ঘাটতি পড়িয়াছিল। বাহিরের ও ভিতরের অনেক দেনা শোধের সময় হয়, অথচ অর্থকোষে অর্থাভাব। গবর্ণমেণ্ট বাহিরের কোনো কোনো আমদানি সামগ্রীর উপর শতকরা ৪০% হারে শুল্ক ধার্য্য করিল। এ ছাড়া নূতন বিক্রিকিনির ট্যাক্স, নূতন আবগারী ট্যাক্স, উচ্চতর হারে আয়কর ধার্য্য করা হইল। গবর্ণমেণ্ট আশা করিল ইহাতে আয় বাড়িবে, বাজেটের ঘাটতি টাকা পূর্ত্তি হইবে। কিন্তু তা হইল না। অষ্ট্রেলিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট একেবারে দেউলিয়া হবার যোগাড় হইল।

ইংলণ্ড এই সময়ে উপযুক্তভাবে সাহায্য করিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল্ ও ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট সমূহ একযোগে ঠিক করিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক ব্যয়-সঙ্কোচ করিতেই হইবে। এইজন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

জার্ম্মাণিতে ১২ কোটি মার্ক দামের নতুন রূপার মুদ্রা

জার্ম্মানি সম্প্রতি অনেক রূপা আমদানি করেছে।

৩১শে অক্টোবর তারিখের খবর এই যে, জার্মানিতে নতুন রূপার মুদ্রা চালানোরও ব্যবস্থা হচ্ছে। জার্মানির রাইখ্‌স্‌ব্যাঙ্ক ১২ কোটি মার্ক দামের রূপার মুদ্রা তৈরীর হুকুম দিয়েছেন। যে দামটা দেওয়া হ'ল সেটা মুদ্রার মধ্যে যতটা ধাতু আছে তার দাম নয়, যে ধরে মুদ্রাগুলির সাহায্যে বাজারে কেনা-বেচা চলবে সেই ধরটাই ধরা হয়েছে। এই নতুন মুদ্রা চালানোর ফলে ব্যাঙ্ক-নোটের সংখ্যা কমানো চলবে, স্বর্ণমান শাসনেও নাকি সুবিধা হবে।

বিলাতের জন্য ৩ কোটি পাউণ্ড ঋণ

ব্যাঙ্ক অব্‌ ফ্রান্স্‌ ও ফেডারাল্‌ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্‌ নিউ ইয়র্ক (ফ্রান্সের ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ব্যাঙ্ক) প্রত্যেকে বিলাতকে ১½ কোটি পাউণ্ড ক'রে ঋণ দিতে রাজী হয়েছেন। (৩ শে অক্টোবর, ১৯৩১)

লণ্ডনের ভূমধ্যস্থ রেলে অদলবদল

লণ্ডনের ভূমধ্যস্থ রেলের যে সব ষ্টেশন, সেগুলার অনেকগুলার স্থান-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অনেক জায়গায় ষ্টেশনগুলার স্থানে বড় বড় দোকানঘর তৈরী হচ্ছে। 'পিকাডিলি টিউবটী'কে বাড়ানো হচ্ছে। তাতে খরচ করা হবে ১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড, অর্থাৎ মাইল প্রতি ৮½ লাখ পাউণ্ড। বহুল যাত্রীর সমাগমের সুবিধার জন্য লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে যে ষ্টেশনগুলা আছে সেগুলা নতুন ক'রে গড়া হচ্ছে।

লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্থোনিয়া

প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের রাশিয়ার পশ্চিম দিকটা ভেঙ্গে যুদ্ধের পর লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া এস্থোনিয়া নামে তিনটী পৃথক রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে। আর্থিক হিসাবে এই রাষ্ট্রগুলা কতদূর সফল হয়েছে? "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের লিথুয়ানিয়াবাসী এক সাংবাদিক ২৩শে অক্টোবর (১৯৩১) তারিখের "ষ্টেটস্‌ম্যানে" বলছেন যে, ঐ তিনটী রাষ্ট্র তাদের আর্থিক সাফল্য ইতিমধ্যে দেখাতে পেরেছে। রাষ্ট্রগুলা তাদের সব সরঞ্জামের জন্য রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল এটা সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রগুলা বলে যে, বলশেভিক যেমন তার যাবতীয় সরঞ্জামের জন্য জার্মানির উপর নির্ভর ক'রেও পৃথক রাষ্ট্রজীবন বজায় রাখতে পারে, তেমনি ঐ রাষ্ট্রগুলাও রাশিয়ার উপর নির্ভর ক'রে স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় পার্থক্য দেখাতে পারে। আজ সারা দুনিয়া ব্যাপক আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ তিন রাষ্ট্রে এই আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় নি। এর কারণ, ঐ তিন রাষ্ট্র মাখন, ডিম, শূকরের মাংস, মুর্গী প্রভৃতি খাদ্য কৃষিজাত জিনিষ তৈরী ক'রে থাকে, রাষ্ট্রগুলা স্ব স্ব প্রয়োজন মত কারখানাজাত মাল তৈরী করে ও কলকারখানায় উৎপাদনের আধিক্য দেখা দিলে মজুরদের কলকারখানা থেকে ছাড়িয়ে কৃষিতে লাগায়। সুতরাং ঐ তিন রাষ্ট্রে কৃষি ও শিল্পের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায় এবং এইটাই ওদের বর্ত্তমান আর্থিক সমৃদ্ধির কারণ।

যুদ্ধের সময় ঐ তিন দেশে ১ লাখ ৮০ হাজার চাষীর বাড়ী ধ্বংস হয়। গত দশ বছরের মধ্যে ঐ তিন রাষ্ট্র নিজেদের টাকা দিয়েই, অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কোন টাকার সাহায্য না নিয়েও, চাষীদের নতুন বাড়ী ও নতুন কৃষিক্ষেত্র উন্নততর প্রণালীতে গ'ড়ে তুলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তিন দেশে নতুন নতুন রেল লাইন, পয়ঃপ্রণালী ও মোটর চলবার জন্য ভাল রাস্তাও তৈরী করেছে।

জনসাধারণের শিক্ষার প্রসারের জন্য ঐ তিন রাষ্ট্র বিশেষ চেষ্টা করেছে ও করছে। ১৯২৮ সন থেকে ঐ তিন রাষ্ট্রে ৭ হ'তে ১৩ বছরের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা পেতে বাধ্য। প্রত্যেক বছরে নতুন সরকারী স্কুলের বাড়ী ও লাইব্রেরী তৈরী হচ্ছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটী ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ল্যাটভিয়া ও এস্থোনিয়াতে ম্যাট্রিক স্কুলের সংখ্যা তিন গুণ ও লিথুয়ানিয়াতে ম্যাট্রিক স্কুলের সংখ্যা পাঁচ গুণ বাড়ানো হয়েছে। চাষীদের জন্য অনেক নতুন সাময়িক পত্র বাহির করা হচ্ছে। এই সব সাময়িক পত্রের জন্য সরকার অর্থ-সাহায্য দিয়ে থাকেন। অনেকগুলা "ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন"ও তৈরী হয়েছে। প্রত্যহ এই সব ষ্টেশন থেকে বক্তৃতা দেওয়া

হয়। চাষীরা সারাদিনের খাটুনির পর এই সব বক্তৃতা শুনে আনন্দ ও শিক্ষা পায়।

ঐ তিন রাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলনের বিশেষ বৃদ্ধি হয়েছে। তিন রাষ্ট্রের চাষীরা যা রপ্তানি করে তার তিন-চতুর্থাংশ সমিতিগুলার হাত দিয়ে যায়।

বড় বড় জমিদারি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা ক'রে জমি-হীন মজুরদের হাতে দেওয়া হয়েছে। জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য জমিদারদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

কলকারখানার কাজের ঘণ্টা ৮ ঘণ্টা বা আরও কম করবার জন্য আন্দোলন সুরু হয়েছে। চাষীদের খাটুনি এখনও বড় বেশী। এরা শেষরাত্রে ৪টার সময় উঠে কাজ আরম্ভ করে ও সন্ধ্যা ৮টা কি ৯টার সময় এদের কাজ শেষ হয়। তবে এই একটানা খাটুনির মাঝে মাঝে বেলাই নেয় আধারাধি সারবার জন্য।

বিলাতে ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য বিদেশীদের হুড়াহুড়ি

সম্প্রতি বিলাতে যে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হয়েছে তাতে "জাতীয় গবর্ণমেণ্টের" দল জয়ী হয়েছে। এই দলের মধ্যে রক্ষণশীল দলের সভ্য-সংখ্যাই বেশী। রক্ষণশীল দলের একটী মূলনীতি হচ্ছে এই যে, বিলাতী শিল্পকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা করে খাড়া হ'তে হলে সংরক্ষণ শুল্কের দরকার। নতুন গবর্ণমেণ্টে রক্ষণশীল দলের লোক এত পুরু থেকে বিদেশের শিল্প-পতিরা সংরক্ষণ শুল্কের প্রভাব এড়াবার জন্য বিলাতেই ফ্যাক্টরী করার কথা ভাবছেন এবং তার জন্য আবেদন ক'রতেও সুরু করেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মানি, চেকো-শ্লোভাকিয়া, ইতালি, আলবানিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্প-পতিদের কাছ থেকে আবেদন এসেছে। আবেদন-সংখ্যার বহর দেখে লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স, বিলাতে কোথায় কোথায় ফ্যাক্টরীর জন্য জমি পাওয়া যেতে পারে, তার একটী তালিকা করেছেন। লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স খুঁজে দেখেছেন যে, ১০০০টী খালি জায়গা পাওয়া যাবে।

বিদেশী কোম্পানীরা বিলাতে ফ্যাক্টরী খুলবে, যদি বিলাত সংরক্ষণ শুল্ক চালায়। কিন্তু, বিলাত তা ক'রবে কিনা সন্দেহ। কারণ, নতুন গবর্ণমেণ্টে রক্ষণশীল দল পুরু হ'লেও, তাদের দল ছাড়া অন্য দলের লোকও গবর্ণমেণ্টে থাকবে, তারা সংরক্ষণশুল্কে সহজে রাজী হবে ব'লে মনে হয় না। তা ছাড়া, বিলাতে পাউণ্ডকে সোনা থেকে ছাড়িয়ে নেবার ফলেই বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা সংরক্ষণ ভোগ ক'রতে আরম্ভ করেছে। গতবারের জাপানাল গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব মিষ্টার চেম্বারলেন যখন ৬ মাসের বাজেট তৈরী করেন তখন তিনি আগামী ১½ বছরের আয়-ব্যয়ের কথা ভেবেই তা করেছিলেন। কাজেই সরকারী আয় বাড়াবার জন্য যে সংরক্ষণশুল্ক দরকার হবে না, তা নিশ্চয়।

শিল্পোন্নতির জন্য নূতন আইন

বাংলার শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়ার বিধি-ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর কায়েকী এক বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিগত ২৪শে জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই দিন ধরিয়া এই বিলের আলোচনা চলিয়াছিল।

এই বিলের ২১শ ধারার মধ্যে আছে :

(১) নূতন অথবা লুপ্তপ্রায় শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

(২) কোনও স্থান-বিশেষে কোনও নূতন শিল্প—যাহা ইতঃপূর্ব্বে সেখানে ছিল না—প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) কুটীর শিল্প এবং যে শিল্প কয়েকজন মিলিত হইয়া অথবা একদল শিল্পী দ্বারা চালিত হয়—তাহার উপকারের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া বিলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে :—

(১) ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই ঋণ পরিশোধের পথ বলিয়া দেওয়া হইবে।

(২) নগদ টাকা ধার দেওয়া হইবে, অথবা ব্যাঙ্ক হইতে জমার অতিরিক্ত টাকা তুলিয়া আনিতে দেওয়া হইবে, অথবা স্থায়িভাবে টাকা আদায় দেওয়া হইবে এবং এই সমস্ত টাকা পরিশোধের পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইবে। সেই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে হইবে।

(৩) গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ অথবা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবেন।

(৪) অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক সর্ত্তে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দেওয়া হইবে, সুবিধাজনক দরে কাঁচা মাল, জ্বালানি কাঠ, জল, ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৫) গবেষণার জন্য অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইবে।

(৬) কল-কব্জা ইত্যাদির মূল্য কিস্তি অনুসারে শোধ করা হইবে, এই সর্ত্তে কিনিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই বিলের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইবে। বোর্ডের সদস্য সকলই বে-সরকারী সদস্য হইবেন। তবে ব্যবসা ও ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে এরূপ কয়েক ব্যক্তিকে এই বোর্ডের সদস্য করা হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এই বোর্ডের হাতে দেওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, যাহাতে এই প্রদেশের শিল্পাদির উন্নতিজনক কার্য্য অগৌণে আরম্ভ হইতে পারে তজ্জন্য এই বোর্ড সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব ও কার্য্যক্রম রচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিবেন।

মিঃ সি, জি কুপার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর কায়েকী ডাক্তার সেনগুপ্তের প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছিলেন।

মিঃ সি, জি, কুপার আর একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্য করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ২৩শে জুলাই তারিখের সভায় প্রবল বিতর্ক হয়। পরিশেষে ইহার পক্ষে ৩৭ ভোট এবং বিপক্ষে ৭০ ভোট হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়।

ব্যবস্থাপক সভায় আর্থিক প্রস্তাব ও আলোচনা

১। দেশীয় শিল্পে উৎসাহ দান

গত ২৯শে জুলাই বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে দেশীয় শিল্পে উৎসাহ দানের মূলনীতি সরকার যাহাতে গ্রহণ করেন, সেই উদ্দেশ্যে মৌলবী সৈয়দ নৌশের আলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই,—সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উপদেশ দেওয়া হউক যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়কালে বঙ্গদেশে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয়ের বিষয় যেন সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয় সম্বন্ধে শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের উপদেশ গৃহীত হইবে। প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে মৌলবী নৌশের আলি বলেন, সরকার দেশীয় শিল্পের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহায্য দান করা হইবে। শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় চৌধুরী মৌলবী নৌশের আলির প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতা করেন। অতঃপর সরকার পক্ষ হইতে মিঃ আর, এন, সিলক্রাইষ্ট বলেন,—সরকার প্রকৃত পক্ষে প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রস্তাবের কোনই প্রয়োজন নাই। বক্তা প্রস্তাবটি তুলিয়া লইতে মৌলবী নৌশের আলিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অসম্মত হইলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়।

২। বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক-সমস্যা

তদ্ভিন্ন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব সচিব বলেন,—বঙ্গদেশে প্রতিদিন ব্যাঙ্কের ছাতার ন্যায় বহু নূতন ব্যাঙ্ক দেখা দিতেছে; কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক কাজ করিবার তত সুবিধাজনক পথ পাইতেছে না। উক্তরূপ ব্যাঙ্কের দালাল ও উদ্যোক্তাদিগকে অভিযুক্ত করা হইতেছে এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান লোপ করিয়া দিবার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩। অনুন্নত সম্প্রদায়ের চাকুরী

গত ৩১শে জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক প্রস্তাব করেন,—সরকার যেন অতঃপর মনঃশুদ্ধ ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ম্মপ্রার্থীর জন্য যাবতীয় প্রাদেশিক সরকারী চাকুরীর শতকরা বিশটী পদ স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ম্মপ্রার্থীদের সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত করার সময় ন্যূনতম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই যেন কর্ম্মক্ষম বলিয়া বিবেচনা করা হয়। শ্রীযুক্ত বিরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—স্বরাজ শাসনেই হউক বা আমলাতন্ত্র শাসনেই হউক দেশের সরকারী চাকুরীতে কেবলমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোককেই নিয়োজিত করা উচিত। মুসলমানগণ দাবী করেন, তাঁহারা শতকরা পঞ্চাশটি সরকারী চাকুরী ভোগ করিবেন, যেহেতু তাঁহারা জাতিতে মুসলমান। অনুন্নত শ্রেণীভুক্তগণ দাবী করিতেছেন, যেহেতু তাঁহারা অনুন্নত শ্রেণীর, অতএব তাঁহাদিগকে শতকরা বিশটি সরকারী চাকুরী দেওয়া হউক। উহাদের দাবীর মূলে শিক্ষা বা অপর কোন গুণ কি ক্ষমতার বিবেচনার কথা নাই। উন্নত শ্রেণীর শিক্ষিতগণ শিক্ষা-সম্পন্ন হওয়ার ফলে কেবলমাত্র শতকরা ৩০টি সরকারী চাকুরী পাইতে পারিবেন। ইহা অতিমাত্রায় বিকৃত ও অদ্ভুত যুক্তি। মিঃ আবুল কাসেম প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন, যাহারা গায়ে খাটিয়া ভূমি চাষ করিয়া মোটা রকমের রাজস্ব যোগায়, তাহাদের দাবীই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন, প্রতিযোগিতা পরীক্ষার কথা এই স্থলে খাটে না। খাঁন বাহাদুর আজিজুল হকও প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন,—এই স্বেতকায় পরিচালিত সরকার প্রকৃতপক্ষে উন্নত শ্রেণীর হেড ক্লার্কদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মিঃ আবদুল সামাদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—তুমি কর্ণধারিগণ যদি সরকারী চাকুরীতে শিক্ষিতগণের সহিত বখরা বসাইতে চাহে, তাহাদের উচিত হইবে—শিক্ষিতগণকে তাহাদের জমিজমার অংশ ভোগ করিতে দেওয়া। স্বরাষ্ট্র সচিব আলোচনার উপসংহারে আশ্বাস দেন, অনুন্নত শ্রেণীর এই স্বাভাবিক বাসনার কথা বিশেষরূপে বিবেচনা করা হইবে। সরকার তাহাদের দাবী স্বীকার করেন। অতঃপর স্বরাষ্ট্র সচিবের উপদেশ অনুসারে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়।

৪। পাটচাষের পূর্ব্বাভাস

শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় চৌধুরী প্রস্তাব করেন, সরকার যেন আর পাটচাষের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ না করেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ রায় চৌধুরী বলেন, এই পূর্ব্বাভাস প্রকৃতপক্ষে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইয়া থাকে এবং ইহা প্রস্তুত করিতে গ্রাম্য চৌকীদারগণের সহায়তা লওয়া হয়। ইহা প্রকাশিত হওয়ায় গরীব অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণের ক্ষতি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষের পাটের পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর মণ করা আট আনা করিয়া কমিয়া গিয়াছে। এরূপ কার্য্যদ্বারা কেবলমাত্র পাট ব্যবসায়িগণ ও ফটকাওয়ালাগণ উপকৃত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কৃষকদের গোচরার্থ পৃথিবীর পাটের চাহিদা সরল ভাষায় ব্যক্ত করা উচিত। মিঃ সি, জি, কুপার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে পর মন্ত্রী মিঃ কারোকী বলেন, পাট চাষ সম্পর্কীয় পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত করা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে না। পৃথিবীর পাটের চাহিদা কত, সে বিষয়ে কৃষকের জ্ঞাত করাইবার বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। পাট চাষ সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পাট সমিতি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। একটী প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বেঙ্গল চেম্বারের অনুমোদনে পাট চাষ সম্পর্কীয় পূর্ব্বাভাসের শেষ বিবৃতি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ইহা দ্বারা প্রাথমিক ও শেষ পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইবার মধ্যবর্ত্তী কাল কম করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর মন্ত্রীর অনুরোধে প্রস্তাবক তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

৫। পুলিশের জন্য পাঁচ লাখ

কলিকাতায় এবং মফস্বলেও পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। কলিকাতায় সার্জ্জেন্ট বাড়িবে ৩১ জন; সশস্ত্র পুলিশের একটা নূতন দল বাড়িবে; বাঙ্গালায় ১৪৫ জন রিজার্ভ পুলিশ রাখা হইবে; তাহা ছাড়া চট্টগ্রামে এখন আসাম রাইফেলের যে ১৫০ জনকে রাখা হইয়াছে, তাহারাও থাকিবে। মিঃ প্রেন্টিস বলেন,—সম্প্রতি কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে যে সব অত্যাচার হইয়া গেল, তাহার জন্যই পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই অতিরিক্ত পুলিশ পোষণের জন্য ব্যয় হইবে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এই অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এই বরাদ্দ কাটিয়া মাত্র ১৲ টাকা করিবার জন্য এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ভোটে টিকে নাই।

৬। দুর্ভিক্ষে সাহায্য ত্রিশ হাজার

গত ৩১া আগষ্ট মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য ত্রিশ হাজার টাকার এক অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুর হইয়াছে। অনেক সদস্যই আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে,—এখন অতিরিক্ত পুলিশ পোষণের জন্য টাকার বরাদ্দ করা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর প্রাণ-রক্ষার জন্য কিছু বেশী করিয়া টাকার বরাদ্দ করাই অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলেন যে, এখন আর ইহার অধিক কিছু হইবে না; তবে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যত টাকাই দরকার হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ভেজাল খাদ্য দ্রব্য নিবারক আইন

১৯১৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভেজাল খাদ্য দ্রব্য নিবারক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার আট বৎসর পরে ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা ব্যতীত বাঙ্গালার অপর সকল স্থানে ঐ আইন প্রচলন করিয়া মফঃস্বলে ভেজাল খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করা বন্ধের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যদি কেহ ভেজাল দুধ, ঘই, ঘানা, ঘী, মাখন, সরিষার তৈল, ময়দা, আটা ও চা বিক্রয় করে তবে ঐ আইন অনুসারে বিক্রেতাকে সাজা দেওয়া যাইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা ভেজাল খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন হইলে

সকলেই বলিবেন, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে একান্ত উদাসীন।

১৯২৯-৩০ সনের বাঙ্গালার শাসন বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে, হাওড়ার জেলা বোর্ড ঐ অনুসারে কোন কাজ করেন নাই।

দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই।

অন্যান্য জেলা বোর্ড সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টারদিগকে ঐ আইনের ১০ ও ১২ ধারা অনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, অধিকাংশ স্থানেই ঐ ধারা প্রয়োগ করা হইতেছে না।

সুতরাং ভেজাল ঘৃত, ভেজাল ঘী, ভেজাল সরিষার তৈল প্রভৃতি অবাধে বিক্রয় হইতেছে এবং বাঙ্গালীকে অজীর্ণ রোগে জরাজীর্ণ করিতেছে।

বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীতে অতি অবাস্ত সরিষার তৈল বিক্রয় হয়। বিশুদ্ধ তৈলের অভাবে সকলেই তাহা বাধ্য হইয়া ব্যবহার করে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই কলুর ঘানির তৈল ব্যবহার হইত; কিন্তু কলের ভেজাল তৈল সস্তা হওয়াতে লোকে তাহাই ব্যবহার করিতেছে ও অজীর্ণ রোগে সারা-জীবন কষ্ট পাইতেছে।

খাঁটি মহুয়া ও আটা মফঃস্বলে প্রায়ই পাওয়া যায় না, সুতরাং লোকে বাধ্য হইয়া নিকৃষ্ট আটাই খাইতেছে।

বেকার-সমস্যা সমাধান

পুণার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলনে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ বলেন—যদি এদেশে নূতন নূতন রেলপথ, কলকারখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এদেশের বেকার-সমস্যা দূরীভূত হইতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়ে তখন এই ধরণের কাজে হাত দিয়া বেকার-সমস্যা আরও জটিল করা অপেক্ষা এই ধরণের নূতন নূতন কাজে হাত দেওয়াই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। যদি নূতন নূতন রেল লাইন, পুল, বাড়ী ইত্যাদি তৈয়ার হয়, তবে দেশের লৌহ-শিল্প, সিমেন্ট-শিল্প ইট-শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হইবে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেশের বেকার-সমস্যা দূরীভূত করিবার জন্য এই ধরণের কাজ আরম্ভ করা হয়; কিন্তু এদেশে তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্ত্তমানে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে যে মন্দা পড়িয়াছে তাহা দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু ভবিষ্যতে এদেশে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হইবে। ভারত-বর্ষের মত দারিদ্র্য পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে নাই। এদেশের লোক ক্রমাগত উপবাস করিয়া জীবন কাটায়। সাইমন কমিশন বলেন যে, ভারতবর্ষের জনপ্রতি বৎসরে আয় ১১০৲ টাকা, কিন্তু উহা সত্য নহে। প্রত্যেক ভারত-বাসীর বার্ষিক গড় আয় মাত্র ১০০৲ টাকা। অথচ যুক্ত-রাজ্যে মাথাপিছু বৎসরে আয় ১০৮০৲ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ার ৮১০৲ টাকা ইংলণ্ডে ৭৫০৲ টাকা এবং কানাডা, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে মাথাপিছু গড় আয় ৪৫০৲ টাকা। আমাদের প্রকৃতি-প্রদত্ত শক্তি ও কাঁচা মালের সাহায্যে আমাদিগকে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। এই জন্য আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ সমস্ত শক্তি খাটাইতে হইবে। বিশেষতঃ এই কাজে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করিলে অনেক কম ব্যয়ে কাজ হইবে। যদি ভারতে নানা জিনিষের জন্য কলকারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে বহু দক্ষ ও সাধারণ মজুরের কাজের সংস্থানও হইবে। পৃথিবীর স্বাধীন দেশে প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই কাজ চালান হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রেলপথগুলিতে সুইডেন ও নরওয়ে হইতে আমদানি করা কাঠের স্লিপার ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইংলণ্ডে এখন চড়া দর হইলেও রেলপথে নিজের দেশে প্রস্তুত লোহার স্লিপার ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ভারতের অবস্থা অন্যরূপ। এদেশের লোহার কারখানা ও বন বিভাগ হইতে অনায়াসে ভারতের জন্য রেলপথের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোহা ও কাঠের স্লিপার পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এদেশে বিদেশ হইতে স্লিপার আমদানি করা হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইত যে, ভারতে কখনও সিমেন্ট তৈয়ারী

হইতে পারে না। কিন্তু এখন ভারতীয় কারখানাগুলিতে ভারতবর্ষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সিমেণ্ট তৈয়ার হইতেছে এবং বৎসরে ভারতের ২ কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে। সিমেণ্টও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভাল হইতেছে।

স্বদেশী মোটর গাড়ী

কলিকাতা কর্পোরেশন মোটর গাড়ী তৈয়ারীর কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য এদেশে বসিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীকে মোটর তৈয়ারী করিতে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তৎসহ কয়েকটী সর্ত্তও যোগ করিয়া দিয়াছেন।

প্রস্তুত গাড়ীর দাম তিন হাজার টাকার বেশী না হয়।

দুই বৎসরের মধ্যে গাড়ীর কোন অংশ ভাঙ্গিলে বদলাইয়া দিতে হইবে। গাড়ীতে ৫ জনের বসিবার স্থান এবং ৪টী দরজা থাকিবে।

আদেশ পাইবার ৬ মাসের ভিতর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

মোটরগাড়ী, ঘড়ি প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্য এই যুগে অবশ্য ব্যবহার্য্যের তালিকাভুক্ত এবং ইহাদের দরুণ বহু টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আর এইগুলি যদি এদেশে তৈয়ারী হয়, তবে বহু বেকারের আহার জুটে এবং দেশের অবস্থাও ফিরিয়া যায়। এ দেশের লোক এ সকল তৈয়ার করিতে পারে না এমন নয়, কিন্তু ইহার জন্য এ পর্য্যন্ত চেষ্টা হয় নাই। যদি কেহ চেষ্টা করে তবে সে লোকলোচনের অন্তরালেই থাকিয়া যায় এবং অনেকের উদ্যম উপযুক্ত সুবিধা সুযোগের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। এই ত সেদিন শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহাশয় ১০০০ বাষ্পশক্তির ডেলাইট নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত ভূদেবভূষণ কর্ম্মকারকে আবিষ্কার করিয়াছেন।

অন্যান্য বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটী এইরূপ দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার কার্য্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ন্যায় উৎসাহ দিলে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

(মানবহু সমাচার)

পোর্ট ট্রাষ্টে ব্যয়-সঙ্কোচ

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারগণের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে,—

গত বৎসরে বিষম ঘাটতি পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরেও ঘাটতি হইবে বলিয়া এখন হইতে বুঝা যাইতেছে। ঋণ ও সিঙ্কিং ফণ্ড সম্পর্কেও ট্রাষ্টের দায়িত্ব রহিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অধিকতর বোঝা না চাপাইয়া বা কোন প্রকারে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া ট্রাষ্টের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় রাখা উচিত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরের ব্যয়-হ্রাস এবং ভবিষ্যতের জন্য স্থায়িভাবে ব্যয়-হ্রাস দ্বারা মিতব্যয়িতাজনক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেই হেতু প্রস্তাব করা যাইতেছে যে,—

(ক) আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা এবং বিশেষে ব্যয়-হ্রাস ও ট্রাষ্টের আর্থিক অবস্থা স্থায়িভাবে দৃঢ় রাখিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কমিশনারগণের এক স্পেশাল কমিটি গঠন করা হউক।

(খ) বাজেট বর্ণনায় উল্লিখিত বিভিন্ন দফার ব্যয় সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে উক্ত কমিটিকে নির্দ্দেশ প্রদান করা হউক এবং প্রত্যেক দফায় কি পরিমাণে ব্যয়-সঙ্কোচ করা সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে কমিটিকে বিস্তৃতভাবে তাঁহাদের মন্তব্য প্রদান করিতে বলা হউক।

(গ) এস্টাবলিশমেণ্ট বাবদের ব্যয় সম্পর্কে মিতব্যয়িতার সম্ভাবিত সকল পন্থা পর্য্যালোচনা করিতে কমিটিকে বলা হউক। কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমান সংখ্যা এবং যোগ্যতার প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়া কত কর্ম্মচারীর দ্বারা কাজ চালানো যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কমিটি বিবেচনা করিবেন। এই সম্পর্কে মাহিনার হার, ছুটী, এলাউয়েন্স এবং (১) যাতায়াতের ভাড়া, (২) পোর্ট কমিশনারের কোয়ার্টার্স প্রদানের সর্ত্ত, (৩) ছুটীর নিয়মাবলী, (৪) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ করার জন্য এলাউয়েন্স ও ছুটীর এলাউয়েন্স, (৫) খোরাকী ভাতা এবং (৬) স্ত্রী প্যাসেজ প্রভৃতি বিষয়ে কমিটি বিবেচনা করিবেন। বিভিন্ন

পদে ভারতীয় নিয়োগ এবং চাকুরীতে বিশেষ হইতে লোক গ্রহণ বন্ধ মিতব্যয়িতার দিক্ হইতে কিরূপ স্বাস্থ্যকর হইবে, কমিটি তাহাও দেখিবেন।

(খ) কমিটি এই সম্পর্কে আরও কোন বিষয় পরীক্ষা করা প্রয়োজন বিবেচনা করিলে তাহা করিবেন এবং শেষ রিপোর্ট দাখিল করিবার পূর্ব্বে বিভাগ হিসাবে বা অন্য কোনভাবে পেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ব্যবসাবাণিজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরায় উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত বড় বড় কাজ স্থগিত রাখা হইবে কি না, কমিটি তৎসম্বন্ধেও বিবেচনা করিবেন।

(ঘ) ছয় জন কমিশনার ও চেয়ারম্যানকে লইয়া কমিটি গঠন করা হউক।

(ঙ) কমিটির সভায় যোগদানের জন্য কমিটির সদস্যগণকে কোন 'ফী' প্রদান করা হইবে না।

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে ;—

মিঃ এস, ডি ম্যাডষ্টোন, মিঃ কে, ষ্টীডকে, মিঃ এন পিয়ার্স, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত কি, এল মেটা, শ্রীযুত এস, কে, রায়চৌধুরী ও চেয়ারম্যান।

দেশী কোম্পানী ধ্বংসের চেষ্টা

ঢাকার "পাইয়োনীয়ার মোটর বোট" নামক একটী দেশীয় ষ্টীমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইবার পর, ঐ কোম্পানীর উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য এক্সচেঞ্জে ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী ও রিভার্স ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী নামক বিলাতী ষ্টীমার কোম্পানী তাঁহাদের ভাড়ার হার অত্যন্ত হ্রাস করেন। পাইয়োনিয়ার মোটর বোট কোম্পানী কিছুদিন পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ "ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীম ভেসল্‌স্" আইনের ৪৪ক ধারা অনুসারে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেন। তদনুসারে ভারতসরকার স্যর বি, এন শর্ম্মা, মিঃ ভব্লিউ পার্সনস্ ও মিঃ এ, ক্যাসেল্‌স্ এই তিনজন সদস্য লইয়া এই ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। স্যর বি, এন, শর্ম্মা, এই কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতী ষ্টীমার কোম্পানী দুইটীর প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া-হ্রাসের উদ্দেশ্য যে স্বদেশী মোটর বোট কোম্পানীর উচ্ছেদ-সাধন, ইহা কমিটী স্বীকার করিয়াছেন। কমিটী প্রতি যাইলের ভাড়া ৩১ পাই ধার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এখন এই বিলাতী ষ্টীমার কোম্পানী দুইটী কি বলিতে চাহেন? বিদেশীদের অবৈধ প্রতিযোগিতার ফলেই আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের অনেক প্রচেষ্টা ধ্বংস হইয়াছে। যাহাতে এরূপ অবৈধ প্রতিযোগিতা না চলিতে পারে তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(শকাব্দের—ঢাকা)

ঢাকা হাসপাতাল মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট

ঢাকা হাসপাতাল মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সুবৃহৎ ও নিজস্ব হাসপাতাল-গৃহটি এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। হাসপাতালটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম, এবং গর্ব্ব অনুভব করিলাম। দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় লোকের কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়া উন্নতি লাভ করিতেছে, অর্থশালী হইয়া নিজেদের একটি বৃহৎ হাসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছে দেখিলে আনন্দ হয়। হাসপাতালের গৃহগুলি প্রশস্ত এবং আলো ও বাতাসপূর্ণ। স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে হাসপাতাল গৃহটী যে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হাসপাতালে ১০০ রোগী একই কালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে এই রকম ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের জন্য ৫০টি বেড্ আছে। এ ছাড়া মেয়েদের জন্য খুব কম টাকা দিয়া পেয়িং ওয়ার্ডও একটি খোলা হইয়াছে। অস্ত্রোপচার গৃহ, প্রসব গৃহ প্রভৃতি সবই অতি সুন্দর এবং ছেলেদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। ইন্‌ষ্টিটিউটের বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ রমারঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। আমরা হাসপাতাল ইন্‌ষ্টিটিউটের উন্নতি কামনা করি।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

জোতদার ও প্রজাসমিতি

বাহারবন্ধের জোতদার ও প্রজাসমিতির নেতৃত্বে রঙ্গপুরের নানাস্থানে সার্টিফিকেট এবং জমির সেটেলমেণ্ট বন্ধ রাখিবার জন্য জোতদারগণের সভাসমিতি হইতেছে। বিগত ১৬—৫—৩১ তারিখে রাণীগঞ্জে বাবু বিপিনবিহারী সাহার গৃহপ্রাঙ্গণে যে সভার অধিবেশন হয়, নিম্নে উহার প্রয়োজনীয় প্রস্তাবাবলীর মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল :

(১) এই সভা ৬—৫—৩১ তারিখে উলিপুর পাঁড়ে বাটীতে আহূত জোতদার সভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সমর্থন করিতেছেন।

(২) জোতদারগণ ভূমিকর্ষণ করেন না—প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্বের উদ্বৃত্তাংশ দ্বারাই তাঁহাদিগের কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রজা সাধারণের নিকট সাধারণতঃ চারি সনের খাজানা বাকী চলিয়া আসে। যখন তাগাদি হইবার উপক্রম হয় তখনই তাহারা তাগাদির পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাকী রাজস্বের জন্য জোতদারগণের জোতের পরিবর্ত্তে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের সাহায্যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হইলে জোতদারগণকে পথের ফকির হইতে হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ও মহারাজা বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়।

(৩) গবর্ণমেণ্ট পাঁজার ন্যায় পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া প্রজাসাধারণের রক্ষার উপায় বিধান করুন।

(৪) দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধ সেটেলমেণ্টের কার্য্য বন্ধ থাকুক, অন্যথা সেটেলমেণ্টের ব্যয়ভার বহন করা প্রজাসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইবে।

(৫) বাহারবন্ধ জোতদার সভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মুন্সী মহাশয় এই সমস্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি গবর্ণমেণ্ট ও মহারাজা বাহাদুরের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করুন।

বিগত ৬ই মে উলিপুর পাঁড়ে বাটীতে বাহারবন্ধের জোতদারগণের যে সভা আহূত হয়, উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয় :—

(১) কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সার্টিফিকেটের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, উহা বন্ধ করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

(২) দেশের আর্থিক দুর্গতির অবসান কাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধ সেটেলমেণ্টের কার্য্য বন্ধ রাখিবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক। সেটেলমেণ্টের প্রাথমিক ব্যয় বহন করা জোতদার ও প্রজাসাধারণের পক্ষে বর্ত্তমানে নিতান্তই অসম্ভব।

রঙ্গপুর জেলা রায়ত কনফারেন্স

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্ত্তমান বৎসরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভবরূপে কম হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে ফসল মারা যাওয়ায় সমগ্র বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ রঙ্গপুর জেলার, রায়তগণের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা প্রত্যেকেই জ্ঞাত আছেন। সমগ্র গাইবান্ধা মহকুমায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের জন্য অনেক রায়তের পক্ষে এক বেলার আহার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। নানাস্থানে রিলিফ কমিটি খুলিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত রায়তগণকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। অভাবের জন্য তাহা খাজানাও দেন দেওয়াই রায়তগণের পক্ষে কঠিন। তাহার উপর বেআইনী সুদ, তহরী, খরচা, খোরাকী, চেকের মূল্য, চাঁদা, প্রভৃতি দিতে হয়। এ জন্য রায়তগণের পক্ষে জীবন-ধারণ করাই একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে সমগ্র রঙ্গপুর জেলায় সেটেলমেণ্ট জরীপ আরম্ভ হইবে। তজ্জন্য রঙ্গপুর কালেক্টরীর নিকটে সেটেলমেণ্ট অফিস দ্রুতগতিতে প্রস্তুত করা আরম্ভ হইয়াছে। "উত্তর বঙ্গ জমিদার সভা" গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিয়াও জরিপ বন্ধ করিতে পারেন নাই। "রঙ্গপুর জেলাবোর্ড" ও "বাহারবন্ধ পরগণার জোতদারগণ" সেটেলমেণ্ট জরিপ বর্ত্তমান বৎসরে না করার জন্য সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত প্রতিবাদে কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। সেটেলমেণ্ট জরিপ বন্ধ করিতে হইলে সমগ্র রঙ্গপুর

জেলার রায়তগণের মিলিত ও সমবেত প্রতিবাদ প্রয়োজন।

যাহাতে রায়তগণের উপর অন্যায় উৎপীড়ন না হয়, এবং আগামী সেটেলমেণ্ট জরিপ কালে রায়তগণের কোন ক্ষতি না হয় তজ্জন্য আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারিগণ "রঙ্গপুর জেলা রায়ত কনফারেন্স" নামে একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া আগামী বর্ষা অন্তে সুবিধামত সময়ে রঙ্গপুর টাউনে প্রকাশ্য অধিবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। উক্ত স্থায়ী কনফারেন্স সেটেলমেণ্ট জরিপ সময়ে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে রায়তগণের কোনরূপ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। এই কার্য্যে সমগ্র রঙ্গপুর জেলার রায়ত ও রায়তহিতৈষী ব্যক্তিবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ, চেষ্টা ও সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়। যত শীঘ্র সম্ভব স্থানিভাবে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করতঃ রায়ত কনফারেন্সের প্রকাশ্য অধিবেশনের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যাইবে। কনফারেন্সের উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত হইল :

১। যাহাতে সেটেলমেণ্ট জরিপ বন্ধ হয় তাহার চেষ্টা করা।

২। "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" ভুক্ত জমিদারি সকলে যাহাতে দাটিফিকেট নালিশ বন্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করা।

৩। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যাহাতে জমিদারগণ সুদ আদায় স্থগিত করেন, তাহার ব্যবস্থা করা।

৪। সর্ব্বপ্রকার বেআইনী আবোয়াব, তহরী, খরচা, চাঁদা, খোরাকী প্রভৃতি প্রদান করা একেবারে রহিত করিয়া দেওয়া।

৫। গভর্ণমেণ্ট, জেলা বোর্ড এবং জমিদারগণ কর্ত্তৃক অভাবগ্রস্ত রায়তগণকে একালীন সাহায্য এবং বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করা।

৬। প্রজার স্বত্ব ও অধিকার রক্ষাকল্পে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও সাহায্য করা।

৭। সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে যে যে ধারা রায়তগণের ক্ষতিজনক তাহার পুনঃ সংশোধনের চেষ্টা করা।

৮। রায়তগণের অভাব অভিযোগ প্রতীকারের জন্য কনফারেন্সের মুখপত্র স্বরূপ সাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশ করা।

(স্বাক্ষর) শ্রীশুকানন বর্ম্মণ, (রায় সাহেব)
এম্, এ, বি, এল, এম্ বি, ই, এম্, এল, সি।
হাজী সাহ আবদুল হাকিম বি, এল,
(চেয়ারম্যান, রঙ্গপুর সদর লোকাল বোর্ড)
শ্রীক্ষেত্রনাথ সিংহ বি, এল।
সাহ আবদুল কাদের বি, এল।
হাজী সফীউদ্দীন আহম্মদ বি, এল।
রইছউদ্দীন আহম্মদ বি, এল।
মহম্মদ আলি বি, এল।
কাজী শেখ রিয়াজউদ্দীন বি, এল।
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু
(ম্যেনেজার, রঙ্গপুর সদর লোকাল বোর্ড,
অস্থায়ী সম্পাদক, "উত্তম ভবন" রঙ্গপুর)।

নারীর উত্তরাধিকার

মহীশূরের ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের ভোটে হিন্দু আইন সংস্কার করিয়া স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারের দাবী বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। উত্তরাধিকারসূত্রে নারী কি অবস্থায় কি ভাবে মৃত স্বামী বা আত্মীয়স্বজনের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন, তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

তথাপি এই সংবাদে আমার কথা এই যে, দেশের জনমত অতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের পুরুষগণ, উত্তরাধিকার সম্পর্কে নারীর অধিকার অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতেছেন। বাঙ্গালার রায়তাগে হিন্দু নারীর অধিকার অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এক শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—কিন্তু সমাজের প্রবল আপত্তিতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে, অদ্যাবধি বাঙ্গালায় এ বিষয় লইয়া হিন্দু আইন সংস্কারের কোন চেষ্টা লক্ষিত হয় নাই। স্ত্রী, কন্যা, বিধবা পুত্রবধূ ইহাদিগকে ধনাধিকার দিলে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহিমা

ক্ষুণ্ণ হইবে, সম্পত্তি বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে, এই শ্রেণীর আপত্তি অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিবেচনার মধ্যে আনেন না যে, কোন হিন্দু ধনীর একাধিক পুত্র হইলেও সম্পত্তি খণ্ডবিখণ্ড হয়—এবং নানা কারণে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সম্পত্তিকে বংশগত করিয়া রাখিবার জন্য আইনের ফাঁকি দ্বারা দেনোত্তর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীও সেবাইতরূপে সম্পত্তি ভোগ করিলে সম্পত্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের আশু সংস্কার বাঞ্ছনীয়। বিধবা স্ত্রী, পতিপরিত্যক্তা এবং বিধবা পুত্রবধূ—ইহাদের পতির ও শ্বশুরের সম্পত্তিতে এবং অবিবাহিতা কন্যার পিতার সম্পত্তিতে অন্নবিত্তের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা তো চাই-ই, হিন্দু নারীর এখনই দুর্দশা যে, তাহার নিজস্ব সম্পত্তি থাকিলেও,স্বামীর ঋণের জন্য বেনামী অজুহাতে মহাজন নীলাম করিয়া লয়—হিন্দু আইন ও আদালত নারীর যৎসামান্য সম্বলও হরণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

হিন্দু সমাজে নারীর এত লাঞ্ছনা, এত অবহেলা, এত কষ্টের কারণ—তাহার আত্মীয়স্বজনের ধনসম্পত্তিতে অধিকারহীনতা। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে নারী অপারগ বলিয়া নহে, নারী বলিয়াই সে বঞ্চিতা। এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

(আনন্দ বাজার পত্রিকা—কলিকাতা)

ফল ও ফুল রপ্তানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে পণ্যদ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানির সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহার নাম এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড। সম্প্রতি এই বোর্ডের পক্ষ হইতে ডাঃ চেম্বাকে একটী বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ৩১৪০৲ টাকা। ডাঃ চেম্বা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীন ফল ও পুষ্প সম্পর্কিত অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত আছেন। এই বৃত্তি লইয়া তিনি বিদেশে গমন করিয়া ভারতের ফল কিরূপে বিদেশে চালান দেওয়া যায়, তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। বিশেষ-ভাবে আম রপ্তানির বিষয় তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

ভারতের কলা,কমলা, আনারস প্রভৃতি উপাদেয় ফল বিদেশীরা খুব পছন্দ করেন। এগুলি দূরদেশে পাঠাইতে সময় লাগে; ইতি মধ্যে তাহা পচিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঁচা বন্ধ করা যাইতে পারে। ইদানীং বিদেশী বণিকের চেষ্টায় ভারতের টাট্‌কা ফল, ফুল ও মূল ইত্যাদি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে প্রেরণের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। সুব্যবস্থা হইলে ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশের আয়ের পথ অধিকতর প্রশস্ত হইতে পারে।

বিলাতের মজুর-সঙ্ঘগুলার সভ্য-সংখ্যা

বিলাতের মজুর-সঙ্ঘগুলার সভ্য-সংখ্যা সব চেয়ে বাড়ে ১৯২০ সনে। তখন সভ্য-সংখ্যা ছিল ৮৩ লাখ ৩৯ হাজার। সভ্য-সংখ্যা হঠাৎ কমে যায় সাময়িক জিনিষ-পত্র তৈরী ক'রছিল, সেই সব কর্ম্মী সভ্য স'রে যাওয়ার দরুণ। তারপর ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত সভ্য-সংখ্যা আস্তে আস্তে ক'মতে থাকে। ১৯২৮ সন থেকে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত সংখ্যাটা মোটামুটি সমান থাকে। ১৯৩০ সনের সংখ্যা হচ্ছে ৪৮ লাখ ২৫ হাজার। ১৯২৯ সনের চেয়ে ১৪ হাজার কম। ১৯৩০ সনে পুরুষ সভ্যের সংখ্যা ৪০ লাখ ৩৪ হাজার, আর মেয়ে সভ্যের সংখ্যা ৭ লাখ ৯১ হাজার। ১৯৩০ সনে ৩১ হাজার বস্ত্র-শিল্পী সভ্য কমে ও ২৯ হাজার রেলের মজুরকে নতুন সভ্যরূপে পাওয়া যায়।

চাকুরীর মোহ বনাম ব্যবসার ঝোঁক

[জনৈক ভদ্রলোক ঘটনাচক্রে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কলিকাতায় গরম চায়ের দোকান করেন। তাঁহার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দুইবার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। মোলাকাৎ দুইটী তখন তখনই লিখিয়া লওয়া হয় নাই, স্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়াই সংপ্রতি লেখা হইয়াছে। উহার ভাষা খানিকটা অন্যরূপ হইলেও মর্ম্মটা যথাসম্ভব অটুট রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে]।

(১)

প্রঃ—আপনি এ গরম চায়ের দোকান কবে করিয়াছেন ?

উঃ—তিন চারি মাস হইল।

প্রঃ—আপনার দেশের সে কারবারটা কি হইল ? সেটা তো বেশ বড় কারবার ছিল।

উঃ—শরিকী বিবাদে মামলা-মোকদ্দমায় সে সব গিয়া।

প্রঃ—সে কারবারের কি অন্য অংশী ছিল ?

উঃ—না, কারবারটা আমার নিজেরই ছিল, তবে আমার দুইজন বিধবা ভ্রাতৃবধূ তাঁদের বাপের বাড়ীর লোকের পরামর্শে নানারূপ মামলা মোকদ্দমা করেন। শেষটা আমার এক শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার দ্বারা একটা আদালী খরচসূদে অনেকগুলি টাকার দাবীতে এক মিথ্যা মামলা করাইয়া আমার বিরুদ্ধে গোপনে এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করান। ঐ ব্যক্তি হঠাৎ একদিন কোর্টের লোক সহ আসিয়া আমার বাড়ীঘর ও দোকান হইতে আমাকে উচ্ছেদ করে।

প্রঃ—আপনি পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না ?

উঃ—এ মামলার সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না।

প্রঃ—আপনি ছানির (ডি-ক্রিয়ারিং) মামলা করিলেন না কেন ?

উঃ—তা কি আর করি নাই ? কিন্তু সময়ের মন্দ হইলে সত্যেরও জয়ের সম্ভাবনা থাকে না, অন্ততঃ এখনকার আদালতে তো নহেই।

প্রঃ—"এখনকার" না বলিয়া "এযানকার" বলিলেই বোধ হয় কথাটা সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইত।

উঃ—হাঁ, জগতে সত্য পদে পদেই পরাভূত হয় দেখিতে পাই। এবার শুধু দেখা নয়, সে তথ্যটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলাম এবং মামলাটী নিছক মিথ্যা। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, আমার স্ত্রী রান্না চাপাইয়া-ছেন, ছেলেপিলেরা খাবার জন্য ব্যস্ত, এইরূপ সময়ে আমি আমার নিজের বাড়ীঘর হইতে ছেলেপিলের সহিত কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হইলাম। এইত জগৎ, আর এইত বিচার !

প্রঃ—ছানির মামলায় হারিয়া আর কোন মামলা করেন নাই কি ?

উঃ—হাঁ করিয়াছি। অনেকগুলি টাকার দাবীর উপরে কোর্ট ফি ইত্যাদি দিতে একেবারে নিঃস্ব হইয়াছি। এখন না পারিতেছি মামলা চালাইতে, না পারিতেছি ছেলেপিলেকে খাওয়াইয়া বাঁচাইতে।

প্রঃ—এ চায়ের দোকান এখন কে চালাইতেছেন ? চাকর তো একজনও দেখিতেছি না।

উঃ—চাকর আর কিরূপে রাখি বলুন। বড় ছেলেটীর

সহায়তার নিজেই চালাইতেছি। এই যে ছেলেটী আসিতেছে।

প্রঃ—কটি ছেলে! এর বয়স কত? স্কুলে যায় না?

উঃ—দশ বছরে পা দিয়াছে। স্কুলে আর কিরূপে পাঠাই বলুন।

প্রঃ—আপনার কিন্তু মনের বল সাংঘাতিক। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি নিজের গাড়ীঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন। আর আজ আপনি নিজের হাতে সবাইকে চায়ের পীরিচ পেয়ালা দিতেছেন! শুধু নিজে নয় ছয়পোষ্য শিশুর দ্বারাও সেই কাজ করাইতেছেন! অনেকের পক্ষেই ইহা অসাধ্য। আমি লক্ষ্য করিলাম আপনার খরিদ্দারগণ আপনার সঙ্গে সম্ভ্রমসূচক "আপনি" কথাটিও বলে না। আর আপনি বেমালুম তা হজম করিয়া যাইতেছেন!

উঃ—(বিমর্ষভাবে হাসিয়া) ওর জন্য আমি দুঃখিত নই। কারণ আমি ঠিক জানি, যদি এই দোকানকেই ফাঁকাইয়া তুলিতে পারি এবং বেতন দিয়া দু'জন লোক রাখিয়া নিজে চেয়ারে বসিয়া শুধু ক্যাশ কলেক্ট করিতে থাকি, তখন সবাই বাধ্য হইয়া "আপনি" বলিবে।

প্রঃ—আপনার কে একজন আত্মীয় না এখানে বেশ বড় চাকুরে আছেন?

উঃ—হাঁ, শ্বশুর—তিনি ৪৫০ টাকার বেতনে সরকারী চাকুরী করেন?

প্রঃ—তিনি কোন সাহায্য করেন না?

উঃ—হাঁ, পরিবার ছেলেপিলে তার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে সাহায্য না করিয়া উপায় কি? কিন্তু আমি তা খুব পছন্দ করি না। আমার স্ত্রীও তা চান না। তবে তিনি উপযাচক হইয়া মাঝে মাঝে এটা-ওটা দ্বারা সাহায্য না করেন তা নয়।

প্রঃ—আপনার শ্বশুর বাড়ী কোথায়?

উঃ—এই—খুব কাছেই।

প্রঃ—সে বাড়ীর কেউ এখানে আসিয়া পড়িলে আপনি নিশ্চয়ই লজ্জা পাইবেন।

প্রঃ—শ্বশুর এ পথে কখনো আসেন না, তবে সেদিন ভালমানুষকে গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম।

প্রঃ—শ্বশুর আপনার কোন চাকুরী করিয়া দিতে পারেন না কি?

উঃ—হাঁ, তা পারেন এবং করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেনও। কিন্তু আমি তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি এবং সে বাড়ীর সবাই আমার উপরে চটিয়াছেন।

প্রঃ—কেন আপনি চাকুরী নিলেন না?

উঃ—দেখুন, আমার নিজের কারবারে ২০।২৫ জন লোক খাটিত। চাকর রাখিয়াছি ছাড়া কোন দিন চাকর হইয়া দেখি নাই—সে অবস্থাটা কেমন। ও আমার ধাতে সইবে না। আমরা ব্যবসায়েতের ছেলে। আপনাদের যেমন ব্যবসার উপরে, আমাদের তেমনি চাকুরীর উপরে জন্মগত ঘৃণা বর্ত্তমান। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে গিয়া কোন কাজকেই ছোট বা অপমানজনক বোধ করার মনোবৃত্তি এখনো আমাদের অনেকের ভিতরেই ঢোকে নাই। সেই রক্তগত সংস্কারের বশেই আমি যা অনেকটা স্বাভাবিক মনে করিয়া করিতে পারিতেছি, আপনি তারই ভিতরে অসাধারণ মনের বল দেখিতে পাইতেছেন।

প্রঃ—কিন্তু আপনার শ্বশুরও ব্যবসায়ী জাতেরই ছেলে। তিনি তো নিজে চাকুরী করেন এবং আপনাকেও চাকুরী করিতে বলেন।

উঃ—তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর বাপ ছিলেন একজন হোমড়া চোমড়া রাজকর্ম্মচারী ও উপাধিধারী। আর শ্বশুরও সেকালের গ্রাজুয়েট—রিটায়ার করিবার সময় হইয়াছে। তিনি কেন চাকুরী পছন্দ করিবেন না? যে ব্যাধিতে আপনারা ভুগিতেছেন, তিনিও সেই ব্যাধিতেই আক্রান্ত। আর আমার পিতামহ ছিলেন একজন পাকা ব্যবসায়ী। তখনকার দিনে চীনাবাজার বড়বাজার অঞ্চলে সবাই তাঁর নাম জানিত। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করিতেন। এখনও সে কারবারটা ঠাকুরদাদার নামেই চলিতেছে;

কিন্তু তাঁর কোন কর্ম্মচারীর বংশধরেরাই তা ভোগ করিতেছে।

প্রঃ—কিরূপে?

উঃ—আমার পিতা নাবালক থাকিতে ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। সেই সুযোগে নানা কৌশলে সাহায্যে তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়। বৃদ্ধ লোকদের মুখে ঠাকুরদাদার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া স্বপ্নের মত মনে হয়। শুনিয়াছি কলিকাতার একজন স্বনামধন্য (অধুনা মৃত) ব্যবসায়ী প্রথম জীবনে ঠাকুরদাদার দোকানে সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। পরজীবনে তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেসব কথা বলিয়া আর লাভ কি?

প্রঃ—থাক্, অসব কথা স্মরণ করাইয়া আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। এ দোকানের আয়ে কি আপনার বর্ত্তমান খরচ চলিয়া যাইতেছে?

উঃ—না।

প্রঃ—তবে কি ধার হইতেছে?

উঃ—ধারই বা কে দিবে? যার কিছু আছে সে ধার পায়। আমার যে কিছুই নাই। স্ত্রীর অনেকগুলি গহনা ছিল—শ্বশুরই বিবাহের সময়ে এক শ' ভরি সোনার গহনা দিয়াছিলেন, তারপরে আমিও যথেষ্ট দিয়াছিলাম, সে সব গিয়াছে। শেষে "পিত্তি রক্ষা"র মত আট গাছা একজিবিশন চুড়ী—ঐ যার নীচে তামা দেওয়া থাকে—তাই কিনিয়া দিয়াছিলাম, তাও কিছুদিন পূর্ব্বে বন্ধক রাখিয়া বাড়ী ভাড়া দিয়াছি। এখনো ২ মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী। দোকান ভাড়াও দুই মাসের বাকী পড়িয়াছে।

প্রঃ—বাড়ী ভাড়া কত দেন? দোকান ভাড়াই বা কত?

উঃ—একতলার একটি কোঠা ৯৲ টাকায় ভাড়া নিয়াছি। আর দোকান ভাড়া ১৮৲।

প্রঃ—নীচের তলায় একটী ছোট কোঠায় চিরকাল সুখে পালিত ছেলেপিলে নিয়া বিশেষ অসুবিধা হইতেছে নিশ্চয়। আপনার স্ত্রীও ত অন্যাবধি কখনও এরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত নন।

উঃ—কি আর করি বলুন। মানুষ অবস্থার দাস।

প্রঃ—এতে স্বাস্থ্যহানিরও সম্ভাবনা আছে।

উঃ—তা তো আছেই—কিন্তু উপায় কি?

প্রঃ—আমার মনে হয় আপনার একটা চাকুরী গ্রহণ করা ভাল। আপনার শ্বশুর নিশ্চয়ই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি অভিজ্ঞ লোকও বটেন। তাই সব দিক্ বিবেচনা করিয়াই তিনি ওরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন।

উঃ—চাকুরী সম্বন্ধে আমার মনোভাব তো পূর্ব্বেই আপনার কাছে প্রকাশ করিয়াছি। তা ছাড়াও, আমার যা বিদ্যা তাতে একটা ৩০৲ টাকার চাকুরী পাওয়াও সম্ভব নয়। ধরুন যেন শ্বশুরের সুপারিশে একটা ৩০৲ টাকার বা ৪০৲ টাকার চাকুরীই পাইলাম; তাতেই বা কি লাভ হইবে? এতগুলি লোকের আধপেটা খোরাকের বেশী কিছু তাহাদের সংগ্রহ করা যাবে কি? আমার পরিবার খুব ছোট নয়, ৬ জন লোক। মেয়ের বিয়ে দিতে হইবে। ৪০৲ টাকায় তা হওয়া অসম্ভব। আমার কারবারে ৩০।৩৫ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী কয়েকজন ছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা কি ছিল তাতো আমার অজানা নাই। না মহাশয় চিরকাল আধপেটা খাইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই যে সেদিন কিছুই না খাইয়া—থাক—কথাটা এই যে—

প্রঃ—আপনি উত্তেজনার মুখে অনভিপ্রেত কথা বলিয়া ফেলিতেছিলেন।

উঃ—"অনভিপ্রেত"!—হাঁ "অনভিপ্রেত" ত নিশ্চয়ই। নিজের দুরবস্থার কথা অন্যের নিকটে বলিয়া অনর্থক তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া কিছুতেই অভিপ্রেত হইতে পারে না।

প্রঃ—যে ভাবেই হউক আপনি কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যদি আপনার নিজের দিক্ থেকে বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে তবে যা বলিতে যাইতেছিলেন বলুন। কারণ আপনাকে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করিবার মত কিছু পাইতে যাইতেছি বলিয়া মনে হয়।

উঃ—আমি বলিতেছিলাম এই যে, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া বর্ত্তমানের উপবাসকেও হাসি মুখে অগ্রাহ্য করা চলে; কিন্তু যার ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মতই মলিন, সেরূপ সামান্য বেতনের দীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে মাথা ঢুকাইবার চিন্তাতেও আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়।

প্রঃ—যদি অনুমতি হেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

উঃ—অবাধে যা খুসী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

প্রঃ—সেদিন আপনার স্ত্রী ও ছেলেপিলেদেরও বোধ হয় আহার জোটে নাই।

উঃ—বেলা ১২টা পর্য্যন্ত তারা কিছুই খাইতে পাইয়াছিল না বটে, কিন্তু ঐ সময়ে একটু অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিতরূপেই তাহাদের আহার জোটে।

প্রঃ—আমি বুঝিতে পারিতেছি কি করিয়া এরূপ হইল। আপনার দোকানে রোজ তো কিছু না কিছু পয়সা আমদানি হইই এবং সকাল বেলাই গরম চা বিক্রয়ের একটা সময়। এই সময়ে যে পয়সা পাইলেন তাহাদ্বারা সামান্য চাউল কেনাও কি সম্ভব হইয়াছিল না?

উঃ—আমার নগদ বিক্রয় খুব কমই। নিকটেই একটী বড় কলেজ হষ্টেল আছে, সেই হষ্টেলের ছাত্রগণই আমার প্রধান সম্বল। তারা মাসকাবারী খরিদ্দার। সারা মাস বাকীতে খায় এবং মাসান্তে হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেয়। কিন্তু কলেজ ছুটীর সময়েই আমার অত্যন্ত দুরবস্থা হয়। যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন সকাল বেলা সামান্য কয়েক আনা নগদ বিক্রয় করিয়া পাইয়াছিলাম। কিন্তু একজন পাওনাদার আসিয়া অত্যন্ত বিরক্ত করায় তাকে উহা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; এবং উপবাসী ছেলেপিলের মুখ দেখিতে সাহসী না হওয়ায় ঐ দিন দুপুরে বাড়ীই গেলাম না। আমার স্ত্রী মঙ্গলবারের উপবাস বলিয়া বাড়ীর অপর মেয়েদের নিকট ব্যাপারটা গোপন করিতে চেষ্টা করেন। বেলা ১২টার সময়ে বাড়ীর একটী ভদ্রলোক যেন কি প্রকারে আসল ব্যাপার জানিতে পারিয়া আমার স্ত্রীর নিকটে দুইটী টাকা পাঠাইয়া দেন। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহে তাদের আহার জোটে। উপবাসটা শুধু আমার উপর দিয়াই যায়।

প্রঃ—এই দোকানের কি বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবেন মনে করেন?

উঃ—এ স্থানটা ভাল নয়; আমি একটা ভাল স্থানের খোঁজে আছি। ভাল স্থান যদি পাই এবং এই মামলার ঝঞ্ঝাটটা কোনরূপে মিটিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই উন্নতি করিতে পারিব। ব্যবসার কিকির কল্পী আমার মাথায় বেশ খেলে। এই অসময়টা কোনরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই আবার সুদিনের মুখ নিশ্চয় দেখিব, সে ভরসা আমার আছে। যে ভাবেই হউক আমাকে আবার টাকার মুখ দেখিতেই হইবে।

প্রঃ—"যেভাবেই হউক" বলিলেন কেন?

উঃ—অবশ্য চুরি ডাকাতি করিয়া নয়, ব্যবসা দ্বারাই টাকার মুখ দেখিব। তবে সৎভাবে যদি সম্ভব হয় তো ভালই হয়, তা নাও হয়, আমি বড়লোক হইবই। অবশ্য এ ব্যবসা দ্বারা খুব বেশী উন্নতি করা অসম্ভব। অন্যরূপ ব্যবসার মতলবও আমার মাথায় আছে।

প্রঃ—ব্যবসাতে কি অসৎপথে উন্নতি হয়?

উঃ—আপনি কি মনে করেন ব্যবসা করিয়া যাঁরা বড়লোক হইয়াছেন তারা সবাই এক একটী পয়গম্বর? গণেশ উল্টানোর কথাটাও শোনেন্ নাই কি?

প্রঃ—আপনি কি তবে ঐ জাতীয় পথই অবলম্বন করিতে চান?

উঃ—দেখুন লোকে আমাকে যেরূপ অন্যায়ভাবে ও মিথ্যা দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তাতে সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া আমার পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি প্রথমতঃ যথাসম্ভব সৎভাবেই অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিব। যদি সেপথে উঠা একান্তই অসম্ভব হয়—

প্রঃ—তবে যে পথে পড়িয়াছেন সেই পথেই উঠিতে চেষ্টা করিবেন?

উঃ—মিথ্যা মামলা দ্বারা নয়, ব্যবসা দ্বারাই।

প্রঃ—কিন্তু "প্রথমতঃ যথাসম্ভব সৎভাবে" বলিলেন কেন?

উঃ—কারণ ষোল আনা সৎভাবে কোন ব্যবসাই চলিতে পারে না বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা।

প্রঃ—আপনার এরূপ ধারণার কারণ কি?

উঃ—কারণ অতীতের ব্যবসাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা।

প্রঃ—আপনার অভিজ্ঞতা শুধু আপনার নিজ ব্যবসাতেই সীমাবদ্ধ। আপনি অন্যের ব্যবসা সম্বন্ধে একথা বলিতে পারেন না।

উঃ—হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই অন্য ভাতের অবস্থা জানা যায়।

প্রঃ—"অনেষ্টি ইজ্ দি বেষ্ট পলিসি" একথা কি ব্যবসার ক্ষেত্রে খাটে না বলিতে চান?

উঃ—"অনেষ্টি" যেই "পলিসি" হইয়া দাঁড়াইল, সেই আর তাহা অনেষ্টিই থাকিল না। পলিসি হিসাবে যে সাধু হয় সে ব্যক্তি প্রকৃত সাধু নয় এবং তার আচরণকে সাধুতা বলিলে শব্দের অপপ্রয়োগ করা হয়। উহাকে সাধুতা না বলিয়া সাধুতার অনুকরণ বা ভাণ—সোজা কথায় ভণ্ডামি বলাই সঙ্গত। প্রকৃত সাধুতা অনেক উঁচু জিনিষ; বণিকবৃত্তির সঙ্গে সে জিনিষ খাপ খায় না। আপনারা আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বদেশ-প্রেমের চোখ দিয়া এবং একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখেন বলিয়াই আপনাদের নিকটে জিনিষটা সবদিক্ দিয়া খুব মনোরম বলিয়া মনে হয়। আমি ভিতরে থাকিয়া উহার বাস্তব স্বরূপ কি তা দেখিয়াছি।

প্রঃ—"দূরতাই চাকচক্যের হেতু" চন্দ্রের পক্ষে প্রযোজ্য এই কথাটা কি আপনি ব্যবসার উপরেও প্রয়োগ করিতে চান?

উঃ—নিশ্চয়ই। প্রকৃত পক্ষে কোন সৌন্দর্য্য, কবিত্ব, মহত্ব বা আধ্যাত্মিকতা বলিয়া কোন কিছুর সন্ধান ইহাতে মিলিবে না। দেশপ্রচলিত আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত না হইয়া যে কোন ফন্দী ফিকিরে যথাসম্ভব বেশী অর্থোপার্জ্জন করাই ব্যবসার একমাত্র কথা—একমাত্র আদর্শ। ইহা ছাড়া অন্য কোন কাল্পনিক আদর্শের প্রেরণায় যদি কেহ এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তবে তাঁকে অবশ্যই পস্তাইতে হইবে। হয় তাঁকে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে হইবে, নয় তো উচ্চ আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া খাঁটি ব্যবসায়ী বনিয়া যাইতে হইবে। আমি খোলা চোখে এসব দেখিয়া শুনিয়াও ধনী হওয়াকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই মরণ কামড়ে ব্যবসা ধরিয়া পড়িয়া আছি। সাধুত্ব যদি আমার জীবনের আদর্শ হইত তবে অবশ্যই পন্থান্তর গ্রহণ করিতাম।

প্রঃ—বর্ত্তমানে ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থার্জ্জন করার দিকে প্রবল ঝোঁক জন্মানো বাঞ্ছিত পক্ষেও যেমন দেশের পক্ষেও তেমনি বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উঃ—বর্ত্তমান বণিক্ সভ্যতার দিনে উপরোক্তিই ভারতে বসিয়া কে আর সে কথা অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া বণিকবৃত্তিকে বা বণিক্ সভ্যতাকে তার নিজ স্থান হইতে অথবা উর্দ্ধে বসাইয়া অনর্থক গৌরবমণ্ডিত করাও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি না।

প্রঃ—আপনি যে এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করিলেন! যে পথে হাঁটিতেছেন, নিজেই সেই পথে আবর্জ্জনা ছড়াইতেছেন!

উঃ—আবর্জ্জনা ছড়াইতেছি না তো, আবর্জ্জনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি মাত্র। নিজের বৃত্তিকে মিথ্যা করিয়া মহৎ প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে কোনরূপে ধনী হওয়া।

প্রঃ—আপনার এ বিষয়ে যেরূপ দৃঢ়তা দেখিতেছি তাতে মনে হয় আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

উঃ—হাঁ, সেই আশীর্ব্বাদই করিবেন।

প্রঃ—আশীর্ব্বাদ আপনাকে করি। কিন্তু "যে কোনরূপে"র পরিবর্ত্তে খাঁটি সৎভাবে ধনী হন এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেই অধিকতর সুখী হইতাম।

উঃ—আমাকে ক্ষমা করিবেন—অভ্যস্ত "আপনাদের

আশীর্ব্বাদে হইবে বলিয়া মনে করি না। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ—সেই মুনিঋষিগণের আশীর্ব্বাদে [illegible] হয়ত সেরূপ অর্থ হইলেও হইতে পারিত। কারণ তাতে খুব জোর আশীর্ব্বাদের দরকার (হাস্য)।

(২)

প্রঃ—অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। শুনিয়াছিলাম আপনি এই অঞ্চলে দোকান তুলিয়া আনিয়াছেন। আজ কোন কাজে এ দিকে আসিয়াছিলাম। মনে হইল একবার আপনার খোঁজ নিয়া যাই। এ দোকান কেমন চলিতেছে? আপনার নিজের এবং দোকানের চেহারা দেখিয়া কিন্তু মনে হয় আপনার অবস্থা ফিরিয়াছে?

উঃ—আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই হইতেছে।

প্রঃ—কতদিন হইল এখানে দোকান খুলিয়াছেন?

উঃ—এক বৎসরের উপর হইবে।

প্রঃ—ব্যবসার পক্ষে বেশ ভাল স্থানই পছন্দ করিয়াছেন। ঘরটীর ভাড়া কত?

উঃ—৬০৲ টাকা।

প্রঃ—লোক ক'জন রাখিয়াছেন?

উঃ—বর্ত্তমানে ৮।৭ জন আছে।

প্রঃ—এদের বেতন কত দিতে হয়?

উঃ—কাহাকেও ২৫৲ টাকা, কাহাকেও ২০৲ টাকা, কাহাকেও ১৫৲ টাকা—এইরূপ দিতে হয়। তা ছাড়া সবাইকে খোরাক দিতে হয়।

প্রঃ—এত সব খরচ করিয়াও লাভ থাকে?

উঃ—হাঁ, তা থাকে।

প্রঃ—মাসে মাসে কত টাকা লাভ থাকে জানিতে পারি কি?

উঃ—সব মাসে কিছু সমান লাভ হয় না। তবে মোটামুটি আপনাকে এই কথা বলিতে পারি যে, দোকানের সব রকম খরচ এবং আমার সংসারের খাইখরচ, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি বাদে প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে ৫০৲ এবং উর্দ্ধপক্ষে ১০০৲ টাকা জমাইতে পারিতেছি। পূর্ব্বে কিছুদিন আরও ভাল চলিতেছিল। সেভাবে চলিলে অল্পদিনেই কাজ গুছাইয়া কোন একটা বড় রকমের ব্যবসা ফাঁদিতে পারিতাম।

প্রঃ—এখন সেরূপ লাভ না হইবার কারণ কি?

উঃ—মহাত্মার আন্দোলনই তাহার কারণ।

প্রঃ—কেন, বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকে কি চা খাওয়াও ছাড়িয়া দিতেছে?

উঃ—না তা নয়, গরম চা অপেক্ষাও মাংস, চপ, কাটলেট, ইত্যাদিতেই বেশী লাভ। কাছেই কতগুলি বেতালস আছে। সেখানে রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত লোকে মদ খাইয়া আমোদ প্রমোদ করে। সেখানে খুব মাংস কাটে। মদের দোকানে পিকেটিংএর ফলে এখন আর আগেকার মত মাংস কাটিতেছে না, তাই লাভও পূর্ব্বের মত হইতেছে না।

প্রঃ—এখন আপনার খরিদ্দারগণ নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করে।

উঃ—(হাসিয়া) আমি ত বহু পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম।

প্রঃ—ভাল কথা, আপনার সে মামলার কি হইল?

উঃ—প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আপোষে ৪৫০০৲ টাকা পাইয়া মামলা তুলিয়া নিয়াছি।

প্রঃ—আপনার যেসের যে বাড়ীটা হইতে অন্যায় করিয়া আপনাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছিল, তার দামই ত অবাধে ১৫০০০৲ হাজার টাকা হইবে।

উঃ—তারও বেশী। কিন্তু কি করি? এদিকে প্রতিদিনকার খোরাক জোটে না, তার উপরে মামলা খরচ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। আর বিচারে হার জিত অনিশ্চিত। সর্ব্বস্বান্ত তো আগেই হইয়াছি। যদি হারি, তবে মামলা খরচের দায়ে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে—এই সব চিন্তা করিয়া যা কিছু পাইলাম তাই নিয়াই সরিয়া পড়িয়াছি।

প্রঃ—সেই টাকাকেই বুঝি মূলধন করিয়া এই দোকান ফাঁদিয়াছেন।

উঃ—দুই শ' টাকা মাত্র এই ব্যবসায়ে লাগাইয়াছি। বাকী সবটাই ব্যাঙ্কে রাখিয়াছি। দুঃসময়ের জন্য হাতে কিছু পুঁজি না রাখিলে কি নরক যন্ত্রণাই যে ভুগিতে হয়, তা একবার ভুগিয়া দেখিয়াছি। ব্যবসায় উত্থান পতন আছে। সুতরাং ও পুঁজিটা আমি কিছুতেই ব্যবসায়ে চালিব না। তবে ওটা থাকার ফলে আমার যে সাহস বাড়িয়াছে সেই সাহসটাকেই মূলধনরূপে খাটাইয়া বর্ত্তমান ব্যবসা চালাইতেছি। ঐ পুঁজিটার পরোক্ষ সহায়তা না পাইলে হয়ত এ ব্যবসায় এরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতাম না।

প্রঃ—আপনি বর্ত্তমানে বেশ সুখী আছেন?

উঃ—আপনার সঙ্গে পূর্ব্বের দোকান ছাড়িতে যে কথা কাটাকাটি হইয়াছিল তখনকার তুলনায় সুখী বটে, কিন্তু স্বাভাবিক সুখী এত অল্পে হওয়া যায় কি? তা যদি হইতে পারিতাম তবে তো শুভের কথামত বহু পূর্ব্বেই একটা চাকুরী গ্রহণ করিয়া ১০টা—৫টা কলম পিষিতাম।

প্রঃ—আশা করি আবার আপনার সঙ্গে যখন কথা হইবে তখন ব্যবসায় উন্নততর অবস্থা দেখিয়া আরও সুখী হইতে পারিব।

উঃ—ভগবানের কৃপা ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

"অ্যানাল্‌স্ অব্ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব্ পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স"
(জুলাই, ১৯৩১)

ধনসম্পদ্-বৃদ্ধির উপর আমদানি-শুল্কের প্রভাব

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে "আমেরিকান্ অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স" নামে ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান চর্চ্চার এক সভা আছে। গত ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল তারিখে এর পঞ্চ-ত্রিংশৎ সভার অধিবেশন হয়। অধিবেশনের স্থান ছিল—ফিলাডেলফিয়া সহরের বেলেভিউ-ষ্ট্রাটফোর্ড হোটেলে। এই বছরের আলোচ্য বিষয় ছিল—"মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি"। প্রধান আলোচ্য বিষয়টা রাজনৈতিক শোনালেও যে সব বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দেওয়া হয় তার মধ্যে ধনবিজ্ঞানের বেশ তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। বক্তৃতার বিষয়গুলাকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়: (১) জার্ম্মাণির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধ; (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোক-আমদানি-শাসনের নিয়ম-কানুন; (৩) রুশিয়ার প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি; (৪) আধুনিক আমদানি-শুল্ক-নীতি; (৫) দক্ষিণ আমেরিকার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ; ও (৬) আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা।

প্রত্যেক বিষয়েই যেটী শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা তাহার সারাংশ "আর্থিক উন্নতি"র পাঠক-পাঠিকাদের জানাতে আমাদের অভিলাষ। উক্ত সভায় ইংরেজ স্যর অর্জ্জ পেইন 'টারিফ্' (আমদানি-শুল্ক) সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা আমাদের বিশেষ ভাল লেগেছে। এইবার সেইটী নিয়েই আরম্ভ করা যাক্। স্যর অর্জ্জের বক্তব্যটা এইরূপ:—

"আধুনিক সময়ে বোধ হয় আমদানি-শুল্কের আলোচনাকেই সব চেয়ে গুরুতর জিনিষ বলা যেতে পারে। আজকাল সারা পৃথিবী একটা দারুণ বাণিজ্য-সঙ্কটে ভুগছে। প্রত্যেক দেশেই বেকারের বৃদ্ধি। দেনদাররা তাদের টাকা শুধ্‌তে বেগ পাচ্ছে। অনেক দেশের গভর্ণমেণ্টও তাদের দেনা শুধ্‌তে কষ্ট পাচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক জায়গায় বিপ্লব দেখা দিয়েছে—অনেক পুরাণো প্রেসিডেণ্টকে নামিয়ে তাঁদের জায়গায় নতুন প্রেসিডেণ্ট খাড়া করা হয়েছে। কয়েক দিন আগে স্পেনে আমরা এক রাজার রাজ্য-বিচ্যুতি দেখেছি। ভারতে ও বার্ম্মায় বিপ্লব-আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। এই সব আন্দোলনের গোড়ায় গেলে আমরা দেখ্‌তে পাবো যে, এদের প্রধান কারণ হচ্ছে বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা। জগতের প্রত্যেক দেশেরই আর্থিক অবস্থা আজ শোচনীয়। কেবল ফ্রান্সই এই অবস্থার বাইরে। কিন্তু ফ্রান্সও বেশী দিন সেরূপ থাকবে মনে হয় না।

নানা জাতির আর্থিক দুর্দ্দশা

আজকাল এই যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার গুরুতর অন্তর্নিহিত কারণ না থেকেই পারে না। প্রত্যেক দেশেরই এই দুর্দ্দশা কেন? দেনদাররা তাদের দেনা শোধ ক'রতে বেগ পাচ্ছে কেন? কোথাও কারুর উপর কোন বিশ্বাস যেন নেই। ভয়ের প্রভাবে সারা জগৎ এখন যেমন ভুগ্‌ছে, আর কখনও তেমন ভোগে নি। ভবিষ্যতের

ভয়, বর্ত্তমানের ভয় সারা মানব-জাতিকে পেয়ে বসেছে। কেউই নিজের পথ দেখতে পাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে যে, কয়েকটা মৌলিক গুরুতর কারণের অস্তিত্ব না থাকলে এই অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারতো না। ইয়োরোপীয় যুদ্ধকে আজ আমরা ১২।১৩ বছর পেছনে ফেলে এসেছি। মহাযুদ্ধের জন্য বাণিজ্য-জগতে যে ওলট্‌পালট্ দেখা দিয়েছিল, তা এত দিনে সেরে যাবে আর এত দিনে পৃথিবী তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে এটা আশা করা অসঙ্গত হ'ত না। কিন্তু তা হয় নি কেন?

মহাযুদ্ধের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিরাকরণের জন্য দুনিয়া উপযুক্ত ঔষধই লাগাচ্ছে, না ভুল ঔষধ লাগিয়ে গুরুতর অবস্থাকে আরও গুরুতর ক'রে তুলছে? এই প্রশ্ন আজ আমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে। যে কেউ ১৯১৪ সন থেকে ঘটনা-পরম্পরার আলোচনা ক'রবেন, বিশেষতঃ গত ১২ বছরের ঘটনাগুলা লক্ষ্য করবেন, তাঁর এই ধারণা না হ'য়েই পারে না যে, ঠিক ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা মোটেই হয় নি। মহাযুদ্ধের সময় ত আমরা জানতামই যে আমরা ভগবানের বিরুদ্ধে, সারা দুনিয়ার আইন-কানুনের বিরুদ্ধে, ও যা কিছুতে ঐশ্বর্য্য বাড়ে সে সবেরই বিরুদ্ধে ছুটছিলাম। কিন্তু সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। যে সব জাতি যুদ্ধে লাগে তাদের আর কোন চিন্তা থাকে না, যুদ্ধে জয় লাভ করাই তাদের সকল চিন্তার সেরা হ'য়ে দাঁড়ায়।

আমাদের মধ্যে যে সব লোকের যুদ্ধের টাকা জোগানো কাজ ছিল, তারা জানতো যে যুদ্ধ শেষ হ'লেই জগৎকে তার বোকামির দাম পুরামাত্রায় দিতে হবে। বারোটী বছর ধ'রে আমাদের শাস্তিভোগ, দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধ-ঘোষণা-রূপ আমাদের অভূতপূর্ব্ব বোকামির ফলাফল ভোগ, দিছিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা সেই শাস্তি ভোগ ক'রছি। গত বারো বছর ধ'রে দুনিয়া এগুতে পেয়েছে অভূতপূর্ব্ব ঋণ-সৃষ্টি ক'রে। যদি কোন লোকের দুরবস্থা হয়। তার সুনাম থাকলে সে টাকা ধার ক'রতে পারে। আর, যতদিন সে ধার ক'রতে পারে ততদিন সে এক প্রকার বাহ্য ঐশ্বর্য্যও ভোগ ক'রতে পারে। কিন্তু—এমন সময় আসবেই, যখন তাকে তার ধারের টাকা ফেরৎ দিতে হবে। এখন সেই সময় এসেছে, যখন সারা দুনিয়াকে তার ধারের টাকা ফেরৎ দিতে হবে, মহাযুদ্ধের সময় যে সব ধার করেছিল সেই সব টাকা উত্তমর্ণের হাতে তুলে দিতে হবে।

একটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা এই—এ কথাটা আমাকে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে—পৃথিবী এতটা ঋণে ডুবেছে যে ঋণ-শোধ দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমান দুনিয়ার ঋণের যে পরিমাণ তা শোধ দেওয়া অসম্ভব। এই ঋণ যেটানো অনেকটা সম্ভবপর হ'ত, যদি উত্তমর্ণ-জাতিগুলা ঋণ-ফেরৎ নিতে রাজী থাকতো, আর অধমর্ণ-জাতিগুলাকে ঋণ শোধ দিতে সাহায্য ক'রতো। আমি এ কথাটা শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেই বলছি না, কিন্তু উত্তমর্ণ জাতিগুলা সম্বন্ধে সাধারণভাবেই বলছি, যে তারা চায় না যে অধমর্ণজাতিগুলা তাদের ঋণ শোধ দিয়ে দেয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, তারা বরং এই ঋণ শোধের পথে নানা বাধা সৃষ্টি করেছে। তার ফলে দুনিয়া ডেউলে হচ্ছে। উত্তমর্ণরাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হচ্ছে। যে অবস্থার আমরা সম্মুখীন হচ্ছি এটাকে দুনিয়াব্যাপী ডেউলের অবস্থা বল্লেও চলে।

এই আর্থিক অবস্থার ফলে রাজনৈতিক ওলট্‌পালট্ দেখা দেবে কি? প্রশ্নের ঠিক উত্তর কে দিতে পারে?

দেনদারদের সঙ্কট

জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কাররা, যাঁরা এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ, তাঁরা বলছেন যে, যদি আমরা বিনা কিন্তে ঠিক পথটা এখনও না নিই, দুনিয়াব্যাপী ক্রেডিটের ভূমিসাৎ কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। অবস্থাটা সত্যিই বিপজ্জনক ও জটিল। 'ক্রেডিটের' ভূমিসাৎ বা ধ্বংস হওয়া মানে কি? সাধারণ লোকের কাছে এর কোন মানে নেই। 'ক্রেডিটের' ধ্বংস হওয়া বা না হওয়ার ফলাফলটা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর এই—জগতের খাদ্য, কাঁচা মাল ও অন্যান্য পণ্য ধারের (ক্রেডিট) সাহায্য চলাচেলা করে। সকালে তুমি তোমার প্রাতরাশটী খাও। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে কি ক'রে? সম্ভব হচ্ছে কেবল এই কারণে যে,

একজন শস্যকে চাষীর হাত থেকে মিলওয়ালার হাতে, মিলওয়ালার হাত থেকে রুটিওয়ালার হাতে, ও রুটিওয়ালার হাত থেকে তোমার হাতে যাবার জন্য ধার দিয়েছে। যদি ধার দেবার যন্ত্র বিকল হয়, তবে সকালে তোমার সামনে রুটি আসবে না, তোমাকে ক্ষুধায় ভুগতে হবে। জগতের প্রত্যেক সহরকেই এই রকম বিনা-আহারে থাকতে হ'তে পারে। কাজেই ধার বন্ধ হওয়া বা ধারের যন্ত্র বিকল হ'তে দেওয়া চলতেই পারে না।

ধারের এই প্রভাব কেন? একথা বুঝতে গেলে জিনিষপত্রের দাম দেওয়া হয় কি ক'রে তা বুঝতে হবে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত, তাঁরা জানেন কি ক'রে জিনিষপত্রের দাম দেওয়া হয়। আপনারা জানেন যে, চাষীকে তার শস্যের দাম দেওয়া হয় তার ক্ষেত্রে, না হয় এলিভেটারে'—যেখানে শস্য গুদামজাত করা হয়। যে ব্যবসায়ী শস্য কেনে সে দাম দেয় কি ক'রে? তার নগদ টাকা নেই। সে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিয়ে চাষীকে টাকা দেয়। যে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সে ধার করে, সেই ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার করে, এই রকম ক'রে এ ওর কাছ থেকে, সে তার কাছ থেকে ধার নিয়ে সারা জগতের শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য চালাচ্ছে। সারা আর্থিক দুনিয়াটাই এই রকমে ধারের ওপর চ'লছে।

সারা দুনিয়ায় আজকাল ধার দেওয়া নেওয়ার যে বিপুল যন্ত্র খাড়া করা হয়েছে, মহাযুদ্ধের সময় তা একেবারে তেঙ্গেচুরে যায়। এই তেঙ্গেচুরে যাওয়ার মানে কি, তার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। মহাযুদ্ধের প্রথম ২।১ মাস জগতের মাল চলাচল একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়াছিল। লণ্ডনের বড় বড় 'অ্যাক্সেপ্টিং হাউস' সক্রপক্ষদের কাছ থেকে (এবং সমগ্র ইয়োরোপের কাছ থেকেও) তাদের পাওনা টাকা আদায় করতে পারছিল না, কাজেই তারা নিজেদের দেনার টাকাও দিতে পারছিল না। তাদের মধ্যে আটটীর অবস্থা একেবারে সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল। মহা-যুদ্ধের আগের এক পক্ষে বিলাতে বিল 'ডিস্কাউন্ট' করা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া, নতুন বিলও কেউ লিখতো না। এ সমস্ত গোলমাল দূরীভূত হ'ল, যখন যে সব বিলাতী বিলের টাকা শোধ দেওয়া হয়নি, সেগুলার দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার ক'রে নিলেন।

এতেও সমস্যার সমাধান হ'ল না, কারণ বিলাতের সরকার নতুন বিলগুলার দায়িত্ব নেন নি। কাজেই 'অ্যাক্সেপ্টিং হাউস'গুলা বিনা দ্বিধায় নতুন বিলগুলার দায়িত্ব নিতে ইতস্ততঃ ক'রছিল। এই বাধাটা দূর করা হ'ল এইভাবে। যে সমস্ত বিল যুদ্ধের সময় বিলাতের ওপর টানা হবে তার জন্য দায়িত্ব বিলাতের সরকার, যুদ্ধ যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন ও তার পরেও এক বছরের জন্য, স্বীকার ক'রে নিলেন। সাধারণ অবস্থায় এই দায়িত্বের মানে দাঁড়াতো, প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটি ষ্টার্লিং দামের বিলের ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া। যাই হোক্, যখন ঐ দায়িত্ব বিলাতের সরকার নিজের ঘাড়ে নিলেন, তখন 'অ্যাক্সেপ্টিং হাউস'গুলা নতুন নতুন বিলের দায়িত্ব কাঁধে নিতে রাজী হ'ল। তার ফলে মালপত্র আবার দেশ হ'তে দেশান্তরে যাওয়া-আসা সুরু ক'রলে। বিলাতের 'অ্যাক্সেপ্টিং হাউস'গুলার ওপর আবার বিল 'টানা' সুরু করা হ'ল, 'ক্রেডিটের' পুনঃস্থাপন হ'ল। দুনিয়াটাও একটা দারুণ দুর্দশার হাত হ'তে মুক্তি পেলে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় দায়িত্ব ঘাড়ে নেবেন কে? এখন করা যায় কি? জগৎকে দারুণ দুর্দশার হাত হ'তে বাঁচাতে হ'লে এখন সবচেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে, জগতের সব গবর্ণমেণ্টগুলার একত্র জড় হওয়া এবং এই বর্ত্তমান সঙ্কট হ'তে ত্রাণ পাবার জন্য কি করা উচিত সে বিষয়ে বিনা বিলম্বে জল্পনা কল্পনা সুরু করা।

আমরা বর্ত্তমান বিপজ্জনক অবস্থায় পড়লাম কি ক'রে? কি ক'রে এই অবস্থার সৃষ্টি হল। আগেই বলেছি, জগৎ বিপুল পরিমাণ ঋণের সৃষ্টি করাতেই এই অবস্থার সৃষ্টি। এমন কি এই যুদ্ধরাষ্ট্রের আপনারা অনেক ঋণ করেছেন। আপনারা যদি যথেষ্ট পরিমাণে মাল-পত্র বিক্রী ক'রতে না পারেন, তা হ'লে সেই ঋণ শোধ দেওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব।

১৯১৪ সন পর্য্যন্ত মার্কিণ ব্যাঙ্কারদের মোট পুঁজি ছিল ৪০০ কোটি ষ্টার্লিং। এর বেশী তাদের টাকা ছিল

না, কাজেই এর বেশী তারা ধারও দিতে পারতো না। কিন্তু গত বছর মার্কিণ ব্যাঙ্কারদের এত টাকা বেড়েছিল যে, তারা ১৪০০ কোটি ডলার পর্য্যন্ত ধার দিতে পারতো। তার ফলে আপনাদের চাষী, জমিদার ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক অনেক টাকা ধার করবার সুযোগ পেলে। ফলে তাদের ঋণও খুব বাড়লো। এইজন্য অন্য দেশের লোকদের যেমন বিপদ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের বিপদ তার চেয়ে কম নয়। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করা খুবই দরকার, যার ফলে দেনদার তাড়াতাড়ি হোক্ বা দেরী ক'রেই হোক্, তাদের সব দেনা চুকিয়ে দিতে পারে।

বাণিজ্য-বৃদ্ধির ফলে সমৃদ্ধি-লাভ

এই উদ্দেশ্য লাভ ক'রতে হ'লে কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? প্রস্তাবিত উপায়টী ঠিকভাবে বোঝাবার জন্য আপনাদের শত এক শতাব্দীর দিকে ফিরে চাইতে বলি—কি রকমে দুনিয়া অথবা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার বর্ত্তমান ধনসম্পদ অর্জ্জন করেছে? একশো বছর আগে আপনারা ছিলেন একটী ক্ষুদ্র জাতি, আপনাদের অবস্থাও ছিল নিতান্ত দরিদ্র। কিন্তু একশো বছরে আপনারা ১২ কোটি লোক-সংখ্যা-ওয়ালা একপ্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হয়েছেন, আপনাদের ধনসম্পদ্ আরও প্রচুর। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল?

আপনাদের দেশের আজ যে শ্রীবৃদ্ধি তা সম্ভব হ'ত না, যদি আপনারা বিদেশের লোককে প্রাণ খুলে ডেকে নিয়ে আপনাদের দেশে তাদের বসতি-স্থাপন ক'রতে না দিতেন। সাগরের ওপার হ'তে আগত লোকদের আপনারা সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তাদের আসা আপনারা সহজ করেছিলেন, তাদের আপনারা চাষের জন্য বিস্তীর্ণ জমি দিয়েছিলেন, এক কথায় লোকের আমদানি বাড়াবার জন্য যা-কিছু সম্ভব তা ক'রেছিলেন। এর জন্যই আপনাদের এই প্রকাণ্ড দেশটার আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু, যানবাহনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকলে এই নবাগত লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে প'ড়তে পারতো না। আপনাদের আমন্ত্রণে যখন বিদেশীরা যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপনের জন্য আসতে লাগলো, তারা যাতে উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে নানা বাধাপূর্ণ ও মানুষের বসতি-হীন পশ্চিমের বনভূমিতে ছড়িয়ে প'ড়তে পারে, সেজন্য আপনারা রেলপথ তৈরী ক'রতে লাগলেন।

এ দেশে যে সব রেলপথ তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে আমার মনে হয় "বাল্টিমোর অ্যাণ্ড ওহিও রেলরোড্"ই প্রথম। এই রেলপথের জন্য প্রথমে যে মূলধন তোলা হয় তার একটা মোটা অংশ বিলাত যুগিয়েছিল। এই কথা ভাব্‌লে আমার একটু অহঙ্কার হয়। কয়েক বছর আগে এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করবার সময় আমি ঐ রেল কোম্পানীর প্রথম যুগের একটী "প্রস্পেক্টাস্" দেখি। সেটী "বেয়ারিং" কোম্পানী লণ্ডনের বাজারে ১৮৩৯ সনে বাহির করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইয়োরোপ হ'তে আগত লোকদের বসতি-স্থাপনের জন্য যে রেলপথ ও টাকা দরকার হয়েছিল, তা কেবল আপনারাই যোগান নি, আমরাও যুগিয়েছিলুম। মার্কিণ চাষীদের ক্ষেতের উন্নতির জন্য যে টাকা দরকার হয়েছিল তা আপনাদের ব্যাঙ্কার ও পুঁজিপতিদের মত আমরাও যুগিয়েছিলুম।

উৎপাদনের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে যে সব প্রাকৃতিক বাধা ছিল, সেগুলা ধ্বংস করার ফলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধির সৃষ্টি। ত্রিশ কোটি বর্গ মাইল পরিমিত জায়গায় রেলপথে বা রাস্তায় যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকাতেই, এবং সর্ব্বত্র ধন-যোগানোর অবাধ ব্যবস্থা থাকাতেই, আপনাদের এই প্রকাণ্ড লোকসংহতির এতটা সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

এ থেকে আমরা কি শিখ্‌তে পারি? ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপায় করলে ব্যবসা-বাণিজ্য চারদিকে বিস্তৃতি লাভ ক'রবেই। আপনারা রেলপথ তৈরী ক'রে বাণিজ্য বিস্তৃতির সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। তা ছাড়া আপনারা একটা কাজ খুবই বিজ্ঞের মত করেছিলেন। আপনাদের শাসন-নীতি অনুসারে বিভিন্ন দেশরাষ্ট্রগুলা শুল্ক বসান দ্বারা ক'রে পরস্পরের মধ্যে মালগুলার অবাধ প্রবেশে বাধা দিতে পারে না। যারা আপনাদের শাসন-প্রণালীর মূল নীতিগুলা ঠিক ক'রেছিলেন, সত্যই তাঁরা দূরদর্শী ছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন অংশে এইরূপ ব্যবস্থার কথা কল্পনা করুন।

আপনাদের ৪৮টী দেশ-রাষ্ট্র, অথচ এদের পরস্পরের মধ্যে কোন শুল্ক-বাধা নেই। আপনাদের দেশই জগতের বৃহত্তম অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্র। এই অবাধ বাণিজ্য নীতি আপনাদের বাণিজ্য-প্রসারে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। আপনাদের দেশরাষ্ট্রগুলার মধ্যে যদি শুল্ক-বাধা থাকতো, তবে পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিণ জনবলের প্রসার একেবারে হ'তো না তা নয়, কিন্তু বেশ বাধা পেতো। আপনাদের আর্থিক উন্নতি জগতে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার।

প্রাকৃতিক বাধার ধ্বংস

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যা চলছিলো, জগতের অন্যত্রও তাই চল্‌তে লাগলো। গত এক শতাব্দীতে জগতে যানবাহনের ব্যবস্থার কতটা উন্নতি হয়েছে, তা আমরা ভাল ক'রে ভেবে উঠ্‌তেও পারি না। ঠিক এক শতাব্দীরও কিছু আগে জগতে একটীও রেলপথ ছিল না। যে মাল-পত্র সেকালে যাওয়া-আসা ক'রতো, তার পরিমাণ খুবই সামান্য ছিল। সমুদ্রপথে বা খাল দিয়েই সাধারণতঃ মালপত্র চালান দেওয়া হ'ত। রাস্তাগুলার অবস্থা এরকম ছিল যে, রাস্তা দিয়ে বেশী মালপত্র আনা বা পাঠানো সম্ভবপর ছিল না। যানবাহনের ব্যবস্থা সে যুগে নিতান্ত সেকেলে ছিল ব'লেই বেশী মালপত্র দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসা ক'রতো না। ১৮১৬ সনে মাত্র ৪০ কোটি পাউণ্ড দামের মাল নিয়ে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলেছিল।

গত এক শতাব্দীতে দুনিয়া নানাপ্রকার নতুন নতুন যানবাহনের ব্যবস্থা পেয়েছে। এর ফলে বাণিজ্যের পথে প্রাকৃতিক বাধাগুলা একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হ'য়েছে। যান-বাহন-বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতিই আধুনিক অবস্থার একটী বিশেষ আশ্চর্য্য কথা। রেল, জাহাজ, মোটর বা এরোপ্লেনে এখন জগতের যে কোন স্থানে অতি শীঘ্রই যাওয়া যায়। জগতে যা কিছু পাওয়া যায় তা-ই প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করা যায় ও যে কোন দেশে শীঘ্র পাঠানো যায়।

১৯১৪ সন পর্য্যন্ত এর ফল হ'ল মহান্। ১৯১৩ সনে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো ৫০০ কোটি পাউণ্ড—অর্থাৎ ১০০ বছরে ২৫ গুণ বৃদ্ধি। দুনিয়া আর এক একটী দেশের সীমানার মধ্যে নিবদ্ধ নয়; দুনিয়া একেবারে আন্তর্জ্জাতিক হ'য়ে দাঁড়ালো। জীবনের নিতান্ত দরকারী জিনিষগুলার জন্যও প্রত্যেক জাতি অন্য জাতি-গুলার উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়লো। এইজন্যই মহাযুদ্ধকে আমি একটা বিরাট অপরাধ মনে করি। ওটা একেবারে সেকেলে। আজকালকার দিনে—যখন প্রত্যেক জাতিই অন্য সব জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক,—যুদ্ধ যে কেবল অপ্রয়োজনীয় তা নয়, একটা অপরাধ-বিশেষ। জাতিগুলার জানা উচিত ছিল যে, তারা একটা প্রকাণ্ড দুনিয়াব্যাপী আর্থিক জীবনের কুক্ষিগত হয়েছিল, আর তাদের একটার ওপর আঘাতও সারা দুনিয়ার ওপর বাজ্‌বে। কিন্তু বৃহৎস্থ জাতিগুলার কর্ত্তারা সেকেলে যুগেই বাস করছিলেন, তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন নি যে তাঁরা বিংশ শতাব্দীর লোক।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য যে পরিমাণে বেড়েছে, জগতের সমৃদ্ধি তার চেয়ে বেশী গুণ বেড়েছে। ১৮১৬ সনে দুনিয়ার আয় ছিল ৪০০ কোটি পাউণ্ড; ১৯১৩ সনে উহা দাঁড়িয়েছিল ২৪০০ কোটি পাউণ্ড।

অবাধ-বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা

গত এক শতাব্দীতে দুনিয়ার যে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ ঘটেছে তার একটা কারণ বাণিজ্যের পথে প্রাকৃতিক বাধাগুলা ধ্বংস করা। কিন্তু এর আর একটা কারণ হচ্ছে যে, জগতের একটী দেশ সাহস ক'রে ঘোষণা করেছিল যে, সে তার তৈরী জিনিষের বদলে জগতের যে কোন দেশের জিনিষ অবাধে নিতে রাজী। বিলাত দুনিয়াকে একটা স্বাধীন বাজার জুটিয়েছিল, যেখানে সারা দুনিয়া সহজেই মালপত্র বেচ্‌তে পারতো। তার ফলে উৎপাদন ও বাণিজ্যের অদ্ভুত প্রসার হ'ল।

বিলাত দুনিয়ার কাছে কেবল নিজের বাজারের দ্বার খোলে নি, বিলাত তার মূলধন সারা জগতে পাঠিয়েছিল, যাতে দুনিয়ার উৎপাদনে সাহায্য হয়। আপনাদের আমেরিকাতেও বিলাত টাকা পাঠিয়েছিল, যাতে আপনাদের ধন উৎপাদনে সাহায্য হয়। তার ফলাফল বিলাতের ওপর কি রকম হবে, তা বিলাত গ্রাহ্য করে নি। আপনারা

এখানে সস্তায় যে পণ্য উৎপাদনে সমর্থ হলেন, বিলাত সেই পণ্যের প্রবেশের পথে কোন বাধা দেয় নি। তার ফলে আমাদের চাষের প্রণালী বদলাতে হ'ল। পশু-উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় আপনাদের সঙ্গে আমরা পারলুম না', কাজেই আমরা পশু উৎপাদন কমিয়ে দিলুম, আর যখন, দুধ ও মাংস উৎপাদন ক'রতে লাগলুম। তাতে আমাদের ভালই হ'ল। কারণ বিলাতের পক্ষে সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যই দরকার।

সাধারণের ধারণা এই যে, যদি কোন দেশ তার বাজার দুনিয়ার কাছে খুলে দেয়, তা হ'লে সে দেশ-বিদেশে বেশী মাল বেচ্‌তে পারবে না, বরং বিদেশের মাল সেই দেশকে ছেয়ে ফেল্‌বে। কিন্তু বিলাতের ব্যাপারে কি দেখ্‌ছি? বিলাত তার বাজার দুনিয়ার কাছে অবাধে উন্মুক্ত করেছে বটে, কিন্তু তবুও বিলাত বিদেশ থেকে যা কেনে, তার চেয়ে ঢের বেশী বিদেশে বেচে থাকে।

মূলধনের বৃদ্ধি

১৮৪৫ থেকে ১৯১৪ সনের মধ্যে বিলাত তার রপ্তানি-বাণিজ্য ৫ কোটি পাউণ্ড থেকে ৫০ কোটি পাউণ্ডে, "অদৃশ্য" রপ্তানি খুব সামান্য অঙ্ক থেকে প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ডে, আমদানি-বাণিজ্য ৯ কোটি পাউণ্ড থেকে ৭০ কোটি পাউণ্ডে বাড়িয়েছিল। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যেই বিলাত দুনিয়াকে ৫৫০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ বাকে বেচেছিল। যে পরিমাণ মালে বেচেছিল সেইটাই হচ্ছে আমদানির তুলনায় রপ্তানির বাড়তি ভাগ। আর ঐ সময়ে বিলাত দুনিয়ার নানা দেশকে যে মূলধন ধার দিয়েছিল, ঐ টাকাটাই সেই মূলধন।

১৮৪০ সনে বিলাতে মাত্র ১ কোটি ৭০ লাখ লোক ছিল। তাদের অবস্থাও নিতান্ত দরিদ্র ছিল। এক কয়লা ছাড়া আর কোন জিনিষই তাদের প্রচুর পরিমাণে ছিল না। তারা দুনিয়ার নানা দেশ থেকে কাঁচা মাল কিন্‌তে সুরু ক'রলে, সেগুলা থেকে নানা পণ্য তৈরী ক'রলে, আর সেই পণ্য সারা দুনিয়ার বাজারে পাঠাতে লাগ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা দেশে রেল, ষ্টীমার, কেব্‌ল্‌, টেলিফোন ইত্যাদি তৈরীর জন্য আবশ্যক মূলধন যোগাচ্ছিল।

এটা সত্যিই একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার! এটা খুব জোর ক'রেই ব'লতে পারি যে, গত শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে যদি কেউ বলতো যে এরূপ ঘটবে, তবে কেউই তার কথা বিশ্বাস ক'রতো না।

সুতরাং যদি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে দেশ নিজেকে বলি দেয়, সেই দেশই নিজের প্রাণ বাঁচায়, আর যে দেশ নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যাকুল সে দেশ তা হারায়, সেটা অভ্রান্ত বলা চলে না কি? বিলাত তার জীবন খুব সাহসের সঙ্গেই দিয়েছে। যখন সারা দুনিয়ার মন সংরক্ষণ-শুল্কের দিকে ছিল, তখন যে দেশ সংরক্ষণ-শুল্কের বেয়াল ভেঙ্গে ফেল্‌তে সাহসী হয়েছিল, সে দেশ কি সাহসের কাজ করে নি?

সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বোধের ফলাফল

ভবিষ্যতে কোন্ দিকে আমাদের চল্‌তে হবে, সেইটা দেখাবার জন্যই অতীতের ছবিটা ধ'রলুম। বাণিজ্যের বাধাগুলা সরিয়ে দেওয়াই আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী হওয়া উচিত নয় কি?

গত শতাব্দীর চতুর্থ-পাদ থেকেই প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞরা দুনিয়ার বাণিজ্যের পথে নানা বাধা সৃষ্টি করেছেন। এঁরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বোধের দ্বারা চালিত হ'য়েছিলেন। তাঁদের দেশ একটা আন্তর্জাতিক সত্তা লাভ করে, তা তাঁরা চান নি।

বরুন বিস্‌মার্কের কথা। যখন জার্ম্মাণিতে বাহির হ'তে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের আমদানি হ'তে সুরু ক'রলো, তিনি বল্লেন, "এটা হ'তে দেওয়া যেতে পারেই না; জার্ম্মাণি তার খাদ্যের জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর ক'রবে, তা হ'তেই পারে না। আমরা যদি আমাদের খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন না করি, তা হ'লে যুদ্ধের সময় দেশের লোককে খাওয়াবো কি?" এই জন্য তিনি রাশিয়ান শস্যের ওপর আমদানি-কর বসালেন। রাশিয়াও এর পালটা জবাব দিল, জার্ম্মাণ কারখানাজাত মালের ওপর আমদানি-কর বসিয়ে। কিন্তু রাশিয়ান খাদ্য ছাড়া জার্ম্মাণির চলা অসম্ভব ছিল। বিস্‌মার্কের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা

তাদের যত খাবার দরকার তা উৎপন্ন ক'রতে পারে নি। আর জার্মাণি রাশিয়াতে যে শুল্ক-যুদ্ধ চলেছিল তাতে রাশিয়াই জিতলো।

দুনিয়া যে আন্তর্জ্জাতিক হ'য়ে উঠেছিল, দুনিয়ার প্রত্যেক জাতই তার সমৃদ্ধির জন্য অন্য জাতের ওপর যে নির্ভরশীল হ'য়ে উঠেছিল, তা বিসমার্ক বুঝতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন জার্মাণি যাতে প্রবল ও মহৎ হয়, তার খাদ্য-সরবরাহের কোন ভাবনা না থাকে ও যে কোন যুদ্ধে লড়াই ক'রতে পারে। অন্য দেশের ওপর তাঁর নীতির কি ফলাফল, তা তিনি ভেবে দেখেন নি। তার ফল কি হ'ল? রাশিয়ার সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধে হেরে তিনি হুকুম দিলেন যে রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্ক রাশিয়ান প্রতিজ্ঞাপত্র (সিকিউরিটি) নিয়ে কোনো টাকা ধার দিতে পারবে না। এই রকমে রাশিয়া যাতে জার্মাণির টাকার বাজার থেকে টাকা না পায় তার বন্দোবস্ত ক'রলেন, এবং রাশিয়ার রাজস্বের ব্যবস্থার মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রলেন।

রাশিয়ার রাজস্বে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা ৩.৪ বৎসর ধ'রে চললো। তারপর ফ্রান্স চেয়ে দেখলো, বাঃ! তার ত পরম সুযোগ উপস্থিত! সে রাশিয়ার সরকারকে বল্লে, "তুমি যদি আমার সঙ্গে সামরিক সন্ধি কর, আমরা ফ্রান্সের টাকার বাজার তোমার কাছে খুলে দেবো, যত টাকার দরকার তা তুমি আমাদের কাছে পাবে।" এই রকমে, ১৮৯০ সনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে যে সামরিক সন্ধি কায়েম হয়, সেটা বিসমার্কেরই কর্ম্মকলাপের ফলস্বরূপ। আর ফ্রান্স ও রাশিয়ার সন্ধির ফলে পরে কি ঘটেছিল তা ত' আমাদের সকলেরই জানা আছে। আমার মতে, জার্মাণ রাজনীতিজ্ঞরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত গ্রস্ত ছিলেন ও একটা কাপুরুষের নীতি অনুসরণ ক'রেছিলেন ব'লেই গত মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হ'য়েছিল। যদি জার্মাণি তার ভবিষ্যৎটা বিশ্বাস ক'রে দুনিয়ার হাতে ছেড়ে দিতো তা হ'লে মহাযুদ্ধ হ'তই না, জার্মাণিও আজকালকার চেয়ে অনেক গুণ বেশী ধনী হ'তো।

বাণিজ্যে বাধা

বর্ত্তমান অবস্থায় এই আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? নীতিটা অতি সোজা। আমরা যতটা সুযোগ পেয়ে, বাণিজ্য ততই প্রসারলাভ ক'রবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যই যতটা বাড়তে পারে, তা বেড়েছে। কোন একটা অজ্ঞের বাধা একটা কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে বাণিজ্যের প্রসারে বাধা দিতে পারে—সরকারী বা বেসরকারী কোন কার্য্যের জন্য এই সাময়িক বাধা সৃষ্টি হ'তে পারে; কিন্তু যখনই বাধাগুলা সরানো হয়েছে, তখনই বাণিজ্য বেড়েছে। দুনিয়া যখনই অবাধে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য ক'রতে উৎসুক, আর যখনই তার জন্য যা করা দরকার তাই করেছে, তখনই বাণিজ্য বেড়েছে।

আজকাল, ঠিক যে সময়ে দুনিয়া দেনার দায়ে ডুবে আছে, আর যে সময়ে মালপত্রের স্বাধীন গতিবিধি ও আদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি দরকার, সেই সময়েই দুনিয়ার বাণিজ্যের দুয়ারগুলা বন্ধ হচ্ছে, নতুন নতুন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে বাণিজ্যের পরিমাণও ক'মে যাচ্ছে।

১৯২৭ সনে জেনেভা সহরে সারা দুনিয়ার পণ্ডিতদের নিয়ে একটা আর্থিক সম্মেলন হয়। অবস্থা অতি গুরুতর হয়েছিল ব'লেই এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ৫০টী জাতি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ২৫০ জন প্রতিনিধি ও ১৬০ জন ওস্তাদ এই সম্মেলনে প্রেরিত হন। জগতের শ্রেষ্ঠতম আর্থিক পণ্ডিতরা এঁদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা একমত হ'য়ে এই রিপোর্ট দিলেন যে, দুনিয়ার শুল্ক-নীতি—যে শুল্ক-নীতি দুনিয়ার বাণিজ্য না বাড়িয়ে কমাচ্ছে—যত গণ্ডগোলের মূল। তাঁরা আরও বল্লেন যে, শুল্কের ধার নামাতেই হবে। সম্মেলনের সভাপতি ম'সিয়ে থেনিস্ একটী পৃথক রিপোর্টে বলেন যে, আধুনিক দুনিয়ার শুল্কনীতি সমৃদ্ধির সৃষ্টি করে না, উহা যুদ্ধ ও দারিদ্র্যেরই কারণ। দুনিয়াকে শুল্কের চাপে বাধিত ক'রলে যুদ্ধ না ঘটেই পারে না।

শুল্ক-নীতির ফলাফল

অবস্থা যত খারাপ তার চেয়ে বেশী খারাপ ব'লে

আমি দেখাতে চাই না। কিন্তু মার্কিণ শুল্ক-নীতি ইয়োরোপে কি ফলাফলের সৃষ্টি ক'রছে সেইটুকু আপনাদের ভেবে দেখতে বলি। ইয়োরোপের জাতিগুলা আজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। যদি দুনিয়ার এই শুল্ক-নীতি বন্ধ করানো না যায়, ইয়োরোপ জার্ম্মানি ও রাশিয়াকে নিয়ে একজোট হ'তে পারে, এবং ভবিষ্যতে এমন একটা যুদ্ধ ঘটতে পারে, যা গত যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। ইয়োরোপ ক্রমেই দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। এই দুর্দ্দশার হাতে ইয়োরোপ বিনা প্রতিবাদে আত্ম-সমর্পণ ক'রবে মনে হয় না।

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর দুনিয়ার জাতিগুলা এমন নীতি অনুসরণ করছেন, যাতে এই অবস্থার নিরাকরণ না হ'য়ে বিপদ আরও ঘনীভূত হয়েছে। "ওয়ার্ল্ড কন্‌ফারেন্সের" প্রস্তাবিত পথা অনুসৃত হ'য়েছে কি, বরং শুল্ক-দেয়াল ক্রমেই উঁচু থেকে আরও উঁচু করা হয়েছে। এমন কি বিলাতেও একটী বড় রাজনৈতিক দল সংরক্ষণ-শুল্কের প্রস্তাব করছেন। কিন্তু এই কথা ভেবে আমার আনন্দ হয় যে, আমার দেশবাসীর অধিকাংশই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। তবে, যাঁরা সংরক্ষণ-শুল্কের বিরুদ্ধে তাঁরা আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত, এইজন্য সংরক্ষণ-শুল্কের প্রস্তাব বিলাতে কার্য্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। যদি তাই হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ আরও রুদ্ধ হবে। তার ফলে বেকারদের বেনা শোধ দেওয়া আরও শক্ত হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু ঐ পথ অবলম্বন করা মানেই, ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সেইজন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করতে হবেই। সংরক্ষণ-নীতি জগৎকে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে, যাঁরা এ সব বুঝতে পারেন তাঁদের পক্ষে ঘুমানো বা বেঁচে থাকা কঠিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডক্টর ষ্টাল্‌টার লীফ্ একজন উঁচুদরের মানুষ ও আমার এক পরম বন্ধু ছিলেন। সংরক্ষণনীতি তাঁকে এত বেশী উদ্বিগ্ন করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে তিনি এত বেশী খেটেছিলেন যে, তার জন্য তাঁকে অকালে মারা যেতে হ'ল। একবার তিনি ইয়োরোপের রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন :—

"ইয়োরোপের রাজনৈতিক নেতাদের নীতি যে সফল হয়েছে, তার জন্য আমি তাঁদের প্রতি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি। তাঁরা আমদানির ওপর নিষেধ জারি করেছেন। লাইসেন্স-নীতি প্রচলিত করেছেন, আমদানি-শুল্কের হার বাড়িয়েছেন। বাণিজ্যে বাধা দেবার জন্য যা কিছু করবার শক্তি আছে, তা তাঁরা করেছেন। তাঁরা সফল হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নীতির একটা গলদ আছে—কারণ তাঁদের নীতির ফলই হচ্ছে ইয়োরোপের আত্মহত্যা।"

মার্কিণ ও বিলাতী আমদানি-শুল্ক

"ওয়ার্ল্ড ইকনমিক কন্‌ফারেন্সের" রিপোর্ট কেউ কানে নিলেনা। দুনিয়া ক্রমেই ঘোরতর বিপদের মধ্যে তলিয়ে পড়ছে। আর, আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ কথা না বলে পারছি না যে, সম্প্রতি যখন আমেরিকা তার শুল্কের হার-বৃদ্ধির ঘোষণা ক'রলে, তখন সেই ঘোষণা সারা দুনিয়াতে মৃত্যু-নির্ঘোষক ঘণ্টাধ্বনির মতই শুনিয়েছিল এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ভীত ও সন্ত্রাসিত হ'য়ে উঠেছিল।

দুনিয়া আপনাদের পণ্য চায় এবং তার জন্য সে দামও দিতে রাজী। দুনিয়া আপনাদের কাছে ঋণী এবং দুনিয়া সে ঋণ শোধ দিতেও চায়। কিন্তু আপনারা আমদানি-শুল্কের হার বাড়িয়ে দুনিয়াকে আপনাদের কাছ থেকে মালপত্র কিনতে অথবা আপনাদের ঋণ শোধ দিতে দিচ্ছেন না। এর ফলে দুনিয়ার অবস্থা দেউলে হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৯১৫ থেকে ১৯৩০ সনের মধ্যে আপনারা দুনিয়াকে ৫০০ কোটি পাউণ্ড দরের মাল ধারে গুঁজিয়েছেন। এই ধার এখনো শোধ দেওয়া হয় নি। দুনিয়া এই ধার চুকিয়ে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আপনারা তা করতে দিচ্ছেন না। আপনারা শুল্কের দেয়াল খাড়া ক'রে বলছেন, "আমরা আপনাদের মালপত্র চাই না। আমরা কয়েক শ্রেণীর মাল চাই, কিন্তু সব শ্রেণীর নয়।" যে সব শ্রেণীর মাল আপনারা কিনতে

রাজী, তা-ও উপযুক্ত পরিমাণে কিন্‌ছেন না, কারণ তা হ'লে সেই মাল দিয়েই দুনিয়া তার ধার শুধ্‌তে পারতো।

আর, আগেই বলেছি, বিলাতের একটী প্রধান রাজনৈতিক দল বিলাতে আগত মালপত্রের উপর একটা সাধারণ শুল্ক হার বসাতে চাইছেন। মনে রাখ্‌তে হবে, বিলাতও একটী উত্তমর্ণ জাতি। বিদেশে আমাদের প্রায় ৪০০ কোটি পাউণ্ড ঋণ খাটছে। এমন বিপদের আশঙ্কা বিলাতেও খুব প্রবল যে, একদিন আমরা আমাদের দেনদারদের ব'লে বসবো, "তোমরা বিলাতে মাল বেচে তোমাদের ধার শোধ দেবে তা ক'রতে দেওয়া হবেনা।" এর ফলে দুনিয়া ঘেঁটলে হবেই এবং সারা জগতে অকথ্য আর্থিক কষ্টের সৃষ্টিও হবেই।

কিন্তু আমরা এই সম্ভাবনার কল্পনাও ক'রতে পারি না। যে ভাবে আমরা চলেছি সে ভাবে আর চল্‌তে পারি না। আমাদের ফিরতে হবে, আর যে পথ "ওয়ার্ল্ড ইকনমিক কন্‌ফারেন্স" দেখিয়েছিলেন সেই পথেই চল্‌তে হবে।

দুনিয়ার সমৃদ্ধি সম্ভব

যদি আমরা উল্টা পথে চলি—দুনিয়াতে বাণিজ্য ও উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে যে সব বাধা রয়েছে সেগুলা যদি সরিয়ে দিই, তার ফল কি হবে? কোন জাতি না বেচে কিন্‌তে পারে না, কিংবা না কিনে বেচ্‌তে পারে না। যদি প্রত্যেক জাতিরই বেচ্‌বার ও কেন্‌বার শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে দুনিয়ার সমৃদ্ধির এক অদ্ভুত বৃদ্ধি দেখা দেবে।

এই নীতি অনুসরণ করবার সময় এসেছে। বর্ত্তমান অবস্থার চাপে আমাদের এই নীতি অনুসরণ ক'রতে হবেই। ইতস্ততঃ করবার সময় আর নেই। আমরা এই নীতি অনুসরণ করবো না কেন? দুনিয়ার চারিদিকে চেয়ে দেখুন, মানুষের জন্য ঈশ্বর দুনিয়াতে কি অপার সম্পদই রেখে দিয়েছেন। আমাদের এই অদ্ভুত পৃথিবী থেকে যে সম্পদ, আয় ও বাণিজ্য সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার কোন সীমা নেই। দুনিয়ার যেখানেই যা কিছু ধন-সম্পদ আছে বিজ্ঞানের সহায়তায় তা আজ কাজে লাগানো যেতে পারে। দুনিয়া থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য্য, কাঁচা মাল, নানাপ্রকার ধাতু, তেল ও মানুষের অভাব মেটাবার জন্য আর যা কিছু দরকার, তা আজ তৈরী করা সম্ভব। বিজ্ঞানের সহায়তায় আজ আমাদের কারখানা-শিল্পের অসম্ভব উন্নতি হয়েছে, তার ফলে মানুষের ব্যবহার্য্য জিনিষগুলা এত অধিক পরিমাণে তৈরী করা সম্ভব যা জগতে কখনও দেখা যায় নি। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, ইতিমধ্যে দুনিয়ার ব্যবসা-দারেরা বাণিজ্যের বিশাল বৃদ্ধি হবে এই আশায় তৈরী হচ্ছেন। আমার মনে হয় এই ধারণা ভ্রান্ত নয়।

এইজন্য মনে হয় যে, ভবিষ্যতের দিকে আমরা নির্ভয়ে চাইতে পারি। জগতের লোককে এ পর্য্যন্ত যে আরামে রাখা গেছে ভবিষ্যতে তাদের এর চেয়ে ঢের বেশী আরামে রাখা যেতে পারে, এই কথাটা বুঝ্‌তে হবে। দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ লোক এখনও দারিদ্র্য-রেখার নীচে। আসুন তাদের আমরা দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি দিই। আসুন তাদের পণ্য উৎপন্ন ক'রতে ও আমাদের মালের সঙ্গে কেনাবেচা ক'রতে উৎসাহিত করি। আমাদের কাছ থেকে না কিন্‌লে তারা আমাদের কাছে বেচ্‌তে পারে না, আমরা তাদের কাছ থেকে না কিন্‌লে তাদের কাছে মাল বেচ্‌তে পারি না। সুতরাং পরস্পরের কেনা বেচার বৃদ্ধি হ'লে ভয় করবার কিছু নেই, ওর ঠিক উল্টা দিকে।

জগতে যে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য রয়েছে, আসুন তা থেকে আমরা অপার ধন-সম্পদের সৃষ্টি করি, আসুন এই ধনসম্পদ্ আমরা প্রত্যেক দেশকেই ভোগ ক'রতে দিই ও আমাদের ঐশ্বর্য্য জগতের শ্রীবৃদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত করি। যে কাজ আমরা গত এক শতাব্দী ধ'রে ক'রে আসছি, আসুন সেই কাজই আমরা চালাই; তা হ'লে আমরা আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা থেকে মুক্ত হব ও এক অনন্ত সমৃদ্ধির যুগে পৌঁছুবো। তা হ'লে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছুবো যে কেবল এ দেশ থেকে নয়, সারা দুনিয়া থেকে দারিদ্র্যের চির-নির্ব্বাসন সম্ভব হবে। এই রকমে কেবল বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে নয়, কিন্তু সকল মানবের পক্ষে বেঁচে থাকাটা একটা সুখের ব্যাপারে পরিণত ক'রতে পারবো।"

১। "মেমরেণ্ডাম্ অন্ পাবলিক ফিন্যান্স" (সরকারী আয়-ব্যয় সম্বন্ধে তথ্যাবলী) ১৯২৮-২৮। জাতি মহাসঙ্ঘ জেনেভা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৯। পৃঃ সংখ্যা ৯"×৭" ২১৪।

এই কেতাবে নিম্নলিখিত দেশগুলির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে: (১) চেকোস্লোভাকিয়া, (২) ফ্রান্স, (৩) জার্মানি, (৪) গ্রেটবৃটেন ও উত্তর আয়র্লাণ্ড, (৫) গুটেমালা, (৬) হাইতি, (৭) হাঙ্গেরি, (৮) ভারতবর্ষ, (৯) ইতালি, (১০) জাপান, (১১) পর্তুগাল, (১২) রুমানিয়া, (১৩) স্পেন, (১৪) যুইট্জার্ল্যাণ্ড, (১৫) যুগোস্লাভিয়া।

আয়ব্যয়ের কেতাবে শুধু বজেট সম্পর্কিত অঙ্করাশি প্রকাশিত করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। প্রথমেই প্রত্যেক দেশের বজেট প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তারপর ধরের উত্থানপতন; বজেট হিসাবের চুম্বক; ১৯২৯-৩০ সনের সহিত ১৯২৪-২৫, ১৯২৫-২৬, ১৯২৬-২৭, ১৯২৭-২৮ ও ১৯২৮-২৯ সনের হিসাবের তুলনা; রাজস্ব বিশ্লেষণ; ব্যয় বিশ্লেষণ; সরকারী বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা; মুদ্রা তৈরী; সরকারী ঋণ; স্থানীয় আয়ব্যয়; (কোন কোন স্থলে) আর্থিক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দেখানো হইয়াছে। বজেট প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি অবলম্বন করা হইয়াছে:

১। আয়ব্যয়ের (ফিন্যান্স) বৎসর। সময়, এষ্টিমেট তৈরী করিবার প্রণালী, আলোচনা, ভোটগ্রহণ ও প্রকাশ,—আনুষ্ঠানিক এষ্টিমেট, অতিরিক্ত এষ্টিমেট, মাসিক এষ্টিমেট।

২। আয়ব্যয়ের গঠন। (ক) বজেটের ঐক্য: সাধারণ ও বিশেষ বজেট, বিশেষ ফণ্ড, সরকারী বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা, ফলের প্রত্যাশাহীন সেবার দাম, ভাটা (ডিপ্রিসিয়েশান), সরকারী সম্পত্তি বিক্রয়, ঋণ ইত্যাদি, রিজার্ভ ফণ্ড, কাজ করিবার ফণ্ড।

(খ) বজেটের সার্ব্বজনীনতা: মূল ও নিট্ মিলন।

(গ) বজেট বিভাগ: রাজস্ব ও ব্যয়ের বিভাগ, সাধারণ ও অসাধারণ, চল্‌তি ও পুঁজিপাটার খরচ, কর্ম্মচারী, দ্রব্যাদি ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয়; পেন্‌সন; ঋণের কাজ; সরকারী বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা।

৩। বজেট অনুযায়ী কার্য্য: (ক) ধার দেওয়া; ব্যয়ের রকম; ভোট দত্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী ব্যয়; অভাবিত ব্যয়, হস্তান্তর, মঞ্জুরির সময় নির্দ্দেশ।

(খ) কোষাগার সংগঠন: খরচ ও সংগ্রহের প্রণালী; আর্থিক প্রতিনিধিরূপে ব্যাঙ্কের কাজ।

(গ) হিসাব পরীক্ষা সংগঠন: ক্যাশ অথবা আক্রুয়েল ভিত্তি; হিসাব নিকাশ; উদ্বৃত্তি ও ঘাটতি গণনার নিয়ম; উদ্বৃত্তিকে কাজে লাগানো; ঘাটতির পূরণ; হিসাব নিকাশ হইলে প্রকাশের তারিখ; আয়ব্যয়ের নিয়মিত প্রকাশ (ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক)।

(ঘ) শাসন, অডিট্ অফিস, বাধ্যবাধকতামূলক শাসন, বিবরণী।

৪। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (এসেট্) ও দেনা (লায়েবিলিটি)।

৫। স্থানীয় আয়ব্যয়। কার্য্যবিভাগ ও রাজস্বের উদ্ভব, সাহায্যদান, কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক তত্ত্বাবধান।

অর্থশাস্ত্রের পড়ুয়াগণ এই কেতাবের যে কোন অধ্যায় লইয়া নাড়াচাড়া করিলে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আমাদের পক্ষে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভবপর নহে। নীচে কয়েকটি মাত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ

আলোচনা প্রকাশ করা গেল, তাহাতে ভারতের অবস্থাটা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

দরের উত্থান পতন

পাইকারী দরের সূচীসংখ্যা (বাৎসরিক গড়) :

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
ফ্রান্স	৩৪৫	৩২৭	৪১৯	৪৮৯	৫৪০	৭০৩	৬১৭	৬২০	৬১৬[১]
জার্মানি				১৩৭	১৪২	১৩৪	১৩৮	১৪০	১৩৮[২]
গ্রেটবৃটেন ১০০		১৫৯	১৪৯	১৬৬	১৫৯	১৪৮	১৪২	১৪০	১৩৭[৩]
ভারতবর্ষ ১০০ (১৯১৩)%	১৭৮%	১৭৬%	১৭২%	১৭৩%	১৪৯%	১৪৮%	১৪৮%	১৪৫%	
ইতালি ১০০					৫৯৬	৬০৩	৪৯৫	৪৬২	
জাপান		১৯৩	১৬৫	২০৭	১৯৬	১৭৪	১৬৯	১৭১	

(১৯২১-২৩) (২৩-২৪) (২৪-২৫) (২৫-২৬) (২৬-২৭) (২৭-২৮) (২৮-২৯)

দেখা যাইতেছে, পাইকারী দর ১৯১৩ সনের তুলনায় দেশের মত সেখানে দর বাড়ে নাই। জাপানের নীচে ১৯২৯ সনে সব চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে ফ্রান্সে, তারপর ভারতবর্ষ। তারপর গ্রেটবৃটেন ও জার্মানির অবস্থা প্রায় ইতালিতে। জাপানের স্থান তৃতীয় হইলেও এই দুই এরকম।

আয়ব্যয়ের তুলনা

পূর্বোক্ত দেশগুলির আয়ব্যয়ের তুলনা করা যাইতেছে :

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
	ফ্রাঁ (০০০,০০০ বাদ)	ফ্রাঁ (০০০,০০০ বাদ)	ফ্রাঁ (০০০,০০০ বাদ)	ফ্রাঁ (০০০,০০০ বাদ)
	৩৬,৪৭৭.৭	৫১,৪২৫'২	৪২,১৯৩.৯	৪৫,০৯০
	=৫২৮.৬	=৫৭১.৪	=৬১১.৫	=৬৫৩.৪
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০
	০০০,০০০ মার্ক	০০০,০০০ মার্ক	০০০,০০০ মার্ক	০০০,০০০ মার্ক
	৯,২১৩.৭	১০,১৭৯.৪	১১,৮২৬.৬	১১,০৩২.২
	=৮৪৩.১	=৯৪২.৫	=১০৯৫	=১০২১.৫
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
	০০০,০০০ পা	০০০,০০০ পা	০০০,০০০ পা	০০০,০০০ পা
গ্রেট বৃটেন	৭৮৪.৯	৭৮৬	৭৭৯.১	৭৭৮'৫
	=১০,৭৬৫'৩৩	=১০,৪৮০	=১০,৩৮৮	=১০,৩৪৬'৬
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা

১। জানুয়ারি হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ১৯২৯ গড়। ২। ঐ ৩। জানুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯২৯ গড়।

ভারতবর্ষ ১৬৫·০৫ কোটি টাকা। ১৫৭·৪৩ কোটি টাকা। ১৫৫·৩৭ কোটি টাকা।

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	০০০,০০০ লিরা	০০০,০০০ লিরা	০০০,০০০ লিরা	০০০,০০০ লিরা
ইতালি	১৯,৯৬৮·২	২৪,৮৬২·৫	২০,৬০১	১৭,৯০৩
	=১২,৪৬৭·৬২	=১৫,৫৩৯·০৬	=১২,৮৭৫·৬২	=১১,২৮৯·৩৭
	কোটি টাকা।	কোটি টাকা।	কোটি টাকা।	কোটি টাকা।
	০০০,০০০ ইয়েন	০০০,০০০ ইয়েন	০০০,০০০ ইয়েন	০০০,০০০ ইয়েন
	১৫০৮·৫	১৫৫৯·৫	১৭৪৪·৫	১৬৮৯·১
	=৯১৯·৮১	=৯৫০·১৭	=১০৬৪·০৩	=১,০২৯·৯০
	কোটি টাকা।	কোটি টাকা।	কোটি টাকা।	কোটি টাকা।

উপরে লিরার দর ৮/০ ধরা হইয়াছে, ১ পাউণ্ড= ১০৯ টাকা, আর অন্যান্য বিদেশী টাকার পরিবর্ত্তিত করিবার বেলা ৬ নবেম্বর (১৯৩১) হিসাব ধরা হইয়াছে (৬৯০ ফ্রাঁ= ১০৮ মার্ক=১৬৪ ইয়েন=১০০৲ টাকা)। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সন (কোথাও কোথাও ১৯২৭ সনও বটে) সাধারণতঃ এষ্টিমেট, সুতরাং শেষ হিসাব যখন প্রকাশিত হইবে তার সহিত কিঞ্চিৎ গোলমাল হইবে।

এখানে খাতের ব্যয়টা বিস্তৃতভাবে দেখাইবার দরকার নাই। কারণ যত আয় তত ব্যয়। কোন দেশের আয় হইতেই তার ব্যয়ের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। আয় ব্যয়ে ঘাটতি অর্থাৎ আয় কম ও ব্যয় বেশী যে না হইতে পারে তা নয়, কিন্তু সকল সভ্য দেশই যথেষ্ট আয়ব্যয় এক বৎসরে না হোক্ কয়েক বৎসরের মধ্যে সম স্থানে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করে।

সকল দেশের আয় বা রাজস্ব গণনা এক প্রকার নহে। তথাপি মোটামুটি বলা চলে, উপরোক্ত ৬টি দেশের স্থান নিম্নরূপ: ইতালি, গ্রেট বৃটেন, জাপান, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ। ১০ হাজার কোটি টাকার উপরে রাজস্ব ইতালির ও বিলাতের। জাপান ও জার্ম্মাণি খুব কাছাকাছি এবং হাজার টাকার কিছু বেশী রাজস্ব আদায় করে। ফ্রান্সের রাজস্ব জাপান জার্ম্মাণির আধাআধি, আর ভারতবর্ষ ফ্রান্সের এক চতুর্থাংশের কিছু বেশী বা কম রাজস্ব আদায়ে সমর্থ। অঙ্কের ভাষায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা চলে:

(১) ভারতবর্ষ=$\frac{1}{4}$ ফ্রান্স

$=\frac{1}{2}$ জাপান অথবা $\frac{1}{2}$ জার্ম্মাণি

(কারণ জাপান অথবা জার্ম্মাণি=২×ফ্রান্স)

$=\frac{1}{10}$ ইতালি অথবা $\frac{1}{10}$ গ্রেট বৃটেন

(কারণ ইতালি অথবা গ্রেট বৃটেন=১০×জাপান অথবা ১০×জার্ম্মাণি।

(২) ফ্রান্স=$\frac{1}{2}$ জাপান অথবা $\frac{1}{2}$ জার্ম্মাণি

$=\frac{2}{10}$ ইতালি অথবা $\frac{2}{10}$ গ্রেট বৃটেন।

(৩) জাপান অথবা জার্ম্মাণি=$\frac{1}{10}$ ইতালি অথবা $\frac{1}{10}$ গ্রেট বৃটেন।

অন্যান্য বিষয় বিবেচনা না করিয়া কোন জাতির আয়ব্যয়ের দিকে তাকাইয়াই তার রাজস্ব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করা সমীচীন নহে। তথাপি একথা সত্য যে, ভারতবর্ষ অন্য পাঁচটি দেশের তুলনায় অত্যন্ত নীচে অবস্থিত এবং যদি ভারতের লোকসংখ্যা অন্যান্য দেশের লোকসংখ্যার সহিত তুলনা করা যায়, তবে এই স্থান যে আরো কত নীচে নামিয়া যায় তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। মোটামুটি ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ও গ্রেট বৃটেনের ৪ কোটি ধরিলে, ভারত গ্রেট বৃটেনের $\frac{1}{10}$ হইলে দোষের হইত না। সে স্থানে গ্রেট বৃটেন=৮০× ভারত। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে গ্রেট বৃটেন একা রাজস্ব বিষয়ে ভারতের চেয়ে ৫৮০ গুণ শক্তিশালী। ইহার

সহিত ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজস্ব যোগ দিলেও বলা চলে যে, গ্রেটবৃটেন = ২০০।২৫০ ভারত।

সরকারী ঋণ

বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা কারণে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ঋণ মোটামুটি দুই প্রকারের: আভ্যন্তরিক ঋণ অর্থাৎ দেশস্থ লোকদের নিকট হইতে ধার লওয়া ও বিদেশী ঋণ। বিদেশী ঋণ যে যে দেশ হইতে ধার লইয়া গঠিত সেই সেই দেশের মুদ্রায় লওয়া হয়। নিম্নে ৩টি দেশের ঋণের অবস্থা বুঝানো যাইতেছে।

ফ্রান্স

মোট আভ্যন্তরিক ঋণ (০০০,০০০ ফ্রাঁ বাদ)

জুন ৩০	এপ্রিল ৩০	মার্চ ৩১	ডিসে ৩১	ডিসে ৩১
১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৬	১৯২৭
২৮০,৬১২'৯	২৮৬,১৭৪'৯	২৮৭,৬৯৯'৮	২৯০,৩৮৩'৬	২৯৮,০৮৫'৩

মোট বিদেশী ঋণ (০০০,০০০ বাদ)

পা	৬৭১.৬	৬৯৫.৯	৭৯৭.৫
ডলার	৩,৫৪৪	৩,৬৩০.৬	৩,৬১৬.৫
ষ্টার্লিং	৫৪.৩	৫৪.৩	৫৫
পেসেটা	—.৩		
পেসো	১৯.৪		
পিয়াস্তার	১৫.		
ক্যানাডা ডলার	৫.৭		
দিনারীয় পা	২.		
ইয়েন	—.১	...	

এই ঋণগুলিকে কাগজী ফ্রাঁয় (০০০,০০০ বাদ) পরিণত করিলে দাঁড়ায়:

	বিদেশী ঋণ	আভ্যন্তরিক ঋণ	মোট
মার্চ ৩১, ১৯২৬	২০৩,১৪৮'৫	২৮৭,৬৯৯'৮	৪৯০,৮৪৮'৩
ডিসেম্বর ৩১, ১৯২৬	১৭৮,১১৫'৪	২৯০,৩৮৩'৬	৪৬৮,৪৯৯'
ডিসেম্বর ৩১, ১৯২৭	১৭৮,৫৮০'৯	২৯৮,০৮৫'৩	৪৭৬,৬৬৬'২

জার্ম্মানি

রাইখস মার্ক (০০০,০০০০ বাদ)

	মার্চ্চ ১৯২৪	মার্চ্চ ১৯২৫	মার্চ্চ ১৯২৬	মার্চ্চ ১৯২৭	মার্চ্চ ১৯২৮	মার্চ্চ ১৯২৯
আভ্যন্তরিক	২,৪০৬'১	১,৮৪১'১	৬,৮৯৫'২	৭,১৪০'৫	৬,৯৮৮'১	৮,০৭২'৮
বিদেশী ১৯২৪ সনে গৃহীত	—	১০৭'৮	১৪৬'৬	১৩২'৪	১০১'৭	৮৭৭'১
মোট	২,৪০৬'১	৪,৭৮৭'৭	৭,৮৪১'৮	৮,০৭২'৯	৭,৮৯০'৬	৮,৯৪৯'৯

গ্রেট বৃটেন

(০০০,০০০ পাউণ্ড)

	৩১ মার্চ্চ ১৯২৬	৩১ মার্চ্চ ১৯২৭	৩১ মার্চ্চ ১৯২৮	৩১ মার্চ্চ ১৯২৯
আভ্যন্তরিক	৬,৫৮০.২	৬,৬১৯.৬	৬,৬১৮.৯	৬,৬১৩.০
বিদেশী	১,১১০.৮	১,১০১.৪	১,০৯৫.২	১,০৮৪'৭
মোট (স্থূল)	৭,৬৯১.	৭,৭২১.	৭,৭১৪.১	৭,৭১৬.

ভারতবর্ষ

(০০০,০০০ টাকা)

	৩১ মার্চ্চ ১৯২৫	৩১ মার্চ্চ ১৯২৬	৩১ মার্চ্চ ১৯২৭	৩১ মার্চ্চ ১৯২৮
আভ্যন্তরিক	১,৭৯৭.৯	৫,১২৪.৮	৫,২৩১.১	৫,৩১১.৮
বিদেশী	৩,৭১৪.৯	৪,৫৩১.৩	৪,৫২০.০	৪,৫৯৪.৩
মোট	৫,৫১২.৮	৯,৬৮৬.১	৯,৭৫১.১	৯,৯১৬.১

ইতালি

(০০০,০০০ লিরা)

	৩০ জুন ১৯২৫	৩০ জুন ১৯২৬	৩০ জুন ১৯২৭	৩০ জুন ১৯২৮
আভ্যন্তরিক	১৫,৭৬৬	২১,৩০৯	৮০,৬৭৫	৮৫,৯৪৬
বিদেশী	...	২,৪৮০	১,৯২১	১,৮৩১
মোট	১৫,৭৬৬	২৩,৭৮৯	৮৫,৫৯৬	৮৭,৭৮৭

জাপান

(০০০,০০০ ইয়েন)

	৩১ মার্চ্চ ১৯২৫	৩১ মার্চ্চ ১৯২৬	৩১ মার্চ্চ ১৯২৭	৩১ মার্চ্চ ১৯২৮
আভ্যন্তরিক	১,০৫৪	৩,৪৭৯.৯	৩,৭১০.৬	৩,৯৪৪.৫
বিদেশী	১,৫১৯	১,৪৭৯.৩	১,৪৬১.২	১,৪৫৩.৪
মোট	২,৫৮৪.১	৪,৯৫৯.২	৫,১৭১.৮	৫,৩৯৭.৯

এই ৬টি বেশের শেষ তারিখের (১৯২৮ অথবা ১৯২৯ সন) মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তরিত করিলে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি পাওয়া যায়ঃ

(কোটি টাকা)

		আভ্যন্তরিক	বিদেশী
ফ্রান্স	১৯২৭	৪৩২০.১	২৪৮৮.১
জার্মানি	১৯২৯	৬৪১.৫	৮১.২
গ্রেঃ বৃটেন	১৯২৯	৯১৭৫.০৬	১৪৪৬.২৭
ভারতবর্ষ	১৯২৮	৫৩২১.৮	৪৫৯৪.৩
ইতালি	১৯২৮	৫৩১১.৭	১১৫.০
জাপান	১৯২৮	২৪০.৪৭	৮৮.৬২

ইহার সহিত মাথা প্রতি ঋণের পরিমাণ কত তাহা মিলাইয়া পড়া যাউক।

	১৯১৩	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
ফ্রান্স (ফ্রাঁ)	২৪	৩১৯	৩৭২	৩৮২	৩৪৭	৩৪২
জার্মানি (রা-মা)		৫.৩	১.৮	৫.৬	৮.৩	৯.৫
গ্রেঃ বৃটেন (পা)		৮.৯	৬.৯	৭'১	৭.	৬.৯
ভারতবর্ষ (টাকা)		৩৮.৬	৩৯.	৩৯.৩	৩৯.৯	
ইতালি (লিরা)		১৬১.৮	১৩২	১৮০.১	১৬৮.৩	
জাপান (ইয়েন)		৬৯.৮	৭৯.৪	৮০.৮	৮৩	

উপরি উক্ত দেশগুলির শেষ বৎসরের সংখ্যাকে টাকায় পরিণত করিলে দাঁড়ায় ফ্রান্স (১৯২৯) প্রায় ৪৯'৬ টাকা, জার্মানি (১৯৩০) প্রায় ৬.৭ টাকা, গ্রেট বৃটেন (১৯২৯) ৯২৲ টাকা, ভারতবর্ষ (১৯২৮) ৫৯'৯ টাকা, ইতালি ৭১৲ টাকা, জাপান ৪০৲ টাকা।

মোট ঋণের পরিমাণের দিক্ হইতে বিচার করিলে এই ৬টি দেশের মধ্যে গ্রেট বৃটেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঋণগ্রস্ত, ঠিক তার নীচেই ভারতবর্ষ ; কিন্তু গ্রেট বৃটেনের মোটা অংশ আভ্যন্তরিক ঋণ আর ভারতের আভ্যন্তরিক ও বিদেশী ঋণ দুই-ই তুল্য ; তারপরে স্থান ফ্রান্স ও ইতালির (বৃটেনের প্রায় আধাআধি), কিন্তু ইতালির বিদেশী ঋণ তুলনায় বাঙ্কা ; জার্মানির ঋণের পরিমাণ গ্রেট বৃটেনের এক ত্রয়োদশাংশ, তন্মধ্যে অধিকাংশ ঋণ আভ্যন্তরিক ; আর জাপানী ঋণ জার্মানির অর্দ্ধেকেরও কম ও বেশীর ভাগ আভ্যন্তরিক। লোকপিছু ঋণের পরিমাণ ধরিলে গ্রেটবৃটেন, ইতালি, জাপান, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, জার্মানি। অঙ্কের ভাষায় মাথা প্রতি ঋণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

জার্মানি = ½ ভারতবর্ষ (প্রায়)
= ২/৯ ফ্রান্স
= ½ জাপান
= ১/১৫ ইতালি
= ১/২৫ গ্রেট বৃটেন

মোট ঋণের পরিমাণের বেলায় ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়, লোক-সংখ্যা দ্বারা হিসাব করিলে একমাত্র জার্মানি ভারতের নীচে, ভারতবর্ষ আর সব দেশের নীচে। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। কোন দেশের ঋণভারের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে মোট ঋণের পরিমাণ বা মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ জানাই যথেষ্ট নয়। গ্রেট বৃটেনের প্রত্যেক অধিবাসীর মাথায় ৯২৲, আর প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথায় প্রায় ৪০৲ টাকার ঋণ চাপান আছে (যদিও দুয়ের বিদেশী ঋণের বেলায় আসমান জমিন ফারাক্)। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি বলি গ্রেটবৃটেন : ভারতবর্ষ : : ৯২ : ৪০, তবে ভুল হইবে। কারণ দুই দেশের ধনসম্পদ্ ইত্যাদি সমান নহে, ক্ষমতা সমান নহে, ইত্যাদি।

হাতী ও ঘোড়ার আর কিছু সমান বোঝা বহিতে পারে না। সুতরাং যদি বলা যায় যে, ভারতবর্ষের আরো ৫২৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তবে সে কথা নিতান্ত উপহাসযোগ্য। দেখিতে হইবে, যে ঋণটা করা হইয়াছে তা শোধ করিবার সামর্থ্য কিরূপ, কত করিয়া সুদ দিতে হইতেছে, দেশের ঐশ্বর্য্য নষ্ট বা ভবিষ্যতে এরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা আছে কিনা যাহাতে ঐ ঋণভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে না, ইত্যাদি। অন্য পাঁচটা অর্থনৈতিক সমস্যার মত ঋণগ্রহণ সমস্যাও কঠিন, সরল নয়। বিষয়টা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

২। "ইন্টারন্যাশন্যাল কনফারেন্স অব্ দি ইউনিফিকেশন অব্ দি লজ্ রিলেটিং টু বিল্স অব্ এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট্স অ্যাণ্ড চেক্স্" (বিনিময় পত্র, কোম্পানীর কাগজ ও চেক সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইন-কানুন ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আহূত আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন)। ১৯৩১ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় বৈঠকের বিবরণী, লীগ্ অব্ নেশানসের ইকনমিক ও ফিন্যান্সাল সেকশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। জেনেভা, ডিসেম্বর ১৯৩০। পৃঃ ৮৮।

উপরি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া বিভিন্ন দেশের নিকট উত্তরের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সব দেশের জবাব পাওয়া গিয়াছে সেগুলির নাম: ইতালি, বেলজিয়াম, সুইডেন, ডেন্মার্ক, জার্ম্মানি, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরি, লুক্সেম্বার্গিয়া, লাত্ভিয়া, গ্রীস, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রেট বৃটেন, স্পেন, ডানৎসিগ্, রুমানিয়া, জাপান, সুইট্জারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, তুরস্ক, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কিংসঙ্ঘ। ইহাদের জবাবগুলি দ্বিতীয় ভাগে স্থান পাইয়াছে। তা ছাড়া প্রথম ভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে; (ক) সূচনা, (খ) প্রশ্নপত্রের যে সব জবাব পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য, (গ) গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রদত্ত বিভিন্ন জবাব হইতে সিদ্ধান্ত, (ঘ) গবর্ণমেণ্টসমূহ কর্ত্তৃক নূতন প্রস্তাব, (ঙ) বিভিন্ন আইনে সংঘর্ষ বাধিলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টসমূহের মত।

এই কেতাবখানি প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীর পক্ষে, বিশেষতঃ যাঁরা মুদ্রা, সিক্কা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁদের পক্ষে, বিশেষ মূল্যবান্। ইহাতে যাবা যামাইবার মত বিনিময় যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে।

শ্রীসুধাকান্ত দে

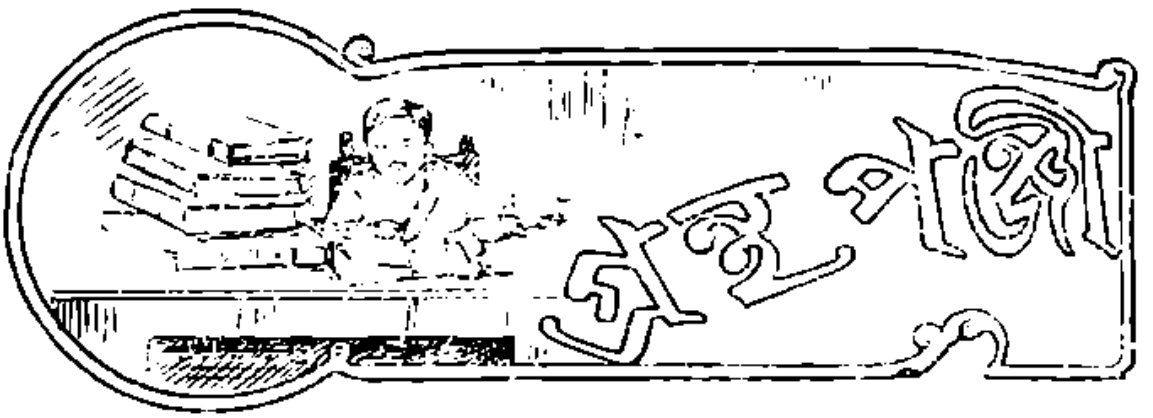

১। "প্রিন্‌সিপ্‌লস অ্যাণ্ড মেথড্‌স্ অব্ হেল্প ডিটারমিনেশন ইন্ দি কোল মাইনিং ইণ্ডাষ্ট্রী। অ্যান ইণ্টারন্যাশন্যাল সার্ভে।" (কয়লার খনির ব্যবসায় কি নিয়মে ও কি প্রণালীতে মজুরি নির্দ্ধারিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক গবেষণা।) ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস্ হইতে 'পঠন পাঠন ও বিবরণ' 'ডি' সিরিজের অন্তর্গত ২০ নং গ্রন্থ। জেনেভা ১৯৩১। ২ পি ৬ পে। পৃঃ ১০৪।

২। "হেরেজেস অ্যাণ্ড রেজুলেশন অব্ কন্‌ডিশনস্ অব্ লেবার ইন্ দি ইউ এস এস আর" (রুশিয়ার শ্রমের মজুরি ও তাহার সর্ত্ত কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়), এল্ সোগোয়স্কি। উপরি উক্ত প্রতিষ্ঠান ও সিরিজ হইতে প্রকাশিত ১৯ নং কেতাব। জেনেভা ১৯৩০। ৪ পি। পৃঃ ২১২।

৩। "ইয়োরোপ-ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স" (ইয়োরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র), আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সঙ্ঘ প্রকাশিত। ইহাতে আছে: সিরেলির অভিভাষণ ১৬ পৃঃ। বাণিজ্যের বিকাশ ও গতি, ৩৮৫ পৃঃ। শিল্প-সমস্যা, ১৬৭ পৃঃ। কৃষি-সমস্যা, ৩১ পৃঃ। সমস্যা-বিভাগ, ১৬৪ পৃঃ। আর্থিক দুর্য্যোগে বেকার, ৭৩ পৃঃ। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসমূহ, ২৬ পৃঃ।

৪। "সাইকোটেক্‌নিক্ ডেয়র মেন্‌শেনহ্যিটশাফ্‌ট" (পরিচালনা, শ্রম ও আবেষ্টন সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা), ডক্টর ফ্রান্‌সিস্‌কা বাউম্‌গার্টেন ও ডক্টর গের্ড কেবিয়ান। কার্ল মারহোল্ড, হাল ১৯৩০। ২৯৩ পৃঃ। ১২·২৫ মার্ক।

৫। "সোৎসিয়ালেটাট উণ্ড বেলাষ্টুঙ্গ" (সামাজিক নীতি ও সামাজিক বাজেট), ডক্টর ফেলিক্স বোয়েন্দের। গস্ প্যাপি, বার্লিন। ১৯৩১। ১৭৮ পৃঃ। ১২ মার্ক।

৬। "চাইনিজ কার্ম্ম ইকনমি। এ ষ্টাডি অব্ ২,৮৬৬ ফার্ম্মস্ ইন্ সেভেন্টিন লোকালিটিজ অ্যাণ্ড সেভেন্ প্রভিন্সেস্ ইন্ চায়না।" (চীন দেশীয় কৃষি অর্থতত্ত্ব, চীনের ৭টি প্রদেশের ১৭টি স্থানের ২,৮৬৬টি ক্ষেত লইয়া গবেষণা।) জন লোসিং বাক্। নান্‌কিং বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনা ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ প্যাসিফিক্ রিলেশনের (শান্তি পরিষদ্) তাঁবে প্রকাশিত। কমার্শিয়াল প্রেস, সাংহাই। ১৯৩০। ১২+৪৭৬ পৃঃ।

৭। "দি ফাইব্ ইয়ার প্ল্যান। ইন্‌ট্রোডাক্‌শন অ্যাণ্ড এক্সপ্ল্যানেটরি নোট্‌স টু দি ম্যাপ অব্ দি ফাইব্ ইয়ার প্ল্যান ফর্ দি ডেভেলপমেণ্ট অব্ ন্যাশন্যাল ইকনমি অব্ দি ইউ এস্ এস্ আর" (পঞ্চ-বার্ষিকী সঙ্কল্প। রুশিয়ার জাতীয় আর্থিক উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্পের ম্যাপ বুঝাইবার প্রচেষ্টা ও তৎসম্পর্কিত ব্যাখ্যাবলি)। ডব্লিউ পি কোট্‌স। ইঙ্গ-রুশিয়ান পার্ল্যামেণ্টারি সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, লণ্ডন। ১৯৩০। ২৩ পৃঃ ও ম্যাপ।

৮। "সাম ফোক্‌স ওন্‌ট ওয়ার্ক" (কোন কোন লোক কাজ করিতে চাহে না), ক্লিফ ফলকিন্‌স। হারকোর্ট প্রেস, নিউইয়র্ক। ১৯৩০। ২০২ পৃঃ।

পণ্যনিয়ন্ত্রণ নীতির গলদ্ কোথায়*

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম-এ

কিছুদিন হইতে কয়েকটী নামজাদা দেশে পণ্য-নিয়ন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই নীতি হয় একেবারে বিফল হইয়াছে, না হয় তো আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছে মাত্র। নিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতার কারণ এই যে, কেবলমাত্র মালপত্র বাজারে কেনার দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশী, উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের দিকে সেরূপে লক্ষ্য করা হয় না। এই বাক্যের সত্যতা কার্য্যক্ষেত্রেও প্রমাণিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী দেশে পণ্য দ্রব্যের দর-নিয়ন্ত্রণ চেষ্টার ফলাফল লিপিবদ্ধ হইল।

ফেডারেল ফার্ম্ম বোর্ডের কার্য্যকারিতা

প্রথমতঃ মার্কিণ দেশের ফার্ম্ম বোর্ডের কথা ধরা যাক। এই প্রতিষ্ঠানটীর জন্ম হয় ১৯২৯ সনের ১৫ই জুন তারিখে; উদ্দেশ্য দেশ-বিদেশের বাজারে মার্কিনের কৃষিজাত বস্তুর প্রকৃত দর নির্দ্ধারণ করা। অন্যান্য শিল্প-দ্রব্যের তালে তালে কৃষিজাত বস্তুও যাতে ব্যবসাক্ষেত্রে আপন আসন বজায় রাখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ফার্ম্মটীর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বোর্ডটীর হাতে ৫০ লক্ষ ডলার দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিকে এই বোর্ডের তহবিল হইতে ঋণ দেওয়া হয়। সমিতিগুলি শস্য-উৎপাদনের জন্য অর্থ প্রদান করে এবং দর নির্দ্ধারণের সহায়তা করিয়া থাকে। এতদিন পর্য্যন্ত বোর্ডটী কেবলমাত্র গম এবং তুলা নিয়ন্ত্রণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। সরকারী ট্রেজারির উৎপাতে এবং বাজার হইতে ১০ কোটী বুশেল গম এবং ধনলক্ষ বেল তুলা দূরে রাখিবার জন্য গম এবং তুলার বাজার দর অত্যন্ত নামিয়া যায়। গমের দর এতদূর নামিয়া যায় যে, ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে এত কম দর আর কখনও দেখা যায় নাই। তুলার অবস্থা আরো কাহিল হইয়া পড়ে; তুলার দর উৎপাদনের খরচার নীচে নামিয়া যায়। এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবার কারণ এই যে, ফার্ম্ম বোর্ড ফসল বুনান, মাড়ান, এবং বাজারে কেনা বিষয়ে এবং পুঁজি চালার সঙ্গে সঙ্গে ফসল উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের দিকে আদৌ নজর রাখে নাই। ফলে কৃষকগণ আপন খেয়ালখুশি-মাফিক ফসল বুনিতে থাকে। তাহারা মনে মনে ভাবে যে, তাহাদের উপরে যখন বোর্ড আছে তখন তাহাদের ভাবনা নাই, যেন তেন প্রকারেণ তাহাদের উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় হইবেই হইবে, এবং তাহারা সুবিধাজনক দরও পাইবে। ফার্ম্ম বোর্ডটী কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে হুঁসিয়ার জারি করিয়া কৃষকদিগকে অতিরিক্ত ফসল সম্বন্ধে সাবধান করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে ফললাভ হইয়াছে যৎসামান্যই। গত বৎসরেও যে পরিমাণ বাজ ফেলা হইয়াছে, তাহাতে যদি প্রতিকূল আবহাওয়া না ঘটে তাহা হইলে শস্য-উৎপাদনের বহর আরো বাড়িয়া যাওয়ার কথা। ফার্ম্ম বোর্ডের যে সমস্ত ক্ষতি হইবে তাহা অবশ্য সরকারী তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে। কিন্তু কৃষকদিগকে কম বেশী পাইতে হইবে না; কারণ পূর্ব্বের উদ্বৃত্ত শস্য এবং নূতন ফসল,—এ দুইটী জিনিষ বাজারে ফেলিতে তাহাদিগকে যথেষ্ট কষ্টভোগ করিতে হইবে।

---

*গত বৎসর পাটের অতি-উৎপাদনের ফলে বাঙ্গালার চাষীর তথা সকল প্রকার লোকের দুর্দ্দশার কথা অনেকের মনে আছে। এই প্রবন্ধ সেই সময়ে লেখা। এক্ষণে উত্তেজনা ও তর্কবিতর্ক আর নাই। সুতরাং ধীরভাবে বিষয়টি আবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এ প্রবন্ধ সে বিষয়ে সাহায্য করিবে।—মাঃ উঃ সম্পাদক।

ব্রাজিলের কাফি ইন্‌ষ্টিটিউটের আংশিক কৃতকার্য্যতা

কাফি সম্পর্কে ব্রাজিলে মার্কিণের ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের অনুরূপ যে কাফি ইন্‌ষ্টিটিউটটী রহিয়াছে, তাহার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, এই প্রতিষ্ঠানটীর আংশিক কৃতকার্য্যতার কারণ প্রায় একই ধরণের। প্রতিষ্ঠানটী ব্রাজিল রাজ্যের কাফির দর বাঁধিয়া দিবার জন্য মোতায়েন রহিয়াছে। কাফি অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপন্ন হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে কাফির দর অত্যন্ত নামিয়া যায়। কার্যগুলি ক্রমে ক্রমে বন্ধক দেওয়া হইতে থাকে এবং শেষে এইগুলি ব্যাঙ্কার এবং অন্যান্য সুদখোরদের হাতে চলিয়া যায়। এই অবস্থা হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানটী জন্মলাভ করে। কাফি সম্বন্ধে ব্রাজিলকে সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ বলিতে হয়, কারণ এই দেশে দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ কাফি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, এবং গবর্ণমেণ্ট ও কাফি ইন্‌ষ্টিটিউটের তরফ হইতে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইলেও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য তাহার শেষ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। প্রচুর কাফি বাজার হইতে তফাৎ রাখিবার মানসে গবর্ণমেণ্ট কাগজের নোট পর্য্যন্ত ছাপাইয়াছেন। তবুও শেষ রক্ষা হয় নাই। এরূপ হইবার কারণ, ব্রাজিলের কাফি উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল সাও পলো ষ্টেটে মাত্র এই নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, ব্রাজিলের অন্যান্য ষ্টেটগুলিতে এরূপ কোন নীতির ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং দুনিয়ার অন্যান্য কাফি-উৎপাদনকারী দেশগুলি এই অবসরে বেশ সুবিধা করিয়া লয়। সাও পলো মাল আটকাইয়া রাখায় কাফির দর অত্যন্ত চড়িয়া যায়। এই ফাঁকে দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলি বেশ দুপয়সা করিয়া লয়। অবশ্য অন্য কারণও ছিল যথেষ্ট। ১৯৩০ সনে কাফির বাজারে ভাটা দেখা দেয়। কাফি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে এজন্য কোন দায়বদ্ধতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ঐ সনে লণ্ডন এবং নিউ ইর্কে সহরে যখন ঠিক এক্‌সচেঞ্জের বাজারে নানারূপ স্পেকুলেশান্ চলিতেছিল, তখন ঐ দুই সহরে কাফি ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষে কর ধারণ করা উচিত ছিল; কিন্তু ইন্‌ষ্টিটিউট্ এসম্বন্ধে আদৌ মনঃসংযোগ করে নাই। অথচ দুনিয়া জুড়িয়া সর্ব্বত্রই এই সনে অত্যধিক পরিমাণে কাফি জন্মে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে কাফি ইন্‌ষ্টিটিউটটী প্রতিষ্ঠা করা হয়, শেষ পর্য্যন্ত সে উদ্দেশ্য আদৌ সাফল্য লাভ করে নাই। এখন ব্রাজিলের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছে যে, কাঁচা মালের অতিরিক্ত উৎপাদন হ্রাস করিবার নীতি অর্থশাস্ত্রানুমোদিত নিশ্চয়ই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে অন্য কোন নূতন স্থান হইতে মাল আসিয়া সব পণ্ড করিয়া না দেয়।

কিউবা দ্বীপে চিনির দর নিয়ন্ত্রণ নীতির অকৃতকার্য্যতা

চিনিই কিউবা দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিউবা দেশের গবর্ণমেণ্ট চিনির দর নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইয়া ব্রাজিলের মতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ, দুনিয়ায় যে হারে চিনি উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে, লোকে ঠিক সেই অনুপাতে চিনিখোর হইতে পারিতেছে না। কিউবা দ্বীপে দুনিয়ার ২০% বরাদ্দ চিনি উৎপন্ন হয়; আবার কিউবা দ্বীপের এই চিনিই একমাত্র ফসল। সুতরাং অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি উৎপাদনের কুফল কিউবা দ্বীপেই দেখা দিয়াছে সব চেয়ে বেশী। কিউবার গবর্ণমেণ্ট দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া চিনির উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে কিউবা দ্বীপে চিনি-উৎপাদন কমিয়া যায় বটে, কিন্তু কিউবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। কারণ দুনিয়ার অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ ইয়োরোপে এবং আভা দ্বীপে, কিউবার চিনি-উৎপাদন হ্রাসের ফলে, চিনি-শিল্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে কতকগুলি বাজার কিউবার হাত-ছাড়া হইয়া যায়। শেষে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিহার করিতে হয়।

৪। রবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অকৃতকার্য্যতা

মালয় উপদ্বীপে রবার উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য বিলাত ১৯২২ সনের নবেম্বর মাসে "প্রিভেনশান আক্ট" নামে একটী

রবার আইন বিধিবদ্ধ করে। এই আইনের বলে একটী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরণের রবার ছাড়া খারাপ রবার রপ্তানি করা একেবারে রহিত করা হয়। আবার রপ্তানি রবারের উপর রীতিমত শুল্কও বসান হয়।

এই আইনে সুবিধা হইত যদি গুদামজাত রবারওয়ালারাও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিত। তাহা উপনিবেশস্থ ইংরাজ প্লাণ্টারগণও এই আইন মানিয়া চলিতে থাকে বটে, কিন্তু গুদামজাতগণ মোটেই এই আইন মানিয়া চলিতে চায় না। ফলে বিলাতকে বাধ্য হইয়া এই নীতি পরিত্যাগ করিতে হয়। রবার-উৎপাদন হ্রাসের আর একটী কুফল এই দাঁড়ায় যে, ভাল রবারের স্থানে অনেক সময় খারাপ রবারের ব্যবহারও ক্রমে বাড়িয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু এক স্থানে নিয়ন্ত্রণ চালাইলে, বহু নূতন নূতন স্থানে মাল উৎপাদন আরম্ভ হইয়া যায়, নয় তো নয়া চিজ্ আসিয়া পুরাতন চিজের স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে।

আমেরিকায় তাম্র-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অকৃতকার্য্যতা

১৯২০-২১ সনে আমেরিকায় তামার বাজারে তীব্র মন্দা আরম্ভ হয়। যোগান ও টানের মধ্যে অসামঞ্জস্যই এই দুর্য্যোগের কারণ। তখন আমেরিকা বাধ্য হইয়া তাম্র রপ্তানি সমিতি গঠন করে। এই সমিতির অর্থ-সাহায্যের জন্য সাধারণের মধ্যে বণ্ড বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সমিতি একরূপ গায়ের জোরে উদ্বৃত্ত তামা লইয়া তাহা গুদামজাত করিতে থাকে। সমিতির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯২২ এবং ১৯২৩ সনে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির জন্যও অবস্থা অনুকূল হইয়া পড়ে। আস্তে আস্তে আবার সমিতি নিয়ন্ত্রণ নীতি রদ করিতে থাকে; শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ নীতি একেবারে ধামাচাপা দেওয়া হয়।

দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তামার চাহিদা বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু এই চাহিদার [illegible] সমিতির সহায়তা সত্ত্বেও আমেরিকান তাম্র-রপ্তানিকারকগণের বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। দুনিয়ার তামের টান বাড়িলেও এমন বাড়া বাড়িল না, যাহার জন্য শতকরা ১৫%-এরও উপরে মূল্য-বৃদ্ধি পায়। আমেরিকায় তাম্র-উত্তোলনের খরচা বেশী; পক্ষান্তরে ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং ক্যানাডায় তাম্র-উত্তোলনের খরচা কম, সুতরাং প্রতিযোগিতায় আমেরিকার হার হইল।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৯২৬ সনে আমেরিকার কপার এক্সপোর্টার্স ইন্‌কর্পোরেটেড্ হয় অর্থাৎ তাম্ররপ্তানি-সঙ্ঘ গঠিত হয়। অনেক বড় বড় লোক এই সঙ্ঘের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হন। নবগঠিত এই সঙ্ঘটী শেষ পর্য্যন্ত বাজার আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং ১৮ সেণ্ট্ ধাঁধা দর স্থির করিয়া দেয়। সঙ্ঘটী বাজার বন্ধ বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে, আর এই কৃত্রিম ধরের স্থায়িত্বের জন্যও নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সঙ্ঘের তাহিরুরি মাত্র এক কি দুই বৎসর টিঁকে, তারপরই উহার সর্ব্বনাশ সুরু হয়। কারণ ইয়োরোপ কিংবা আফ্রিকার উপর হুকুম চালাইবার কোনই এক্তিয়ার উহার ছিল না। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমেরিকান তামার খনিগুলি পর্য্যন্ত সঙ্ঘকে কদলী প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যজনক লাভ করিয়া ফেলে। শেষ পর্য্যন্ত তামার দর ১১ সেণ্ট পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। সুতরাং এই ব্যাপারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিশেষ ধরণের স্থানে এবং কালে সীমাবদ্ধ কোন একটী জোটের পক্ষে নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিতে যাওয়া আহাম্মুকি মাত্র। একটী দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিলে শেষ পর্য্যন্ত ঐ দেশ বা অঞ্চলেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

চীনা ডাককর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আর্থিক তথ্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি ; বি, এ ; এফ্, আর, ইকন, এস্ (লণ্ডন)

বর্ত্তমান চীন চলিয়াছে দ্রুত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া। তাহার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে নিত্য নূতন ভাঙ্গন-গড়ন চলিয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় চীনা জীবনের মাপকাঠি, রীতিনীতি প্রভৃতি সবই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান চীনের আর্থিক জীবনকে বুঝিবার জন্য সে দেশে পারিবারিক আর্থিক তথ্য সংগ্রহের যে সাগ্রহ চেষ্টা চলিতেছে, তাহারই কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধে দিব। শ্রীযুক্ত কাংচুয়ান্ এইরূপ তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে একজন ওস্তাদ। তিনি সম্প্রতি সাংহাইতে ৮৫টী ডাককর্ম্মচারীর পারিবারিক আর্থিক তথ্যসংগ্রহ করিয়াছেন। এই কাজে তাঁহাকে প্রত্যেকটী পরিবারের লোকজনের সহিত মোলাকাৎ করিতে হইয়াছিল। তাহাতেই কি তথ্য সহজে সংগৃহীত হয়! তিনি অনেক বিঘ্নের সহিত যুঝিয়া দুই মাসে মাত্র ৮৫টী পরিবারের আর্থিক তথ্যসংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গালী জীবনের আর্থিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এই চেষ্টাটুকুও আরম্ভ হইয়াছে কি?

শ্রীযুক্ত কাংচুয়ানের গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া নীচে দেখান হইল :

পরিবারের আয়তন

পরিবারের জন-সংখ্যা	পরিবার-সংখ্যা
৪	৮
৩	৯
২	২
৫	১০ বা ততোধিক ১
১	
৬	
৭	

ইহা হইতে দেখা যায়, তথায় ডাক কর্ম্মচারীর পরিবারে গড়ে ৪·২ জন লোক আছে।

কোন্ বয়সের কত জন

বয়স	পরিবারে শতকরা কত জন লোক
১৪ বৎসর পর্য্যন্ত	২৬·৫
১৫-১৯	৯·০
২০-২৯	২৭·৭
৩০-৩৯	১৪·৭
৪০-৪৯	১০·০
৫০-৫৯	৭·০
৬০-৮৪	৫·১
	১০০·০

এই ৮৫টী পরিবারের মধ্যে—

পুরুষ	১৬৫ জন
নারী	১৬০ ,,
বালক	৫৭ ,,
বালিকা	৬০ ,,
	৪৪২ ,,

প্রত্যেকটী পরিবারের বাৎসরিক গড় আয়ের হিসাব নিম্নরূপ :

আয়ের পন্থা	আয়ের পরিমাণ
১। উপার্জ্জন	৫০৪·৯৬ রূপার ডলার
২। ঋণ	৫৫·২১

৩। ক্ষেত্রের ফসল বা উপঢৌকন	১৬·৭০ ,,
	৫৭৩·৮১ ,,

চাকরী করিয়া যে উপার্জ্জন হয়, তাহা মোট আয়ের ৮৭·৫% অংশ।

এই ৮৫টী পরিবারের কত জন উপার্জ্জন করে তাহার হিসাব নিম্নরূপ :

স্বামী	
স্ত্রী	
পুত্র	৮ ,,
কন্যা	—
অন্যান্য	৩ ,,
	১০৬ ,,

প্রত্যেক পরিবারের মোট আয়ের শতকরা ৯২·২ অংশ উপার্জ্জন করে স্বামী, স্ত্রী ২·৩% অংশ, পুত্র ৩৯% অংশ, অন্যান্যে ১·৬% অংশ। কন্যা কিছু উপার্জ্জন করে না।

চীনা ডাককর্ম্মচারীর বার্ষিক গড় ব্যয় ৫৭৪·০৪ ডলার। মোট ব্যয়ের কত অংশ কোন খাতে তাহা নীচে দেখান যাইতেছে :

খাদ্য	৬১·৩%
বাড়ীভাড়া	৯·০%
জামা কাপড়	৩·৬%
আলো	২·৩%
চা ও তামাক	৩·১%
যাতায়াত খরচ	·৮%
চিকিৎসা	৪·৯%
শিক্ষা	২·১%
আমোদপ্রমোদ	১·৪%
সামাজিক ব্যয়, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজাপার্ব্বণ, ইত্যাদি	১০·২%
ঋণের সুদ	৩·৭%
যে সব আত্মীয়-স্বজন দূরে থাকেন তাঁহাদিগকে পাঠান হইয়াছে	১·১%
অন্যান্য খরচ	·৫%
	১০০·০

শ্রীযুক্ত কাংহুয়ান্ খরচের দফাগুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি বলেন যে, চীনা ডাককর্ম্মচারীর 'খাই খরচে'র ব্যয় ইয়োরোপ আমেরিকার তুলনায় বেশী বলিয়া মনে হয়।

মানবের স্থূল অভাব

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

শ্রমের প্রসার

একবার ভাবিয়া দেখা যাক্ মানুষের জীবনধারণের জন্য কোন্ কোন্ জিনিষের দরকার হয়। এইসব জিনিষকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি মানুষের পরিশ্রম, যত্ন, আয়াস ও কষ্ট সাপেক্ষ। কতকগুলি মানুষ বিনা শ্রমে ও বিনা চেষ্টায় পাইয়া থাকে, যেমন বাতাস, সূর্য্যের উত্তাপ, ইত্যাদি। বাতাস বা সূর্য্যের উত্তাপ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এমন কি, এদের অভাবে মানুষের প্রাণবিনাশ পর্য্যন্ত ঘটে। কিন্তু এগুলি প্রকৃতি আমাদিগকে না চাহিতেই দিয়াছে। এদের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বা পরিশ্রম করিতে হয় না।

সাধারণতঃ যে জিনিষ আমরা বিনা শ্রমে লাভ করি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুভূতি আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা

সচেতনভাবে বর্ত্তমান থাকে না। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাস গ্রহণ করিতে না পারিলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হয় না। অথচ আমরা বাতাস পাইবার জন্য সিকি পয়সার পরিশ্রম বা কষ্টও করি না, এবং মনে হয় যেন তাহা করিতে প্রস্তুতও নই। অথচ দেশকালপাত্রভেদে যদি বাতাস, সূর্য্যের উত্তাপ, ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তবে আমরা তাহের জন্য বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

বর্ত্তমান সভ্য সমাজের দিকে তাকাইলে এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে বহু প্রমাণ মিলিবে সন্দেহ নাই। বাতাস আমাদের নাগালে পায়। কিন্তু কোন কারণে যদি বাতাস কোন স্থানে কমিয়া যায় এবং যদি সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস পাইবার বা সৃষ্টি করিবার পথ থাকে, তবে সেরূপ কোন পরিশ্রমকেই আমরা পরিশ্রম বলিয়া মনে করিব না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তালপাখা হইতে বিজলীপাখা পর্য্যন্ত তার সাক্ষ্য দিতেছে। নদীর বা পুষ্করিণীর জল আমরা বিনা আয়াসে অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতে পারি, ব্যবহার করিতে পারি ও তাতে স্নান করিতে পারি। কিন্তু যেখানে নদী, খাল বা পুষ্করিণী নাই, সেখানে মানুষ কি জল না খাইয়া থাকে? জলের ব্যবহার কম পরিমাণে হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া জল ছাড়া চলে না। সুতরাং মাটিতে নলকূপ বসাইয়াই হোক্ বা কল তৈরী করিয়াই হোক্, জল চাই। এই জল পাইবার জন্য সমস্ত বাধাকে জয় করিতে হয়। কলিকাতায় কূপ, পুষ্করিণী অত্যন্ত বিরল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক জলের অভাব বোধ করিতেছে না। কারণ কলের জলে অভাব মিটিতেছে।

অবান্তর হইলেও একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা দরকার। পরিশ্রম দ্বারা সাধারণতঃ জিনিষের দাম নির্ণীত হয়। অর্থাৎ যে জিনিষ পাইতে বা উৎপাদন করিতে যত বেশী কষ্ট, শ্রম, আয়াস ও ব্যয় করিতে হয়, সেই জিনিষের দামও তত বেশী। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জিনিষের দাম শ্রমের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কথাটা আংশিক সত্য। পুরা সত্য কথাটা এই যে, দাম বাস্তবিক পক্ষে নির্ভর করে পরিশ্রম করিবার ইচ্ছার উপর। কোন্ জিনিষ পাইবার জন্য আমরা কতখানি পরিশ্রম বা কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী আছি?—এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সেই জিনিষের দাম নির্ভর করে। হীরক বা বহুমূল্য ধাতু ইত্যাদি আমাদের পক্ষে এমন অপরিহার্য্য নয় যে, সেগুলি না থাকিলে আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। বরং অবস্থার বিপাকে পড়িলে আমরা একমুষ্টি অন্নের জন্য বহুমূল্য হীরকখণ্ড বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত থাকিতে পারি। হীরক যোগাড় করিতে খুব যে অধীর পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও নয়। বরং বর্ত্তমান জগতে দু'বেলা দু'মুঠা ভাত যোগাড় করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছে। তথাপি হীরক মূল্যবান্ এবং খাদ্যদ্রব্য সকলের চেয়ে সস্তা। এই দাম বা মূল্যের হেতু খুঁজিতে হইবে আমাদের মানসিক দৃষ্টিতে। আমরা মনে মনে কোন কোন জিনিষকে অত্যধিক মর্য্যাদা দিই। সেগুলিকে পাইবার জন্য আমাদের বাসনা এমন প্রবল ও তীক্ষ্ণ যে, তজ্জন্য আমরা অপরিসীম শ্রম করিতে রাজী থাকি। এই জিনিষগুলিই মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের দরকারী ও ব্যবহৃত জিনিষকে আমরা যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তাদের সীমারেখা এমন কিছু দৃঢ় ও অপরিবর্ত্তনীয় নয়। আজ যা বিনা শ্রমে পাওয়া যাইতেছে, কাল তার জন্য শ্রম করিতে হইতে পারে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমারেখার অদলবদল হওয়া বিচিত্র নয়। কোন কালেই নিশ্চিতরূপে এমন কথা বলা চলে না যে, অমুক অমুক জিনিষ বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় ও যাইবে, আর অমুক অমুক জিনিষ পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হইবে। মোটামুটিভাবে শুধু এই কথা বলা চলে যে, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব বাড়িয়াছে ও অভাবের নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে; এই সব অভাব পূরণের জন্য মানুষের শ্রমের পরিমাণ ও প্রকার বাড়িয়াছে। আদিম মানব সমাজের চেয়ে এখনকার মানব সমাজ অনেক বেশী পরিশ্রম-লব্ধ জিনিষের উপর নির্ভর করে, তাতে সন্দেহ আছে কি? বস্তুতঃ, বিনা আয়াসে ও পরিশ্রমে লব্ধ জিনিষের পরিমাণ হাজার মন্বন্তরে যতখানি

বাড়িয়াছে, পরিশ্রম-লব্ধ নিত্যের পরিমাণ তাহার বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জীবনধারণের ত্রিধারা

মানুষের বল, চেষ্টা ও পরিশ্রম তিনটি ধারায় বা স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। জীবন-ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষ যে তিনটি উপাদানকে অত্যাবশ্যক ও অপরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করে, তা সংক্ষেপে এই: (১) খাদ্য, (২) বস্ত্র, (৩) আশ্রয়-স্থান।

এই ত্রিধারার ভিতর দিয়া মানুষের সহিত পৃথিবীর অন্য সকল প্রাণীর বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে। তিন প্রকার অভাবই অত্যন্ত স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পার্থিব। অথচ এই স্থূলতা অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্ট রূপ ও মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রয়োজনীয়তার দিক্ হইতে পশু ও মানুষের পক্ষে খাদ্য সমান মূল্যবান্, অন্বেষণের দিক্ হইতে নহে। প্রত্যেক পশু ও পাখীর খাদ্য চাই, মানুষেরও চাই। ক্ষুৎ-প্রবৃত্তি মানুষের ও পশুর মধ্যে সমান প্রবল ও সমানভাবে বর্ত্তমান আছে। মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনের অধিকাংশ সময় খাদ্য-অন্বেষণে যায়, কিন্তু সভ্য মানুষের তাহা যায় না। প্রতিদিন প্রত্যেক ইতর প্রাণীকে তার খাদ্যের জন্য পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। হয়ত অসভ্য মানুষ এ বিষয়ে ইতর প্রাণীর মত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রত্যেক সভ্য মানুষের ক্ষুৎপিপাসার সমান কাতর বা চকল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা স্থানে এমন ঢের মানুষ ছড়াইয়া আছে, যাদের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিবার উপকরণ সর্ব্বদা হাতের কাছে রহিয়াছে। এরা নিজেদের অথবা পূর্ব্ব-পুরুষদের সঞ্চয়ের ফলে এমন ধনতার অধিকারী হইয়াছে যে ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির কথা তাদের একদিনও ভাবিতে হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ক্ষুৎপিপাসার অস্থির মানবের সংখ্যাই অনেক অধিক।

কিন্তু ক্ষুৎপিপাসার অত্যন্ত কাতর মানুষও বর্ত্তমান কালে তার সমস্ত শক্তি, সময় ও পরিশ্রম আহার্য্য অন্বেষণে ব্যয় করে না। অনেক লোক দিনের অধিকাংশ সময় উপজীবিকার সন্ধানে কাটায় বটে, তবু এমন সুস্থ, সবল, সভ্য মানুষ নাই, যার অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় নাই। মনুষ্য ভিন্ন ইতর প্রাণীর দৃষ্টি খাদ্যকে ছাড়াইয়া যায় না। মানুষের দৃষ্টি একদিকে যেমন অতীতের মধ্যে নিহিত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত, অন্যদিকে তেমনি বর্ত্তমানকে সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিবার আগ্রহে পূর্ণ। এইজন্য হাজার হাজার বছর ধরিয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের আহার্য্য দ্রব্য ও আহার-প্রণালী অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু যুগে যুগে মানুষ নব নব খাদ্যদ্রব্য উদ্ভাবন করিয়াছে, তা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে, খাইবার প্রণালীকেও বহুভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

মানবের বৃত্তিসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, সর্ব্বাপেক্ষা পার্থিব হইল ক্ষুৎপিপাসা। যেখানে মানুষ অন্য সব ইতর প্রাণীর সহিত একাসনে অধিষ্ঠিত, সেখানেও তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা আকার পাইয়াছে।

আশ্রয় স্থান মানুষ ও পশুর পক্ষে সমান দরকার। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি বিভিন্নরূপ ধারণ করে। রৌদ্র-বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যেমন দরকার, শত্রুর হাত হইতে নিরাপদে আপনার উপজীবিকা ভোগ করিবার উপায় করাও তেমনি দরকার। সেইজন্য সকল প্রাণীর পক্ষেই আশ্রয় আবশ্যক।

কিন্তু এখানেও মানুষে পশুতে মিল যতটা অমিল তার চেয়ে ঢের বেশী। সিংহের বিবর হাজার হাজার বৎসরে কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? পাখীর নীড় বাঁধিবার প্রণালী কতখানি উন্নতিলাভ করিয়াছে? ইতর প্রাণীর আশ্রয়স্থান রচনার নৈপুণ্যে চমৎকৃত হইবার অনেক কিছু আছে, তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতেছি না। তথাপি মানুষের কুটির-নির্ম্মাণে যে মনন-শক্তির, যে বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, ইতর প্রাণীর রচনা-নৈপুণ্যে তার সম্ভাবনা কোথায়? মানুষের ঊর্দ্ধদৃষ্টি অন্য কোন প্রাণীতে দেখা যাইবে না।

খাদ্য ও আশ্রয়স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ পশু থাকিয়াও পশুকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, আপনার পশুত্বকে

জয় করিয়া মনুষ্যত্বের পতাকা উড়াইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের ব্যাপারে মানুষের সহিত অন্য কোন প্রাণীর মিল নাই। অন্যান্য প্রাণীর শরীর আচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে কি নাই, সে কথা এখানে বিবেচ্য নয়। এখানে এই কথা বিবেচ্য যে, খাদ্য ও আশ্রয় ব্যতীত বস্ত্রও মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ একদিনে কাপড় পরিতে শিখে নাই নিশ্চয়। কতকালে মানুষ কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং ধাপে ধাপে গাছের বাকল হইতে সুতা বা রেশমের কাপড়ে অগ্রসর হইয়াছে, তা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যুগের পর যুগ মানুষ যে মননশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে তা স্মরণযোগ্য।

স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্ম

মানুষের জীবন-ধারণের জন্য সর্বাগ্রে দরকার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়। এই তিনটি অভাব মানুষের আদিম অভাব ও অত্যন্ত স্থূল। মানুষ যদি তার জাগ্রত অবস্থার সমস্ত সময়টা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এই তিনের পশ্চাতে অতিবাহিত করিত, তবু তার সহিত সৃষ্টির অন্য সমস্ত প্রাণীর যথেষ্ট পার্থক্য থাকিয়া যাইত। কারণ মানুষ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

পশুপাখী সারাটা দিন কেমন করিয়া কাটায়, তা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? মানুষের মধ্যে বহু পরিমাণে আলস্যপরায়ণতা দেখা যাইবে, কিন্তু তাহা ইতর প্রাণী প্রায় অনলস জীবন যাপন করে বলা যাইতে পারে। তারা যতক্ষণ সুস্থ থাকে ততক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় অনবরত খাটে। তাদের এই কাজের প্রেরণা আপনা হইতে আসে, কারও শিক্ষা বা পরিচালনা দরকার হয় না। অধিকাংশ মানুষ আপনা হইতে কাজে প্রবৃত্ত হইতে চায় না, অথবা প্রবৃত্ত হইলেও প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য এমনভাবে খাটে না। সোজা কথায় মানুষের চেয়ে ইতর প্রাণীরা অনেক বেশী খাটে।

তবু একথা সহজেই বুঝা যাইবে যে, মানুষের পরিশ্রমের ফলের সহিত ইতর প্রাণীর পরিশ্রমের ফলের আকাশ পাতাল তফাৎ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইতর প্রাণী যাহাই তার সকল পরিশ্রম খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য ব্যয় করে। মানুষ তদুপরি বস্ত্রের জন্য সময় ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট অবসর ভোগ করে। নিজ অন্নবস্ত্রের ধান্দায় মানুষকে যত না কেন অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে হোক্, দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষ যত না নিষ্পেষিত হোক্, এমন সুস্থ ও সবল মানুষ কম, যাদের হাতে অল্প-বিস্তর সময় না থাকে। দ্বিতীয়তঃ, পশুপাখী যে অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য শ্রম করে, সে অন্ন ও আশ্রয়ের পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ বৎসরেও সামান্য মাত্র হইয়াছে। আর মানুষের বেলায় সে দিক্ দিয়া কত না পরিবর্তন, রুচির উত্থান-পতন লক্ষিত হইবে।

যদি পশুপাখী মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত, তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এইরূপে নালিশ করিত, "প্রকৃতি বড় কৃপণ। নিষ্ঠুরও বটে। আমরা প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যা পাই, অনেক মানুষ অলস জীবন যাপন করিয়া তার চেয়ে ঢের বেশী পায়। আমরা দিনরাত খাটিতে পারি, তাই আমাদের শক্তি দিয়াছ। ওরা অলস, তাই ওরা জিতিয়া গিয়াছে। আমরা স্থাবরত্ব লাভ করিয়াছি, আর ওরা দিনে দিনে উন্নত হইয়াছে।"

আমি এমন কথা বলিতেছি না, পশুপাখীর জীবনে কোন সরলতা বা কোন চারুতা নাই। আহার-অন্বেষণে ও আশ্রয়-নির্মাণে ইতর জীবকেও তার বুদ্ধি খাটাইতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। এদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অসংখ্য সম্ভাবনা। পদে পদে নিজেদের ও বংশধরদের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চলিতে হয়, কখনো বা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। এই শত্রুর সংখ্যা স্বজাতীয়ের মধ্যেও কম নয়, অন্য জাতীয়ের মধ্যের ত কথাই নাই। গোটা জীবনের সকল কথা স্মরণ করিয়া বলা চলে কি যে, পশুপাখীর জীবন একঘেয়েতাতে কোন বৈচিত্র্য নাই, তা কলের মত রসহীন ও প্রাণহীন? বোধ হয় বলা চলে না।

পশুপাখীর জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মধ্যেও বুঝিবার মত অনেক বস্তু আছে। তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে সকল কথা আজও ধরা পড়ে নাই। তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য এখনও অনেক বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তথাপি

একথা সত্য, পশুপাখীর মনন-শক্তি সমস্তটাই খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, অন্য দিকে চালিত হইবার জন্য তার কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ঐ দুই স্থূল অভাবের চারিদিকেই প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তার উর্দ্ধে উঠিবার অবকাশ পায় নাই। এই স্থূলের ভিতর দিয়া তারা কোন সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর লোকের সন্ধান পায় নাই। কিন্তু মানুষ তাহা পাইয়াছে। মানবসমাজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থূল অভাবগুলিকে অস্বীকার করিতে পারে না। অন্ততঃ ইহলোকে পারে না। এগুলিকে স্বীকার ও ভিত্তি করিয়া তাকে সভ্যতা গড়িতে হইয়াছে। তার সমগ্র মনন-শক্তি এদের জন্য ব্যয়িত হয় নাই। এই স্থূলতার ভিতর দিয়া সে একটা সূক্ষ্মতার সন্ধান পাইয়াছে।

তার কারণ খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় মানুষের কাম্য হইলেও উদ্দেশ্য নহে। মানুষ গোড়া হইতে এগুলিকে উপায় মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। পশুপাখীর পক্ষে এগুলি উদ্দেশ্যও বটে। মনে হয় যেন সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত তাদের এই উদ্দেশ্য স্থির হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য তাদের বুদ্ধি-খরচের দরকার হয় নাই। কিন্তু মানুষের বেলায় এগুলি উপায় মাত্রে পরিণত হইয়াছে। কিসের উপায়? মানুষ জানে এগুলি উপায় মাত্র, কিন্তু কিসের উপায় তা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে কি? না, পারে নাই। কখনও এটা উপায় মনে করিয়াছে, কখনও ওটা উপায় মানিয়া লইয়া প্রতিনিয়ত কত না পরীক্ষা করিয়াছে। আর উপায় নির্দ্ধারণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা দ্বারা খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় স্থানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই স্থূল অভাবগুলি মানুষের উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে নিশ্চয়; কিন্তু সর্ব্বোপরি যুগে যুগে উদ্দেশ্যের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ঘটে, বস্ত্রে ও আশ্রয়-স্থানে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, সে কথা মনে রাখা দরকার।

বিপ্লবের ইতিহাস সন্ধান

সকল পশু বা পাখীর খাদ্য বা বাসস্থান একপ্রকার নহে। কেহ আমিষাশী, কেহ নিরামিষাশী। প্রত্যেকের আবার নানা প্রকার স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে। গরু ঘোড়ার আশ্রয়-স্থান যে প্রকার, সিংহ, ব্যাঘ্রের তদ্রূপ নহে, পক্ষীকুলের আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তথাপি এ কথা বলা চলে যে, একজাতীয় পশুপাখীর ভিতর আহার ও বাসস্থান নির্ব্বাচন বা নির্ম্মাণে প্রায় পার্থক্য থাকে না এবং বিভিন্ন জাতীয় পশুপাখীও স্ব স্ব পথ পরিত্যাগ করে না।

কিন্তু মানুষের বেলা একথা সত্য নয়। আদিম মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে স্বরূপতঃ কারে পার্থক্য রেখা মানিয়া চলা হইত কি না তার ইতিহাস কেহ লেখে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্য মানবসমাজে বিভিন্ন জাতির ইচ্ছামত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় নির্ব্বাচন ও নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। প্রতি ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তার নিজের খুসীমত এইসব স্থূল অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারে। যদি সুযোগ বা সুবিধা সত্ত্বেও সে তা না করে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন আইনকানুন মানিয়া চলে ত তা পরাধীনতার জন্য নয়, ইচ্ছা করিয়াই। এই পরাধীনতা ও স্বাধীনতার দ্বারাই আদিম সমাজের সহিত বর্ত্তমান সমাজের পার্থক্য বোঝা যাইবে। অসভ্য মানুষের খাওয়া পরা, উঠা বসা, থাকা চলা সমস্তই উপর হইতে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন বিষয়ে কোন শাসন না মানার অর্থ কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বকে অস্বীকার করা। কেহ তা করিলে, তার সহজে নিষ্কৃতি নাই, তাকে দণ্ড বহন করিতে হইবে। অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তি বড় নয়, ব্যক্তির চেয়ে আচার বা প্রথা বড়।

কিন্তু মানব সমাজ যুগে যুগে এ কঠিন নাগপাশ ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। পুরাতন নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই নূতন নিয়ম গড়িতে ও দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়-স্থানের যথোচিত ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই, ভাল করিয়া তার সন্ধান পর্য্যন্ত হয় নাই। এই অভাব অত্যন্ত স্থূল ও পার্থিব বলিয়া ঐতিহাসিকের পক্ষেও যেন এদের লইয়া কোন প্রকার গবেষণা করা লজ্জার বিষয়!

বস্তুতঃ, মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়-স্থান

—প্রত্যেকটির বিস্তৃত ইতিহাস বৈজ্ঞানিকভাবে বিবৃত করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কেন করা হয়? কোন জাতি আজ যে খাদ্য ব্যবহার করিতেছে, কেন করিতেছে? এই খাদ্য কিরূপ ভাবে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে? কোন্ কোন্ কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? পরিবর্ত্তনের ফল কোন্ সময়ে কিরূপ হইয়াছে? খাদ্যের সহিত জাতীয় স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কি? জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন, দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংস্থান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ কতখানি হইয়াছে? খাদ্যই বা ঐগুলিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? কোন্ জাতির মধ্যে খাদ্যবিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কতখানি পার্থক্য এবং সেই পার্থক্যের কারণ কি? জাতির বা ব্যক্তির কতখানি সময় খাদ্য-সংগ্রহে যায় ও সময়-সংক্ষেপের কোন্ প্রণালী কোন্ জাতি অবলম্বন করিয়াছে? কারা খাদ্য উৎপাদন করে? কর্ষন-প্রণালী কি?

কোন্ জাতির মধ্যে কিরূপ বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে? ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বস্ত্র-ব্যবহারের বিকাশ কিরূপভাবে ঘটিয়াছে? বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বস্ত্র ব্যবহারে কিরূপ পার্থক্য রহিয়াছে এবং কেন এই পার্থক্য? বস্ত্র-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন কেন ঘটিয়াছে? বস্ত্রনির্ম্মাণ জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন, দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কখন কতখানি নির্ভর করিয়াছে বা করে নাই? বস্ত্রের ব্যবহার দ্বারাই বা সেগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? জাতির বা ব্যক্তির কতখানি সময় ও পরিশ্রম বস্ত্রনির্ম্মাণে বা বস্ত্রসংগ্রহে ব্যয়িত হয়? বস্ত্রের ব্যাপারে কোন দেশকে পরদেশের উপর কতখানি নির্ভর করিতে হয়? কারা কি প্রকারে বস্ত্র উৎপাদন করে? উৎপাদকগণ পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় কি না? বস্ত্র-কর্ষন কিরূপে হয়?

কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে আশ্রয়স্থান নির্ম্মিত হয়? বাড়ী ঘর নির্ম্মাণে কোন্ নির্দ্দিষ্ট রীতি কোন্ কোন্ জাতি অবলম্বন করিতেছে বা করিতেছে না? কেন করিতেছে বা করিতেছে না? কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান প্রণালীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? আশ্রয়-নির্ম্মাণে কোন্ কোন্ লোকের কিরূপ সাহায্য দরকার হয়? দেশে দেশে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বা এক দেশের মধ্যেই যে পার্থক্য রহিয়াছে, তা কতদিনে হইয়াছে? কেন হইয়াছে? আশ্রয় নির্ম্মাণের মাল-মশলায় যুগে যুগে ও দেশে দেশে কিরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে? কেন দিয়াছে? জলবায়ু, প্রাকৃতিক আবেষ্টন, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা বিভিন্ন সময়ে আশ্রয়-রচনার পার্থক্য কতখানি দায়ী? আশ্রয় রচনাই বা ঐ সবকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? কারা আশ্রয় রচনা করে? ইত্যাদি। ইত্যাদি।

উপরে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন এলোমেলোভাবে করা হইল। কিন্তু যে কোনটার উত্তর দিতে গেলেই দেখা যাইবে, খাদ্যে, বস্ত্রে ও আশ্রয়স্থানে মনুষ্যসমাজে কিরূপ বিপ্লবের পর বিপ্লব দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষ এই মূল অভাবগুলিকে চিরদিন উপায় বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। সেইজন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তাপূর্ব্বক তাকে এই উপায়ে সর্ব্বদা বদলাইতে হইয়াছে, আবার না ভাবিয়াও বদলাইতে হইয়াছে। এই বিপ্লবের ইতিহাস মানব-সমাজের এক গৌরবময় ইতিহাস। পুনঃ পুনঃ এই বিপ্লব দ্বারা মানুষ প্রমাণ করিয়াছে যে, সে পশুত্বের অন্তর্গত হইয়াও পশুলোক ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও তাদের চিন্তা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ। তথাপি এগুলি তুচ্ছ নয়। এদের সব চেয়ে ভাল করিয়া পাইবার জন্য অথবা আমাদের সব চেয়ে মূল অভাবগুলি মিটাইবার দিকে আমাদের কম মনোযোগ দিলে অর্থাৎ সেগুলির উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বাধা পায়। এই মূল অভাবগুলি যত সহজে ও যত ভাল করিয়া মিটিবে ততই আমাদের আত্মিক উন্নতির অবকাশ বাড়িবে।

আত্মিক মনাম শারীরিক উন্নতি

শরীরের রক্ষা ও পোষণের জন্য খাদ্য চাই। বস্ত্র সেই

শরীরকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে। আশ্রয়-স্থান গড়িয়া মানুষ পরিবার পরিজনকে লইয়া প্রকৃতির সকল প্রকার অত্যাচার হইতে নিজেকে অনেকটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, বস্ত্র ও আশ্রয় মানুষের ভৌতিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা অথবা বৃদ্ধি করে। এগুলি শারীরিক উন্নতির সহায়ক।

কিন্তু এই স্থূল অভাবগুলি মিটাইবার জন্য কতখানি মনোযোগ বা সময় ও পরিশ্রম দেওয়া যাইতে পারে? শারীরিক উন্নতি দরকার। কিন্তু সেই শারীরিক উন্নতির জন্যই আমাদের সমস্ত যত্ন, চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করিতে হইবে? পশুপাখী হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তা করিয়া আসিয়াছে। ফলে হাজার হাজার বৎসরে তাদের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু মানুষ তা করে নাই। ফলে মানুষের আত্মিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই দুই প্রকার উন্নতির জন্য সময়কে কিভাবে ভাগ করা চলিবে? অধিকাংশ সময় এই তিনটি স্থূল অভাব মিটাইবার জন্য ব্যয় করা হইবে, না আত্মিক উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে?

আত্মিক উন্নতির মোহ মানবজাতির অধিকাংশের মধ্যে এত প্রবল যে, বর্ত্তমানাবস্থার মধ্যে শারীরিক উন্নতির কোন স্থান নাই, কিন্তু আত্মিক উন্নতি সবখানি অথবা অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। আত্মবাদী বলেন, শরীর নশ্বর, অতএব আমাদের স্থূল ও পার্থিব অভাবগুলির দিকে বেশী দৃষ্টি দিলে, সেগুলি কোন কালে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে ত পারা যাইবেই না, অধিকন্তু আত্মার শক্তি খর্ব্বীকৃত হইবে। শরীর যেন জঞ্জাল-বিশেষ, আত্মার অবাধ বিকাশের পথে বাধা-স্বরূপ। শরীরকে ও শরীরের স্থূল অভাবগুলিকে যত শাসনে রাখা যায়, আত্মার শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। আত্মার শক্তিই প্রকৃত শক্তি, আত্মার ঐশ্বর্য্য প্রকৃত ঐশ্বর্য্য।

সংসারে অতিমাত্র দুঃখ-কষ্ট অতিমাত্র শরীর-সেবার ফল। শরীর-ধারণের পক্ষে নাম্বালিয়া পুটিকর খাদ্য অল্প পরিমাণে পাইলেই যথেষ্ট। সেখানে খাদ্য-বিলাসিতার প্রয়োজন কি? সেইরূপ বস্ত্র বা আশ্রয়-বিলাসিতাও নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সন্ন্যাসের আদর্শ শারীরিক সকল অভাব মিটাইবার জন্য সংযমের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দেয়া দিয়াছে। এই আদর্শের ও উপদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে একদিকে আত্মিক উন্নতির চেষ্টা, অন্য দিকে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাব-জনিত দুঃখ ইত্যাদিকে দূর করিবার যত্ন।

প্রথম ভাবিবার কথা এই যে, আত্মিক আদর্শ দ্বারাও দুঃখ ও অভাবকে জয় করা সম্ভব হয় নাই। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় সমস্যা মানুষের পক্ষে হাজার হাজার বৎসরেও সহজ অথবা সরল হইয়া দাঁড়ায় নাই। আজও কোটি কোটি নরনারীকে তার অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতে হয়।

দ্বিতীয় ভাবিবার কথা এই যে, শারীরিক উন্নতি ভিন্ন আত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। মানুষের স্থূল অভাবগুলি ভাল করিয়া না মিটিলে অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ থাকে না। আমি এমন বলিতেছি না যে, স্থূল অভাবগুলি মিটিলেই আপনা হইতে আত্মিক উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু একথা সত্য, দারিদ্র্যের যতই গুণ কীর্ত্তন করা হোক্ না, দারিদ্র্যের ফলে মানুষের সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে বাধ্য। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় চিন্তায় মানুষ তার সমস্ত শক্তি, শ্রম নিযুক্ত করিয়াও যদি যথোচিত পরিমাণে সেগুলি না পায়, তবে তার জীবন ধারণ করা দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়।

দারিদ্র্য পৃথিবী হইতে দূর করা যায় কি না, অথবা মানুষকে খাওয়া-পরার চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় কি না, সে কথার মীমাংসা আজও হয় নাই, শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু বহুবার বহুক্ষেত্রে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবের আত্মিক উন্নতি তার শারীরিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই কথা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রচার করিবার সার্থকতা আছে। কতকগুলি লোক অন্তরে ঠিক উল্টা কথাটা বিশ্বাস করে। আর কতকগুলি লোক অবস্থার পীড়নে হতাশের আশ্বাসস্বরূপে উল্টা কথাটা বিশ্বাস করে। কিন্তু তা কারো পক্ষেই কল্যাণকর নহে। প্রথমে জানা করিয়া বোঝা চাই যে, স্থূল অভাবগুলি মিটাইতে না পারিলেই ধর্ম্মের পথ

প্রণত হয় না। আমরা যদি অন্ন, বস্ত্র বা আশ্রয়ের অভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ পাই, তবে এমন মনে করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই যে, আমরা পরম ধার্ম্মিক বনিয়া যাইতেছি এবং পরলোকে আমাদের জন্য অশেষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই বোঝা চাই যে, যদি আমরা নিজ নিজ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে নিজেদের মূল অভাবগুলি যথোচিতভাবে মিটাইতে পারি, ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া, ভাল ঘরে থাকিয়া সময় কাটাইতে পারি, তবে তা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে যেমন কল্যাণকর, সমাজের ও জাতির পক্ষেও তেমনই কল্যাণকর। ভাল খাইলে, ভাল পরিলে ও ভাল ঘর বাড়ীতে থাকিলে আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা বাড়ে, নিজ নিজ কার্য্যের দ্বারা আমরা সমাজের যথার্থ সেবা করিবার অবকাশ পাই—তাহাই আর্থিক উন্নতির পথ।

বস্তুতঃ, আর্থিক উন্নতি ছুঁইকোড় জিনিষ নয়। শারীরিক উন্নতি ব্যতীত আর্থিক উন্নতির কল্পনামাত্র করা সম্ভবপর নয়। শারীরিক উন্নতির ভিত্তির উপরেই মাত্র আর্থিক উন্নতি দাঁড়াইতে পারে। এই কথা অস্বীকার করিলে জাতীয় জীবনে মহা অনর্থ ও অকল্যাণ দেখা দেয়। এই কথা সকলের আগে বুঝা চাই।

বিদ্যালয়ে হাতের কাজ

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুশারী

আমি ১০ বৎসর ধরে মুক-বধির বিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগে চিত্র-শিল্প, মৃত্তিকা-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থেকে শিল্প-বিভাগের নানা কার্য্য দেখবার ও শিখবার সুবিধা পেয়েছি।

মুক-বধির বালকবালিকাগণ কি করে তাদের কর্ম্মজীবন সার্থক করবে সে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করতে গিয়ে এখন দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সম্বন্ধে ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের অভাব কোথায় এবং তাহার প্রতীকার কি, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে কয়েকটি উপায় দেখতে পেয়েছি।

আমি সাহিত্যিক নই, বং এর মাত্রায় হাত বড় পেকেছে, কথার মালা গাঁথতে ততটা শক্তিলাভ করিনি। তাই সহজ চলিত ভাষায় আমার মনের ভাব ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। জানি না তা পাঠকদিগকে বোঝাবার মত হয়েছে কিনা।

প্রকৃত শিক্ষা এবং তাহার উদ্দেশ্য

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের সম্যক পুষ্টিদ্বারা আমরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করি এবং প্রকৃত শিক্ষা হতে বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকি।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'ল অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও পুষ্টিসাধন। যে শিক্ষায় এ উদ্দেশ্য সফল হয় না, সে শিক্ষা ব্যর্থ।

"মানসিক শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষা দ্বারা মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠতম জিনিষগুলি উদ্বুদ্ধ হয় এবং উহার ফলে মানুষের যাবতীয় বৃত্তিগুলি সুসমঞ্জসভাবে বিকশিত হয়।" (সি এন পিটারসন, এ, এ, ডি, ৬ষ্ঠ ভাগ, নং ২, পৃঃ ১১৯। এ কথা ভুলে গিয়ে এবং হাতের কাজ শ্রমিক সমাজেরই শিক্ষণীয় বিষয়, এই ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে আমরা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে চলেছি। এমন দিন গেছে, যে দিন কুটীর-শিল্পই আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র সম্বল

ছিল। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তখন বিদেশ থেকে আমদানি হতো না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা আজ কুটীর-শিল্প ও হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করি। বিদ্যালয় প্রভৃতির পরীক্ষায় পাশ করাই এখন যেন আমাদের চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পাশের মূল্য যে কি তা' জানবার সুযোগ ঘটে তখন, যখন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি। পাঠশালার নিম্ন শ্রেণী থেকে কলেজের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ্য বিষয় কণ্ঠস্থ করে আমরা শিক্ষক মহাশয়ের মনস্তুষ্টি বিধান করে এসেছি। এমন কি গল্পের সারাংশ ও রচনা প্রভৃতি পর্য্যন্ত বই পড়ে কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করেছি। আমাদের চিন্তা-শক্তি ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এমনি করে সীমাবদ্ধ থেকে আজ আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

বিদ্যালয় প্রভৃতির কর্ত্তব্য শেষ করতে আমাদের প্রায় ২২।২৩ বৎসর কেটে যায়। তার উপর কোনও কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করতে আরও ৫।৬ বৎসর অতীত হয়। জীবনের এই কিছিদধিক ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়, বহু অর্থ ও উদ্যম আমরা ব্যয় করি। তারপর আর আমাদের কতটুকু কর্ম্মক্ষমতা অবশিষ্ট থাকতে পারে? ৫০ বৎসর আমাদের পরমায়ু; জীবনের উন্নতির জন্য এই ৫০ বৎসরের ভিতরে অর্দ্ধেকেরও অধিক সময় আমরা যদি কেবল পাঠ মুখস্থ আর পরীক্ষায় পাশ করেই কাটিয়ে দিই, তবে প্রকৃত কর্ম্ম শিখবার ও করবার সময় আর কোথায় পাব? তারপর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে করতেই কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না। যে কাজেই হাত দিই না কেন, সফলতার সিংহদ্বারে পৌঁছুতেই ৩।৪ বৎসর লেগে যাবে।

আলোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশে যাঁরা বিশেষ মনীষা নিয়েও জন্মেছেন, তাঁদেরও জীবনে উন্নতি করতে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সে বাধার অন্যতম কারণ হচ্ছে সাধারণের সহানুভূতির অভাব। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক কোনও প্রকার সাহায্য কারও উন্নতির জন্য আমরা করতে চাই না। আমাদের দেশে যিনি যা কিছু করেছেন নিজের অসীম ও ঐশ্বরিক শক্তির বলেই তা' করতে পেরেছেন। কোনও বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হয়েছে, এমন লোকের দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নহে। আমরা সবাই নিজেদের সুখ শান্তি নিয়েই ব্যস্ত; কিন্তু এ সুখ শান্তি কোথা থেকে যে আসবে সে ভাবনা আমরা ভাবি না। পরের মুখের দিকে চেয়ে হাত পেতে থাকতে আমরা খুবই অভ্যস্ত।

অর্থ নৈতিক সমস্যা

দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যা ক্রমশঃ যেমন জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে শুধু পুথিগত বিদ্যার জন্য এমন করে সময়, অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করতে যাওয়া উচিত কি? দেশ আমাদের প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র নয়। কথায় বলে "সোনার ভারত"। কিন্তু তবু খেতে পরতে আমাদের জোটে না কেন? এ জন্য দায়ী আমাদের কর্ম্মশক্তি। তদুপরি বৈদেশজাত দ্রব্যাদি তুচ্ছ করে আমরা আবার বিদেশী দ্রব্যে অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। তাই সস্তা আমাদের হাতের তাগ করে চলে যায়। দেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি যতদিন না বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হবে, ততদিন আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে উহা ব্যবহার করতে আমরা ইতস্ততঃ করব, ইহা অনেকটা স্বাভাবিক। আমাদের যথাকথিক মার্জ্জিত রুচির হঠাৎ পরিবর্ত্তন করা খুব সহজ নয়। সবাই যে ভোগবিলাস ত্যাগ করে' সন্ন্যাস অবলম্বন করবে, এ হতেই পারে না। সন্ন্যাসীর রাজ্য দরিদ্রের রাজ্য। দেশকে দরিদ্র করে বিশ্বের দরবারে আমরা তুচ্ছ হয়ে যাব। মনের ঐশ্বর্য্য লোভনীয় হতে পারে, পার্থিব ঐশ্বর্য্যও অবহেলার যোগ্য নয়। যে দেশে যত বেশী বিলাসের সামগ্রী উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় সে দেশ তত ধনী। বিলাসের সামগ্রী ব্যতীত দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করে দেশের ধন বৃদ্ধি করতে হলে, সে সকল তৈরী করবার উপযুক্ত শিক্ষা চাই। আনাড়ীর মত কাজে হাত দিলে, সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তাই এখানে ব্যবহারিক শিক্ষা ও তার প্রবর্ত্তনের জন্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলব।

বস্তু, শব্দ, শিল্প ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ

বস্তুপাঠ দ্বারা আমাদের জ্ঞানের দ্বার ইন্দ্রিয়গুলির পুষ্টি সাধন ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির বৃদ্ধি হয়। ফ্রোবেলের শিক্ষা-গুরু সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসী মহাত্মা পেষ্টালজী বলেন, "শব্দ শিক্ষা দিও না, বস্তু শিক্ষা দাও।" আম শব্দটী পুথিতে পড়লেই আম সম্বন্ধে জানলাভ হয় না; তার রূপ, গুণ সবই জানা দরকার। রূপ, রস ও গন্ধের মিশ্রণে বস্তুর উৎপত্তি এবং বস্তু হতে শব্দের উৎপত্তি হয়। রূপ শিল্পের দ্বারা, রস ও গন্ধ বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় হাতের কাজ

বালকবালিকাদিগকে নিজেদের ইচ্ছামত গড়ে তুলতে চেষ্টা করা একটা মস্ত ভুল। তাদের ভিতরে মানুষের সমস্ত শক্তিই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শক্তি জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়। ফ্রোবেল বলেন, "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। বালকবালিকাদের ইন্দ্রিয়গুলি উন্মুক্ত না হলে জ্ঞানের পথ সুগম হয় না। বাল্যকালে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মনের বশীভূত থাকে না বলেই জ্ঞান পুষ্টিলাভ করে না। এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সবল করাই শিক্ষার প্রথম কাজ। ছেলে-মেয়েদের প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায়, হাতের কাজ প্রাথমিক জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ স্বাভাবিক বুদ্ধি-প্রসূত কার্য্যদ্বারাই বালকবালিকাদের মানসিক শক্তি বিকশিত হয়।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা যুক্তিযোগী মাত্রেই জানেন। প্রথমেই আমরা বালকবালিকাদের হাতে 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ একখানা দিয়ে তার প্রথম পাতা খুলেই "অ, আ, ই, ঈ" পড়তে বলি। নূতন বই দেখে তারা যত বার পড়েই উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়। কারণ তাদের স্বভাব হ'ল সর্ব্বদা নূতন কিছু নিয়ে থাকা। একই বিষয় নিয়ে বেশী সময় তারা থাকতে চাইবে কেন? আমরা কিন্তু তখন তাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে পুনঃ পুনঃ ঐ একই বিষয় পড়তে বাধ্য করি। এরূপ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়ে তাদের শিক্ষা গড়ে উঠতে থাকে। যদি হাতের কাজ, ছবি, গল্প, বা তাদের রুচিকর খেলনা প্রভৃতি দিয়ে ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তা' হলে তারা অমন অধৈর্য্য হয়ে ওঠে না, বরং পড়তে অধিকতর উৎসাহিত হয়।

লেখাপড়ার সঙ্গে হাতের কাজের সম্বন্ধ

"পুথিগত বিদ্যা আর পরহস্তগত ধন উভয়ই সমান।" পরহস্তগত ধন যতক্ষণ না নিজের হাতে আসে ততক্ষণ যেমন তাতে নিজের কোন উপকার হয় না, পুথিগত বিদ্যাও তেমন কাজে না লাগাতে পারলে ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজের ভাব প্রকাশ করতে যে কেবল ভাষারই প্রয়োজন তা' নয়, ভাব প্রকাশের আরও অনেক উপায় আছে। চিন্তার দ্বারা সংগ্রহের জন্য বেশীর ভাগ পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় বটে, কিন্তু সে চিন্তা-প্রসূত ভাবকে পরিপূর্ণ আকারে ও বিচিত্র রূপে প্রকাশ করতে হলে শিল্পকলার সাহায্যেই তা সম্ভব হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি জানতে ভূগোল ও ইতিহাসের ব্যবস্থা, পদার্থজ্ঞান লাভ করতে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা, বস্তুজ্ঞান লাভ করবার জন্য বস্তুপাঠের ব্যবস্থা, বস্তুর আকার-ভেদ জানবার জন্য চিত্রজ্ঞানের ব্যবস্থা এবং স্বাভাবিক বস্তুকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করবার জন্য বস্তুশিল্পের ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানলাভের এগুলি সাধারণ উপকরণ।

সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা আমাদের তখনই লাভ হবে, যখন আমরা আমাদের সর্ব্ববিধ শক্তিকে সংযতভাবে এক সুরে বেঁধে নিতে পারব। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে আকর্ষণের সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে।

কেহ কেহ বলেন, অনেক বিষয় এক সঙ্গে শিখতে গেলে কোন বিষয়ই শিখতে পারা যায় না। লেখাপড়ার সময় অন্য কাজ করলে লেখাপড়া হয় না। প্রকৃত শিক্ষার দিক্ থেকে দেখতে গেলে এ ধারণা অমূলক বলেই মনে হয়। বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজ শিক্ষার যে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা' দেশ-বিদেশের শিক্ষা-নীতিবিদ্-গণের কেহই অস্বীকার করেন নি।

লেখাপড়া শিক্ষার সময়ে আমরা সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় পড়ে থাকি। কিন্তু এই মুখস্থ করা বিদ্যার প্রায়ই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না বলে ইহাকে অকর্ম্মণ্য জ্ঞান বলা যেতে পারে। লেখা এবং পড়ার ভিতর দিয়েই এ জ্ঞান বেশীর ভাগ বেড়ে চলে, কর্ম্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক কমই থাকে। কথায় বলে "কর্ম্মহীন জ্ঞান ও জ্ঞানহীন কর্ম্ম উভয়ই অকর্ম্মণ্য।"

মানুষ যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন, তার যদি প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়, তা হলে তা তাকে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সত্যের পথে চালিয়ে নিয়ে যাবেই। এ কথা সত্য যে প্রত্যেক বিষয়ে কেহ বিশেষজ্ঞ হতে পারে না; কিন্তু সকল বিষয়ে সাধারণ অভিজ্ঞতা বোধ হয় সকলেই লাভ করতে পারে।

মস্তিষ্কের প্রত্যেক কোষের বিভিন্ন কার্য্যশক্তি দেহের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুদের মস্তিষ্কের কোষগুলি আশ্চর্য্যরকমে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জ্জগতের যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। শক্তিপ্রয়োগের জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র থাকে। এই শক্তিকেন্দ্রগুলির কার্য্যকারিতা বিচার করলে দেখা যায়, হস্ত এবং বাহুই এদের অনেকটা স্থান অধিকার করে আছে এবং হস্ত-শক্তি-কেন্দ্র অপরাপর শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত রয়েছে। ইহাদ্বারা এই বুঝা যায় যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শক্তিকেন্দ্রগুলিও কোন কোন বিষয়ে শক্তিলাভে বাধা পায়। যে অঙ্গ পরিচালিত হয় সে অঙ্গই পুষ্টি লাভ করে। আধুনিক শিক্ষায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি ঘটে না, কারণ এ শিক্ষায় হাতের কাজের উপর খুব কম নজর দেওয়া হয়। ফলে হাতের কাজ সম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনার অভাবে জড়তা পায়।

ডাক্তার রবিন্‌সন্ লিখিত "ম্যাসুয়েল ট্রেনিং" প্রবন্ধে তাঁ হেনোভার কৃত মস্তিষ্কের কেন্দ্র-সংস্থানের একটি প্রতিলিপি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচয় আছে; নিম্নে তা দেওয়া গেল।

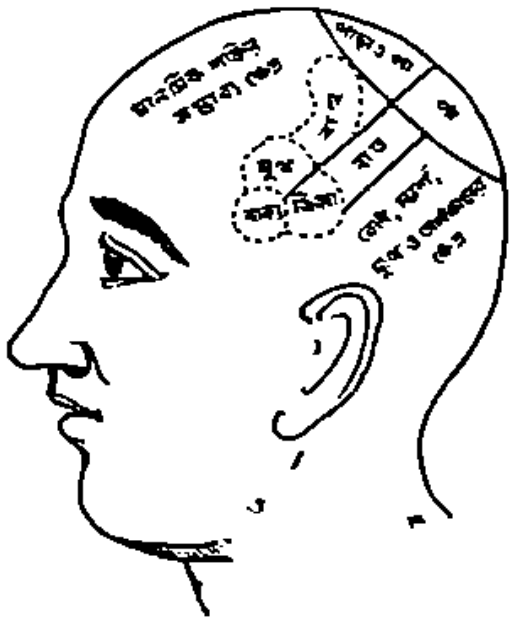

ধারণার প্রণালী (মোড্‌স্ অব্ ইম্‌প্রেশন)		প্রকাশের প্রণালী (মোড্‌স্ অব্ এক্সপ্রেশন)
১। শ্রবণ	১। জিহ্বা	ভাষা (কথিত)
২। দর্শন		
৩। অনুভব		
৪। পরীক্ষা (টেষ্টিং)		সঙ্গীত
৫। ঘ্রাণ	২। হস্ত	যন্ত্রশিল্প
৬। তাপ-জ্ঞান		ভাস্কর্য্য
		অঙ্কন
		সূচশিল্প
		বাদ্য
		ভাষা (লিখিত, মুদ্রিত)*

হাতের কাজে চোখ ও হাতের কর্ম্মশক্তি একযোগে পরিচালনার আবশ্যক হয়। সুতরাং মনুষ্যত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও স্পর্শ শক্তি সম্যক বিকশিত হয়ে থাকে।

মূক-বধিরদের শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজের সম্বন্ধ

মূক-বধির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা অনেকটা শিল্প-চর্চ্চার ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে, বোধ হয় উপায়ান্তর নেই বলে। উপায় যদি থাকত তবে হয়ত সাধারণ বিদ্যালয় প্রভৃতির শিক্ষার মত এ শিক্ষাও কেবল অধ্যয়ন

* এ এ ডি, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩৭১।

ও পাঠে কণ্ঠস্থ করার ভিতর দিয়েই গড়ে উঠত। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ও যত্নে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করছে, মূক-বধিরগণও আজ তাদের জীবন সফল করবার বিভিন্ন পথ খুঁজে পেয়েছে।

এই মূক-বধির বালকবালিকাদের শিক্ষায় সঙ্গে হাতের কাজের প্রয়োজন খুবই বেশী। প্রথমতঃ, ইহাদের শ্রবণ শক্তির ও বাক্‌শক্তির অক্ষমতার জন্য চিন্তাশক্তিও সীমাবদ্ধ থেকে যায়। হাতের কাজ দ্বারা যেমন ধারণা শক্তি এবং হস্ত ও চক্ষুর কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্য কোন কার্যে তেমন পায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ হাতের কাজ ছাড়া কোন প্রকার কাজ করে খেতে তারা পারে না। কারণ তাদের পক্ষে লেখাপড়া, অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই এরা হাতের কাজের শিক্ষা পেয়ে থাকে। ভাষাজ্ঞান ছাড়া কোনও হাতের কাজে বিশেষজ্ঞ হবার উপায় নেই, তা আমি পূর্ব্বে বলেছি। ভাব, ভাষা ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। ভাব ভাষা দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং ভাষা জ্ঞানলাভের উপকরণ সংগ্রহ করে। যারা বধির নয়, তারা বস্তুর ভাবটি ভাষার সাহায্যে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মূক-বধিরগণ বস্তু বা ইঙ্গিতের সাহায্য ব্যতীত ভাব গ্রহণ করতে পারে না। সাধারণের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে অন্ততঃ এতটুকু জ্ঞান ৬।৭ বৎসরে তারা লাভ করতে পারে। অভিভাবকগণ তাঁদের মূক-বধির ছেলেমেয়েদের ইহার অধিক সময় প্রায়ই বিদ্যালয়ে রাখতে পারেন না। সুতরাং আমার মনে হয়, এদের পক্ষে হাতের কাজ শিখবার দিকে অধিক অবহিত হওয়া উচিত। তাতে সময়ও নষ্ট হবে না, আর তাদের জীবিকানির্ব্বাহেরও একটা সহজ পথ করে দেওয়া হবে।

অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি বালকবালিকাগণও হাতের কাজ শিক্ষা দ্বারা অধিকতর উপকৃত হয়।

হস্তশিল্প শিক্ষক হইবার উপযোগী কে

অনেকের ধারণা, যাদের কিছুমাত্র লেখাপড়া হয় না, চিত্রশিল্প প্রভৃতি হাতের কাজ তারাই শিখতে যায়। কথাটার মধ্যে যে কোনরূপ সত্য নেই তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু উপরি উক্ত মন্তব্য যে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তার প্রমাণও ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। যাদের কোন বিশেষ রুচি থাকে তারা অন্য বিষয় শিক্ষা করতে অমনোযোগী হবে, এটা স্বাভাবিক। তবুও সাধারণ শিক্ষার নিয়মাবলী সকলকেই মেনে চলতে হবে, নতুবা সে শিক্ষক হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমাদের দেশে এখন যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, প্রবেশিকা অবধি পড়লে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হবে, এ হিসাবেই তা তৈরী। সুতরাং শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত মূলপাঠ্যের মধ্যে হাতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে শিল্পবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সকলেই লাভ করতে পারে। তার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই যে-কোন রুচিজনক শিল্পের উচ্চ শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে পারা যায় এবং অভিভাবকগণও ব্যয়বাহুল্যে কাতর হন না। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর শিল্প-শিক্ষায় মনোযোগ দিলে, সে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এবিষয়ে স্যার জেম্‌স্ ক্রেইন গ্রাণ্ট বলেন, "যে সব বালকবালিকা ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একেবারে হাতের কাজ জানে না, তার পরে তারা কখনো সে বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করতে পারে না।"

অবশ্য আমি ইহা বলতে চাইনা যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহ কারখানায় পরিণত হ'ক। লেখাপড়া শিক্ষায় শিল্পেরও একটা স্থান থাকে, ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। তারপর কার্য্যক্ষেত্রে দু'এক বৎসর অভ্যাস করলেই বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়।

উপসংহার

যতদিন না আমরা এই হাতের কাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব, যতদিন সাধারণ লেখা পড়া শিক্ষার পাশে এ শিক্ষা স্থান লাভ না করবে, ততদিন আমাদের চৈতন্য ঘুচবে না। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ত দূরের কথা, শিল্প বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও আমাদের দেশে

খুবই কম। আজকাল দেখা যায়, স্থানে স্থানে শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; হয়তো বা দেশের এ দুর্দ্দিন আর থাকবে না। বেকার-সমস্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যাই এখন আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করছে। এ সমস্যার সমাধান কেবল লেখাপড়া শিখায় হবে না। এর জন্য শিল্পের উন্নতিবিধান করতে হবে।

বীমা সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রয়াস

বীমা কোম্পানীগুলি যে টাকা অংশীদার ও পলিসি-হোল্ডারদের নিকট হইতে পায় তাহা তাহারা সুদে খাটায়। সর্ব্বদাই তাহারা যাহাতে পর্য্যাপ্ত সুদ সমেত পায় তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য অনেক সময়ে কোম্পানীগুলি সরকারী কাগজ কিনিয়া রাখে। সরকারী কাগজের ন্যায় নিরাপদ জমা আর কিছুই নাই। কিন্তু সমস্ত টাকা এভাবে আবদ্ধ করা দেশের বা দশের হিতের জন্য হয় না। সেইজন্য বিলাতের বড় বড় হিসাব-নবিশরা বীমা কোম্পানীর টাকার কিয়দংশ দ্বারা সাধারণ শেয়ার কিনিবার জন্য পরামর্শ দেন। আমেরিকায় অধিকাংশ বীমা কোম্পানী সাধারণ ষ্টক ও শেয়ার ক্রয় করে; কারণ ইহাতে লাভ বেশী। বৃটিশ বীমা কোম্পানীরা একটু প্রাচীনপন্থী; কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সেখানেও হাওয়া বদলাইতে সুরু করিয়াছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বৃটিশ কোম্পানীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলিয়াছে; তাহাদের অধিকাংশ মূলধন সরকারী কাগজে আবদ্ধ,—যদিও কয়েকটি কোম্পানী অগ্রণী হইয়া বাহিরের শেয়ারে টাকা চালিয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে কোম্পানীর কাগজের দর খুব কমিয়া গিয়াছে—তথাচ শিল্প ও বাণিজ্যে টাকা চালিতে খুব কম কোম্পানীই সাহস পাইতেছে। ইহার ফলে দেশের এই কোটি কোটি টাকা অনেকটা অলসভাবে পড়িয়া আছে এবং লোকের টাকা তাদের নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে নিয়োজিত হইতেছে না। সাধারণ শিল্প-বাণিজ্যে টাকা চালার মধ্যে অনেক বিপদ আছে—একথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া এ বাধা একেবারে অলঙ্ঘনীয় নহে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর পক্ষে এ বিষয়ে খুবই হুঁসিয়ার হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি এক প্রকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে, বীমা কোম্পানীরা বুঝিয়া সুঝিয়া এই শ্রেণীর যৌথ ব্যাঙ্কে টাকা ধার দিতে পারে। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি শক্তি লাভ করিলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য নানাভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

২। বীমার সহিত ব্যাঙ্কের যোগাযোগ

১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা কোম্পানী আইন অনুসারে ভারতীয় কোম্পানীমাত্রকেই সরকারী কাগজে দুই লক্ষ টাকার জামিন জমা দিতে হয়। সরকারী কাগজের দাম কমিয়া গিয়াছে বলিয়া কোম্পানীগুলি দুই লক্ষ টাকার কাগজ কিনিয়া রেখে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার মূল্য অনেক কম। ইহার সুদও অল্প। কিন্তু ইহার বদলে যদি এই টাকা সরকারের অনুমোদিত দেশীয় ব্যাঙ্কে জমা রেখা হয়, তাহাতে ব্যাঙ্কগুলি পরিপুষ্ট হয় এবং বীমা কোম্পানীগুলিরও সুদের আয় বেশী হয়। ২৪৫টি কোম্পানী যদি দুই লক্ষ করিয়া টাকা দেশী ব্যাঙ্কে জমা রেখ—তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলিতে ৫ কোটি টাকা খাটিতে পারে। নরওয়ে সুইডেন ও এষ্টোনিয়াতে বিদেশী কোম্পানী-গুলিকে দেশীয় ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা দিতে বাধ্য করা হয়।

বৈদেশিক বীমা কোম্পানীগুলি প্রায় ৬০ কোটি টাকা

এদেশে খাটাইতেছে; ইহার অধিকাংশই সরকারী কাগজ। এই বিপুল অর্থ ভারতবাসীর। অথচ ভারতীয় ব্যাঙ্ক বা শিল্প ইহা হইতে কোনো সুবিধা পায় না। জার্মাণ দেশে বৈদেশিক বীমা কোম্পানীকে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা দশ ভাগ জার্মাণিতে জমা রাখিতে বাধ্য করা হয়। সুইটজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে বিদেশী কোম্পানীরা প্রিমিয়ামের সমস্ত টাকাই দেশের ব্যাঙ্কে জমা দিতে বাধ্য। ভারতের পক্ষে মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন, ভারতীয়দের প্রদত্ত অর্থ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু বীমা কোম্পানীগুলি সে দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না।

৩। বিলাতী বীমার নূতন প্রচেষ্টা

জীবন বীমা করিবার সময়ে সকলেরই মনে হয় যে, যদি কয়েক মাস অসুখে পড়িয়া থাকি বা সেবকাদে চালাইতে অক্ষম হই তাহা হইলে ত এতগুলি টাকা একেবারে মাঠে মারা যাইবে। এরূপভাবে অনেক কোম্পানীতে অনেক লোকের অনেক টাকা গিয়াছে। সেই জন্য বর্ত্তমানে বীমা বিজ্ঞানের মধ্যে আকস্মিক অপঘাত মৃত্যু এবং অস্থায়ী ও স্থায়ী অক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইতেছে। আজ-কালকার অনেক কলকারখানার কাজেই এমন কি পথে ঘাটে, আকাশে সাগরে চলিবার সময়েও মানুষের অপঘাত মৃত্যু হয়। কিন্তু বিপজ্জনক কাজে যাহারা ব্রতী তাহাদের জীবন বীমা করিতে পূর্ব্বে খুবই বেশী প্রিমিয়াম লাগিত। এ সম্বন্ধে কোম্পানীগুলির ভয় ক্রমশই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। এবং বর্ত্তমানে হাজার পাউণ্ডে পঁচিশ শিলিং বেশী দেওয়ার বেওয়াজ হওয়ায়, বহু লোকে এই বীমা করিতেছে। বিলাতে এই শ্রেণীর বীমা খুবই চলিতেছে।

আর্থিক অচ্ছলতা ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য অনেকের পক্ষে জীবনের কোনো কোনো সময়ে প্রিমিয়াম দেওয়াই ভার বলিয়া মনে হয়। বীমাকারক যদি যথার্থই অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে মৃতের সহিত তুলনা করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দেওয়ার রীতি অনেক কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা ভাল করিয়াই হয়। শেষোক্ত বীমার জন্য বিলাতে ও আমেরিকায় সাধারণ পলিসি হইতে হাজার করা প্রায় ছয় পাউণ্ড অধিক চাঁদা দিতে হয়।

৪। চাই বীমা বিজ্ঞানে পারদর্শী লোক

বিলাতের বীমা কোম্পানীগুলি খুবই সেকেলে ধরণের—ইহাই হইতেছে কোনো ঔপনিবেশিক বীমাবিদের মত। কোম্পানীগুলির অনেক দোষ, সে জন্য পৃথিবীর বীমা বাজারে ইংরাজ প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। অন্যান্য নানা দোষের মধ্যে বিশেষ দোষ হইতেছে এজেণ্ট-নির্ব্বাচনে। আমাদের দেশেও অনেকের ধারণা যে, যদি কিছু না হয় ত' হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিব, অথবা বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট হইব। কোম্পানীর ধারণা বিপদ মস্তক হইলেই তাকে এজেণ্ট করা যায় এবং এজেণ্টের ধারণা চোখে মুখে কথা বলিতে পারিলেই কাজ হয়। কিন্তু কোম্পানীর মঙ্গলের জন্য এবং বীমাকারীর হিতের জন্য এজেণ্টের সুশিক্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অর্থনীতি, গণিতবিদ্যা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। অদৃশ্য বস্তু বিক্রয় করা খুবই কঠিন। ক্যানাডায় এ বিষয়ে বেশ ভাল নিয়ম আছে: যদি কেহ কোনো কোম্পানীর এজেণ্ট হইতে চায়, তবে তাহাকে সেই রাজ্যের বীমা-বিভাগের সার্টিফিকেট লইয়া তবেই এই কাজে নামিতে হয়। মার্কিণ রাজ্যেও এইরূপ নিয়ম আছে। আমাদের দেশে এজেণ্ট ও সাব-এজেণ্টদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এদেশের অনেকেই পাঁচ কাজের উপর একাজ করেন। তাঁদের না থাকে শিক্ষা, না থাকে বিশ্বাস। বীমা কোম্পানীগুলির এ বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটি আছে; তাহারা জীবন বীমার সহিত, মোটর গাড়ী, বাড়ী, আগুন—সবই বীমা করে; ফলে তাহারাও একাগ্রচিত্তে মানুষের জীবন বীমা সমস্যার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না। ক্যানাডা ও মার্কিণ রাজ্যে বীমা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে; সেজন্য ইংলণ্ড হইতে তাহারাই বীমার আপাইয়া যাইতেছে।

৪৫ বি, বেনিয়াপুকুর রোড ইষ্ট কলিকাতা কলিকা প্রেস হইতে শ্রীঅমূল্যধন পাল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আগ্রহায়ণ—১৩৩৮ আর্থিক উন্নতি ৬ষ্ঠ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—ভক্ত আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

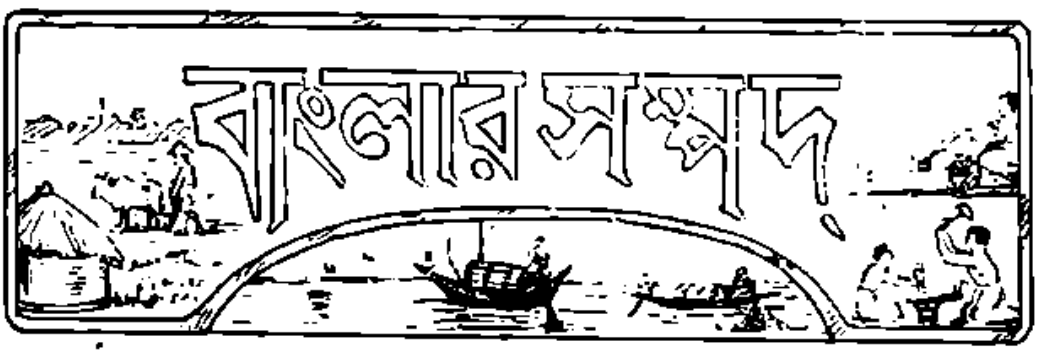

বাংলার কথা—তথ্য-সঙ্কলন

পরিশিষ্ট

"আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন সংখ্যায় বাংলাদেশের ছাব্বিশটি জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও লোকতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় তথ্য-সঙ্কলন শেষ করিয়াছি। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও কলিকাতা এই তথ্য-সঙ্কলন হইতে বাদ গিয়াছে; তদ্ভিন্ন কুচবিহার ও স্বাধীন ত্রিপুরা এই দুইটি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও কিছু লেখা হয় নাই। এগুলির সম্বন্ধে পরে লিখিবার চেষ্টা করিব। তবে মোটের উপর সমগ্র বাংলা-দেশ লইয়া পরিশিষ্টাংশে কতকগুলি বিষয়ে মন্তব্য করা যাইতে পারে। যেমন, (১) শিক্ষা, (২) জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য, (৩) সহর ও গ্রাম (৪) লোকের পেশা।

(১) শিক্ষা

বাংলার পুরুষদিগের মধ্যে হাজার করা ১৮১ জন এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হাজারকরা ২১ জন লেখাপড়া জানে। একখানা চিঠি কোন রকমে লিখিতে বা পড়িতে পারাই লেখাপড়া জানার মাপকাঠি। মোটের উপর বাংলায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হাজারকরা মাত্র ১০৪ জন। সম্প্রদায় অনুসারে সমগ্র বাংলায় হাজারকরা শিক্ষিতের হার দেওয়া গেল—

সম্প্রদায়	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	২৩৮	৩৬
মুসলমান	১০৯	৬
দেশীয় খৃষ্টান	৩১৭	১৬৪
বৌদ্ধ	১৬১	১১
প্রেতোপাসক	১৪	১

(২) জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার দিক্ দিয়া বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্দ্ধমান,

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও যশোহর প্রভৃতি ১২টি জেলায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে।* ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য লোক-ক্ষয়কর পীড়া, জনসাধারণের দারিদ্র্য, জলাভাব (নদী প্রভৃতি মরিয়া যাওয়ায়) ও অন্যান্য কারণ বশতঃ ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস প্রভৃতি কারণগুলি এই জেলাগুলির অবনতির জন্য দায়ী। অথচ সরকার ইহার কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যশোহরের ভৈরব নদ সংস্কারের কথা আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ শোনাই যাইতেছে, অথচ কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। উক্ত জেলাগুলির স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইরূপ উদাসীন। যেটুকু করা যায় সেটুকু করিতেও তাঁহারা নারাজ!

(৩) সহর ও গ্রাম

বাংলাদেশের সহরগুলিতে বাস করে এমন লোকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৩২ লক্ষ ১১ হাজার ৩ শত ৪ জন অর্থাৎ হাজারকরা ৬৭ জন মাত্র। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠগুলি বাদ দিলে হাজারকরা ৪ জন বাংলার অন্যান্য সহরগুলিতে বাস করে। কতকগুলি সহরে ১৯১১ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে শতকরা কতজন করিয়া লোক বাড়িয়াছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল—

সহরের নাম	শতকরা সংখ্যা
রংপুর	১৬ জন
দিনাজপুর	১৩ ,,
জলপাইগুড়ি	২৭ ,,
বগুড়া	৩৫
সৈদপুর (রেলওয়ে কেন্দ্র)	৬৩
ঢাকা	১০
নারায়ণগঞ্জ	১০
মাদারীপুর	৩৩
চাঁদপুর	১৯
ময়মনসিংহ	২৭
বরিশাল	১৯
চট্টগ্রাম	১৪
কুমিল্লা	১৪ ,,

পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের সহরগুলির (বিশেষ করিয়া যেগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র নহে) লোক-সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এই সূত্রে আর একটি কথা বলিবার আছে। বাংলার অধিকাংশ সহর নামেই সহর, অনেকাংশে তাহারা ইয়োরোপের মধ্যযুগের সহরগুলির সহিত তুলনীয়।

(৪) লোকের পেশা

কোন্ কোন্ পেশা অবলম্বন করিয়া কতজন লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং তাহাদের দ্বারা কত লোক পরিজন প্রতিপালিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

পেশা	মোট সংখ্যা সোয়াসহ	প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষ	প্রকৃত কর্ম্মী স্ত্রী
(১) কৃষি ও পশুপালন	৩,৭৪,২৯,৮৪২	১,০৮,২৪,৭০৬	১২,৬৪,৫০২
(২) খনিজ দ্রব্য	৯৭,৪৭১	৩৮,২৫৮	২৯,০৭৩
(৩) কলকারখানা ও গৃহশিল্প	৩৬,২১,৮৩১	১২,৪৫,৫৯৯	৪,২৮,৬৯১
(৪) যানবাহন	৭,০৯,৪৯০	৩,৫৪,০০৪	১৭৭৯
(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য	২৪,৩৯,৮৫৯	৮,০১,৫৪৭	১,৮২,৫৫৮
(৬) সৈন্য, পুলিশ, ইত্যাদি	১,৭৭,৩৫৭	৬৮,৫৬৫	

* ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর যে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যশোহর ও রাজসাহী বাদে আর সকল জেলারই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৭)	সরকারী কর্মচারী	১,৪৪,২৬১	৪৭,৮২৩	৪০৪
(৮)	কেরানী, ডাক্তার প্রভৃতি	৭৮৩,২৮৮	২৩৬,৩৪২	১৮,৭৭০
(৯)	সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল	৩৭,৪২০	১০,২০৬	৩,৪৪০
(১০)	গৃহ-কৃত্য	৬,৮৮,২৬৮	৩,০৮,৮৮১	১,১৬,৩৮৫
(১১)	বিবিধ	৯,৮০,১৮১	৪,০৪,৪৩০	৫,৪৩,৯৩
(১২)	ভিক্ষুক, বেশ্যা*, নর্ত্তক ও বাদক প্রভৃতি	৪,৫১,৮৭০	১,২৮,২০২	১,৪৭,৮৮২

উপরি লিখিত সংখ্যাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কতকগুলি ব্যাপার বোধগম্য হয়। যেমন, বাংলার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এখনও পর্য্যন্ত কৃষি ও পশুপালন এবং যে সরকারী চাকুরীর জন্য আমরা অত্যন্ত লালায়িত তাহাদ্বারা অত্যন্ত অল্পসংখ্যক লোকেরই জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শতকরা কত জন লোক কোন্ পেশা অবলম্বন করিয়া আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

পেশা	শতকরা অংশ
শিল্প	৭·৫%
যানবাহন	১·৫%
পুলিশ, সৈনিক ও চৌকিদার	০·৪%
সরকারী চাকুরী	০·৩%
উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার ও কেরানী	১·৫%
দাসদাসী	১·৫%

সবগুলি পেশা দেওয়া হইল না। কিন্তু যাহা দেওয়া হইল তাহাতেই আমাদের অবস্থা বোঝা যাইবে। বাংলা দেশের শ্রমিক অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ভিক্ষুক ও বেশ্যা প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত ভয়াবহ। এতদ্ভিন্ন অর্দ্ধ-বেশ্যা যে ঠিক কত তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এই তথ্য-সঙ্কলনের দ্বারা বাংলার যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইল তাহা আদৌ গৌরবজনক নহে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার বিপুল চাপে বাঙ্গালী একেবারে পর্য্যুদস্ত হইতে বসিয়াছে। অবশ্য এ সকল সমস্যার সমাধান বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবনে যে সকল আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহারই আলোচনা আমরা 'আর্থিক উন্নতি'তে করিতে পারি এবং ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা রহিল। ১৯৩১ সনের আদম-সুমারীর সম্পূর্ণ প্রতিবেদন শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তখন ১৯২১ ও ১৯৩১ এই দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহার একটা তুলনামূলক আলোচনার সুবিধা হইবে।

শ্রীসুকুমার মিত্র

বাঙ্গালায় গবাদি পশু-সুমারী

বিগত ১৯১২ সনে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা-গণনা করা হয়। তৎপর ১৯২০ সনে দ্বিতীয়বার, ১৯২৬ সনে তৃতীয়বার এবং ১৯৩০ সনে চতুর্থবার গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যা-গণনা করা হইয়াছে।

৮২½ লক্ষ গাভী

সমগ্র বঙ্গদেশে গাভীর সংখ্যা ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬১০টি মাত্র। তন্মধ্যে দেশী-গাভীর সংখ্যা ৮১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৯৭টি এবং বিদেশী গাভীর সংখ্যা ৮১ হাজার ১০টি মাত্র।

৯½ লক্ষ মহিষ

সমগ্র বঙ্গদেশে মহিষ ও মহিষীর মোট সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ১৯৯টি। ইহার মধ্যে মহিষ ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৮০টি এবং মহিষী ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৮৯টি মাত্র। রাজসাহী বিভাগে মহিষের এবং বর্দ্ধমান বিভাগে মহিষীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

* ভিক্ষুক বা বেশ্যাদিগের মধ্যে আবার প্রকৃত কর্ম্মী কথাটা হাস্যকর বটে। তবে এখানে 'প্রকৃত কর্ম্মী' দ্বারা যাহারা ঐ সকল বৃত্তিতে লিপ্ত থাকিয়া পেশা প্রতিপালন করে তাহাদিগকে বুঝায়।

গাভীর সংখ্যায় রাজসাহী বিভাগ প্রথম

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে রাজসাহী বিভাগেই গাভীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৯টি বা প্রায় ২২ লক্ষ। তৎপরেই ঢাকা বিভাগ—গাভীর সংখ্যা ২১ লক্ষ ৬ হাজার ৭৪৮টি। বর্দ্ধমান বিভাগ তৃতীয়—গাভীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৮১টি এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ চতুর্থ—গাভীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২০৪টি। চট্টগ্রাম বিভাগে গাভীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম অর্থাৎ ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭১৮টি মাত্র।

১০½ লক্ষ গাভীর স্থল ময়মনসিংহ জিলা

বঙ্গদেশের ২৬টি জেলার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অর্থাৎ ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬১টি বা প্রায় ১০।০ লক্ষ গাভী আছে। তৎপর মেদিনীপুর জেলা দ্বিতীয়—গাভীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৫১; রংপুর জেলা তৃতীয়—গাভীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১০ হাজার ২৬; দিনাজপুর জেলা চতুর্থ—গাভীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ১৫০; এবং ঢাকা জেলা পঞ্চম—গাভী-সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ মাত্র। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এবং দার্জ্জিলিং জেলাতে গাভীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম।

প্রতি ৬ জন বাঙ্গালীর ১টি গাই

সমগ্র বঙ্গদেশে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৮৯ কম হইয়াছে। কিন্তু দুগ্ধবতী মহিষীর সংখ্যা ১৯২৬ সন হইতে ১৯৩০ সনে ৫২৮২টি অধিক হইয়াছে। সুতরাং, পাঁচ বৎসর মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২০৭টি বা শতকরা ১'৪৬ ভাগ কম হইয়াছে। ১৯৩০ সনে বঙ্গদেশে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষীর সংখ্যা মোট ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৯৯টি; আর সমগ্র বঙ্গের প্রবাসী ও স্থায়ী অধিবাসীদের (বৃটিশ এলাকায়) মোট সংখ্যা ৪ কোটি, ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫০৬ (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে)। অতএব মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পঁচজন বাঙ্গালীর ভাগে ১৮'২৩টি বা প্রায় ছয়জন বাঙ্গালীর ভাগে একটি করিয়া গাভী রহিয়াছে। এত গাভী থাকিতেও বাঙ্গালীর 'দুধে-ভাতে' খাওয়া উঠিয়া গিয়াছে, বিদেশের কৃত্রিম দুগ্ধ ও নানা প্রকার 'ফুড্' শিশু-খাদ্যের স্থানাধিকার করিয়াছে এবং খাঁটি দুগ্ধ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

গাভীর সংখ্যা কমিতেছে

বিগত ১৯২৬ সনের সহিত তুলনায় বঙ্গদেশের চারিটি জেলা ভিন্ন অন্যান্য সকল জেলায়ই গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মাত্র ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ—এই চারিটি জেলায় দেশীয় গাভীর সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। গাভীর সংখ্যা-হ্রাস হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই বাঙ্গালার শতকরা ১৯ জন লোক ভগ্ন-স্বাস্থ্য, বাঙ্গালায় অকালমৃত্যুর সংখ্যা অত্যধিক, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ভয়াবহ, এবং বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নিত্য নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

৫০ লক্ষ জোড়া চাষের বলদ

কলিকাতা ব্যতীত বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলায় চাষের বলদ ও মহিষের সংখ্যা মোট ১০১৮৩০৭টি অর্থাৎ ৫০ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৬ জোড়া। গত ১৯২৬ সনের তুলনায় চাষের বলদের সংখ্যা ১০৫৯৯৬টি হ্রাস পাইয়াছে; এবং ৪১৩৭টি চাষের উপযোগী মহিষের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পোঁ-চষা ভূমির এবং পুষ্টিকর পশুখাদ্যের অভাবে চাষের উপযোগী বলদগুলি কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই, ইহাদের সংখ্যার অনুপাতে কার্য্যের শক্তি নিতান্ত অল্প। এই জন্য বঙ্গদেশের প্রায় ৬০ লক্ষ জোড়া বলদের দ্বারাও চাষের কার্য্য সুসম্পাদিত হয় না। ফলে অনেক স্থানে মহিষের সাহায্যে চাষ করিতে হয়। এ কারণে চাষী বলদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; এবং উহাদের স্থান মহিষের দ্বারা কিয়দংশে পূরণ করা হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। বঙ্গদেশে গাভীগণের ন্যায়, চাষের বলদেরও ক্রমোন্নতিসাধনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা বাঙ্গালার কৃষির ক্রমোন্নতিসাধনও দুষ্কর হইবে না।

এক জোড়া বলদে ১৫ বিঘা জমি চষে

সমগ্র বঙ্গদেশের মোট চাষের জমির পরিমাণ ২৩৩৭০১০০ একার (এক একার কিঞ্চিদধিক তিন বিঘার সমান)। এই জমি ৫০,৯২০৩৬ জোড়া বলদ ও মহিষের দ্বারা কর্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক জোড়া বলদ বা মহিষ গড়ে ৪৫৯ একার বা প্রায় ১৫ বিঘা জমি কর্ষণ করিয়া থাকে।

মেষ ও ছাগল

সমগ্র বঙ্গদেশে ৬,১০,১৭৭টি মেষ এবং ৫৪,৫৫,২৫২টি ছাগল রহিয়াছে। বিগত ১৯২৬ সনের তুলনায় (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর মধ্যে) বাঙ্গালার মেষের সংখ্যা ১৬,৯৪৭টি অর্থাৎ শতকরা ১·৬৪ ভাগ এবং ছাগলের সংখ্যা ৫,৭১,৭৪৫টি অর্থাৎ ৯·৫২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। সংক্রামক অন্তর্বর্তিতঃ মাংসের অত্যধিক কাটতি এবং মহামারী—প্রধানতঃ এই বিবিধ কারণেই মেষাদির সংখ্যা-হ্রাস ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

মেষে বর্দ্ধমান ও ছাগলে রাজসাহী বিভাগ

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক—২,৬৭,৬৩১টি—মেষ রহিয়াছে। তৎপরেই প্রেসিডেন্সী বিভাগ। চট্টগ্রাম বিভাগে মেষের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। ছাগলের সংখ্যা রাজসাহী বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—১৭,৬৫,০৯১টি। তৎপর বর্দ্ধমান বিভাগ দ্বিতীয়—১১,৬০,৫০০টি, এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ তৃতীয়—১১,৫৫,৮০৪টি মাত্র। চট্টগ্রাম বিভাগে ছাগলের সংখ্যা অতি কম—৩,৮৫,৬৭৩টি মাত্র।

লাঙ্গল কমিতেছে

বঙ্গদেশে চাষী-জমির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে; কিন্তু সেই বৃদ্ধির অনুপাতে লাঙ্গলের বা চাষের বলদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই। বর্দ্ধিত বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কথা, বিগত ১৯২৬ সনের তুলনায় সমগ্র বঙ্গদেশে লাঙ্গলের সংখ্যা ২৬,৫০৯ বা শতকরা ২·০৬ ভাগ কমিয়াছে। লাঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে চাষের বলদ ও মহিষের সংখ্যাও ১,০৫,৪৯৬টি বা ৪২,৭২৮ জোড়া কমিয়া গিয়াছে। জমির পরিমাণ বাড়ে অথচ লাঙ্গল ও হাল-চাষের উপযোগী বলদের সংখ্যা হ্রাস পায়; সুতরাং বাঙ্গালাদেশে যে কিরূপ সুফল হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাঙ্গালায় ২৪০ কোটি গবাদি পশু

সমগ্র বঙ্গদেশে ১৯২৬ সনে, সর্ব্ববিধ গবাদি পশুর মোট সংখ্যা ছিল ২,৫৪,৯০,৮২৪টি এবং ১৯৩০ সনে গবাদি পশুর সংখ্যা ২,৫২,৮৬,৮৪৪টি হইয়াছে; অর্থাৎ বিগত পাঁচ-বৎসরে ২,০৩,৮৪০টি বা শতকরা ০·৮০ ভাগ কম হইয়াছে। কৃষি-বিভাগের অনুসন্ধানে প্রমাণ হইয়াছে যে, কাঁচা ঘাসই গোজাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাইটামিন-যুক্ত বা খাদ্য-প্রাণবহুল খাদ্য। গোচর জমির পরিমাণ বাড়াইবার কোনও উপায় অবলম্বিত এবং দেশী ও বৈদেশিক নানা-জাতীয় চাষ করিবার প্রথা প্রচলিত না হইলে, আমাদের বাঙ্গালাদেশে গবাদি পশুর খাদ্য কাঁচা ঘাসের অভাব দূর হইবে না। এ কারণে উহাদের সংখ্যাও ক্রমেই হ্রাস পাইবে। দুগ্ধবতী গাভী এবং চাষের বলদের সংখ্যা-হ্রাস যে জাতির পক্ষে সর্ব্বনাশের কথা, তাহা কৃষি ও স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশের পক্ষে গোধনই প্রকৃত ধন। এই ধনের অভাবেই বাঙ্গালী নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে, এবং মরিতে বসিয়াছে।

২৭২টি উট

বঙ্গদেশের মধ্যে মোট ২৭২টি অর্থাৎ রাজসাহী বিভাগে ১৮২, প্রেসিডেন্সী বিভাগে ২০, এবং বর্দ্ধমান বিভাগে ২৪, ঢাকা বিভাগে ৪২, এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৪টি মাত্র উট রহিয়াছে। ১৯২৬ সনে উটের সংখ্যা ছিল ৪৬৫টি। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৩টি বা শতকরা ৪১·৪১ ভাগ কম হইয়াছে।

১ লক্ষ ঘোটক

সমগ্র বঙ্গদেশে ঘোটক, ঘোটকী এবং উহাদের বাচ্চার মোট সংখ্যা ১,০৪,৫৫৮টি মাত্র। এই সকলের সংখ্যা ১৯২৬ সনে ছিল ১,২৪,৮৮২টি। কিন্তু পাঁচ বৎসরে ১১,৩৪৯টি অর্থাৎ শতকরা ৯·১ ভাগ কম হইয়াছে। সাইকেল ও মটরকারের অত্যধিক সংখ্যা-বৃদ্ধিই উক্তরূপ সংখ্যা-হ্রাসের মুখ্য কারণ। বঙ্গদেশের মধ্যে রাজসাহী বিভাগেই ঘোটকাদির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—৪৮৭৭৬টি। তৎপরেই ঢাকা বিভাগে।

বঙ্গদেশে মোট ১০৩৫টি খচ্চর এবং ১২৪৭টি গাধা রহিয়াছে। বিগত ১৯২৬ সনের তুলনায় ৮০টি খচ্চর বাড়িয়াছে; কিন্তু ১৫৫টি গাধা কমিয়াছে।

(কৃষি-সম্পদ্—কলিকাতা)

বাঙ্গালার বয়নশিল্প

বাঙ্গালা দেশে বয়নশিল্পে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত আছেন। বয়নশিল্পীদের সুবিধার জন্য এখন নানাবিধ তাঁত বিলাত, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ হইতে আমাদের দেশে আসে এবং আমাদের দেশেও প্রস্তুত হয়। যে তাঁতে বয়নকার্য্যের সৌষ্ঠব ও সুবিধা করা যায় সেই তাঁত বয়নকারীদিগের সহজলভ্য করিবার জন্য "ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ"এর অফিসে রক্ষিত রাখা হয়। শিল্প বিভাগ বাঙ্গালা দেশে ২৫টী বয়নশীল বয়ন পাঠশালা ব্যতীত ৯টী বয়নশিক্ষক মাহিনা দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বয়নশিল্প বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে পাঁচ জন স্থায়ী এবং একজন টীকা বেতনভোগী। ইঁহারা বিভাগের নির্দ্দেশানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বৎসরের মধ্যে ৩০৬ দিন শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে বিভাগের এইরূপ শিক্ষক আরও বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে। এই সকল বয়নশিল্পী নূতন নূতন আবিষ্কৃত তাঁতের সরঞ্জাম প্রদর্শন করেন এবং যাহাতে নানারূপ পাড়, নানা রকম কাপড় (মোটা ও সূক্ষ্ম), বেনেব, পশম, সুতা ও পাট বয়ন করা যায় তাহার সুবিধা করিয়া দেন।

সংকারি বলেন যে, এই বয়নশিল্প এবং শিল্পোৎপন্ন সামগ্রী দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেছে। ইহাতে দেশের অবস্থা ভাল করিতেছে। এমন কি দেশীয় চাহিদানুযায়ী সামগ্রী অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতেছে এবং লোকের ব্যবহার করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া দিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের বয়নশিল্পীদের অবস্থার বিষয় যতটা অনুসন্ধান করিতে পারা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, দিন দিন বয়নশিল্পীদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। কারণ এখন অনেক বয়নশিল্পী নিজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপর সামান্য কার্য্যদ্বারা অতিকষ্টে নিজের ও পরিবারের প্রাণরক্ষার উপায় করিতেছেন। ইহাদের রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে দেশী সুতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া উহাদিগকে বয়নশিল্পে নিযুক্ত করিয়া নিজেদের চাহিদামত সস্তা পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র তৈয়ারী করাইতে হইবে। যাঁহারা বয়ন করিবেন, তাঁহারাও তাঁহাদের পরিবারের, এবং দেশের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারেন। এইরূপ কার্য্যে প্রথমে স্নেহ, দয়া, মায়া ও ভালবাসা ভিন্ন অন্য মূলধন কিছুই লাগে না। কারণ শিল্পীদের গৃহে পূর্ব্বেকার বয়ন এখনও কিছু কিছু কাপড় মজুত আছে। উহাদের বিক্রয়লব্ধ টাকাতে বা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়। পরে যদি প্রতি উপার্জ্জনক্ষম তন্তুবায় মাসে ১৲ এক টাকা করিয়া দিয়া (যাঁহারা একেবারে ১০৲ বা তদূর্দ্ধ দিতে সক্ষম বা ইচ্ছুক নহেন) ১০ মাসে একটী "তন্তুবায় বয়ন কো-অপারেটিভ ষ্টোর" আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই অন্তর্বায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই আবার জাগিয়া উঠিতে সমর্থ হইবে। আমার মনে হয়, যে কয় হাজার তন্তুবায় বাঙ্গালা দেশে আছেন, তাঁহারাই অপরের বিশেষ সাহায্য না পাইলেও নিজের প্রস্তুত কাপড় দেশ হইতে দূর করিতে পারেন এবং দেশ তাঁতের কাপড়ে ছাইয়া ফেলিতে পারেন। একটী কল করিতে যে টাকার প্রয়োজন, আমরা সেই টাকার সুতে (টাকাতে হাত না দিয়া) দেশের কাপড়ের যোগান দিতে পারি। আমরা যদি প্রতি তাঁতি এক একজন এক একটী মিল হই, তাহা হইলে যে কোন কোম্পানী, যতই টাকা দিয়া মিল বসান না কেন, কিছুতেই আমাদের সমান

করিতে পারিবেন না। জগতে এত মিল থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালার তাঁতিদের আদর ভারতের চারিদিকে; এমন কি বাঙ্গালার বাহিরেও তাঁহারা আদর পাইয়াছেন। জগতে শিল্প যখন উন্নত হয়, তখন অবনত হয়। বিশেষতঃ যখন বহুশিল্প এত ছড়িলেও মরে নাই তখন মরিবেও না। যে শিল্পের মূলে অন্নদান ও জীবন-রক্ষা, যে শিল্পের মূলে জাতীয় গৌরব রক্ষা ইত্যাদি আছে, তাহা কখনই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে শিক্ষকদের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা ঢাকাতে পশমের গায়ের চাদর তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই পশমের গায়ের চাদরের চাহিদা এ বৎসর এত বেশী হইয়াছে যে, মনে হয়, আগামী বৎসরে যতই তৈয়ারী হউক না কেন সব বিক্রয় হইয়া যাইবে।

ইঁহারা তাঁতের সকল প্রকার সংবাদ, (পুরাতন ও নূতন আবিষ্কৃত) উচিতমূল্যে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনীরদচন্দ্র দাস

(তন্তুবায়-সমাচার—কলিকাতা)

বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারীর প্রচেষ্টা

বড়ই সুখের কথা যে, শ্রীযুক্ত কে, চৌধুরী প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাঙ্গালায় লবণ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন নামক একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম—এই ছয়টী জেলায় লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সমিতি যত্নবান হইয়াছেন। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এই সাধু সঙ্কল্পের সহায়তা করিবেন। উপযুক্ত চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতে পারিলে এবং সরকার বাহাদুর অনুমতি দিলে বাঙ্গালার সমুদ্র উপকূলে যে উত্তম স্বদেশী লবণ প্রস্তুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মদেশে এরূপ প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তথায় কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণের কারখানায় লবণ তৈয়ারী হইতেছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালার উপরোক্ত ছয়টী জেলার উপকূলভাগে কম পক্ষে ৬০০টী ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, এই ৬০০ কারখানায় অন্ততঃ ৬০০০ শ্রমিকের কাজের সংস্থান হইতে পারে। ইহাতে স্বদেশ-সেবা, অর্থার্জ্জন এবং বেকারের সাহায্য, এই তিনটী প্রয়োজনীয় কার্য্য হইবে। সুতরাং বাঙ্গালার শিক্ষিত ও সম্পন্ন যুবকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে রাজস্ব সচিব স্যর জর্জ্জ শুষ্টার ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিবেন এবং বাঙ্গালা দেশে যাহাতে লবণ শিল্প গড়িয়া উঠে তজ্জন্য যথাসম্ভব অর্থ-সাহায্যও করা হইবে। এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াই শ্রীযুক্ত কে. চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বঙ্গদেশে লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। লবণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ। এ দেশে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইলে মূল্যও সুলভ হইবে। ফলে ধনী দরিদ্র সকলেই উপকৃত হইবে।

(সকালের—ঢাকা)

স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী

গোয়ালন্দ ও রাজবাড়ী (বরদ) ষ্টেশনের মধ্যে শীঘ্রই স্বদেশী কোম্পানীর ষ্টীমার যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিবে। এই কোম্পানীর নাম "জগবন্ধু ষ্টীম সার্ভিস"। পদ্মার উপরে স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী এই প্রথম। এই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর। আশা করি দেশীয় লোকেরা ইহার সাহায্য করিবেন।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

কাপড়ের কথা

কাপড়ের মহাজনগণ এবার কাপড় খুব কম আমদানি করিয়াছেন। গত বৎসরের দিশাতী কাপড় প্রায় প্রত্যেক

বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দোকানেই মজুত আছে। মিলের বস্ত্র এবার কিছু বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। এগুলির মূল্য খাঁটি বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষা কিছু কম হইলেও মিলের কাপড়ের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার ফল এই হইতেছে, অল্প লোক খাঁটি বস্ত্র ভাবিয়া মিলের এই বস্ত্র বেশী মূল্যে কিনিয়া শুধু যে প্রতারিত হইতেছে তাহা নহে, ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছে। কংগ্রেস হইতে এই ভেল বস্ত্রের প্রকৃত রূপ সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। মিলের এই ভেল বস্ত্র এই ভাবে চলিতে থাকিলে খাঁটি বস্ত্রের বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

বস্ত্র

পাবনার বাজারে শুধু খাঁটি বস্ত্রের বিক্রয়ের কোন দোকান নাই। মাত্র দুইটী দোকানে খাদি-প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম ও অন্যের বস্ত্র কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাহারা এত অল্প পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করে যে, অধিকাংশ সময়েই চাহিদা মিটাইতে পারে না এবং বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বস্ত্রও দিতে পারে না। বিভিন্ন প্রকারের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র সহরে আমদানি করিতে না পারিলে সাধারণের মধ্যে বস্ত্রের প্রচার-কার্য্য সফল হইবে না।

মিলের কাপড়

মিলের কাপড়ের মধ্যে বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় টেকসই ও ধরে সুবিধার জন্য বাজারে ইহার চাহিদা অন্যান্য কাপড় অপেক্ষা বেশী। কিন্তু বাজারে ইহার আমদানি কম—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সকল রকমের বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় ও ছিট কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ীই আমদানি করেন না। বোম্বাই, আহমদাবাদ প্রভৃতি মিলের কাপড়ই নাকি কলিকাতার মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ বেশী পরিমাণে রাখেন এবং সেই সব কাপড়ই মফঃস্বলের বস্ত্র-ব্যবসায়িদের ঘাড়ে তাঁহারা চাপাইয়া দিয়া থাকেন। বঙ্গলক্ষ্মীর পরিচালকগণ প্রত্যেক জিলাতে তাহাদের বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন এরূপ শুনা গিয়াছিল। কিন্তু পাবনাতে এরূপ কোন প্রতিনিধিও পর্য্যন্ত নিযুক্ত হন নাই।

বাজার দর

বাজারে জিনিষপত্রের দর পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিনি, মিছরি, লবণ, কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল, মসলা, মসলা, ডাক্তারী ঔষধ ইত্যাদির দর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের লবণ বিক্রয়কারী সমিতির সম্পাদক জানাইয়াছেন, তাঁহারা লবণের দর বৃদ্ধি করেন নাই, অথচ মফঃস্বলের মহাজনগণ লবণের দর কেন এত বৃদ্ধি করিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। চিনি, কেরোসিন, ডাক্তারী ঔষধ ইত্যাদির আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এসেম্ব্লিতে রাজস্ব বিল উত্থাপন করিয়াছেন। আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। অথচ ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতেই বর্দ্ধিত হারে শুল্ক আদায় করা হইবে ইহাও গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এই যে বর্দ্ধিত শুল্ক ইহা অর্ডিনান্সের বলে আদায় হইতেছে, না ঐ রাজস্ব বিলের বলে আদায় হইতেছে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। ফলতঃ এই সুযোগের সুযোগে মহাজনগণ পূর্ব্বোক্ত জিনিষগুলির যথেচ্ছ দর-বৃদ্ধি করিয়া এই দুর্দ্দিনে সকলের মনে এক ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। (স্বরাজ—পাবনা)

কলিকাতা বন্দর

১৯২৯-৩০ সনে কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক বৎসরের চেয়ে বেশী হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে বাণিজ্য হইয়াছে, এইবার লইয়া তিন-বার তাহা অতিক্রান্ত হইল। এ বৎসরও ঐ হারে বাণিজ্য বাড়িলে কিং জর্জ্জেস্ ডকে অতিরিক্ত বার্থ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৩০-৩১ সনে বাণিজ্যের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় ২৪% কমিয়া গিয়াছে।

বাণিজ্য ও মাল-চলাচল

কলিকাতার জেটিতে—আমদানির পরিমাণ ৪,৫৩,৩১৭ টন অর্থাৎ গত বৎসরের চেয়ে ২,৭৬,৫৮৫ টন কম।

ডক।—ডকগুলিতে মোট আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ৪৪,১৮,৬০৮ টন। গত বৎসর ছিল ৫৮,৫৪,৬৭৯ টন। আমদানি—৬,৪৬,৮৪৪ টন; ইহা গত বৎসরের চেয়ে ২,০৬,৬০৮ টন কম, এক বোলা গুড়ের পরিমাণ কিছু বেশী, তা ছাড়া অন্য সমস্ত জিনিষ কম আসিয়াছে। সাধারণ রপ্তানি ১৪,৪০,৩১১ টন ও কয়লা রপ্তানি ২৩,৮৯,৩৯৩ টন। গত বৎসর এই দুইয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯,৮৫,০৪২ টন ও ৩০,১৬,১৮৫ টন। একমাত্র চাল কিছু বেশী রপ্তানি হইয়াছে। তাহাড়া অন্য প্রত্যেক পণ্য কম রপ্তানি গেছে, —পাট, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ ওর ও লিগ্‌নো-সোরার খাতে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে কয়লা রপ্তানি কিন্তু অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছিল—৩০ লক্ষ টন।

পেট্রোলিয়াম্ (মোবার্ক), বজবজ।—এ বৎসর সর্ব্বপ্রকার তৈলের মোট আমদানি ১২,২০,৩৩,০৪৭ গ্যালন। ১৯২৯-৩০ সনের পরিমাণ ১২,২৪,৬২,০০৬ গ্যালন। ৩০ লক্ষ গ্যালন কেরোসীন বেশী আমদানি হইয়াছে। কিন্তু পেট্রোল, ডিজল আমদানি, 'লুব্রিকেটিং' তৈল ও অপরিষ্কৃত তৈল আমদানি কম হইয়াছে।

চা।—গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর চা ২,২০০ টন বা ৮% কম রপ্তানি হইয়াছে। চা শুল্কের আয় হইয়াছে ৫,৮৮,৬৬৭৲ টাকা। গত বৎসর হইয়াছিল ৬,০০,২৩৮৲ টাকা।

জাহাজের গতিবিধি

এ বৎসর ১,০১৮টি জাহাজ বন্দরে পৌঁছিয়াছিল, মোট মূল টনেজ ৭২,২৪,০৫৩। গত বৎসর জাহাজ ছিল ১,৪৯৬টি, টনেজ ৮২,৬০,৫০২। নদীতে জাহাজ চলাচল করিয়াছে ১০৪টি; খিদিরপুর ডকে ৭৮২টি। কিং জর্জেস্ ডকে ঢুকিয়াছিল ১১১টি জাহাজ, টনেজ ১১,০৭,৪৪৭। গত বৎসর এই দুয়ের সংখ্যা ছিল ১১৮ ও ৮,০৪,৭১৫ টন।

চট্টগ্রাম বন্দরে পৌনে এগার কোটি টাকার বাণিজ্য

চট্টগ্রাম বন্দরের গত দুই বৎসরের বাণিজ্যের হিসাব নিম্নরূপ।

		১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
		লাখ টাকা	লাখ টাকা
বিদেশী	আমদানি		১৩৪·৭৯
	রপ্তানি	৬৮৪·৪৮	৪৪৯·১৩
মোট বহির্ব্বাণিজ্য		৮৭১·৩৮	৬৯৩·৭২
উপকূল	আমদানি	৩১১·৪৭	৩০৪·২২
	রপ্তানি	১০০·৯৮	৭৫·৯১
উপকূল বাণিজ্য		৪১১·৪৫	৩৮০·৮০
মোট বাণিজ্য		১২৮৩·৮৩	১০৭৩·৫৫

গত তিন বৎসর ধরিয়া চট্টগ্রামের বাণিজ্য ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে। যথা, ১৯২৮-২৯—১৫,১৯,৮৮,২৬২৲ টাকা; ১৯২৯-৩০—১২,৮৪,৬৫,২৯৪৲ টাকা; ১৯৩০-৩১—১০,৭৬,০৩,৩৮১৲ টাকা, অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সনে ১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় হ্রাস ২৯.২% ও ১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় হ্রাস ১৮.২%। বিদেশী ও উপকূল—উভয় বাণিজ্যই হ্রাস পাইয়াছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বন্দরসমূহের বাণিজ্যের মূল্য-হ্রাসের নমুনা: ১৪,৬৯,২৭২৲ টাকা (১৯২৮-২৯), ১২,৮৮,১৮৯৲ টাকা (১৯২৯-৩০), ও ৬১,৩১,৪৪৩ (১৯৩০-৩১)।

সুতরাং অধীন বন্দরসমূহ লইয়া চট্টগ্রাম বন্দরের মোট বাণিজ্যের মূল্য যথাক্রমে ১৬,১৪,৫৭,৮৩৫৲ টাকা (১৯২৮-২৯), ১৩,৭৭,৩১,৪৮৩৲ টাকা (১৯২৯-৩০), ১১,৩২,৫৬,৮২৪৲ টাকা (১৯৩০-৩১)। হ্রাসটা ২২.৪% ও ১৭.২%।

গত বৎসরের তুলনায় মোট বহির্ব্বাণিজ্য ২০·৭% হ্রাস পাইয়াছে; তন্মধ্যে আমদানি-হ্রাস ৩৪·৮% ও রপ্তানি-হ্রাস ১৫·৭%। আমদানির খাতে লোহা বা ইস্পাত, তুলার পীসগুড্‌স এবং মেশিনারি ইত্যাদি যথাক্রমে ৫৭,৪৬,২৮২৲ টাকার, ৩,৭৬,৭০৫৲ টাকার ও ২৬,১০,৯৪৫ টাকার কম আসিয়াছে। আর রপ্তানিতে কাঁচা পাট (৯২,০০৩০২৲ টাকার) ও চা (১৫,৩৬,১৬২৲ টাকার) অধিকতর হইয়াছে।

মোট বহির্ব্বাণিজ্যের ৯০·৩১% অংশ যুক্তরাজ্যের সহিত ও ·৫৩% অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত হইয়াছিল। গত বৎসর এই হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৮৯·০৫% ও ·৮৩%।

এ বৎসর বন্দরে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৪১,৮৫৫ টন ওজনের ৮০২টি জাহাজ বন্দরে ঢুকিয়াছিল, গত বৎসর ঢুকিয়াছিল ৬৪২,৩৬৪ টনের ৮১১টি জাহাজ।

বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু

১৩২৯ ও ১৩৩০ সনে বাঙ্গালায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	আত্মহত্যা		জলে ডুবা		সাপের কামড়		হিংস্র জন্তুর আক্রমণ		ঘর ভাঙ্গিয়া পড়া		অন্যান্য কারণ	
	১৩২৯	১৩৩০	১৩২৯	১৩৩০	১৩২৯	১৩৩০	১৩২৯	১৩৩০	১৩২৯	১৩৩০	১৩২৯	১৩৩০
পুরুষ	১২১৩	১০০৪	১০২৫	৮৭৭	১৩৫৮	১২৯৮	৫৮	৪৭	১১৯	৯৯	৯১৫	১১১৩
স্ত্রী	১৯৩১	১৮২২	৯৬১	৮১৮	১৪৮৫	১৩৮১	১৬	১৬	৪৪	৩৫	৫২০	৪৮৪
বালকবালিকা	৩৮	৪২	৭১১৫	৬৬৪৭	৮৬৬	৭৫০	৮১	৫১	৫৫	৫০	৪৪২	৫০২
মোট	৩১৮৬	৩১৬৮	৯১৪১	৮৪২২	৩৬৮৯	৩৪২৯	১৬৫	১১৪	২১৯	১৬৪	২০৩৭	২০৯৯

কচুরীপানার দৌরাত্ম্য

ফরিদপুর জেলার কাশীয়ানী থানার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে আমাদের সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে এবং ইহারই খাজানা আদায় করিবার জন্য প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে আমি এখানে আসিয়া থাকি, আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ ক্রমশই আবাদের অবস্থা খারাপ হইতেছিল এবং প্রজাগণ ক্রমাগত কচুরী কর্ত্তৃক সমস্ত ফসল নষ্ট হইবার বিষয়ে অভিযোগ জানাইত। বিষয়টী যে কতদূর গুরুতর তাহা এতদিন তেমনভাবে তলাইয়া দেখি নাই, কিন্তু গত বৎসর এবং এবার আদৌ আষাঢ়-পর না হওয়াতেই বিষয়টির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়াছি।

কুমার নদীর একটী শাখা দক্ষিণ দিকে আসিয়া যেখানে বালুগ্রামের খাল নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা দিয়া প্রতি বৎসর বর্ষারম্ভে প্রচুর পরিমাণে কচুরী আসিয়া শিঙ্গিমারার খাল ও শ্রীপুর গ্রামের মধ্য দিয়া দীঘার বিল, বিলপচুনে, হাতজোড়া মোল্লার বিল ও তেকুলিয়া প্রভৃতি বিলের ভিতর দিয়া হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল ধ্বংস করিয়া ফেলে। বিলের ভিতর এক একটি চাষে ২৫০।৩০০ বিঘা পরিমাণ জমির উপর কচুরীর ঝাঁক যখন বাতাসে শস্যের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতে থাকে তখন যে কী ভীষণ দৃশ্য হয় তাহা অবর্ণনীয়। এই সব কচুরীতে বিশেষ করিয়া রাতখামার, মোল্লারকান্দি, তালতলা, ওড়াকান্দী, পাকুলিয়া শিবপুর ও কুমরিয়া প্রভৃতি গ্রামের ফসল একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। দীর্ঘ দিন যাবৎ ভীষণ ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বালুগ্রামের নিকট একটী স্থায়ী পাকা বাঁধ করিয়া দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু সরকার এদিকে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাঁধ দিবার আরও একটী প্রধান কারণ—বর্ষার প্রারম্ভেই বালুগ্রামের খাল দিয়া হঠাৎ এত অধিক পরিমাণ জল আসিয়া পড়ে যে তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তিত বিল ও গ্রামগুলির সমস্ত শস্যই ডুবিয়া যায়। এই জলকে রোধ করিবার জন্য জনসাধারণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সাময়িকভাবে ২।৩টী মাটীর বাঁধ দিয়া আজ ১৬ বৎসর যাবৎ কোনরূপে কিছু কিছু শস্য পাইতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কচুরীরূপ শত্রু তাহাও হইতে দিতেছে না। এই সকল মাটীর বাঁধ না দিলে বিলের জমি কখনো চোরায় না বা চাষ করিবারও ব্যবস্থা হয় না, কিন্তু মাটীর বাঁধ বেশী বর্ষায় ভাঙ্গিয়া ও ভাসিয়া যায় এবং তখনই কচুরীরও ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়। এইরূপ একটি বাঁধের যে কত প্রয়োজন তাহা একবার সরকার ভাবিয়া দেখিবেন কি? ইহাদ্বারা মুকসুদপুর, কাশীয়ানী ও গোপালগঞ্জের সমস্ত অধিবাসীর অশেষ উপকার সাধিত

হইবে। আমি ভুক্তভোগী, এ সম্বন্ধে সরকারকে অনুসন্ধান করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীঅপূর্ব্বকুমার রায় চৌধুরী
(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

পদ্মার ধ্বংসলীলা

বহুদিন হইতে পদ্মা নদী বিক্রমপুরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছে, এবং রাজনগরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়া কীর্ত্তিনাশা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রাক্ষসীর উদর-গহ্বরে এ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের কত কীর্ত্তি যে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা ভাবিলে বস্তুতই বক্ষ বিদীর্ণ হইতে চাহে। প্রায় চারি বৎসর হইল, বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মঠ পদ্মাকর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে। গত বৎসর হইতে বিক্রমপুরের পদ্মাস্তজনবহুল দুইটী প্রসিদ্ধ পল্লী—সানিহাটী ও ব্রাহ্মণগাঁ—পদ্মার প্রকোপে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল, এবং সানিহাটী গ্রামের প্রায় সমস্ত ও ব্রাহ্মণগাঁর অর্দ্ধাধিক নদীগর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; এ বৎসর ব্রাহ্মণগাঁর অবশিষ্টাংশও গ্রাস করিয়া পদ্মা পুনরায় তাহার কীর্ত্তিনাশা নামের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। অনেকের ধারণা ৺অক্ষয়কুমার বাড়রীর বাড়ীতে তারপাশা ষ্টেশনের স্থান দেওয়াতেই ব্রাহ্মণগাঁর শেষাংশ এত তাড়াতাড়ি পদ্মাগর্ভস্থ হইয়া গেল। ষ্টীমার-ষ্টেশন যেখানে যায়, সেইখানেই অহরহ ষ্টীমারের ঢেউ লাগাতে নদীর ভাঙ্গন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগাঁ ছাড়িয়া এখন ষ্টেশন ধানকুনিয়া গিয়াছে; সেখানেও ষ্টেশনের স্থান ব্রাহ্মণগাঁয়ের ন্যায় দ্রুতবেগে ভাঙ্গিতেছে।

গত বৎসর ব্রাহ্মণগাঁর বিখ্যাত ঘোষবাবুদের বাড়ী পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার পরও ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৺অক্ষয়কুমার বাড়রী, ৺চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ৺শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর চারিখানি সুবৃহৎ ও সুসমৃদ্ধ বাড়ী ব্রাহ্মণগাঁর শেষচিহ্নরূপে বিরাজমান ছিল, এবং চারি বাড়ীতেই শারদীয় পূজা সমারোহে সম্পন্ন হইত। অল্পদিন মধ্যে ৺শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য চকমিলান বাড়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইহার সুবৃহৎ ও সুশোভিত ৺চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় পূজার দালান এ অঞ্চলে বড় ছিল না; এই চণ্ডীমণ্ডপ এবং বাড়ী সংলগ্ন বাঁধা পুকুরের পাড়স্থিত নারিকেল ও আম্রবৃক্ষশ্রেণী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ৺শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহুবিধ স্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও ষটক, কুলীন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এখনকার দিনে তাঁহার ন্যায় ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি বিক্রমপুর সমাজে বড় বেশী দেখা যায় না। ইহার বাসস্থান বিলুপ্ত হওয়াতে বহু ব্যক্তি মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিতেছেন। গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগাঁর উক্ত চারিখানি বাড়ীই পদ্মার করাল কবলে পড়িয়া চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে! সম্প্রতি পদ্মা তারাকুলের জমিদার রায় বাহাদুর হরেন্দ্রলাল রায়ের ব্রাহ্মণগাঁস্থিত বাজার ভাঙ্গিতেছে। নদীর গতি যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে এবার বিক্রমপুরের যে আরও কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা বিধাতা জানেন।

(ঢাকা-প্রকাশ)

৫১ লক্ষ টাকার গোসাপ

১৯২৯-৩০ সনের বনবিভাগের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এক সুন্দরবনে ১৩ হাজার গোসাপ নিহত হইয়াছে। ৩ বৎসরের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	সংখ্যা	মূল্য
১৯২৬-২৭	১,৯৫,৩০৭	৩৩,৫৪,০০০৲ টাকা
১৯২৭-২৮	২১,৯৯,০৪২	৩০,৪২,০০০৲ ,,
১৯২৮-২৯	২৯,৪৪,৫১৩	৫১,০৮,০০০৲ ,,

গোসাপ বধ করাতে দেশের মধ্যে সাপের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, সমুদ্র-তীরের নিকটবর্ত্তী জিলাসমূহে ধান্য-ক্ষেত্রে কাঁকড়া বৃদ্ধি পাইয়া ধান্যের অনিষ্ট করিতেছে। মানবের প্রাণ যাইতেছে, তথাপি গোসাপের চামড়া বিক্রয় করিয়া একদল ধনবৃদ্ধি করিতেছে।

গোসাপের চর্ম্মদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের হাতের বগলা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈয়ার হয়। সেইজন্য বিদেশে উহার খুব

সমাদর। যাহারা গোপনে এই ব্যবসা করে তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। গবর্ণমেণ্ট গোপাল বধ নিবারণের জন্য হুকুম জারী করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সম্যকরূপে কার্য্যকর হইতেছে না।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের কষ্ট

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে সুদীর্ঘকাল যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নানারূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বহু আবেদন-নিবেদন এবং কাতর আর্ত্তনাদেও অদ্যাপি রেলকর্ত্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে উদাসীন রহিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তৃতীয় শ্রেণীর মূক যাত্রীরাই প্রতিদিন তাহাদের কষ্টার্জ্জিত সহস্র সহস্র মুদ্রার টিকেট ক্রয় করিয়া রেল-কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। আমরা আশা করিয়াছিলাম, গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত রেলপথে যাত্রীদিগের অভাব অভিযোগের কথা আলোচিত হইলেই শীঘ্র উহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। গত অক্টোবর মাস হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক শত মাইলের উপরে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া যে হারে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তদপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভাড়া বৃদ্ধি সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের রেলপথ-ভ্রমণে কোনরূপ সুবিধাজনক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। প্রত্যেক গাড়ীতে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ যত জন যাত্রীর বসিবার স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, প্রায়শঃই তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক যাত্রী উহাতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ফলে অতিরিক্ত ভীড়ে যাত্রীদিগকে যে কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা প্রায় বাদুড়ঝোলার মত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। সে দৃশ্য সভ্য দেশে সভ্যজাতি-পরিচালিত রেলপথে বস্তুতঃ অভূতপূর্ব্ব। (সম্বন্ধ—ফরিদপুর)

ভারতের আর্থিক অবস্থা

১৯২৯-৩০ সনের শেষ ভাগে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সনে অবস্থা উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, আরো খারাপ হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, পৃথিবীর এরূপ আর্থিক দুরবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই। সকল দেশ সমান দুরবস্থায় পতিত হয় নাই, যে সকল দেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ কাঁচা মালের রপ্তানি ও শিল্প দ্রব্যের আমদানিতে আবদ্ধ সেগুলি বেশী ঝুঁকিতেছে।

দরের উঠানামা

১৯২৯ সনের শীতকাল হইতে সেই যে জিনিষপত্রের দর কমিতে আরম্ভ করে, ১৯৩১ সনের মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত তাহা থামে নাই। এপ্রিল ১৯৩০ হইতে মার্চ্চ ১৯৩১ পর্য্যন্ত পাইকারি দরের হ্রাস নিম্নপ্রকার হইয়াছে: যুক্তরাজ্য ১০%, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৮%, জাপান ১৯%, ভারতবর্ষ ১৯%। দর-হ্রাসের কারণ নানা লোকে নানা প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কতকগুলি এই: অতি উৎপাদন, সোনার অসমভাবে বণ্টন, অযৌক্তিক খরচ না করা, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দুর্য্যোগের ফলে দারুণ ক্ষতি ও তজ্জন্য লোকের মনে অবিশ্বাসের উদ্ভব।

ভারতীয় দ্রব্যের বাজার নাশ

১৯৩০ সনের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের আগে রাষ্ট্র গঠন সম্বন্ধে রাজকীয় কমিশনের বিবরণী বাহির করা সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক জোরসে অসহযোগ আন্দোলন চালানোর ফলে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যই শুধু হ্রাস পায় নাই, বিদেশীরা ভারতীয় পণ্য কিনিতেও ভরসা পায় নাই। ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসের পর বিশেষ করিয়া পশ্চিম ভারতের অবস্থা মন্দ হয় ও বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। এবার সুবৃষ্টি হওয়ার ফলে অতি চমৎকার ফসল জন্মিয়াছে। সুতরাং একদিকে ভারতে রপ্তানিযোগ্য ফসল যেমন প্রচুর মৌজুদ হইতে লাগিল, অন্য দিকে দুনিয়াব্যাপী ভাঁটা ও টানের অভাব জন্য খুব অল্প মূল্য স্বীকার করিয়া সে ফসল বিক্রয় করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এ কথা পাট ও গম সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পাটের টান এত কম হইয়াছিল যে, কলিকাতার পাটকলগুলিকে কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিতে হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার গম এরূপ প্রচুর মৌজুদ ছিল ও রুশিয়া এত বেশী বিক্রয় করিয়াছে যে, দুনিয়ার বাজারে ভারতের গম আর ঠাঁই পায় নাই। সুতরাং বাজার বরং কতকটা ভাল, বাহির হইতে টানটার বদল হয় নাই। গত তিন বৎসরে কোথায় কত টন কাঁচা তুলা হইয়াছে, তার হিসাব নিম্নরূপ:

(হাজার টন)

সন	যুক্তরাজ্য	জাপান	অন্যান্য দেশ
১৯২৮-২৯	৪৩	২৮৭	৩৩২
১৯২৯-৩০	৫৮	২৯৩	৩৮৬
১৯৩০-৩১	৫০	৩০১	৩৫০

দেখা যাইবে যে, যুক্তরাজ্যে ও জাপানে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াছে। ১৯৩০-৩১ সনের মোট রপ্তানি ১৯২৮-২৯ সনের চেয়ে বেশী এবং ১৯২৯-৩০ সনের চেয়ে কিছু কম। আমদানি শুল্ক বাড়িয়াছে ও স্বদেশী আন্দোলন জোরের

সহিত চলিতেছে, এই দুই কারণে বোম্বাইয়ের দিনগুলির অদূর ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় জনগণের ক্রয় করিবার শক্তি অত্যন্ত কম হওয়ায়, বোম্বাইয়ের কলগুলি আশানুরূপ লাভ করিতে পারিতেছে না। "যুক্তিপ্রয়োগ" নীতি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি একীকৃত হইবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ব্রহ্মদেশে খুব চাউল জন্মিয়াছিল, রপ্তানির জন্য প্রায় ৩১ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত ছিল। কিন্তু দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় ও দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে চাষীদের লাভ হয় নাই।

পণ্য রপ্তানির কথা

আলোচ্য বর্ষে ২০২·৪ কোটি টাকার বেসরকারী পণ্য রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ৩১০·৮ কোটি টাকার। সুতরাং হ্রাসটা প্রায় ২৯%। বিদেশী পণ্য পুনঃ রপ্তানি ৭·১৩ কোটি টাকা (১৯২৯-৩০), ও ৫·১৪ কোটি টাকা (১৯৩০-৩১)। রপ্তানি পণ্য এইরূপ হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ পণ্যাদির পরিমাণ হ্রাস নহে, মূল্য হ্রাস। বস্তুতঃ, পূর্ব্ব বৎসর যে পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছিল এ বৎসরও অনেক দ্রব্য সেই পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীও গিয়াছে, কিন্তু দর ভীষণভাবে পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স বিভাগের কর্ত্তা দর-হ্রাসের যে সূচী সংখ্যা তৈয়ী করিয়াছেন তাহা হইতে অবস্থাটা কতক আন্দাজ করা যাইবে। তাহা এই :

(১৯১৪ সনের জুলাই শেষ = ১০০)

পণ্যের নাম	মার্চ্চ, ১৯২৯	সেপ্টেম্বর, ১৯২৯	মার্চ্চ, ১৯৩০	সেপ্টেম্বর, ১৯৩০	মার্চ্চ, ১৯৩১
খাদ্য শস্য	১২৯	১২৮	১০৩	৯৯	৮৬
ডাল	১৪৮	১৪৫	১৪০	১১১	৮২
চা	১৫৭	১২৯	১২১	১০৫	১১৪
তৈলবীজ	১৪৮	১১৪	১৪২	১১৭	৯০
কাঁচা পাট	১০৬	৯০	৭২	৫০	৩৫
পাট দ্রব্য	১০৯	১২২	৮৯	৮৬	৮০
কাঁচা তুলা	১৬১	১৪৬	১০৭	৮৫	৯৩
হাইড্‌স ও স্কিন	১৩০	১০৯	১০০	৭২	৮০

কাঁচা পাট ও পাটদ্রব্য গত মার্চ্চের তুলনায় এই মার্চ্চে যথাক্রমে ৩৭% ও ১০% হ্রাস পাইয়াছে, রপ্তানি মূল্যের পতন ৭৯·১০ কোটি টাকা হইতে ৪৪·৭৪ কোটি টাকা, অথচ পরিমাণ গত বৎসরের ১,৭৬৫ টনের তুলনায় এ বৎসর ১,৩৮৭ টন হইয়াছিল। তুলার বেলায় রপ্তানি ৭·২৭ লাখ টন (১৯৩০) ও ৭·০১ লাখ টন (১৯৩১), কিন্তু মূল্য ৬৫·০৮ কোটি টাকা ও ৪৬·৩৩ কোটি টাকা। এর পরিমাণ ৩৭·৭ কোটি পাউণ্ড ও ৩৫·৬ কোটি পাউণ্ড, মূল্য ২৬·০১ কোটি টাকা ও ২৩·৫৬ কোটি টাকা। বীজের দাম ২৬·৪৭ কোটি হইতে ১৭·৮৩ কোটি টাকা, শস্য, ডাল ও আটা ৩৪·১৯ কোটি হইতে ২৯·৮৮ কোটি টাকা, গাম, রেসিন, লাক্ষা ৭·৩২ কোটি হইতে ৩·৫২ কোটি টাকা। আর হাইড্‌স ও স্কীন রপ্তানিতে এ বৎসর ক্ষতি হইয়াছে ২½ কোটি টাকা। উত্তর ভারতে খুব ভাল গমের ফসল হইয়াছিল, কিন্তু বাজার পায় নাই। গত বৎসর ৬০৬ পা ওজনের এক এক ক্যাণ্ডির দাম ছিল ৩২৷৷০ টাকা, কিন্তু এ বৎসরের শেষে দাম দাঁড়ায় ১৮৲/০। এ বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ ১·২৭ লাখ টন, দাম ১·২৫ কোটি টাকা, গত বৎসর ১৩০০০ টন ২১ লাখ টাকায় বিক্রীত হয়।

পণ্য আমদানির হিসাব

১৯২৯-৩০ সনে ভারতের আমদানি পণ্যের মূল্য ছিল

২৩৮·৯ কোটি টাকা। আলোচ্য বর্ষে দাঁড়াইয়াছে ১৬৩·৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বেসরকারী পণ্য আমদানি ৩১½% হ্রাস পাইয়াছে (মূল্যে)। তুলার সুতা ও দ্রব্য, ধাতু (লোহা ও ইস্পাত), কলকব্জা, চিনি, মোটরগাড়ী, ভিন্ন অন্য গাড়ী,—এই সব দ্রব্যে সব চেয়ে বেশী হ্রাস ঘটিয়াছে। এই সব পণ্যে হ্রাসের পরিমাণ :—

	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
	কোটি টাকা	কোটি টাকা
সুতা ও সুতার জিনিষ	৫৯·৪১	২৫·২৫
ধাতু-লোহা ও ইস্পাত	১৭·২০	১০·৮৮
কলকব্জা	১৯·৩৫	১৪·১৩
চিনি	১৫·৭৮	১০·৯৬
যানবাহন	১০·৮৫	৭·৩১
অষ্ট্রেলিয়ান্ গম	৪·১৮	২·১৫
পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে তুলা	২·১৬	৫·১৫
আমেরিকা হইতে তুলা	·২০	·৮৩

যুক্তরাজ্য হইতে তুলার দ্রব্য আমদানি খুব বেশী রকম নামিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতে তীব্র রাজনৈতিক রকম আন্দোলন ইহার প্রধান কারণ। (কন্‌ট্রোলার অব্ কারেন্সির রিপোর্ট, ১৯৩০-৩১)।

ভারতীয় গমের শেষ পূর্ব্বাভাস (১৯৩০-৩১)

গত বৎসর ৩,১৬,৫৪,০০০ একরে গমের ফসল হইয়াছিল, এ বৎসর ৩,১৬,৫৪,০০০ একরে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, অর্থাৎ ২% বাড়িয়াছে। আর মোট ফসল এবার হইয়াছে ৯৩,০২,০০০ টন, গত বৎসর হইয়াছিল ১,০৪,৬৯,০০০ টন। গত বৎসরের মত এমন ফসল ইতিপূর্ব্বে আর কখনো হয় নাই। এ বৎসর তার চেয়ে ১১% কম হইয়াছে। আরতনের হিসাব এই :

	পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরের গড় হাজার একর	হাজার একর	হাজার একর
বৃটিশ ভারত—			
পাঞ্জাব	৯,২৮৭	৯,৯৫২	৯,৫০২
যুক্তপ্রদেশ	৭,৬১২	৭,১৮২	৭,১১৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩,০৯৮	২,৯৮৩	৩,৪৮২
বোম্বাই	২,২৮০	২,০৫০	১,৮৫৯
বিহার ও উড়িষ্যা	১,২১৩	১,২০০	১,১৯২
উত্তর-প পীমান্ত প্র	৮৯০	১,০৫৭	১,০২৯
বাঙ্গালা	১৪৭	১২৬	১২৩
দিল্লী	৫৮	৫৩	৪২
আজমীঢ়-মারবাড়	২৪	২৯	২৫
মোট	২৪,৪৮৫	২৯,৬১২	২৪,৩৮০
দেশী রাজ্যসমূহ—			
পাঞ্জাব রাজ্য	১,৩৫৩	১,৩৬৯	১,২৬৫
যুক্তপ্রদেশ „ (রামপুর)	১১৯	১১৮	১১১
মধ্যপ্রদেশ „	৩১	১১৫	১১৪
বোম্বাই „	৫৩০	৪১৯	৩৮৮
মধ্য ভারত „	১,৯৫১	১,৮০৫	১,৯১৬
গোয়ালিয়ার	১,১২৭	৯৪৩	১,২৪২
রাজপুতানা	১,২৪৩	১,১৭২	১,০৩৪
হায়দ্রাবাদ	১,১৭৩	১,০২৯	৯৫৩
বড়োদা	৭৩	৭৩	৬৯
মহীশূর	৪	৪	৩
মোট	৭,৫৯৬	৭,০৪২	৭,০৯৫
সর্ব্বমোট	৩২,১৮১	৩১,৬৫৪	৩১,৪৭৫

	ফসলের আদায় নিম্নরূপ :				
	১৯২৯-৩০ হাজার টন	পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরের গড় (হাজার টন)	একর প্রতি উৎপাদন		
			১৯৩০-৩১ পা	১৯২৯-৩০ পা
বৃটিশ ভারত—					
পাঞ্জাব	৩,১২৩	৩,৭৮১	২,৭৭৫	৭৪৯[১]	৮৩১[১]
যুক্তপ্রদেশ	২,৬৮৬	৩,০০৯	২,৪০৯	৭৯০[১]	১,০২৬[১]
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬৩৫	৫৮৮	৭৬৫	৪৫৯[১]	৪৪৬[১]
বোম্বাই	৪৪১	৪৩০	৩৫৬	৪৬৮[১]	৪৯৫[১]
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৫৪	৫১৫	৪৭০	৮৩৮	৯৬১
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	২১৬	২৪৮	২০৫	৫৪৪	৫২৬
বাঙ্গালা	৩৪	৩৩	২৮	৫৩৩	৫৮৭
দিল্লী	১০	১০	১৮	৫৮৯	৬৭৯
আজমীঢ় মারবাড়	৬	১১	৭	৫৬০	৮৫০
মোট	৭,৩০৫	৮,৯২৪	৭,০৬৭		
দেশী রাজ্যসমূহ—					
পাঞ্জাব	৪৩৭	৪২৭	৪২০		
যুক্তপ্রদেশ	৩৯	৩৩	২৬		
মধ্যপ্রদেশ	৬	২৯	২৪		
বোম্বাই	১৪৬	১১৬	১১৮		
মধ্য ভারত	৩২৪	২৬৯	৩৪২		
গোয়ালিয়র	২৭২	১৭৮	২৩১	৪৪১	৪২৩
রাজপুতানা	৩২০	৩৬৪	২২৭	৫৭৭	৬৯৮
হায়দ্রাবাদ	১০৫	১০৭	৮৭	২৫৮	২০৫
বড়োদা	১৭	২০	১৮	৫১৫	৬১৪
মহীশূর	১	১	(ক)	৩৬৩	৪১৩
মোট	১,৬২৭	১,৪৪৪	১,৪২৩		
সর্ব্বমোট	৯,৩০২	১০,৪৬৯	৮,৫৫৬	৬৪৭	৭৪১

সমগ্র ভারতে গমের আয়তন নানা উঠা-নামার ভিতর দিয়া ১৯২১-২২ সনে ২৮ কোটি একর হইতে ১৯৩০-৩১ সনে ৩·২ কোটি একর হইয়াছে, আর ঐ সময়ে ফসলের পরিমাণ প্রায় ৮০½ লক্ষ টন হইতে ৮২½ লক্ষ টনে

১ চিহ্নিত দেশগুলিতে একর প্রতি উৎপাদন তৎতৎ দেশস্থ দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ। (ক) ৫০০ টন।

পৌঁছিয়াছে। আয়তনের তারতম্য হইয়াছে ২·৮ কোটি একর হইতে ৩·২ কোটি একরের মধ্যে, আর ফসলের তারতম্য হইয়াছে ৮০ লক্ষ টন হইতে ১·২ কোটি টনের মধ্যে।

গম আমদানি রপ্তানির কথা

গত চারি বর্ষে ভারতবর্ষ হইতে মোট গম রপ্তানির পরিমাণ নিম্নরূপ :

১৯২৭-২৮ সনে ২,৯৯,৭০০ টন; ১৯২৮-২৯ সনে ১,১৪,৭০০ টন; ১৯২৯-৩০ সনে ১৩,০০০ টন এবং ১৯৩০-৩১ সনে ১,৯৮,৪০০ টন। পৃথিবীর কোন্ দেশ ভারতীয় গম কতটা লইয়াছে তার হিসাব :

(হাজার টন)

	১৯২৭ -২৮	১৯২৮ -২৯	১৯২৯ -৩০	১৯৩০ -৩১	১৯৩১-৩২ জুন অবধি ৩ মাস
যুক্তরাজ্য					৮
ইয়োরোপ (যুক্তরাজ্য বাদে)	৪২				
মিশর					
এশিয়াস্থ তুরস্ক[১]					
আরব পারস্য					
অন্যান্য দেশ	৪	৩	২	১	...
মোট	৩০০	১১৫	১৩	১২৬	৮

১৯৩০-৩১ সনের ১২ মাসে ও ১৯৩১-৩২ সনের প্রথম ৪ মাসে রপ্তানির পরিমাণ এই প্রকার : এপ্রিল ২০০, মে ৭০০, জুন ৪৮,৪০০, জুলাই ৬১,৭০০, আগষ্ট ৪৫,৩০০, সেপ্টেম্বর ২০,৩০০, অক্টোবর ১১,৮০০, নবেম্বর ২,৬০০, ডিসেম্বর ১,৭০০, জানুয়ারী ২,৬০০, ফেব্রুয়ারী ১,০০০, মার্চ্চ ২০০; এপ্রিল ২০০, মে ১০০, জুন ৮,০০০।

গত চারি বৎসরে ভারত যে ভাবে গম আমদানি করিয়াছে :—

(হাজার টন)

	১৯২৭ -২৮	১৯২৮ -২৯	১৯২৯ -৩০
অষ্ট্রেলিয়া হইতে	৬১	৫২৯	২৩১
ক্যানাডা „		১৫	৭
আর্জ্জেন্টিনা „	...	১০	৬
মোট অন্যান্য দেশ ধরিয়া	৬১	৫৬২	৩৫৭	২৩২

১৯৩১ সনের এপ্রিল—জুন তিন মাসে ৮০,৫৬২ টন গম আমদানি করা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ৩৩,৮৬১ টন আসিয়াছিল। এ বৎসর ৭৯,১৫০ টন অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে।

মাদ্রাজ প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য (১৯৩০-৩১)

(ক) বেসরকারী

১। বিদেশী বাণিজ্য	পূর্ব্ব ৫ বৎসরের জের টাকা		১৯৩০-৩১ টাকা
আমদানি—			
পণ্য	২২,৪৫,৯১,৪৬৩	২৬,৮৭,৭৪,৩১৪	২০,৭০,৪৬,২৮৯
সোনা	২,১৪,১৯,৪৮৭	৪,৭১,৯২,৮০৪	৩,৪৩,০৮,৩৩৫
রূপা	১৪,৪৪,৮০৬	৫,১৭,৪৪৫	৬৬,৬২,২০৯
মোট আমদানি	২৪,৭৪,৫৫,৭৮৭	৩১,৬৪,৮৪,৫৬৩	২৪,৮০,২৪,৮১৩

১ তুরস্ক অর্থ ইরাক্, সিরিয়া, আর্ণা।

রপ্তানি—			
বিদেশী পণ্য পুনঃ রপ্তানি	৩৪,৫৬,৪৮০	২৮,৭৮,২২৭	২৭,১২,১০৯
ভারতীয় পণ্য	৪২,৩৭,২৭,৭৯০	৪৪,৭২,২৭,১৯০	৩২,০০,৭৫,১৪৭
সোনা	৬১,০১৬	১,৬২৬	২৯,১৪৩
রূপা	১৫,৫৭,৬১৫	৪৩,৪৪৭	৯,১২৯
বিবিধ মোট	৬২,৮১৩	৫,০১,২৯৪	৬,৫৪,৫২৯
মোট রপ্তানি	৪২,৮৭,৬৫,৭১৪	৪৫,০৬,৫১,৮৫০	৩২,৩৪,৮০,১৯৭
মোট বহির্বাণিজ্য	৬৭,৬২,২১,৫০২	৭৬,৭১,৫৬,৪১৭	৫৭,১৫,৭৫,০১০
২। উপকূল বাণিজ্য			
আমদানি—			
ভারতীয় পণ্য			
বিদেশী পণ্য			
সোনা			
রূপা	২,৭৯৩		
মোট আমদানি	১৯,২৩,৩৫,২৪৬	২২,০৮,১৯,৫৬১	১৯,৫০,১২,৫১১
রপ্তানি—			
ভারতীয় পণ্য			
বিদেশী পণ্য			
সোনা			
রূপা	১৫,৫৫,৬৫১	৬৬,৬৬৭	৪,৪৪,৪০৭
মোট রপ্তানি	১১,৭৬,৯১,৫৭৪	১১,৬৩,৯৯,৮২৭	১০,৬৮,১০,৩৭৫
মোট উপকূল বাণিজ্য	৩১,০০,২৬,৮২০	৩৪,৭২,১৯,৩৮৮	৩০,২৭,২২,৮৮১
মোট বেসরকারী বাণিজ্য	৯৮,৬২,৪৮,৩২২	১,১১,৪৩,৫৫,৮০১	৮৭,৪২,২৭,৮৯১
(খ) সরকারী			
বিদেশী—			
আমদানি	৩৮,১৯,৯৫১	৪৬,০২,১৪১	
রপ্তানি	৪৭,৭৪৩	১৭,৯০৫	
উপকূল—			
আমদানি	১০,০৩,৬০০	৮,৮৪,৭৮৪	১২,১৩,৬১৬
রপ্তানি	৪২,০৮,১২৪	৮,৯০,৪৮৮	৪,৯০,৮৬৪
মোট সরকারী	৯০,৮৯,৪২৮	৪৩,১৬,৩৪৮	৪০,৭৮,৫৭৫
মোট বাণিজ্য	৯৯,৫৩,৩৭,৭৪০	১,১১,৮৭,৫২,১৫৯	৮৭,৮৩,০৬,৪৬৬

মোট বাণিজ্য ২১·৪২% হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার আমদানি রপ্তানির হ্রাস নিম্নরূপ :

	আমদানি			রপ্তানি		
	পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরের গড়	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরের গড়	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৩৬৬·৪৬	৪৩৭·৪৩	৩৩৭·৫৩	১১১·০৩	১,০৬৩,৮৫	১,০৫৪·৪১
২। কাঁচা মাল, শিল্পজাত নয়	২৩৮·৫৩	৩১৭·৪০	২২৮·৪৯	১,৯৮৪·২১	২,১৮২·৭৭	১,২০৯·১৫
৩। শিল্পজাত দ্রব্য	১,৬০১·৪৫	১,৮২৪·৪০	১,৩৯১·৮৯	১,১৫৯·৯০	১,১২৬·৪১	৮৮৬·৩৪
৪। জীবিত জন্তু	১·২৫	১·১১	১·৯০	২৯·৯০	২৮·৭৮	২০·০০
৫। ডাকের দ্রব্য	৩৮·২৪	৩৭·৪০	৩৪·৮৬	৯৭·১০	৭০·৪৬	৪৯·২৫
মোট	২,২৪৫·৯৩	২,৬৬৭·৭৪	২,০৭০·৪৭	৪,২৭০·৮৪	৪,৪৭২·২৭	৩,২০০·৭৪

আমদানি কমিয়াছে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির : চিনি, তামাক, কফি, মসলা, মদ, ফল, সব্জী, প্রভিশন, চা, কাঁচা রেশম, সার, কাঁচা হাইড্ ও স্কিন, এক প্রকার মূল্যবান্ পাথর ও মুক্তা, বনে-শিল্প, ধাতু, রেল বাহীত অন্য যান, কলকব্জা, রবার, কাঁচা দ্রব্য, মৃৎপাত্র, পোষাক, কাগজ, ছুরিকাঁচি, মনোহারি দ্রব্য, পেষ্টবোর্ড, রং, কেমিক্যাল ও ঔষধ। আর রপ্তানি : বাঁশ, কাঁচা তুলা, কাঁচা রবার, বইল, তৈল, পাট, হাইড্ ও স্কিন, অস্ত্র, সার, শিং, গাছের ছাল, ঝিনুক, কাঠ, চামড়া, সুতার দ্রব্য, ঘড়ি, বাড়ী নির্ম্মাণের দ্রব্য, ঔষধ, ধাতু, পশম দ্রব্য, ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান আমদানি রপ্তানি দ্রব্য

প্রধান প্রধান বিদেশী পণ্য আমদানি :

	পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরের গড়	১৯২৯-৩০	
	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা
ধাতু ও তন্ত্র	২৮৫·২৮	১৯৮·৫২	২২২·৭৬
মেশিনারি ও মিল ওয়ার্ক	১৭২·৯১	২৪২·৮৫	২০৪·৭৮
তৈল	১৪৭·৬০	১৭০·২৮	১৯২·৭৬
সুতার দ্রব্য	২৮৫·৭০	৩৪৬·৬৬	১৯৪·৮৫
চিনি	১১৯·৯১	১৮৫·৪৯	
যান (রেলওয়ে লোকোমোটিব্ বাদ)	১০৩·৫৬	১৫০·৫৩	১০৯·২৬
তুলার টুইষ্ট ও ইয়ার্ণ	১৪৭·৭১	১৫৯·১৩	৮৩·৪৭
প্রভিশন	৪০·১৫	৭৩·২৮	৭১·৯৮
হার্ডওয়্যার	৫৮·১৬	৬৯·০০	৬০·৫৪
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	৫১·০২	৫৯·০৬	৫১·৬২
রং করিবার দ্রব্য	৪১·৮১	৫৫·৯২	৪৮·৪৫
মসলা	৬০·৩৬	৪৬·২৮	৪৪·৫৩
কাঁচা রবার	৩৬·৯২	৬১·৬৬	৪২·৯৫
যন্ত্রপাতি	২৬·২৭	৩৯·৪৭	৪০·৮০
কৃত্রিম রেশম	১৫·১৩	৩৩·১৭	৩১·৬১
কাঁচা রেশম	৩৯·৬২	৫১·৬৪	৩৪·১২
সার	১৪·২০	৪৬·১২	৩২·৪৮
তামাক	৩৫·৬১	৪৪·১৫	৩০·৬১
লাখান	১৮·৭৪	২৬·৮০	২০·১১

ভারতীয় পণ্য ও শিল্প-দ্রব্য রপ্তানি :

বীজ	৯,১৪৩·৫১	৪১২·৩০	৮১০·৭৪
চামড়া	৬৮৮·৬৭	৬৯০·৫১	৫৬৪·২৬
চা	৩৬৫·৬৮	৪২৪·৯৮	৪১১·৬৮
শস্য, ডাল ও আটা	১১১·২৯	১৯২·৭৮	১৮৯·৭৫

কফি	১৮০·২৯	১৪১·৮৭	১৮৮·৩৫	খইল	২৯·৭২	২৮·৭৮	৯০·০০
সুতার দ্রব্য	২৬৯·০২	২৪১·১৩	১৭৫·৮২	জীবন্ত পশু	১৫·৩৯	১৭·২৯	১৪·৫৮
কাঁচা তুলা	৪৬৯·০৬	৪৫২·৪৪	১৬৩·৯৬	অস্ত্র	১৪·১৩	১৭·১৭	১৪·৯৪
রবার	১২৮·৪৫	১২৪·৬৭	৯৯·৭১	সাবু	১৭·১৩	১০·৫৭	১০·৫৬
ঘড়ি	১০৮·৭৮	১০৩·৩০	৮৭·৬৭	তৈল	২৮·৬৮	১৯·৪১	১০·০৫
তামাক	৪৯৮·৩	৫৯·০৬	৬২৮০				
কল ও যন্ত্রী	৫৭·৮৮	৬৫·১২	৬১·৮২				
মসলা	৮২·৫৯	১১২·২৮	৬০·৬০				
মাছ	৩৩·৭০	৩৭·৪৬	৩৪·৪৭				
হাইড ও স্কিন, কাঁচা	২৫·৮৪	২৭·৭৯	২৫·৫৮				

দুই লাখ মোটর যানের দেশ ভারতবর্ষ

১৯৩১, মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে কোন্ প্রদেশে কি প্রকার মোটর যান কয়খানা ছিল তাহার হিসাব নীচে দেওয়া যাইতেছে :

	মোটর কার ট্যাক্সি সুদ্ধ	মোটর সাইকেল স্কুটার ও অটোমোবিল (লরি, বাস, ইত্যাদি) সুদ্ধ	ভারি মোটর কার	
বাঙ্গালা (কলিকাতা সুদ্ধ)	৩৩,২২০	৪,৮৪৯	৪,১২৮	৪২,১৯৭
বোম্বাই সহর	৮,৩৩৬	৪৯৯	৮৭৩	৯,৭০৮
বোম্বাই (সহর ও সিন্ধু বাদ)	৪,০২৭	৭৭২	৭০	৯,৮৬৯
মাদ্রাজ সহর	১২,৩৩১	৩,০১৩	১,৯০২	১৭,২৬৬
মাদ্রাজ (সহর বাদ)	৭,৭৪২	১,৮৭৩	৭,৫৩২	১৭,২৫৭
যুক্তপ্রদেশ	১২,০১৫	২,১২০	৪,৩৫৮	১৯,৪২৩
পাঞ্জাব	১১,৬৬৬	৪,২১৬	৭,৪১৪	২৩,৩৫৬
ব্রহ্মদেশ	১১,৪৫৯	১,৩১২	৭,১১৯	১৯,৮৯০
বিহার উড়িষ্যা	৯,০০৫	১,২৪২	২,২০৭	১২,৬৮৪
মধ্যপ্রদেশ	৫,২১০	১,০৬১	১,৫২৪	৮,৭৯৫
সিন্ধু	৪,০২৪	১,০৮১	১৪৭	৫,২৬২
দিল্লী	৫,৭০৬	১,১১৪	১,২৭২	৮,০৯২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩,০৬৬	১,৩৫৪	২,০৫৯	৬,৪৭৯
আজমীঢ় ও খাড়	৫৫০	১৫২	১৮১	৮৮৩
আসাম	২,১৮০	৩০৬	১,৬১৯	৪,১৫৪
মোট	১৭৫,৪৩৬	২৪,৯২৪	৪৪,৬৬৫	২০৫,১৬৫

গোটা ভারতে মোট যত মোটর যান তার এক-পঞ্চমাংশ বাঙ্গালায় অবস্থিত, কিন্তু ট্যাক্সি সমেত মোটরকার এক-চতুর্থাংশ ও ভারি মোটর যান এক-দশমাংশ। যদি সমগ্র ভারতে বাঙ্গালার মাপে মোটর থাকিত তবে মোট যানের সংখ্যা ২½ লক্ষ ও ট্যাক্সি সমেত মোটরকারের সংখ্যা ২ লক্ষ হইত। সমগ্র ভারতের মাপে বাঙ্গালায় মোটর লরি ইত্যাদির সংখ্যা ৭ হাজারের উপরে হওয়া উচিত ছিল। মোটামুটি বলা চলে প্রত্যেক সাড়ে ছয় হাজার

ভারতবাসী একটি মোটরকার ও প্রত্যেক দেড় হাজার বাঙ্গালী একটি মোটরকার ব্যবহার করেন।

যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের ব্যয়সঙ্কোচ

যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের মোট বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা। এ বছরে ৫৫ লক্ষ টাকার ব্যয়সঙ্কোচ করা হয়েছে। ব্যয়সঙ্কোচ-সমিতি বলেন যে, আরও ১ কোটি টাকার ব্যয়সঙ্কোচ করা যেতে পারে। এই ১ কোটি টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা কমানো যেতে পারে মাহিনা কমিয়ে দিয়ে।

আসামে বেকার সমস্যা

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের সাংবাদিক মোড়হাট থেকে ৩০শে অক্টোবর তারিখে জানাচ্ছেন যে, আসামে বেকার সমস্যা খুব প্রবল। সম্প্রতি একটী চা-বাগানে মাসিক ১২ টাকা মাহিনাওয়ালা এক কেরাণীর পদ নাকি খালি হয়। নতুন লোকের জন্য কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নি। চা-বাগানটী সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন থেকে ৫ মাইল দূরে। তা সত্ত্বেও ৫০ জন লোক নিজে এসে পদটীর জন্য প্রার্থনা জানায়। তাদের মধ্যে জন কয়েক ম্যাট্রিক পাশ করা ও জন কয়েকের চা-বাগানের অভিজ্ঞতা ছিল। ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে কাকেকেই নেওয়া হয় নি।

মাদ্রাজের ৭০০টী 'বাসের' হ্রাস

গত ৩২শে অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ডাবিলউ এম্ ব্রাউনিং সরকারকে জানান যে, মোটর গাড়ীর উপর করের চাপ বাড়ার ফলে গত ১লা এপ্রিল হ'তে মাদ্রাজের ১৮টী জেলায় ৭০০টী বাসের চলাচল বন্ধ হয়েছে।

ভারতীয় ফসল (১৯৩০-৩১)

গম চাষের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল। অন্য কয়েকটি ফসলের আবাদ ও আয়তন নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	অনুমিত আয়তন	গত বৎসরের (=১০০)	শেষ অঙ্ক ১৯২৯-৩০ একর	অনুমিত আবাদ	গত বৎসরের (=১০০)	শেষ অঙ্ক ১৯২৯-৩০
		কত অংশ			কত অংশ	
নীল		৯০	৬৬,২০০	১৩,৫০০ হন্দর	৯৪	১৪,৪০০ হন্দর
আখ		১১০	২৫,১৫,০০০	৩১,৭৮,০০০ টন	১১৫	২৭,৬১,০০০ টন
বাদাম		১০৯	৫৭,৪৮,০০০	২৯,৮৮,০০০ টন	১১২	২৬,৬৮,০০০ টন
চাউল		১০২	৮,০৪,৭৯,০০০	৩,১৫,৯৩,০০০ টন	১০১	৩,১১,৩১,০০০ টন
ক্যাষ্টর	১৪,৫৭,০০০	১১৩	১২,৮৫,০০০	১,২০,০০০ টন	১০৩	১,১৬,০০০ টন
তিসি	৫৫,৪১,০০০	১০৪	৫৩,৪৫,০০০	৫,২৩,০০০ টন	১১৫	৪,৫৫,০০০ টন
তুলা	২,৩৬,১৬,০০০	৯১	২,৫৯,৪২,০০০	৪৮,২০,০০০ টন	৯৭	৫১,২৫,০০০ টন
সরিষা	৬৫,১০,০০০	১১০	৫৯,০৭,০০০	৯,৭৭,০০০ টন	৮৯	১০,৯৫,০০০ টন
ষসিনা	৩০,২০,০০০	১০৮	২৮,০২,০০০	৩,৭৮,০০০ টন	১১৫	৩,৮০,০০০ টন

নীল—মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই (সিন্ধু সমেত) = সমগ্র ভারতীয় নীল আবাদের ৮৯%।

আখ—সংযুক্ত প্রদেশ (দেশী রাজ্য সমেত), পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, (দেশী রাজ্য সমেত), উ-প-সীমান্ত প্রদেশ, আসাম, ব্রহ্মপ্রদেশ ও বেরার, দিল্লী, আজমীর, বেলুচিস্থান, বড়োদা = ৯৬% এর কিছু বেশী।

বাধাম—মাদ্রাজ, বোম্বাই (দেশী রাজ্য সমেত), ব্রহ্ম, হায়দ্রাবাদ = ৯২% এর কিঞ্চিৎ বেশী।

চাউল—বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ (দেশী রাজ্য সমেত), মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (ঐ), আসাম, বোম্বাই (ঐ), কুর্গ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বড়োদা = প্রায় ৯৭%।

ক্যাষ্টর—গোটা ভারতবর্ষ।

তিসি—ব্রহ্ম, সংযুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই (দেশী রাজ্য সমেত), মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালা পাঞ্জাব, আজমীঢ়-মারবাড়, হায়দ্রাবাদ, বড়োদা কোটা (রাজপুতানা) = ৮৯%।

তুলা—গোটা ভারতবর্ষ।

সরিষা—সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, আসাম, বোম্বাই (দেশী রাজ্য সমেত), উ-প-সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, আজমীঢ়-মারবাড়, বড়োদা, হায়দ্রাবাদ = ৯৬% এর কিঞ্চিৎ বেশী।

মসিনা—মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (দেশী রাজ্য সমেত), সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, বোম্বাই (দেশী রাজ্য সমেত), পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, কোটা—প্রায় ৯২%।

গম—পাঞ্জাব (দেশী রাজ্য সমেত), সংযুক্ত প্রদেশ (ঐ), মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (ঐ), বোম্বাই (ঐ), বিহার ও উড়িষ্যা, উ-প-সীমান্ত প্রদেশ, বাঙ্গালা, দিল্লী, আজমীঢ়-মারবাড়, মধ্য ভারত, সৌরাষ্ট্রিয়। রাজপুতানা, হায়দ্রাবাদ, বড়োদা, মহীশূর—৯৮% এর কিঞ্চিৎ বেশী।

উন্নতির পথে আহম্মদাবাদ

লোকাল অথরিটিজ্ লোন্‌স্ আক্ট্ নামে একটী আইন আছে; ইহার বলে জেলা বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের হুকুম লইয়া টাকা ধার করিতে পারে। এই আইনের বলে আহম্মদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি ২০ লক্ষ টাকা ধার করিবার অনুমতি পাইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ১৫ লক্ষ টাকায় সহরের পথগুলিকে ১০ মাইল পর্য্যন্ত আস্‌ফাল্ট দিয়া বাঁধানো ও বাকী টাকায় বিজলী বাতির ব্যবস্থা বাড়ানো। ঋণ লক্ষ করিয়া দুই কিস্তিতে শতকরা ৫% হারে সুদে এই টাকা তোলা হইতেছে। আহম্মদাবাদ ধনী সহর, টাকার অভাব হইবে না। সহরে ৭০টির উপর কাপড়ের কল আছে; নূতন আরও হইতেছে। কিন্তু সহরটি যে পরিমাণে ধনী, ইহার রাস্তাঘাট সে পরিমাণ সুন্দর ও সুগম নহে। অতদিন পরে আহম্মদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি এদিকে দৃষ্টি দিয়াছে। এই টাকা ৩০ বৎসরে শোধ হইবে; ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বেও শোধ দিতে পারিবার সর্ত্ত আছে। বহু বিস্তৃত ড্রেনেজ প্রণালীর ফলে মিউনিসিপ্যালিটি আশা করে ১½ লাখ বাড়াইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহা হইতে ও অন্যান্য আয় হইতে কর্জ্জ শোধ করা যাইবে বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির বিশ্বাস।

চাষ সম্পর্কে বড়োদার চেষ্টা

বড়োদা রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কৃষির উপর পড়িয়াছে। গত বছরের সরকারী প্রতিবেদনে নায়েব দেওয়ান বাহাদুর কর্ম্মচারীদিগের সহিত চাষীদের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যাহাতে হয়, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সরকারী চাষবাড়ীর অধ্যক্ষেরা প্রতি বৎসর একটি বা দুটি তালুক লইয়া চাষীদের সহিত চাষবাস সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিবেন ও সরকারী পরীক্ষার ফলাফল বুঝাইয়া দিবেন। পুস্তিকা ছাপাইয়া বিলি করা যায়; কিন্তু নিরক্ষর চাষীদের কাছে কথাবার্ত্তার সাহায্যে যে কাজ হয় তাহা পুস্তিকা দ্বারা হইতে পারে না।

নূতন সারের পরীক্ষা কেবল সরকারী চাষবাড়ীতে করিয়া কাজ থাকিলে চলিবে না; চাষীর নিজ ক্ষেতে সরকারী পরীক্ষিত সারের পরীক্ষা করাইতে হইবে; কারণ চাষীর ঘুসঘুসাতের সংস্কার ভাঙ্গা খুবই কঠিন। বড়োদা রাজ্যের কোন কোন জেলায় বেশ ভালভাবেই এই কাজ চলিয়াছিল।

দেশের নানা স্থানে বিদেশী কলকব্জা আমদানি হইয়াছিল। বড়োদায় বহু নূতন মোটর ট্রাক্টর অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। কথা হইয়াছে যে, এই সব ট্রাক্টর

কোথায় কিভাবে আছে তাহার একটা হিসাব লওয়া উচিত।

একটা বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে বলিয়াছেন; সেটি হইতেছে কৃষি ডিরেক্টর বা পরিচালকের পরিবর্তন সম্বন্ধে। ডিরেক্টর সারা বছরে ৭২ দিন মাত্র ঘুরিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে প্রায় চল্লিশ দিন কাটান আমেরিকা জেলায়। লাটের মেওয়ান এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভারতীয় পুলিশ

পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরে ভারতবর্ষের মিলিটারী পুলিশের সংখ্যা প্রকাশ পাইয়াছে। সংখ্যাগুলি ১৯২৯এর।

আসাম	৩,৮২৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৪,০৩৪
বর্ম্মা	১০,০৯০
বিহার উড়িষ্যা	৪৩৯
বঙ্গদেশ (ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্ এর সেনা)	৮:৮

এ ছাড়া গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানে এমন অতিরিক্ত পুলিশের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—

মাদ্রাজ	৬০০
বোম্বাই	২,২০০
যুক্তপ্রদেশ	৫০০
পঞ্জাব	৯০০
বিহার-উড়িষ্যা	৪০০
মধ্যপ্রদেশ	২৪৫
উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত	১,২২৪
দিল্লী	৫০৭
বঙ্গদেশ	৪০০

পুলিশের ও সার্জ্জেণ্টদের বেতন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ যে, দেশীয় পুলিশ ২০৲-২৪৲ বেতন পায় বোম্বাই ও বঙ্গে। সার্জ্জেণ্টদের বেতন ১৫০৲-২০০৲ বোম্বাইতে, ১৭৫৲ হইতে ২২৫৲ বঙ্গদেশে। তবে বোম্বাই ও কলিকাতা সহরের পুলিশ ও সার্জ্জেণ্টের বেতন ইহা অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ একজন দেশীয় পুলিশ হইতে একজন সার্জ্জেণ্ট প্রায় দশ গুণ অধিক বেতন পায়।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের গম শস্য

(ক) আয়তন (••• বাদ)

	১৯৩১ একর
রুশ	১২,৪৯৪
ইতালি	১০,০২৯
রুমানিয়া	১০,৮৭২
যুগোস্লাভিয়া	৬,৬৫২
আর্ম্মানি	৫,২০৯
পোল্যাণ্ড	৪,৩২৪
আলজিরিয়া	৩,৮৪৪
বুলগেরিয়া	৩,৫৪৮
করাসী মরক্কো	২,৮৬৯
চেকোস্লোভাকিয়া	১,৯৭৮
টিউনিস্	১,৭৩০
কানাডা	২৩,•••

	১৯৩১-৩২	১৯৩০-৩১
অষ্ট্রেলিয়া	১৩,৫••	১৮,১৬০
আর্জ্জেন্টিনা		১৯,৭••

(খ) ফসলের পরিমাণ

অষ্ট্রেলিয়া	২১৫,৮•• হাজার বুসেল (৫,৭৭৫ হাজার টন)	১২৬,৪৭৭ হাজার বুসেল (৩,৩৬৮ হাজার টন)
আর্জ্জেন্টিনা	৬,৩১৮ হাজার টন	১৫,৯০৪ হাজার টন

চীনের বহির্ব্বাণিজ্য

	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৩০	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯
	হাজার এইচ্ টেল		হাজার এইচ্ টেল	
জাপান	৩২৭,১৩৫	৩২৩,১৪২	২১৬,৫৫৫	২৫৮,৪২৮
যুক্তরাষ্ট্র	২০২,২৭৭	২০০,৮৪৪	১৩১,৮৮০	১১৩,৫৮১
ভারতবর্ষ	১৩২,১৬৮	৫৪,৪৭৯	১১,১০৭	১৭,৮১৫
গ্রেটবৃটেন	১০৮,২৪৮	১১৯,১৪৯	৬২,৬৬৯	৭৪,৩৩৪
আর্ম্মানি	৬৯,১০৫	৬৭,০৭৬	২২,৩৬১	২২,৪৫৮
ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারত	৪৮,৩৬১	৫৫,৯২৮	—	—
বেলজিয়াম	২৭,৪৫৭	২৫,৭৭৩	—	—
ফ্রান্স	১৬,২৮৭	১৮,১৮৫	৪২,৭০০	৫৬,৩২৯

ক্যানাডা	১০,৪১৭	৩৮,৪৭৭	—	—
হংকং	২১৮,৩৭০	২১৪,৪৮১	১৪৮,০১৮	১৭৩,৫৮১
রুশিয়া ও সাইবেরিয়া	—	—	৫৫,৪১৩	৫৫,৯৮৬
নেদারল্যাণ্ড	—	—	৪৪,৯৪৪	৩৯,৫৪৩
জোভিয়া	—	—	৪৪,১৭৫	৩৯,৭৮৪
তুরস্ক	—	—	২২,১৫০	৪৪,৫৪১

বিলাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যজাত চায়ের দুরবস্থা

আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডে চা-এর বাজারে ক্রমশই জাভা সুমাত্রার চা'র চাহিদা বাড়িতেছে। তালিকাটা প্রথমেই দিয়া দিই :—

	বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উৎপন্ন (মিলিয়ন পাঃ)	অন্য দেশী		
১৯২১	৩৮০২	৩২৬	৪১২৮	৯২১ %
১৯২৬	৩৪৬১	৬৪৮	৪১০৯	৮৪২ %
১৯৩০	৩৬৭.৩	৮৫৭	৪৫৩০	৮১০ %

দশবৎসর পূর্ব্বে যেখানে বিলাতে আমদানি চা-এর শতকরা ৯২ ভাগ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের উৎপন্ন চা, সেইখানে বর্ত্তমানে হইয়াছে ৮১%, অর্থাৎ দশবৎসরে শতকরা ১১% কমিয়াছে। বৃটিশ মূলুকে চা উৎপন্ন হইতেছে ভারত, সিংহল, ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিজ, ব্রহ্মদেশ, ডাচ্‌ গায়না, ব্রিটিশ গায়না, ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা (ঃ আফ্রিকা), কেনিয়া (পূঃ আফ্রিকা) এবং আর দুই চারটা ছোট জায়গায়। বিলাতের লোক যাহাতে সাম্রাজ্যে উৎপন্ন চা পান করে তার জন্য রীতিমত প্রোপাগাণ্ডা সুরু হইয়াছে। ভারতের টী-সেস্‌ কমিটি, লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান টী অ্যাসোসিয়েশন্‌, সিলন অ্যাসোসিয়েশন্‌ দক্ষিণ ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশন্‌, সাম্রাজ্যের বাজার বোর্ড (মারকেটিং বোর্ড), ভারতের ট্রেড্‌ কমিশনার, পূর্ব্ব আফ্রিকার চীফ-কমিশনার সকলে মিলিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, যদি বিলাতের লোকে জাভা-সুমাত্রার চা পান করে, তবে সাম্রাজ্যের নানা স্থানের চা-এর বাণিজ্য উঠিয়া যাইবে। ইহার ফলে দেশী কৃষকদের কাজ যাইবে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের আয় কমিবে। বিলাতে শেয়ার-হোল্ডারদের আয় কমিবে, আয় কমিলে বিলাতের আয় কর কমিবে, মোটের বিক্রয় কম হইবে—ইত্যাদি যত অমঙ্গল হইতে পারে তাহার আশঙ্কায় তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

তরুণ আফগানিস্থান

কাবুলের স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বাদশাহ নাদির খান রাজাবুজুককে প্রত্যাবৃত্তকে বিশেষরূপে 'এনাম' প্রদান করেন। দেশবাসী অভিনন্দন পত্র দ্বারা বাদশাহকে শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

বাদশাহ নাদিরখান রাজধানী কাবুলকে খাইবার পাশ, কান্দাহার ও হিরাটের সহিত রেল বিস্তার পূর্ব্বক সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্যান্য বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিকেও রাজধানীর সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা চলিতেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কাবুল ও তাসখেন্দের মধ্যে এরোপ্লেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিমান পথের আরও উন্নতি-সাধন করা হইবে।

সেনা বিভাগ

পূর্ব্বে আফগানিস্থানবাসীদের জন্য বিভাগে প্রবেশ বাধ্যতামূলক ছিল। এখন ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপর নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে। দেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যাবাস স্থাপন করা হইয়াছে।

আফগানরাজ নাদিরশাহ সৈন্যগণকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজকীয় শরীররক্ষী সেনাদলের ও রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর পুরাতন পোষাকের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ধরণের পোষাক রচিত হইয়াছে। অপরাপর সমুদয় সৈন্যের পোষাক পরিবর্ত্তিত না হইলেও প্রত্যেকের শিরস্ত্রাণগুলি নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা দেখিতে প্রায় রুশীয় কসাক সৈন্যের অনুরূপ।

কাবুলে সামরিক কলেজে তুর্কী ও জার্ম্মাণবিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সামরিক অফিসারদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে।

অবৈতনিক শিক্ষা

বাদশাহ নাদির খেদের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ কোহিস্তানে ইত্যাদি অনুন্নত অঞ্চলে বহু অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ৪টী কলেজ ও কতিপয় উচ্চ বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হইয়াছে। মোটের উপর বাদশাহ নাদিরখানের শাসন-সুব্যবস্থায় আফগানিস্থান দিন দিন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার বাণিজ্যে অপ্রতিহত গতি

সোভিয়েট রুশিয়া যে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার প্রভাব ও বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টায় নিযুক্ত তাহা নহে, পশ্চিম দিকেও তাহার বাণিজ্য প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার অভাব নাই। আরবের হেজাজের পেট্রোলিয়াম খনির একচেটিয়া কারবার বলিতে গেলে সোভিয়েটদের হাতে; ইয়োরোপীয় কোম্পানীরা তাহাদের কম দামের কাছে টিকিতে পারিতেছে না। সোভিয়েটদের তৈলের কারখানার রুশ প্রতিনিধি হেজাজের রাজা ইবন্ সউদ্-এর বিশেষ অন্তরঙ্গ। লোহিত সাগরের তীরস্থ যেমেন রাজ্যে সোভিয়েট বাণিজ্য বিস্তার যথেষ্টই হইতেছে। প্রতি দুই মাস অন্তর সোভিয়েট জাহাজে করিয়া পেট্রোলিয়াম, ময়দা, চিনি, সূতির কাপড় প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য বোঝাইয়া বন্দরে আসে; অপর পারে আফ্রিকার ইরিট্রিয়া দেশের সহিত চিনির ব্যবসায় ক্রমশই জমকাইয়া উঠিতেছে। মস্কো ও হোদাইদার সোভিয়েট এজেন্টের সহিত সাঙ্কেতিক ভাষায় নিরন্তর তারযোগে কথাবার্ত্তা চলিতেছে; ইহা দেখিয়া ইংরাজরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। এতদিন তাঁহারা এই সব অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, হঠাৎ সোভিয়েটকে নূতন আদর্শের ধুয়া ধরিয়া পৃথিবীর বাণিজ্য গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

মিশরে সোভিয়েট শিল্পজাত সামগ্রী প্রচুর আসিতেছে; মিশর গবর্ণমেণ্ট কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। তাঁহারা দেশীয় শিল্প ও লাঙ্কাশায়ারের শিল্প সংরক্ষণের জন্য সোভিয়েট সামগ্রীর উপর বিশেষ শুল্ক বসাইতে চান; কিন্তু তাহা করিতে সাহস হইতেছে না। কারণ মিশরের কার্পাসের অন্যতম বড় খরিদ্দার রুশিয়া। এ পর্য্যন্ত (সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৩১) রুশিয়া ৩১,০০০ বেল তুলা কিনিয়াছে এবং তাহার এই ক্রয় চলিতেই থাকিবে। রুশিয়া তুলা না কিনিলে মিশরী তুলা আর অন্যত্র বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রুশিয়া বলিয়াছে তোমাদের তুলা কিনিতে পারি এই সর্ত্তে যে, তোমরা রুশিয়ার জিনিষ তোমাদের দেশে যেতে কোন প্রকার বাধা দিবে না।

তবে ইংরাজদের মনে মনে আশা যে, মিশরের আর্থিক অবস্থা যেরূপ খারাপ, তাহাতে ব্যবসায়ীর পক্ষে বিদেশ টাকা দেওয়া অসম্ভব হইবে; কারণ অনেক ইতালীয় ও জাপানী বণিক বিস্তর মাল আগাম পাঠাইয়া শেষকালে টাকা না পাইয়া মাল কাড়িয়া লইতেছে। ইংরাজদের তরফ সোভিয়েট বাণিজ্য মিশরে এমনিভাবে অর্দ্ধাভাবে নষ্ট হইবে।

শীঘ্রই তুলা সম্মেলন বসিবার কথা। এই সম্মেলন ওয়াশিংটনে বসার পক্ষে মিশরের আপত্তি এই জন্য যে, যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নাই। অথচ রুশিয়ার যোগ দেওয়া চাই-ই। ঐ কারণেই মিশরেও সম্মেলন বসিতে পারে না। সুতরাং সুবিধাজনক বলিয়া উহা লণ্ডনে বসিবার সম্ভাবনা।

ভারত-পারস্য বাণিজ্য

(১৯০০-৩১)

ভুজ্‌ভাপ রেলওয়ে এক্ষণে সুক্কি-আবিসান রেলওয়ে নামে পরিচিত। এই রেলওয়ে দ্বারাই ভারতের সহিত

পারস্যের যোগাযোগ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। নীচে যে সকল অঙ্ক-তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতের সহিত পারস্যের মাল আদান প্রদান বুঝা যাইবে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রানের মূল্য সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। ১৯২৮-২৯ সনে ১০০৲ টাকা=৩৬১৬ ক্রান; ১৯২৯-৩০ সনে ১০০৲=৪২৩৭ ক্রান; আর ১৯৩০-৩১ সনে ১০০৲=ক্রান।

২০শে মার্চ্চ, ১৯৩১ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সে বৎসর সুয়েজ-আহিদান রেলওয়ের সাহায্যে পারস্যের মোট আমদানি রপ্তানির হিসাব নিম্নরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের হিসাবও দেওয়া যাইতেছে।

আমদানি

	ভারতীয় মণ	ক্রান	কোটি টাকা (০০০ বাদ)
১৯২৮-২৯	২৩,৪৮,৯৬৬	১,১০,৮৫২	৪৫,৩১৯
১৯২৯-৩০	২৩,৪১,৩২৯	১,৯১,০৪৫	৫৮,১০৭
১৯৩০-৩১	৩২,৪৫,৮১৩	২,৬৩,২৩০	২২,৮৩৪

রপ্তানি

	ভারতীয় মণ	ক্রান	লাখ টাকা (০০০ বাদ)
১৯২৮-২৯	৮,৬২,৫০৬	১০,০৭৮	৩৩,৮৭৮	৯৩৭
১৯২৯-৩০	১৪,৮৭,০৯২	১,২০,৮২৬	২০,৫৫৬	৪৮১
১৯৩০-৩১	১৮,৬৯,৩৪১	১,৪১,৯২০	৪০,৫১২	৮৮৬৯

চা, চিনি ও তুলার সূতা

চিনি আমদানি এইরূপ হইয়াছে: ৮৫৫ টন (১৯২৮-২৯); ১,৪২০ টন (১৯২৯-৩০); ৪,১৫৭ টন (১৯৩০-৩১)। অর্থাৎ এক্সিয়ারি কর (মনোপলি ট্যাক্স) বসাইবার পূর্ব্বে গড়ে ৫০০০ টন আসিত,—তার প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ অনেকগুলি: রুশিয়া হইতে আমদানি হ্রাস হওয়ায় প্রতিযোগিতার অভাব, এক্সিয়ারি কর বসাইবার পর হইতে আমদানির মূল্য কম হওয়া হেতু দেশের মধ্যে কম সরকর; নূতন নূতন বিদেশের উদ্যমের ফলে বেশী বেশী চিনি খরচ। কিন্তু সব চেয়ে বড় কারণ হইতেছে বিদেশী শিক্কা নিয়ন্ত্রণের জন্য পারস্য সরকারের প্রচেষ্টা। বস্তুতঃ প্রতিকূল বাণিজ্যকে অনুকূল করিবার জন্য পারস্য সরকারের চেষ্টার আর অবধি ছিল না। নূতন বিধি অনুসারে বণিক্‌গণকে আমদানি রপ্তানি সমান রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ফলে পারস্যজাত দ্রব্য বিদেশে ক্রয় করিয়াও বিক্রয় করা হইতেছে। একমাত্র চা ও চিনি পারস্যে আমদানি পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া লাভ হইয়াছে, এমন কি রপ্তানির দরুণ ক্ষতিরও কিছু পূরণ হইয়াছে। কিন্তু এ ৩টি পদার্থের মূল্যও গত দুই বৎসরের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। ১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় কম হইলেও সূতার আমদানি ১৯২৮-২৯ সনের প্রায় সমান সমান হইয়াছে। পারস্যেই সূতা প্রস্তুত করিবার নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। কৃতকার্য্য হইলে আমদানি আরও হ্রাস পাইবে।

পারস্যের বাজারে বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা

সুয়েজ-আহিদান রেলপথে আনীত বৃটিশ সাম্রাজ্যজাত মালের সহিত সাম্রাজ্যের বাহিরের মালের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এই প্রতিযোগিতার মর্ম্ম উপলব্ধ করা যাইবে।

	বৃটিশ সাম্রাজ্য ক্রান	অন্যান্য দেশ ক্রান
পীদ্‌গুড্‌স্—		
১৯২৯-৩০		২৪,৮০,৪৬২
১৯৩০-৩১		৮,৬৪,৬২০
চা—		
১৯২৯-৩০	৮০,৬৬,৮১৩	
১৯৩০-৩১	৭৫,০৮,৬২৯	
চামড়াও চামড়ার জিনিষ—		
১৯২৯-৩০	৭,১৮,৩১০	৪৪,৭২০
১৯৩০-৩১	৫,০০,৭৫৫	২,০৪,৩৬৯
তুলার সূতা—		

১৯২৯-৩০	৩১,৩৩,৩১৬	১,৩২,৪২১
১৯৩০-৩১	১৭,৯৮,৯৫১	৩,৪১,৪৪৬

রেবারডেশারি ও রেশমের দ্রব্য—

১৯২৯-৩০	২,৬৭,৪২৪	
১৯৩০-৩১	১,২৩,৬৯৮	

খাদ্য শস্য ও বীজ—

১৯২৯-৩০		
১৯৩০-৩১		

কল ও যন্ত্রপাতি—

১৯২৯-৩০	৩২,৬৯৪	৪,৭৩,৫০৯
১৯৩০-৩১	১৭,১২০	৮১,৫১০

মোট আমদানির পরিমাণ কমিয়া গেলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যজাত দ্রব্যের আদর সাধারণতঃ বাড়িয়াছে দেখা যাইবে। মোট বাণিজ্য কমিবার একটা হেতু এই যে, রুশিয়া ও জার্মানি হইতে মাল এক্ষণে উত্তর পারস্য দিয়া বেশী আসিতেছে।

ভারত পারস্য হইতে কোন্ কোন্ জিনিষ কিনে

ভারত পারস্য হইতে যত জিনিষ কিনে তার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ পারস্য ভারতবর্ষ হইতে কিনে। এখানে আমদানি রপ্তানির সমস্ত হিসাব দেখানো সম্ভবপর নহে। শুধু দ্রব্যাদির নাম এখানে লিখিত হইতেছে ও ব্র্যাকেটে ভারতীয় মণ ও লাখ টাকায় মূল্য দেখান হইয়াছে।

ভারত পারস্য হইতে কিনে: বাদাম (৪৫,৪৮৪·৫ ; ১৭·৬৮), মাখন (১,৪২২·৮ ; ·৬৯১), গালিচা (১৮,০৯৭·৮ ; ৪১·৫২২), খাদ্যশস্য (২৭৮·০ ; ·০০৯), তুলা (৮·১ ; ·০০২), শুকনা ফল (১৮,১৬১·৩৭ ; ৪·৩০), ওষধি (১১,৪৬৯·৮ ; ১·২৬), পশু-লোম (২৮৯·৩ ; ·২২৮), নাড়ীভুঁড়ি (৫০৭·৯৭ ; ১·২৪), রেশমের কাপড় (৫০১·৬ ; ৪·৪৭), কাঁচা রেশম (৪৬·৫ ; ·০১৫), জিন (২,৯২৩·৮ ; ·৯৪৬), মসলা ৪১৫·১৪ ; ১·৪৫৮), টার্কুইস ও অন্যান্য দামী পাথর (৬·৭ ; ·০৯০), পশম (৫৯৫·৯ ; ·০৬১), অন্যান্য (৪৭,৭১৪·৬ ; ৪·৭০২)।

মোট ১,৪১,৯৯৩·০ মণ ও ৮৮·৭ লাখ টাকা।

ভারত পারস্যে কোন্ কোন্ জিনিষ বেচে

ভারত পারস্যে বেচে: অ্যালকোহলিক বিভারেজ ও স্পেট (১৯২·৫ ; ৩৯৫), দিয়াশলাই (৩০·৬ ; ·০০৯) জীবিত পশু ; কাঠ (৪৭৯·৪ ; ·০১১) মোমবাতি (১৪২·৭ ; ·০২২), টায়ার (৬৩০·৬ ; ৬৮০), সিমেন্ট (৪২১·২ ; ·০১২), মাখন ও পনীর কফি ও কোকো (১৭৭·৮ ; ·০০৪), খাদ্য শস্য (৮,৩০৬·৪ ; ·৩৭১), খেজুর (১২·৯ ; ·০০০৮), অন্যান্য ফল (১৫৪·০ ; ·২১২), সব্জী তেল (৫৫·৪ ; ·০১৩), দুধ (৫·৬৭ ; ·০০০৬), সব্জী—তাজা ও টীন করা (১,৬৬৯·৭ ; ·৩১৪), চিনি (১৩৩,১৯৯·৭ ; ৬·৯৯), চা (২৬,৭১৭·৫ ; ১০·৭০), ওষধি (৫৯০·১ ; ·২৫২), মসলা (৬,৪৪১·৭ ; ২·৪), কাপড়চোপড় (৫৬৪·০ ; ·২২৯), খনিজ তেল (৪৭,২০৩·৯ , ৫·১৭), কলকব্জা (১,৮৭৬·৩ ; ৮১৬), তুলার সুতা (৯,৮৩৩ ; ৫·০৩), অস্ত্র বয়ন পীস্ গুড্স্ কাঁচা তুলা ও রেশম সুদ্ধ (৯,৫৯২·৬ ; ৬·৪২), রেবারডেশারি (২৪৫·১ ; ·১০৭), লণ্ঠন (১১৩·১৫ ; ·০৫৮)। আসবাব ও গৃহসজ্জা (২৯৭·৬ ; ·০৬৫), ধাতু (৩,৪১১·০ ; ২·১৭), ঘড়ি (৪·১ ; ·০০২), কাগজ (১,৪৮৪·১৭ ; ·৪৬৭), চামড়া ও চামড়ার জিনিষ (১,০৯২·০৫ ; ৮১০), মৃৎপাত্র ও চায়না (১০·৬ ; ·০০৩), কেমিক্যাল (৫৪৭·৩৫ ; ·০৪৮), ষড়, সাবান (৪৭·৪ ; ·০১১), তামাক (৪·৯৫ ; ·০১৪), রং (১৯৮২·২ ; ২·০০), কাঁচা দ্রব্য (৮৪০·১ ; ৩৫৮), মোটর ও সাইকেল (১,৬৭২·০ ; ১·৯), অন্যান্য (১,৪৯২·০ ; ·৪৫২)।

মোট—২,৬৩,২৩০·৯ মণ ও ৪৮.৯৯ লাখ টাকা।

বৃটিশ মালয়ে তুলার জিনিষ আমদানি
(১৯৩০)

তুলার ইয়ার্ণ, সুতা, 'গ্রিচ্' না করা—

	পা	ডলার
১৯২৯	১২,৪৪,৫২৮	৫,৩৫,৯৮১
১৯৩০	৬,৪৮,৮৮২	২,৩০,২৮১

১৯২৯ সনে যুক্তরাজ্য হইতে ৪৪,০৮০ পা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভারত হইতে ১২,০২,৬৪৮ পা, আর অনির্দিষ্ট

দেশসমূহ হইতে বিশেষতঃ চীন হইতে ১,২০০ পা আমদানি হইয়াছিল। ১৯৩০ সনে যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে ১৬,০০০ পা, বৃটিশ সাম্রাজ্য ৬,০৩,০৫০ পা, প্রধানতঃ চীন ২৭,০০০ পা। পুনঃ রপ্তানির মোট পরিমাণ ৩,২৯,৬৭৮ পা,—প্রধানতঃ গিয়াছে সেলিবিস্ ও মংকা দেশে। ১৯২৯ সনের পুনঃ রপ্তানি ইহার দ্বিগুণ ছিল।

পীস্‌গুড্‌স, প্লেন—

	গজ	ডলার
১৯২৯	৫,৪৯,২৭,০৫৬	১,১৯,৩৩,৮৪৮
১৯৩০	৩,১৯,১২,৯৪১	৬২,৩১,৬৮২

১৯২৯ সনে যুক্তরাজ্য হইতে ৪·১৪ কোটি গজ, বৃটিশ সাম্রাজ্য অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও হংকঙ্ হইতে ৩০ লক্ষ গজ, ইয়োরোপ অর্থাৎ প্রধানতঃ জার্মাণ হইতে ৪৯ লক্ষ গজ, চীন হইতে ১২ লক্ষ গজ ও জাপান হইতে ২৯ লক্ষ গজ আমদানি আসিয়াছিল। ১৯৩০ সনে যুক্তরাজ্য ১·৯৫ কোটি গজ, ভারতবর্ষ ও হংকঙ্ ২০ লক্ষ গজ, ইয়োরোপ ৩৫ লক্ষ গজ, চীন প্রায় ৭ লক্ষ গজ ও জাপান ৫০ লক্ষ গজ পাঠাইতে পারিয়াছে। দেখা যাইতেছে, একমাত্র জাপানের হিস্যা বাড়িয়াছে।

পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ৫০ লক্ষ গজ। অথচ এই সেদিন অর্থাৎ ১৯২৭ সনে একা ভ্রাম মোট ১·৭ কোটির মধ্যে ১·১ কোটি গজ গ্রহণ করিয়াছিল।

পীস্‌গুড্‌স, পীস্ অবস্থায় ব্লিচড—

	গজ	ডলার
১৯২৯	৭,৫৬,২৮,২০০	১,৮৪,৩১,৫৫২
১৯৩০	৫,৩৪,৫০,৩৭৪	৯৩,৫০,৭৩৮

১৯২৯ সনে যুক্তরাজ্য হইতে ২·৭৪ কোটি গজ, ভারতবর্ষ ও হংকঙ্ হইতে ৬৫ লক্ষ গজ, ইয়োরোপ হইতে ৭৩ লক্ষ গজ, চীন হইতে ১·৬২ কোটি গজ, জাপান হইতে ১·৫৭ কোটি গজ আমদানি আসিয়াছিল। ১৯৩০ সনে যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে ৮৬ লক্ষ গজ, ভারতবর্ষ ও হংকঙ্ ৩৭ লক্ষ গজ, ইয়োরোপ ২৬ লক্ষ গজ, চীন ১·২ কোটি গজ, জাপান ২·৫৩ কোটি গজ। সব চেয়ে ক্ষতি হইয়াছে যুক্তরাজ্যের, আর সব চেয়ে লাভবান্ হইয়াছে জাপান। জাপান ১৯২৭ সনে ৪·৩৫ কোটি গজ, ১৯২৮ সনে ১·৪ কোটি গজ পাঠাইয়াছিল।

পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ ১·৬৭ কোটি গজ; ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে ১০ লক্ষ গজ কম করিয়া রপ্তানি হইয়াছিল, আর ১৯২৯ সনে ১২ লক্ষ গজ বেশী গিয়াছিল। সুমাত্রা প্রধান খরিদ্দার বটে, তবে বোর্ণিও ও শ্যামও যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে।

পীস্‌গুড্‌স, ব্লিচড—

	গজ	ডলার
১৯২৯	৩,৭১,০৯,৭৩৪	৭২,৪৭,৭১৮
১৯৩০	৩,১৭,৮৭,৫৯৭	৪৮,২৩,৪৩২

১৯২৯ সনে জাপান হইতে ১·৬১ কোটি গজ, যুক্তরাজ্য হইতে ১·৬৪ কোটি গজ, এক ইতালি হইতে ১৮ লক্ষ গজ আমদানি আসিয়াছিল। ১৯৩০ সনে জাপান পাঠাইয়াছে ২·৬ কোটি গজ, যুক্তরাজ্য ৩৫ লক্ষ গজ, ইয়োরোপ ৭·৮২ লক্ষ গজ পাঠাইয়াছে। এদিকে জাপান কি করিয়া যুক্তরাজ্যকে ধীরে ধীরে হটাইয়া দিয়েছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বোঝগম্য হইবে।

	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	কোটি গজ	কোটি গজ	কোটি গজ	কোটি গজ
যুক্তরাজ্য	১·৪৭	১·৩৯	১·৬৪	·৩৫
জাপান	·৬৩		১·৬১	২.৬

জাপানের হাতে এখন এই বাণিজ্যের ৮২% অংশ রহিয়াছে। ১৯৩০ সনের শরৎ ঋতু হইতে এই বাজারে নূতন এক প্রতিযোগী দেখা দিয়াছে,—সোবিয়েট ইউনিয়ন। স্থানীয় রুচি অনুযায়ী চের মাল আসিতেছে, এগুলি গুণে ম্যাঞ্চেষ্টার ও জাপানের মাঝামাঝি।

পুনঃ রপ্তানির পরিমাণ ১·১১ কোটি গজ। ১৯২৯ সনে ছিল ১·৩৪ কোটি গজ।

সুতীর রুমাল—

	ওজন	ডলার
১৯২৯	৬,৪৫,০৬৬	৮,১০,৬৯৯
১৯৩০	১,৭০,৪৩১	২৩০,৫২৯

১৯২৭ সনে ২,৭৩,০০০ ওজন রুমাল আসিয়াছিল।

১৯২৯ সন অবধি আমদানি বাড়িয়া তারপর কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের হিস্যা কমে নাই। ১৯৩০ সনে যুক্তরাজ্য যোগাইয়াছে ১'০৪,৮৫৪ ডজন।

সুতীর সায়ু, কেইন, ইত্যাদি—

	সংখ্যা	ডলার
১৯২৯	১,০১,৬৫,০৮৬	১,৩২,১৯,২৭৯
১৯৩০	৬১,০১,৬১৯	৭৬,২৬,৫৬২

১৯২৯ ও ১৯৩০ সনে কোন্ দেশ কত খণ্ড যোগাইয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

	১৯২৯	
	লক্ষ খণ্ড	
যুক্তরাজ্য	১২০	
ভারতবর্ষ	৩৬	
জাভা	৩২	
ফরাসী ভারত	১৩	৮৮২
হল্যাণ্ড	৩'১১	৩'১৩
জাপান	৩'০৫	'৮১৫
জাপান	'০৩	'৬২

পুনঃ রপ্তানি ১৯২৭ সন হইতে ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে। ১৯২৭ সন : ৬০ লক্ষ খণ্ড ১৯৩০ সন : ১৯ লক্ষ খণ্ড।

সেলাই করিবার সুতা—

	ডলার
১৯২৯	১৬,০০,২১৪
১৯৩০	১১,২৭,০৪১

যুক্তরাজ্য হইতে আমদানি : ১৯২৯—১৪,৩৩,৪৬১ ডলার ; ১৯৩০—৯,৯৩,২০০ ডলার। এ ব্যবসায়ে যুক্তরাজ্যের স্থান দ্বিতীয়।

মুদ্রা-বিনিময়ের নূতন ব্যবস্থা

ইংলণ্ডে স্বর্ণমান রহিত হওয়ার ফলে যে অনিশ্চিততার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতিকারকল্পে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করেন :—

তিন দিন সরকারী কার্য্যালয় এবং ব্যাঙ্কসমূহ বন্ধ রাখার ফলে কাহারও কাহারও মনে নানা সন্দেহ হইয়াছে। ইহা অবগত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন, বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের কার্য্য যাহাতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আরম্ভ হইতে পারে, তাহার উপায় করিবার জন্য এবং আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থা করিবার জন্য তিন দিন ব্যাঙ্কসমূহ বন্ধ রাখা হইয়াছিল। সুতরাং চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। ভারতের আভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার যখন আফিস আদালত এবং ব্যাঙ্কগুলি খুলিবে, তখন সমস্ত লোকের চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কি বলেন

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার অলফ্রেড্ মিড ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বলিয়াছেন, ব্যাঙ্কপরিচালকগণের ইচ্ছানুসারে ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখা হয় নাই, এবিষয়ে তাহারা কোন আন্দোলন করেন নাই। তবে অকস্মাৎ যে অপ্রত্যাশিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিয়া ব্যাঙ্ক বন্ধের আদেশ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্যায় হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে খাঁটি সোনার সহিত ভারতীয় মুদ্রার যোগ ছিল। গ্রেট বৃটেন এখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহার ফলে গ্রেট বৃটেনের প্রচলিত মুদ্রা-পাউণ্ডের সহিত (খাঁটি সোনার সহিত নহে) ভারতীয় মুদ্রার সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে যে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে, তাহার সহিত সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। তাই তিন দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখা হইয়াছে। ইহাতে চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। নূতন ব্যবস্থাদ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ ঘটে নাই।

আমেরিকা কি মনে করেন

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বড় বড় অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে, স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার ফলে বৃটেনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে এবং তাহার দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে, আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে প্রতিযোগিতা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালার গবর্ণরের উক্তি

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে কোনও সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট স্যার টান্‌লি জ্যাক্সন বলেন,—আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই মনে হয় যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা স্বাভাবিকই রহিয়াছে। এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের শক্তি হ্রাস পাইতে পারে। আগামী শুক্রবার সমস্ত ব্যাঙ্ক খুলিবে। নগদ টাকার সমস্ত চাহিদাই মিটান হইবে। স্বাভাবিক কার্য্যাবলীর কোনই বিঘ্ন হইবে না।

আমার মনে হয়, তিন দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখায় কোন কোন স্থলে একটু চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমরা এই অবস্থা সৃষ্টি করি নাই। গ্রেট বৃটেনে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে, তাহার জন্যই ভারতবর্ষেও এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, চারিদিকের অবস্থা স্বাভাবিক হইবার আশায় কয়েক দিন কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখা ভালই হইয়াছে।

রাজস্ব সচিবের ঘোষণা

২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার জর্জ্জ শুষ্টার ঘোষণা করেন,—মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি অধিকার লাভ করিবেন। সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে সোনা বিক্রয় করা হইবে না। প্রকৃত পক্ষে বাণিজ্যের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন সেই পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় করা হইবে। পারিবারিক ব্যয়ের জন্য যে পরিমাণ সোনার প্রয়োজন, তাহাও বিক্রয় করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিধান জারী হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত চুক্তি হইয়াছে, তাহার দাবী মিটাইবার উপযোগী সোনাও বিক্রয় করা হইবে। এই তিনটি স্থল ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে সোনা বিক্রয় করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য থাকিবেন না।

স্যার জর্জ্জ শুষ্টার আরও বলেন যে, ইংলণ্ডে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি প্রয়োজন হইলে গ্রেট বৃটেন ভারতবর্ষকে আর্থিক সাহায্য করিবেন, এই যে প্রতিশ্রুতি তাহার কোন নড়চড় হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এখন ১২৭ কোটি রৌপ্য মুদ্রা জমা আছে এবং ১৩৮ কোটি টাকার নোট বাজারে চালান হইয়াছে।

বড়লাট কর্ত্তৃক অর্ডিনান্স জারী

২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বর্ণ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বড়লাট এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। রাজস্ব সচিব স্যার জর্জ্জ শুষ্টার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদনুসারে বিধি ব্যবস্থা করাই এই অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য।

ল্যাঙ্কাশায়ারে বিক্রয়-বৃদ্ধি

লিভারপুল কটন এক্সচেঞ্জে বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর ৪০০০০ গাঁইট কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে আর কখনও এক দিনে এত অধিক কাপড় বিক্রয় হয় নাই।

বিগত কয়েক দিন ধরিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলিতে খুব বেশী করিয়া কাজ হইতেছে।

শ্যাম হইতে রৌপ্য রপ্তানি

শ্যাম দেশের গবর্ণমেণ্ট বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে দুই কোটি আউন্স পরিমিত রৌপ্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া এই সমস্ত রৌপ্য জমা হইয়াছিল।

ভারতের মজুত সোনা

কমন্স্ সভার কোনও প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরের পক্ষ হইতে কাপ্তেন মার্গেসন বলেন,—

১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের ৩,১০,৯২,০০০ পাউণ্ড পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা মজুত ছিল। এতদ্ভিন্ন লণ্ডনে এখন যে সিকিওরিটি ও সোনা মজুত আছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ১,২২,৫০,০০০ পাউণ্ড। ফেব্রুয়ারীর হিসাবে লণ্ডনে, ভারত গবর্ণমেণ্টের আন্দাজ ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড আছে।

কাপ্তেন মার্গেসন আরও বলেন যে, টাকা বিনিময়ের হার এতদিন যেভাবে রক্ষা করা হইয়াছে, এখনও সেইরূপেই রক্ষা করা হইবে।

বৃটিশ রাজস্ব সচিবের আশ্বাস বাণী

বৃটিশ রাজস্ব সচিব মিঃ চ্যাম্বেলেন বেতার বার্ত্তার মারফতে বৃটিশ জাতির নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—বৃটিশ জাতির আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার

বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এরূপ বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোন দেশই করিতে পারে নাই। আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে চাই, ব্যাঙ্কে অথবা সেভিংস ব্যাঙ্কে আপনাদের যে অর্থ আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই অর্থ সম্পর্কে আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না, আতঙ্ক পরিহার করুন। কেননা বিনা কারণেও আতঙ্কের ভাব সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার পরিণাম ভয়ের হইতে পারে।

আমরা সকল বিপদেই তরণীর ব্যবস্থা করিয়াছি। এতদপেক্ষা গুরুতর বিপদ হইতেও বৃটেন উদ্ধার পাইয়াছে। এই বিপদ কাটাইয়া বৃটেন নিশ্চয়ই অধিকতর শক্তিশালী হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ভারতের আয়ব্যয়ে সমতা-রক্ষার প্রস্তাব

বিগত মার্চ্চ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব স্যার জর্জ্জ শুষ্টার আয়ব্যয়ের একটি আনুমানিক হিসাব দিয়াছিলেন। কথা ছিল যে, এই হিসাব অনুসারে ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের কাজ চলিবে। কিন্তু নানা কারণে আয়ের পরিমাণ কম হইতেছে এবং ব্যয় বেশী হইতেছে। তাহার ফলে বৎসরের শেষে যথেষ্ট ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য সরকারী এবং বে-সরকারী সদস্য লইয়া গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর কমিটির মন্তব্য হইতে কোন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এবং নিজের বিবেচনা অনুসারে আরও কতকগুলি প্রস্তাব জুড়িয়া দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব স্যার জর্জ্জ শুষ্টার আর একটি বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই নূতন বাজেটের বিবরণ প্রদান করেন।

গত নবেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে নূতন বাজেট পাশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। স্যার জর্জ্জ শুষ্টার বলেন,—পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন দারুণ অর্থাভাব দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে সকল দেশেই আর্থিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ অবস্থা মন্দ নহে। তথাপি ইহার আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ আয় হইতে ব্যয় বেশী হইতেছে দেখিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক, ভারতের আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কে আস্থাহীন হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কিছুতেই অন্যান্য দেশবাসীর এবং ভারতবাসীর আস্থা হারাইতে পারি না। এই অভিপ্রায়েই নূতন বাজেট করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কি কি বিষয়ে আয় হ্রাস হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া স্যার জর্জ্জ শুষ্টার বলেন,—গত মার্চ্চ মাসের বাজেটে কাষ্টম হইতে যে আয় হইবে ধরা হইয়াছিল, তাহা হইতে অন্ততঃ ১০ কোটি টাকা কম হইবে। ইনকাম ট্যাক্স হইতে দেড় কোটি টাকা কম পাওয়া যাইবে।

রেলের আয় ক্রমেই কম হইতেছে। সুতরাং রেলের নিকট হইতে আয়ও ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা কম পাওয়া যাইবে। অন্যান্য বিষয়ে যে আয় হইবে ধরা হইয়াছিল, তাহা হইতে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা কম হইবে।

মোটামুটি গত মার্চ্চ মাসের বাজেটে এক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইবে, সেই বৎসরে ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

অতঃপর ১৯৩২-৩৩ সনেও আয়-বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সেই বৎসর আরও ১৯ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। সুতরাং আগামী ১৮ মাস সময়ের মধ্যে আমাদিগকে মোট ৬৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা যাইবে না।

মোটামুটি তিনটি উপায়ে আমরা আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে চাই :—

(ক) সরকারী কার্য্য-পরিচালনার ব্যয়-হ্রাস এবং নানা বিভাগের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(খ) অস্থায়ীভাবে বেতন হ্রাস করা হইবে।

(গ) নূতন কর ধার্য্য করা হইবে।

(ক) অর্থসচিব স্যর জর্জ্জ সুটার বলেন যে, সামরিক আফিস আদালতের ব্যয়-সঙ্কোচদ্বারা ২৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

সামরিক বিভাগের ব্যয় আগামী বৎসর ৪৯০ কোটি কম করা হইবে। তাহাতে দেখা যায়, দুই বৎসরের মধ্যে এই বিভাগের ব্যয় মোট ৮ কোটি টাকা হ্রাস করা হইবে। আগে সামরিক ব্যয় ছিল বার্ষিক ৫৫ কোটি টাকা।

(খ) বড়লাট শতকরা ২০ টাকা কম করিয়া তাঁহার বেতন লইবেন এবং তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণ শতকরা ১৫ টাকা করিয়া কম বেতন পাইবেন।

আই-সি-এস কর্ম্মচারী এবং অপর সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন অস্থায়িভাবে শতকরা ১০৲ হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে। আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিবে। তবে সন্তবপর হইলে তৎপূর্ব্বেই সাবেক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

বেতন হ্রাস করিয়া ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৩৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

(গ) নিম্নলিখিত নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে।

(১) তুলার উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সা করিয়া আমদানি শুল্ক গ্রহণ করা হইবে।

(২) কলকব্জার আমদানি শুল্ক শতকরা ১০৲ টাকা করা হইবে।

(৩) বিভিন্ন দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক শতকরা ১০৲ টাকা হইবে।

(৪) লাল চিনির উপর আমদানি শুল্ক বাড়াইয়া প্রতি হন্দরে ৬৸০ আনা স্থলে ৭।০ আনা করা হইবে।

(৫) বিভিন্ন প্রকার তুলার আমদানি শুল্ক প্রচলিত বাজার দরের শতকরা ২০ টাকা অথবা প্রতি মোড়ায় চারি আনা করিয়া (দুই ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবস্থায় বেশী আয় হইবে) বর্দ্ধিত করা হইবে।

(৬) কৃত্রিম রেশমী সুতার আমদানি বাজারদরের উপর শতকরা ১০৲ হইতে ১৫৲ পর্য্যন্ত করা হইবে।

(৭) কৃত্রিম রেশমের কাপড়, কর্পূর, বিজলী বাতির ডোম ইত্যাদির আমদানি শুল্ক বাজার দরের উপর শতকরা ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা করা হইবে।

(৯) কাইসের আমদানি শুল্কের প্রচলিত হারের এক চতুর্থাংশ বর্দ্ধিত হইবে। তন্মধ্যে পর মার্চ্চ মাসের বাজেটের অতিরিক্ত চার্জ্জও থাকিবে।

(৯) আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যাহাদের বার্ষিক আয় ১০০০৲ ও ১৯৯৯৲ টাকার মধ্যে, তাহাদের নিকট হইতে টাকা প্রতি দুই পয়সা করিয়া এবং আগামী ১৯৩২-৩৩ সনে টাকা প্রতি চারি পয়সা করিয়া ইনকাম ট্যাক্স লওয়া হইবে।

(১০) বর্ত্তমানে যাহারা যে পরিমাণ ইনকাম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স দিতেছেন, তাহার এক-অষ্টাংশ প্রচলিত বর্ষের জন্য, এবং এক-চতুর্থাংশ ১৯৩২-৩৩ সনের জন্য বেশী দিতে বাধ্য হইবেন।

(১১) লবণ প্রমুখ কতকগুলি জিনিষের উপর আবগারী শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। বর্ত্তমানে যে হারে এই আবগারী শুল্ক লওয়া হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ বেশী লওয়া হইবে। বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এইরূপ বর্দ্ধিত শুল্ক দিতে হইবে।

(১২) ভারতবর্ষের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলাচল করে, তাহার মাশুল বাড়িবে। পোষ্ট কার্ডের দাম তিন পয়সা এবং খামের দাম দেড় আনা হইবে। কোন্ তারিখ হইতে এই ব্যবস্থা তাহা বড়লাট ও তাঁহার শাসন পরিষদ বিবেচনা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সকলকে জানাইবেন।

এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার পর ১৯৩২ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইবে, সেই বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় ১০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বেশী হইবে।

তবে ১৯৩২-৩৩ সনে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা যাইবে। সেই বৎসরে ব্যয়-সঙ্কোচ দ্বারা ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। অন্যান্য বিষয়ের আয় ধরিয়া মোট ২৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে

বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে ১৯৩৭-৩৩ সনে ব্যয় বাদেও ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

বিলাতে মহাত্মা গান্ধি

(১) তিন দলের সদস্যগণের নিকট মহাত্মার বক্তৃতা

পার্লামেণ্টের কমিটি কক্ষে শ্রমিক, রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দলের সদস্যগণের এক মিলিত সভায় মহাত্মা গান্ধি বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি সভ্যদিগকে "বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তিনি কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে ভারতের বক্তব্য বলিবেন। কংগ্রেসের প্রার্থিত পূর্ণ স্বাধীনতার কথায় শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই। কারণ পূর্ণ স্বাধীনতা হইলেই ভারত বৃটেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে বা রাজনৈতিক যোগসূত্রে সমঅংশীদাররূপে বৃটেনের সহিত বদ্ধ হইতে রাজী হইবে না—এরূপ বুঝায় না। পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হইল—বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা, স্বদেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্বন্ধ প্রভৃতির উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ। বৈঠকের গত অধিবেশনে বৃটেনের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

স্বদেশকে রক্ষা করার ক্ষমতা যদি ভারতীয়দের নিজেদেরই থাকে, তাহা হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণে তাহারা উড়িয়া যাইবে, এমন ভয় করিবার কিছু থাকে না। নিজেদের দেশরক্ষার ভার তাহারা নিজেরা লইলেই প্রত্যেক বৃটিশ অধিবাসী বা প্রত্যেক সৈন্যকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এমন কোন কথাও নাই, ভারতীয়দের অধীনে তাহারা যদি কাজ করিতে চায় তবে তাহা তাহারা করিতে পারিবে।

শাসন ব্যবস্থায় ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন সম্পর্কে মহাত্মা বলেন যে, সিভিলিয়ানদের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সব চুক্তি আছে, সেগুলি ভঙ্গ করা হইবে না। তবে সিভিলিয়ানগণকে যত বড় বলিয়াই তাহা হউক না কেন, তাঁহাদের জন্য যদি বহু ব্যয় বহন করিতে হয় তবে তাহাতে লাভ কি? যে মোটা মাহিনা তাঁহাদিগকে দিতে হয়, ভারতের বর্তমান অবস্থায় তাহা কখনই সম্ভব হইবে না।

প্রসঙ্গতঃ ভারতের কোটি কোটি কৃষকের অবস্থা তিনি বর্ণনা করেন। এই কৃষককুলকে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়।

অতঃপর ইয়োরোপীয়গণকে তিনি অভয় দিয়া বলেন যে, তাঁহারা যদি ভারতে বন্ধুভাবে থাকিতে চান তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কি প্রয়োজন আছে?

উপসংহারে তিনি ভারতের পল্লীর কল্যাণকেই সর্ব্বোপরি স্থান দেন।

তিনি প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করা হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার বলেন—পল্লীবাসীদের তিনি উন্নতি করিবেন এদিকে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালাদের অর্থসাহায্য লইয়া তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহারও করিবেন—এ দুইয়ের সামঞ্জস্য তিনি কেমন করিয়া করেন? উত্তরে মহাত্মা বলেন, মিলওয়ালারা যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা কখনও গোপন করা হয় নাই, তাঁহারা টাকা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যতটা মনে করা হয়, ততটা নয়। অধিকাংশ অর্থই বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। দেশের লোককে বিলাতী কাপড় ছাড়াইতে পারিলে তিনি আরও শক্তিশালী হইবেন, তখন মিলওয়ালাগণকে সাধারণের স্বার্থের সর্ত মানিয়া লইতে হইবে।

একজন প্রশ্ন করিলেন, কংগ্রেস যদি কোন বৃটিশ কোম্পানীকে মিল প্রতিষ্ঠা করিতে না দেয় বা এমন সর্ত দেয় যাহাতে সেরূপ কোন মিল স্থাপন করা না যায়, তাহা হইলে ইয়োরোপের অবস্থা কি হইবে—তাহাদের রক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে? মহাত্মা বলেন, সে কথা দিল্লী চুক্তির আগে খাটিত, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় খাটিতে পারিত, এখন নয়। তখন বৃটিশ শক্তি প্রয়োগে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করা যাইত।

আরও কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়া মহাত্মা বলেন, মোটামুটি বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের অস্থি হইয়াছে।

হাসপাতাল বা জলসেচ—এই রকম দুই একটি ভাল কাজের নাম করা যায় বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; তাহার চেয়ে স্বাধীনতাই তাঁহাদের চের বেশী কাম্য। মুসলমানেরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া যদি হিন্দুদের উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেও তিনি ভীত নহেন। তাহারা যাহাই করুক, তবু তাহারা ভারতীয়ই থাকিয়া যাইবে।

হামার্সদে বলিয়াছিলেন যে, গান্ধিজী লোককে সস্তা বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিয়া ঘরের তৈয়ারী কাপড় পরিতে বাধ্য করিতেছেন। তদুত্তরে গান্ধিজী উক্ত প্রশ্ন-কর্ত্তাকে তাঁহার সঙ্গীদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মহাত্মার বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরে কাটিয়া গিয়াছিল। গান্ধিজী বলেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তিনি আরও প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী আছেন।

একজন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাত্মা শব্দের অর্থ কি?" মহাত্মা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "নিতান্ত নগণ্য লোক।"

(২) ল্যাঙ্কাশায়ারে মহাত্মাজী

বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা গান্ধি ল্যাঙ্কাশায়ারে গিয়াছিলেন। প্রিস্টেডেলে কয়েক ঘণ্টা শ্রমিকদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি ডারউইন সহরের মেয়রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। তথায় টাউন হলে মহাত্মা গান্ধিকে অভিনন্দিত করা হয়।

অতঃপর তিনি কাপড়ের কলের মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহাতে ভারতের সহিত বেশী করিয়া ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হয় তাহার উপায় করা কি মহাত্মার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না?

মহাত্মা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আপনাদের দুঃখ দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়াছি। কিন্তু একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, ভারতের কোটি কোটি লোকের অবস্থা আপনাদের অপেক্ষাও শোচনীয়। তাহারা অনশনে দিন কাটায়, রোগ হইলে বিনা চিকিৎসায় মরে, যথেষ্ট বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং আমি সর্ব্বাগ্রে তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনে যত্নবান হইয়াছি। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করে। আমি তাই স্থির করিয়াছি, বৃটেনের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে সন্তোষজনক মীমাংসা হইলে পর, যদি দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ নিজের দেশের বস্ত্র দ্বারা নিজেদের চাহিদা মিটাইতে পারে না, তাহা হইলে বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন হইবে এবং সেই স্থলে অন্যান্য দেশের দাম না কিনিয়া বৃটিশ বস্ত্র ক্রয় করাই তাহাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। কেন না, বৃটেন হইবে তখন ভারতের সব অংশীদার। সেই অংশীদারের বস্ত্র না কিনিয়া ইটালী, জার্ম্মানি, জাপান কিংবা আমেরিকার বস্ত্র ক্রয় করিলে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হইবে। তবে দেখিতে হইবে যে, অন্যান্য দেশের বস্ত্রের প্রকার এবং দাম হইতে যেন বৃটিশ বস্ত্রের দাম বেশী না হয় এবং গুণে তাহা মন্দ না হয়।

(৩) গোলটেবিলে বক্তৃতা

গত ১৭ই নভেম্বর তারিখের যুক্তরাষ্ট্র গঠন কমিটির বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন:—প্রকৃত কথা এই যে, দায়িত্বমূলক গভর্ণমেণ্টের আমলে যে সব দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে তাহা আজ কংগ্রেস পালন করিতে সক্ষম। অন্ততঃ কংগ্রেস নিজেকে এই সব ব্যাপারে সক্ষম বলিয়া মনে করে। কাজেই এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিনীতভাবে অথচ সংক্ষেপে আমি আমার বক্তব্য বলিয়া এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিব।

কংগ্রেসের দাবী এই যে, ভারতবাসীর উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, সামরিক ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতবাসীর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। অবশ্য এজন্য সাময়িকভাবে রক্ষাদল কংগ্রেস

স্বীকার করে। এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কর্তৃত্বের দাবী না করিয়াও আমরা স্বায়ত্তশাসন পাইতে পারি,—উহা মনে করিয়া আমরা নিজকে অথবা বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করিতে চাহি না। যে জাতির নিজের সামরিক বিভাগ বা পররাষ্ট্র বিভাগের উপর কর্তৃত্ব নাই, সেই জাতিকে কখনও স্বায়ত্তশাসন-সম্পন্ন জাতি বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক জাতির অস্তিত্বের পক্ষে দেশ-রক্ষার ব্যাপার ও সামরিক বিভাগ অত্যাবশ্যক। যদি কোন জাতির সামরিক বিভাগ ভিন্ন দেশ কর্তৃক শাসিত হয়—তা, ঐ জাতি যত বড়ই বাগাড়ম্বরই হউক না কেন, তাহা হইলে ঐ জাতি নিশ্চয় স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন নহে। আমাদের ইংরাজ শিক্ষকগণ আমাদিগকে অগণিত বার এই কথাই শিখাইয়াছেন এবং এই জন্যই যখন কথা হয় যে, আমরা স্বায়ত্তশাসন পাইব অথচ সামরিক বিভাগের উপর কর্তৃত্ব পাইব না বা এজন্য দাবী করিব না—তখন আমার অনেক ইংরাজ বন্ধু আমাকে পরিহাস করিয়াছিলেন। এজন্য আমি বিনীতভাবে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সামরিক বিভাগ, ও পররাষ্ট্র বিভাগের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করিতেছি। আমি এই সঙ্গে পররাষ্ট্র বিভাগের কথাও এই জন্য উল্লেখ করিতেছি যে, যখন এই বিষয়ে আলোচনা উঠিবে তখন আর আমাকে এই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে না। আমরা বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, স্বায়ত্তশাসন পাইবার সময়ে যদি আমরা সামরিক বিভাগের উপরও কর্তৃত্ব না পাই, তাহা হইলে কখন যে, আমরা উহা পাইব তাহা কল্পনারও অতীত। দায়িত্বমূলক গবর্ণমেণ্ট চালাইতে চালাইতে হঠাৎ যে আমরা কখন আমাদের সামরিক বিভাগ পরিচালনার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইব তাহা আমরা ভাবিতে পারি না।

বর্তমানে ভারতে গোরা ও ভারতীয় যে সব সৈন্য আছে তাহা ভারতবর্ষকে পদানত রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত। সৈন্যদল ভারতীয়ই হউক আর বিদেশীই হউক, উহাতে আমার বা আমাদের কিছু আসে যায় না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানাইতে চাই যে, ভারতীয় সৈন্যদলে যে সব শিখ গুর্খা, পাঠান, মারাঠী ও রাজপুত সৈন্য আছে তাহারা যে স্থানেরই লোক হউক না কেন, তাহারা যতদিন সামরিক বিভাগের অধীন থাকিবে ততদিন আমি তাহাকে বিদেশী বলিয়াই মনে করিব। আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করিতে পারি না। অনেক সৈন্য গোপনে আমার নিকট আসিয়াছে কিন্তু পাছে তাহাদের কথা সৈন্য বিভাগে জানাইয়া দেওয়া হয়, এই ভয়ে তাহারা আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিতে সাহস পায় নাই। যে সব স্থানে সৈন্যদল রাখা হয় সেই সব স্থানে সচরাচর আমরা যাইতে পর্যন্ত পারি না। তাহারা আমাদিগকে যাহাতে স্বদেশবাসী বলিয়া মনে না করে তজ্জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় সৈন্যগণকে সৈন্য বিভাগের বহির্ভূত লোকজনের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালিখি করিতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। পৃথিবীর কোন দেশে এই নিয়ম নাই। আমি ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই কমিটির কাছে আমার বক্তব্য বলিলাম। কিন্তু উহা মাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নহে। ভারতের শত সহস্র কংগ্রেসসেবীর অভিজ্ঞতা এই যে, তাঁহাদের ও সৈন্য দলের মধ্যে এক অভেদ্য দেয়াল গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। এই কারণে ইহাও আমি জানি যে, গোরা সৈনিকগণ বুঝে থাকুক, ভারতীয় সৈন্যগণেরও এখনই কর্তৃত্ব-ভার লওয়া এক মহা কঠিন ব্যাপার হইবে। আমাদের পক্ষে বর্তমানে এই দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখদায়ক অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর আমাদের দেশে অনেক গোরা সৈন্য আছে। উহাদের রাখার উদ্দেশ্য কি? ভারতের প্রত্যেক শিশুও একথা জানে যে, বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধের অজুহাত দেখাইয়া ভারতের বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্যই ভারতে সৈন্যদল রাখা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্যও এই সৈন্যদল রাখা হইয়াছে। এই সমস্তই সৈন্যদলের প্রধান কাজ। কাজেই সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ইংরাজগণ যে সব মন্তব্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। যদি আমি একজন ইংরাজ হইতাম

এখন যদি একটা জাতিকে শাসন করিবার আমার আকাঙ্ক্ষা থাকিত, তাহা হইলে আমিও ঠিক এইরূপ কথাই বলিতাম। তাহা হইলে আমিও ভারতবাসিগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে সৈনিকের শিক্ষা প্রদান করিতাম, আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দিতাম এবং যাহাদিগকে আমি গুণী করিয়া যাইব বলিয়া মনে করিব তাহাদের উপর আমার আদেশ অনুসারে গুলী চালাইবার ভার বিশ্বস্ততা তাহাদিগকে শিখাইতাম। জালিয়ানবরালাবাগে কাহারা গুলী চালাইয়াছিল? যাহাদের উপর গুলী বর্ষণ হয় তাহারা তাহাদের স্বদেশবাসিগণই নয় কি? ইংরাজদের মনোবৃত্তিতে আমি বিস্মিত হই নাই—এই ব্যাপারে মাত্র আমার চোখ খুলিয়াছে।

ভারতে যে সব বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ আছেন এবং যে সব ইংরাজ আছেন তাঁহাদের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই ভারতে গোরা সৈন্য রাখা হইয়াছে। যদি আমি একথা স্বীকার করিয়া লই যে, আজ ভারতকে পদানত রাখিবার অধিকার ইংরাজের আছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে ভারতের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার ইংরাজের থাকিবে, তাহা হইলে ইংরাজদের বর্ত্তমান মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। আর যদি উহা স্বীকার না করি, তবে সাধ্য ও মানবা সাহস করিয়া যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই, তাহার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কোনই কঠিন কার্য্য হইবে না। তাঁহারা উত্তরেই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সেনাদল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহেন। কাজেই বর্ত্তমান সৈন্যদলের কত অংশ কমাইয়া দেওয়া উচিত তদ্বিষয়ে তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না। আমার পক্ষে কিন্তু কি করা উচিত তাহা বলা কঠিন নহে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলি যে, বর্ত্তমান বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কল্পনা মারাত্মক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট চালাইবার দায়িত্ব লইবার পূর্ব্বে যদি সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব আমার উপর না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সমস্ত সৈন্যদলকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক। তবে এই ব্যবস্থা হইলে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহার বিষয় আমি জানি—একথা আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি। বর্ত্তমানে যে সৈন্যদল আছে তাহারা আমার আদেশ মান্য করিয়া চলিবে না। আমি উহা ভালরূপেই জানি। আমি জানি ভারতের ইংরাজ প্রধান সেনাপতি আমার আদেশ মানিয়া চলিবেন না। শিখেরা এবং গর্ব্বিত রাজপুতগণও আমার আদেশ মান্য করিয়া চলিবেন না। তাহা সত্ত্বেও আমি আশা করি যে ইংরাজ জাতির সদিচ্ছা লইয়া আমি ভারতীয় সৈন্যগণকে আদেশ দিবার ক্ষমতা রাখি এবং ইংরাজগণও পরিবর্ত্তনের যুগে ভারতীয় সৈন্যগণকে এই নূতন শিক্ষা প্রদান করিবেন যে, তাহারা যদি আমার আদেশ মান্য করিয়া চলে তবে তাহারা নিজ দেশের সেবাই করিবে। গোরা সৈন্যগণকে তাঁহারা এই কথা বলিতে পারেন "বর্ত্তমানে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন ইংরাজের স্বার্থ বা ইংরাজের জীবন রক্ষার জন্য তোমরা এই দেশে অবস্থান করিতেছ না—তোমরা বিদেশীর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্যই এদেশে অবস্থান করিতেছ। তোমাদিগকে ভারতের অভ্যন্তরে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহাও দমন করিতে হইবে এবং মনে করিতে হইবে যে, তোমরা যেন তোমাদের নিজের দেশের সেবা করিতেছ। উহাই আমার স্বপ্ন।

আমি যদি সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব না পাই, তবে আমি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব না পাইলেও আমি স্বায়ত্ত শাসন পাইতে পারি, এই মনে করিয়া আমি নিজেকে প্রতারণা করিব না। ভারতবর্ষ এখন একটা জাতি নহে, যাহা কি করিয়া নিজের দেশ রক্ষা করিতে হয়, তাহা কখনও জানে নাই। ভারতে দেশ রক্ষার সকল প্রকার সম্ভাবনা বর্ত্তমান আছে। ভারতে মুসলমানগণ আছে, তাহারা বিদেশীর আক্রমণে ভয় পায় না। শিখেরা কাহারও দ্বারা বিজিত হইবে এই চিন্তা করিতেও নারাজ। তথায় যখনই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে তখনই বলিবে—আমরা একাই ভারতবর্ষকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারি। তারপর ভারতে রাজপুতগণ আছে যাহারা গ্রীসের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র থার্ম্মোপলির যুদ্ধে জয়লাভ করে নাই, তাহারা সহস্র থার্ম্মোপলির যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে।

সামরিক বিভাগের কর্তৃত্বের স্বপক্ষে আজ আমি যে সব যুক্তিতর্ক দিলাম, ঠিক সেই সব যুক্তিতর্কের বলেই আমি আজ পররাষ্ট্র বিভাগের উপর আমাদের কর্তৃত্বের দাবী করিতেছি। এক্সটারন্যাল এফেয়ার্স অর্থে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বুঝায় তাহা আমি বুঝিতে না পারিয়া এবং গোল টেবিল বৈঠকের রিপোর্টেও উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমি আমার বন্ধু আয়েঙ্গার ও দাশকে উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের উত্তর আমার সামনে আছে। তাঁহারা বলেন যে, উহার অর্থ ভারতবর্ষের প্রতিবেশী শক্তিসমূহের দেশীয় রাজ্যগুলির, বৈদেশিক শক্তিগুলির ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক।

বৈদেশিক সম্পর্কের অর্থ যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি যে, আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং তৎসম্পর্কিত কর্তব্য পালন করিতে একান্ত সমর্থ। আমরা নিঃসন্দেহে আমাদের স্বীয় আত্মীয়স্বজন, স্বীয় প্রতিবেশী, স্বীয় দেশবাসী ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধিসর্তের আলোচনা চালাইতে সক্ষম। আমরা আমাদের প্রতিবেশী আফগানদের সহিত এবং সমুদ্রপারবর্তী রাজ্য জাপানের সহিত এক অন্যান্য উপনিবেশসমূহের সহিত নিশ্চয়ই গাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারি। যদি সিন্ধুপারবর্তী অন্যান্য রাজ্য বা ডোমিনিয়নসমূহ আমাদের দেশবাসীকে আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া থাকিতে না দেন, তথাপি আমরা তাহাদের সহিত আপোষরফা করিতে সমর্থ হইব। এ সমস্ত কথা মূর্খের মত শুনাইতে পারে, কিন্তু আপনাদের জানা উচিত যে, কংগ্রেসে আমারই মত হাজার হাজার মূর্খ নরনারী রহিয়াছেন এবং আমি তাঁহাদেরই পক্ষ হইতে বিনীত ভাবে এই দাবী পেশ করিতেছি। আমি দৃঢ়তার সহিত আবার বলিতেছি যে, আমরা যে রক্ষামূলক ব্যবস্থার কথা ভাবিতেছি, তদ্দ্বারাই আমরা পুরাপুরিভাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিব। বালবাজী এই সমস্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশের সহিতই আমি সম্পূর্ণরূপে একমত। কিন্তু এই ব্যবস্থাই একমাত্র "রক্ষাকবচ" নহে। যদি ইংরাজ ও ভারতবাসিগণ একই তরীতে আরোহণ করিয়া একই দিকে যাত্রা করেন এবং তাঁহারা মনের ভিতর কোন স্বার্থবুদ্ধি পোষণ না করেন, তবে আমি একান্ত বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, আমরা এমন একটা রক্ষামূলক ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিব, যাহা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড, উভয়ের পক্ষেই সম্মানজনক হইবে এবং ইহা দ্বারা ভারতস্থিত প্রত্যেকটি ইংরাজের স্বার্থ সুরক্ষিত ও নিরাপদ হইবে—ভারতবর্ষ এই প্রকার প্রতিশ্রুতি আপনা-দিগকে দান করিতেছে।

ভারতের মুসলমান এবং সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তি

ভাবী শাসনতন্ত্রে কোন সম্প্রদায়ের কি অধিকার ও সুবিধা থাকিবে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া মুসলমান, অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দু ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় খৃষ্টান প্রভৃতি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির বিবরণ সম্বলিত এক বর্ণনাপত্র প্রধান মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। তাহাতে মাননীয় আগা খাঁ, ডাঃ আম্বেদকার, রাওবাহাদুর এ, পেনিয়ুমিনডাম, স্যর হেনরি গিডনি এবং স্যর হিউবার্টকারের স্বাক্ষর আছে।

যাঁহারা এই চুক্তি করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ভারতের ১১৯০ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৪৬ জন লোকের পক্ষ হইতে এই চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই চুক্তির মধ্যে নাগরিকের অধিকার, ধর্ম-সংক্রান্ত স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দাবী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা-সম্পর্কিত ১১টি ধারা আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ধারাতে মুসলমান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইয়োরোপীয়ান এবং অনুন্নত শ্রেণীর বিশেষ দাবী স্বীকৃত হইয়াছে।

পরিশেষে একটি তালিকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কোন্ প্রদেশের আইন সভায় কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন প্রতিনিধি থাকিবেন, তাহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবী

নিম্নলিখিত ১১টি ধারাতে বিভিন্ন সমাজের দাবী এবং সংরক্ষণী ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে :—

১। অতঃপর ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মমত, জাতি অথবা আদর্শ এই সমস্তের জন্য কাহাকেও চাকুরী, ব্যবসায় অথবা নাগরিকের অধিকার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

২। বৈষম্যমূলক আইন করিয়া যাহাতে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা না হয়, তজ্জন্য শাসনতন্ত্রের মধ্যে স্থায়িভাবে সর্ত্ত রাখা হইবে।

৩। ধর্ম্ম সম্পর্কে পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে কাহাকেও কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না, অথবা কাহারও নাগরিকের অধিকার কিংবা দাবী নষ্ট হইবে না।

৪। স্ব স্ব সম্প্রদায়গত ধারণা, ধর্ম্মবিষয়ক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের থাকিবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে।

৫। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা ব্যক্তিগত অধিকার, শিক্ষা বিস্তার, ভাষার উন্নতি এবং ধারণা প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে যথাবিহিত অনুপাতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে,—এই মর্ম্মে কয়েকটী সুস্পষ্ট বিধান শাসনতন্ত্রের মধ্যে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে।

৬। নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

৭। মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোককে যথাসম্ভব বিভিন্ন মন্ত্রিসভার জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

৮। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষা এবং তাহাদের উন্নতি-বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্থায়িভাবে কতকগুলি বিভাগ রক্ষা করিতে হইবে।

৯। বর্ত্তমানে যে সমস্ত সম্প্রদায় কোন না কোন আইন সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথানুসারে সমস্ত আইন সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এতৎসংশ্লিষ্ট তালিকার মধ্যে যে সম্প্রদায় হইতে যত জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা আছে, সেই অনুপাত মানিয়া চলিতে হইবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়কে কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইবে না কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমান করা হইবে না।

এই ধারায় আরও বলা হইয়াছে যে, ১০ বৎসর পরে পঞ্জাব ও বাঙ্গলার মুসলমান এবং অন্যান্য প্রদেশের যে কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে যুক্ত নির্ব্বাচন, অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমস্ত সংখ্যা নির্দ্ধারিত রাখিয়া যুক্ত নির্ব্বাচন-প্রণালী গ্রহণ করিতে পারিবে। ঠিক সেইরূপে কেন্দ্রীয় আইন সভাতেও যুক্ত নির্ব্বাচন অথবা সমস্তসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যুক্ত নির্ব্বাচন প্রণালী গ্রহণ করিবার অধিকার যে কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের থাকিবে।

তবে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ ২০ বৎসর কাল পৃথক নির্ব্বাচনের ফলাফল না দেখিয়া এবং যে পর্য্যন্ত না সোজাসুজিভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়, সে পর্য্যন্ত—যুক্ত নির্ব্বাচন এবং সমস্ত-সংখ্যা নির্দ্ধারিত রাখার ব্যবস্থা করা হইবে না।

১০। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে কতকগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে। এই কমিশন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যার অনুপাতে কর্ম্মকুশলতা এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান ইত্যাদির বিষয় বিবেচনা করিয়া চাকুরীপ্রার্থী মনোনীত করিবেন। গবর্ণর-দিগকে এবং গবর্ণর জেনারেলকে এই নীতি অনুসরণ

করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্বাচন ঠিক হইল কিনা তাহা বিবেচনা করিবেন।

১১। কোন আইন সভায় কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের যত জন সদস্য আছেন, তাহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্য যদি মনে করেন যে, কোনও বিল আইনে পরিণত হইলে তাহাদের ধর্ম অথবা সমাজ-সংক্রান্ত রীতিনীতির উপর আঘাত পড়িবে, তাহা হইলে সেই বিল অনুযায়ী কার্য স্থগিত থাকিবে। যদি মৌলিক কোন অধিকারের উপর আঘাত পড়ে, তাহা হইলে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রতিবাদেই সেই বিলের কার্য স্থগিত রাখিতে হইবে। এই ধারাতে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রতিবাদ হওয়ার পর এরূপ বিল সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আইন সভাকে পূর্ণ এক বৎসর সময় দেওয়া হইবে। এই সময় মধ্যেও যদি আইন সভা কিছু না করেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেল তাঁহার অভিরুচি অনুসারে এই বিল অনুমোদন কিংবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

যে সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম অথবা সমাজ-সংক্রান্ত রীতিনীতির উপর এরূপ বিল দ্বারা আঘাত পড়িবে, সেই সম্প্রদায়ের দুইজন প্রতিনিধি ইহার বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি করিয়া সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করিতে পারিবেন এবং সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া রায় দিবেন।

মুসলমানগণের বিশেষ দাবী

মুসলমানগণের বিশেষ দাবী প্রধানতঃ তিনটি, যথা :—

(ক) কেন্দ্রীয় আইন সভায় যত জন সদস্য থাকিবেন তাঁহাদের এক-তৃতীয়াংশ হইবেন মুসলমান।

(খ) সিন্ধুকে পৃথক করিয়া গবর্ণর-শাসিত প্রদেশ করিতে হইবে।

(গ) সীমান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশের সমান মর্যাদা স্বীকার করার ভিত্তিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে। এই নবগঠিত প্রদেশের আইন সভায় মোট যত জন সদস্য থাকিবেন, তাহাদের সংখ্যার শতকরা ১০ জনের বেশী সদস্য গবর্ণমেণ্ট মনোনয়ন করিতে পারিবেন না।

অনুন্নত সমাজের বিশেষ দাবী

অনুন্নত সমাজের বিশেষ দাবী প্রধানতঃ চারিটি। যথা :—

(ক) অস্পৃশ্যতার ফলে নাগরিকের অধিকার উপভোগ সম্পর্কে যে বৈষম্যমূলক আচরণ, শাস্তির ব্যবস্থা এবং অক্ষমতা, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হইল, এই মর্মে একটি বিশেষ বিধান ভাবী শাসনতন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়া দিতে হইবে।

(খ) সরকারী চাকুরী, পুলিশ ও সামরিক বিভাগে অনুন্নত সমাজের প্রার্থী গ্রহণ সম্পর্কে উদার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) জমি হস্তান্তরিত করা সম্পর্কে পাঞ্জাবে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহার সুবিধা পাঞ্জাবের অনুন্নত সমাজগুলিকেও দিতে হইবে।

(ঘ) শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন অথবা অনুন্নত সমাজের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতেছেন, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ থাকিলে গবর্ণর অথবা গবর্ণর জেনারেলের নিকট আপীল করিবার অধিকার তাহাদের দিতে হইবে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের বিশেষ দাবী

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের বিশেষ দাবী প্রধানতঃ তিনটি, যথা :—

(ক) হাউস টেবিল কনফারেন্সের সাব কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত দাবী সম্পর্কে একটু উদার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণের অবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র রকমের। তাহাদিগকে ইয়োরোপীয়ানগণের ন্যায় ব্যয়সাধ্য প্রণালীতে জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। সুতরাং সরকারী চাকুরী ও বেতন সম্পর্কে তাহাদিগকে একটু বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে।

(খ) নিজেদের শিক্ষায়তনগুলির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ

করিবার অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ সরকারী সাহায্য এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) বিচারের সময় জুরী নির্ব্বাচন সম্পর্কে অন্যান্য সম্প্রদায় যেরূপ সুবিধা পাইয়া থাকেন, তৎসমস্ত সুবিধাই তাহাদিগকে দিতে হইবে, অধিকন্তু এই সঙ্গে জন্মের বৈধতার প্রমাণ চাওয়া হইবে না। ইয়োরোপীয়ান জুরী অথবা ভারতীয় জুরী মনোনীত করিবার অধিকার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আসামীকে দিতে হইবে।

ইয়োরোপীয়ানগণের বিশেষ দাবী

ইয়োরোপীয়ানগণের বিশেষ দাবী প্রধানতঃ দুইটি, যথা :—

(ক) ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে ভারতবাসীর সমান অধিকার ও সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ফৌজদারী মামলার বিচারের সময় ইয়োরোপীয়ান আসামিগণ যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এই সমস্ত সুবিধা পরিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র জেনারেলের অনুমতি লইতে হইবে।

কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন প্রতিনিধি

চুক্তিপত্রের শেষে যে তালিকা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বিধা বিভক্ত হইবে। ইহার সিনেট অথবা আপার হাউসের মোট সদস্য-সংখ্যা হইবে ২০০ জন। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত হইবেন :

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু	১০১ জন
অনুন্নত হিন্দু সমাজ	২০ ,,
মুসলমান	৩১ ,,
ভারতীয় খৃষ্টান	১ ,,
ইয়োরোপীয়ান	৪ ,,
শিখ	৬ জন
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	১ ,,

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার লোয়ার হাউস অথবা চেম্বারের মোট সদস্য-সংখ্যা হইবে ৩০০। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত হইবেন :

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু	
অনুন্নত হিন্দু সমাজ	
মুসলমান	
ভারতীয় খৃষ্টান	৭ ,,
শিখ	১০ ,,
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৩ ,,
ইয়োরোপীয়ান	১২ ,,

অতঃপর বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যগণের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশ

মোট সদস্য-সংখ্যা ২০০ জন। তন্মধ্যে—

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু	৩৮ জন
অনুন্নত হিন্দু সমাজ	৩৫ ,,
মুসলমান	১০২ ,,
ভারতীয় খৃষ্টান	২ ,,
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৩ ,,
ইয়োরোপীয়ান	২০ ,,

বোম্বাই

মোট সদস্য-সংখ্যা হইবে ২০০। তন্মধ্যে—

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু	৮৮ জন
অনুন্নত হিন্দু সমাজ	২৮ ,,
মুসলমান	৬৬ ,,
ভারতীয় খৃষ্টান	২ ,,
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৩ ,,
ইয়োরোপীয়ান	১৩ ,,

মাদ্রাজ

মোট সদস্য-সংখ্যা হইবে ২০০। তন্মধ্যে—

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু	১০২ জন
অনুন্নত সমাজ	৪০ ,,
মুসলমান	৩০ ,,
ভারতীয় খৃষ্টান	১০ ,,
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	৪ ,,
ইয়োরোপীয়ান	৮ ,,
পাহাড়িয়া জাতির প্রতিনিধি	২ ,,

পাঞ্জাব

মোট সদস্যসংখ্যা হইবে ১০০ জন। তন্মধ্যে

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু	১৪ জন
অনুন্নত সমাজ	১০ ,,
মুসলমান	৫১ ,,
শিখ	২০ ,,
অন্যান্য সম্প্রদায়	৫ ,,

সমস্ত প্রাদেশিক সভার মত এখানেও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থাকিবেন, তাঁহাদের মোট সংখ্যা হইবে ১৭ জন, ভারতীয় খৃষ্টান ২৪ জন, ইয়োরোপীয়ান ৬৩ জন।

চুক্তিপত্রের মধ্যে বলা হইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক, জমিদার এবং শ্রমিকগণের পক্ষ হইতে সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য কোন প্রকার পৃথক ব্যবস্থা করা হয় নাই। কারণ স্বাক্ষরকারিগণ মনে করেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য যে সমস্ত সদস্যপদ নির্দ্ধারিত করা হইল, তাহার দ্বারা হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে শ্রমিক, জমিদার ও বণিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

আমেরিকার খেসারৎ রেহাইয়ের প্রস্তাব

কয়েক মাস পূর্ব্বে (জুলাই ২০, ১৯৩১) মার্কিণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা হুভার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যদ্ধ ইয়োরোপের বিশেষভাবে জার্ম্মানির যেরূপ অর্থ-সঙ্কট হইয়াছে তাহাতে ইয়োরোপের পক্ষে এরূপ সঙ্কটে দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়া বেড়ানো অসম্ভব। সুতরাং এক বৎসরের যুদ্ধের খেসারৎ রেহাই দেওয়া যাক্। কথাটা উঠা মাত্র ইয়োরোপময় নানা জল্পনার সৃষ্টি হয়; অতঃপর ইয়োরোপীয় অর্থ ও রাজনীতির মধ্যে মার্কিনদের এরূপ ঔদার্য্যের ভাব প্রকাশ পাওয়ায় জল্পনা কল্পনা শতমুখে শতভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে সব চেয়ে জোর প্রতিবাদ হইল ফ্রান্সের তরফ হইতে। বিগত যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলে খেসারৎ বাবদ বেলজিয়াম ও ফ্রান্স মোটা টাকা বৎসরে বৎসরে পাইতে থাকে। ফ্রান্স তাহার পাওনা গণ্ডা ছাড়িতে রাজি নহে; সে মনে করে, জার্ম্মানির অক্ষমতা নিবেদন কেবল তাহার ভাণ। ফ্রান্স জার্ম্মানিকে ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে রাজি, কিন্তু টাকা রেহাই দিতে রাজি নয়। ফ্রান্স আশঙ্কা করে যে, এক বৎসরের টাকা ছাড়িলে খেসারতের সব টাকাই ধীরে ধীরে রেহাই হইয়া যাইবে। কিন্তু মার্কিণ টাকা বেশ চেনে; সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে, এমন অভিসন্ধি সে স্বপ্নেও করিতে পারে না। মোট কথা, কাল যতই যাইতেছে, ততই হুভারের প্রস্তাব ধামা-চাপা পড়িতেছে।

দর্জ্জির কাজে বাঙ্গালী ভদ্রলোক

["ঢাকা ষ্টিচিবিজ্ঞান কলেজ" বড় বড় অক্ষরে এই-রূপ লেখা এক সাইন বোর্ড টানান আছে দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করা গেল। অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারীর নাম এস সি মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁর সঙ্গে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল তার মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।]

প্রঃ—আপনি কি এই কলেজের অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—আপনার কাছে আপনার কলেজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনি দয়া করিয়া উত্তর দিলে বাধিত হইব।

উঃ—জিজ্ঞাসা করুন।

প্রঃ—আপনাদের এখানে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয়?

উঃ—ইংরাজীতে ছাপানো আমাদের প্রস্‌পেক্টাস্ আছে, এই এক বস্তু লউন। ইহাতে দেখিতে পাইবেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়কে পাঁচটি অধ্যায়ে (কোর্স) ভাগ করা হইয়াছে। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ :

প্রথম। (১) পাঞ্জাবী। (২) নিমা। (৩) কতুয়া। (৪) শার্ট (ডি বি প্র্যাক্টনেক ইত্যাদি) (৫) সেমিজ্। (৬) পেটিকোট। (৭) ব্লাউস। (৮) ফ্রক। (৯) পেনি। (১০) নাবিক স্যুট। (১১) ইজার-বডি। (১২) জাঙ্গিয়া।

দ্বিতীয়। (১) লাউঞ্জ কোট। (২) কেপ্ কলার কোট। (৩) অলষ্টার কোট। (৪) ব্যাক্-বেল্ট কোট। (৫) ডি বি কোট। (৬) কর্পুলেন্ট কোট। (৭) বেষ্ট। (৮) কর্পুলেন্ট বেষ্ট। (৯) ডেমি কোট। (১০) শয়ন করিবার কোট। (১১) ঘোড়ায় চড়ার কোট। (১২) আণ্ডার ইউয়ার। (১৩) প্যাণ্ট। (১৪) কর্পুলেন্ট প্যাণ্ট। (১৫) শর্ট। (১৬) পায়জামা।

তৃতীয়। (১) মিলিটারি টিউনিক জ্যাকেট। (২) আচ-কান। (৩) চাপকান। (৪) চোগা। (৫) ষ্টেয়ারহেড। (৬) এস্ বি আলষ্টার। (৭) ডি বি আলষ্টার। (৮) ওভারকোট। (৯) ইউনিফর্ম কোট। (১০) মোটর ড্রাইভার কোট। (১১) ট্রাম ড্রাইভার কোট। (১২) রাগ্‌লান। (১৩) পেট্রোল জ্যাকেট।

চতুর্থ। (১) ঘোড়ায় চড়ার ব্রীচ্। (২) ঘোধপুর ব্রীচ্। (৩) নিকার ব্রীচ্।

পঞ্চম। (১) ফ্রক কোট। (২) ডেমিড্রেস্ কোট। (৩) প্রাতঃকালীন কোট।

আমরা ছাত্রদের এই সমস্ত বিষয়ই শিখাইয়া থাকি। তবে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যে কেহ এই পাঁচ অধ্যায়ের একটি বা ততোধিক অধ্যায় শিখিতে পারে।

প্রঃ—আপনাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে কতদিন লাগে? শিক্ষার্থীকেই বা কত দিতে হয়?

উঃ—আমরা সাধারণতঃ ৬ মাসে এই পাঁচটি অধ্যায় শিখাইয়া থাকি। প্রস্‌পেক্টাসে দেখিতে পাইবেন সর্ব্বমোট ১৫০৲ টাকা শিক্ষার্থীর নিকট কী বাবদ লইবার কথা : প্রথম অধ্যায়ের জন্য ৩০৲ টাকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য ৫০৲ টাকা, তৃতীয় অধ্যায়ের

মত ৪০৲ টাকা, চতুর্থ অধ্যায়ের জন্য ১৫৲ টাকা, ও পঞ্চম অধ্যায়ের জন্য ১৫৲ টাকা। কিন্তু এ বৎসর দেশের অবস্থা খারাপ বলিয়া মোট ২০৲ টাকা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদের নিয়ম এই যে, প্রথম অধ্যায়ের টাকাটা অগ্রিম দিতে হইবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের বেলা টাকা অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা থাকিলেও আমরা কিছু কিছু সুবিধা করিয়া দেই।

প্রঃ—যারা শিখিতে আসে তারা কি পাঁচটি অধ্যায়ই শিখিয়া যায়?

উঃ—পাঁচটি অধ্যায় শিখিবার মত টাকা অনেকে যোগাড় করিতে পারে না। যতটা পারে ততটা শিখে। শিক্ষাটা মাঝ পথে বাধা না পাইলে ৬ মাসে সকল বিষয়ে শিক্ষা শেষ হয়। কিন্তু কেহ কেহ একটি বিষয় শিখিয়া ২।১ মাস হয়ত আর আসে না। আবার টাকা যোগাড় হইলে আসে। এরূপ ক্ষেত্রে ৬ মাসের বেশী সময় যে লাগিবে তা আর বিচিত্র কি?

প্রঃ—আচ্ছা আপনার কলেজে কি শিখাইয়া থাকেন এবং কি ভাবে শিখান জানিতে পারি কি?

উঃ—পাঁচটি অধ্যায়ে যে সব জিনিষের নাম করা হইয়াছে সেগুলি শিখাই। শিখানোর অর্থ সেগুলির কাট-ছাট সম্বন্ধে হাতে কলমে দেখাইয়া দেই। ছাত্রদের নিজ নিজ মিটন কাপড়, ফিতা, চক, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি থাকে। আমি কাপড়ের উপর আঁকিয়া কোন্‌টা কি ভাবে করিতে হইবে দেখাইয়া দেই। এইরূপে হাত দরুস করিতে অনেক দিন যায়।

প্রঃ—সেলাই শিখান না?

উঃ—সেলাই শিখানোর ব্যবস্থা আছে, সেজন্য মাসে ২৲ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। কিন্তু সেলাই শেখা সহজ নয়। সে জন্য ধৈর্য্য ও সময়ের প্রয়োজন। বস্তুতঃ দুই বৎসরের আগে কেহ সেলাই শিখিতে পারে না, আর অধিকাংশের এরূপ ধৈর্য্য নাই যে দুই বৎসর ধরিয়া সেলাই শিখিবে।

প্রঃ—আচ্ছা, যে সকল বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন, সেগুলি কি ঘরে বসিয়া কেতাব দেখিয়া শেখা যায় না?

উঃ—না মহাশয়, তা সম্ভব নয়। আমি যাদের শিক্ষা দেই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তারা আমার অসাক্ষাতে কোন কাজের দায়িত্ব নিতে সাহস পায় না। সুতরাং শুধু বই পড়িয়া এ বিষয়ে দক্ষ হওয়া অসম্ভব।

প্রঃ—আপনার এই কলেজে আপনার সহকারী আর কেহ আছেন কি? না, আপনি একাই শেখান?

উঃ—আমি একা শেখাই। সহকারীর কোন প্রয়োজন হয় না। সবলেই আর কিছু সব এক সঙ্গে শিখিতে পারে না। আমি আঁকিয়া দেই, তাহাতেই এক একজনকে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

প্রঃ—এই কলিজ কতদিন খুলিয়াছেন? এখন ইহার অবস্থা কি প্রকার জানিতে পারি কি?

উঃ—আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ আমি ছাত্র লইয়া কলিজের কাজ শিখাইয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম ছাত্রেরা আমার কাছে শিখিত ও মাস মাস কিছু কিছু করিয়া দিত। নবাবপুরে আমার নিজের কলিজের দোকান আছে। এই দোকান আগে আমি চালাইতাম। গত আড়াই বৎসর যাবৎ আমি এই বিদ্যালয় খুলিয়াছি। আমার ভাই আমার দোকানের ভার লওয়ায় আমি এদিকে মন দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অনেক ভদ্রলোকের ছেলে পূর্ব্বে আমাকে আসিয়া রীতিমত কলিজের কাজ শিখাইবার জন্য বলিত। তখন আমার ইচ্ছা হইল যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া এইরূপ একটা ইস্কুল চালাই। প্রথম বৎসরে কম ছাত্র পাই নাই। গত বৎসর এটা বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর দেশের দারুণ দুর্দ্দিনে আমার ইস্কুলের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর ব্যাডিন ষ্ট্রীটের এই যে বাড়ী দেখিতেছেন, এখানে জোড়সে

ইস্কুল চলিয়াছিল। আমি রাতদিন এখানে পড়িয়া থাকিতাম, আমার খাবার পর্য্যন্ত এখানে লইয়া আসিত। কিন্তু যে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে তা যে শীঘ্র শেষ হইবে, তা মনে হয় না। হয়ত আমাকে এই ইস্কুল উঠাইয়া দিতে হইবে।

প্রঃ—অত্যন্ত দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। গত বৎসর আপনি কয়টি ছাত্র পাইয়াছিলেন।

উঃ—২১টি।

প্রঃ—আচ্ছা, এই একুশটি ছাত্রের জাতি কি ছিল, ইহারা কতদূর লেখাপড়া শিখিয়াছিল? অভ্যাস গুণই বা কি ছিল?

উঃ—বলিতেছি শুনুন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ছিল, কায়েত সাহা ও অন্যান্য জাতের ছাত্রও আসিয়াছে,—বৈদ্য প্রায় পাই নাই বলিলেই চলে। মুসলমান ছাত্র মাত্র দুই জন পাইয়াছিলাম। একটা মজার কথা এই যে, চাকা সহরের অথবা চাকা জিলার ছাত্র খুব কম পাই। সব চেয়ে বেশী ছাত্র আসিয়াছিল বৈষনসিংহ হইতে। শ্রীহট্ট, ফরিদপুর ও বরিশাল হইতেও ছাত্র আসিয়াছে। প্রায় সকলেই ম্যাট্রিক পাশ ছিল। গ্রাজুয়েট একজন ও আই এ পাশ একজন পাইয়াছিলাম। খুব বুদ্ধিমান ছাত্র ২।১ জন পাইয়াছি। তবে অধিকাংশই সাধারণ ছেলে ও দরিদ্র।

প্রঃ—দেখিতেছি ভদ্রলোকের ছেলেদের এদিকে নজর পড়িয়াছে।

উঃ—এ বৎসরের অবস্থা দেখিয়া পড়িয়াছে আর বলিতে পারি না। দেশের অবস্থা খারাপ না হইলে আমি যে কলেজটাকে জাঁকাইয়া তুলিতে পারিতাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রঃ—আপনার এখানে যারা কাজ শিখিয়াছে তারা সকলেই কি আজ "কাজকর্ম্ম" করিয়া খাইতেছে?

উঃ—হাঁ মহাশয়। সকলেই আর কিছু বড় আদর্শ লইয়া আসে না। মফঃস্বল সহরে ছোটখাট ব্যবসা যারা পেট চালাইতে পারিলেই অনেকে সন্তুষ্ট হয়। সেই প্রকার বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারিলে অনেকেই কাজ খুঁজিয়া লয়। এই চাকা সহরেই তিনজন দর্জ্জির ব্যবসা চালাইতেছে, তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ।

প্রঃ—আপনি এভাবে প্রতি বৎসর কতকগুলি ছাত্রকে যে নিজ ব্যবসার সঙ্কেত শিখাইতে মনস্থ করিয়াছেন, আপনার একথা মনে হয় নাই কি যে, ইহারা নিজ ব্যবসা ভাল করিয়া শিখিতে পারিলে আপনাকে ভাতে মারিবে?

উঃ—আজ্ঞে না, সে প্রকার চিন্তা কখনো মনে উদয় হয় নাই। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলে এ ব্যবসা শিখিয়া যদি দু'পয়সা ঘরে আনিতে পারে তবে সে ত অত্যন্ত আহ্লাদের কথা। আর যারা শিখিবে, তারা আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিলেই বা ভয় কি? লোকে ত কাজ দেখিয়া ঘর দিবে। আমি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি, সে সুনাম ত আর নষ্ট হইবে না।

প্রঃ—এই ইস্কুল চালাইবার জন্য আপনার খরচপত্র কিরূপ হয়?

উঃ—এক পয়সাও নয়। কারণ, আপনাকে আগেই বলিয়াছি, নবাবপুর ষ্ট্রীটে আমার দর্জ্জির দোকান আছে। যে কোন জিনিষেরই নমুনা দেখাইবার প্রয়োজন হউক না কেন, দোকানে দেখাইবার সুবিধা হয়। সেজন্য আমাদের আর বৃথা কাপড় কাটিতে হয় না।

প্রঃ—কিন্তু আপনার প্রসপেক্টাসে যত প্রকার পোষাকের নাম করিয়াছেন তার সবগুলি কি সর্ব্বদা আপনাদের দোকানে পাওয়া যায়? নূতন কিছু দেখাইতে হইলে কি করেন?

উঃ—আমাদের দোকানে প্রায় সর্ব্বদাই সব রকম পোষাকের নমুনা থাকে। দু' একটির যদি কখনো অভাব থাকে, আমরা অন্য পোষাক দিয়া ভাবে প্রকারে বুঝাইয়া থাকি।

প্রঃ—আচ্ছা, যে সকল পোষাকের নাম দেখিতেছি এগুলির কাটছাট সম্বন্ধে আপনি নিজে কোন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন কি, না শাস্ত্রানুমোদিত পথে চলিয়াছেন?

উঃ—মহাশয়, আমাদের পোষাকের কাটছাট সব বিলাতী কাটছাটের অনুকরণে, আমরা নূতন কোথায় পাইব?

প্রঃ—আপনারা পোষাক তৈরী সম্বন্ধে কেতাব-পুস্তিকা-পত্রিকা ইত্যাদি রাখেন কি? ছেলেদের পুথিগত বিদ্যাদান কিরূপে করেন?

উঃ—না, ছেলেদের পুথিগত কোন বিদ্যাদানের ব্যবস্থা আমার ইস্কুলে নাই। বিদেশ হইতে কোন কেতাব-পুস্তিকা-পত্রিকাও আনি না। তার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে মৌলিক পছন্দ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। আমরা হুবহু হুকুম পাই, অমুক ছবি দেখিয়া জামা বানাইয়া দাও অথবা অমুক স্থানে এই রকম একটা জিনিষ দেখিয়াছি তাহা বানাইয়া দাও। বস্, সেই অনুসারে আমাদের কাজ করিতে হয়। আমাদের আর উদ্ভাবনার সম্ভাবনা কোথায়? আর উদ্ভাবনা করিলেই বা তা কে মানিয়া লইবে? সুতরাং অভিজ্ঞতার ফলে আমি এবিষয়ে পণ্ডশ্রম করিয়া কোন লাভ নাই।

প্রঃ—কিন্তু আপনারা লোকের রুচি উন্নত করিবার চেষ্টা করেন না কেন?

উঃ—চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। লোকেরা আমার কথামত পোষাক তৈরী করিবে না।

প্রঃ—আপনি বলিতেছেন ইংরেজী ছাটকাট অনুসারে আপনার ছাটকাট হয়। কিন্তু আপনি ত নূতন ছাট পান না, সেলাইও পান না। প্রতিদিন কত নূতন নূতন ছাট ও সেলাইয়ের উদ্ভব হইতেছে। এখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে তা পুরাণা হইয়া যায়।

উঃ—হায় বই কি? কিন্তু উপায় কি বলুন। আমি অনেক কষ্ট করিয়া বিভিন্ন লোকদের প্রতিলিপি-সম্বলিত একটি বড় খাতা আপনাকে দেখাইতেছি, দেখুন। আমার ইচ্ছা ছিল ব্লক করিয়া একটি পুস্তক ছাপাই। সে অনেক পয়সার কাজ। ইহাতে আমার নিজের উদ্ভাবনী কিছু কিছু স্থান পাইত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। ভবিষ্যতে যে হইবে তারও পথ দেখিতেছি না।

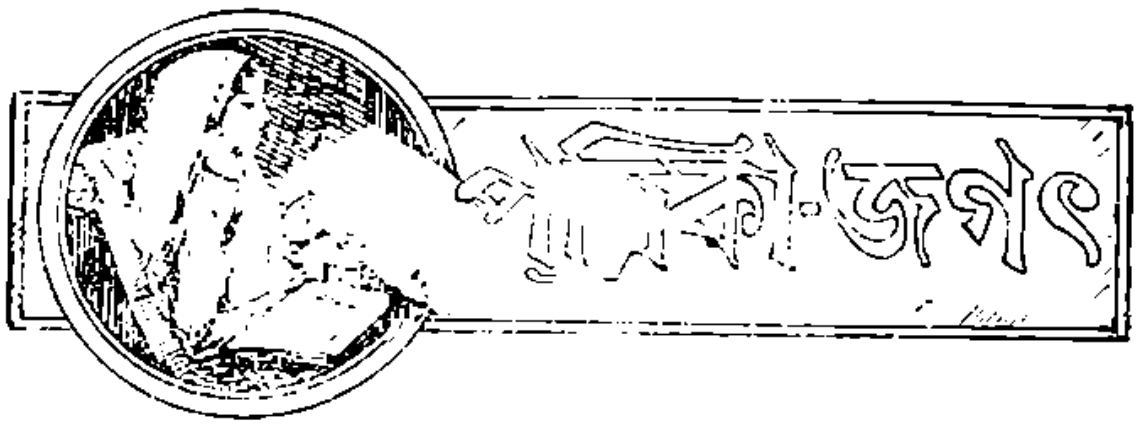

"ইণ্টারন্যাশানাল লেবার রিভিউ," অক্টোবর, ১৯৩১

শিল্প ও টাকাকড়ি : ম্যাকমিলান রিপোর্টের আন্তর্জ্জাতিক তাৎপর্য্য

লোকের মনে সাধারণতঃ এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, টাকাকড়ি-সংক্রান্ত বর্ত্তমান যে আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, তার কোথায় যেন কি গলদ্ ঘটিয়াছে,—যদিও প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন করা সম্ভবপর, তবু এই সব মাল বাজার পায় না, এরূপ দৃশ্য সময় সময় দুনিয়ার সর্ব্বত্র দেখা দিতেছে। কিছুদিন যাবৎ লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, এইরূপ গরমিলের জন্য শিল্পের সহিত টাকাকড়ির বর্ত্তমান সম্পর্কটাই দায়ী। উৎপাদকেরা যে মাল তৈরী করে তা বেচিয়া ফেলিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। খাদকেরাও মাল কিনিতে উৎসুক। অথচ ক্রয়-ক্ষমতার কিনা টাকাকড়ির অভাবে উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইতেছে না। কিন্তু টাকার সরবরাহ-ক্ষমতা রহিয়াছে আয়-ব্যয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে, সুতরাং নিশ্চয়ই টাকাকড়ির সঙ্গে শিল্পের কোথাও না কোথাও অসংযোগ ঘটিতেছে।

এই যুক্তি বেশ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই বৃটিশ কোষাগার কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিল্প ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত সমিতি এই বিষয়টি লইয়াই বিশেষ অনুসন্ধানের ফল বিবরণীর আকারে বাহির করিয়াছে। যদিও আলোচনা ও অনুসন্ধানের কেন্দ্র ইংলণ্ডের লিপিভূমি, তথাপি বিবরণী খোটা দুনিয়ার কথাও বিচার করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত পি ডাব্লিউ মার্টিন এই বিবরণী সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তারই কতকটার চুম্বক নীচে দেওয়া যাইতেছে।

বিবরণীর জন্মকথা ও সীমা নির্দ্দেশ

১৯২৯ সনের ৪ঠা নবেম্বর তারিখে তদানীন্তন অর্থ-সচিব মিঃ फিলিপ স্নোডেন বিলাতের জনসভায় বর্ত্তমান অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগের কথা জ্ঞাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হয় :

ব্যাঙ্কিং, টাকাকড়ি (ফিন্যান্স), সাউকারি (ক্রেডিট) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা,—আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জ্জাতিক যে সকল কার্য্য ক্রিয়া করিতেছে বিশেষভাবে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা এবং ইহাদের সাহায্যে কি করিয়া শিল্প, বাণিজ্য ও মজুর-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তার উপায় বাৎলানো।

১৯৩১ সনের জুলাই মাসে সমিতির বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে আর্থিক দুনিয়ায় এরূপ দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, এ বিবরণীর দিকে যথেষ্ট নজর দিবার অবকাশ লোকের ছিল না।

বিবরণীটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) শিল্প ও নিয়োগের সম্পর্কে মুদ্রাঘটিত ব্যবস্থার (মেসিন) বর্ণনা-সম্বলিত প্রবন্ধ ; (২) শিল্প ও টাকাকড়ির সম্বন্ধ কিরূপে উন্নীত করা যায়, তদ্বিষয়ে প্রস্তাবাবলি ; (৩) সমিতির বিভিন্ন সভ্যগণ, কখনো একত্রে, কখনো বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসল বিবরণীর চাইতেও বেশী কিছু বলিতে চাহিয়াছেন—তাঁদের মতবা, ইত্যাদি। বর্ত্তমান দুনিয়ার আর্থিক দুর্য্যোগের (ডিপ্রেশন) কারণ কি এবং এই অবস্থার প্রতীকার কিরূপে হইতে পারে, ভবিষ্যতে যাতে ইহা না ঘটে তার জন্যই বা কি

করা যাইতে পারে,—এই দুটি বিষয়ই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

দুনিয়ায় দুর্যোগের কারণ কি

মুদ্রাঘটিত কারণ ও মুদ্রাঘটিত নয় এমন কারণ।—গত দশ বৎসর ধরিয়া গ্রেটবৃটেনে পুনঃ পুনঃ বেকার সমস্যার উদ্ভব এবং ১৯২৯ সনের শেষ ঋতু হইতে দুনিয়ায় দুর্যোগের কারণ মুদ্রাঘটিত কি না সে বিষয়ে ম্যাকমিলান সমিতি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছে। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, দুর্যোগের কারণ এক নয় বহু, এবং তার কতকগুলি মুদ্রা-ঘটিত, কতকগুলি মুদ্রাঘটিত নয়। যেগুলি মুদ্রাঘটিত নয় তার মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) যুদ্ধজনিত ক্ষতি ও বাধা হেতু পুঁজিপাটার টানে অপ্রত্যাশিত অস্থিরতা ; (২) যুদ্ধফলের ফলে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ দেশসমূহের পরস্পর স্থান-পরিবর্তন ; (৩) শিল্প ও কৃষিতে দ্রুত কার্য্যকর (টেক্‌নিক্যাল) পরিবর্তন ; (৪) এক দিকে টান-যোগানের অসমতা বনাম নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য, নূতন বনাম পুরাতন শিল্প এবং শিল্প বনাম কৃষি-সমস্যা, অন্য দিকে ঐ অসমতা হেতু টানের সদা-পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ; (৫) মজুরির হারের স্থিতিশীলতা ; (৬) শুল্ক (টারিফ) বৃদ্ধি ; (৭) আয়-ব্যয়ের (বাজেট) গরমিল ; (৮) নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্য ফট্‌কার বাজারে ঘোরতর অঘন-বঘন।

মুদ্রা ঘটিত কারণের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণ প্রমাণ (গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড) ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ ভাবে বিলাতী স্বার্থ আলোচনা না করিয়া দুনিয়ার স্বার্থের দিকে চাহিয়া অবস্থাটা তলাইয়া বুঝা প্রয়োজন।

স্বর্ণ-প্রমাণ ব্যবস্থার গলদ্।—১৯২৫ সনে সরকারী অভিপ্রায় বলে বিলাতে পাউণ্ড ষ্টার্লিংকে 'পার ভ্যালু' অর্থাৎ যত সোনা তত দামে ফিরাইয়া আনা হয়। তাতে ষ্টার্লিংএর দাম চড়ে। অর্থাৎ সে সময়ে অন্য জায়গায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা (অথবা জাতীয় সিক্কায় উহার রূপান্তর) যত কিনিতে গ্রেট বৃটেনে তার চেয়ে কম কিনিতে সমর্থ ছিল। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বৃটিশ বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত ছিল। অন্যদিকে অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও বেলজিয়াম, বিপরীত পথ অবলম্বন করায় (অন্য সব জায়গার চেয়ে ঐ সব দেশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনায় বেশী কেনা যাইত) বিনিময়ের অসুবিধা আরো বাড়িয়া যায়।

কোন দেশের পক্ষে সেই দেশে অবলম্বিত সিক্কার উর্দ্ধীকরণ (ওভার-ভ্যালুয়েশন) বা অধঃকরণ (আণ্ডার-ভ্যালুয়েশন) যতই গুরুতর হোক্ না, স্বর্ণ-প্রমাণ সমস্যার কাছে তাহা সমগ্র দুনিয়ার কাছে কিছুই নয়। সমস্যা সংক্ষেপতঃ এই : যদি কোন উত্তমর্ণ দেশ অর্থাৎ এমন দেশ যেখানকার সরকার অথবা অধিবাসীরা অন্যান্য সরকার অথবা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে নিট্ টাকা (বালান্স অব পেমেণ্টস্) পাইবার অধিকারী,—(ক) উচ্চ শুল্ক দেওয়ালের সাহায্যে আমদানি বন্ধ করিয়া দেয়। (খ) কোন অবস্থাতেই নিজের জিনিষপত্রের দর দুনিয়ার জিনিষপত্রের দরের উপরে উঠিতে না দেয়, এবং (গ) বিদেশে দয়া দিয়াছে টাকা ফের দিতে (রিন্ বেইমেণ্ট) অস্বীকার করে, তবে ঐ দেশের দিকে অনবরত স্বর্ণস্রোত (অথবা স্বর্ণের জন্য দাবী) প্রবাহিত হইতে থাকিবে ও তারপর ক্রমে ক্রমে এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, অধমর্ণ দেশগুলিকে বাধ্য হইয়া স্বর্ণ প্রমাণ রদ্ করিতে হইবে অথবা ঋণ বাড়াইতে হইবে।

উত্তমর্ণ দেশ হয় সবো (সেবা ও 'সাভিবিদ্' সমেত) নয় সোনায় তার ঋণ-শোধ গ্রহণ করে ; কিংবা যা উহার পাইবার কথা তা আবার ধার দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি শুল্ক ব্যবস্থার দ্বারা ঐ দেশ পণ্য আমদানি বন্ধ করিয়া দেয় অথচ ঠিক সেই সময়েই আবার দুনিয়ার দরের তুলনায় নিজের দরকে কখনো চড়িতে না দেয় (ও এইরূপে রপ্তানি হ্রাস ও আমদানি-বৃদ্ধির পথে বাধা জন্মায়), যদি আবার অধমর্ণ দেশগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে ধার দিতেও প্রস্তুত না থাকে ; তবে ইহার প্রাপ্য কতক অথবা সমস্ত টাকাই সোনা দিয়া শোধ না করিয়া উপায় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে স্বর্ণ প্রমাণের এই অর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। প্রধান উত্তমর্ণ দেশ গ্রেট বৃটেন অবাধভাবে আমদানি

করিয়াছে এবং বিদেশে যত খুশী টাকা খাটাইয়াছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ ও যুদ্ধ ঋণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স দুই মস্ত উত্তমর্ণ দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুই দেশের কোনটিই অবাধ আমদানি বা বিদেশে অবাধ টাকা খাটানো নীতি অবলম্বন করে নাই। সুতরাং পাটীগণিতের নিয়ম অনুসারে এই দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহে যে রাশি রাশি সোনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিবে, তাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

ম্যাকমিলান সমিতির মতে বর্ত্তমান দুনিয়াব্যাপী ভাঁটার (ডিপ্রেশন) এক প্রধান কারণ হইতেছে স্বর্ণের কু-বণ্টন। যে যে দেশে স্বর্ণ প্রমাণ প্রচলিত আছে সেখানেই সিক্কা ও সক্কলশীল সাউকারির সহিত মৌজুদ্ সোনার একটা সম্পর্ক বাঁধিয়া দেওয়া আছে। কোন দেশের মৌজুদ্ সোনা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া গেলে, সেই দেশের সিক্কা ও সক্কলশীল সাউকারির পরিমাণ কম করিয়া যাইবে, নতুবা আর বাড়িতে পাইবে না। এই দুই বড় উত্তমর্ণ দেশ অনবরত সোনা টানিয়া লইতেছে বলিয়া বাকী দুনিয়ার হাত শোষ করিবার উপায়ের সংস্থান হইতেছে না। ফলে আবশ্যক ক্রয়-ক্ষমতা না থাকায়, লাভজনক দরে জিনিষপত্র কিনিবার মত ক্রেতা পাওয়া যায় না ও শিল্পের অবনতি ঘটে।

বাণিজ্য-চক্র।—স্বর্ণ-বণ্টনের কুব্যবস্থার সহিত আর একটি সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। তা বাণিজ্য চক্রের ফলাফল। আধিক জগতে বাণিজ্যের জোয়ার ভাঁটা পরস্পর কেন দেখা দেয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও সন্তোষজনকভাবে দিতে পারে নাই। কিন্তু সমিতি ভাঁটার এক গুরুতর ফল লক্ষ্য করিয়াছে,—তা এই যে, যে সময়ে ক্রয়ের পরিমাণ এমন যথেষ্ট থাকে না যে, বিক্রেয় দ্রব্যাদির পরিমাণ সেই দরে বেচা যায় যাতে ঐ সব দ্রব্য তৈরী করিতে মোট যে খরচ হইয়াছে তাহা উঠিয়া আসে। ফলে উৎপাদন কমিয়া যায় অথবা ক্ষতিকর হইয়া উঠে এবং উৎপাদনের মূলধনের হ্রাস-বৃদ্ধির মত ঘটা হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি দর নামিয়া যায়।

বর্ত্তমান ভাঁটায় বিক্রয়ের এইরূপ অভাব ও দর-হ্রাস অতি ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশে পাইকারি দর ১৯২৮ সনের গড়ের তুলনায় প্রায় ২০-৩০% কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন দিকে, বিশেষভাবে কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচা মালে, এই দর-হ্রাসের পরিমাণ ৭০%। ফলে, বিস্তীর্ণ শিল্পের ক্ষেত্র ছাড়িয়া মানুষ ও যন্ত্রপাতি কর্ম্মহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং অতিরিক্ত পণ্য-সম্ভার পড়িয়া আছে এইজন্য যে, যে দর পাওয়া যাইতেছে তা এখন নয় যে, তাতে ভাবী উৎপাদনব্যয় ও বিক্রেতারা নিজ নিজ খরচ উঠাইয়া লইতে পারে।

সমিতির মতে দুনিয়ার বাণিজ্য-পতনের জন্য দায়ী প্রধানতঃ তিনটি কারণ :—(১) মুদ্রাঘটিত নয় এরূপ কতকগুলি কার্য্যপরম্পরা,—এগুলি অনেকাংশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের ফল; (২) স্বর্ণপ্রমাণকে যথাযথভাবে কাজে খাটাইতে না পারার ফলে কুব্যবস্থা; (৩) বাণিজ্য বা সাউকারি চক্রের ক্রিয়া। দুনিয়ার ভাঁটার মূল সমস্যা এই যে, যথেষ্ট ক্রয় হইতেছে না এবং ফলে দ্রুতবেগে দর নামিয়া গিয়াছে। যে সকল কারণ মুদ্রাঘটিত নয় সেগুলিই বিগত দশকের আর্থিক অটিলতার কারণ হইলেও, সমিতি মনে করেন মুদ্রাঘটিত কারণসমূহও কম দায়ী নহে, যদি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত মুদ্রা-সাম্যের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তবে দুনিয়ার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা বহুল পরিমাণে প্রতিহত হইত।

প্রতীকারের ব্যবস্থা

এক্ষণে গুরুতর প্রশ্ন হইল, কি করিয়া ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ান যায়। বাজারে যারা ক্রেতা, কোন উপায়ে তাদের ক্রয়-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে পারিলে দ্রব্যাদি লাভজনক দরে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইতে পারে। এই ক্রয়-শক্তি বাড়াইবার উপায়ই সমিতি অন্বেষণ করিয়াছেন।

স্বর্ণপ্রমাণকে কার্য্যকরভাবে প্রয়োগ করা।—সোনাকে যদি আন্তর্জ্জাতিক সিক্কা রূপে রাখিতে হয়, তবে উহার ক্রিয়া আরো সন্তোষজনক হওয়া দরকার। সমিতি স্বর্ণ প্রমাণ রাখিবার পক্ষপাতী, কারণ বিদেশী বিনিময়ে গুরুতর উঠানামার প্রতিষেধক হইল স্বর্ণপ্রমাণ। মুদ্রা-সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে আয়ত্ত করিবার পথও এইখানে।

এ বিষয়ে দুইটি জিনিষ বিবেচ্য। প্রথমতঃ, দুনিয়াতে

স্বর্ণপ্রমাণকে স্থায়ী করিতে হইলে, উত্তমর্ণ দেশসমূহকে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন দুনিয়ার সমুদয় সোনা আসিয়া তাদের সিন্দুকে না জমা হয়। আধুনিক কালে সোনার গতি লক্ষ্য করিলে এই কথার সমীচীনতা বুঝা যাইবে। ১৯২৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে উত্তমর্ণ দেশসমূহ (গ্রেট বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, সুইডেন) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ও কোষাগারে দুনিয়ার সোনার ৬০% নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী এই পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৪·৫%। এই গতি থামিয়া যায় নাই।

এই স্বর্ণ-প্রবাহ বন্ধ করিবার ও ইহার গতি উল্টাইবার একটা উপায় হইতেছে, কল সোণ যাবৎ উত্তমর্ণ দেশগুলি ঋণ লইবে অথবা এখনকার চেয়ে বেশী বেশী টাকা খাটিবে যায় দিবে। সমিতির মতে এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রথমতঃ তিন প্রধান উত্তমর্ণ দেশের গ্রেট বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স—নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। কারণ একযোগে কাজ না করিলে যে দেশ স্বর্ণ প্রমাণ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবে তারই সোনা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

বিদেশে টাকা খাটাইবার পরিমাণ ঢের বাড়ানো দরকার। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য হইতেছে আভ্যন্তরিক মুদ্রার বাজারে সস্তা সাউকারি প্রচুর পরিমাণে রাখিয়া দেশে ও বিদেশে প্রচুর ধার লওয়ার পক্ষে সাহায্য করা। সমিতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নীত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক আলোচনায় ও দেনদরকারী আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন, (বিদেশে ধার দিবার জন্য, প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ দিয়াছেন।

মৌজুদ্ স্বর্ণ-হ্রাস

আজকাল সোনা আর কিছু হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় না। সুতরাং ব্যাঙ্কে সোনা মৌজুদ্ রাখার প্রথার এখন আর সার্থকতা নাই। পূর্ব্বে বিস্তর সোনা মৌজুদ রাখা প্রয়োজন হইত দুই কারণে: (১) অবিশ্বাস জন্মিলে অথবা অন্য কোন কারণে কোন দেশের অধিবাসিগণ অসম্ভব পরিমাণে নগদ টাকা (সোনা) চাহিয়া বসিলে—সেই আভ্যন্তরিক টান মিটাইবার জন্য ; (২) আন্তর্জাতিক লেনদেনে কাটাকাটির পর কোন দেশের কিছু প্রাপ্য থাকিলে সেই দেশের দেনা মিটাইবার জন্য সোনায় দেশত্যাগ ঘটিত। হাতে হাতে প্রচলন বর্ত্তমানে না থাকায় এক্ষণে বিশেষভাবে বাহ্য টান মিটাইবার জন্যই ব্যাঙ্কে সোনা রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে এখনও আভ্যন্তরিক ও বাহ্য, উভয় প্রকার টানের কথা ভাবিয়াই বেশী বেশী সোনা মৌজুদ্ রাখা হইয়া থাকে। সমিতি মনে করেন, ব্যাঙ্কে যদি শুধু বাহ্য টান মিটাইবার জন্যই সোনা রাখা হয়, তবে দুনিয়ার সোনা উৎপাদন কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও এখনো বহুদিন পর্য্যন্ত স্বর্ণ প্রমাণকে অব্যাহত রাখা চলিবে।

দুনিয়ার পণ্যাদির দর নিয়ন্ত্রণ।—স্বর্ণ প্রমাণকে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার পর প্রশ্ন হইবে, আর্থিক সাম্য পুনরুজ্জীবিত ও রক্ষা করিবার জন্য মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির লক্ষ্য কি হইবে? সমিতির প্রস্তাব এই : প্রথমতঃ, এক্ষণে দরের যে অবস্থা তার চেয়ে বহু উর্দ্ধে বিভিন্ন জিনিষপত্রের দরকে তুলিতে হইবে ও তারপর দরের এই উর্দ্ধ সীমা যতদূর সম্ভব স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। অথবা দর স্থিরীকরণের পরিবর্ত্তে আর্থিক নীতি এই হইতে পারে যে, উৎপাদনের কুশলতা বৃদ্ধি যেহু যতদূর দর নামিতে পারে তার চেয়ে যাতে বেশী দূর না নামে তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া।

এই দুইটি প্রস্তাবই বিবরণীর মূল বিষয়। প্রথম দৃষ্টিতে এই দুইটি প্রস্তাব পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। উভয় ক্ষেত্রেই আসল উদ্দেশ্য হইতেছে, ক্রয়ের পরিমাণ এমনভাবে অব্যাহত রাখা যে, দর যেন কখনও এত নীচে নামিয়া না যায় যে, তাতে উৎপাদন খরচা পর্য্যন্ত উঠিবে না। দরকে স্থিরভাবে বাঁধিয়া দিবার প্রাণপণ চেষ্টার উপরই সমিতি জোর দিয়াছে। কিন্তু আসলে বাজারের ক্রয়ের দিকে—ক্রয় করিবার শক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করাই —হইল সমস্যা।

সুতরাং ম্যাকমিলান সমিতির মতে আর্থিক নীতির উপায়

এইগুলি: (১) স্বর্ণ-প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে কাজে খাটানো,—বর্তমানে কতকগুলি উত্তমর্ণ দেশ বহুল পরিমাণে সোনা গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকায় ইহা অসম্ভব হইয়াছে; (২) স্বর্ণ-মৌজুদ হ্রাস করা,—আসল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া সোনা মৌজুদ রাখিলে অনেক সোনা কাজের জন্য ছাড় পাওয়া যাইবে; (৩) দুনিয়ার দর-নিয়ন্ত্রণ। ইহার মধ্যে তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুতর।

মুদ্রা সামঞ্জস্যের (মণিটারি অ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট) কারিগরি (টেক্‌নিক)

সমিতি মনে করেন, দুনিয়ার দর-নিয়ন্ত্রণের কারিগরি বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির আয়ত্ত হইবার মত বিষয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুই বিশেষ উপায়ে মুদ্রা সম্পর্কিত অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা করিতে পারে: (১) ব্যাঙ্কের হারে পরিবর্তন করিয়া; ব্যাঙ্কের হার বলিতে ব্যাঙ্ক যে হারে টাকা ধার দেয় তাহা বুঝিতে হইবে; কোন্ দেশে টাকা সাধারণতঃ কি হারে ধার দেওয়া হইবে তা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করিয়া দেয়; (২) খোলা বাজারের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা; খোলা বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জামিন পত্রমূহের (সিকিউরিটি) বেচাকেনা করিতে পারে; ইহা (জামিন কিনিয়া) অধিকতর সাউকারি জোর করিয়া আনিতে পারে অথবা (জামিন বেচিয়া) সাউকারি বাজার হইতে দূর করিতে পারে। উভয়েরই ফল গুরুতর।

ব্যাঙ্কের হার সম্বন্ধীয় নীতি।—ব্যাঙ্কের হারের ফলাফল দুই দিকে দেখা যেয়: (১) সোনার অবস্থার উপর; (২) শিল্প-ব্যবসার (বিজ্‌নেস্) উপর। ব্যাঙ্কের হার বাড়িলে দুই-বিরোধী এবং কতক পরিমাণে দীর্ঘ-মিয়াদী টাকার হারের উপর প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্বল্পমেয়াদের আকর্ষণ করে। এইরূপে যে টাকা এরূপ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, তা দেশে থাকিতে উৎসাহ পায়। পরন্তু উঁচু হার বলিয়া বিদেশ হইতেও টাকা দেশে খাটানো হইয়া থাকে। ফলতঃ, যখনি কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেখে যে, ইহার সোনা বড় তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তখনি ইহার স্বাভাবিক হারের উপর ব্যাঙ্কের হার বাড়ানো ও ঐরূপে টাকা ফিরাইয়া আনা।

অভ্যন্তরিক শিল্প-ব্যবসার উপর ব্যাঙ্কের হার-বৃদ্ধির ফলাফল কম প্রত্যক্ষ হইলেও, কখনো কখনো বেশী গুরুতর হয়। যে দরে টাকা ধার পাওয়া যায়, তা বাড়াইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ধার করিতে ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে নিরুৎসাহ করে। অধিকন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি মানে আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে অভ্যস্ত, তখনি তারা তাদের লেন-দেন গুটাইয়া আনিতে ব্যস্ত হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের হার বাড়ার অর্থ প্রচলিত উৎপাদনের বহর কমাইবার পরোক্ষ উপায়, তার অর্থ পারিশ্রমিকের পরিমাণ কমে, তার অর্থ ক্রয়ের পরিমাণ কমে।

ব্যাঙ্কের হার-হ্রাসের ফলাফল তত প্রবল নয়। ব্যাঙ্কের হার নীচু হইলে দীর্ঘ ও হ্রস্ব মিয়াদে ধার বেশী বেশী লওয়া হয় ও তাতে ব্যবসা বাড়ে, ক্রয়ের পরিমাণও বাড়ে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এইরূপ হইবেই এমন কোন কথা নাই। ব্যাঙ্কের হার হ্রাস হইলে বর্দ্ধিত কাজকর্ম চলিতে পারে। উহা বর্দ্ধিত কাজকর্মের কারণ নহে। অন্য দিকে, ব্যাঙ্কের হার হ্রাসে সোনা অন্যান্য দেশে লাভজনকভাবে নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইয়া দেশ ছাড়িয়া যায়। আর তাহা অবস্থানুসারে বাঞ্ছনীয় হইতেও পারে, নাও পারে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, ব্যাঙ্কের হার নীতি দ্বারা ব্যবসার কাজকর্মের অতি দ্রুত বৃদ্ধি বন্ধ করা যাইতে পারে। ঐ উপায়েই আবার মৌজুদ স্বর্ণের পরিমাণ বজায় রাখা সম্ভব হয় ও অন্য দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের পুনঃ প্রবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে। ঐ উপায়েই আবার সোনা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। এটা মূল্যবান্ উপায়স্বরূপ হইলেও, ইহার ফলাফল নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা শক্ত।

খোলা বাজারের কাজকর্ম।—বিশুদ্ধভাবে খোলা বাজারের কাজকর্ম যুদ্ধের পরে দেখা দিয়াছে। প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেম এই পথের পথিক হইলেও, ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড এই কাজ কিছু কিছু করিয়া থাকে। খোলা বাজারে জামিনপত্রাদি কিনিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক সাউকারি প্রচলিত করিতে

সমর্থ হয়। এই সাটকারি প্রধানতঃ জামিনের বাজারে রাখা যাইতে পারে ও কর্জগ্রহীতাদের যখেই টাকা হাতে আসিলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ঋণ শোধ করিয়া দিতে পারে; কিন্তু উহার কতকাংশ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয়ে নিয়োজিত হইবে (তাহাতে ব্যবসার কাজ বৃদ্ধি পাইবে), আর জামিনপত্রের বাজার সাধারণ পাওনার ব্যবসায় ভবিষ্যৎ উন্নতি লাভ করিতে পারে ও বিশেষভাবে নতুন বিনিয়োগের ধারের খরচা কমাইতে ও তদ্দ্বারা পুঁজিপাটার উন্নতি ঘটাইতে পারে।

সুতরাং খোলা বাজারে কেনার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জামিনপত্র বেচিতে থাকিলে উল্টা ফল দেখা দিবে। সাটকারি বাড়িয়া চলিয়া যায়, জামিনের বাজারের উপর ধর নামিবার সম্ভাবনা ঘটে, বিশ্বাস কমে ও উৎপাদন ও ক্রয় হ্রাস পাইতে থাকে।

মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতির উদ্দেশ্য।—ম্যাকমিলান সমিতির বিশ্বাস এই যে, ব্যাঙ্কের হার সম্বন্ধীয় নীতি ও খোলা বাজারের কাজকর্মরূপ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাঙ্কের সাটকারির পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যে, তাহে মোটামুটিভাবে দরের স্থিরতা রক্ষিত হইবে। এই যুক্তির ভিত্তি এ বিষয়ে ভাঁটা ও আনুষঙ্গিক দর-হ্রাসের হেতু টাকা খাটাইবার হার সকলের ধারের সহিত সমান তালে চলিতে পারে না। এই যুক্তি অনুযায়ী ব্যাঙ্কের হার ও খোলা বাজারের কাজকর্ম দ্বারা টাকা খাটানো বাড়াইতে পারিলে ঠিক কাজ করা হইবে। বিবরণী বিশেষ কোন মতবাদের দিকে ঝোঁক দেয় নাই, অর্থের সুব্যবস্থার উপরই ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, কি প্রণালীতে সেই সুব্যবস্থা হইবে তা লইয়া মাথা ঘামান হয় নাই।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।—১৯২৮ সনে দুনিয়ার জিনিষপত্রের দর যত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল এক্ষণে তত উর্দ্ধে উঠাইতে হইলে ও সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। কোন একটি মাত্র দেশের চেষ্টা দ্বারা কিছুই হইবে না। কোন দেশ ঐরূপ করিতে গেলে তার সাটকারির সহজ ব্যবস্থা ও অন্যান্য দেশের তুলনায় চড়া সুদ তাহার সর্বনাশ করিবে। অন্যান্য জায়গায় সস্তায় জিনিষ পাওয়া যাইবে এই হেতুতে রপ্তানি হ্রাস পাইবে ও আমদানি বাড়িবে, তাহাতে উহাকে স্বর্ণ প্রমাণ হইতে বিচ্যুত হইতে ও উদ্বানপতনশীল বিদেশী বিনিময়ের আবর্ত হইতে বাধ্য করিবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বারে বারে জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বলে মুদ্রা-নীতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর খাড়া করান সম্ভব হইতে পারে, ক্রয় উৎপাদনের সহিত সমান তালে চলিতে সমর্থ হইবে এবং ধীরে ধীরে হইলে মূল্য-সামঞ্জস্য সম্ভব হইবে। আর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা না থাকিলে মুদ্রা-ঘটিত উপায়ে কিছুই করা যাইবে না; তখন বর্তমান অবস্থার প্রতীকারের উপায় হইবে, মজুরি-হ্রাস, রক্ষিত কর-ভার, শুল্ক ও বাজার দখল করিবার জন্য জাতিতে জাতিতে ভীষণ প্রতিযোগিতা।

বিবরণীর সার্থকতা

ম্যাকমিলান বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-ব্যবসার সহিত টাকাকড়ির যথোচিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্তব্য। দর ও উৎপাদন যাতে ঠিক স্থানে থাকে সেজন্য দরকার ব্যাঙ্কের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয়-শক্তি দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে বিবরণীর ব্যবস্থা: (১) বড় বড় উত্তমর্ণ দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাই, নতেৎ স্বর্ণপ্রমাণকে দুনিয়ার ব্যবস্থারূপে পরিণত করা যাইবে না; (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মৌজুদ্ সোনার পরিমাণ বর্তমান অবস্থার অনুযায়ী করা কর্তব্য, তাহা হইলে কাজের জন্য অনেক সোনা ছাড় পাওয়া যাইবে,—ইহাতেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার; (৩) আন্তর্জাতিকভাবে এমন মুদ্রা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যে, ক্রয়ের পরিমাণ যেন উৎপাদনের পরিমাণের সহিত তাল রাখিতে পারে ও তার ফলে পণ্যাদি লাভজনক দরে বাজারে বিকাইতে পারে। প্রথম ও তৃতীয় দফা আরো একটু বিবেচনা করা যাক্।

স্বর্ণ সমস্যা।—দুনিয়ার স্বর্ণ এক্ষণে যথাযথভাবে বণ্টিত নাই। ২।১ বৎসরের মধ্যেই সোনার উৎপাদন কমিয়া যাইবে। সুতরাং উত্তমর্ণ দেশগুলি যদি শুধু নিজেদের

সোনার পরিমাণ বাড়াইতেই ব্যস্ত থাকে, তবে মিত্র হোক্ বা বিপক্ষে হোক্, বাধ্য হইয়া অন্যান্য দেশকে স্বর্ণপ্রমাণ ত্যাগ করিতে হয়। তাহাতেও দুনিয়ার ভাঁটা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া দাঁড়াইবে, এবং অধমর্ণ দেশসমূহে ও যে সব উত্তমর্ণ দেশ এই নীতি অবলম্বন করিবে না, সেগুলিতে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা, মূল্য-হ্রাস ও আর্থিক অসামঞ্জস্য দেখা দিবে। শেষে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের উপায়রূপে সোনার দান কমিতে কমিতে বর্ত্তমানে রূপার মত ইহা অবনতভাবে পড়িয়া যাইবে। সেইজন্য স্বর্ণপ্রমাণ সমস্যার মত গুরুতর সমস্যা দুনিয়ায় আর কিছুই নাই। এ সমস্যার আশু সমাধান হওয়া দরকার।

মজুরি হ্রাস ও শিল্পগত ভাঁটা।—বিশ্বরথীর সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, শিল্পগত ভাঁটা রোধ করিবার উপায় সকল ক্ষেত্রে মজুরি-হ্রাস নহে। সমিতির মন্তব্য "তার জীবন যাপনের ধারার উপর কলাকল যাই হোক্ না, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বেতন বা মজুরি আর্থিক চাপের ফলে হ্রাস পাইলে অসন্তুষ্ট না হইয়া পারে না এবং কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিবে না যে, যখন উৎপাদনের কারিগরিতে এরূপ ভীষণ উন্নতি হইতেছে তখন তার মজুরি হ্রাস করিবার প্রয়োজন আছে।" নিজের দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মজুরেরা 'অতি-উৎপাদনের দায়েই মজুরি-হ্রাস' বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি করিয়াছে। ম্যাকমিলান সমিতিই এরূপ ক্ষেত্রে মজুরির উপর হাত না দিয়াও প্রতীকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

'মজুরি-হ্রাস দ্বারা আর্থিক সমীকরণ সংসাধিত হয় না'—একথার তাৎপর্য্য এনয় যে, এক ব্যবসার সহিত অন্য ব্যবসার মজুরির সামঞ্জস্য করা হইবে না, অথবা আপাত মজুরির (অর্থাৎ মুদ্রায় অবধারিত মজুরি) অদল-বদল ঘটিবে না, যদিও প্রকৃত মজুরি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলা হইয়াছে যে, শিল্পগত ভাঁটার প্রতিরোধের জন্য প্রকৃত মজুরি হ্রাস করা চলিবে না।

ম্যাকমিলান সমিতির প্রস্তাবগুলির নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ মূল্য আছে: সমিতিতে চৌদ্দজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১০ জন একমত হইয়া বিশ্বরথীতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন: যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল সেগুলি বিশেষ তর্কমূলক ও ছিলই, অধিকন্তু সমিতির সভ্যদের প্রত্যেকের স্বার্থ, অভিজ্ঞতা, মনোভাব, মানসিক শক্তি, রাজনৈতিক প্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ছিল; সভাপতি ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও শিল্প-বন্ধের সালিশীকারক; সভ্যদের মধ্যে ছিলেন দুইজন অর্থশাস্ত্রী, উভয়ের মত পরস্পর বিরোধী, তিনজন ব্যাঙ্কার, কাহারো সঙ্গে কাহারো মিল নাই, তিনজন শিল্প-ব্যবসার প্রতিনিধি এবং চারিজনের একজন কোম্পানেরের, একজন ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের, একজন মজুর-সঙ্ঘের ও একজন সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধি এবং অন্য একজন ভূতপূর্ব্ব সমুদ্রতরণী। বেছে বেছে ধরিয়া অনুসন্ধানের পর এই বিভিন্নমতবিশিষ্ট লোকের সমষ্টি যে এরূপ গুরুতর বিষয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন তাহাতে মনে করা যাইতে পারে তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ বাজে নয়।

আর্থিক মতবাদের নূতন ধারা।—ম্যাকমিলান সমিতি আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এক বিপ্লব, এক বিশেষ দান, আনয়ন করিয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮৬ সনে বিলাতে এক রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল আমদানীকৃত শিল্প-ব্যবসায়ে ভাঁটার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য,—ঐ ভাঁটাও তার আগের দশ বৎসর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল। সে সময়ে ঐ রাজকীয় কমিশনের এক স্থানে বলা হইয়াছিল যে, ভাঁটা বা মুনাফার অভাবের হেতু অতি-উৎপাদন। অতি-উৎপাদন বলিতে এমন সময়ে পণ্যাদির উৎপাদন অথবা উৎপাদন করিবার ক্ষমতা বুঝায় যখন টান উৎপাদকের পক্ষে লাভজনক দর যথেষ্টভাবে বজায় রাখিতে অসমর্থ। "অবশ্য সাধারণভাবে অতি-উৎপাদন অসম্ভব কথা।" যে যি সে হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীনপন্থী অর্থশাস্ত্রীদের এই মত আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে, যেহেতু ক্রয়শক্তি আপনা আপনি নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তার সামঞ্জস্য-বিধানের কথা অর্থ হীন হইয়া যায়। ম্যাকমিলান সমিতি ঠিক তার উল্টা কথাটা শুনাইয়া দিতেছেন যে, "সকল ব্যবসায়ী উৎপাদনের জন্য যা খরচ করিয়াছে, বিনিময় দ্বারা তা ফিরাইয়া পাইতেছে না"

বলিয়া যত গণ্ডগোল। বাজারের ক্রয়ের দিকে যথেষ্ট ক্রয়শক্তি না আসিলে এ গণ্ডগোল মিটিবে না। সুতরাং সাধারণভাবে অতি-উৎপাদনও অসম্ভব কথা নয়। ১৮৮৬ সনে রাজকীয় কমিশন যা অসম্ভব বলিয়াছিলেন ১৯০১ সনে সমিতি তাই ঘটিতেছে বলিতেছেন।

শেষ কথা

এইখানে প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞদের পরামর্শ একরূপ বাদ দিয়াছে। বর্ত্তমানে যে ভীষণ তাঁটা দেখা দিয়াছে তা হইতে উদ্ধার পাইবার একটা উপায় হইতেছে প্রকৃত টানের যথার্থ বুদ্ধি। আর তার উপায় হইতেছে ভাবী ক্রেতাদের হাতে যথেষ্ট ক্রয়ক্ষমতা আনিয়া দেওয়া। কিন্তু এই ক্রয়ক্ষমতাও আবার এত বেশী পরিমাণে আনিয়া দেওয়া উচিত নহে যে মুদ্রা-ঘটিত ব্যবস্থাই বিপন্ন হইয়া পড়ে। এক কথায়, ক্রয়ের পরিমাণ এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাওয়া দরকার যে জিনিষপত্রের দর তত উর্দ্ধে উঠিবে যত উর্দ্ধে উহা লাভজনক হয়। কিন্তু তারপর আর উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না।

এই উদ্দেশ্যে টাকাকড়ি ও শিল্প ব্যবসার সংযোগ সাধন করিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ফলে একবার দেখা দিয়াছে অস্বাস্থ্যকর জোয়ার, তখন ক্রয়ের পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; অন্যবার দেখা দিয়াছে অতোধিক অস্বাস্থ্যকর তাঁটা, তখন ক্রয়ের পরিমাণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে ও বেকার, ব্যবসায়ে ক্ষতি ও কারবারের হ্রাস দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার প্রতীকার করিবার পক্ষে এ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক সংযোগিতা ছাড়া বড় বাধা ছিল এই বিশ্বাস যে, আর্থিক সামঞ্জস্য আপনা আপনি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতই তা ঘটে না। ম্যাকমিলান সমিতি এই সামঞ্জস্যের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তা বাৎলাইয়া দিয়া জগতের উপকার করিয়াছেন।

"দি কোয়ার্", জুলাই, ১৯৩১

বিলাতের ভবিষ্যৎ

কোয়ার্ একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই বছরের জুলাই সংখ্যায় "বিলাতের ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ এই পত্রিকাতে স্থান পেয়েছে। "লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্"এর রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক লাস্কি এই প্রবন্ধের লেখক। লাস্কি বলেন যে, বিলাত এ পর্য্যন্ত যতটা উঁচু জীবন-যাত্রার প্রণালী বজায় রেখে এসেছে, ভবিষ্যতে তা আর পারবে না। বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্য সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছে, কাজেই বিলাতের অর্থাভাব ঘটতে বাধ্য। এর প্রতীকারের দুটা উপায় আছে:—(১) বিলাত এ পর্য্যন্ত যে সব জিনিষ রপ্তানির জন্য তৈরী ক'রে এসেছে, সেগুলা আজকাল অন্য দেশও তৈরী ক'রতে আরম্ভ করেছে। কাজেই বিলাত যদি এমন সব জিনিষ তৈরী ক'রতে আরম্ভ করে যেগুলা নবীন দেশগুলা তৈরী ক'রতে পারে না, তা হ'লে বিলাতের একটা ভরসা আছে। কিন্তু বিলাত তা চট্ ক'রে ক'রতে পারবে ব'লে লাস্কি আশা করেন না। কারণ, শিল্প-জগতে জার্ম্মানি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু বিলাত এখনও সেকেলে ছোট ছোট ফ্যাক্টরী, সেকেলে প্রণালীতে ফ্যাক্টরী পরিচালনা এবং সেকেলে ধরণের শিক্ষা-প্রণালী নিয়েই প'ড়ে আছে। এখনও বিলাতের ধারণা—"বিলাতী জিনিষ অন্য দেশ কিন্‌লে সে দেশ ব'র্ত্তে যাবে। বিলাতী জিনিষ আবার খোসামুদি ক'রে বেচ্‌তে হবে না কি?" বিলাতের বর্ত্তমান ধরণ-ধারণ এই রকম ব'লেই লাস্কির ভয় এই যে, বিলাত আধুনিক জগতের আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজকে চট্ ক'রে খাপ খাওয়াতে পারবে না। (২) বিলাতের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে আমদানির উপর উঁচু হারে শুল্ক চাপিয়ে দেশের বাজারটা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের দখলে আনা। এতে বড় বড় কোম্পানীগুলা হয়তো বাঁচতে পারে এবং তারা উন্নতিও ক'রতে পারে। কিন্তু দেশের সমৃদ্ধি আগেকার তুলনায় নিশ্চয়ই ক'মে যাবে। প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টাই বেশী অবলম্বিত হবার সম্ভাবনা। কাজেই বিলাত এ পর্য্যন্ত যতগুলা লোককে যতটা আরামে ও সুখে রেখেছে তা আর পারবে না। ইংরেজ যদি আগেকার মতই আরাম পেতে চায় তা হ'লে হয় তার জন্ম-শাসন বেশী ক'রে আরম্ভ করা দরকার, না হয় বাড়্‌তি লোকের রপ্তানি করা দরকার।

"দি ষ্টেটস্‌ম্যান", নবেম্বর ১৯৩১

১। কলকব্জার উদ্ভাবন বনাম বেকার সমস্যা

যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের ফলে কাজ শীঘ্র ও সুচারুরূপে করা যায়। এইজন্য কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন মানুষের স্বার্থের সহায়ক। কিন্তু কলকব্জার উদ্ভাবন মানেই কাজ ক'মে যাওয়া। তার ফলে মজুরেরা কাজ হারায় ও বেকারের সৃষ্টি হয়। এদিক থেকে দেখ্‌লে কলকব্জার উদ্ভাবন মানুষের স্বার্থের বিপক্ষে। কাজেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়বে, তত্ই বেকারের সংখ্যা বাড়বে, মানুষের দুর্দ্দশাও বাড়বে। যুদ্ধের আগে সারা দুনিয়ার উৎপাদনের উচ্চতম হারের চেয়ে ১৯৩০ সনের উৎপাদন শতকরা ২৪ ভাগ বেশী। কিন্তু দুনিয়ার লোকসংখ্যা শতকরা ২ ভাগ মাত্র বেড়েছে, অথচ চারিদিকেই বেকারের বৃদ্ধি। ১৯২৪ সনের তুলনায় ব্রিটেনের উৎপাদন শতকরা ১১ ভাগ বেড়েছে, কিন্তু কাজ-ওয়ালা লোকের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ কমেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ব্রিটেনেরই অনুরূপ; বরং সেখানে কড়াকড়ি আরও বেশী। চীন বা ভারত কারখানা-শিল্পে বেশী অগ্রসর নয়। অথচ এখানেও উৎপাদন-বৃদ্ধি ও বেকার-বৃদ্ধি পাশাপাশি চলেছে। এর কারণ কি এবং প্রতীকারের উপায়ই বা কি? সোস্যালিষ্টদের মামুলি বুলি হচ্ছে—গরীবদের রোজগার বাড়াও, অর্থাৎ ধনীদের রোজগার কমিয়ে গরীবদের রোজগার বাড়াও, তা হলেই তাদের ভোগ করবার ক্ষমতা বাড়বে এবং তাদের ভোগের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য আরও বেশী উৎপাদন দরকার হবে, এর ফলে নতুন নতুন কারিগরী খোলা হবে এবং বেকারেরা কাজ পাবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ঠিক ঐ কথা ব'লছেন না। কিন্তু ওর কাছাকাছি কথাই বলছেন। উনি বলেন, কলকব্জার উদ্ভাবনের ফলে যখন কাজের পরিমাণ কমে গেছে, তখন যতটুকু কাজ পাওয়া যাচ্ছে তা দেশের অধেকার সবাইয়ের মধ্যে ভাগ ক'রে দাও। অর্থাৎ যারা কাজ পাচ্ছে তাদের প্রতিদিন কম খাটাও, তাদের ছুটীও বাড়িয়ে দাও। তার ফলে বেশী লোকের দরকার হবে, সুতরাং বেকারেরা কাজ পাবে। তা ছাড়া, যারা কাজে রত তাদের অবসর বাড়বে, সুতরাং আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার কাটাবার সময় বেশী হবে; তার ফলে আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার জিনিষের চাহিদা বাড়তে পারে। এতেও নতুন কাজের সৃষ্টি হবে।

২। ঋণভারগ্রস্ত চাষী সাঁওতাল পরগণার দৃষ্টান্ত

সুদে টাকা খাটানো গ্রামের মহাজনদের অর্থাগমের একটা বড় পন্থা ছিল। এই তেজারতি ব্যবসা সম্বন্ধে এদেশে এত নিন্দাবাদ হইয়াছে এমন খুব কম প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই হইয়াছে। শিক্ষা, সমবায় প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে এই কারবারকে দেশ হইতে দূর করিবার কথা পুনঃপুনঃ উঠিয়াছে।

(ক) সাঁওতাল পরগণার (লোক-সংখ্যা ২০ লাখ; কৃষক ৯০%) এই সুদের অত্যাচার সইয়া এককালে বিদ্রোহ হয়; গবর্ণমেণ্টে ১৮৭২ সনে আইন দ্বারা স্থির করিয়া দেন যে, মহাজন দেনদারের নিকট হইতে শতকরা ৫৪ টাকার বেশী (চক্রবৃদ্ধি হইবে না) সুদ পাইবে না এবং সুদ কখনো আসল হইতে বেশী হইবে না।

(খ) ইহার কতকগুলি সুফল ফলিয়াছে। প্রথমতঃ মহাজন কখনই দেনদারকে সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করে না, যতদিন যায় ততই দেনদার ধীরে চোরাবালির মধ্যে ডুবিতে থাকে; শেষকালে ঘটীবাটি জমিজমা বিক্রয় করিয়া নিম্ন মজুর শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে; মহাজনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ বন্ধকী জমিজমা তাঁহার হস্তগত হয়। একথা পুরাণো কথা। কিন্তু সাঁওতাল গ্রামের আইনের ফলে মহাজনের টাকা ফেলিয়া রাখিয়া সুদ বাড়ানোতে স্বার্থ নাই; কারণ তাহার "নয় গা মাপিলেও এক সের, এক গা মাপিলেও একসের চাল। সুদ ২৫% হারের বেশী পাইবে না এবং সুদ আসল হইতে অধিক হইবে না।

ধরা যাক্ ক, খ ও গ নামে তিন ব্যক্তি প্রত্যেকে ৪০৲ টাকা করিয়া ধার লইতেছে। ক সাঁওতাল পরগণার এক চাষী, ৪০৲ টাকার সহি দিয়া টাকা ধার লয়; খ-ও

৪০৲ টাকা ধার পায় বটে, কিন্তু লিখিয়া দেয় ৬০৲ টাকা ; গ রেগুলেশন মিলার চাষী ও চক্রবৃদ্ধি হারে ৫০% সুদ ধরিয়া বলিয়া ৪০৲ টাকা ধার দয়।

উপরিউক্ত এই তিন অবস্থায় দেনদারের ৬ বৎসরে কিরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় হয় তা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

বৎসরের শেষে প্রাপ্য	ক	খ	গ
প্রথম	৫০৲	৭৫৲	৬০৲
দ্বিতীয়	৬০৲	৯০৲	৯০৲
তৃতীয়	৭০৲	১০৫৲	১৩৫৲
চতুর্থ	৮০৲	১২০৲	২০২৷০
পঞ্চম	৮০৲	১২০৲	৩০৩৷০
ষষ্ঠ	৮০৲	১২০৲	৪৫৪৷৵০

যে লোকের ৪০৲ টাকা ধার না লইয়া উপায় নাই, তার পক্ষে পর বৎসর ৬০৲ টাকা শোধ করা কঠিন। খুব ভাল ফসল হইলে পর বৎসর যদি ৯০৲ টাকা শোধ করা তার পক্ষে সম্ভবও হয় তবু মহাজন চাহিবে না যে শোধ করিয়া দিউক। সাঁওতাল পরগণায় যে নিয়ম আজ ষাট বৎসর যাবৎ চলিতেছে তাহা বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত করা যায় কি না তাহা ভাবিবার বিষয়।

এই আইনের প্রথম সুবিধা এই যে, বাৎসরিক সুদের হার ২৪% মাত্র। দ্বিতীয় সুবিধা এই সুদ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণকে অতিক্রম করে না। তৃতীয় সুবিধা সুদের হার চক্রবৃদ্ধি হইবে না। লোকে সাধারণতঃ ধারণা করিতে পারে না চক্রবৃদ্ধি সুদ চাষীদিগকে কিরূপে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু ১০৲ টাকা যে ধার লইয়াছে তাকে ২০৲ টাকা বা ৩০৲ টাকার বেশীর জন্য দায়ী করা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

সাঁওতাল পরগণায় সুদ ২৪% ও আসলের দ্বিগুণের বেশী উত্তমর্ণ কেহই পায় না। ধরা যাক্ সুদ ৫০%, আর আসলের চারিগুণ পর্য্যন্ত দাবী করা যায়। এখন দেখা যাক্ ৫০% চক্রবৃদ্ধি সুদে কোন সীমা নির্দিষ্ট না থাকিলে ৪০৲ টাকার জন্য কত পাওয়া যায় (গ), আর ৫০% সুদেও সীমা নির্দিষ্ট থাকিলে কত পাওয়া যায় (ঘ)।

বৎসরের শেষে প্রাপ্য	গ	ঘ
প্রথম	৬০৲	৬০৲
দ্বিতীয়	৯০৲	৮০৲
তৃতীয়	১৩৫৲	১০০৲
চতুর্থ	২০২৷০	১২০৲
পঞ্চম	৩০৩৷০	১৪০৲
ষষ্ঠ	৪৫৪৷৵০	১৬০৲ সীমা
সপ্তম	৬৮৩৷৵০	১৮০৲

এমন লোক যদি থাকে যে, তার জমিন এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর যে তার কাছে ৫০% সুদ না লইয়া উপায় নাই, তবে কেন গলায় ফাঁস জড়াইয়া দেওয়া ? তার স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করিবার দায় কি রাষ্ট্রের নাই ? সমবায় বা শিক্ষার প্রভাবে এই প্রকার অত্যধিক সুদ গ্রহণের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইবে এইরূপ চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। এই সমস্যার সমাধানের কথা ভাবিয়া দেখা দরকার।

(৩) পেট্রোলিয়ামের কাহিনী

বর্ত্তমান যুগটাকে লোহার যুগ বলা হয় ; কিন্তু লোহার যুগের তলায় আছে কয়লা ও তৈল। পেট্রোলিয়াম তৈল যে বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান বল সে-কথা দিন দিন স্পষ্ট হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পেট্রোলের ব্যবহার লোকে জানিত না, এবং উহা খনি হইতে বাহির করিয়া পুড়াইয়া ফেলা হইত। কারণ তখন পেট্রোলিয়ামের একমাত্র ব্যবহার ছিল কেরোসিন ; পেট্রোল তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের তৈল-খনির যারে যাল (যাই-প্রোডাক্ট) আজ সকল সভ্যতার, সকল সুখের অন্যতম মূল উপাদান। এই পেট্রোলের সাহায্যে পৃথিবীর মোটর গাড়ী এরোপ্লেন চলিতেছে—লক্ষ লক্ষ এঞ্জিন চলিতেছে। এই তৈল হইতে পারাফিন বাতি, বিজলি বাতির কার্বন, আলকাতরার পথ, ছাপার কালী, সুগন্ধি নির্য্যাস, ভ্যাসেলিন প্রভৃতি প্রায় দুইশত প্রকারের সামগ্রী প্রস্তুত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের যুগে পেট্রোলিয়াম, আবার খেলিবার টেনিস বল হইতে মোটর গাড়ীর টায়ার প্রভৃতি যাবতীয় রবারের সামগ্রী করিবার অন্যতম উপাদান পেট্রোলিয়াম।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এই তৈল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দে মার্কিণ রাজ্যের পেনসিল্‌ভেনিয়া প্রদেশেই উহা প্রথম বড় রকম শিল্পের আকারে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এই বৎসরে ২৮শে আগষ্ট তারিখে কর্ণেল এড্‌উইন ড্রেক্ নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার পেনসিল্‌ভেনিয়ার অন্তর্গত টিতুস্‌ভিলে এই তৈল আবিষ্কার করেন। ড্রেককে এই খনিতে অজস্র টাকা ব্যয় করিতে দেখিয়া লোকে পাগল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। ৬৯ ফুট পর্য্যন্ত খুঁড়িয়াও যখন তৈলের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন ড্রেক প্রায় নিরাশ হইয়াছেন, এমন সময়ে একদিন প্রাতে গিয়া দেখেন গভীর কূপ তৈলে পরিপূর্ণ। সেই দিন পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট দিন। এই সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্র চারিদিকে এই তৈলের অন্বেষণের জন্য চেষ্টা দেখা দিল। নিম্নে ড্রেক এক দিনে লক্ষপতি হইল; যে জমি এক পাউণ্ড একর দরে বিক্রয় হইত সে জমি পরদিন সোনা দিয়া মুড়িয়াও লোকে কিনিতে রাজি হয়।

সে-যুগে তৈল ব্যবসায়ে যে-সব লোক লক্ষপতি হন, তাঁহাদের মধ্যে জেম্‌স্ পেরমন খুবই ভাগ্যবান্। তাঁহার সর্ব্বস্ব বেচিয়া তিনি একশ' পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়া এক টুকরা জমি ইজারা লইয়া কাজ সুরু করেন। যখন তিনি তাঁহার শেষ কপর্দ্দকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন তাঁহার কূপ হইতে তৈল উঠিতে সুরু করে। প্রতিদিন দশ হাজার ব্যারেল করিয়া তৈল উঠিতে লাগিল। দুই বৎসরে সেই কূপ হইতে যে তৈল উঠিল তাহার মুনাফা হইল দশ লক্ষ পাউণ্ড।

বছর দুয়েক পূর্ব্বে কালিফোর্ণিয়ার এক জমিতে তৈলের অনুসন্ধান সুরু হয়; জমিটা ছিল এক ট্যাক্সি চালকের। সে জমি দিবার সময় বলে যে যদি কিছু পাওয়া যায় ত সে শতকরা ২৫% লইবে। মাটি খোঁড়া সুরু হইল; এবং তেলের ফোয়ারা সেখান দিয়া ছুটিল। ট্যাক্সি চালকের কপাল ফিরিল; সে পাইল মাট হাজার পাউণ্ড।

'অদৃষ্টে যদি থাকে' এই কথাটা বছর তিন চার আগে এই তেলের ব্যবসায় বড়ই আশ্চর্য্যজনকভাবে কাজে পরিণত হইয়াছে। যথা আমেরিকার টেক্সাস দেশের সমুদ্রতীরে অসংখ্য কাঁকড়া থাকে। সেই কাঁকড়ার কুটীরবাসীর ঘরের তলায় গর্ত্ত করে; কুটীরবাসী পরদিন পেট্রোলিয়ামের গন্ধ পায়। বহুদিন হইতে সে ইহার সন্ধানে ছিল; আজ দৈব তাহাকে তৈলের সন্ধান দিল।

পেট্রোলিয়ামের গল্প ত্রিশ বৎসরের কাহিনী। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই দশ বোতল পেট্রোল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইত, আজ সেই জায়গায় কোটি কোটি টন্ পৃথিবীময় উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইতেছে।

আজ পেনসিল্‌ভেনিয়াতেই ৩০০ তৈল-কূপ আছে। এবং নিউ-ইয়র্ক হইতে কালিফোর্ণিয়া পর্য্যন্ত প্রদেশে কোটি কোটি টন তৈল উৎপন্ন হইতেছে। এ ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, রুশিয়া, রুমেনিয়া, বার্ম্মা, মেক্সিকো, পারস্য এবং জাপানে তৈল প্রস্তুত হইতেছে। মাত্র ৭২ বৎসর পূর্ব্বে ড্রেকের পাগলামীর ফলে যে তৈল মৃত্তিকা হইতে পাওয়া যায়, তাহার প্রসার এতদূর হইয়াছে এবং তাহা আজ সমগ্র জগতের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্তর্গত হইয়াছে।

বার্ম্মার বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর কাজ পূর্ব্ব জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। তাহাদের তৈল প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র যেনান গিয়াঙ্ বিখ্যাত ছিল; ১৯২৪ সনের পর হইতে ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী চৌক্ নামক ক্ষুদ্র গ্রামও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভারতের শিল্প-বিপ্লব

১। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতের পল্লীগ্রামগুলা আর্থিক হিসাবে অনেকটা স্বাবলম্বী ছিল, সহরগুলা বস্ত্রাদি ও রাজারাজড়ার জন্য বিলাসিতার জিনিষ ছাড়া আর কিছু তৈরী ক'রতো না, যাতায়াতের পথ ও যানবাহনের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল। তারপর ইংরেজের কৃপায় দেশে রেল তৈরী হ'লো, রাস্তাও বাড়লো। এদেশের মালপত্র ইংলোরোপে যেতে আরম্ভ করলো। ইয়োরোপের মালপত্র এদেশের গ্রামে গ্রামে ঢুকতে আরম্ভ ক'রলো। এদেশে পাটের কল, কয়লার খনি, লোহার খনি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগলো। ভারতের ফ্যাক্টরী-জাত মাল ও বিদেশী ফ্যাক্টরী-জাত মালের প্রতিযোগিতার ফলে এদেশের কুটীর শিল্পগুলা একটার পর একটা ধ্বংস হ'তে লাগ্‌লো। কুটীর-শিল্পীদের অনেকেরই আর কোন প্রকার শিক্ষা না থাকায় তারা চাষী মজুরদের দলে যোগ দিলে। এইটাই ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবের একটী ছোটখাট বিবরণ। শ্রীযুক্ত ডি, আর গ্যাড্‌গিল "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এভোলিউশান অব্ ইণ্ডিয়া ইন্ রিসেণ্ট টাইম্‌স্" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৩০২ পৃষ্ঠা, ১৩শি, ৬ পে,) একখানি বই লিখেছেন। এই বইখানিতে ভারতের শিল্প-বিপ্লবের বিবরণটী বেশ পাওয়া যাবে।

কুটীর-শিল্পগুলার ধ্বংস সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন যে, ইংরেজ রাজত্বই কুটীর শিল্পগুলার ধ্বংসের জন্য দায়ী নয়, এদেশের ফ্যাক্টরী-জাত ও বিদেশী ফ্যাক্টরী-জাত মালের প্রতিযোগিতাই তার জন্য দায়ী। তা ছাড়া, তিনি আরও বলেন যে, মানুষ সস্তা জিনিষ চায়। ফলে তৈরী জিনিষ যত সস্তা, কুটীর শিল্পের জিনিষগুলা তত সস্তা হ'তে পারে না। কাজেই, কুটীর শিল্পগুলা এক কালে ধ্বংস হ'তই। সুতরাং তাদের ধ্বংস হওয়ার জন্য শোক করা বৃথা।

কুটীর শিল্পীরা সব জমির দিকে ছোটাতে জমির উপর চাপ বেশী হয়েছে। এর উপায় কি? অনেকে বলেন, কারখানা-শিল্পের বিস্তারই এর ঔষধ এবং তার জন্য চাই সংরক্ষণশুল্ক। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত গ্যাড্‌গিল খুব আশান্বিত নন্। তিনি দেখাচ্ছেন যে, কারখানা-শিল্প বিষয়ে ভারতের নানা বাধা। যেমন কয়লা কারখানা-শিল্পের একটী প্রধান উপাদান। অথচ কয়লা ভারতের কয়েকটী বিশেষ স্থান ব্যতীত অন্যত্র নেই, তার খুব উঁচু শ্রেণীর নয়। জলস্রোত হ'তে বিজ্‌লী তৈরী করা বিষয়ে যতটা আশা পোষণ করা গিয়েছিল, তা যে পূরণ হয় নি, তাও তিনি বলেছেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

জাপানের আর্থিক অবস্থা

২। ১৯৩০ সনে শ্রীযুক্ত জন ই ক্রর্ডের লেখা জাপান সম্বন্ধীয় একখানা বই বেরিয়েছে। বইখানির নাম—"জেপান্‌স্ ইকনমিক পোজিশন্," দাম—২৫ শিলিং, পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৪৮৯, প্রকাশক—ম্যাকগ্রাহিল্। জাপানের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এই বইখানিতে পাওয়া যাবে।

জাপান দুনিয়ার বৃহত্তম "শক্তি"গুলার অন্যতম; আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সঙ্ঘে জাপান, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বিলাত, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলার সমান সমান চলে; সেইজন্য অনেকের ধারণা থাকতে পারে যে, জাপান শিল্পক্ষেত্রে বুঝি একটা সেরা দেশ। উল্লিখিত গ্রন্থকার সেই ভুলটী ভেঙে

দিচ্ছেন। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ ক'রছেন যে, জাপান দুনিয়ার শিল্প-জগতে একটী সেরা দেশ নয়। কুটীর-শিল্পের প্রভাব এখনও জাপানে অত্যন্ত অধিক। মজুরদের শতকরা ৬০ ভাগ যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেগুলিতে ৫ জনেরও কম লোক নিযুক্ত। এতেই বোঝা যাবে জাপানী শিল্পের বহর কতখানি। জাপানী গবর্ণমেণ্ট সংরক্ষণশুল্ক বসিয়ে ও অর্থসাহায্য ক'রে জাপানের শিল্প-জীবনকে উন্নত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করতে কসুর করেন নি। তবুও জাপানের শিল্প বিশেষ উন্নত হয় নি। তার কারণ জাপানে কাঁচামালের অভাব। তা ছাড়া, কারখানা-শিল্পের জন্য যত পুঁজি দরকার তা-ও নেই। এই সঙ্গে গ্রন্থকার আরও একটী কথা বলেছেন। তিনি বলেন কারখানা-শিল্পে জাপানীরা অনুকরণ ক'রতে খুব পটু. কিন্তু উৎপাদনের কোন নতুন পন্থা আবিষ্কার করা তাদের মাথায় খেলে না। একথা সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যাও হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

জাপানের চাষীরা চাষবাস করার পর ঘরে ঘরে অনেক জিনিষ তৈরী করে। তাতে চাষীদের কিছু রোজগার বাড়ে বটে। কিন্তু তারা উপযুক্ত সময়ে কাজ ক'রে উৎপাদন করে ব'লে জিনিষ সস্তায় দিতে পারে। এর ফলে কারখানা-গুলাও জিনিষ সস্তায় দিতে বাধ্য হয় আর খরচা কমাবার জন্য মজুরদের বেশী খাটাতে ও তাদের মাহিনা কমাতে বাধ্য হয়। চাষীদের বেশী খেটে জিনিষপত্র তৈরী করার ফলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এটা ভেবে দেখবার মত।

জাপানের শিল্প-পতিরা এ পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কল-কব্জার ওপর নির্ভর ক'রে এসেছেন, মজুরদের যত পেরেছেন কম মাইনে দিয়েছেন এবং মজুর সঙ্ঘগুলার ওপর যত পেরেছেন অত্যাচার করেছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত অর্চার্ড বলছেন যে, জাপানী কারখানাপতিরা নিজেদের নীতির ভ্রমটা বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা বুঝেছেন দুনিয়ার বাজারে টক্কর দিতে হ'লে ঐ নীতি খাটবে না। মজুরদের ভাল ক'রে মাইনে দিতে হবে, তা ছাড়া উৎকৃষ্ট কলকব্জাও আনাতে হবে।

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থাটা কি রকম? মোটের ওপর বলা যেতে পারে যে, সেটা খুব আশাপ্রদ নয়। রীলে গোটানো রেশম জাপানী রপ্তানির শতকরা ৩৪ ভাগ; এর প্রধান ক্রেতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। রেশমের বাজারে চীন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে; তা ছাড়া কৃত্রিম রেশম যে কোন সময়ে জাপানের রেশমী ব্যবসা ভূমিসাৎ করতে পারে। জাপানের আর একটী প্রধান রপ্তানির মাল হচ্ছে সুতার জিনিষ। এ বিষয়েও জাপানের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী। তা ছাড়া, চীনদেশে কাপড়ের কল উঠছে; তার ফলে জাপানের শ্রেষ্ঠ বাজার চীনদেশ ক্রমে হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

চীনদেশ থেকে জাপান লোহা, কয়লা, তুলা প্রভৃতি কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে পেতে পারতো; তা ছাড়া, চীন একটী বড় বাজারও বটে। কিন্তু, কাঁচামাল ও রাজনৈতিক শক্তির লোভে জাপান চীনের ওপর একটু বেশী চাপ দিয়েছে। তার ফলে চীন চটেছে। কাজেই জাপানের কাঁচামালের প্রধান ক্ষেত্র ও জিনিষ বেচবার প্রধান বাজার আজ টলমল করছে। জাপান চীনে অনেক পুঁজি ঢেলেছে, তার অনেক লোকসানও হয়েছে। জাপানের এমনিই পুঁজির অভাব, তার ওপর পুঁজির লোকসান হওয়া কম কথা নয়।

জাপানের প্রধান সমস্যা হচ্ছে তার লোক নিয়ে। যখন জাপান প্রথম বিদেশীদের সঙ্গে লেন-দেন আরম্ভ করে তখন থেকে জাপানের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে। বছরে ১০ লাখ হিসাবে লোক বাড়ছে। এদের আহার্য্য কি ক'রে সংগ্রহ হচ্ছে? প্রথমতঃ, ধানের ক্ষেত বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, আগেকার ক্ষেতগুলার উৎপাদন-ক্ষমতাও বাড়ানো হয়েছে। ক্ষেতগুলার উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়েছে শতকরা ৫০ ভাগ। এখন আহার্য্য আমদানি হয় লোক-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের জন্য মাত্র। আহার্য্য বিষয়ে জাপান অনেকটা স্বাবলম্বী বটে, কিন্তু ধানের ক্ষেত এত আটগা জুড়ে আছে যে, কারখানা-শিল্পের কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্য জমি জোটে না, কারখানা-শিল্পের জন্যও জমি পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে ওঠে।

যাই হোক্, যে হারে জাপানের লোক বাড়ছে তাতে

সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হবে। জাপান তার জন-শক্তির আহার জোটাবে কি ক'রে? আমেরিকার চেয়ে জাপানীরা মাথাপিছু ঢের বেশী চাল, গম, ময়দা, মাংস ও চিনি খাচ্ছে। জাপানীরা যদি তাদের খাদ্যের মাপকাঠিটা একটু ছোট করে তা হলে একটা উপায় বেরোয়। তা ছাড়া অন্য উপায়ও আছে:—(১) রপ্তানির জন্য বেশী ক'রে কারখানা-জাত মাল তৈরী করা—কিন্তু এ রাস্তায় নানা অসুবিধা: জাপানে কাঁচা মালের অভাব, বাহিরে বাজারের অভাব, আর (প্রবন্ধকার বলেন) জাপানীদের শিল্প বিষয়ে কুশলতারও অভাব; (২) লোক-রপ্তানি—কিন্তু লোক রপ্তানি করবার মত সুবিধাজনক জায়গা অতি অল্প; (৩) জন্ম-শাসন—এ পন্থাটী এ পর্য্যন্ত জাপানে বড় বেশী নিন্দিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে এখনও জাপানীদের বিশেষ উৎসাহ হয় নি।

বইখানি প'ড়ে জাপানের আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বেশী আশান্বিত হওয়া যায় না।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

চাষী মজুরের আইন সম্পর্কে জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারি

"৩। "দি ল অন্ দি কন্ট্রাক্ট অব্ এমপ্লয়মেণ্ট অব্ এগ্রিকালচারাল ল্যাবারার্স ইন্ অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণি এণ্ড হাঙ্গারি" (অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণি ও হাঙ্গারিতে কৃষি-সম্পর্কিত শ্রমিকদের নিয়োগের চুক্তিবিষয়ক আইনকানুন)। আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস, জেনেভা হইতে প্রকাশিত। পঠন পাঠন ও বিবরণীর অন্তর্গত কে সিরিজ (কৃষি) ১০ নং ডেস্ক্রাইব। ১৯৩০। পৃঃ ৮৩। ১ শি ৬ পে।

১৯২৭ সনে আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনের দশম অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:

আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে (গবর্ণিং বডি) বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছেন, অনুবর্ত্তী এক সম্মেলনের সেশনে "নিয়োগ সম্বন্ধে চুক্তির সাধারণ নীতিসমূহ" বিষয়ক সমস্যা এজেণ্ডায় উত্থাপিত করা যায় কি না।

ইতালি সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ডি মিকেলিস এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাঁর মতে সাধারণ নীতির অর্থ চুক্তির আকার, কতদিন তা প্রযোজ্য থাকিবে, বাধ্যতার সমস্যা, মজুরির হার, মজুরিপরিবর্ত্তন ও তার কারণ, কাজ শিখিবার কাল, সাপ্তাহিক বিশ্রাম, ছুটি, বিদায়, বিদায়ের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি। ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৪৮তম বৈঠকে নির্দ্দেশ করা হয় যে, এ প্রশ্ন সম্মেলনের এজেণ্ডায় পাইবার পূর্ব্বে নিয়োগ-সম্পর্কিত চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে প্রাথমিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন; যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রকার অনুসন্ধান করিবার ভার আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস্ লয়। বর্ত্তমান বিবরণীতে তিনটি দেশের কৃষি-শ্রমিকদের লইয়া এই অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এই দেশের মোটামুটি নিম্নলিখিত ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত:

(১) সূচনা।

(২) অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণি ও হাঙ্গারিতে কৃষি-মজুর আইনের প্রয়োগ-সীমা।

(৩) নিয়োগের কৃষি-সম্পর্কিত চুক্তির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ।

(৪) নিয়োগ সম্বন্ধে চুক্তি-পত্রের আকৃতি।

(৫) কৃষি-সম্পর্কিত মনিব ও মজুরের চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা।

(৬) কৃষি-সম্পর্কিত নিয়োক্তা ও মজুরের সাধারণ কর্ত্তব্যসমূহ।

(৭) পারিশ্রমিক—মজুরির হার-যোনাস্—ছুটি দিবার নিয়ম—দ্রব্যাদিতে মজুরি দেওয়া-বাসস্থান—মজুরি দেওয়ার প্রথা-মজুরি কর্ত্তন।

(৮) কাজের ঘণ্টা—কাজের দিন—কাজের ঘণ্টা কি করিয়া হিসাব করা হয়—রবিবারে কাজ—অতিরিক্ত সময়ে কাজ করা।

(৯) বাৎসরিক ছুটি।

(১০) স্ত্রীলোকদের নিয়োগ—স্ত্রীলোকদের কাজ ও কাজের ঘণ্টা—সন্তান জন্মের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিবার বিধি।

(১১) বালকবালিকা ও যুবকযুবতীকে নিয়োগ করিবার রীতি।

(১২) অতিরিক্ত মজুরের জন্য উপ-চুক্তি।

(১৩) পীড়া ও কার্য্যে অসামর্থ্য।

(১৪) কৃষি-মজুরদের নিয়োগ-সম্পর্কিত চুক্তি কত দিন স্থায়ী হয় ও নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা—চুক্তির সর্ত্ত নোটিশের সময়—নোটিশ সম্বন্ধে বাধা।

(১৫) নোটিশ ছাড়া অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে চুক্তি-ভঙ্গ।

(১৬) চুক্তিভঙ্গ হইলে আইনগত ফলাফল—কাজ খুঁজিয়া পাইবার জন্য কত সময় দেওয়া হয়—'ডেজারেন্স'—বাসস্থান ত্যাগ ও ফসলী জমি-চুক্তি।

(১৭) অন্যান্য ব্যবস্থা—'সারবিস' বই—সার্টিফিকেট—'সারবিস' কার্ড—মজুর সভার নিয়মাবলী—মজুর সভা।

(১৮) সিদ্ধান্ত।

(১৯) গ্রন্থপঞ্জী।

সকল প্রকার মজুরের মধ্যে কৃষি-মজুরের সব চেয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হয়। কল কারখানার সব চেয়ে নিকৃষ্ট মজুরেরা যে বেতন পায়, কৃষি মজুরেরা তার চেয়ে সর্ব্বত্রই কম পাইয়া থাকে। তা ছাড়া মজুর আইন ও সামাজিক বীমার সুফলসমূহ প্রায়ই তাদের ভাগ্যে জোটে না। আইনের চোখে তাদের বিশেষ সত্তা এখন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং কৃষি মজুর সম্বন্ধে এক এক দেশে এক এক প্রকার আইন প্রচলিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তারপর কৃষি-মজুরের সহিত শিল্প-মজুরের এক বিশেষ পার্থক্য আছে। কৃষি-মজুর তার কার্য্যস্থানের অতি কাছে বাস করিতে বাধ্য; কখনও কখনও সে নিয়োক্তার বাড়ীতেই খাওয়া পরা পাইয়া বাস করে, তখন তার অবস্থা গার্হস্থ্য ভৃত্যের সামিল হইয়া যায়। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বিশ শতাব্দীর অনুপযুক্ত অনেক ধারণা অনুযায়ী কাজ হইতেছে দেখিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ইহার উপর কৃষি মজুরদের ভিতর 'মজুর সঙ্ঘ' আন্দোলন নাই বলিলেও চলে। সুতরাং এখনো ইহারা নিজেদের সুবিধা বাড়াইয়া লইবার মত শক্তি অর্জ্জন করে নাই।

কোন কোন দেশে কৃষি-মজুরের হীনাবস্থার আর একটি কারণ এই যে, কারখানা মজুরদের রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তিত হইলেও কৃষি-মজুরেরা দেশের অসামরিক বিধি (সিবিল ল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আর যেখানে বিশেষ বিধি প্রচলিত আছে, সেখানে ঐ বিধি শুধু সেই সব কৃষি-মজুরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যারা নিয়োক্তাদের সহিত বাস করে। অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণি ও হাঙ্গারির আইনের এক বিশেষত্ব এই যে, শুধু খামারের ভৃত্যদের কথাই ধরা হয় নাই, যে কেহ চাষবাসে নিযুক্ত থাকিয়া পারিশ্রমিক পাইতেছে তাকেই ধরা হইয়াছে। আর এই সব আইন এক দিক্ দিয়া দেখিলেও অন্য দিকে ইহাদের মধ্যে নূতন নূতন মজুর আইন স্থাপনার চেষ্টা দেখা যাইবে। এই আইনগুলিকে কতকটা অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝামাঝি কালের জন্য উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। (পৃঃ ৫-৬)।

জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারিতে কোন্ কোন্ আইন কৃষি মজুর সম্পর্কে প্রযোজ্য (পৃঃ ৮-৯) ও সেগুলি কি ভাবে প্রযোজ্য, ঐ তিন দেশের কোন স্থানে কিরূপ চুক্তি, চুক্তির স্বাধীনতা ও নিয়োক্তা-মজুরের কর্ত্তব্য ইত্যাদিতে সেই সব আইন লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা হইয়াছে। কি হারে মজুরি দেওয়া হইবে তা মজুর আইনের কোথাও লিখিত নাই। তবে অসামরিক আইন অনুসারে চুক্তিতে যে পারিশ্রমিক স্থির হয় নিয়োক্তা তা দিতে বাধ্য (পৃঃ ২২)। সুতরাং পারিশ্রমিক সম্পর্কে আগেই কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া লওয়া দরকার। অষ্ট্রীয়ার মজুর-বিধি (কোড্) ও এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলে। যদি পূর্ব্বে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন চুক্তি করিয়া লওয়া না হয় তবে স্থানীয় পারিশ্রমিকের হারে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। (পৃঃ ২২)। একমাত্র হাঙ্গারিতেই কৃষি-মজুরদের মজুরির নিম্নতম হার বাঁধিয়া দেওয়া আছে। (ঐ)। হাঙ্গারিতে চাষীদের ও কৃষি-মজুরদের ফসলের সময় যে আয় হয় তার উপর সারা বৎসর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। যে ফসল ফলিয়াছে তারই একটা শতকরা অংশ (প্রধানতঃ গমের) মজুরি বাবদ ধরা হয়। ফসল গোড়াতেই মজুরদের নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে নিয়োগ করা হইয়া

থাকে। এখন এমন হইতে পারে যে, কোন কারণে অনেক ফসল নষ্ট হইয়া গেল, তখন কৃষি-মজুরদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ১৮৭৬ সনে আইন পাশ করিয়া এই ব্যবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, যেখানে ফসল সাধারণ গড়ের অর্দ্ধেকেরও কম হইবে, সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা ঠিক করিয়া দিবে মজুরির ব্যবস্থা কিরূপ হইবে। ১৮৯৮ সনের আইনেও ছিল যে মজুরেরা যদি ফসলের শতকরা একটা অংশের বদলে মজুরিরূপে পাইতে না চায়, তবে কার্য্য-শেষে তারা নিয়োক্তাকে জানাইতে পারিবে যে, তারা নির্দ্দিষ্ট ওজনে অথবা নগদ টাকায় মজুরি লইবে। ১৯২৬ সনের আইন অনুসারে কোন জেলায় মজুরি (টাকায় বা ফসল) যদি এত কম হয় যে, তাতে মজুরের শোষণ চলিতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তবে কৃষি-মন্ত্রী দৈনিক মজুরির নিম্নতম সীমা বাঁধিয়া দিয়া ঘোষণা জারি করিতে পারেন। ১৯৩৮ সনের এই জানুয়ারী এই আইনকে কৃষি-মজুরের পক্ষে আরো সুবিধাজনক করা হইয়াছে। (পৃঃ ২২-২৪)।

অষ্ট্রীয়ার অনেক স্থলে কৃষি-মজুরদের জন্য বোনাসের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া মজুরের এক নিয়োক্তার অধীনে অথবা একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা চাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নগদ যে মজুরি দেওয়া হইয়াছে তারই একটা শতকরা অংশ বোনাস্ হিসাবে দেওয়া হয়। নীচের তালিকা হইতে শতকরা হারটা বুঝা যাইবে:

প্রদেশ	কত বৎসরের চাকুরী							
	৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০
কারিন্থিয়া ও ষ্টীরিয়া	২৫	৪০	৭৫		১২৫	১৫০	১৭৫	২০০
লোয়ার অষ্ট্রীয়া	—	৩০	৪০		৭০	৮০	৯০	১০০
আপার অষ্ট্রীয়া ও সালজবুর্গ	—	২৫	—		—	৭৫	—	১০০

অষ্ট্রীয়ার বুর্গেনল্যাণ্ডে কোন মজুর যদি না থামিয়া অনবরত একই মনিবের অধীনে বা একই কাজে ৫ বৎসর নিযুক্ত থাকে, তবে মনিব তাকে বিনা দোষে তাড়াইয়া দিলে বা নোটিশ দিলে অথবা সে নিজে যথেষ্ট কারণে অসময়ে কাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে মুদ্রায় ও ফসলে শেষ বৎসর যে মজুরি পাইয়াছে তার ২৫% বোনাস্ হিসাবে পাইবার অধিকারী। ঐ অবস্থায় তার অন্যান্য বোনাস্ নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

৬ষ্ঠ	বৎসর কাজের পর	৩০%
১৫		৪০%
২০		৫০%
২৫		৬০%
৩০		৭০%
৩৫	,,	৮০%
৪০	,, ,, ,,	১০০% (পৃঃ ২৪)

কোন্ দিন মজুরি দিতে হইবে তাহাও টাইরলে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। অন্য সর্ব্বত্র চুক্তির সময় মত মজুরি দেওয়া হয়। ঘণ্টা ধরিয়া মজুরি ঠিক হইলে সপ্তাহ-শেষে, আর দিন, সপ্তাহ বা মাস ধরিয়া মজুরি ঠিক হইলে সেই সময়ের শেষে মজুরি শোধ করার নিয়ম। এক মাসের চেয়ে বেশী সময়ের জন্য যদি চুক্তি হয় তবে মাসের শেষে মজুরি দিতে হয়। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে কৃষি-মজুরের কাজ অনেক বেশী। সেইজন্য অনেক স্থলে বাৎসরিক মজুরির একটা অংশ গ্রীষ্মের ছয় মাসের জন্য বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এই অনুপাত কোথাও ৫৫%, কোথাও ৬০%, কোথাও ৬৫%, কোথাও বা ৭০%। সুতরাং শীতের ছয় মাসের মজুরি দাঁড়ায় ৪৫%, ৪০%, ৩৫% ও ৩০%। নগদ মজুরি সর্ব্বদাই সময়ের অন্তে দেওয়া হইলেও, ফসলী মজুরি সাধারণতঃ আগেই দেওয়া হয়। চুক্তির সময় বাপিয়া ঐ ফসল ভোগ করা চলে। (পৃঃ ২৯-৩০)।

কত ঘণ্টা কাজ করানো যায় সে সম্বন্ধে বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। বাভারিয়ায় স্থানীয় নিয়ম ও বৎসরের ঋতু অনুসারে

রাত্রিতে কত ঘণ্টা ঘুমাইতে ও বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইবে, তা ঠিক করা হয়। অষ্ট্রীয়াতে ১লা মে হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৮ ঘণ্টা ও বৎসরের বাকী সময় ৯ ঘণ্টা হইল মজুরদের রাত্রিতে বিশ্রামের সময়, আর কাজ করিবার সময় ১২ অথবা ১০ ঘণ্টা, টাইরলে গ্রীষ্মকালে ১২ ঘণ্টা ও শীতকালে ১০ ঘণ্টা কাজ করানো দস্তুর। জার্ম্মাণিতে দৈনিক কাজের ঘণ্টা প্রথম ৪ মাস ৮ ঘণ্টা, দ্বিতীয় ৪ মাস ১০ ঘণ্টা ও তৃতীয় ৪ মাস ১১ ঘণ্টা। প্রত্যেক মাসে ২৫টি কাজের দিন আছে ধরিয়া লইলে বৎসরের মোট কাজের ঘণ্টা দাঁড়ায় ২,৯০০। এই অঙ্কের অবশ্য উনিশ-বিশ ঘটে,। ইহাই কাজের ঘণ্টা সম্বন্ধে মোটামুটি হিসাব (পৃঃ ৩১-৩২)। রবিবারে কাজ (পৃঃ ৩৩-৩৪) ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ (পৃঃ ৩৪-৩৫) সম্বন্ধেও বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে।

কৃষিতে এই তিন দেশে বিস্তর স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। ছোট ছোট ক্ষেতে চাষীর স্ত্রী ও কন্যারা শুধু ঘরের কাজে নয়, চাষের কাজেও সাহায্য করে। ধনিগণের বাড়ীতে খাটিয়া স্ত্রী-মজুরেরা কাজ করে। বড় বড় ক্ষেতে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরাও কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনেও ইহাদের সম্বন্ধে অনেকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হাঙ্গারিতে স্ত্রী-লোকদের কাজ সম্পর্কে আইনে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু হাঙ্গারি আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী কাজে খাটাইয়াছে। জার্ম্মাণিতে শুধু বিবাহিত স্ত্রী-লোকদের জন্য নয়, অবিবাহিত কন্যা ও অবিবাহিত মাতারাও কোন কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আর কোথাও ছোটখাট সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে বা পরে স্ত্রীলোকদের দ্বারা কি প্রকার কাজ কত সময় ধরিয়া করানো যাইবে তাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (পৃঃ ৫৭-৩৯)।

সভ্যদেশে বালকবালিকাকে কাজে লাগান হয় একেবারে নিষিদ্ধ নয় নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ মানিয়া লাগাইতে হয়। জার্ম্মাণিতে এখন পর্য্যন্ত কৃষি-মজুরের কাজে বালকবালিকাকে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। হাঙ্গারিতে ১২ বৎসরের কম বয়সের কাহাকেও ক্ষেতের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা চলিবে না। নিযুক্ত করিলে তাহা যে শুধু বন্ধ হইবে তা নয়, যে নিযুক্ত করিবে তার জরিমানা হইবে। অষ্ট্রীয়াতে বালকবালিকার উর্দ্ধতম বয়স চৌদ্দ বৎসর; দশ বৎসর বয়সে তাদের হালকা কৃষি মজুরির কাজে লাগান যাইতে পারে। এই সব বালকবালিকাকে গ্রীষ্মকালে ৯ ঘণ্টার বিশ্রাম (রাত্রি ৮টা হইতে সকাল ৫টা) ও শীতকালে ১০ ঘণ্টার বিশ্রাম (রাত্রি ৮টা হইতে সকাল ৬টা) দিতেই হইবে। (পৃঃ ৩৯-৪০)।

অষ্ট্রীয়াতে নিয়োক্তা বা মজুর নোটিশ না দিয়াই কাজ ত্যাগ করিতে পারে। নিয়োক্তারা ৭টি গুরুতর কারণে মজুরদিগকে চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ছাড়াইয়া দিতে পারে: যথা, অনুপযুক্ততা—অবহেলা অথবা নিয়োক্তাকে অপমান ইত্যাদি—অসৎ অভিপ্রায়, মত্ততা, চুরি, রাহাজানি—ছোঁয়াচে অথবা ঘৃণিত রোগ—আগুন ও বাতি সম্বন্ধে অসাবধানতা, পশুদের উপর নিষ্ঠুরতা, ইচ্ছাপূর্ব্বক নিয়োক্তার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন—হপ্তাখানেকের বেশী জেলবাস—নিয়োক্তার অজ্ঞাতে অপরিচিতকে ঘরে স্থান দেওয়া। আর মজুরেরা ৬টি গুরুতর কারণে হঠাৎ নিয়োক্তার কাজ ছাড়িয়া দিতে পারে: যথা, স্বাস্থ্য-নষ্টের আশঙ্কা—নিয়োক্তার চুক্তিভঙ্গ—অসৎ ব্যবহার—মজুরকে দিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে কাজ করানো—নিয়োক্তার বাড়ীতে ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব—পারিবারিক কারণ। (পৃঃ ৪০-৪১)। হাঙ্গারি ও অষ্ট্রীয়ায় বেতনভোগী চাকুরে সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থাসকল প্রচলিত আছে (পৃঃ ৪৪-৪৫)।

এই ক্ষুদ্র কেতাবখানি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। বলা বাহুল্য, তিনটি দেশের কোথাও কৃষি-মজুর-সম্পর্কিত আইনকে আদর্শ বলা চলে না। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যতে কি করা উচিত কোন না কোন দেশের আইনের মধ্যে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শ্রীসুধাকান্ত দে

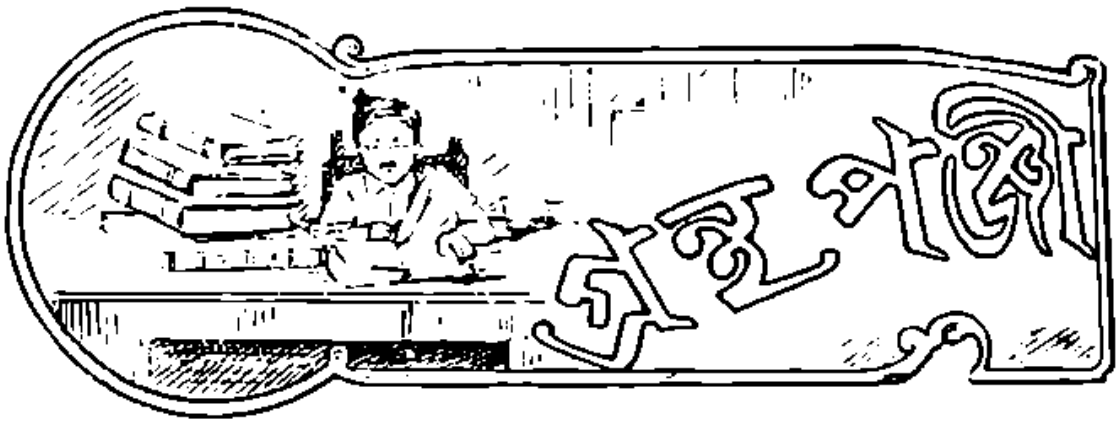

১। "মেথডস্ অ্যাণ্ড টেক্‌নিক্ অব্ সাংস্কৃতিক রিসার্চ। হিথ পার্টিকুলার এপ্লিকেশান টু দি সোস্যাল সায়েন্সেস্।" (বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন প্রণালী ও স্থান নির্দেশ, বিশেষভাবে নানা সামাজিক বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা।) হ্যান্‌ড্‌বুচ্ আর্ট স্প্রাচ্‌ও হাইনহার্ট জন গোয়েনেলস। হার্পার ব্রাদার্স, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। ২১+৫৩১ পৃঃ। ৪ ডলার।

২। "গোল্ডস্টাণ্ডার্ড উণ্ড আর্ব্বাইট্‌স্‌লোহ্‌ন্‌ফ্রাইট্" (স্বর্ণপ্রমাণ ও শ্রমের মাপকাঠি), ডক্টর থি ডাব্লিউ শিফেলে-নৌমবুর্গ। গেথোয়েহ-শ্রিফ্‌ট্‌ন্‌কে ডুকেরাই উণ্ড ফেরলাগ, হলে। ১৯৩১। ৪৭ পৃঃ।

৩। "দি ল রিলেটিং টু ইন্‌ভ্যাল্যুয়েশন্" (শিল্প সম্বন্ধীয় আইন কানুন), এইচ্ ভ্যালুয়েশন্। স্যর আইজাক পিট্‌ম্যান অ্যাণ্ড সন্স, লণ্ডন। ১৯৩১। ১৭+২৬১ পৃঃ।

৪। "ডি ডাযচে নাখ্‌ক্রিগ্‌স্টাইলুঙ্গ্‌ভাণ্ডেরুঙ্গ্" (যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মানির লোক-চলাচল বা বহির্গমন নীতি), ডক্টর ফ্রান্‌ৎস নাকে। এমিল এবেরিং, বার্লিন। ১৯৩০। ৬৬ পৃঃ।

৫। "আর্ব্বাইট্‌স্ লোহ্‌ন্‌ফ্রাইট্ উণ্ড ষ্টিউর্‌লাফ্‌ট্‌স্ পোলিটিক" (শ্রমের মাপকাঠি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি), ডক্টর এড্‌আর্ড মেয়ের ওয়ু শ্‌লেবেড্রিসেন। জে শ্‌লেবেইট্‌সার, মিউনিক, বার্লিন, লাইপৎসিগ। ১৯৩১। ৪৪ পৃঃ। ১·৫০ মার্ক।

৬। "রেজিয়নাল অ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানিং ইন্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস্" (মূলনীতি ও প্রয়োগের দিক্ হইতে স্থানীয় এবং নগর সম্পর্কিত গঠন সমস্যা), ডাব্লিউ এইচ্ অ্যাডলিন। জর্জ্জ রাউট্‌লেজ, লণ্ডন। ১৯৩০। ১৩+১৪৮ পৃঃ।

৭। "ডেবেলপ্‌মেণ্ট অব্ আগ্রারিয়ান্ মুভ্‌মেণ্ট অ্যাণ্ড আগ্রারিয়ান্ লেজিস্‌লেশন ইন্ চায়না" (১৯১২-৩০)। চীনদেশে কৃষি আন্দোলন ও কৃষি আইনের অভিব্যক্তি (১৯১২-৩০)। ডেক্‌রয়েন ডি এইচ্ ল্যাঙ্গ। ইয়েঞ্চিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও সমাজসেবা বিভাগ, পাইপেং। ১৯৩১। ১৪৪ পৃঃ।

৮। "ষ্টাণ্ডার্ডস্ অব্ লিবিং। হেট্‌স লিব্ হুইচ উই হ্যার্ক।" (জীবনযাত্রার বিভিন্ন মাপকাঠি। কাজ করিব, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে চাই। ই এস কিৰ্কপ্যাট্রিক। হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার গ্রাম্য জীবন সমিতির উদ্যোগে কৃষি কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩০। ৭৯ পৃঃ।

৯। "আর্ব্বাইট্ উণ্ড স্পোর্ট" (কাজ ও খেলা), ডক্টর এইচ্ মেৰ্ক্কিস্ ও অন্যান্যেরা। ফুনিয়াস্ স্প্রিঙ্গের, বার্লিন। ১৯৩১। ৪+৭৩ পৃঃ।

১০। "দি ষ্টাটিস্‌হোল্ড একাউণ্টস্ অব্ টু চাইনিজ্ ফ্যামিলিজ্ (দুইটি চীনা পরিবারের গার্হস্থ্য আয়ব্যয়ের হিসাব), লিউ নি ডি প্যাঙ্গ্। চায়না ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ আমেরিকা, নিউ ইয়র্ক। ২৩ পৃঃ।

জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় বীমার স্থান

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাহা, এম-এ, পি-এইচ্-ডি

যুক্তরাষ্ট্রে জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতিদের লইয়া একটি সমিতি মোতায়েন আছে। সেই সমিতিতে কিছু দিন আগে শ্রীযুক্ত ফ্র্যাঙ্ক এল জোন্স যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে বিভিন্ন দেশে জীবন বীমার পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করেন (১ ডলার=২৸০)

(০০০ বাদ)

	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৮	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯
যুক্তরাষ্ট্র (সরকারী ও যুদ্ধ বিপদ্ বীমা ধরা হয় নাই)	৯৫,৩০৬,৩১৫	১০৩,১৪৬,৪৪০
ক্যানাডা	৫,৭২০,৪১৩	
যুক্তরাজ্য	১১,৪৮১,৫৮২	
আর্জ্জাণি	৩,২৮০,৬২৫	
ফ্রান্স	৮৮৪,৫৮৬	
ইতালি	৯৫১,২৭৪	
বেলজিয়াম	৬৯,০৫৩	
জাপান	৩,৭৩৩,৮৫১	
অষ্ট্রেলিয়া	২,৩১০,৫৭৯	
ভারতবর্ষ	২৫৯,৩৪৩	

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, জগতের মোট জীবন-বীমা ব্যবসার ৭০% একা যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যের স্থান দ্বিতীয় হইলেও, উহা যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ⅛ অংশ ব্যবসা করে। বেলজিয়ামের স্থান ভারতেরও নীচে। কিন্তু উভয় দেশের লোকসংখ্যা ধরিয়া তুলনা করিলে ভারতবর্ষের স্থান যে এ বিষয়ে কত নিম্নে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

কয়েকটি দেশের মাথা পিছু বীমা কত ও শতকরা কত জন বীমাকারী, তাহার হিসাব নিম্নলিখিত দুইটি তালিকায় পাওয়া যাইবে।

মাথা পিছু বীমা

আমেরিকা	
ক্যানাডা	
নিউ জীলাণ্ড	
গ্রেট বৃটেন	
ভারতবর্ষ	

কত লোক বীমাকারী

আমেরিকা	৪ জনের ১ জন
ইংলাণ্ড	১০ জনের ১ জন
ভারত	৫০০ জনের ১ জন

ভারতবর্ষের দৈনিক গড়্‌পড়তা আয় অতি সামান্য। সুতরাং অন্য দেশের তুলনায় আমাদের মাথা পিছু বীমার পরিমাণ সামান্য হওয়ায় বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু ইয়োরোপের সভ্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশে বীমাকারী লোকদের সংখ্যা এত কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমার মনে হয়, আমাদের বীমা কোম্পানীসমূহ যথেষ্ট উন্নত ধরণে বীমার কার্য্য চালান না বলিয়া এখনও বহু লোক বাহিরে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা সহজে পুরাতন প্রথা ছাড়িতে চাহেন না ও সহরের বাহিরে কাজ বেশী করেন না। কিন্তু ভারতের গ্রামে গ্রামে এমন যথিষ্ণু কৃষক ও গৃহস্থ রহিয়াছেন যাঁহারা বীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিলে জীবন বীমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন।

পাশ্চাত্য দেশে বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের জমান টাকা বিশেষভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিজনক

কাজে খাটাইয়া থাকে। ইংলণ্ডে বীমা কোম্পানীর টাকার সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। জার্ণাল অব্ দি ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ অ্যাক্চুয়ারিজ (১৯২৮, পৃঃ ২৩) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাহায্য পায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :

(১) রেলওয়ে
(২) বিজলী ও 'শক্তি' কোম্পানীসমূহ (ঐ)
(৩) গ্যাস্ কোম্পানী (ঐ)
(৪) লোহা, কয়লা ও ইস্পাত
(৫) জমি, টাকাকড়ি ও বন্ধক
(৬) জাহাজী ব্যবসা
(৭) টেলিগ্রাফ
(৮) টাকাকড়ি সংক্রান্ত সঙ্ঘ
(৯) বন্দর ও অন্যান্য কোম্পানী

আমেরিকার শিল্প ব্যবসায়সমূহ বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পায় তাহা নীচের তালিকায় দেখান যাইতেছে :

রেলওয়ে	৩৫%
স্থাবর সম্পত্তি	৩০·১৬%
খামার বন্ধক	১৩·১৬%
সরকারী 'সিকিউরিটি	৯%

মাত্র ৯% সরকারী সিকিউরিটি কিনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। আর বাকীটার বেশীর ভাগ শিল্প ও কৃষিকে সাহায্য দানের নিমিত্ত সম্পত্তি বন্ধক লইয়া ধার দেওয়া হয়।

কোন কোন ভারতীয় কোম্পানী শিল্প বাণিজ্যে টাকা খাটায় বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। ভারতীয় কোম্পানীগুলি মোট যে টাকা খাটাইতেছে তার পরিমাণ ২৩½ কোটি টাকা। এই টাকা প্রধানতঃ নিম্নলিখিতভাবে খাটান হইতেছে :

	কোটি টাকা
ভারতে স্থিত সম্পত্তি বন্ধকের উপর	২
সরকারী সিকিউরিটি	১২
পোর্ট ট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার	৪
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়	৮০
জমি ও বাড়ী	১

উপরের তালিকাতে দেখা যাইবে যে, ১৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬৫% এমন সব বিষয়ে খাটান হয় যাহা হইতে স্বদেশী ব্যবসায়সমূহ কোন প্রত্যক্ষ ফল পায় না। ১ কোটি টাকা বা ৪% শিল্প বাণিজ্যকে উৎসাহ দিবার জন্য লাগান হয়। অন্যান্য সূত্রে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য পরোক্ষ ভাবে যে সাহায্য পায় তাহা ধরিয়া মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানী শিল্পের উন্নতির জন্য তাহাদের পুঁজির মাত্র ৫% খাটাইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কর্তব্য আরো বেশী টাকা স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে খাটানো। এই দিকে আমি বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সমবায় পল্লী-সমিতির ভালমন্দের কথা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুপারভাইজার, বরিশাল কোঃ অঃ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, বরিশাল

আর্থিক উন্নতির গত আশ্বিন সংখ্যায় "কৃষক ও সমবায়" শীর্ষক (ডাক্তার হ'তে উদ্ধৃত) প্রবন্ধে লেখক যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সমস্ত কেন্দ্রীয় সমিতির উপর তার সবগুলি প্রযোজ্য কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের কতকটা সন্দেহ আছে। অবশ্য কোন কেন্দ্রীয় সমিতিতে কিছু ত্রুটি যে নেই, সে কথাও আমরা বলিনা ; ত্রুটি আছে, এবং যা আছে তা যে সমিতির কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি এড়ায় না এও সত্য কথা ; তবে বিনা সংশোধনের হাত কেন্দ্রীয়

সমিতির নেই বলেই এ সকল জানা-শোনা ত্রুটি এখনও হয়ে গেছে। যেমন, পূর্ব্বেকার জমে-উঠা মোটা রকমের দেনা শোধের জন্য পল্লীসমিতির ১০ হতে ১৫ বছর মিয়াদে দাদনের কথা—ইহা কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে অসম্ভব। বাইরের আমানত নিয়েই যাকে দাদন কার্য্য চালাতে হবে, তার পক্ষে আমানতের দীর্ঘতম মিয়াদের বেশী সময় থাতক সমিতিকে দেওয়া একেবারেই সম্ভবপর হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সমিতি যে সকল আমানত পাচ্ছে, তার দীর্ঘতম মিয়াদ হচ্ছে চার বছর। এই চার বছরের মাথায় আমানত শোধের জন্য তাকে তৈরী হয়ে থাকতেই হবে। তাহলে কি করে সে পল্লী-সমিতিকে চার বছরের অধিক সময়ের মিয়াদ দিতে পারে? অবশ্য এ অসুবিধা দূর হতে পারে যদি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক বসানো যায়।

তারপর পল্লীসমিতির সভ্যদের দাদনের কথা। যখন যে টাকা দরকার তখন সে টাকাটা না পাওয়া সভ্যদের পক্ষে অসুবিধারই কথা সন্দেহ নেই। হতে পারে—সমিতি যখন কর্জ্জের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আবেদন করে, তখন কোন কোন সভ্যের টাকার দরকার থাকে না—অথচ ভবিষ্যতে টাকা পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে অথবা আদৌ—পাবে কিনা এই সন্দেহে, দরকার না থাকা সত্ত্বেও তারা টাকাটা নিয়ে অথবা খরচা করে দেনার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। এ অসুবিধা ততদিন পর্য্যন্ত হয়েই থাকে যতদিন পর্য্যন্ত না পল্লীসমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে ক্যাস ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। কিন্তু এই ক্যাস ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে থাতক সমিতির পরিচালক সমিতিকে বেশ শিক্ষিত ও হিসাবী হওয়া আবশ্যক; তা নাহলে উপকারের চেয়ে অপকারই হবে অনেক বেশী এবং ভবিষ্যতে ব্যাপার ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠবে। শিক্ষা ও হিসাবের অভাবের জন্যই এখনও পল্লীসমিতি তার আবশ্যকতা বুঝতে পারে না; যেখানে ১০৲ টাকা আবশ্যক সেখানে চাহিদা থাকে তার ১০০৲ টাকার, আর এই চাহিদা ও আবশ্যকের মীমাংসা করে দিতে হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিদর্শক কর্ম্মচারীর। ক্যাস ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে এ জিনিষটা সাধারণতঃ পল্লীসমিতির হাতেই থাকবে (যে নিজের ভাল মন্দ আবশ্যক অনাবশ্যক এখনও বুঝতে শিখেনি) এবং তাতে করে কৃষকদের দেনার মাত্রা শুধু বেড়েই যাবে—কমবে না। শুধু এই একই কারণে পল্লী-সমিতির প্রার্থনাকে পরিদর্শক কর্ম্মচারীর অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ছেটে কেটে কমিয়ে দিতে হয়; তহবিলে টাকা নেই অথবা অন্য কোন গোপন রহস্য এর ভেতর থাকে না।

এখন সংগঠনের কথাটা ধরা যাক্। যতটা সম্ভব দেখে শুনেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সংগঠন কার্য্য করে থাকে। যেখানে দশজনকে নিয়ে কারবার সেখানে সকলই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে, নিখুঁত হবে, এ কেউ আশা করতে পারে না, মোটা-মুটি চলনসই হলেই হল। তাছাড়া কারবার না করে কে ভাল কে মন্দ এ সিদ্ধান্ত করাও সকল সময় সম্ভব হয় না। কারবার যখন অগ্রসর হতে থাকবে প্রাকৃতিক নিয়মে তখনই ভাল মন্দ ধরা পড়বে, এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সুতরাং সংগঠনের বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিতের জন্য বাইরে থেকে যতটা দেখা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একেবারেই ততটা দায়ী হতে পারে না। তাকে দোষ দেওয়া যেত যদি সে মন্দটিকে ভাল করার চেষ্টা না করত। অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানকে ভাল করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্টই চেষ্টা করে থাকে, কোথাও বা সুফল লাভ হয়, কোথাও বা হয় না।

পল্লী সমিতির কিস্তিটি ঠিক ঠিক উঠে আসতে বাধা থাকলেই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার দাদন বন্ধ করে দেয় এ কথা আমরা স্বীকার করতে পারি না। মধ্যবর্ত্তী সময়ের পূর্ব্বেই পল্লীসমিতির সভ্যাদির অবস্থা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে এবং যদি দেখা যায় যে, কোন অনিবার্য্য কারণে পল্লীসমিতি তার নির্দ্ধারিত দেয় কিস্তিটি পুরোপুরি আদায় করতে পারবে না, তাহলে যতটা সম্ভব কিস্তি আদায় অন্তে তাকে আবার কর্জ্জ দেওয়া হয়ে থাকে, এ দৃষ্টান্ত যথেষ্টই আছে; তবে ইচ্ছাকৃত অনাদায়ের জন্য অবশ্য দাদন বন্ধ করে দেওয়া আবশ্যক।

তারপর সভ্যদের দাদন-পরীক্ষার কথা। সভ্যদের কর্জ্জ টাকা তাদের লিখিত কাজে খরচা হল কিনা সে সম্বন্ধে সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে থাকে। বিশেষতঃ, দেনা শোধের জন্য যে টাকাটা

যেতেছে যে টাকাটা দেনা-শোধে ব্যয় হল কিনা সে বিষয়ের সকলই তখন ত থেকেই থাকে, দেনা শোধের ছাড়চিট খতগুলি পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে দাখিল করার ব্যবস্থা আছে এবং তা এখনও হয়ে আসছে। তাছাড়া অধিকাংশ সময়েই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ সভ্যদের যাদব কার্য্য নিজেদের হাতে করে তাদের নির্দ্দিষ্ট খাতে টাকাটা খাটানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন।

সভ্যদের বাইরের নতুন কর্জ্জ সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, একবার যারা সমবায়ের ভেতর ঢুকেছে, গ্রামের মহাজন সাধারণতঃ তাহাদিগকে কর্জ্জ দিতে চাহেন না। এটা খুবই সত্য; তাছাড়া সমবায়ীদের বাইরে কর্জ্জ করার তেমন কোন আবশ্যকতাই হয় না। তাদের যখন যে টাকার দরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তখনই তা দিয়ে আসছে; তাদের অভাব অভিযোগ পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ সকল সময়েই পূরণ করে দিচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ বরিশাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কথা ধরা যেতে পারে। এবারকার দুর্ভিক্ষে ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় বহু পল্লীসমিতিকে বিনা সুদে ধানের টাকা দাদন করেছে।

পল্লী সমিতির উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ যেসকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার কিছু কিছু যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে না আছে তা নয়, কিন্তু সর্ব্বোপরি যে কারণ সেটা হচ্ছে কৃষকদের অন্নগত আর্থিক অনটন।

বাঙ্‌লার কৃষকদের জমিজমা যা আছে তা নাম মাত্রই। ফসল যা হয় তাতে কৃষাণ খরচাই হয় না। অথচ জমির আয় ছাড়া ওদের অন্য কোন প্রকার আয়ের পথই নেই। এই জমির বৎসরান্তে আয় থেকে কৃষকদের খেতে পরতে হবে, খাজনা দিতে হবে ভবিষ্যতের কৃষাণ খরচা জোগাতে হবে, তদুপরি আবার দেনাও শোধ করতে হবে। কাজেই সব দিকটা তারা সামলে উঠতে পারে না; তাই বাঙ্‌লার কৃষক আধপেটা খেয়ে কৃশ হয়ে যাচ্ছে, খাজনার দায়ে তাদের জমিজমা বিকিয়ে যাচ্ছে, দেনার মাত্রা ক্রমেই তাদের বেড়ে উঠছে।

এ ছাড়া আরও একটা জরুরি কারণ আছে, বাঙ্‌লার কৃষক না খেয়ে না পরে দিনরাত খেটে যে জিনিষ জন্মায় পেটের দায়ে, মহাজনের তাড়ায়, মালিকের চোক রাঙানিতে তা তখনই মাটীর দরে বিকিয়ে দিতে হয়; অথচ যা তাকে কিনতে হয় তা অনেক বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয়। তাতে করে তাদের লোকসান দিগুণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই যে চির মজ্জাগত অভাব এ যদি দূর করা না যায়, তাহলে শত চেষ্টা ব্যর্থ করে বাঙ্‌লার কৃষকদের এ দুরবস্থা লেগেই থাকবে—কিছুতেই যেতে পারে না—যাবে না।

যুবক বাংলার শিল্পনিষ্ঠা ও বিশ্ব-দৌলতে তাহার ঠাঁই*

যুবক বংগ

বহরমপুরে শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার গৌরব আমাকে দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রারম্ভে আমার প্রথম কর্ত্তব্য বহরমপুরের মহানুভব শ্রেষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের অন্যতম কাশিমবাজারের পরলোকগত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। স্বর্গীয় মহারাজা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে জাতীয়তাবাদীদিগের সভায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদেশী পণ্যবর্জ্জন আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিয়া যুবক বাংলার সৃষ্ট বিষয়ে

* বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর অপরাহ্ণে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বহরমপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তার মর্ম্ম।

সহায়তা দান করেন। ঐ সময় হইতে যুবক বাংলা রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমাগত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। আজ স্বদেশে যা-কিছু শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, আজ যে সকল যন্ত্র ও চটকল, কয়লার খনি, রাসায়নিক কারখানা, চা-বাগান, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনী প্রতিষ্ঠান, জীবন বীমা কোম্পানী, শ্রমজীবি-সঙ্ঘ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, ঐগুলি প্রধানতঃ ১৯০৫ সনের দেশপ্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যন্ত্র ও হাতিয়ার প্রস্তুত বিষয়েও বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীরা উল্লেখযোগ্য গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আন্তর্জ্জাতিক জগতে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

শিল্প জগতে যুবক বাংলার স্থান

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বর্ত্তমানে যে সকল মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা সমসাময়িক শিল্প-জগতে হয়ত হেলেফেলা যায়। কিন্তু প্রথমেই একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা বাঞ্ছনীয় যে, কেবল জগতের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী জাতির তুলনায় বাঙ্গালীরা শিল্প ও সৃষ্টি-কৌশল বিদ্যায় নিকৃষ্ট। যুক্তরাজ্য, জর্ম্মানিয়া, পোলাণ্ড ও অন্যান্য বল্কান দেশ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপ এবং রুশিয়া—এ সকল স্বাধীন স্থানের তুলনায় বাংলা একেবারে নগণ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিষয়ে ইয়োরোপের শতকরা ৬০ জন লোকের অবস্থা আনুমানিক পরিমাণে বাঙ্গালীদের অবস্থারই মত। তুলনামূলক ভাবে শিল্পের দিক্ দিয়া বাঙ্গালীর অবস্থা খুব খারাপ নহে।

বাংলা ও ভারত

ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনা করিলেও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে বাংলার অবস্থা নৈরাশ্যজনক নহে। শিল্প-বিষয়ক কৃতিত্বের কথা বিবেচনা করিলে মারাঠী কিংবা দাক্ষিণাত্যবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এবং তামিল কিংবা অন্ধ্রবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলা যায় না। কেবলমাত্র পার্শী, গুজরাটী ও ভাটিয়ারা এ বিষয়ে বাঙ্গালীদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহারা মারাঠী, পাঞ্জাবী এবং ভারতের অন্যান্য জাতিরও অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন যে, মারাঠী, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীরা শিল্প বিষয়ে পশ্চাৎপদ বলিয়া গুজরাটী, ভাটিয়া ও পার্শীদের তুলনায় সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন।

বাঙ্গালীদের অনুন্নতির কারণ

ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও তথ্যমূলক বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীদের শিল্পসম্বন্ধীয় অনুন্নতি তাঁহাদের শিল্পবিমুখতারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীদের অনুন্নতির ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যে কারণেই হউক বাঙ্গালীদের অর্থনৈতিক উদ্যম ও কার্য্যকারিতা আধুনিক শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচালিত না হইয়া অন্যত্রের ক্ষেত্রে ধাবিত হইয়াছে। আজ সেদিন শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের উদ্যম দেখা দিয়াছে। এই বিলম্বের জন্যই বাঙ্গালীরা প্রধানতঃ শিল্প-ব্যবসায় অনুন্নত রহিয়াছে।

বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য

এই অনুন্নতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু আমি ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বাঙ্গালীদের দোষক্ষালন করিব না। বাঙ্গালীদের শিল্প-বিষয়ক শোচনীয় অনুন্নতি দূর করিতে হইবে। আজ যুবক বাংলার সম্মুখে এক আদর্শ রহিয়াছে। শিল্প বিষয়ে যুবক বাংলাকে গুজরাটী, ভাটিয়া, পার্শীদিগের সমকক্ষ হইতে হইবে। কেবল তাহা নহে, যুবক বাংলাকে শিল্প-ব্যবসা বিষয়ে বৈদেশিক উচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিতে হইবে।

আমাদের লক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উপায়ও অস্পষ্ট নহে। ১৯০৫ সনের আন্দোলনে যে সকল ভাব সূচিত হইয়াছিল ঐগুলির মধ্যেই যুবক বাংলার প্রধান শিল্প-নীতি নিহিত আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সকল প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই শিল্প ও ব্যবসার আগ্রহ বদ্ধমূল ও প্রসারিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যুবক বাংলার পক্ষে সরকারকে জাতীয় শিল্পের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। আধুনিক ও মহাযুদ্ধের পরবর্তী নীতি অনুসারে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের পুনঃব্যাখ্যা করিতে হইবে। কেবলমাত্র অনুসন্ধান, প্রচার, পরীক্ষামূলক কার্য্য প্রভৃতি এই কার্য্যের অন্তর্গত হইবে না। সরকারের ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্য, সরকার কর্ত্তৃক ব্যবসার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, গঠনমূলক ট্যারিফ, ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্যে মিউনিসিপ্যালিটীর ক্ষমতার প্রসার, শিল্প ব্যবসায় সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও ঐ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমি এখানে কেবলমাত্র এই আভাস দিতেছি যে, কৃষি-সংক্রান্ত ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত রকমের যন্ত্রপাতি অবিলম্বে জিলায় জিলায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। এই সকল যন্ত্রপাতির চাহিদা প্রবল এবং ঐগুলি দেশের কারিগর ও মিস্ত্রী দ্বারা সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, কলিকাতায় ও বাংলার অন্যান্য ব্যবসাপ্রধান অঞ্চলে "শিল্প পুঁজি-সঙ্ঘ" স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ দেশকল ব্যবসা উন্নতিলাভে সমর্থ হইতেছে না, সেগুলিকে অর্থ-সাহায্য প্রদান করা ঐ সকল সঙ্ঘের প্রধান কাজ হইবে। তরুণ বাংলার কতিপয় ব্যবসায়ী এইরূপ কয়েকটা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম ও ব্যবসায়-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এক্ষণে পাঁচ ছয়টা "শিল্প-পুঁজিসঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। সঙ্ঘগুলা অংশীদারদের কোম্পানীরূপে কাজ করিবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য শ' পাঁচেক টাকার কম হওয়া উচিত নয়।

মাড়োয়ারীদের সহযোগ

এখানে আরও একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগ লাভের চেষ্টা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। বাংলার সকল প্রকার আন্দোলনে মাড়োয়ারীরা বাঙ্গালীদের মতই আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছেন। আমাদের স্বার্থের জন্যই আরও অনেক দিন তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া আবশ্যক হইবে।

ইহুদীরা ইয়োরোপে ও আমেরিকায় যে কার্য্য করিতেছেন, মাড়োয়ারীরা আর্থিক ভারতে তাহা করিতেছেন। মাড়োয়ারীকে 'নিখিল ভারতীয়' বলা যায়। কেবলমাত্র বাঙ্গালীরা নহেন, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল, বিহারী ও অন্যান্য প্রদেশবাসীরা মাড়োয়ারীদের অর্থের উপর অল্পাধিক নির্ভর করেন। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসা আবশ্যক।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

এ কথায় যেন ভুল না হয় যে, বাঙ্গালী আমরা অনেক বিলম্বে আধুনিক শিল্প-ব্যবসার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। আমরা ইহাও যেন না ভুলি যে, গ্রেটবৃটেনের অধিবাসীদের তুলনায় ফরাসী ও জার্ম্মাণগণ শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রায় দুই পুরুষ পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইটালীয় ও জাপানীরাও শিল্পব্যবসার বিষয়ে ত্রুটী হইয়াছেন। বাঙ্গালীরা বিভিন্ন বিদ্যা ও কলায় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা বিলম্বে শিল্প-ব্যবসার পাঠ আরম্ভ করিলেও তাঁহারা জার্ম্মাণ ও জাপানীদের মত শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবেন, আমি এরূপ বলিতে সাহসী হইতেছি।

যুবক বাংলার শিল্প-ব্যবসা-বিষয়ক কার্য্যকারিতা ভারতের অন্যান্য লোকদিগকে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য অধিবাসীদিগকে উদ্দীপনা প্রদান করিবে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় গণতন্ত্রের ও কাসিষ্ট ইটালীর আর্থিক স্বদেশ প্রেমের মত জগতে স্মরণীয় হইবে।

এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি যুবক বাংলাকে ত্যাগ ও সংগঠনমূলক কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। যুবক বাংলাকে শিল্প ও ব্যবসা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বঙ্গীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন স্মৃতি-পরিষৎ বিষয়ক প্রস্তাব

("প্রী প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া"র মারফৎ অমৃত বাজার পত্রিকা, আনন্দ বাজার, আড্‌ভান্স্, দৈনিক বসুমতী, লিবার্টি ইত্যাদি বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক পত্রিকায় প্রকাশিত)।

১৯৩২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্মদাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্মতিথি দুই শতাব্দী পূর্ণ করিবে। এই উপলক্ষে মার্কিণ নর-নারী আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ও জগতের নানাস্থানে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছে। বিভিন্ন ছোট বড় নানারি দেশের নর-নারীও স্বাধীনভাবে এইরূপ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। এই আন্তর্জ্জাতিক উৎসবে যোগদান করা ভারতীয় নর-নারীর পক্ষেও বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের কোনও একটা বা কতকেটা দিন এই জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা যাইতে পারে। ভারতীয় সার্ব্বজনিক জীবনের প্রাদেশিক ও অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রে "জর্জ্জ ওয়াশিংটন তিথি" পালিত হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা মাফিক অনুষ্ঠানের আকার প্রকার যথাসম্ভব বাছিয়া লইলেই চলিবে।

অতিরিক্ত একটা অনুষ্ঠানের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এক একখানা বই প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহার ভিতর থাকিবে আমেরিকার রাষ্ট্র, শিল্প-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন ইত্যাদি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ। জর্জ্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে দুই একটা রচনাও চাই, বলা বাহুল্য। তাহা ছাড়া যুবক ভারতের জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্ম্মকাণ্ডে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কতখানি ও কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার আলোচনা থাকাও দরকার। এই প্রস্তাব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সহজেই গৃহীত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত বিষয়গুলি মাল ও লেখক হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হইবে। কোনও একটা মূল ভারতীয় রচনার তর্জ্জমারূপে এইগুলা প্রকাশ করা হইবে না, ইহাও জানিয়া রাখা ভাল। তবে প্রত্যেক ভাষায়ই বইয়ের নাম রাখা যাইতে পারে নিম্নরূপ— "জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও আমেরিকা।"

এই সঙ্গে আর একটা প্রস্তাব পেশ করা যাইতেছে। ১৯৩২ সনের ভিতর ভারতীয় প্রকাশক ও সম্পাদকগণ তাঁহাদের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিকের একটা "জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও আমেরিকা সংখ্যা" প্রকাশ করিতে পারেন। ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন তিথির উল্লেখ করা দরকার হইবে। আর সেই সঙ্গে কোন্ তারিখে বিশেষ সংখ্যাটা বাহির হইবে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করাও ভাল।

ভারতের সার্ব্বজনিক সভা-সমিতি, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান-পরিষৎ শিল্প-বাণিজ্যভবন, গ্রন্থাগার, গবেষণা-গৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার দেশকে সম্বর্দ্ধনা করার গৌরব সহজেই অনুভূত হইবে আশা করিতেছি। এই উৎসবে যোগদান করিলে মার্কিণ নর-নারীর সঙ্গে ভারতীয় নর-নারীর আত্মীয়তা আরও খানিকটা নিবিড়তর হইয়া উঠিবে, এই বুঝিয়া দেশের জননায়কগণ নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে যথোচিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে উৎসাহ দিবেন, এরূপ ভরসা আছে। শীঘ্রই বাঙ্গলা দেশের জন্য "বঙ্গীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন স্মৃতি পরিষৎ" নামে একটা নাতিবৃহৎ সংগঠন-সভা কায়েম হউক। ইতি কলিকাতা, নবেম্বর ১৯৩১।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বঙ্গীয় গ্যেটে স্মৃতি-পরিষৎ বিষয়ক প্রস্তাব

("জী গ্রেস অব্ ইণ্ডিয়া" মাসিক অমৃত বাজার পত্রিকা, আনন্দ বাজার, আজকাল, দৈনিক বসুমতী, শিবাজী ইত্যাদি বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক পত্রিকায় প্রকাশিত)।

১৯৩২ সনের ২২শে মার্চ তারিখে জার্মাণ সাহিত্যবীর গ্যেটের মৃত্যু-তিথি এক শতাব্দী পূর্ণ করিবে। এই উপলক্ষে জার্মাণ নর-নারী জার্মানির বিভিন্ন কেন্দ্রে আর জগতের নানা স্থানে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছে। বিভিন্ন ছোট বড় মাঝারি দেশের নরনারীও স্বাধীনভাবে এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। এই আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদান করা ভারতীয় নরনারীর পক্ষেও বিশেষ-রূপে বাঞ্ছনীয়।

আগামী মার্চ মাসের কোনো একটা বা কয়েকটা দিন এই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা যাইতে পারে। ভারতীয় সার্বজনিক জীবনের প্রাদেশিক ও অন্যান্য কর্মকেন্দ্রে "গ্যেটে-তিথি" পালিত হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা মাফিক অনুষ্ঠানের আকার-প্রকার যথাসময়ে বাহির করিয়া লইলেই চলিবে।

অধিকন্তু একটা অনুষ্ঠানের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দু, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এক একখানা বই প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহার ভিতর থাকিবে জার্মানির সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র-শাসন, আইন-কানুন ইত্যাদি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ। গ্যেটে সম্বন্ধে দু'একটা রচনাও থাকা দরকার, ইহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া যুবক ভারতের জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্মকাণ্ডে জার্মাণ "কুল্টুর" কতখানি ও কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার আলোচনা থাকাও দরকার। এই প্রস্তাব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সহজেই গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার লিখিত বইগুলা মাল ও লেখক হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হইবে। কোন একটা মূল ভারতীয় রচনার তর্জমারূপে এইগুলা প্রকাশিত করা হইবে না। তবে প্রত্যেক ভাষারই বইয়ের নাম রাখা যাইতে পারে নিম্নরূপ :—"গ্যেটে ও জার্মানি।"

এই সঙ্গে আর একটা প্রস্তাবও পেশ করা যাইতেছে। ১৯৩২ সনের ভিতর ভারতীয় প্রকাশক ও সম্পাদকগণ তাঁহাদের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিকের একটা "গ্যেটে ও জার্মানি সংখ্যা" প্রকাশ করিতে পারেন। মার্চ মাসে গ্যেটে তিথির উল্লেখ করা দরকার হইবে। আর সেই সঙ্গে কোন্ তারিখে বিশেষ সংখ্যাটা বাহির হইবে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করাও ভাল।

ভারতের সার্বজনিক সভাসমিতি, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান-পরিষৎ, শিল্প-বাণিজ্য-ভবন, গ্রন্থাগার, গবেষণা-গৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে গ্যেটে ও তাঁহার দেশকে সম্বর্ধনা করার গৌরব সহজেই অনুভূত হইবে আশা করা যাইতেছে। এই উৎসবে যোগদান করিলে জার্মাণ নরনারীর সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর আত্মীয়তা আরও খানিকটা নিবিড়তর হইয়া উঠিবে এই বুঝিয়া দেশের জননায়কগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথোচিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে উৎসাহী হইবেন এইরূপ ভরসা আছে।

শীঘ্রই বাংলা দেশের জন্য "বঙ্গীয় গ্যেটে স্মৃতি-পরিষৎ" নামে একটা নাতিবৃহৎ সংগঠন-সভা কায়েম হউক। ইতি কলিকাতা, নবেম্বর ১৯৩১।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বঙ্গীয় কৃষকের দরিদ্রতা

বাঙ্গলার কৃষকের দারিদ্র্য কতদূর ভীষণ তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এবারকার দুর্ভিক্ষের এই দারিদ্র্যের নগ্নতা আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল অনেক স্থানেই কৃষকগণ দুবেলা অন্নের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থলে কৃষকদিগের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। কোন কোন স্থান হইতে ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। এই কারণ গুরুতর আপাতক কারণ যাহাই হউক উহার মূল কারণ যে কৃষকের ভীষণ দারিদ্র্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই দারিদ্র্যের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৃষকের দরিদ্রতার কথা চিন্তা করিলেই সর্ব্বপ্রথমে তাহার জমির কথা মনে পড়ে। কৃষকের জমিটুকুই তাহার সর্ব্বস্ব, এই জমি হইতেই তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অথচ এই জমিতে তাহার কোনও স্থায়ী স্বত্ব নাই। পূর্ব্বে এমন দিন ছিল যখন জমিদার ইচ্ছা করিলেই জমি হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে প্রজাস্বত্ব আইনের বলে সে জমিতে পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখলের স্বত্ব লাভ করিয়াছে এবং জমিদার ইচ্ছামাত্রই এক্ষণে আর তাহাকে জমি হইতে তাড়াইতে পারেন না। কিন্তু এখনও জমিদারই কার্য্যতঃ ভূমির মালিক বলিয়া বিবেচিত হন। জমিটা জমিদারেরই সম্পত্তি, তবে প্রজা বহুদিনের দখলের ফলে তাহাতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অধিকার লাভ করে মাত্র। এই অধিকারগুলি আইনে নির্দ্দেশ করা আছে। প্রজা এই সকল অধিকারের অতিরিক্ত কোনও কার্য্য করিলে অথবা জমিদারের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করিলে জমিদার তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারেন এবং কোন কোন স্থলে প্রজাকে তাহার জমি হইতে উৎখাত করিবারও অধিকারী হন।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জমিতে প্রজার স্থায়ী স্বত্ব না জন্মিলে তাহার অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। কারণ স্থায়ী ও পূর্ণ স্বত্ব না পাইলে প্রজা জমির উন্নতিসাধনে যত্নবান হইবে না।

তাহার জমিই কৃষকের প্রধান স্থাবর সম্পত্তি। এই সম্পত্তির মূল্য যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই তাহার অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে যদিও প্রজাস্বত্ব হস্তান্তর-যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তথাপি জমির মূল্যের একাংশ জমিদারের পকেটে চলিয়া যায়। প্রজাস্বত্ব স্থায়ী নহে বলিয়া উহার মূল্যও কম হয়। জমিতে যদি প্রজার কায়েমী স্বত্ব থাকিত তবে তাহার মূল্য খোৎ স্বত্ব অপেক্ষা যে অনেক বেশী হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাকে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া দরকার এবং তাহার দেয় খাজানাও মোকররী হওয়া আবশ্যক। কেবল শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অথবা জমিদার কর্ত্তৃক জমির কোনও উন্নতি সাধিত হইলে খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে এরূপ বিধান থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু জমিতে প্রজার স্থায়ী স্বত্ব জন্মিলে একটা বিপদের আশঙ্কা আছে। অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী কৃষক হয়ত এই স্বত্বের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। অভাবে পড়িয়া অনেকে হয়ত যখন তখন জমি হস্তান্তর করিয়া ফেলিবে অথবা অলসতা-নিবন্ধন বা বিলাসিতার জন্য জমি নিজে চাষ না করিয়া অপর লোককে বিলি করিয়া দিবে। এরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিলে তাহার যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করা যায়, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক নিজের স্বার্থ বুঝিতে সক্ষম হইবে এবং বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত নিজের জমি হস্তান্তর বা প্রথার হাতে বিলি করিবে না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন একটু সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে।

কৃষকের দরিদ্রতার দ্বিতীয় কারণ তাহার দখলী জমির

অন্নতা। প্রত্যেক প্রজার অধিকৃত জমির পরিমাণের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক-স্থলেই তাহার জমির পরিমাণ অতি সামান্য—এত সামান্য যে তদ্দ্বারা অনেক পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। যে পরিবারের ১০ বিঘা জমির দরকার তাহাদের হয়ত ৫ বিঘা জমিও নাই। জমির পরিমাণ যথেষ্ট নয় বলিয়া অনেক কৃষক জমির আয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, অথবা জমি বিক্রয় করিয়া সাধারণ শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। এই সমস্যাটি বর্ত্তমান সময়ে ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

জমি অল্প হইবার প্রধান কারণ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি। প্রত্যেক গ্রামের হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এক পুরুষ পূর্ব্বে তথায় কৃষকের সংখ্যা যত ছিল বর্ত্তমানে অনেকস্থলেই তাহা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই প্রকারের বৃদ্ধি স্বাভাবিক। কোনও কৃষকের মৃত্যু হইলে তাহার যখনী জমি তদীয় পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। মুসলমান সমাজে কন্যাগণও এই ভাগ প্রাপ্ত হয়। কাজেই উক্ত কৃষক নিজে যতটা জমি ভোগ করিত তাহার প্রত্যেক পুত্র তদপেক্ষা অনেক কম জমি ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে জমি বিভক্ত হইয়া পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইয়া উঠিতেছে।

এই উত্তরাধিকারসূত্রে জমি বিভাগের কোনও প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং এ আইন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র ও বহুকালাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এই সকল বিধানের পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের চেষ্টা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে এরূপ প্রতিবাদ হওয়া সম্ভব যে, কোন গবর্ণমেণ্টই ঐ প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এমন কতকগুলি বিধান করা যাইতে পারে, যাহাতে কোনও কৃষক-পরিবারের জমি সমস্ত সেই পরিবারের হস্তচ্যুত না হয়। যদি এরূপ বিধান করা যায় যে, পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি তাহার অংশের জমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই পরিবারের কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিতে প্রস্তুত হয় তবে তাহার নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে, তাহা হইলে ইহার কতকটা প্রতিবিধান হইতে পারে।

উত্তরাধিকারসূত্রে বিভক্ত হওয়াতেই যে কৃষকের অধিকৃত জমির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে তাহা নহে। অন্যান্য কারণেও অনেক জমি ক্রমশঃ কৃষকের হস্তচ্যুত হইয়া অকৃষকের হস্তে পড়িতেছে এবং তজ্জন্য অনেক কৃষক ভূমিহীন হইয়া এক্ষণে শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অনেক কৃষক দারিদ্র্যবশতঃ ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া ঋণপরিশোধার্থ নিজের জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় অথবা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে উত্তমর্ণ আইনের সাহায্যে সেই জমি নিজেই ক্রয় করিয়া লয় অথবা অপরের নিকট বিক্রয় করে। এই ভাবে কত জমি যে প্রতি বৎসর কৃষকের হস্তচ্যুত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

উপরোক্ত অবস্থার প্রতিকার-সাধন সহজসাধ্য নহে। যতদিন বঙ্গের কৃষককুল দারিদ্র্যভারে নিষ্পীড়িত থাকিবে ততদিন ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার অসম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে কোনও প্রতিকারের চেষ্টা করিলেও তাহাতে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি এরূপ বিধান করা যায় যে, প্রজার জমি হস্তান্তরের অযোগ্য হইবে, তাহা হইলে উহা প্রজার পক্ষে লাভজনক না হইয়া বরং ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিবে। কারণ প্রজার জমি হস্তান্তরের অযোগ্য হইলে তাহাতে প্রজার পূর্ণ স্বত্ব থাকে না এবং জমির মূল্যও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। পূর্ব্বে প্রজাস্বত্ব আইনের এরূপ বিধান ছিল যে, জমিদারের সম্মতি ব্যতীত প্রজাস্বত্বের জমি কেহ হস্তান্তর করিতে পারিত না। বর্ত্তমানে তাহা সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও জমির সমস্ত মূল্য প্রজা প্রাপ্ত হয় না, কতক অংশ জমিদারকে দিতে হয় এবং জমিদার নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিতে প্রস্তুত হইলে তাহাকেই সেই জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। এই বিধানটি প্রজার পক্ষে ক্ষতিকর এবং এই কারণে বহু জমি কৃষকের হস্তচ্যুত হইয়া অকৃষকের হস্তে পড়িতেছে। যদি এরূপ বিধান হয় যে, কৃষকের বিক্রীত জমির সমস্ত মূল্য কৃষকই প্রাপ্ত হইবে

এবং বিশেষ স্থল ব্যতীত কোনও জমি অকৃষকের হস্তে যাইতে পারিবে না—তাহা হইলে কৃষকদের অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধন হইতে পারে।

উপরে যে দুইটী অবস্থার কথা লিখিত হইল ইহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রের যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়টী দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং সম্ভবপর হইলে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন পূর্ব্বক ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কি উপায়ে এই অবস্থার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যদি দেখা যায় যে, কোন গ্রামে অকৃষকের অথবা ধনী প্রজাদের হস্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি সঞ্চিত হইয়াছে অথচ সেই গ্রামে দরিদ্র কৃষকগণ ক্রমশঃ জমিহীন হইয়া পড়িতেছে, তখন রাষ্ট্র সঙ্গত মনে করিলে সেই অতিরিক্ত জমি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া দরিদ্র কৃষকের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিতে পারে।

হয় ত কোন গ্রামে লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অল্প এবং তাহারই নিকটবর্ত্তী অপর গ্রামে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ অধিক। এরূপ অবস্থায় প্রথমোক্ত গ্রামের লোকেরা যাহাতে শেষোক্ত গ্রামে যাইয়া বসবাস পূর্ব্বক অতিরিক্ত জমির আবাদ করিতে পারে এরূপ করাও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটী সঙ্ঘ স্থাপিত হইলে ঐ সঙ্ঘ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, অথবা কতকগুলি গ্রাম একই জমিদারের এলাকায় থাকিলে জমিদারও এইসকল ব্যবস্থা করিতে পারেন।

যদি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জমি অপ্রাপ্য হয় তবে জমিবিহীন কৃষকদিগকে দূরবর্ত্তী স্থানে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রজাগণ নিজেদের পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইতে প্রায় অনিচ্ছুক হয়। দূরবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে ত তাহারা কেমন একটা ভয় বা আশঙ্কার ভাবই পোষণ করে। এই সংস্কারগত অনিচ্ছা, ভয় বা আশঙ্কা দূর করাও রাষ্ট্র এবং সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি যেলাতে লোক-সংখ্যার অনুপাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অতি অল্প এবং অনেক কৃষকের আদৌ জমি নাই। এজন্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে হয়। পক্ষান্তরে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও আসাম প্রদেশে বহু জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। লোকাভাবে ঐ সকল জমির চাষ হয় না। এক্ষণে যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কতক জমিহীন দরিদ্র কৃষক ঐ সকল স্থানে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, তবে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, অথচ পতিত জমিগুলিও ফলপ্রসূ হইয়া উঠে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে কত লোক সুদূর আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছে, অথচ আমাদের দেশের লোক এক যেলা হইতে অপর যেলায় যাইতেও অনিচ্ছুক। এই কুসংস্কার দূর করিতে হইলে স্থানান্তরগামী প্রজাকে কতকগুলি সুবিধা দিতে হইবে, এবং প্রথমাবস্থায় কিছু মূলধন না দিলে তাহার পক্ষে স্বস্থান ত্যাগ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ উদ্যোগী না হইলে কোন ফল হইবে না।

কৃষকের দরিদ্রতার তৃতীয় কারণ এই যে, এদেশের কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধনের জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই। দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে উহার অর্থোৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। এই অর্থোৎপাদন দুই প্রকারে হইতে পারে—প্রথমতঃ কৃষি দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ শিল্প দ্বারা। শিল্প সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছুই বলিব না। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি-কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে, যেখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, তথায় কৃষিসম্পদ্ বৃদ্ধির নিমিত্ত যে বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে দেশের লোক নিতান্ত উদাসীন, গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কাজেই এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কৃষিকর্ম্মের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। পূর্ব্বে কোন জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত এখনও প্রায় সেই পরিমাণ শস্যই উৎপন্ন

হইতেছে। বরং কোন কোন স্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মান্ধাতার আমল হইতে আমাদের কৃষকগণ একই প্রণালীতে জমির চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞানের এত বিস্তার সত্ত্বেও বঙ্গদেশে কৃষিকর্ম্মের কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্কার-সাধন হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর, অজ্ঞ। তাহারা যে কৃষিকার্য্যের কোনও নূতন তত্ত্ব বা প্রণালী উদ্ভাবন করিবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেকে আবার কৃষিকর্ম্মকে হেয় বলিয়া মনে করেন। আজ যদি তাঁহারা অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে ব্রতী হন তবে শীঘ্রই উহার সাধন হইতে পারে।

আজকাল ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে কৃষি-বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের বলে ভূমিকর্ষণের অনেক নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জমি গভীরভাবে কর্ষিত হয় বলিয়া তাহাতে ফসলের পরিমাণ সাধারণ উপায়ে কর্ষিত ভূমি অপেক্ষা ২।০ গুণ অধিক হইয়া থাকে। তারপর বিবিধ প্রকারের সার ব্যবহারেও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। দুই চারিজন যুবক বিদেশ হইতে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া এদেশে আগমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এদেশীয় কৃষিকার্য্যের কোনও উন্নতি সাধিত হয় নাই। ইঁহাদের অনেকেই গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করিতেছেন। স্বাধীনভাবে কৃষি-কার্য্যের অনুশীলন দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন অথবা দেশীয় কৃষকদিগের মধ্যে উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা অতি অল্পই সাধিত হইয়াছে।

এ দেশের গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতকটা চেষ্টা না করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণ চেষ্টা বিশেষ সুফল প্রসব করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর হইল বিহারের অন্তর্গত পুষাতে একটী কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এই বিদ্যালয়টী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। তথায় যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ঠিক এদেশের উপযোগী হাতে কলমে শিক্ষা অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে তথায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা অল্প। যাহারা শিক্ষান্তে করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই চাকুরীর জন্য লালায়িত। কর্ম্মক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা অতি অল্প লোকেরই আছে। কাজেই উচ্চ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা অনেকাংশে বিফল হইয়াছে।

তারপর নানাস্থানে এগ্রিকালচারাল স্কুল অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টাও সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট একটী কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিভাগ হইতে কতিপয় স্থানে কয়েকটী কৃষিশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কৃষিশালায় কৃষিবিষয়ক বিবিধ পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রত্যেক কৃষিশালার সংসৃষ্ট কৃষি বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ারও অল্পাধিক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব আয়োজন এবং অর্থব্যয় সত্ত্বেও বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কৃষিকর্ম্মের উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও কতকগুলি মোটা মাহিয়ানার লোক কলমপেষাগণের অর্থে পুষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় কৃষকগণের কতটুকু উপকার হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। ইঁহারা সাধারণতঃ সহরে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাস করেন, কদাচিৎ মফস্বলে পদার্পণ করেন। সুদূর পল্লীবাসী গ্রাম্য কৃষকগণের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে।

শুধু তাহাই নহে, এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আচরিত পদ্ধতিই এজন্য দায়ী। গ্রাম্য কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া অথবা পরীক্ষালব্ধ নূতন তথ্যগুলি তাহাদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদিগকে উহা গ্রহণে ব্রতী করা—এই সকল কার্য্যের কোনও সুব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। পক্ষান্তরে কৃষক-

দিগের মধ্যেও কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করা; বা কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করিবার আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। আমাদের অজ্ঞ কৃষকবৃন্দ সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী। কোনও নূতন বিষয়ের উত্থাপন হইলেই তাহারা উহা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহাদের মতে পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃষকদের চিত্ত হইতে এই সকল সংস্কার দূর করিতে হইবে। ইহা কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সম্ভবপর নহে। গ্রামের মোড়ল, তালুকদার ও জমিদারগণ এবং কৃষকদিগের উপর যাহাদের প্রভাব আছে এরূপ লোকেরা চেষ্টা করিলেই এই কুসংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে পারে। সাধারণ শিক্ষার বিস্তারও এজন্য একান্ত আবশ্যক। সকলের উপর হাতে কলমে পরীক্ষা। কোনও নূতন বিষয় হাতে-কলমে পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারিলে সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ বা আশঙ্কার অবসর থাকে না।

সংপ্রতি পল্লীগ্রামস্থ প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার একটী প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যেরূপ আয়োজনের দরকার তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সহজ-সাধ্য বলিয়া মনে হয় না। কৃষিবিদ্যা যদি মুখস্থ করার বিষয় হইত তবে তাহা শিক্ষা দেওয়ার সহজেই ব্যবস্থা করা যাইত, কিন্তু এই বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষা করিতে হয়। কাজেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জমি এবং উক্তজমি আবাদ করিবার জন্য সরঞ্জাম থাকা দরকার। ইহা বহুব্যয়সাধ্য। তারপর কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। সেরূপ শিক্ষক বর্ত্তমানে দুর্লভ। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিদ্যালয়ে যেসকল লোক শিক্ষালাভ করিয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয় তাহাদের সংখ্যাও অল্প এবং তাহারা প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষা দিতে সক্ষম কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে।

বর্ত্তমানে প্রত্যেক বা অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে, কতকগুলি নির্ব্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ১০।১২টী গ্রাম লইয়া একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তথায় একটী কৃষি-মূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কৃষক-সন্তানগণ তথায় কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এরূপ বিদ্যালয়ে বায়-নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক হইবে, জমিদারগণকেও এরূপ বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিতে বাধ্য করা দরকার এবং গ্রামা কৃষকগণ হইতেও কিছু সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে কেবল কৃষি-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি শিক্ষা দিলে চলিবে না, স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্যকরী শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সংস্রবে একটী কৃষিসঙ্ঘ বা কৃষি-সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। উক্ত সমিতি উহার এলাকাধীন স্থানের কৃষি-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত তথ্য-সমূহ এই সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক কৃষকগণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে। স্থানীয় কৃষির উন্নতিসাধনার্থে এই সঙ্ঘ আরও অনেক প্রকারের কার্য্য করিতে পারেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধন সম্পর্কে জমিদারগণ যেন তাঁহাদের দায়িত্ব কখন বিস্মৃত না হন। স্বার্থের দিক দিয়াও তাঁহাদের এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ কৃষি-বিদ্যার আলোচনার দ্বারা যদি স্থানীয় কৃষির উন্নতি-সাধন হয় এবং তাহারই ফলে জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু এই স্বার্থদৃষ্টি ব্যতীতও কেবল প্রজাবর্গের হিতের নিমিত্তই জমিদারদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

এই প্রশ্নটী বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে বুভুক্ষু লোকদিগের অন্ন-সংস্থানের পক্ষে দেশের ধনবৃদ্ধির যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই ধনবৃদ্ধি কেবল কৃষি ও শিল্পের উন্নতিদ্বারাই হইতে পারে। আজকাল চারিদিকে যেরূপ কাঠের প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহাতে কোনও দেশের শিল্পবৃদ্ধি সহজ নহে, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই আমরা কৃষির উন্নতিসাধন করিতে পারি। বর্ত্তমানে যে ক্ষেতে ১০ মণ ধান

জন্মে যদি উৎকৃষ্ট কৃষি-পদ্ধতির প্রচলন করা যায়, তাহা হইলে ১৫।২০ মণ ধান উৎপন্ন হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে উহার মূল্যও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এই প্রকারে বিবিধ উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধন করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে পারে।

এক্ষণে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বনীয় আমরা তাহাই কতকটা নির্দ্দেশ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে কোন্ জমিতে কোন্ শস্য বপন করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় তাহাই স্থির করিতে হইবে। কৃষিবিভাগের যোগে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের প্রস্তাবিত কৃষি-সঙ্ঘ যদি পরীক্ষা দ্বারা কোন জমিতে কি শস্য এবং কোথায় কি নূতন শস্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দেয় এবং তৎসম্বন্ধে কৃষকদিগকে উপদেশ দেয় তবে তাহাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

কোন্ জমিতে কোন্ শস্য উৎপাদন করিতে হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইলে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ আবশ্যক, কিন্তু উৎকৃষ্ট বীজ কৃষকেরা সহজে সংগ্রহ করিতে পারে না, কোন্ বীজ উৎকৃষ্ট তাহাও তাহারা অবগত নহে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ যত্নবান্ হইলে কৃষকদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ সহজ হইতে পারে। বর্ত্তমানে কৃষি-বিভাগ হইতে বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কৃষক-দিগের পক্ষে তাহা দুষ্প্রাপ্য। সহরে যাইয়া বীজ কিনিয়া আনা গ্রাম্য কৃষকের পক্ষে সহজ নহে। যদি কৃষিবিভাগ হইতে প্রেরিত লোক গ্রামে আসিয়া কৃষকদিগের নিকট বীজ বিক্রয় করিয়া যায় অথবা যদি প্রস্তাবিত কৃষি-সমিতি সহর হইতে বীজ আনাইয়া কৃষকদিগের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তবে সুবিধা হইতে পারে। ইউনিয়ান বোর্ডের উপরও এ কার্য্যের কতক ভার দেওয়া যাইতে পারে।

তারপর জমির উত্তমরূপে কর্ষণ আবশ্যক। আমাদের দেশে জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হয় না, এজন্য ফসলও অতি অল্পই পাওয়া যায়। গভীরভাবে কর্ষিত হইলে জমিতে প্রচুর শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। এই গভীর কর্ষণের জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে হইলে এক সঙ্গে বহু জমির দরকার হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া উহাতে কলের লাঙ্গল চলিতে পারে না। তবে প্রচলিত লাঙ্গলের উৎকর্ষ-সাধন একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ কৃষিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ-গণের চেষ্টা ব্যতীত কোন ফললাভের আশা করা যায় না। উৎকৃষ্ট লাঙ্গল উদ্ভাবিত হইলে তাহা কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়েও কৃষি-সমিতি-সমূহ দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে।

চাষের বলদ উৎকৃষ্ট না হইলে উৎকৃষ্ট লাঙ্গলও অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারিবে না। এজন্য চাষের বলদের উন্নতি-সাধন আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের কৃষকগণ অত্যন্ত উদাসীন। যে কোন প্রকারের বলদ হইলেই তাহারা লাঙ্গলে জুড়িয়া দেয়, ফলে ভূমির কর্ষণও তদনুরূপই হইয়া থাকে। বলদগুলির উন্নতি-সাধন করিতে হইলে উহাদিগকে প্রচুর খাদ্য দিতে হয়। কিন্তু আজকাল গোচারণের ভূমির অভাব বশতঃ ইহাদের প্রায়ই খাদ্যাভাব ঘটিতেছে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ বিধান হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের জন্য কতক ভূমি আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ অথবা গ্রাম্য কৃষিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক চাষী বলদের ও দুগ্ধবতী গাভীসকলের নিয়মিত পরীক্ষা হওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে গাভী ও বলদ এদেশের লোকের জীবনধারণের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে উহারা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হইলেও রাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের রক্ষা ও উন্নতিসাধনের জন্য আবশ্যকমত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

জমিতে উপযুক্ত সার দিলে অনেকস্থলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারে অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমিতেও প্রচুর শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ সার দিতে হয়, কোন্ শস্যের পক্ষে কোন্ সার উপযোগী তাহা সাধারণ কৃষকদিগের অজ্ঞাত। কোন্ সার কি প্রকারে তৈয়ার বা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা অনেক কৃষকই জানে না। এবিষয়ে কৃষিবিভাগ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিবিভাগের

কর্ম্মচারিবর্গ যদি গ্রামে আসিয়া কৃষকদিগকে ক্ষেত্রে সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং কোন্ জমি বা কোন্ শস্যের পক্ষে কোন্ সার উপযোগী, কি প্রকারে সার প্রস্তুত এবং ব্যবহার করিতে হয় এসকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া যান, তবে কৃষকদিগের অজ্ঞতা কতকটা দূর হইতে পারে। কৃষি সমবায়-সমিতি সকলও এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারে।

যে সকল স্থলে জলসেচনের দরকার তথায় আবশ্যকীয় খাল পুকুর ও কূপাদি খননের কাজ জমিদারের উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে। জমিদার অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলে প্রজাগণের সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট অগ্রিম টাকা দিয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিলে তৎপর জমিদারের নিকট হইতে কতকটা খরচ আদায় করিতে পারেন।

কখন কখনও অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে ক্ষেতের শস্য নষ্ট হইয়া যায়। তখন খাদ্যদ্রব্যের অভাব বা দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ দেশে হাহাকারধ্বনি উঠিত হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি যে কেবল ভারতবর্ষেই হয় তাহা নহে, সব দেশেই এ প্রকারের দৈব উৎপাত ঘটিয়া থাকে। দৈব প্রতিকূল হইলেও অন্যান্য দেশে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু এদেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সাধারণতঃ কোনও চেষ্টাই করা হয় না। অজ্ঞ নিরক্ষর কৃষককুল কেবল অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়া অলসভাবে বসিয়া থাকে। অনাবৃষ্টি হইলে জলসেচনাদি দ্বারাও শস্য রক্ষা করা যাইতে পারে, অতিবৃষ্টি হইলে জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এরূপ চেষ্টা আমাদের দেশে অতি অল্প স্থলেই হইয়া থাকে, কাজেই এদেশে প্রকৃতি একটু প্রতিকূল হইলেই যে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

তারপর সময় সময় চারাগাছের অনেক রোগ জন্মে, অনেকস্থলে পোকায় শস্য কাটিয়া ফেলে, পতঙ্গাদিতে শস্য নষ্ট করে—এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইলে আমাদের কৃষকগণ তাহার কোনও প্রতিকার খুঁজিয়া পায় না। এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে সংবাদ পাওয়া মাত্র কৃষিবিভাগ হইতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের আক্রান্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রতিকারের উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করা ও কৃষকগণকে সদুপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনও স্থলে বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই স্থানীয় কৃষকসমিতি যদি গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগে সংবাদ প্রেরণ করেন তবে শীঘ্র উহার প্রতিকার হইতে পারে।

উপরে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের যে সকল উপায়ের কথা লিখিত হইল তৎসম্বন্ধে প্রজাবর্গ, জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট—ইহারা একযোগে সমবেত শক্তি প্রয়োগ না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কৃষিসজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ ও প্রজাবর্গের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর কার্য্যও করিতে পারে। এই প্রার্থনীয় সহযোগ যত শীঘ্র স্থাপিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

কিন্তু দেশের শিক্ষিত যুবকগণ কৃষিকার্য্যে ব্রতী না হইলে ইহার আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। কৃষিকার্য্যকে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা হীন কার্য্য বলিয়া মনে করেন। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত। যে কার্য্য দ্বারা দেশের খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা কখনও হীন হইতে পারে না। তারপর কৃষিকার্য্যে কোনও ছল প্রতারণা নাই—নিজের হাতে ভূমি কর্ষণ করিয়া নিজের ও পরিবারের অন্ন সংগ্রহ, পরের দাসত্ব না করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন—ইহার চেয়ে মহৎ কার্য্য আর কি আছে? কাজেই উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর যুবকদিগের কৃষিকার্য্য অবলম্বন করার কয়েকটী প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ তাহাদের শরীর কোন প্রকার কঠিন পরিশ্রমের অযোগ্য, তাহাদের মধ্যে অল্প লোকই রৌদ্রে পুড়িয়া কি বৃষ্টিতে ভিজিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম। তারপর শিক্ষিত যুবকদিগের এই কার্য্যে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নাই, অনেকেরই কৃষিকার্য্যের উপযোগী কোন জমি নাই, অনেকে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না। এসকল প্রতিবন্ধক কি প্রকারে দূর করা যাইতে পারে তাহা আলোচনা করা দরকার।

(কল্যাণী—কলিকাতা)

৩৩ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে কলিকাতা অমিয়চাঁদ প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত নাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

পৌষ—১৩৩৮ ৬ষ্ঠ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'জ্যেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—ভয় আমার দিকে দিকে বিঘোষ-কেতন উড়াতে।

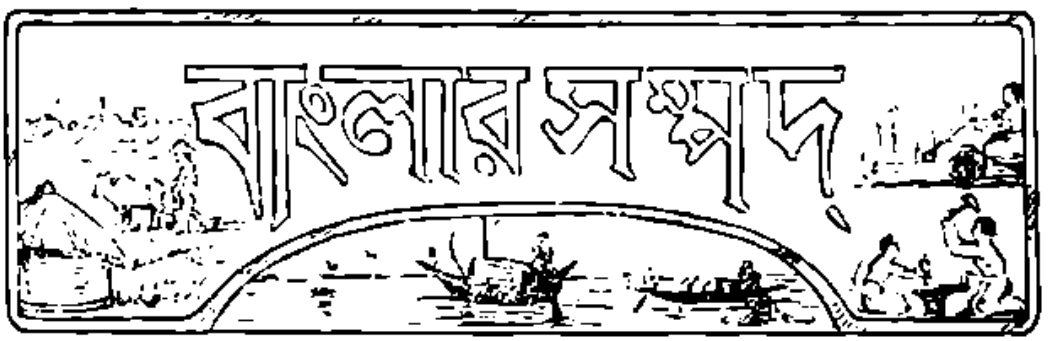

বিক্রমপুরের রূপান্তর

খরস্রোতা পদ্মা ভীষণ ক্রমে বিক্রমপুর ধ্বংস করিতেছে। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের রাজধানী দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত রাজনগরে রাজার বহু কীর্ত্তি—পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, একুশ রত্ন—অত্যুচ্চ মঠসমূহ, মণিসাগর, হুর্গ সাগর, বিন্দুসাগর, প্রভৃতি সরোবর, স্থপতি কলা বিদ্যার অশেষ কারুকার্য্য-খচিত সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি-পরিশোভিত রাজ-নিকেতন ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ উদরসাৎ করিয়া পদ্মা ঐ অঞ্চলে কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী সময়ে বিক্রমপুর-মধ্যে প্রবাহিত পদ্মা উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে স্বীয় বক্ষে ছোট বড় চর উৎপাদন করতঃ কতক কতক স্থল স্থলন পূর্ব্বক মূল (আসল) বহু স্থান বিনষ্ট করিয়াছে। এরূপে উত্তর বিক্রমপুরের কাওলিপাড়া, তারপাশা, দাতাল নগর, খলিকার হাট, বটেশ্বর, রামনেদ, সোহাগদল, ইদ্রাপাশা, কালীপাড়া, কমরপুর, রাজপুর, সৌহজঙ্গ, শ্রীধরপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, কেদারপুর প্রভৃতি বহু গ্রাম পদ্মা-গর্ভে নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত তারপাশা গ্রামে তৎকালে যে ষ্টীমার ষ্টেশনটি ছিল তাহা কোন কালে কত দূরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া তাদনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বহু স্থানান্তরে অপসারিত হইলেও বর্ত্তমানেও ঐ তারপাশা নামেই অভিহিত হইতেছে। কেদারপুর গ্রামস্থ ষ্টীমার ষ্টেশনটি সরিতে সরিতে ভাগ্যকূলে অপসারিত হইলেও পূর্ব্ব নামেই বর্ত্তমানেও অভিহিত হইতেছে। অধুনা পদ্মা-গর্ভে নিমজ্জিত ধ্বংস-প্রাপ্ত কমরপুর গ্রামে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ও প্রধান কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসন্ন সেন ও অন্যান্য বহু বৈদ্য কবিরাজ মহাশয়গণের জন্মভূমি ছিল। কালীপাড়া, তারপাশা, ইদ্রাপাশা প্রভৃতি গ্রাম বহু উন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। সৌহজঙ্গ লক্ষ্মীগঞ্জ বন্দর প্রসিদ্ধ কাষ্ঠবাজারের স্থান তাদনে ক্রমে সরিতে সরিতে হিজলার বাদকুনিয়ার মধ্যে

আসিয়া বহু গোলাগঞ্জ কারবারে পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে একটি প্রধান বিশিষ্ট কারবার বাণিজ্য প্রধান স্থান হইয়াছিল।

ইদানীং উত্তর বিক্রমপুরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পশ্চিম সীমা নারিসা আমরা হইতে পূর্ব্ব সীমা রাজবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২৫।৩০ মাইল ব্যাপিয়া পদ্মার উপকূলবর্ত্তী ছোট, বড়, প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু শত গ্রাম ১৩৩৮ সনের আষাঢ় প্রাবণ মাস হইতে ১৩৩৯ সনের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল মধ্যে পদ্মাকবলে কবলিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কদমতলখোলা, পাচনখোলা, উয়ারি, চর কোরহাটী, ভাওয়ার, তিলিজখা, সানিহাটী, মাওয়া, দিয়াগাঁও, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণগাঁও, তাতাটিয়া, আকিয়াবল, কলিকাল, রামকৃষ্ণপুর, চৌদ্দহাজারী, বহর, আটগণগাঁও, পাকিয়া, নগাঁও, তেলিরবাগ, ধনহুত্র চাচুরতলা (অন্যতম পীঠস্থান) বিষগাঁও, বানারি, বুরুলবাড়ী, বাহেরক, সাতক, সাহতা, রাজবাড়ী, বেহারপাড়া, দীঘিরপাড় প্রভৃতি বহু গ্রাম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৩৩৬ সনের শ্রাবণ মাস হইতে ১৩৩৮ সনের আশ্বিন মাস ও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান পদ্মায় ভাঙ্গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্রাহ্মণগাঁও।—বহু গ্রাজুয়েট জজ, মুন্সেফ, ডেপুটী, বিখ্যাত পত্রিকা-সম্পাদক, প্রাচীন জমীদার, নব্য জমীদার ও অন্যান্য বহু লোকের বসতি ছিল। গ্রামে একটি সব পোষ্ট অফিস, একটি হাইস্কুল ছিল। সব বিলুপ্ত।

সানিহাটী।—গ্রামে বহুসংখ্যক গ্রাজুয়েট, প্রফেসার ও ধনী লোকের বাস ছিল। একটি বাজার ও বহু রাজ-কর্ম্মচারীর আবাস স্থান ছিল। সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে।

লৌহজঙ্গ।—পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। চাউল, তৈল, কাঠ, টিন, লবণ প্রভৃতির বড় বড় গোলা, গঞ্জ, রাশি কারবার ছিল। মাছ শুকাইবার সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত। এখানে একটি পুলিশ থানা, সবরেজেষ্টরী অফিস, বড় পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ছিল, একটি হাই স্কুল ছিল কতক কতক গ্রামান্তরে সরিতেছে।

ধানকুনিয়া।—বিক্রমপুরের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ একটি হাট ছিল এবং এখানে সব জিনিষের বড় কারবার ছিল।

ভাওয়ার।—গ্রামে ৪।৬ বৎসর পূর্ব্বে কারুকার্য্য-খচিত একটি অত্যুচ্চ বিচিত্র মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা-কালে পদ্মা ১ মাইলের অধিক দূরে ছিল। এই মঠটি গত পূর্ব্ব বৎসর পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ হাট ছিল। তাতাটিয়া গ্রামেও একটি উচ্চ মঠ ছিল তাহাও বিলুপ্ত।

মাওয়া।—প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, একটি বাজার ছিল, বহু লোকের বসতি ছিল।

চৌদ্দহাজারী।—গ্রামে একটি উচ্চ মঠ ছিল।

কলিকাল।—গ্রামে উচ্চ-শিক্ষিত বহু ভদ্রলোক ছিল।

বিষগাঁও।—প্রসিদ্ধ, বর্দ্ধিষ্ণু সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। এখানে একটি গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি হাই স্কুল, একটি সব পোষ্ট অফিস, একটি বিশিষ্ট বাজার ও সম্পত্তি-সম্পন্ন বহু লোকের বাসস্থান ছিল। গ্রামের চিহ্নও নাই।

বানারী।—বহু ভদ্রলোকের বসতি স্থান, জমীদার বাড়ী, একটি পোষ্ট অফিস ও একটি হাইস্কুল ছিল। উহাদের কোন চিহ্নও নাই।

বহর।—উচ্চশিক্ষিত বহু ভদ্রলোকের বসতিপূর্ণ স্থান ছিল। গ্রামে একটি সাব পোষ্ট অফিস ও একটি প্রসিদ্ধ হাট ছিল।

বাহেরক, ধনহুত্র গ্রামে ভদ্রলোকের বাস ছিল।

তেলিরবাগ।—এই গ্রামের অধিকাংশ স্থান ভাঙ্গিয়া মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাস ও এস, আর দাস মহাশয়দিগের বিচি অট্টালিকা-শোভিত বাটীর অতি নিকটে পদ্মা আগমন করিয়াছে, অতিরিক্ত মধ্যেই সম্ভবতঃ উহা বিলুপ্ত হইবে। এই গ্রামে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি হাইস্কুল আছে।

চাচুরতলা।—বিক্রমপুরের চাচুরতলা সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ী প্রসিদ্ধ পীঠ স্থান। বিক্রমপুরবাসী সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কালীমাতার মন্দির ও প্রকাণ্ড বটগাছ যুক্ত পীঠস্থান কখনই পদ্মায় ভাঙ্গিবে না। কিন্তু কালক্রমে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। এই পীঠস্থানের বহু কিম্বদন্তি সবই বিলুপ্ত হইল। এখানে চাচুরতলা সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ছিল। এখন সব বিলুপ্ত।

রাজাবাড়ী।—বাঙ্গালা দেশের বিখ্যাত স্বাধীন বার ভূঁইঞার অন্যতম চাঁদ রায় কেদার রায়ের অতুল কীর্ত্তি রাজাবাড়ীর মঠ স্থপতি কলাবিদ্যার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত অত্যুচ্চ স্মৃতিসৌধ পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই মঠের চূড়ার অগ্রভাগ সুদূর চাঁদপুর সহর হইতে দৃষ্ট হইত। চাঁদরায়ের এই কীর্ত্তি-কাহিনী স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বিবৃত আছে। রাজাবাড়ী প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান ছিল। পুলিশ ষ্টেশন ও সবরেজেষ্টরী অফিস ছিল। এই এলাকার বহু স্থান সহ এখান পদ্মায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় থানাটি উঠিয়া গিয়াছে এবং সবরেজেষ্টরী অফিস টঙ্গিবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বীরিয়পাড়া।—বড় কারবারের স্থান। এখানকার হাট প্রসিদ্ধ ছিল বিক্রমপুরের মধ্যে প্রকাণ্ড মাছের আমদানি এখানে অধিক পরিমাণে হইত। বহু কাঠের ও অপর নানা জিনিষের কারবার ছিল। এই হাটটি ভাঙ্গিবার কালে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। এই হাটের কতক অংশ ছোট বড় বহু ঘর মালামাল জিনিষপত্র লোক-জনসহ অকস্মাৎ পদ্মাগর্ভে বহু পড়িয়া যায়। লোকজন বহু কষ্টে দাঁড়াইয়া ও অন্যের বহু চেষ্টায় রক্ষা পায়।

পদ্মা যে প্রকার ক্রিপ্রকারিতাসহকারে, উত্তর বিক্রম-পুরের সম্পূর্ণ দক্ষিণ পার্শ্ব উপকূলবর্ত্তী নারিলা, বাঘরা হইতে পূর্ব্বদিকে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল ব্যাপী স্থান বর্ত্তমানে প্রচণ্ডভাবে ভাঙ্গিয়া গ্রাস করিতেছে তাহা বিক্রমপুরের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। পদ্মার এই প্রচণ্ডতা নিবারণের কি কোন উপায় নাই? অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ মতে, গোয়ালন্দের পশ্চিম দিকে কি যে-কোন স্থানে পদ্মার স্রোতের বেগ প্রতিরোধপূর্ব্বক বিপথগামিনী করিতে পারিলে, কি অন্য যে কোন উপায়ে পদ্মার প্রচণ্ড বেগ প্রশমিত কি ধারণ করিতে পারিলে বহুত প্রতিকারের আশা করা যায়।

অপর দিকে বিক্রমপুরের উত্তর পার্শ্বস্থ কতক স্থান ব্যাপিয়া "ধলেশ্বরী" নদী প্রবাহিত। ইদানীং "ধলেশ্বরী" নদীও পদ্মাসহ প্রতিযোগিতায় বিক্রমপুর ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ তালতলা হাট ও বন্দর ভাঙ্গিয়া "ধলেশ্বরী" গর্ভে নিহিত হইয়াছে। তালতলার বাকী অংশ, কুমারালী, রাধপুরা, হটকটিয়া প্রভৃতি অনেক গ্রাম ধলেশ্বরীর প্রকোপে ধ্বংস হইতেছে। ইহাতে শ্রীনগর হইতে মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাতায়াত যে একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা ছিল, তাহার তালতলা হইতে পূর্ব্বদিকে ৩।৪ মাইল পরিমাণ ধ্বংস স্থান হইয়া গিয়াছে।

পদ্মার ধ্বংসলীলায় বহু মানব-পরিবার যে কি ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। লক্ষপতি ভৈরবদশা-গ্রস্ত হইয়াছে, মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থগণ সর্ব্বস্বান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। যাঁহাদের কিছু টাকা পয়সা আছে তাঁহারা গ্রামান্তরে বাসোপযুক্ত জায়গা কিনিয়া বাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেছে। যাঁহাদের টাকা পয়সার সন্ধান নাই তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের বাড়ীর ছিটাল, কাইটাল, কোলা, খামরিতে অস্থায়িভাবে ঘর, বাধা করিয়া অবস্থান করিতেছে। বহু আশ্রয়হীন নিঃস্ব পরিবার বিক্রমপুরে আশ্রয়-সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া বিক্রমপুর ছাড়িয়া অন্য জেলায় এবং বহু পরিবার সুদূর আসাম প্রদেশে যাইয়া চিরতরে একপ্রকার নির্ব্বাসিতের মত অবস্থানের বন্দোবস্ত করিতেছে।*

শ্রীঠাকুরদাস নায়ক, ডাক্তার
পোঃ বৌলতলী, ঢাকা
(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

বৌলতলীর আর্থিক যৎকিঞ্চিৎ

বৌলতলী, বিক্রমপুর, ঢাকা। পাটের দর না থাকায় এ বৎসর যথাকালে তিলের চাষ খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছিল এবং বহুদিন যেসব জমিতে তিলের চাষ হয় নাই সেই সকল জমিতে তিলের চাষ হওয়ায় তিল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ অকালে বৈশাখ মাসে

* এই সঙ্গে আমরা নূতন চরসমূহের নির্দ্দেশ দেখিলে সুখী হইতাম। আশা করি কেহ সে বিষয়ও আমাদিগকে লিখেন। আঃ উঃ সম্পাদক।

বর্ষাবারিতে মাঠ ঘাট, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত হওয়ায় অপকারক্ষম তিল মরিয়া যায়, অপেক্ষাকৃত উঁচু জমির তিল কোন কোন অংশে রক্ষা পাইয়াছে। মোটের উপর ।০ আনা পরিমাণ তিল গৃহস্থগণ পাইয়াছে। ইহাতে তিলের প্রতি লোকের যে একটা আগ্রহ হইয়াছিল তাহার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে।

আশু ধান্য এবার লোকে কিছু কিছু পাইয়াছে। হৈমন্তিক (আমন) ধান্যের অবস্থা এবার বৌলতলী, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ আশাপ্রদ দেখা যায়। বহুদিন এমন আমন ধান জন্মিতে দেখা যায় নাই। এখনও ধানের অনেক রিপু আছে। যদি ভগবান রক্ষা করেন গৃহস্থের ভরসার কথা। এতদঞ্চলে এবার পাটের চাষ বেশী হয় নাই। এই অঞ্চলের পাট আগেই তৈয়ার হয়। লোকে ঘর পায় নাই; ৺ টাকা ৺০ টাকা দরে সব পাট বিক্রী হইয়াছে। বিক্রমপুরের মুন্সীগঞ্জ সেরাজদীখা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় বর্ষান্তে পাট তৈয়ার হয়। ঐ অঞ্চলে এখন পাট ৪০।৪৲ টাকা দরে বিক্রী হইতেছে।

দেশে বড়ই অর্থাভাব। বাজার দর সুবিধাজনক হইলেও লোকে ইচ্ছানুরূপ খাইতে পায় না। পদ্মার ইলিশ মাছের আমদানি এবার প্রচুর, সময় সময় খুব সস্তা হয়। আমন ধান্য টাকায় ৵৮-৵৯ সের দরে বিক্রীত হয়। বালাম চাউলের দর ৪।০, ৪৷০ টাকা মণ। দেশী ভাল চাউল ৩৷০।৪৲ টাকা মণ। দুগ্ধ ৵০—৵১০ পয়সা পাকা সের। সর্ষপ তৈল ৵০ আনা সের। লবণ ৵১, ৵৸ দরে এ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইত, কিন্তু লবণের দর এখন ৵১০, ৵১৫। জল-প্লাবনে লোকের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। ভদ্রাসনকারী ও বহু বৃক্ষাদি নষ্ট হইয়াছে। তরকারীর দর কিছু চড়া।

এবার এই বর্ষাকালেই বিক্রমপুরের প্রায় সমুদয় অঞ্চলেই কলেরা রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। এতদঞ্চলে প্রায় গ্রামে গ্রামেই ২।৪ জন কোন কোন স্থানে ২৫।৩০ জন লোক কলেরার শমনসদনে প্রেরিত হইতেছে।

বৌলতলীর ইউনিয়ন বোর্ড বেঞ্চ কোর্ট তালরূপ চলিতেছে। এখানে বিস্তর লোকদ্বারা বিচার হইতেছে। এবৎসর বৌলতলী ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌শন গত ২১শে ভাদ্র হইয়া গিয়াছে। ভোটার কর্ত্তৃক ৬ জন মেম্বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট মনোনয়নে ৩ জন মেম্বার এখনও নিযুক্ত হন নাই। ঐ ৩জন নির্ব্বাচিত হইলে প্রেসিডেণ্ট ও তৎপর কোর্টের বিচারকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। এবার পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

পল্লী ধ্বংস নিবারণের উপায়

হরিপুর প্রভৃতি বড় নদীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি ক্রমেই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। জনগণ-পরিপূর্ণ এই পল্লীসমূহ এক্ষণে নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে জীর্ণ কুটীরবাসী অস্থিচর্ম্মসার ক্ষীণজীবী মানব এখনও পরিলক্ষিত হয়। এই জনশূন্যকীর্ণ গ্রামের অধিবাসিগণ অতিশয় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় কোন রকমে জীবন যাপন করিতেছে, এইবার অদৃষ্টের দারুণ পরীক্ষার সম্মুখে পড়িয়া বুঝিবা তাহারা একেবারে ধ্বংসে হইয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ পল্লীসমূহ পূর্ব্বে এ প্রদেশের অতি গৌরবের স্থান ছিল, এ স্থানে দরিদ্রতার কোনও চিহ্নমাত্র ছিল না এবং এই গ্রামসমূহ এ প্রদেশের আনন্দ ও সুখের লীলাভূমি ছিল। বোধহয় এই সকল স্থান আর দশ বৎসরের মধ্যে ভীষণ বন্যজন্তুসঙ্কুল বিশাল জঙ্গলে পরিণত হইবে।

জঙ্গলপূর্ণ গ্রামের বাহিরে যতদূর কিছু পতিত জমি কিংবা যান পচা গভীর কর্দ্দমময় বিল অথবা অনুর্ব্বর মাঠ আছে। সেই সমস্ত জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাই এই গ্রাম-বাসীদের একমাত্র উপজীবিকা। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর অনাবৃষ্টির পর এবার যখন আষাঢ়ের মুষলধারায় শস্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন এই সব কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ভগবানকে শতমুখে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ক্রমে ধান্য পরিপক্কপ্রায় হইয়া উঠিল, আর কয়েকদিন পরেই ধান্য-কর্ত্তন আরম্ভ হইবে। এমন সময় অদৃষ্টের কি পরিহাস—এই ধান্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্র তিনদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জলপ্লাবিত হইয়া গেল! চতুর্থ দিবসে সমস্ত ফসল অতল জলে নিমজ্জিত হইল।

তারপর জলে থৈ থৈ! শস্তক্ষেত ত দূরের কথা, বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। ঘরের ভিতর মাচা করিয়া থাকা ভিন্ন কোন উপায় রহিল না। মধ্যে মধ্যে ভীষণ বিষধর সর্প কালান্তক যমের মত আক্রমণ করিতে লাগিল। দুঃখে কষ্টে ভয়ে এ প্রদেশের লোক একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। লোকে কর্ত্তব্যের ভার কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কেন এ মুখের গ্রাস ভগবান সহসা কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর লোকজনের যে কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইল তাহা মনুষ্যের পক্ষে অবর্ণনীয়।

বন্যাসঙ্কট সময়ে স্থানীয় সরকার পক্ষ হইতে এই দুঃস্থগণের জন্য সাহায্য আসিতে লাগিল কিন্তু তাহা অতি সামান্য।

সরকার পক্ষ হইতে বোধ হয় আর একটী ষ্টেট রিলিফের টাকা সাহায্য করিবেন। শুনিলাম ঐ টাকা দ্বারা চাটমহর হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত রাস্তা মেরামত করা হইবে। দেশের মধ্যে, বিশেষতঃ মফঃস্বলে ভাল রাস্তা একরূপ নাই বলিলেই চলে, সুতরাং ভাল রাস্তার প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল রাস্তা থাকিলেই চলে না। পানীয় জল, সুচিকিৎসা সুশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া চাই। এ প্রদেশের স্থানসমূহ ক্রমশঃ লোকশূন্য হওয়ায় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার হওয়া অতি প্রয়োজনীয়। হরিপুর ইউনিয়নের গ্রামসকল যেরূপ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সকলেরই জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কার্য্যে অনুমান চারি হাজার টাকার প্রয়োজন, সর্ব্ব-সাধারণের ইচ্ছায় ঐ পরিমাণ টাকা হইলে হরিপুর ইউনিয়ন-মধ্যগত গ্রামসমূহের জঙ্গল পরিষ্কার ও পুষ্করিণী সকলের সংস্কার করা যাইতে পারে। পরন্তু চাটমহর হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত রাস্তাও মেরামত করা সম্ভব হইবে। উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে সুবিধা হইতে পারে।

স্থানীয় রিলিফ কমিটী ক্রমশঃ জঙ্গলগুলি; পাঁচ বৎসরের জন্য ও মজা পুকুরগুলি দশ বৎসরের জন্য বিনা বন্দোবস্তে অস্থায়ী ইজারা দিবেন। মেম্বার অন্তে অস্থায়িকারিগণ তাঁহাদের ভিটি ও পুষ্করিণী ফেরৎ পাইবেন। মেয়াদকালে কমিটী হইতে ভিটিগুলির ও পুষ্করিণী সকলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ করিবার ও মৎস্য জন্মাইবার ব্যবস্থা করিয়া মূলধন উঠাইয়া লইবে। বেকার ও দুঃস্থদিগকে কাজ দেওয়া হইবে। মজুরীর হার রিলিফ রেট অনুযায়ী হইবে।

আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান। এই ইউনিয়নের শতকরা ৯৯ জন লোক কৃষি-উপজীবী। এখানে ক্রমে জঙ্গলের বিস্তার হওয়ায় বন্য শূকরের বিশেষ উপদ্রব হইয়াছে। কৃষকগণ যে শস্য উৎপন্ন করে তাহা নৈসর্গিক বিপদ আপদে রক্ষা পাইলেও উহা বন্যশূকরের হাত হইতে রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব জঙ্গল পরিষ্কার করা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক।

এই ইউনিয়নে জঙ্গল অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ম্যালেরিয়া, রক্তবমন, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি নানারূপ উৎকট পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া গ্রামবাসিগণকে ত্রাস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এরূপভাবে পীড়া বৃদ্ধি পাইলে এ প্রদেশ জনশূন্য হইবে। তখন রাস্তা দিয়া চলাচল করিবে কে?

এতদ্ভিন্ন বন্যজন্তু কর্ত্তৃক গবাদি পশুর সর্ব্বদাই প্রাণহানি হইয়া থাকে। এই প্রকারে এ প্রদেশের কৃষকগণ ক্রমেই সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

(সুরাজ—পাবনা)

নোয়াখালির চর

চর জমার ও চরভূবিলীতে প্রতি বৎসরই ৩০।৪০ ঘর লোক যাইয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোন শিক্ষিত পরিবার প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও রাস্তাঘাটের অভাবে, ডাক্তার কবিরাজের অভাবে তথায় যাইয়া বসতি স্থাপন করিতে সাহস করিতেছেনা। অবশ্য অনেক শিক্ষিত লোক নদীর কবলে বাড়ী ঘর হারাইয়া এখনে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছেন এক চরে যাইয়া বাড়ী ঘর করার ইচ্ছাও তাহাদের আছে। অথচ নানা প্রকার অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছেন। চর জমার, চর ভূবিলী ও চরে আবাদযোগ্য

হইতে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে এবং তিন লক্ষার টাকার অধিক স্থেছ আদায় হইতেছে। বার্ষিক গড়ে ২০০০৲ টাকা ঘাট ও খোঁয়াড় হইতে আদায় হইতেছে অথচ চরের লোকের চলিবার একটী রাস্তার ব্যবস্থা হইতেছেনা, রোগগ্রস্থায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিলেও একজন ডাক্তার কবিরাজ পাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছেনা, এ হেন স্থানে শত ইচ্ছা থাকিলেও কেহ বসতি স্থাপন করিতে পারেনা। গবর্ণমেণ্ট লোক চলাচল ও গরু মহিষ চলাচলের জন্ত কয়েকটি গোপাট রাখিয়েছেন সত্য, কিন্তু উক্ত গোপাটগুলি চাষের জমি হইতে ২ হাত ২½ হাত নীচু। জলের অভাবে চাষী জমির চাষ করিতে পারেনা অথচ গোপাটের উপর কোমর পর্য্যন্ত জল। মনে হয় যেন এক একটী নদী। গত ২।৩ বৎসর যাবৎ শুনা যাইতেছে যে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড চর অঞ্চলের রাস্তার জন্ত কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বৎসরই রাস্তা হইবে হইবে বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কিছুই দেখা যাইতেছে না। এবারও রাস্তা ঘাট বান্ধিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত, এখন হইতে যদি চরের রাস্তার প্রতি সুনজর না পড়ে তবে আর পড়িবে কবে? রাস্তা, স্কুল ও ডাক্তারখানার সুব্যবস্থা হইলে নিশ্চয়ই চরে লোকের বসতি অধিক পরিমাণে বাড়ীতে থাকিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অনেক শিক্ষিত লোকও ইহাদের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে। দরিদ্র কৃষক প্রজাবৃন্দ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রৌদ্রে জলিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া পতিত জমি চাষ করিয়া ও কষ্টপ্রকারে কষ্টিপ্রস্ত হইয়া চরের জমির উন্নতিসাধন করিতেছে এবং খাসমহাল ও ডিঃ বোর্ডের আয় বাড়াইতেছে, তাহাদের এত কষ্টার্জ্জিত অর্থে কতপ্রকার ভোগ-বিলাস চলিতেছে, অথচ তাহারা একটু সুবিধার সহিত চলাচল করিবার একটি রাস্তাও পাইতেছে না, মরিবার সময় একজন ডাক্তার কবিরাজও পাইতেছে না, এমনই তাহাদের ভাগ্যলিপি!

যদি চরঅঞ্চল ও চরসুবিলীর অবস্থিতির কাল ২০ বৎসর ধরা যায় (অবশ্য অনেক বেশী) তবে একটি আনুমানিক হিসাব করিলে উক্ত চরসমূহ হইতে নিম্নলিখিতরূপ আয় হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়?

রাজস্ব গড়ে বৎসর ১ লক্ষ টাকা হইলে ২০,০০,০০০৲ টাকা।

২। সেলামী বাবদ আয় ২০,০০০৲ টাকা।

৩। স্থেছ টাকা প্রতি ৴১০ হিঃ গড়ে বার্ষিক ৩১২৫৲ হিঃ ৬২৫০০৲ টাকা।

৪। ফেরিঘাটের আয় গড়ে বার্ষিক ২০০০৲ হিঃ ৪০০০০৲ টাকা।

১ম ও ২য় দফার আয়ের টাকাগুলি খাস মহাল বা গবর্ণমেণ্টের তহবিলে পড়িয়াছে।

৩য় ও ৪র্থ দফার টাকাগুলি ডিঃ বিঃ তহবিলে পড়িয়াছে। খাসমহাল কি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আয়ের টাকার পরিমাণ পরসাও উক্ত চরস্থের দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের জন্ত ব্যয় করিতে পারিয়াছেন কি? আমরা কি আশা করিতে পারি যে, অচিরেই খাসমহাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড চরস্থে রাস্তা ঘাট ও ডাক্তারখানার সুব্যবস্থা করিয়া লোকের বসবাসের পূর্ণোপযোগী করিয়া দিবেন। তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই যে উক্ত চরস্থে বহু লোকের বসতি স্থাপিত হইতে পারিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

চর জাহাজমারা চর অঞ্চলের একটি স্বহল পরগণি। উহাতে বাগটায়ার দোনা ও ছুধার দোনা নামক ছুইটি দোনা বা খাল আছে। উক্ত চরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দোনা ছুইটীরও উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানে উক্ত দোনাদ্বয় হওয়া যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা অবর্ণনীয়। ছুধার দোনায় বাঁধ দিবার জন্ত খাসমহাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে শত অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্তও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত দোনাটী বিশেষ ভাবে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ছুই পাড়ের জমি অনবরতই উদরস্থ করিতেছে। তাহাতে খাসমহালও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং দরিদ্র কৃষক প্রজাগণও মারা যাইতেছে। সর্ব্বদাই কৃষকগণকে লাঙ্গল, জোয়াল, দই, গরু, মহিষ ইত্যাদি লইয়া এপাড় ওপাড় যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু পার হওয়া যে কি ভয়াবহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্ত কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এই দোনা পার হইবার জন্ত লোককে প্রাণ হাতে লইয়া জলে নামিতে

হয়। উহারা কৃষক বলিয়া কি উহাদের জীবনের কিছুই মূল্য নাই? উহাদের শ্রমার্জ্জিত অর্থে যে খাসমহাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড পুষ্ট হইয়া আসিতেছে সেই খাসমহাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ কি ইহাদের জীবন-রক্ষার্থে হাজার খানেক টাকা ব্যয় করিয়া দোনাটীতে একটী বাঁধ দিয়া দিতে পারেন না? কৃষককুলের প্রতি এত অবহেলা ও অবজ্ঞা কেন? যে কৃষককুল দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়াও পতিত লোণা জমিতে সোণা ফলাইয়া ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের অন্নের যোগাড় করিতেছে, যে কৃষককুলের হাতে টাকা না থাকিলে ভদ্র অভদ্র ধনী দরিদ্র সকলের ঘরে হাহাকার পড়িয়া যায়, সে কৃষককুলের অভাব অভিযোগ মোচন করা, তাহাদের প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করা কি কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য নহে? এখন দুধার দোনায় একটি বাঁধ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দোনাটীর দুই মুখই খোলা, ইহাতে বাঁধ দেওয়া অতি সহজ। যে খালে বা নদীতে বাঁধ দ্বারা স্রোতের বেগ আটকাইতে হয়, সে খালে বাঁধ দেওয়া অবশ্য কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। কিন্তু যে খালের দুই মুখই খোলা সে খালে বাঁধ দিতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না। হাজারখানেক টাকা ব্যয় করিলে উক্ত দোনাটীতে একটি সুদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উক্ত দোনাটী বাঁধ দিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতির কোন কারণ নাই। যে পরিমাণ টাকা বাঁধ দিতে খরচ হইবে তাহার তিনগুণ টাকা আয় বাড়িবে। বাঁধের দুইদিকে দোনা ভরাট হইয়া বহু জমির উৎপত্তি হইবে। উত্তর হাতিয়া, কলাকোপা, সাবাজপুর, জালিয়াচর ইত্যাদি বহু স্থানের লোকের নোয়াখালী যাতায়াত করিবার সুবিধাজনক পথ জাহাজঘাটা অতিক্রম করা ব্যতীত অন্য পথ নাই। সুতরাং উক্ত চরের কৃষক ছাড়াও সর্ব্বদা নানা স্থানের যাত্রিগণেরও ঐ দোনাটী সাঁতরাইয়া পার হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কিন্তু উহাতে কুম্ভীর, হাঙ্গর ইত্যাদি নানা প্রকার জলজ হিংস্র জন্তুরও ভয় আছে। ইহাদের দ্বারা যাত্রিগণ ও কৃষকগণ যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হইতে পারে। সুতরাং বাঁধের কার্য্য চালু না হওয়া পর্য্যন্ত পার হওয়ার জন্য খাসমহাল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা হইতে সর্ব্বসাধারণের অনতিবিলম্বে একখানা খেয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক, যাহাতে দরিদ্র কৃষক প্রজাগণ ও নানা স্থানের যাত্রিগণ অন্ততঃ জীবনটুকু লইয়া নিরাপদে দোনাটী পার হইবার সুযোগ পায়।

এ, কে, এম, আমিন উল্লাহ
(নোয়াখালী-হিতৈষী)

নোয়াখালীর রাস্তাঘাটের পরিচয়

টাউনের নূতন বাজার দিয়া যে রাস্তাটী পুরাতন রেল রাস্তা ক্রস করিয়া পশ্চিম দিকে গিয়াছে, ইহার নাম সাস্তাসীতা বা ভবানীগঞ্জ রোড। গাড়ীর আড্ডার ঘাট পর্য্যন্ত এই রাস্তাটী মিউনিসিপালিটির অধীন। তাহার পর হইতে পশ্চিম দিকে ডিঃ বিঃ অধীন। মিউনিসিপালিটির সীমা ছাড়াইয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সীমায় পা দেওয়া মাত্রই পথিককে যে দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রাস্তাটীর অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যেন রাস্তার নির্ম্মাণ অবধি আর কোন মেরামত-কার্য্য হয় নাই। এই রাস্তায় এক একটী গর্ত্ত কূপাকার ধারণ করিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক এই প্রকাণ্ড রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। রাত্রের ত কথাই নাই দিনের বেলাও এই রাস্তায় চলিতে গিয়া গর্ত্তে পড়িয়া বহু লোককে গড়াগড়ি খাইতে হয়, বহু লোক চাউল, ডাইল ও সওদা সত্রাদি গর্ত্তে ফেলিয়া দেয়।

কিশোরগঞ্জের রাস্তা

কিশোরগঞ্জ হইতে দক্ষিণ দিকে নদী পর্য্যন্ত এই রাস্তাটী গিয়াছে। পূর্ব্বে সাস্তাসীতার রাস্তার দক্ষিণের লোক কানুকীর পোল হইতে সহকারী খালের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তাটী সহর পর্য্যন্ত গিয়াছিল ঐ রাস্তা দিয়া চলাচল করিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ রাস্তাটী নদী-গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় এখন বাধ্য হইয়াই লোককে কিশোরগঞ্জ রাস্তা দিয়া সাস্তাসীতার রাস্তা ধরিয়া চলাচল করিতে হয়। এই রাস্তাটীর অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত রাস্তা

হইতেও বিশুদ্ধ খারাপ। এই রাস্তার মধ্যে পথিকের এমন দুরবস্থা হয় যে, বর্ষার প্রারম্ভ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত হাঁটু পরিমাণ জল কর্দ্দম ভাঙ্গিয়া লোককে চলাচল করিতে হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে রাস্তা কিয়দংশ জুড়িয়া কেহ পুকুরের পাড় বাঁধিয়াছে, কেহ ডবুর খোলা ইত্যাদি দ্বারা এমন ভাবে রাস্তার জল নিকাশের স্থান আবদ্ধ করিয়াছে যে, রাস্তার জল রাস্তাতেই থাকিয়া যায় এবং ক্রমাগত রাস্তাটি কর্দ্দম ও ডোবায় পরিণত হয়। এই রাস্তাটির মেরামত কার্য্য অনেকদিন হইতেই বোর্ড ছাড়িয়া দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইহা নাকি বোর্ড এবলিশ করিয়া দিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোককে যে রাস্তা দিয়া দিবা-রাত্র চলাচল করিতে হয়, সেই রাস্তাটী কোন অজুহাতে এবলিশ করা হইল এবং তাহার তত্ত্বাবধান একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহার কোনই কারণ বুঝা যাইতেছে না। এই রাস্তায় যে সব লোক চলাচল করে তাহাদের নিকট হইতে ছেস লওয়াও এবলিশ করা হইয়াছে কি?

চর উরিয়া লোকাল বোর্ড রাস্তা

এই রাস্তাটী সরকারী স্থানাখোলার পশ্চিম দিকস্থ কাস্টমের গোল হইতে পশ্চিম দিকে চর উরিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে। কুমারখালী খালের ভাঙ্গতি উঠিয়া এই রাস্তার পূর্ব্বাংশ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন উক্ত খাল সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া গিয়াছে। এই রাস্তাটীর ভগ্নাংশ পুনঃ নির্ম্মাণ ও তত্ত্বাবধানের মেরামত কার্য্যের জন্য অন্ততঃ হাজার লোকের দস্তখতী দরখাস্ত কয়েকবার বোর্ডে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নাই। এই রাস্তাটীর অভাবে যে চর উরিয়াবাসী দরিদ্র প্রজা-গণের কি কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ষার সময়ে (অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত) জোয়ারের জলে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকে। এবং জোয়ার পড়িয়া গেলে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদার মধ্য দিয়া লোক চলাচলের কি যে দুর্গতি তাহা ভুক্ত-ভোগীরাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। লালমাটীর সমতল রাস্তায় যাঁরা চলেন তাঁরা ইহাদের দুর্দ্দশার কিছুই বুঝিবেন না। ইহা ব্যতীত গোপা জলে সাজাদীতার রাস্তার দক্ষিণাংশের কৃষিক্ষেত্র ও বাগানবাড়ী নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কুমারখালী খালের বাঁধ হইতে খালের উত্তর পাড় দিয়া পশ্চিম দিকে সাবেক রাস্তার ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও তত্ত্বাবধানের মেরামত কার্য্য না হইলে লোকের বাঁচিবার আর উপায় নাই। এই জন্য বোর্ডের নিকট কয়েকবার নিবেদন পেশ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহদৃষ্টি এপর্য্যন্তও এদিকে পতিত হইতেছে না।

ঘাটের দুর্দ্দশা

রেল রাস্তার মুখ খেয়া নৌকার একটী প্রধান আড্ডা। এইস্থান হইতে চর অঞ্চল, কাস্টম, সদর চতুর্দ্দিকে খেয়া নৌকা ছাড়ে। এই স্থানে ও চর অঞ্চলে নৌকাঘাটায় এক এক খানা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার জন্য বহুবার কাগজে লেখা ও বোর্ডকে অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও যাত্রীদের এই অনুরোধ রক্ষা করিবার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে নাই। যদিও এই পাড়ে কয়েকখানা ভাড়াটিয়া ঘর আছে কিন্তু তাহাতে এক ঘণ্টার জন্য বসিলেও দুইটি করিয়া পয়সা ভাড়া দিতে হয়। যাত্রিগণের, বিশেষতঃ চরের কৃষক যাত্রীদের নিকট প্রায়ই পয়সা থাকে না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা সব সময়েই রাস্তার উপরে পড়িয়া থাকিতে হয়। চরের খেয়াঘাটের অবস্থা আরও ভয়ানক। সেইস্থানে শুধু চরের মধ্যে থাকিবার জন্য পয়সা দিয়াও স্থান পাওয়া যায় না, কেবল মাঠে পড়িয়াই মরিতে হয়। কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ এত আবেদন নিবেদন ও আলোচনা সত্ত্বেও ইহার কোন প্রতিবিধান করিতেছেন না। তদুপরি আবার খেয়া নৌকার মাঝিমাল্লাদের ইতরোচিত ব্যবহারে যাত্রী-দিগকে বহু অসুবিধা ও অপমান ভোগ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খবরের কাগজে আলোচনা হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকারের কোন নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ, কে, এম, আদিন উল্লা, চর উরিয়া
(নোয়াখালী-হিটৈষী)

রণগ্রামের সেতু

যাঁহাদিগকে কাশেভত্রে রণগ্রামের নদী পার হইতে হয় তাহাদিগের পক্ষে এই সেতুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু প্রত্যহ সহস্রাধিক লোককে রণগ্রামের নদী পার হইতে হয়। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস এই নদী পার হওয়া যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। বাংলার মধ্যে আর কোথাও এইরূপ প্রয়োজনীয় রাস্তার উপর পথিক সাধারণকে এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হয় কিনা সন্দেহ। ঘটা বাসে যাতায়াত করিবার সময় বর্ষার কয়েক মাস রণগ্রামের নদী পার হইয়া আরোহিগণকে এক পার হইতে অন্য পারে গিয়া বাসে আরোহণ করিতে হয়। এই সময়ে শিশু, নারী এবং রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোকদিগকে যে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে বুঝান দুঃসাধ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন এই অতি প্রয়োজনীয় সেতুটি নির্ম্মাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। জনসাধারণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

এবারেও রণগ্রামের সেতু নির্ম্মাণের জন্য বহু লোকেই জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। শুনিতেছি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বলিয়াছেন, এই অর্থসঙ্কটের দিনে ঋণ করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। আরও শুনিতেছি যে, কোন একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ২০০ বৎসরের জন্য মাশুল আদায়ের অধিকার লইয়া রণগ্রামের সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। জেলা বোর্ড একবার যে এষ্টিমেট করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা গিয়াছিল যে, এই সেতু নির্ম্মাণে প্রায় ৮০,০০০৲ আশী হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং যাঁহারা জেলা বোর্ডের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বহন করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে সেতু নির্ম্মাণের অধিকার দান করা আমাদের মতে অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে। যদি ৬০,০০০৲ টাকাও ব্যয় হয় তাহা হইলে কম পক্ষে উক্ত টাকার বার্ষিক ৩০০৲ তিন হাজার টাকা সুদ দাঁড়ায়। বৎসরের মধ্যে সকল সময়েই টোল (অর্থাৎ পথিক ও যানবাহনের উপর মাশুল) আদায় করিয়া তাঁহাদিগকে সুদ সমেত আসল টাকা তুলিয়া লইতে হইবে। যদি জেলা বোর্ড অথবা সরকার বাহাদুর মনে করেন যে, এইরূপ ভাবে কার্য্য করা হইলে তাঁহাদের স্থায়ী আয় বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সময়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া নির্ম্মাতাগণের নিকট হইতে বার্ষিক সামান্য কিছু আদায় করিয়াও লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তবে জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য করিলে এইরূপ সময় বাড়াইবার প্রস্তাবে অনেকেই অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন। কারণ বর্ত্তমানে বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫।৬ মাস কাল জনসাধারণকে পায়ের মাশুল দিতে হয়, আর এই ব্যবস্থায় সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বৎসরের মধ্যে সকল সময়েই অতি দরিদ্র ব্যক্তিকেও পায়ের মাশুল দিতে বাধ্য হইতে হইবে। এইরূপ অসুবিধা হইলে ইহা নিশ্চিত জানিয়াও আমরা বর্ত্তমান দুর্গতির তীব্রতা উপলব্ধি করিয়াই অগত্যা উক্তরূপ প্রস্তাব করিতেছি। জেলা বোর্ড যদি সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া উপায় অবলম্বন করতঃ অনতিবিলম্বে রণগ্রামের সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতে আমাদের প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। আর যদি অর্থাভাবের দোহাই দিয়া তাঁহারা কুম্ভকর্ণের ন্যায় সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতে থাকেন তাহা হইলে আমাদিগের প্রস্তাবিত পন্থার বিষয় সাবধানতা সহকারে আলোচনা করিবার জন্য আমরা জেলা বোর্ডের সদস্যগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

(কাশীবাজার-মুর্শিদাবাদ)

বাজার দর

পুরাতন ধান্য প্রতি মণ	১৷৵ হইতে ১৸০ টাকা
নূতন ,, ,,	১৷৵ ,, ১৷০
পুরাতন চাউল টাকায়	১৫ সের
নূতন ,,	৮
ভাল বৎস প্রতি সের	।০ হইতে ।৵০ আনা
ছাগ ,,	৵০ ৶০

অন্যান্য তরীতরকারীর দর আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে।

(কাশীবাজার—মুর্শিদাবাদ)

ভৈরব নদের উপর সেতু

কুষ্টিয়াঘাট থানার কাছে ভৈরব নদের উপর পুল বাঁধিবার কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ আশঙ্কিত হইতেছি; অনেক দিন হইতেই ভৈরব নদ কাটিয়া তাহার স্রোত বহতা রাখিবার কল্পনা চলিতেছে। স্বর্গীয় রায় যাদবচন্দ্র অমৃতলাল রায় এ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের চেষ্টায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত নদ সংস্কারের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে উহার উপর স্থায়ী পুল বাঁধা হইলে, উক্ত নদ সংস্কারের কল্পনা চিরদিনের জন্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ পুল বাঁধা হইলে এই নদের স্রোত এখনও যাহা কিছু বহতা আছে, তাহাও অচিরাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার ফলে যাত্রাপুর হইতে আলাইপুর পর্য্যন্ত ভৈরবের দুই কূলের বহু পল্লীর জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া গ্রাম-গুলি চিরকালের জন্য ম্যালেরিয়ার আবাস হইয়া পড়িবে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড পুরাতন ভৈরব নদটী রুদ্ধ করিয়া এতগুলি জন-বহুল পল্লীর সর্ব্বনাশ করিতে কেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অন্য কথা, এখনও একদিকে বরিশাল, পিরোজপুর, অন্যদিকে বহুদিয়া কেশবপুর প্রভৃতি বন্দর হইতে বিবিধ পণ্য পরিপূর্ণ বড় বড় নৌকা কষ্টে সৃষ্টে এই মরা নদের স্রোত দিয়া যাতায়াত করিতেছে। ইহার উপর পুল বাঁধা হইলে এই সকল নৌকা যাতায়াতের পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। আমরা স্পষ্টতই দেখিতেছি, ভৈরব নদ এই উপায়ে চিরতরে লুপ্ত হইলে ভোমরা, বড়রিয়া, রাংদিয়া, চিকনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী বিস্তৃত পরগণা একেবারে মরুভূমি হইয়া যাইবে। কালে বর্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি জেলার বহু পল্লীর ন্যায় এই সকল পল্লী জনশূন্য হইয়া পড়িবে। এ বিষয়টী সম্বন্ধে আমরা খুলনা ডিঃ বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

আর যদি পুল বাঁধিতেই হয়, তবে তাহা কুষ্টিয়াঘাটের পোষ্টাফিস, বন্দর, মুলঘর রেল ষ্টেশন ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় লোক-যাতায়াতের স্থানে না হইয়া কুষ্টিয়া-ঘাট থানার কাছে কেন হইতেছে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই ক্ষুদ্র খালটী পারাপার হইতে দাদার একখানি ডিঙ্গী নৌকা রাখিলেই চলিতে পারে, এ পর্য্যন্ত তাহাই চলিতেছে। পুল হইলে বড়জোর পনর বিশ বৎসরের মধ্যেই যে এই মরা স্রোতটী একেবারে বুজিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া বুঝিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইবে না।

(খুলনাবাসী—খুলনা)

মালদহ সহর

জলের কল

রাস্তায় পাইপ বসিয়া গিয়াছে—এখন স্থানে স্থানে জল পড়িবার ঘর বসান হইতেছে। কোথায় কোথায় কলগুলি বসিবে তাহার একটী খসড়া তৈয়ারী আছে এবং সেই অনুসারেই কাজ হইতেছে। কোন্ নীতি অনুসারে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, তবে সংখ্যা এবং স্থান অনুসারে কল বসা উচিত। দূরত্ব হিসাবে দিতে গেলে ঠিক হইবে না বলিয়া মনে হয়। পরে ইহা লইয়া বচসা বাধিতে পারে, সকলে বলিবে "বাবা, ট্যাক্সও দেব আবার জল নিতে এত অসুবিধাও ভোগ করিব!"

রাস্তার ধূলা

(১)

আর কত দিন এমত থাকিবে? রাস্তা চলা যে দায় হইয়া উঠিল।

কলের পাইপ বসাইতে যে ধূলা উঠিয়াছে তাহার ফলে রাস্তাগুলি সহরের রাস্তা বলিয়া মনে হয় না। যত উত্তর আসিবে—জল পাইতে হইলে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। যে যে অংশে পাইপ বসিয়াছে সেই সেই অংশে ঝোলার দিয়া পূর্ব্বের মত করা যায় না কি? এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত, যাহাতে খাবারের দোকানগুলির গ্লাসকেস-গুলি সর্ব্বদা বন্ধ থাকে—নচেৎ রাস্তার অর্দ্ধেক ধূলা লোকের পেটে গিয়া ঢুকিবে।

(২)

কিছুদিন পূর্ব্বে মিউনিসিপালিটী হইতে সদর রাস্তায় জল দেওয়ার বেওয়াজ ছিল। বর্ত্তমানে তাহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। শীতের প্রথম হইতে ধূলা উড়িতে থাকে—দীর্ঘকায় বাস্ বা মটর রাস্তা দিয়া চলিলে কিছু সময়ের জন্য সাধারণের পথ চলা বন্ধ করিতে হয়। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী দোকানগুলি ধূলার আবরণ পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গ্যাস কেসের বৈকল্পিক সত্ত্বেও খাবারের দোকানগুলিতেও কিছু ধূলা প্রবেশ করে বলিয়া মনে হয়।

মিউনিসিপালিটী হইতে পুনরায় রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

মাছের বাজার

স্থানীয় শুধরী বাজারের মাছপটিতে ক্রেতার ভিড় কোন দিনই কম হয় না। মৎস্য-বিক্রেতাদের বসিবার সোজা কোন নিয়ম নাই, চলাচলের সরু পথটীর দিকে কোন দৃষ্টি না রাখিয়াই মাছের ডালিগুলি যেখানে সেখানে রাখিয়া তাহারা বসিয়া পড়ে। লোকের যেরূপ চাপাচাপি হয় তাহাতে কেহ মাছ কাটা বটীর উপর পড়িয়া যে জখম হইবে না তাহা বলা যায় না। মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক মাছের বাজার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেক গণ্ডগোলের পর তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান বাজারে যদি বিক্রেতাগণের বসিবার স্থান উঁচু করিয়া মধ্যে মধ্যে লোক-চলাচলের পথ করিয়া দেওয়া হয় তবে বিপদের আশঙ্কা থাকেনা।

পল্লীতে অর্থাগমের নূতন পন্থা

১। পল্লীতে পাকা চর্ম্মের ব্যবসা শিক্ষা

নানা শিল্পের মধ্যে চর্ম্মশিল্পও প্রয়োজনীয় এবং আর্থিক উন্নতির সাহায্যকারী। এই শিল্পজাত দ্রব্য হইতে জুতা, ব্যাগ, সুটকেশ, বেল্ট, ঘোড়ার সাজ, মানিব্যাগ, ফুটবল, ঘড়ির ব্যাণ্ড প্রভৃতি অনেক প্রকার জিনিষ তৈয়ার হইতে পারে। বর্ত্তমানে পল্লীতে যাইয়া বিনা ব্যয়ে পল্লীবাসীদিগকে চর্ম্ম-শিল্পের উন্নত প্রণালী শিক্ষা দিবার সরকারী ব্যবস্থা আছে, অনেকে বোধ হয় ইহার সংবাদই রাখেন না। "ক্রোম ট্যানেরের" আজকাল যথেষ্ট আদর হইয়াছে। চেষ্টা করিলে সকলেই এক মাসের ভিতর চামড়া পাকা করা শিখিতে পারে এবং উহা নিকটবর্ত্তী সহরে বিক্রী করিবার ব্যবস্থা করা যায়। যথেষ্ট মাল পাইলে খরিদ্দারগণ পল্লীতেই ক্রয় করিতে আসিবে। ঢাকা জেলায় বাবুরহাটে তাঁতের কাপড়, শাড়ী, সিট ইত্যাদি যথেষ্ট আমদানি হওয়াতে নানা জেলা হইতে পাইকার আসিয়া তথা হইতে মাল খরিদ করিয়া নিতেছে। আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক চাকুরীর অভাবে বেকার অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। পল্লীতে গরু ছাগল ও ভেড়ার কাঁচা চর্ম্ম অল্পমূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কারবার করিতে নিম্নে ৫০৲ উর্দ্ধে হাজার টাকা দরকার। অনেক মুচি কাঁচা চর্ম্মের কারবার করিতে না পারায় জীবিকার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না। মুচি মুসলমানগণকে উৎসাহ দিয়া চামড়ার কারবার করিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারা যায়। লক্ষ্মি কারবারের অবস্থা যে কি দাঁড়াইয়াছে মহাজনদের বুঝিতে বাকী নাই। বর্ত্তমানে এই একটা কারবার আছে, যাহাতে প্রচুর টাকা অল্প সময়ে সামান্য টাকাতে আয় হইতে পারে। এই দেশে চর্ম্ম-শিল্পের সুব্যবস্থা না থাকাতে বৎসর বৎসর ৭ কোটী টাকার কাঁচা চামড়া শুধু কলিকাতা হইতেই বিদেশে রপ্তানি হয়। এই চামড়া আমাদের গৃহপালিত পশুর। এই সব পশু আমাদের কৃষি কার্য্যের সাহায্যের ও খাদ্যের উদ্দেশ্যে পালিত হয়। কলিকাতায় চীনারা জুতার ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যবসায়ে তাহারা ধনী হইয়া যাইতেছে। আমরা তাহাদের দোকানে সামান্য চাকুরী লইতে অপমান মনে করি না। চামড়ার ব্যবসা কলিকাতায় পূর্ব্বে পাঞ্জাবী ও অন্যান্য বিদেশীরাই করিত। শিল্প না হইলে কি লইয়া বাণিজ্য করিব? চর্ম্ম-শিল্পের সাহায্যকারী সকল প্রকার ভূমি জাত এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দুঃখের বিষয় শিল্প বাণিজ্য সামান্য যা কিছু এদেশের

লোকের হাতে আছে তাহা প্রধানতঃ অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকের হাতে থাকায় আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বিত না হওয়ায় ব্যবসার উন্নতি হইতেছে না। বড় একটা গরুর চামড়া ভাল রকমে ট্রেস করিতে ৸৵০ আনার মসলার দরকার হয়।

দেশের শিল্পোন্নতিকল্পে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ হইতে এক্ষণে নানা অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত হইতেছে। কতক দিন পূর্ব্ব হইল ঢাকা জেলায় পাঁচদোনা, আড়াই হাজার ও ভট্টপুর ইউনিয়নে পাকা চামড়ার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দু মুসলমানের এই কার্য্যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট, সাউথ ক্যানেল রোড পোঃ ইটালী, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সংবাদ পাওয়া যাইবে।

২। তুলার চাষ

দেশী কাপড়ের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কাপড়ের সুতার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী না হইয়া পাটের জমিতে যাহাতে তুলার চাষ হইতে পারে, কাপড়ের কল-ওয়ালাগণের প্রথম দুই এক বৎসর যাহাতে দিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ অনেক চাষীর তুলা চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও পাছে তুলা বিক্রী না হয়, এই ভয় তাহাদের হইতে দূর করিতে হইলে দাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিলের কর্ম্মকর্ত্তা ও দেশের উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৩। চিনির কল

চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলাতে অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ হইতেছে, বিশেষতঃ ঢাকা জেলায় বর্ত্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়। এখানে সহজে একটী চিনির কল চলিতে পারে। এদিকে ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

লাঙ্গল সম্বন্ধে নব্য উদ্ভাবন

ভাল করিয়া জমির চাষ করিতে হইলে উপযুক্ত, কার্য্যকর এবং উন্নতরূপে তৈয়ারী কৃষিযন্ত্র আবশ্যক।

এ পর্য্যন্ত যে সকল যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে তাহা আদৌ বাংলার উপযুক্ত নয়। সেগুলির ব্যবহারে অসুবিধা এবং তাহাদের মধ্যে কারিগরি বেশী। আজকাল অনেক কৃষি-যন্ত্রই ইস্পাতে তৈয়ারী হইতেছে। সেগুলি অনেক দিন চলে, সেগুলির ব্যবহার সুবিধা ও লাভজনক, কারণ সেগুলি ব্যবহার করিলে অল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

বহুপূর্ব্বে লাঙ্গলের মত বাঁকা গাছের ডাল দিয়া জমি চাষ করা হইত। লাঙ্গল মানুষেই টানিত। পরে যখন হাল চাষ করিতে পশুর ব্যবহার হইতে লাগিল তখন হালের আকারও বড় হইল।

বাংলার কৃষকেরা সহজে তাহাদের বাপ-পিতামহের পদ্ধতি ছাড়িতে চাহে না। তাহাদের মান্ধাতার আমলের পুরাতন যন্ত্রের বদলে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিলে যে সুবিধা হয় তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। লেখাপড়া না জানাই উহার মূল কারণ। তাহাদের বিশ্বাস যে পুরাকালে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার ছিল এখনও সেগুলি তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং চাষীদের আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখান আবশ্যক। এ বিষয়ে বাংলার জমিদারগণ ও শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁহাদের দেশের ও দেশবাসীদের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। জমির চাষের জন্য লাঙ্গলই সর্ব্বপ্রধান কৃষিযন্ত্র এবং ইহার ব্যবহারও সর্ব্বত্র দেখা যায়। লাঙ্গল এমন হওয়া চাই যাহাতে করিয়া মাটি সম্পূর্ণ উলটাইয়া দেওয়া যায় এবং নীচের মাটি উপরে উঠিলে রোদ-বাতাস লাগিতে পারে। মাটিতে রোদ হাওয়া লাগিলে তাহার অনেক উন্নতি হয়—মাটির ভিতরের উপাদান ও বাইরের রং ইত্যাদি বদলাইয়া যায়, অল্প ঝুরিয়া যায় এবং সারবান হয়, সুতরাং শস্যও বেশী হয়।

প্রকৃত পক্ষে দেশী কাঠের লাঙ্গলকে লাঙ্গল বলা চলে না। ইংরাজিতে যাহাকে কাল্টিভেটার বলে উহা অনেকটা সেই প্রণালীতে কাজ করে। উহা সম্পূর্ণরূপে মাটি উলটাইয়া দেয় না। সুতরাং দেশী লাঙ্গল দিয়া চাষ করিলে চাষ গভীর হয় না এবং রোদ হাওয়া লাগিয়া যতটা উপকার হওয়া উচিত তাহা হয় না।

যাহা হউক, এখন আর কোন অসুবিধা নাই। বাঙ্গালা

কারিগরের দ্বারা বাংলার বাংলার মাটির উপযুক্ত এবং বাঙ্গালী চাষীর ক্রয়যোগ্য লাঙ্গল তৈয়ার হইতেছে।

একখানি কাঠের দেশী লাঙ্গলের দাম সাড়ে তিন টাকার কম নহে, কিন্তু উহা বেশী দিন যায় না। দেশী লাঙ্গল দিয়া জমি ভালরকম তৈয়ার করিতে তিন, চার, এমন কি পাঁচ বারও চাষ দিতে হয়। চাষীর এবং তাহার বলদের এতটা অনর্থক পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। তাহা তাহারা এখন অন্য কাজে লাগাইয়া অধিক লাভ করিতে পারিবে।

উন্নত দেশী লাঙ্গল এখন যাহা তৈয়ার হইতেছে তাহার দ্বারা একবার লাঙ্গল দিলেই চলিবে, চাষ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ গভীর হইবে এবং শস্য অধিক ফলিবে।

এই উন্নত লাঙ্গলের লৌহাংশের দাম চারি টাকা হইতে সাড়ে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত, আর তাহাদের কাষ্ঠাংশের দাম মাত্র এক টাকা। এই সকল লাঙ্গলের চারিটী অংশ, তাহাতে একটী বোল্ট নাটও নাই, তাহাদের মেরামতেও কোন হাঙ্গামা নাই, এমন কি যে কোন বালক বিনা অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ঠিক করিতে পারে। ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার মধ্যে ফালি ফাল, তাহাও শক্ত ইস্পাতে তৈয়ারী, অন্ততঃ পাঁচ সাত বৎসর তাহা চলিবে, আর তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও গ্রাম্য কামারেই তাহা তৈয়ার করিতে পারিবে।

বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া একখানা কাঠের দেশী লাঙ্গল যতটা ভারী হয়, ছোট "সবকাম" লাঙ্গল তাহার চাইতে বেশী ভারী নহে। সুতরাং চাষী তাহা দেশী লাঙ্গলের মত অবাধে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

যদি "সবকাম" লাঙ্গল যদি কাঁধে লইতে বেশী ভারী মনে হয়, তাহা হইলে উহা জোয়ালের উপর ঝুলাইয়া বলদের কাঁধে দিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া আসা করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন মাটির উপযুক্ত নানা প্রকার উন্নত লাঙ্গল তৈয়ার করা হইয়াছে। যাঁহার যেরূপ আবশ্যক, নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট তাঁহাদের বলদের ও জমির বিবরণ ও জিলার নাম দিয়া আবেদন করিলে সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠান হইবে।

হিউ, সি, ই, সেটারলন,
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার, রহণা, ঢাকা।

কাংস্য শিল্পের উন্নতি

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে যথাসম্ভব অল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে না পারিলে শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে দাঁড়ান হওয়া অসম্ভব। অধুনা পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্রই নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রাদি উৎপন্ন হইতেছে। তাম্র, কাঁসা পিতল প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত ঘটী, বাটী, থালা ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করি। আমাদের দেশের শিল্পীরা যে উপায়ে এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করেন এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া আমাদের দেশে প্রেরণ করেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া দেশী অপেক্ষা বিদেশী জিনিষেরই বেশী কাটতি হইতেছে। সুতরাং স্বদেশী জিনিষের কাটতি বাড়াইতে হইলে যাহাতে সস্তায় অপেক্ষাকৃত ভাল জিনিষ বিক্রয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পুরাতন প্রণালী আর চলে না। তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রণালীতে অল্পব্যয়ে জিনিষপত্র তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বাংলা দেশে প্রায় ২ লক্ষ কাঁসারী আছে। তাহারা তাম্র, কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ারী করে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ এই সমস্ত শিল্পীদের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বাসন নির্ম্মাণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাংস্য-শিল্প সম্পর্কে গবেষণা করিয়া শিল্প-বিভাগ স্থির করিয়াছেন, এদেশে সাধারণতঃ যে ব্যয়ে কাঁসার বাসন পত্র প্রস্তুত হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ কম ব্যয়ে প্রয়োজনীয় কাঁসার বাসন প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণতঃ কাঁসা গলাইয়া ঢালাই করিয়া অথবা আগুনে উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া এদেশের কাঁসারিগণ জিনিষপত্র তৈয়ারী করে। এই কাঁসার মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ তাম্র এবং ২৩ ভাগ টিন থাকে।

এইরূপে প্রস্তুত কাঁসার জিনিষ সাধারণতঃ প্রতি সের ২।০ আনা মূল্যে বিক্রয় হয়।

শিল্প বিভাগের গবেষণায় দ্বারা স্থির হইয়াছে, শতকরা ২৩ ভাগ টিন না দিয়া কিছু টিন ও কিছু দস্তা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার অংশও কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর। এইরূপে কাঁসার অনুরূপ অথচ সস্তাদরের এক প্রকার মিশ্রিত ধাতু উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাদ্বারা বাসন তৈয়ারী করিলে তাহা কাঁসার ন্যায় পরিষ্কার, টেকসই এবং ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। মিশ্রিত ধাতুর আর একটী বিশেষত্ব এই যে, আকারে ঠিক সমান হইলেও ইহার বাসন কাঁসার বাসন অপেক্ষা ওজনে কম হইবে।

প্রথমতঃ মিশ্রিত ধাতুর দামই কাঁসা হইতে শতকরা ৩৫ ভাগ কম হইবে এবং তাহাদ্বারা মিশ্রিত বাসনের দাম মোটের উপর শতকরা ৫০ ভাগ কম হইবে।

বাঙ্গালার কাঁসারীদের নিকট এই প্রণালী বিশ্লেষণের ফল হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাটী করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ বাস্তবিক কুটীর-শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিতেছেন।

বাঙ্গালীর শীতবস্ত্রের সেকাল ও একাল

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা শীত-নিবারণের জন্য কার্পাস-জাত বস্ত্র ব্যবহার করিত। প্রাপ্ত-বয়স্কেরা মোটা চাদর, বালাপোষ ও তুলার জামা, আর বালকবালিকারা দোলাই ব্যবহার করিত। যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহাদের ঘরে ২।৪ খানা কাশ্মীরী শাল থাকিত। এই শাল তাঁহারা নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে ব্যবহার করিতেন। সেই শাল ৩।৪ পুরুষ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইত। সেরূপ শাল আজকাল বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোট, ওভার কোট, সার্ট, অলষ্টার, চেষ্টারফিল্ড, কম্ফর্টার, সোয়েটার, উলেন জার্সি, পেটিকোট, মোজা, দস্তানা না হইলে আজ বাঙ্গালীর এই দারুণ শীত কিছুতেই বিদূরিত হয় না। বাঙ্গালা ত আর সত্য সত্যই উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হয় নাই। তবে বাঙ্গালীর এত ঠাণ্ডা বোধ হইল কিসে? যে দেশের লোকের আয় মাথা প্রতি /১০ পয়সা সে দেশের লোক এরূপ 'কাপুড়ে বাবু' সাজে কোথা হইতে? এই অর্থকষ্টের দিনে বাঙ্গালী যদি হিসাব করিয়া না চলে, অন্যান্য অপেক্ষা প্রয়োজনের দিকে যদি বেশী দৃষ্টি না দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করা অসম্ভব নহে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

কৃত্রিম ঘৃত

কৃত্রিম ঘৃতে কোন পুষ্টিকর পদার্থ এবং ভিটামিন নাই, অথচ উহা দেখিতে ঠিক আসল ঘৃতের মত বলিয়া ব্যবসায়ী-দের দ্বারা বিস্তর প্রবঞ্চনা চলিতেছে। কেবল যে মহরায় প্রস্তুত মিষ্টান্নেই উহা চলিতেছে, তাহা নহে; সাধারণের নিকট আসল ঘৃত বলিয়া অন্ততঃ পক্ষে আসলের সহিত মিশাইয়া উহা চালানো হইতেছে। নানা প্রকার তৈল হইতে উহা প্রস্তুত হয় এবং উহাতে ঘৃতের স্বাদ ও আকার উৎপাদন করা হয়। এই প্রবঞ্চনা নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল যে, কৃত্রিম ঘৃতে কোনরূপ রং দিতে আদেশ করা হউক। গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

পশুপালন-বিভাগের খরচা

ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পশু-পালন বিভাগের জন্য বছরে ১৪ লাখ টাকা খরচ করেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলা খরচ করেন ৭৮ লাখ টাকা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে মোট ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলার ঐ উদ্দেশ্যে খরচ হয় আরও বেশী।

১৯৩০ সনে আসামের বন-সম্পদ্

১৯৩০ সনে আসাম গভর্ণমেণ্টের বন-বিভাগের খরচা কোনরূপে বেটানো হয়।

পূর্ব্বের ৫ বৎসরে বন-বিভাগের বার্ষিক গড় আয় ছিল ৩৪ লাখ টাকা এবং ব্যয় মিটাইয়া গড়ে বার্ষিক ৮½ লাখ টাকা হাতে থাকিত। ১৯৩০ সনে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ২৯½ লাখ টাকা। ব্যয় মিটাইয়া ছিল মাত্র ১½ লাখ টাকা।

রিজার্ভ বনস্থলীর পরিমাণ ৫ বর্গ মাইল বাড়িয়াছিল। ১৯৩০ সনে 'রিজার্ভ' বনস্থলীর পরিমাণ ছিল ৩১৫৩ বর্গ মাইল।

শালগাছ রোপণে বিশেষ সফলতা পাওয়া গিয়াছিল।

গণ্ডারের চামড়া ও শিংয়ের দাম খুব বেশী। এইজন্য অনেকে বিনা অনুমতিতে গণ্ডার বধ করিত। ইহা নিবারণের জন্য চোরদের শাস্তি বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং গণ্ডার পাহারা দেবার জন্য একদল সৈনিক আমদানি করা হয়।

যাহাতে বনের অভ্যন্তরে পৌঁছিতে পারে এইজন্য গোয়ালপাড়া ট্রাম আরও ২ মাইল বাড়ানো হয়। কাঠের বাজারে দখা পড়াতে ১৯৩০ সনে ট্রাম কোম্পানীর লোকসান হয়। ৯০,৫১৫৲ টাকা খরচ, কিন্তু আয় হয় মাত্র ৫৮,১৪৮৲ টাকা।

জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের জন্য অনেক ক্ষতি হয় এবং অনেক মেরামত করিতে হয়।

নাহার কাটিয়াতে আসাম-বেঙ্গল রেলের জন্য স্লীপার তৈরীর কল আছে। ১৯২৯ সনে এই কলে ২ লাখ ২০ হাজার স্লীপার তৈরী হয়। ১৯৩০ সনে ২ লাখ ৭০ হাজার স্লীপার তৈরী হয়।

গালার রপ্তানি ৫০,৭১৭ হইতে ৫২,৪১২ মণে দাঁড়ায়। গালার বাজার দরের দ্বারা গালার 'রয়ালটি' নির্দ্ধারিত হয়। গালার বাজার দর কমার দরুণ রয়ালটির পরিমাণ ২৫০,৩৯১ হইতে ১৩৭৬২৮ টাকা দাঁড়ায়।

১৩০০ কোটি টাকার শস্য ; ২০০০ কোটি টাকার পশু

ভারতে বর্ত্তমানে যে কয়টী শিল্প আছে, তার মধ্যে কৃষিই প্রধান। এ কথাটা সহজেই বুঝা যাবে এই থেকে যে, ভারতের শস্যের মোট বার্ষিক দাম হচ্ছে ১৩০০ কোটী টাকা, আর ভারতীয় গৃহপালিত পশুর মোট বার্ষিক দাম—২০০০ কোটি টাকারও বেশী। যুদ্ধের আগে গবাদি পশুর দাম যা ছিল, এখন তার চেয়ে ৮০০ কোটি টাকা বেড়েছে। তাইতেই কারখানা শিল্পের উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়ে ভারতের কৃষিকে ভুললে চলবে না।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য (১৯৩০-৩১)

১৯৩০-৩১ সনে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য কিরূপ হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ-সম্বলিত সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে জানা যায়, আলোচ্য বর্ষে ভারতের আমদানির পরিমাণ ৭৫·১৮ কোটী এবং রপ্তানির পরিমাণ ৯·৩২ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের সহিত ভারতের আদান-প্রদান খুব বেশী। ১৯৩০-৩১ সনে তাই গ্রেট বৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৫৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

ভাইসরয়ের অর্থ কমার্শ্যাল ইন্‌টেলিজেন্স ডাঃ ডি, বি, মীক বলেন, আলোচ্য বর্ষে শিল্প-বাণিজ্যের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে সেরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাস হইতে বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি উহা কেবল নীচের দিকেই যাইতেছে। এখনও উন্নতির বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্দ্দশার আলোচনা করিয়া ডাঃ মীক নিম্নলিখিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে কাঁচা মাল এবং শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে আবার কাঁচা মালই বেশী উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীর লোক তাহা ব্যবহার করিয়াও নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না।

(২) আর্থিক অনটন দেখা দিয়াছে। ফ্রান্স ও আমেরিকায় কেবল স্বর্ণ মজুদ করা হইতেছে। ইহার ফলে অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যে সোনা জমা ছিল তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(৩) পৃথিবীর নানা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে। বিশেষভাবে ভারতবর্ষ চীন ও দক্ষিণ আমেরিকায় গোল বাধিয়াছে।

১৯৩০-৩১ সনে বৃটিশ ভারতের আমদানির পরিমাণ ৬৫ কোটী টাকা এবং রপ্তানির পরিমাণ ৫২৬ কোটী টাকা। ১৯২৯-৩০ সনের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, আমদানির দিকে ৭৬ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩২ ভাগ এবং রপ্তানির দিকে ৯২ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

তুলাজাত দ্রব্য তামাক এবং কোন কোন লৌহজাত দ্রব্যের আমদানি প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

১৯২৯-৩০ সনে নানা রকমের কাপড় আমদানি হইয়াছিল ৭৮ কোটী টাকার। ১৯৩০-৩১ সনে মোট ৪১ কোটী টাকার কাপড় ভারতে আসিয়াছে।

১৯২৯-৩০ সনে মোট ১৯১,১০,০০০০০ গজ কাপড় আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৮৯,০০,০০০০০ গজের বেশী কাপড় ভারতে আসে নাই।

বিলাতী সুতার আমদানিও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে ৪৪০০০০০০ গজ সুতা ৬ কোটী টাকা মূল্যে আমদানি করা হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সনে ২,১০,০০০০০ গজ সুতা ৩,০৮,০০০০০ কোটী টাকা মূল্যে আমদানি করা হইয়াছে।

১৯২৯-৩০ সনে ১৭ কোটী ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯,৭২,৭০০ টন লোহা ও ইস্পাত আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে ১০ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬,১৪,২০০ টন মাত্র আসিয়াছে।

গত বৎসর ৭ কোটী ৫২ লক্ষ টাকার মোটর গাড়ী ইত্যাদি মাল আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকার মোটর মাল এদেশে আসিয়াছে।

১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় ১৯৩০-৩১ সনে ৩৪ কোটী টাকার পাট ও পাটের জিনিষ কম রপ্তানি হইয়াছে। মোট ৩,৭৮,০০০ টন পাট কম রপ্তানি হইয়াছে। কাঁচা পাট গত বৎসর ২৭ কোটী টাকা মূল্যে ৪৫,১৯,০০০ গাঁইট রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ১৩ কোটী টাকা মূল্যে ৩৪,৭০,০০০ গাঁইট মাত্র রপ্তানি হইয়াছে।

গত বৎসর ২২ কোটী টাকা মূল্যের ৫২,২০,০০০০০টী পাটের থলিয়া রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সনে মোট ১৪ কোটী টাকা মূল্যের ৪০,৪০,০০,০০০টী থলিয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। গত বৎসর ৩০ কোটী টাকার ১৬৫,১০,০০০০০ গজ চট রপ্তানি হইয়াছিল। এবার ১৭ কোটী টাকার মোট ১২৭,১০,০০০০০ গজ রপ্তানি হইয়াছে।

তুলা রপ্তানিও হ্রাস পাইয়াছে। গত বৎসর ৩৯,২৬,০০০ গাঁইট তুলা রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সনে মাত্র ১৪৪,০০০ গাঁইট তুলা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

গম রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াছে, ১৯২৯-৩০ সনে ১৩০০০ টন গম রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সনে মোট ১,৯৬,৫০০ টন গম বিদেশে গিয়াছে।

১৯২৯-৩০ সনে ৫ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩,২৬,০০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৫ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২,৭৯০০০ টন চাউল বিদেশে গিয়াছে।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, পরিমাণের দিক্ দিয়া চাউল রপ্তানি খুব বেশী কমে নাই। কিন্তু মূল্যের দিক্ দিয়া যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং কৃষকদের হাতে যথেষ্ট টাকা আসে নাই। সর্ব্বত্র কিনিবের দর সস্তা হইয়াছে বলিয়াই চাউলের দরও কমিয়াছে, ইহাই সরকারী কর্ম্মচারীদের অভিমত।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস

সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকারের নিযুক্ত ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন নিম্নলিখিত হারে হ্রাস করিবার প্রস্তাব দিয়াছেন—

যাহাদের বেতন ১০৲ পর্য্যন্ত তাহাদের টাকা প্রতি ৬
১১৲ হইতে ১০০৲ „ „ ৵০
১০১৲ „ ৫০০৲ শতকরা ৭।০ টাকা
„ ৫০১৲ „ ৫৫০০৲ ১০৲
„ ১৫০১৲ „ ৩০০০৲ ১৫৲ „
„ ৩০০০৲ „ টাকার উপর „ ২০৲

ট্যাক্স বৃদ্ধি
বাজেটের ঘাটতি পূরণ

ভারত গভর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ের দুই মুখ সমান করিবার জন্য যেমন কিছু খরচ কমাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, তেমনি কিছু আয় বাড়াইবারও প্রয়োজন হইয়াছে। এইজন্য গত ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সিমলায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে অর্থসচিব স্যর জর্জ্জ শুষ্টার এক বিল পেশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—বাজেটে যে আয় ধরা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে। অতএব, স্থির হইয়াছে, সামরিক ও অসামরিক সকল সরকারী বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে, বেতন হ্রাস করিতে হইবে, সকল টাক্স শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং কয়েকটি নূতন টাক্স ধার্য্য করিতে হইবে।

১লা অক্টোবর হইতেই অস্থায়িভাবে ভারতের বর্ত্তমান সকল টাক্সের চার টাকায় চারি আনা হিসাবে বৃদ্ধি পাইল। ইন্‌কাম টাক্সও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বড়লাট তাঁহার বেতন শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা হিসাবে কম লইবেন; তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের বেতন শতকরা ১৫৲ পনের টাকা হিসাবে কম লইবেন। আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সিভিল সার্ভিসের এবং সরকারী সকল কর্ম্মচারীদের বেতন শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে কমিয়া যাইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের খরচ কমিবে অনুমান দেড় কোটি টাকা, সামরিক বিভাগের ব্যয় কমিবে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা—দুই বৎসরের সর্ব্বসমেত ৮ কোটি টাকা। বিলের মূল প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) কাঁচা তুলার উপর প্রতি পাউণ্ড দুই পয়সা হারে নূতন আমদানি শুল্ক, (২) মেসিন প্রভৃতির উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা হারে আমদানি শুল্ক; (৩) রবারের উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা হারে আমদানি শুল্ক; (৪) লাল চিনির উপর আমদানি শুল্ক ছিল প্রতি হন্দরে ৬৸০, তাহার স্থলে হইল ৭।০ আনা; (৫) বুট এবং সু জুতার মূল্যের উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি, (৬) নকল রেশমের উপর শুল্ক ছিল শতকরা ১০৲ টাকা, তাহা হইবে ১৫৲ পনের টাকা; (৭) নকল রেশমী কাপড়ের উপর, এবং ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের উপর যে আমদানি শুল্ক ছিল, তাহা দ্বিগুণ হইল, (৮) সকল আমদানি শুল্ক টাকায় চারি আনা হারে বৃদ্ধি; (৯) এই বৎসরই ১০০০৲ এক হাজার টাকা হইতে ১৯৯৯৲ এক হাজার ৯ শত ৯৯ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের

উপর টাকায় ২ পাই হিসাবে এবং পর বৎসর ৪ পাই হিসাবে কর ধার্য্য হইল ; (১০) ইনকাম ট্যাক্সের বর্ত্তমান হার বর্ত্তমান বৎসরে টাকায় দুই আনা হারে এবং আগামী বৎসরে টাকায় চারি আনা হারে বৃদ্ধি ; (১১) লবণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় সকল শুল্ক টাকায় চারি আনা হারে বৃদ্ধি ; (১২) খাম ও পোষ্টকার্ডের দাম যেরূপ বৃদ্ধি অর্থাৎ খাম ৵১০ স্থলে পয়সা এবং পোষ্টকার্ড ১৫ তিন পয়সা। খাম পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধি কোন দিন হইতে হইবে, গবর্ণর জেনারেল তাহা পরে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সংবাদের বৈঠকে এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসা

মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার অত্যাবশ্যক কি না সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণের অভিমত আমাদের জানা না থাকিলেও, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত যে, সভ্য অসভ্য জগতেই সুগন্ধি দ্রব্য বহুলভাবে আদৃত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতবর্ষে দেবকার্য্যে গন্ধ, পুষ্প ও সুগন্ধি চন্দন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক হিন্দুবাটীতে ফুলের বাগান রাখা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান বাদসাহগণ সুগন্ধি জিনিষের অত্যন্ত আদর করিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কয়েকটি গন্ধ তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। সুগন্ধি ফুল এদেশে যত পাওয়া যায় অন্য দেশে তেমন নহে। এই সকল সুগন্ধযুক্ত ফুল হইতে চেষ্টা করিলে রাসায়নিক উপায়ে বহুবিধ গন্ধ তৈয়ার হইতে পারে ; কিন্তু আমরা এতই পরপ্রত্যাশী ও অলস হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন প্রায় সকল প্রকার গন্ধ-দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমদানি না করিলে আর চলে না। দেশীয় তৈল ও সাবানে যে সব গন্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহারও বেশীর ভাগ বিদেশ হইতে আমদানি গন্ধদ্রব্যের উপাদান নিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বাজারে আজকাল অনেকেই অনেক প্রকার গন্ধ তৈল বাহির করিয়াছেন এবং লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন। দেশে বিশুদ্ধ তৈলের উপাদান এবং সুগন্ধযুক্ত পুষ্প থাকা সত্ত্বেও স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর নানাপ্রকার কৃত্রিম বিদেশী তৈলের সহিত বিদেশী গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে।

১৯২৭-২৮ ও ১৯২৮-২৯ দুই বৎসরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ সুগন্ধি দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে :

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
বাংলা	১১৬৮৫১৲	৯০৮৫৭৲
বোম্বাই	৩০০৩৯২৲	১৫০৬০২৲
সিন্ধু	৮১২১২৲	১০৪৪৭৭৲
মাদ্রাজ	৫৮৯০৲	৭১৯৬৭৲
ব্রহ্ম	৭৬৭৫৮৲	৬৫০৯২৲

উপরের তালিকা ব্যতীত সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধি সুরাসার আমদানি হইয়াছিল নিম্নলিখিতরূপ :

	১৯২৭-২৮
কর্পূর তৈল	৫১৮৫৲
লবঙ্গ তৈল	২৬৫২৲
লেভেণ্ডার তৈল	৯৮৩২৲
লেবু তৈল	৬১৪৮০৲
অটোরোজ	১২৩৮৲
অন্যান্য	৬৫০৭৮০

ইহা ভিন্ন সুগন্ধ সুরাসার-মিশ্রিত নানা প্রকারের এসেন্স আমদানি হইয়াছিল নিম্নরূপ :

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
বাংলা	৩৭২৮০৲	৩২৭০৬৯৲
বোম্বাই	৪৩৯৮৬২৲	৭০৬১২৲
সিন্ধু	৬৯৪৫২৲	৭০৬১২৲
মাদ্রাজ	৬৮৩৯৪৲	৯০৪৩৯৲
ব্রহ্ম	৪২০০২৩৲	৩১৫১১২৲

এই অর্থকষ্টের দিনেও বহু লক্ষ টাকার সুগন্ধি জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া আমরা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি।

(ময়মনসিংহ-সমাচার)

অষ্ট্রিয়ার আর্থিক সঙ্কট

অষ্ট্রিয়ায় বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। শিল্পগুলার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ব্যাঙ্কগুলা টলমল করছে। "ক্রেডিট আন্সটাল্ট" নামে একটী বড় ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে। চাষীদের অবস্থাও ভাল নয়। চাষীদের ছেলেরা জমির অভাবে চাষ করতে পারছে না, অথবা ছোট ছোট টুকরা বা নিকৃষ্ট জমি চাষ করছে, অথচ জমিদারদের জমিদারির অন্তর্গত অতি উৎকৃষ্ট জমি হয় পড়ে রয়েছে, না হয় ভাল ক'রে চাষ করা হচ্ছে না। চাষীরা চাইছে সেই সব জমি তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হোক্। গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থাও সুবিদিত নয়, গবর্ণমেণ্ট খরচা কমাচ্ছেন, কিন্তু খরচা কমানো উচিত হচ্ছে কি না পারছেন না। এ বিষয়ে একটী বাধা অষ্ট্রীয়ার সিভিল্ সার্ভিসের লোকেরা। অষ্ট্রীয়ার সকল শ্রেণীর মধ্যে এঁরাই এখন সব চেয়ে বেশী বাঁধা মাইনে পান। এঁদের চট্ ক'রে চাকরি থেকে তাড়ানো যায় না। তা ছাড়া এঁরা বিনা খরচায় নানা সুবিধা ভোগ করছেন—যেমন রেল-ষ্টীমারে বেড়ানো, ছেলেদের স্কুলে পড়ানো, ইত্যাদি।

বিলাতের রপ্তানি-হ্রাস

১৯১৩ সন হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত বিলাতের রপ্তানির পরিমাণ বুঝাইবার জন্য নীচে কয়েকটী সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে :

					১৯৩০		১৯৩১	
					জানুয়ারী	জুলাই হইতে	জানুয়ারী	এপ্রিল
	১৯১৩	১৯২৪	১৯২৮	১৯২৯	হইতে জুন	ডিসেম্বর	হইতে মার্চ্চ	হইতে মে
পরিমাণ (১৯২৪ সনের পরিমাণকে ১০০ ধরিয়া)	১২০	১০০	১০৪'৬	১০৮'৩				
মূল্য (লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)	৫২৫	৮০১	৭২৪	৭২৯				
মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি (১৯২৪ সনের মূল্যকে ১০০ ধরিয়া)	৬৮'৫	১০০	৯০'৪	৯১'০	৭১'১	৬৬'৩	৫১'৬	৪৯'৯

বিলাতের রপ্তানি-বাণিজ্য যে অত্যন্ত কমতির দিকে তাহা উপরের অঙ্কগুলা একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

তুরস্কে আমদানি বন্ধের ব্যবস্থা

তুরস্কে একটী নূতন আইন জারি হইয়াছে। ইহার ফলে ৫০ রকম জিনিষের আমদানি বন্ধ করা হইবে। বিলাসিতার জিনিষ, মদ, পশুচর্ম্ম প্রভৃতি ঐ ৫০ প্রকার জিনিষের অন্তর্গত।

জাপান ও বিলাত গত ৯ মাসে তুরস্কে ১ কোটি ৪০ লাখ পাউণ্ড দামের কাপড় রপ্তানি করিয়াছে। উক্ত আইন অনুসারে এই কাপড়ের আমদানি বন্ধ হইবে।

উপরের খবর কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ হইতে আসিয়াছে। প্যারী হইতে একটী খবর আসিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এইরূপ। আধ কাঁচা মালের উপর শুল্ক শতকরা ২ হইতে ৩ এবং কারখানা-জাত মালের উপর শুল্ক শতকরা ২ হইতে ৬ হারে বাড়ানো হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৭০০ ব্যাঙ্ক বন্ধ

এই বৎসরের প্রথম ১০ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৭০০টী ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়। এই কয়টী ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ১৪০ কোটি ডলার। এই আমানত যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমানতের শতকরা ৪ ভাগ। ১৭০০টী ব্যাঙ্ক ফেল মারার মানে ঐ পরিমাণ আমানতের লোকসান।

অক্টোবরে ৫১২টী ব্যাঙ্ক ফেল মারে। এই কয়টী ব্যাঙ্কের মোট আমানত ৫৬ কোটী ডলার। এ পর্য্যন্ত কোনও মাসে এতগুলা ব্যাঙ্ক ফেল মারে নাই।

কিন্তু এই সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার যে, নবেম্বরের প্রথম তিন সপ্তাহে ২২০টী ব্যাঙ্ক, যাহারা ইতিপূর্ব্বে কাজ বন্ধ করিয়াছিল, তাহারা আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

হাম্বেরীর বাজারে মিশরের তুলা

হাম্বেরী মার্কিণ তুলা কিনে থাকে। মিশর হাম্বেরীর তুলার বাজারে ঢোকবার চেষ্টা ক'রছে। শোনা যায়, মিশর সরকার হাম্বেরীতে ১০,১২ হাজার গাঁট তুলা বেচ্‌বেন। কিন্তু এর দাম নগদ পাওয়া যাবে না। ঠিক হয়েছে যে, ক্রেতারা এর জন্য হাম্বেরী সরকার 'ট্রেজারী বণ্ড' দিয়ে দাম শোধ দেবে।

বিলাতের আর্থিক উন্নতি

বিলাতের "ফেডারেশান অব্‌ বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্‌" ও "এম্পায়ার ইকনমিক ইউনিয়ন" নামক দুটী প্রতিষ্ঠান বিলাতের রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতির উপায় বাৎলাবার জন্য একটী কমিটি গঠন করেন। কমিটির রিপোর্ট বেরিয়েছে। কমিটি বলেন যে, যুদ্ধের পরে ১৯২৫ সনে স্বর্ণমানে ফিরে যাওয়া বিলাতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। স্বর্ণমান চালাতে অন্য জাতিগুলার যেরকম চলা উচিত ছিল তা চলে নি। এইজন্য স্বর্ণমানে ফেরার ফলে বিলাতের ক্ষতি হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি স্বর্ণমানে ফিরে যেতে হয়, তা হ'লে আগে দেখ্‌তে হবে অন্য জাতিগুলা স্বর্ণমান চালাতে আন্তরিক ইচ্ছুক কিনা; তা না হ'লে যদি তারা বিলাতের স্বর্ণমানের সুবিধায় নিজেদের স্বার্থপুষ্টির চেষ্টা করে তা হ'লে স্বর্ণমানে ফেরা ঠিক নয়।

বিলাতের আর্থিক উন্নতির জন্য কমিটি যেসব প্রস্তাব করেন তার গোটা কয়েক এই রকম :

(১) বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলায় এরকম মুদ্রা-ব্যবস্থা হওয়া দরকার, যাতে দেশগুলার মুদ্রার দাম আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশী ওঠানামা না করে এবং দেশগুলার পরস্পরের মধ্যে স্বাধীনভাবে আর্থিক সহায়তা চল্‌তে পারে।

(২) রূপার দাম বাড়াবার জন্য শীঘ্রই একটী আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন আহ্বান করা দরকার। রূপার দাম বাড়্‌লে চীন, ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের লোকদের মাল কেনবার ক্ষমতা বাড়বে। রূপার দাম বাড়াবার একটা উপায় হচ্ছে কেন্দ্র ব্যাঙ্কগুলার পুঁজিতে কিছু পরিমাণ রূপা রাখ্‌বার ক্ষমতা দেওয়া।

(৩) বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুঁজি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাতে বেশী না যায়, বরং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুঁজি বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই যাতে নিয়োজিত হয়, তার চেষ্টা করা।

যুক্তপ্রদেশের আর্থিক অনুসন্ধান সমিতি

যুক্তপ্রদেশের গভর্মেণ্ট ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে একটী আর্থিক অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা ও কৃষিসচিব শ্রীযুক্ত জে পি শ্রীবাস্তব ইহার সভাপতি। ১৯৩১ সনের এপ্রিল হইতে সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। এ পর্য্যন্ত সমিতি এই কয়টী কাজ করিয়াছেন: (১) গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ যে সব সংখ্যাতালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন সেইগুলাকে ভিত্তি করিয়া ইঁহারা কয়েকটী 'চার্ট' ও 'গ্রাফ্' তৈয়ার করিয়াছেন; (২) সমগ্র যুক্তপ্রদেশে ও যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় খুচরা ও পাইকারী দরের হার লইয়া ইঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন; (৩) যুক্তপ্রদেশের প্রধান বাজারগুলায় গম ও ঘরের যোগান সম্বন্ধে ইঁহারা স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়াছেন।

সরকারী চাকুরেদের কাজকর্ম্মে তাহাদের শক্তি কতটা অবধা যায় হয় এ সম্বন্ধে তাঁহারা বর্ত্তমানে গবেষণা করিতেছেন।

যুক্তপ্রদেশে উৎপাদন খরচা, বাজার ও বাজারের অবস্থা এবং আখ, তুলা ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য কি প্রণালীতে টাকা যোগানো হয়, এ সম্বন্ধেও তাঁহারা অনুসন্ধান করিবেন স্থির হইয়াছে।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ বাংলাদেশের শিল্পোন্নতির জন্য কিরূপ চেষ্টা করছেন তা জানা দরকার। তাঁদের চেষ্টা প্রধানতঃ বিবিধ: (১) গবেষণা চালানো—রসায়ন বিভাগে এঁরা নানা প্রকার দেশীয় তৈল ও সাবান নিয়ে গবেষণা করছেন; ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এঁরা কুটীরশিল্পীদের যন্ত্রপাতি কি ক'রে উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করছেন; (২) টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দেওয়া—শ্রীরামপুর উইভিং ইন্‌ষ্টিটিউট্ এবং কয়েকটী ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের সাহায্যে এঁরা বয়ন শিক্ষা দিচ্ছেন; বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যে এঁরা চামড়া 'ট্যান' করবার আধুনিক প্রণালী শিক্ষা দিচ্ছেন, তা ছাড়া ক্যালকাটা টেক্‌নিকাল স্কুল এবং কাঁচড়াপাড়া টেক্‌নিকাল স্কুলের সাহায্যে এঁরা সাধারণ টেক্‌নিকাল শিক্ষা দিচ্ছেন।

৫০০০ 'কাপ' চা বিতরণ

ইণ্ডিয়ান টী অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় চায়ের কাটতি বাড়াবার জন্য প্রধানতঃ দুটী পন্থা অবলম্বন করেছেন:

(১) বিলাতের ও ভারতের গভর্ণমেণ্ট বিদেশী চায়ের ওপর যাতে শুল্ক বসান তার চেষ্টা। ভারত গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে ইতিপূর্ব্বে লেবার গভর্ণমেণ্টকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহির হ'তে আগত চায়ের ওপর পাউণ্ড প্রতি ৪ পেন্স হারে শুল্ক বসাতে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তত্ত্ব বাবের রাজস্ব সচিব স্নোডেন সাহেব সে প্রস্তাবে রাজী হন নি। বিলাতের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কাছে এই ধরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর ফলাফল এখনো জানা যায় নি। যদি বিলাত ঐ ধরণের শুল্ক বসায়, তা হ'লে বিলাতে ভারতীয় চায়ের বিক্রী বাড়বে।

(২) ভারতীয়দের মধ্যে চায়ের প্রচলন বাড়ানো। ভারতের সুদূর পল্লীগুলাতে এখনও অনেক চাষী আছে যারা চা দেখে নি এবং চায়ের আস্বাদ জানে না। এরা যাতে চা-পানে দীক্ষিত হয় এর জন্য অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যে টাকা

চালাচ্ছেন। এঁরা ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের ১১৩টী, যুক্তপ্রদেশের ২১০টী এবং দক্ষিণ ভারতের ১৮৯টী গ্রামকে চা-পানে দীক্ষা দিয়েছেন। এর জন্য এঁরা ৩০০০ বাটী চা বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। চায়ের গুণ বোঝাবার জন্য ফিল্ম্ও তৈরী করা হয়েছে। চা-বিতরণের সাহায্যের জন্য ১৫টী মোটর-বাহিনী এবং ৪টী মোটর গাড়ী নিয়োজিত হয়েছে।

দুনিয়ার আর্থিক সঙ্কট—জেনারল্ স্মাট্সের উক্তি

নভেম্বর মাসে বিলাত ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার সময় জেনারল্ স্মাট্স্ দুনিয়ার আর্থিক সঙ্কট সম্বন্ধে কয়েকটী দরকারী কথা বলেন। তিনি বলেন যে, সমগ্র ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থা অতি খারাপ। শীঘ্র এর উপায় না ক'রলে সেখানে আর্থিক সঙ্কট এবং তার পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ওলট-পালট দেখা দিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের জন্য যে টাকা দাবী করা হয়েছে, তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশী হচ্ছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের দাবী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক গণ্ডগোলের জন্য দুনিয়ার আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। সেইজন্য, ক্ষতি-পূরণ ও অন্যান্য গণ্ডগোল মেটাবার জন্য শীঘ্র এক সম্মিলন আহ্বান করা উচিত। দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য আর একটী জিনিষ দরকার—সেটী হচ্ছে দুনিয়ায় সমর-সজ্জা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক খরচা কমিয়ে দেওয়া।

বিলাতের ফ্যাক্টরীতে শিক্ষার সুযোগ—কমতির দিকে

সম্প্রতি ভারতীয় 'ষ্টোরস্ ডিপার্টমেণ্টের' ডিরেক্টার জেনারল্ তাঁহার ১৯৩০-৩১ সনের রিপোর্টে বলিতেছেন যে, বিলাতের ফ্যাক্টরীগুলাতে ভারতীয়দের শিক্ষা পাইবার সুযোগ কমিতেছে। ইহার কারণ দুইটী :—(১) ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ; (২) বিলাতে ভারতীয় ক্রয়ের কমতি।

১৯৩০-৩১ সনে উক্ত বিভাগ বিলাতের ফ্যাক্টরীতে শিক্ষা পাইতে ইচ্ছুক এরূপ ১৫৪ জন ভারতীয়ের দরখাস্ত পান। এই সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ২০টী বেশী। দরখাস্তের মধ্যে ৭টী প্রত্যাহৃত হয়, ৩টীতে উক্ত বিভাগ কোন সাহায্য করিতে পারেন নাই। ৯৮ জন দরখাস্তকারীকে বিলাতের কোন না কোন ফ্যাক্টরীতে ঢোকানো হয়। বাকী কয়টী দরখাস্ত লইয়া বিলাতের ফ্যাক্টরীওয়ালাদের সঙ্গে লেখা-লেখি চলিতেছিল।

অনেক সময় শিক্ষা দিবার জন্য কারখানাওয়ালারা 'প্রিমিয়াম' দাবী করে। কিন্তু উক্ত বিভাগের চেষ্টার ফলে মাত্র একজন আবেদনকারী ছাড়া আর কাহাকেও প্রিমিয়াম দিতে হয় নাই।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর সি ভি রমণ

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি বিতরণ সম্পর্কীয় উৎসবের সময় স্যর সি ভি রমণ বক্তৃতা দেন। তিনি সেই সময়ে যে সব কথা বলেন তার মধ্যে একটী কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেই কথাটী এই—ভারতে একটী সাধারণ ধারণা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে যা কিছু আবিষ্কার হচ্ছে, তা সবই ভারতে এককালে ছিল ; কিন্তু এ কথাটী সত্য নয় ; বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তা অতীতের কোন যুগে বা কোন দেশেই ছিল না ; বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতির জন্য পশ্চিমাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ক্ষত্রিয়-কর্ম্মীর সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ

(ক্ষত্রিয়-কর্ম্মীর-সমাজের উনবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি আমেরিকা-প্রত্যাগত ডাক্তার কেশবকৃষ্ণ রায়, এম্-ডি (ক্যালিফর্ণিয়া) মহাশয়ের অভিভাষণ)।

• • • • আমার এই অকিঞ্চিৎকর অভিভাষণ সমাপ্তিতে অতি অল্প সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি অত্যাবশ্যক কতকগুলি বিষয়ে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি :

১। আমাদিগের স্বজাতীয়গণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন।

২। আমাদিগের পুত্রগণকে অন্ততঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাদান।

৩। আমাদিগের কন্যাগণকে অন্ততঃ "মাইনর," এবং একান্ত অসমর্থপক্ষে "ছাত্রবৃত্তি" পর্য্যন্ত শিক্ষাদান।

যদি কোনও ছেলে বা মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান।

৪। স্বজাতীয়গণের মধ্যে নৈতিক উন্নতি সাধন ও সর্ব্বপ্রকার মদ্যপান, মাদকদ্রব্য ও কুসংসর্গ পরিহারের জন্য যত্নবান হওয়া।

৫। স্বজাতীয়গণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতিসাধন ও গুরুমন্ত্রে মধ্যে মধ্যে পুরাণাদি হইতে কথকতার দ্বারা শিক্ষাদান।

৬। আমাদিগের কন্যাগণকে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যবান্, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক পাত্রে সম্প্রদান।

অনেক স্থলে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাহার তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা হয়। ইহা অতীব গর্হিত কার্য্য। যেন কোন মতে দায় উদ্ধার হইল! আমার মনে হয়, যেখানে সুপাত্র না পাওয়া যাইবে সেইখানে কন্যাকে কোনরূপ অর্থকরী বিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কন্যাগণের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বলিবার নাই, যেহেতু সম্প্রতি "সর্দ্ধা আইন" বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

৭। আমাদিগের মধ্যে দুঃস্থ বিধবাগণকে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দানের সমুচিত ব্যবস্থা। তাঁহারা কেন সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য লোকের গলগ্রহ হইয়া থাকিবেন? সমস্ত দিন সংসারে যাহার পরিশ্রম করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মাত্র একমুষ্টি অন্ন ও একখানি বস্ত্র পাইবেন ও তাহার উপর কটু কথা, অপমান, ভৎর্সনা ও গঞ্জনা ইত্যাদি সহ্য করিবেন,—ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ। হিন্দু আইনে বিধবাদিগকে সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে বিশেষ কিছুই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। দেখিতে পাই যে, যখনই কোনও অপুত্রক মহিলার স্বামী লোকান্তরিত হন, তখনই তাঁহার আত্মীয়েরা সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করে। যদি তাঁহার কোনও বিষয় সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিরক্ষরতার সুবিধা লইয়া তাঁহাকে প্রায়ই আত্মীয়েরা বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে। এই বিষয়ে আইনসভা হইতে কড়া আইন প্রণয়ন করাইয়া লওয়া উচিত।

৮। আমাদিগের পুত্র-কন্যাগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যায়ামাদি শিক্ষার প্রচলন।

দিন দিন আমাদিগের সন্তানগণের শারীরিক অবনতি হইতেছে দেখিতে পাই। সেইজন্য পুত্রকন্যাগণকে উত্তমরূপে ব্যায়ামশিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে বঙ্গদেশে নারীহরণের কাহিনী প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়। আমার বোধ হয়, এইরূপ ঘৃণ্য ব্যাপার নিম্নোক্ত কারণে হইয়া থাকে,—

(১) আমরা দুর্ব্বল ও ভীরুস্বভাব।

(২) আমরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য।

(৩) আমরা স্ত্রীস্বাধীনতা সমর্থন করি না।

(৪) আমরা আমাদিগের কন্যাগণকে আত্মরক্ষার উপযোগী ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ উদাসীন।

উক্ত দুর্নীতি সমাজ হইতে অবিলম্বে বিতাড়িত করিতে হইবে। যদি কোনও দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা কোনও কন্যা অপহৃতা হয়, তাহাকে কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে উদ্ধার করিয়া দুর্ব্বৃত্তকে আইনের সাহায্যে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরে ঐ কন্যাকে সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে ফিরাইয়া লইতে হইবে।

৯। পূর্ব্বে আমাদিগের শিল্পকলা ও কারুকার্য্য আমাদিগেরই একচেটিয়া ছিল। আমি জ্ঞাত আছি যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য রায় সাহেব কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ের প্রপিতামহ ৺শিবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার মহাশয় তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধির 'কোর্ট জুয়েলার' ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীর নিকটস্থ রাস্তাটি 'শিবমিস্ত্রী লেন' বলিয়া পরিচিত ছিল।

এক্ষণে আমাদের একচেটিয়া কারুকার্য্য ও অলঙ্কার শিল্প ব্যবসাক্ষেত্র অসংখ্য অ-বাঙ্গালী ও অ-কর্ম্মকার শ্রেণীর লোকদ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা রীতিমত অর্থোপার্জ্জনও করিতেছেন, আর কর্ম্মকার-শ্রেণীর শিল্পীরা কোথাও সামান্য মজুরিতে কার্য্য করিতেছেন, কোথাও বা কোনরূপ বৃত্তির অভাবে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে নিষ্পেষিত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

বর্ত্তমান ইতালি

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত কথোপকথন—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন।]

প্রঃ—আপনি ইতালিতে কোথায় কোথায় ছিলেন?

উঃ—এইবার ইতালিতে আমার দ্বিতীয় পর্য্যটন। প্রথম বার ১৯২৪-২৫ সনে ছিলাম ইতালির নানা জায়গায় বিশেষভাবে মিলানে, পাদোভায়, ভেনিসে ও বোলৎসানোয়—এক কথায় সেবার আমি কেবল উত্তর ইতালিই দেখেছি। এ যাত্রায় সুরু করি দক্ষিণ ইতালিতে; কলম্বো হ'তে যাত্রা করে নেপল্‌সে নামি ১৯২৯ সনের জুন মাসে; তখন ভয়ানক গরম; ওখানে কাটে হপ্তাখানেক, তারপর যাই রোমে, রোমে প্রায় দুসপ্তাহ কাটে, এই আমার প্রথম রোম দেখা; তারপর যাই পিসায়, পিসা হতে মিলানে, মিলানের পর ইতালির আর কোথাও সময় কাটাবার সুযোগ হয়নি, সোজা চলে যাই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পর কাটে মাস কয়েক ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রীয়ায়। পরে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডেই কিছুকালের জন্য স্থায়ী বাস হয়—জেনেভায়।

তারপর ১৯৩০ সনে সুইট্‌সারল্যাণ্ডের জেনেভা হ'তে আর একবার ইতালি আসার সুযোগ ঘটে—মিলানে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে বক্তৃতার জন্য ডেকেছিল; ফেব্রুয়ারী মাসে সেই সূত্রেই আবার পাদোভায় যেতে হয়, সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার উপলক্ষে। তখন ইতালিতে কাটে হপ্তা আড়াই। তারপর চলে যাই জার্ম্মানিতে ডিউসিক টেক্‌নোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে। সেখানে ছিলাম চাকরীর মেয়াদে এক বছর।

তারপর আবার আসি ইতালিতে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে, ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে। এখানে বক্তৃতা দিতে হয়, আর এ সূত্রে এখানে কাটে হপ্তা দু'য়েক। তারপর যাই আবার জার্ম্মানিতে (বার্লিনে)।

শেষবার ইতালিতে ফিরি ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবারও রোমে। উপলক্ষ ছিল "লোকবলবিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস"। এই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক বিভাগে আমাকে অন্যতম সভাপতি করা হয়েছিল। এই সূত্রে রোমে কাটে মাস খানেক। তারপরেই জেনেভা হয়ে "ঘরমুখো বাঙ্গালী।"

প্রঃ—তা'হলে মোটের উপর ইতালিতে কত দিন কেটেছে?

উঃ—প্রথম বার ১৯২৪-২৫ সনে—উত্তর ইতালিতে বছর খানেক। আর এবারকার প্রায় আড়াই বছরের ইয়োরোপ-সফরের মধ্যে মোটের উপর মাস তিনেকের বেশী নয়। মিলান দেখা হয়েছে বার তিনেক, পাদোভা বার চারেক, রোমও বার তিনেক। বোলৎসানোয়ই সবচেয়ে বেশী দিন কেটেছে।

প্রঃ—মিলান জনপদের বিশেষত্ব কি?

উঃ—আমাদের দেশের লোকে ইতালির নাম করবামাত্রই তার রাজধানী রোমের কথা মনে আনে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের তরফ থেকে রোম একদম নগণ্য। দুনিয়ার আর্থিক বাজারে রোমের ইজ্জৎ কিছুই নাই। আর্থিক ইতালির কেন্দ্র হচ্ছে মিলান। আসল কথা আধুনিক কল-কারখানার ধনদৌলত যা কিছু সবই উত্তর ইতালির সম্পদ্। উত্তর ইতালি বল্লে মিলান, তুরিন আর জেনোয়া এই তিনটা বড় সহরের নাম করতে হয়। এই সুতর কটা আর এই সহরের আশ-পাশ শিল্পকেন্দ্র, কারখানাকেন্দ্র। এককথায় বলা চলে এইসকল পল্লী-সহরই ইতালিতে বর্ত্তমান জগৎ এনেছে। আধুনিক কর্ম্মজীবন, আধুনিক আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আধুনিক টাকাকড়ির আকার-প্রকার ইতালিয়ান সমাজে দেখতে হলে এই তিন সহরেই আড্ডা গাড়া দরকার, আর এই তিন সহরের ভেতর মিলানই সব চেয়ে বড় আর নামজাদা।

প্রঃ—সেকি মহাশয়, রোম তা'হলে কোথায় গেল?

উঃ—মিলানের লোকেরা রোমকে পুছে না। রোমকে ভাবে সরকারী আফিসের আটলা-দুর্গ। এই হল রোমের আধুনিক রূপ। উত্তর ইতালির বিবেচনায় রোমের আধুনিকতার আর কোন পরিচয় নাই। আসল কথা রোমকে ইতালিয়ানরা মহা নরনারীর গোরস্থান বিবেচনা করে। সেকেলে বাড়া মরের ধ্বংসস্তূপ বুকে বহন করাই রোমের যা কিছু কীর্ত্তি। রোম অতীতের সাক্ষী, রোমের নরনারী প্রাচীনপন্থী। রোমের সমাজে পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, কবর-তত্ত্ব, ঘটোৎকচের মত কুরকুল চেপে রয়েছে, রোমের ঘাড়ে নতুন কিছু বসান অসাধ্য। এইরূপ উত্তরে ইতালিয়ান নরনারীর ধারণা।

প্রঃ—মিলানে আপনি কি কি দেখলেন?

উঃ—মিলানে অস্ত্র-শিল্পের বণিকদের বড় বড় আড়ৎ দেখেছি। এখানকার "আল্ফা রমার্ডাসোনে ইতালিয়ানা" ইতালির সব চেয়ে বড় আড়ৎ। লোহা ইস্পাতের কারখানাও এখানে দেখেছি। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা এখানকার প্রসিদ্ধ। এখানকার বণিকসঙ্ঘ দুনিয়ায় নামজাদা। ইতালির পথ-ঘাট সম্বন্ধে নানচিত্র তৈয়ারী হয় মিলানেই, টুরিং-ক্লাব কেন্দ্রে। এখান-কার বহুনি বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইতালির ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়েই আমাকে বক্তৃতার জন্য ডেকেছিল।

প্রঃ—আচ্ছা তাহলে কি রোমে এরকম ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বড় একটা দেখা যায় না?

উঃ—না। রোম আর রোমের আশপাশ কৃষিপ্রধান। রোমকে মধ্য ইতালির দক্ষিণ সীমানা বলা চলে। রোমের খানিক উত্তরে গোলোক্রেয়া আর ফ্লোরেন্স। এই দুই সহর পৃথিবীর ইতিহাসে নামজাদা। কিন্তু বর্ত্তমান ইতালিতে এই দুই সহর মিলানের কাছে কাণা। এই দুই সহর রোমের মতন, মোটের উপর মধ্য ইতালিরই অন্তর্গত, সিসাও তাহাই গণ্য। মধ্য ইতালিকে ইতালিয়ানরা কখনও আধুনিক শিল্প-সম্পদের কেন্দ্র বিবেচনা করে না।

প্রঃ—তাহলে খাঁটি দক্ষিণ ইতালির অবস্থা কিরূপ?

উঃ—আর্থিক হিসাবে রোম অনপদে দক্ষিণ ইতালির সূত্রপাত ধরে নিতে পারি। দক্ষিণ ইতালির নামজাদা সহর নেপল্স্। এই অঞ্চল আপাদোড়া কৃষিপ্রধান। সিসিলি দ্বীপটাকে দক্ষিণ ইতালির অন্তর্গত ভাবতে হবে।

প্রঃ—আচ্ছা রোমে আপনি কি দেখলেন?

উঃ—সরকারী আফিস, মন্ত্রিভবন, শাসনকেন্দ্রের উচ্চতম বাপ ইত্যাদি। মিলানে আলাপ করেছি, এঞ্জিনিয়ার-দের সঙ্গে, রাসায়নিকদের সঙ্গে, কারখানা-পরিচালক-দের সঙ্গে। এই ধরণের ছিল মিলানের আবহাওয়ায় আমার চলাফেরা। রোমে বিলকুল পট-পরিবর্ত্তন। এখানকার যাঁদের সঙ্গে আমার বহুরূপ বহুরূপ তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বড় বড় সরকারী চাকুরে। কৃষি-সচিব, শিল্পসচিব, যানবাহন-সচিব, স্বাস্থ্য-রক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠান, ম্যালেরিয়া নিবারণের সরকারী কেন্দ্র, রেল বিভাগের বড়কর্ত্তা, বীমাবিভাগের

সরকারী আফিস, যৌবন-আন্দোলনের সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র, রাজকীয় অ্যাকাডেমিয়া বা পরিষৎ, মজুর-আন্দোলনের সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা, ভূমি-সংস্কারের আফিস, ইত্যাদি ইত্যাদি লোকজন বা প্রতিষ্ঠান রোমের আবহাওয়ায় আমার জীবন স্পর্শ করেছে।

অবশ্য কি রোমে, কি নেপল্‌সে, কি মিলানে, কি পাদোভায়,—সর্ব্বত্র টুলো পণ্ডিতদের সঙ্গে পংক্তি-ভোজন বস্তুতন্ত্রতনই চলেছে। বলা বাহুল্য, স্কুল মাষ্টার, গুরুমহাশয়, মৌলভি, অধ্যাপক, গবেষক, তথ্য-সংগ্রাহক, লেখক ইত্যাদি লিখিয়ে পড়িয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সর্ব্বত্রই অনেক কিছু ঘটেছে। মন্দির, মিউজিয়াম, সংগ্রহালয়, সঙ্গীতভবন মহাপুরাণো ইমারৎ আর সেই সবের পরিচালক কিংবা এই সবের বিদ্যায় মুরুব্বি লোকজনের সঙ্গেও সব জায়গায়ই কিছু কিছু গা ঘেঁশাঘেঁশি করতে হয়েছে। আমার জীবনে কোনোকিছু রহস্যময় করার রেওয়াজ নাই।

প্রঃ—এ সব লোকের সঙ্গে আপনি কোন্ ভাষায় কথা বলেছেন?

উঃ—ইতালিতে আমি "নেটিভ"দের ভাষায় অর্থাৎ ইতালিয়ানে কথা বলতে চেষ্টা করেছি; কেন না ইতালিয়ানরা আমার মাতৃভাষা জানে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়েও যে সমস্ত বক্তৃতা দিতে হয়েছে সে সমস্ত ইতালিয়ান ভাষায়ই দিয়েছি। কয়েকটা প্রবন্ধও ইতালিয়ান্ ভাষাতেই ইতালিয়ান্ অর্থনৈতিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি।

প্রঃ—ইতালিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোকের কিরূপ ধারণা?

উঃ—প্রথম্ পর্য্যটনে এ বিষয়ে যেরূপ দেখে এসেছি, এ যাত্রায় তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী দেখতে পেয়েছি। ইতালিয়ানরা প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করতে ঝুঁকছে। তাদের কাগজে ভারতবর্ষের নিত্য-নৈমিত্তিক আলোচনা বেশ মোটা আকারে ঠাঁই পাচ্ছে। যুবক ভারতের কর্ম্ম ও চিন্তা আরও নিবিড়ভাবে পাকড়াও করবার জন্য ইতালিতে একটা পরিষৎ কায়েম করবার চেষ্টা চলছিল। আমাকে এই পরিষদের ডিরেক্টর বাহাল করবার কথা হচ্ছিল। তার উদ্দেশ্য যত আর্থিক ভারতের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় নরনারীর কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার-রাসায়নিক-বণিক্-ব্যাঙ্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মিত গবেষণা চালানো। কিন্তু আমাকে শীঘ্রই দেশে ফিরে আসতে হল বলে কাজটা সম্প্রতি ধামা চাপা আছে। প্রতিষ্ঠানটার নাম "ইস্তিতুতইতল-ইন্দিয়ানো"। এ সম্বন্ধে ইতালির প্রায় সব বড় বড় কাগজে অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

প্রঃ—এবার তাহলে কাশিকম্ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—কাশি শব্দের অর্থ হল, সমিতি বা সঙ্ঘ। শাস্ত্রের বচন সঙ্ঘেই শক্তি,—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" কাশি ধর্ম্মের তাৎপর্য্যই তাই। কাশিজম্ বলে বুঝতে হবে দলনিষ্ঠা, সঙ্ঘনিষ্ঠা, ইত্যাদি। সেকালের ল্যাটিন যুগে এই কাশি-নীতি ওলন্দাজ ছিল। একালের যুবক ইতালিও প্রাচীন রোমান জাতির গণাতন্ত্রী কর্ম্মধারাকে কাজে লাগাতে ঝুঁকেছে। আমাদের ভারতে যেমন আমরা অনেক সময় সেকেলে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মক্ষেত্রেও চালাতে যাই, অবশ্য সবই নতুন আকার-প্রকারে, ইতালিয়ানরাও তেমনি পুরোণো সভ্যতার অনেক কিছু একালের কাজে লাগিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে ইতালিয়ান স্বদেশ-সেবক মাৎসিনিও এই প্রণালীতেই প্রাচীন ল্যাটিন যুগের মহাকবি ভার্জ্জিল আর মধ্যযুগের দান্তেকে আধুনিক স্বদেশী-স্বরাজ-স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রধান গুরুস্বরূপ খাড়া করেছিলেন। প্রাচীনকে নবযুগের কাজে সদ্ব্যবহার করা "রোমান্টিক" ভাবুকতার আন্দোলনের একটা বিশেষ লক্ষণ। সেই ধারা অনুসারে এই কালের ইতালিয়ানরাও কাশিনিষ্ঠা সমাজে প্রচার করেছে।

প্রঃ—তাহলে ফাশিজ্‌মের ভিতর মুসলিনি এলে ঢুকল কোত্থেকে ?

উঃ—মুসলিনি লড়াইয়ের আগে একজন মজুর-পন্থী সোশ্যালিষ্ট ছিলেন। ফাশিস্মো (ফাশিজ্‌মো) তখনকার দিনে বড় বেশী নাগা ঝাড়া করতে পারে নি। একটু আধটু এখানে সেখানে দেখা দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু লড়াইয়ের পর দেশের নানা জায়গায়, নানা কর্ম্মক্ষেত্রে স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠে। তারই অন্যতম লক্ষণ ফাশিনিষ্ঠার উদ্বোধন। মুসলিনিও ইতিমধ্যে নানা ঘাটে টোল খেতে খেতে ফাশিওলার সঙ্গে হরদম মহরম করতে লেগে যান। ফাশিওলাকে হাত করা আর সেগুলাকে নিজের তাঁবে এনে নিজের মতলব-মাফিক কাজ করান—এই হচ্ছে মুসলিনির কৃতিত্ব। তারপর মুসলিনি দাঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফাশিস্মো একটা খাঁটি পারিভাষিকরূপে দিব্যিজয়ী হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—ফাশিজ্‌মের বর্ত্তমান আকার-প্রকার কিরূপ ?

উঃ—শব্দটার অর্থ অবশ্য দলনিষ্ঠা, সঙ্ঘধর্ম্ম, ইত্যাদি ; কিন্তু সঙ্ঘধর্ম্ম বল্‌লে ফাশিস্মোকে বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝা যায় না। দল বেঁধে ফুটবল খেলাও যায়, আবার দলবেঁধে আকাশে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণা করাও যায়। কাজেই মুসলিনির সঙ্ঘনিষ্ঠার শব্দটার কথা ছেড়ে অর্থটার দিকে নজর দেওয়াই বেশী যুক্তিসঙ্গত। প্রথম বারকার ইতালি ভ্রমণের সময় দেখেছি অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত মুসলিনিকে গলদ্‌ঘর্ম্ম, অনেক বেগ পেতে হয়েছে। ইতালিয়ান সমাজে তাঁর কাজকর্ম্ম, তাঁর ফাশিধর্ম্ম তখনও নিরেটভাবে দাঁড়াতে পারে নি। আজ এখানে, কাল ওখানে, আজ এ সমাজে, কাল ও সমাজে মুসলিনির বিরুদ্ধে ছোট বড় মাঝারি প্রতিবাদ তখনো কিছু কিছু দেখা দিত। কিন্তু এ যাত্রায় গিয়ে দেখি, বিগত পাঁচ বছরে মুসলিনি দেশের সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছেন। ফাশিস্মো বাস্তবিক পক্ষে আজকাল ইতালির অলিগলিতে জয় জয়কার ভোগ করছে। বাজারে দাঁড়িয়ে, খোলা মাঠে সভাসমিতি করে অথবা খবরের কাগজে,—ফাশিনীতি অথবা মুসলিনির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করবার মতন সাহস কারো নেই। বরং খোলাখুলি সর্ব্বত্রই প্রচারিত হচ্ছে "মুসলিনি নির্ভুল"। তা ছাড়া দেশের ভেতর যত প্রতিষ্ঠান দেখতে পেয়েছি, তার প্রত্যেকটার নামেই 'ফাশিস্তা' শব্দটা জোড়া আছে।

প্রঃ—আমরা বিদেশে বসে ফাশিজ্‌মের আসল লক্ষণ তাহলে কি করে বুঝতে পারব ?

উঃ—ফাশিজ্‌ম্ বস্তুটার প্রধান কথা সার্ব্বজনিক আত্মকর্তৃত্বের অস্তিত্ব-লোপ। জনসাধারণের স্বরাজ বা ডেমক্রেসী বলে যা কিছু বোঝা যায়, তার উচ্ছেদ-সাধন করাই মুসলিনির প্রধান কীর্ত্তি।

প্রঃ—ফাশিধর্ম্মকে তাহলে একটা সমনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক বলা যায় কি করে ?

উঃ—এইখানেই মুসলিনির বিশেষত্ব। মুসলিনি ছেলে বয়সে আর যৌবনকালে মজুরপন্থী ছিলেন বলেছি। তা ছাড়া ডেমক্রেসী, সাম্য, আত্মকর্তৃত্ব ইত্যাদি বস্তুও মুসলিনির আত্মায় অনেক প্রভাবই বিস্তার করেছিল। কিন্তু লড়াই শেষ হবার সময় সন্ধি কালে মুসলিনি বেশ বুঝেছিলেন যে, ইতালির হাড়ে এসব সাম্য, স্বরাজ, ডেমক্রেসী ইত্যাদি বস্তু সইবে না। তিনি খোলাখুলি প্রচার করেছেন, "ডেমক্রেসী উনবিংশ শতাব্দীর একটা মায়ামুগ-গোছের ছিল ; তার পেছন পেছন ছুটে পৃথিবীর লোকের লোকসান ছাড়া লাভ হয় নি। এর ফলে লোকেরা শিখেছে কেবল পার্ল্যামেণ্টে অথবা অন্যান্য সমিতিতে গিয়ে কথা কাটাকাটি আর বকাবকি করতে। বাক্‌বিতণ্ডার অত্যাচার আর তর্কাতর্কি ইত্যাদি বাজে কথা কপচানোর আওতা হতে মুক্তি দেওয়া হবে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গৌরব।" মুসলিনি এসব কথা অনেকবার অনেক উপলক্ষে প্রচার করেছেন। তাঁর মতে এমন্মাত্র ইতালি নয় গোটা ইউরোপেই ডেমক্রেসী তুলে দেওয়া

বাঞ্ছনীয়। অন্য দেশের লোকেরা কিছু করুক বা না করুক, মুসলিনি যেই নিজের দেশে লোকসেবার সুযোগ পেলেন অমনি নিজ ধর্মনিকে কাজে লাগাতে লেগে গেলেন। এর তাৎপর্য,—স্বদেশসেবক হিসাবে তিনি ইতালিয়ান নরনারীকে আর কথা কাটাকাটির গহ্বরে পড়তে দিচ্ছেন না।

প্রঃ—এক কথায় একে কি তবে একজনের যথেচ্ছাচার বা একাধিপত্য বলা যেতে পারে?

উঃ—হাঁ। সোজা কথায় ইহার নাম ডেস্পটিজ্‌ম্‌। যাকে বলে "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং।" তবে ইহাকে মামুলি যথেচ্ছাচার বলা চলে না, কেন না মুসলিনি একজন খাঁটি স্বদেশসেবক। দেশের জন্য যখন যেখানে যা কিছু করা উচিত, তার জন্য প্রাণপাত করতে মুসলিনি রাজী আছেন, আর প্রস্তুতও আছেন। স্বপনে স্বপনে নিশি জাগরণে ইতালিয়ান নরনারীর হিতসাধন ছাড়া মুসলিনির আর কোন চিন্তা বা কাজ নাই। মুসলিনি খাটতেও পারেন ঠিক ভূতের মত। আমাদের কৌটিল্য যে সকল নরপতিকে রাজর্ষি বলেছেন, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যে রকম আদর্শ রাজা চেয়েছিলেন, আমরা রামরাজ্য বললে যা বুঝি, মুসলিনি ব্যক্তিটা আর তাঁর কাজকর্ম, ধরণধারণ, সবই প্রায় সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরেজী পারিভাষিকে একে বলে এন্‌লাইটেণ্ড বা বেনেভোলেণ্ট ডেস্পটিজ্‌ম্‌। এই ধরণের যথেচ্ছাচারশীল একাধিপত্য ইতিহাসে অনেকবার দেখা গেছে। আমাদের অশোক, আকবর, শিবাজী, ফরাসী চতুর্দশ লুই, প্রাশিয়ান ফ্রেডরিক, রুশ পিটার ইত্যাদি নরপতি মুসলিনির জাতভাই। এঁরা সবাই যোদ্ধেটে, কিন্তু খাঁটি স্বদেশসেবক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে নিজের সমাজকে "দুরিয়ে" উন্নত করবার, জোর-জবরদস্তি করে ঠেলে তুলবার কাজে অধিষ্ঠীয় কর্মযোগী। এই ধরণের কতিৎকর্মা আদর্শনিষ্ঠ লোকহিতসাধক বাদ্‌সায়াই জগতে যুগান্তর এনে ছেড়েছে।

আধুনিকতার যোলশেত্তিক রুশিয়ার মাহবরেরাও জাত হিসাবে মুসলিনির চেয়েই বেশীরভিনিষ্ঠ কর্মবীর। মুসলিনির মতন সোভিয়েট স্বদেশসেবকেরাও বোল আনা ডেস্পট। তাঁরাও ডেমক্রেসী বা স্বরাজের তোয়াক্কা রাখেন না।

প্রঃ—ইতালিতে কি তাহলে আজকাল কোন পার্লামেণ্ট নেই?

উঃ—ফাশিষ্ট আমলে প্রথম প্রথম কিছুদিন পার্লামেণ্ট কাজ চালিয়েছিল, কিন্তু পার্লামেণ্টের মেম্বরেরা অনেকেই ফাশিষ্টদিগকে বরদাস্ত করতে পারত না। কাজেই ঝগড়াঝাটি চরমরূপে দেখা দিত। এই সব ঝঞ্ঝট এড়াবার জন্যে মুসলিনি পার্লামেণ্টের বালাই তুলে দিয়েছিলেন। বিলকুল নিপার্লামেণ্ট ভাবে মুসলিনি ফাশিষ্টরাজ চালিয়েছেন কয়েক বৎসর। কিন্তু এ যাত্রায় ১৯২৯ সনে যখন ইতালিতে পৌঁছলাম তখন দেখলাম মুসলিনিরাজে আবার এক পার্লামেণ্টের উদ্ভব হয়েছে। এই পার্লামেণ্ট অবশ্যই আগাগোড়া মুসলিনির এক খেলনের ইয়ার অর্থাৎ স্বপক্ষীয় বন্ধুবান্ধবে ভরা। ফাশিষ্ট দলের বহির্ভূত কোন লোক এই নূতন পার্লামেণ্টের মেম্বর নন। পার্লামেণ্টটাকে এক কথায় মুসলিনির বৈঠকখানা বা মন্ত্রণা-সভা বলা যেতে পারে। তবে এ একটা খাঁটি নতুন ছাঁচের পার্লামেণ্ট। এর ধরণধারণ অতি বিচিত্র।

প্রঃ—এ কি তাহলে যথেচ্ছাচার নয়?

উঃ—হাঁ, যথেচ্ছাচার বটে; কিন্তু আগেই বলেছি এই যথেচ্ছাচার ছেলেপিলের জন্য মা-বাপের যথেচ্ছাচারের মতন। ফাশিষ্ট শাসনকে এই হিসাবে পিতৃতন্ত্র একাধিপত্য বলতে পারি। ঠিক যেমন আমাদের কালিদাস দিলীপ সম্বন্ধে বলে গেছেন—রাজাই হচ্ছেন বাপ, বাপগুলো ছেলেদিগকে পালন করেছে মাত্র। "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ"।

প্রঃ—আপনি তাহলে এ ধরণের যথেচ্ছাচারকে পছন্দ করেন?

উঃ—মুখে রাখা উচিত যে স্বরাজ, আত্মকর্তৃত্ব, ডেমক্রেসী এক জিনিষ, আর সুরাজ, সুশাসন, দেশোন্নতি, জনসাধারণের হিতসাধন আর এক জিনিষ। স্বরাজ অর্থাৎ ডেমক্রেসী না থাকলেও সুরাজ থাকা সম্ভব, দেশকে, দেশের লোকজনকে টেনে উন্নত করা সম্ভব। মুসলিনি খোলাখুলি সজ্ঞানে স্বরাজকে তাড়িয়েছেন। তাঁর মতলব ইতালিতে সৌরাজ্য কায়েম করা। সেই সৌরাজ্যটা ফাশিষ্ট আমলে চল্‌ছে। তার তারিফ করতেই হবে। এই ধরণের সৌরাজ্যই বোলশেভিক রুশিয়াতেও আমি আছে। সৌরাজ্যের সঙ্গে শাসন-প্রণালীর আদিক সম্বন্ধ যে বেশী নয় তাহার আর এক প্রমাণ এই।

প্রঃ—আপনি বল্‌লেন যে, মুসলিনির নতুন পার্ল্যামেন্টটা একদম বিচিত্র ধরণের। এর বিশেষত্বটা কি?

উঃ—পৃথিবীতে যত জায়গায় পার্ল্যামেন্ট আছে, সব জায়গায় জেলা অর্থাৎ জনপদ হিসাবে লোক বাছাই হয় আর পার্ল্যামেন্টের সভ্য কায়েম করা হয়। কিন্তু মুসলিনির এই নতুন পার্ল্যামেন্টে এই মামুলি রীতি ষোল আনা বর্জ্জন করা হয়েছে। এই হিসাবে মুসলিনি একজন "বাপকা বেটা", একজন চরম বিপ্লবী। এই মামুলি বাছাই-প্রথার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে, আর্ম্মাণিতে এমন কি বিলাতেও কমসে-কম বিগত ২৫।৩০ বছর ধরে লিখিয়ে পড়িয়ে মহলে অনেক আন্দোলন চল্‌ছিল। কিন্তু কেহই কোথাও এই সাবেকী পার্ল্যামেন্ট-প্রথা তুলে দিয়ে নতুন কিছু খাড়া করাতে সাহসী হয় নি। যা কিছু নানা দেশে খাড়া করা হয়েছে, তা খাঁটি পার্ল্যামেন্ট-স্থানীয় জনসভা নয়। মুসলিনির তাঁবে সাবেক প্রথা একদম উড়ে গেল। আজ তার বদলে যেটা খাড়া হল সেটা খাঁটি পার্ল্যামেন্টই বটে।

প্রঃ—জনপদগত বাছাইয়ের পরিবর্ত্তে তাহলে আবার কোন্ ধরণের বাছাই ফাশিষ্ট পার্ল্যামেন্টে কায়েম হয়েছে?

উঃ—ইয়োরোপের নানা দেশের নানা লোকে বুঝেছিল যে, দেশের জনসভায় কর্ম্ম হিসাবে, পেশা হিসাবে, বাসনা হিসাবে সভ্য বাছাই হওয়া উচিত। যেখানে অমুক জেলার সভ্য না হয়ে অমুক বাসনার প্রতিনিধি, এই আদর্শে পার্ল্যামেন্ট কায়েম হলে নরনারীর বিভিন্ন স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে—এই ছিল বিগত ২০।২৫ বৎসরের গতিশীল ভাবুকদের ধারণা। মুসলিনি গতিশীলদের ধারণাই কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর এই নয়া পার্ল্যামেন্টের মেম্বরেরা কেহ চাষীর প্রতিনিধি, কেহ মজুরের প্রতিনিধি, কেহ কেরাণীর প্রতিনিধি, আবার অপর দিকে কেহ জমিদারের প্রতিনিধি, কেহ পুঁজিপতির প্রতিনিধি, কেহ বা কর্ম্মকর্ত্তা-পরিচালকদের প্রতিনিধি। জগতের শাসন-প্রণালীতে এই এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট সুরু হয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা, ফাশিজ্‌মের আর কোন লক্ষণ আছে?

উঃ—এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল একটা লক্ষণের কথাই বল্‌ছিলাম। সেটা শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধীয়। সেই শাসন-প্রণালীতে স্বরাজ বা ডেমক্রেসীর অভাব প্রচুর, এই কথাটাই বুঝিয়েছি। এবার ফাশিজ্‌মের দ্বিতীয় লক্ষণ বিবৃত করছি। আগেই বলেছি মুসলিনি যৌবনে ছিলেন মজুরপন্থী সোশ্যালিষ্ট। তখন তাঁর স্বধর্ম্ম ছিল মজুরে মনিবে লড়াই বাধান। মজুর-শ্রেণীর স্বার্থ আর মনিব-শ্রেণীর স্বার্থ যে এক নয় এই ছিল তখনকার দিনে তাঁর সমাজ-দর্শন। মুসলিনি দেশের হাল হাতে পাবামাত্রই বুঝে নিলেন যে, সোশ্যালিজ্‌মের বুকনি অর্থাৎ শ্রেণী-বিরোধ দিয়ে আর কাজ সামলান চলবে না। তাই জায়গায় তিনি দর্শন কায়েম করলেন শ্রেণী-সাম্যের বা শ্রেণী-সামঞ্জস্যের। মজুরের শত্রু মনিব নয়, আর মজুরও মনিবের শত্রু নয়। আর দুইই দেশের সেবক, রাষ্ট্রের ভৃত্য। এই হ'ল মুসলিনির নতুন নীতি। অবশ্য এই নতুন নীতিও মুসলিনির নিজ মাথার সন্তান নয়। সেই বিস্‌মার্কের আমল থেকে বহুকাল ধরে ইয়োরামেরিকার সকল দেশেই সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধে

শ্রেণী-সামঞ্জস্যের মত চলে আসছিল। 'ভাই ভাই এক ঠাঁই—ভেদ নাই ভেদ নাই'—এই ছিল এক কথায় এই সামঞ্জস্য-নীতির মূলমন্ত্র। মুসলিনির বাহাদুরী এই যে, তিনি মাদকোচা মেরে এই নীতিটাকেই ইতালির মাটীতে গেড়ে দিয়েছেন। গেড়ে দিয়েছেন কেবল বোলচালে, বক্তৃতায় আর বই লেখালেখিতে নয়—সোজাসুজি আইন করে। মুসলিনি-রাজের সোড়ার কথাই হচ্ছে রাষ্ট্র। এর কাছে ধনিকও কাণা, মজুরও কাণা। কোন ব্যবসা, কোন শ্রেণী কোন দল স্বাধীনভাবে অপর কোন শ্রেণী, অপর কোন দল, অপর কোন পেশার বিরুদ্ধে ওস্তাদ্ করতে পর্য্যন্ত অধিকারী নয়। করেছ কি মরেছ। খাড়া আছে ফাশিষ্ট রাষ্ট্রের চাবুক।

প্রঃ—ফাশিষ্ট ইতালিতে তাহলে কি সোশ্যালিজ্‌ম্ নেই?

উঃ—না। শাসন-প্রণালীতে স্বরাজ বা ডেমক্রেসীর পক্ষ-প্রাপ্তি যেমন ফাশিজ্‌ম্‌এর প্রথম স্বধর্ম্ম, তেমনি সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর বিলোপ সাধন ফাশিজ্‌ম্‌এর দ্বিতীয় স্বধর্ম্ম। সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর শ্রেণী-বিরোধের জায়গায় দাঁড়িয়েছে ইতালিতে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌এর রাষ্ট্রীয় ঐক্য। মুসলিনি জবরদস্ত ন্যাশনালিষ্ট,—ঐক্যপন্থী, সামঞ্জস্য-পন্থী শক্তিপূজক।

বছর চল্লিশ পঞ্চাশেক আগে জার্ম্মাণ বিস্মার্ককে "সেকেলে" সোশ্যালিষ্টরা হুমকাত সন্ত্রস্ত। ঠিক সেইরূপই একালের সোশ্যালিষ্ট অর্থাৎ "কমিউনিষ্টরা" —রুশ বোলশেভিকরা মুসলিনিকে তাদের যমস্বরূপ বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। কমিউনিজ্‌মের মুক্তরই হচ্ছে ফাশিজ্‌ম্।

প্রঃ—আচ্ছা ফাশিজ্‌ম্‌এর আর কোন নতুন লক্ষণ দেখেছেন কি?

উঃ—হাঁ, দেখেছি। কিন্তু তাকে ফাশিজ্‌ম্‌এর লক্ষণ বলব কি মামুলি সৌরাজ্যের লক্ষণ বলব বুঝে উঠতে পারছি না। সহজে এই লক্ষণটাকে শিল্পনিষ্ঠা বলতে পারি। মুসলিনির আমলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হতে 'যায় প্রাণ থাক মান' আদর্শে দেশটাকে শিল্পোন্নতির, আধুনিক কলকব্জাপ্রধান ফ্যাক্টরী-কারখানার দিকে সজোরে ঠেলে তোলা হচ্ছে। যে সকল আইন করলে দেশটা সহজে অল্প সময়ে নানা স্থানে নানা ক্ষেত্রে এক সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী যন্ত্রপাতিবহুল কারবারে ভরে উঠ্‌তে পারে তার প্রাচুর্য্য ফাশিষ্ট আমলের একটা বড় কথা। বিদেশী পারিভাষিকে এক কথায় তার নাম ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালি-জেশন্, আমাদের পারিভাষিকে আমরা এক কথায় যাকে বলি স্বদেশী আন্দোলন।

প্রঃ—সেকি রকম? ইতালিতে তাহলে মুসলিনির আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আধুনিক কলকব্জার আর শিল্পনিষ্ঠার প্রভাব ছিল না?

উঃ—কথাটা একটু গভীরভাবে বোঝা দরকার। বিলেতের তুলনায় ফ্রান্স আর জার্ম্মাণি ১৮৩০ সনেও কৃষিনিষ্ঠ, পল্লীনিষ্ঠ, পাড়াগেঁয়ে মফস্বল মাত্র ছিল। বিলেতের ইংরেজ জাত হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিজেশন-কারবারে মানবজাতির অগ্রণী। আর ইতালি ১৮৭০ সনেও ঠিক ১৮৩০ সনের ফ্রান্স-জার্ম্মাণির মতনই প্রায় ষোল আনা কৃষিনিষ্ঠ পল্লীজীবী মফস্বলে পাড়াগাঁ মাত্রই ছিল। তারপর আস্তে আস্তে ইতালিয়ান সমাজে শিল্পনিষ্ঠা দেখা দেয়, ঠিক যেমন জাপানে আর ভারতেও প্রায় সেই সময়ই কিছু কিছু আধুনিক ফ্যাক্টরী-জীবন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৪ সন অর্থাৎ লড়াইয়ের সময় কাল পর্য্যন্ত ইতালিতে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিজ্‌ম্ বা শিল্পনিষ্ঠা বড় বেশী বিস্তৃত ছিল না। যা কিছু ছিল, তারও অনেক কিছুতেই হয় ইংরেজ, না হয় জার্ম্মাণ, না হয় ফরাসী জাত ছিল কর্ম্মকর্ত্তা, পরিচালক, পুঁজিপতি। ইতালিয়ানরা এসব বিষয়ে অনেকটা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" ছিল, এইরূপ বললেই অবস্থাটা বোঝা যেতে পারে। যেই লড়াই সুরু হল, তখনই দেখা দিল জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে বয়কট। কাজে কাজেই ইংলণ্ড আর ফ্রান্স—এই দুই দেশের ঘাড়ে পড়ে গেল ইতালিকে শিল্পনিষ্ঠার মজবুদ করবার দায়িত্ব।

কিন্তু যেটারা ইংরেজ আর ফরাসী নিজ ঘর সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। কাজেই যেন তেন প্রকারেণ ইতালিয়ানরা নিজেরাই স্বদেশী আন্দোলন পুষ্ট করতে বাধ্য হল। এক কথায় আমরা ভারতে যেমন ১৯০৫এর যুগে স্বদেশী আন্দোলন কায়েম করেছি, ইতালিয়ানদের স্বদেশী আন্দোলনেরও প্রায় সেই সময়ই সূত্রপাত হয়েছে। ইতালি অবশ্য ভারতের চেয়ে খানিকটা বেশী দূর এগিয়ে গেছে, তবে শিল্পনিষ্ঠার ধারাটা যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা চালালে ইতালির অবস্থা পরিষ্কার হয়ে আসবে। মনে রাখা উচিত যে, লড়াইয়ের প্রভাবে ভারতে যেমন, ইতালিতেও তেমন শিল্প-নিষ্ঠার বন্যা ছুটেছে। সেই বন্যাটাকেই মুসলিনি হস্তেমুখী হয়ে রাষ্ট্রের বিশ্বাস দিয়ে ইতালিয়ান নরনারীর ভেতর বইয়ে দিচ্ছে। আমার মতে এই শিল্পযোগ মুসলিনির অন্যতম কীর্তি। কাজে কাজেই ফাশিজ্‌মের তৃতীয় লক্ষণ হিসাবে শিল্পনিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পনিষ্ঠার চাষ-আবাদকে "আধুনিক" প্রণালীতে অগ্রগতি ইত্যাদির সাহায্যে উন্নত করে তোলাও বুঝতে হয়।

প্রঃ—তাহলে দেখছি আপনার মতে ফাশিজ্‌মের ভিতর রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির কোন নতুন আবিষ্কার নেই।

উঃ—বাস্তবিকই তাই। আর্থিক হিসাবে ইতালি,—ইংলণ্ড আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের চেয়ে অনেক নীচু ধাপে অবস্থিত। তাদের উঁচু ধাপকে আদর্শ করে মুসলিনি ইতালিকে তাদের পেছনে পেছনে যথাসম্ভব ঠেলে তুলবার চেষ্টা করেছেন। প্রণালীগুলা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কিছুই নাই। সব প্রণালীই অগ্রণী দেশগুলায় অনেকদিন ধরে কায়েম হয়ে রয়েছে। এই হিসেবে ফাশিষ্টদের আর্থিক কর্মকৌশল আর সোভিয়েট রুশিয়ার বোল-শেভিক অর্থনীতি বিলকুল এক। বাস্তবিক পক্ষে শিল্প-নিষ্ঠার উৎপ্রেরণা হিসাবে যুবক ভারতের স্বদেশী আন্দোলনও এই ফাশিজ্‌ম্ ও বোল্‌শেভিজ্‌ম্‌এরই সম শ্রেণীভুক্ত।

সমাজনীতি সম্বন্ধে, আগেই বলেছি, মুসলিনি বিসমার্ক ইত্যাদি সোশ্যালিষ্ট-বিরোধী রাষ্ট্রকর্তাদের পথেই নিজের পায়সী চালাচ্ছেন। মুসলিনি চান সমাজের দলাদলি ধ্বংস করতে আর তার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিনিষ্ঠ মজবুত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। ইংরেজি পারিভাষিকে এর নাম এক কথায় ষ্টেট-সোশ্যালিজ্‌ম্। আজকালকার দিনে এই বস্তুই ফরাসী পারিভাষিকে "সলিদারিসম্" অর্থাৎ দায়বদ্ধতা নামে প্রচলিত। সোজা কথায় তার নাম ন্যাশনালিজ্‌ম্ অর্থাৎ জাতীয় ঐক্য কিংবা স্বাদেশিকতা। বাস্তবিক পক্ষে বিসমার্ক হতে মুসলিনি পর্যন্ত সোশ্যালিজ্‌ম্-বিরোধীরা ষোল আনা সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর ঘর নন্। তাঁরা সোশ্যালিজ্‌মের দু-টা বর্জন করে সু-টা গ্রহণ করেছেন। দু-টা বর্জন শ্রেণী-বিরোধ আর দুটা হ'ল আপামর জনসাধারণের জন্য আয়বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রের সুব্যবস্থা, ইত্যাদি। সহজে এই কথাটা নিম্নলিখিত ফর্মুলায় দেখিয়ে দিচ্ছি :

ফাশিজ্‌ম্—ষ্টেট সোশ্যালিজ্‌ম্=সলিদারিসম্=
ন্যাশনালিজ্‌ম্ (রাষ্ট্রীয় ঐক্য, স্বাদেশিকতা)
+সোশ্যালিজ্‌ম্ (দু বাদে যা থাকে অর্থাৎ মজুর ইত্যাদি শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টি)।

এইবার রাষ্ট্রনীতির কথা। স্বরাজ ভেঙে সুরাজ গড়া মুসলিনির কীর্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ভিতরে নূতনত্ব কিছুই নাই, আগেই বলেছি। সেকালের বোম্বেটে বাদসারা সকলেই ছিলেন এই মেজাজের ও চরিত্রের লোক। মুসলিনির বাহাদুরী এই যে, যে যুগে লোকেরা ডেমক্রেসীর নাম শুনবা-মাত্রই আহ্লাদে আটখানা হয়, সেই যুগে এদিক্ ওদিক্ না তাকিয়ে সোজাসুজি প্রচার করলেন ডেমক্রেসী মানুষের অনিষ্টকারক। আগেই বলেছি, এই প্রচারেও মুসলিনি অগ্রণী নন।

ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে আর আমেরিকাতেও ডেমক্রেসীর কু সম্বন্ধে বিগত ৫০ বছর ধরে মত জারি আছে। সেই মতটাই মুসলিনি আত্মস্থ করে নিজের দেশের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। আগেই বলেছি, ডেস্পটিজ্‌ম্‌ হিসাবে রুশিয়ার বোলশেভিজ্‌ম্‌ ইতালিয়ান ফাশি-ধর্ম্মেরই মাসতুত ভাই। প্রভেদ এই যে, বোলশেভিকেরা গরীবদের মা-বাপ রূপে ধনীদের উপর কড়া শাসন জারি করেছে। আর মুসলিনি ধনী ও নির্ধন দুয়েরই উপর যথাসম্ভব সমানভাবে চাবুক লাগাতে চেষ্টিত।

প্রঃ—আচ্ছা মুসলিনির যদি নতুন কিছুই না থাকে, তবে তাঁকে আপনি যুগাবতার অবতারস্ত দেশসেবক বলেছেন কি জন্য?

উঃ—ও লোকটা বুঝেছে ইতালির ঘাড়ে কি সইবে। মুসলিনি বেশ জানে ইংরেজরাজের শাসন-প্রণালীর ধারা ইতালির চৌদ্দ পুরুষে কখনও দেখেনি। মুসলিনি বেশ জানে যে, আমেরিকা ও জার্ম্মাণির ধনদম্পদ্‌ ইতালির সমাজে এক প্রকার স্বপ্নমাত্র। ইতালি এখনও বহু দিন কৃষিপ্রধান থাকতে বাধ্য। অধিকন্তু ইতালি ইয়োরোপের যাপে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানেই অধমস্ত। এই সকল দুর্ব্বলতা যতদিন ইতালিয়ান নরনারীর শিরা-উপশিরায় বয়ে যাবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইতালির সমাজে যদি ডেমক্রেসীর তর্কাতর্কি হয়, সোস্যালিজমের বাদবিসম্বাদ থাকে, তাহলে আন্তর্জ্জাতিক দুনিয়ায় ইতালির পক্ষে শক্তিশালীরূপে কাজ করা একরূপ অসম্ভব। মুসলিনির চিন্তায় একমাত্র আরাধ্য বস্তু,—জগতে ইতালিয়ান নরনারীর প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা। আর এই প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিনি যে অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, কর্ম্মনিষ্ঠা ও জীবনোৎসর্গ দেখিয়ে যাচ্ছেন, তা যে-কোন যুগের, যে-কোন সমাজের উন্নতিকামী জননেতার পক্ষে আদর্শস্থানীয়। মুসলিনি ইতালিয়ান সমাজে এনেছেন নতুন কোন দর্শন নয়, নতুন-কোন ধর্ম্ম নয়, নতুন কোন কর্ম্মকৌশল নয়, নতুন কোন চিন্তা-প্রণালী নয়,—এনেছেন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এনেছেন শক্তিযোগ, এনেছেন দেশের জন্য প্রাণদান করবার প্রবৃত্তি, এনেছেন আমাদেরই সুপরিচিত স্বদেশী আন্দোলনের ভক্তিযোগ।

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ", নবেম্বর, ১৯৩১

আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য দুনিয়াব্যাপী প্রচেষ্টার ভাবী স্বরূপ

অনেক দিক্ দিয়া বর্ত্তমান দুনিয়ার যে আর্থিক পুনর্গঠন হওয়া আবশ্যক একথা কেহ অস্বীকার করে না। এই পুনর্গঠন-চেষ্টা যে আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, সমস্যাটা পুঁথিগত না রহিয়া প্রকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক গিয়ুসেপে দে মিচেল্স্ (ইনি আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসের কার্য্যনির্ব্বাহকদের অন্যতম) এই আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।

কয়েকটি মূলনীতি

জীবন ও সামাজিক বিবর্ত্তন যে সকল শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ আর্থিক ও সামাজিক সম্বন্ধসমূহের রূপগুলি যেসকল শক্তিদ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, সেগুলির সম্পূর্ণ ফলাফল স্পষ্ট করিয়া তোলা এই পুনর্গঠন প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে। যাঁরা বর্ত্তমান দুনিয়া সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন তাঁরাই স্বীকার করেন যে, ইহার ব্যাধির মূল কথাটি এই যে, চক্রাকারে একের পর অন্য বাণিজ্যিক তাঁটা দেখা দেয়। তার ফলে যে দুর্য্যোগ বা ক্রাইসিস্ দেখা দেয় তার গভীর কারণ খুঁজিতে হইবে উৎপাদনের কারিগরিতে (টেক্‌নিক) পরিবর্ত্তনবশতঃ, উৎপাদনের শক্তিসমূহের বিক্ষোভবশতঃ (ডিরেঞ্জমেণ্ট) ও বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থায়িভাবে কার্য্যকরিণ অন্য বহু কারণ বশতঃ গুরুতর বিশৃঙ্খলার (ডিস্‌অরগ্যানিজেশন)। তাঁটার এই সকল গভীর ও স্থায়ী কারণ দূর করা যাইতে পারে শুধু এক সম্পূর্ণ নূতন আর্থিক ভিত্তি গঠন করিয়া। সে ভিত্তি সম্ভব হয় ধন-উৎপাদনে তিনটি ফিনিষের—শ্রম, জমি ও কাঁচা মাল, এবং পুঁজিপাটা—আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ দ্বারা ও উন্নততম কল আবিষ্কারের নিমিত্ত পরস্পরের মিলন দ্বারা।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, চক্রাকারে পূর্ব্যমান হেতুসমূহের দ্বারা সংঘটিত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন আর্থিক তাঁটার পক্ষে উৎপাদনের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ দাওয়াই নহে, আর চক্রাকারে পূর্ব্যমান তাঁটার ফলে যে বেকারের উদ্ভব হয় তার পক্ষে ত আরও নহে। সমগ্র পরিকল্পনা হইতেছে বিশ্ব অর্থনীতিকে নূতন ভূমিতে দাঁড় করাইয়া দেওয়া। উদ্দেশ্য: (১) যতদূর সম্ভব ততদূর আর্থিক স্থায়িত্ব স্থাপন করা ও গুরুতর দুর্য্যোগ ও গুরুতর বেকার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে আভাস দেওয়া,—গুরুতর দুর্য্যোগের অর্থ অমুক অমুক দেশে উৎপাদনের অমুক অমুক ধরণের সাদা নষ্ট হইয়া যাওয়ার জন্য অথবা সাধন ও উৎপাদনের সাদা নষ্ট হওয়ার জন্য অনুযায়ী গোলযোগে যে গভীর ও পুনঃ পুনঃ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহা নহে; ইহার অর্থ উৎপাদন ও বণ্টনের উপায়ে আর্থিক বিশৃঙ্খলা। এই উপায়কে নূতন ভিত্তির উপর পুনর্গঠন করিতে পারিলে মানবের কাজকর্ম্মের ও সমাজের বিপজ্জনক ব্যাধির কথা

পুর্ণাঙ্গে টের পাওয়া যাইবে। যদি মনে করা হয়, এইরূপে সকল আর্থিক অঘটন বিদূরিত হইয়া যাইবে, তবে ভুল হইবে। বস্তুতঃ সকল যুগে আর্থিক সাম্য কোন না কোন সময়ে পর্য্যবসিত হইবে। আর্থিক ক্রিয়াসমূহ আকস্মিক আঘাত ও দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে। কারণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকল প্রাণবন্ত বস্তুর সঙ্গে চাহাই হইল নিয়ম। কিন্তু আর্থিক ক্রিয়াকলাপের বাধাগুলিকে যদি কোনক্রমে কম তীব্র, স্থান বিশেষে বন্ধ করা ও সংখ্যায় কমাইয়া ফেলা সম্ভব হয়, যদি সেইরূপ উপায় আবিষ্কার করা যায়, তবে তা যে একটা কল্যাণকর কিছু হইবে তাতে সন্দেহ নাই। আর বেকার সমস্যা তখন শিল্পগত বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধ ও প্রতীকারযোগ্য রূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

পুনর্গঠনের বিভিন্ন রূপ

লোকবল ও শ্রম।—শ্রমের চলাচল সমস্যাকে এ পর্য্যন্ত (সাধারণতঃ অস্থায়িভাবে ও শ্রম-সম্বন্ধীয় অনুসারে) শ্রমিকদিগকে স্থান দেওয়ার সমস্যারূপে গণ্য করা হইয়াছে। ১৯১৯ সনে ওয়াশিংটনে আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে বেকারের প্রতিষেধকরূপে প্রশ্নটিকে এই ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ফলতঃ সমবৌতার আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসকে নিয়োগ বিনিময়ের জাতীয় প্রণালীসমূহের সহযোগের ভার দেওয়া হইয়াছিল। অন্য দেশে নিযুক্ত হইবার জন্য কোন দেশে শ্রমিকের যাত্রা হইবে যদি দুই দেশের মধ্যে এ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি হয়,—অবশ্য নিয়োগকারীদের ও শ্রমিকদের সঙ্ঘসমূহের মতামতকে উপেক্ষা করিয়া নহে। বহু বিভিন্ন কারণে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবসমূহ বিভিন্ন দেশ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই; মূল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রস্তাবমত কাজ করা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার এবং প্রস্তাবমত কাজে বেকার-সমস্যার এক দিক্ মাত্র সমাধান হইবে, কিন্তু ইহা সমূলে নিপাত করিতে সমর্থ হইবে না। জাতীয় প্রণালীর মত আন্তর্জ্জাতিক কার্য্য ফুটাইবার প্রণালীও বেকারের দুর্দ্দশা দূর করিতে বা কমাইতে পারিবে না।

ওয়াশিংটন সম্মেলন নিয়োগ বিনিময় প্রণালী, শ্রমিক স্থাপনা ও লোক চলাচল (মাইগ্রেশন) এই তিনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কাজটির ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করা উচিত, উৎপাদনের সকল রকম শক্তির সহযোগ আবশ্যক।

কোন কোন দেশ জনবলের আতিশয্যজনিত নানা কুফল ভোগ করে, কিন্তু এই সব দেশে হয়ত উৎপাদনের একটি বা দুইটি প্রকারই অভাব থাকে। অন্য দিকে কোন কোন দেশে কাঁচামাল অথবা পুঁজিপাটার অভাব না থাকিলেও হয়ত লোকবল অত্যন্ত কম। যদি অতিশয় জনবল-বিশিষ্ট দেশসমূহ হইতে লোকদের অল্প লোকবিশিষ্ট দেশসমূহে পাঠান সম্ভব হইত, তবে দুনিয়ার আর্থিক সম্পদ্ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইত। কারিগরির পরিবর্ত্তনে ও শুল্কের যান্ত্রিক উদ্ভাবনায় যে সকল লোক কর্ম্মচ্যুত হয়, তাদের তৎক্ষণাৎ অন্যত্র কাজ পাওয়া সম্ভব হইত। এক কথায়, লোকের ধন ও মঙ্গলের পরিমাণ বাড়িত এবং আর্থিক ও সামাজিক অঘটনের গুরুতর কারণগুলি দূরীভূত হইত। দুনিয়ায় এমন বহু স্থান আছে যাহা মোটেই কর্ষিত হয় নাই, অথবা অল্প কর্ষিত হইয়াছে, সেগুলিতে অনেক লোক ধরিতে পারে ও ঐ লোকবলের সাহায্যে এই সব দেশের ও নবাগত লোকদের একসঙ্গে উন্নতি হইতে পারে।

ইয়োরোপ সম্বন্ধে একথা খুব খাটে। কারণ ইয়োরোপে ভবিষ্যতে শ্রমের যোগান ও কাঁচা মালের যোগানের ভিতর ঘোর বৈষম্য ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইয়োরোপীয় কৃষিতে যান্ত্রিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা এখনো হয় নাই, আর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-খরচা চড়া ও সমুদ্রপারের রপ্তানির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে ঐ দ্রব্যকে দাঁড়াইতে হয়, তার কারণ যান্ত্রিক উন্নতির অভাবের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। কিন্তু সেই অভাব আর থাকিবে না, অমনি আর এক মহা বিপদ্ দেখা দিবে,—কৃষি যন্ত্রচালিত হইলে ইয়োরোপ মহাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে।

শুধু ইয়োরোপের পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, বাজারে মাল ফেলা ও নিয়োগ-সমস্যা, সংগঠন-(অর্গ্যানিজেশন) সমস্যার সহিত জড়িত। অন্যান্য মহা-

দেশের বিকাশের উপায় ও প্রয়োজনীয়তার কথাও মনে রাখিতে হইবে।

জমি ও কাঁচা মাল।—উৎপাদনের কোন কোন দফার (পরিচালনা, শ্রম ও পুঁজিপাটার) অভাবে বা অল্পতায় বিশালায়তন দেশসমূহ আদৌ কিছু উৎপাদন করিতে পারে না অথবা উচু হারে উৎপাদন করিতে পারে না। অথচ ঐ সব দফা থাকিলে এই সকল দেশ ক্রমাগত বর্ধিত লোকসংখ্যাকেও আহার যোগাইতে সমর্থ হইত।

আর্থিক শক্তি-বিকাশ ও সামাজিক রীতিনীতি উচ্চ করিবার জন্য শিল্প-ভূয়িষ্ঠ দেশসমূহের বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বাজারের দরকার হয়। অন্য দিকে, এই সব দেশের সেই সময়ে নূতন নূতন দেশ হইতে কাঁচা মালের যোগান ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে পারা চাই। ফলে হয় এই যে, আন্তর্জাতিক সংগঠনকে শ্রম ও উৎপাদন ছাড়া আর্থিক কার্যাকলাপ লইয়াও ঘাঁটা ঘাঁটাইতে হয়। ঐ কার্যাকলাপ ব্যক্তির দিক্ হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া উচিত এই জন্য যে, তাহাতে ঐ কার্যাকলাপের জন্য আবশ্যকীয় দফাসমূহের সর্বাপেক্ষা অধিক সংযোজন সাধিত হইতে পারে। খাদক বা ভোক্তাদের টানের কথাটাও সমগ্র প্রণালীর কাজের ধারার সম্পর্কে বিচার করিয়া দেখা উচিত।

উৎপাদনের দফাগুলির যুক্তিসঙ্গত সমবায় ও বণ্টন হইলে ও তজ্জন্য আইনসঙ্গত কাঠামো গড়িয়া উঠিলে আন্তর্জাতিক ভাবে ভোক্তাদের সংগঠনকার্য আর তেমন সুদুরপরাহত বলা যায় না। আর তাহা হইলেই ভোক্তাদের অভাব ও ইচ্ছাসমূহ সুস্পষ্টরূপে জ্ঞানগোচরে আসিয়া টানকে যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর করিয়া তুলিবে ও তাহাতে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের অত্যধিক ওঠা-নামা বাধা পাইবে।

শ্রমবণ্টন, জমির স্থায়ী চাষবাস, কাঁচামাল সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত (অবশ্য অল্প কয়েকটি দেশে) দ্বি-দেশ-গত সমঝোতাগুলিকে প্রসারিত ও নিখুঁত করা দরকার। ১৯২৭ সনে পোল্যাণ্ডের লিথুয়েনিয়া গাও পাইলো রাষ্ট্রের এই সমঝোতা হয় যে, নূতন নূতন স্বাধীন বাসিন্দা (সেটলার) খুলিবার জন্য পোল পরিবারগুলিকে জমি কিনা ও লওয়া বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। ১৯২৬ সনে ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে টিউনিসস্থ কন্সুলেট সম্পর্কে এক সমঝোতা খাড়া করা হয়। এই সকল সমঝোতার মূল কথা এই যে, দুই দেশ প্রত্যেকে কতকগুলি সুবিধা অন্যের নিকট হইতে পাইবে বলিয়া অন্য কতকগুলি সুবিধা সেই দেশকে ভোগ করিতে দেয়। ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়িবার পক্ষে বর্তমানে এইরূপ সমঝোতার কমতি নাই। এক্ষণে, দ্বিদেশ বা বহুদেশ সম্পর্কিত ভাবী সমঝোতার মূলনীতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে স্থির করা যাইতে পারে : সংগঠিত বা মুক্তভাবে লোকের বহির্গমন, শ্রম ও কাঁচা মালের বিনিময়, উপনিবেশ স্থাপনের বিভিন্ন প্রণালী, গ্যারাণ্টির প্রণালী। এই মূলনীতিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুসারে নানা সমঝোতা যোগাযোগ হইতে পারে।

পুঁজিপাটা ও সাউকারি।—দুনিয়ার সর্বত্র লোকসংখ্যার ঘনত্ব সমান করা যেরূপ অসম্ভব, পুঁজিপাটার সমত্ব আনয়ন করাও সেইরূপ অসম্ভব। দরকার এই যে, কোন বাধা বিঘ্ন ব্যতীত শ্রম ও পুঁজিপাটা যেন মিলিত হইতে পারে ও যেখানে তাদের নিয়োগ সব চেয়ে লাভজনক সেইখানে নিযুক্ত হইতে পারে।

সাউকারি ও তদ্বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজিপাটার সমাবেশ করিতে পারে। বিশ্ব-অর্থনীতিকে যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইলে সাউকারিকে সমগ্র ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত না করিয়া উপায় নাই, তা আর্থিক দুর্যোগ নিবারণের জন্যই হোক্ কি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদক-রূপেই হোক্।

আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য কোন না কোন আকারে এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই যা সাউকারিকে বাণিজ্যিক ও উৎপাদক ক্রিয়া অব্যাহত ভাবে করিতে দিবে। এ বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তা প্রশংসার যোগ্য। আন্তর্জাতিক মিটমাটের ব্যাঙ্ক (যাকে বলা ইণ্টারন্যাশনাল সেটলমেণ্ট) এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ; সাউকারি সমাবেশে ভবিষ্যতে ইহার হাত আরও বেশী দেখা যাইবে। অন্যান্য উদাহরণ, আন্তর্জাতিক সাউকারিকে সুখসাধ্যুক্ত করিবার জন্য জাতি সঙ্ঘের ও আন্তর্জাতিক কৃষি পরিষদের উদ্যোগ,

তা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকরূপে হোক্ বা কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্রদ-মিয়াদি সাউকারির আকারে বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানরূপেই হোক। ফল, টান যোগানের সমতা রক্ষা করিয়া দুর্যোগ নিবারণ। এখন কাজ হইল এই সকল প্রচেষ্টার যোগাযোগ স্থাপন করা ও এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যে সাউকারির জন্য সমুদয় টান ও সাউকারি কন্টনের সকল প্রকার আকার তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এখনে কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা ও কারণ বশতঃ চেষ্টা ফলবতী হইতেছে, অথচ এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা করা সম্ভব হইতেছে না। আমাদের ব্যবস্থা-সমূহ এই অবস্থার প্রতীকার করিবে। বিশেষভাবে স্বর্ণ-সম্পর্কীয় সাময়িক সমস্যা যতদিন পর্যন্ত সকলের পক্ষে সন্তোষজনকরূপে মীমাংসিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের একযোগে কাজ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। ইয়োরোপে এই মীমাংসা খুবই দরকার,—সেখানে দেশ-সীমার বন্ধন ও টারিফ্ প্রণালী, শ্রম-যোগানের তুলনায় কাঁচা মালের কমতি, স্বর্ণ-খনির অভাব, উৎপাদনের কর্তার যথেষ্ট পারিশ্রমিক না পাইলেও ও পুঁজিপাটা বৃদ্ধির কোন আশা না থাকিলেও উৎপাদন করিবার আবশ্যকতা, রাজনৈতিক বিপদ ও সৈন্যবৃদ্ধি হেতু বাজেটে ঘাটতি ও সঞ্চয় পূরার অভাব আজ ইয়োরোপকে এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে যে, এই প্রশ্নের আশু মীমাংসা না হইলে তার পক্ষে মরণ ধ্রুব।

একত্র কাজ করিবার ফন্দী

এক নূতন আর্থিক দুনিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। সকল জাতি যদি অন্তরের সহিত চেষ্টা করিত, তবে তাহা আজই সম্ভব হইত। কিন্তু দুনিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এ বিষয়ে সহায়ক নহে। তথাপি আর্থিক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি শক্তি আমাদের হাতে আছে, মনুষ্য জাতির উন্নতির জন্য প্রবর্তিত এরূপ কতকগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে যে, ভবিষ্যতে সুফল পাইতে হইলে এখন কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে ধরিয়া কাজের এক যুক্ত ফর্দ্দ তৈরী করা যাইতে পারে ও তারপর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি পালন করিবার জন্য ফতোয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমে আন্তর্জাতিক মজুর অফিসের কথা ধরা যাক্। ইহাকে যে কাজের ভার দেওয়া হইবে সে বিষয়ে ইহার বিশেষ যোগ্যতা আছে। ইহাকে শ্রমিকদের (উঁচু ও নীচু), এবং কারিগরিতে ও পরিচালনায় দক্ষ কর্মীদের তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহারা ইচ্ছুক ও উপযুক্ত হইলে পশ্চাৎ লিখিত ফর্দ্দসমূহের সাহায্যে, ইহাদিগকে বিশেষ বিশেষ স্থানে পাঠান হইবে, সেখানে তাহারা কৃষি ও খনি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে অবস্থা, নূতন কেন্দ্রের বিকাশ ও নিজ নিজ শক্তি অনুসারে লিপ্ত হইবে। কিন্তু লোক বাছিবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, এক প্রকার বেকার আছে তারা দেশে সর্বাঙ্গীণ কার্যব্যস্ততা ঘটিলেও কাজ জোটাইতে পারে না। ইহাদিগকে লইতে হইবে। উৎপাদনের উপকরণগত কারিগরির প্রকৃত পরিবর্তনে যে মজুরেরা কর্ম-হীন হইয়া পড়ে তাদের বেকারত্ব সহজে ঘুচে না। কারি-গরির বিবর্তন ও যুক্তিপ্রয়োগ হেতু যারা বেকার তারা নূতন দেশে নূতন ধন উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইতে পারে।

এমন কোন কোন দেশ থাকিতে পারে যেখানে বেকার সমস্যা তত প্রবল না হইলেও লোক-ঘনত্ব এত বেশী যে সেই লোকেরা দেশে থাকিয়া কিছুতেই জীবিকা উপার্জন করিতে পারে না, আর এই মনুষ্যশক্তির মর্যাদা আরো বেশী হয় এই জন্য যে, ইহাদের মধ্যে অতিশয় দক্ষ শ্রমিক, কারিগর ও পরিচালক আছে। যে সমস্ত লোকের দ্বারা নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা চলিতে পারে তার একটা সম্পূর্ণ ফিরিস্তি তৈরী করা সোজা কাজ নয়, একদিনের কাজও নয়। যে সকল দেশে বেকার প্রবল অথবা লোক-সংখ্যা অত্যধিক সে সকল দেশ হইতে কত লোককে চালান করিয়া দুনিয়ার অন্যত্র স্থায়ী বাসিন্দারূপে বসান যাইতে পারে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক মজুর অফিসের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ দেশ ইহাদের উপযোগী ও ইহাদের শ্রমের সাহায্যে যোগ্যতর আর্থিক রূপান্তর লাভ করিবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন

স্থানে অন্তরিত হইবার মত লোকেদের সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিবে। যে সকল দেশে এই শ্রমিকেরা প্রেরিত হইবে তথায় ইহারা কোন্ কোন্ কাজ অবলম্বন করিবে সে কথা আন্তর্জাতিক মজুর অফিস, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ—আর্থিক ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, স্বাস্থ্য—ও আন্তর্জাতিক কৃষি পরিষৎ বিচার করিয়া দেখিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক মজুর অফিস্ ও আন্তর্জাতিক কৃষি পরিষৎ, উভয়ের পক্ষে সাধারণ বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য এক যুগ্ম উপদেষ্টক কৃষি-সমিতি কায়েম করিয়াছে। তাহা দ্বারা এদিকে অনেক সাহায্য হইতে পারিবে।

এই সকল কাজের টাকাকড়ি যোগান একটা মস্ত সমস্যা বটে। দীর্ঘ মিয়াদে টাকা খাটানোর সুযোগ আজ ভীষণ হইয়া দেখা দিয়াছে। তথাপি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার কারণ নাই। ভাবী সুদিনের কথা ভাবিয়া একটা পরিকল্পনা আগে হইতেই করিয়া রাখা দরকার। আন্তর্জাতিক বিশ্বাস একবার পুনঃস্থাপিত হইলে, পুঁজিপাটার চলাচল আবার আরম্ভ হইবে, শিল্পের জন্য, উপনিবেশ ও চাষের জন্য টাকা খাটান আবার আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা দরকার।

সম্প্রতি, সাটকারি সমস্যা অর্থাৎ পুঁজিপাটার নিয়োগ ও চলাচল সম্বন্ধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অনেক আলোচনা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কথা বাৎলাইয়াছেন শ্রীযুক্ত ব্রাডুই। তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষপাতী যাহা মধ্যম-মিয়াদী পুঁজিপাটার রপ্তানির সহায়তা, সহযোগ ও চালনা করিবে।

বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন, পূর্ত্ত কাজ, খনি ইত্যাদির জন্য টাকা সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান মোতায়েন রহিয়াছে। এগুলি ভাবী কর্ম্মপ্রণালীর মূল উৎস বাৎলাইতে পারে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এখনি ভাবের আদানপ্রদান হওয়া উচিত। তাহাতে ভবিষ্যতে যুক্তভাবে কাজ করিবার পথ বাহির হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, যে কাজের পরিকল্পনার আভাস উপরে দেওয়া গেল তাহা জাতিসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত করিতে হইবে। অবশ্য জাতিসঙ্ঘকে এ বিষয়ে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হইবে, যেন জাতিসঙ্ঘের আদেশ সকলে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

"দি স্টেট্‌স্‌ম্যান", জানুয়ারী, ১৯৩২

(১) ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা—ইহার কারণ ও উপায়

ব্যবসা-বাণিজ্যে দুনিয়াব্যাপী যে একটা মন্দা আসিয়াছে, তাহা আজকালকার স্কুলের ছাত্ররাও বোধ হয় অবগত আছে। এই মন্দার কারণ কি? এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যাঁ কেনোর বক্তৃতা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত কেনো ফ্রান্সে এক সময়ে প্রধান মন্ত্রীসচিব ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ৩রা জানুয়ারী (১৯৩২) তারিখের "স্টেট্‌স্‌ম্যান"এ বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কেনো দেখাইতেছেন যে, সমসাময়িক দুনিয়া দুইটা বিশেষ আর্থিক সুবিধা ভোগ করিতেছে:—(১) উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, তাহার ফলে উৎপাদনে উৎকর্ষ-লাভ এবং (২) কাঁচা মালের দরে কমতি। তা সত্ত্বেও, দুনিয়ার অবস্থা খারাপ হইতেছে। ইহার কারণ কি?

অনেকে বলেন, সংরক্ষণ শুল্কের দেয়ালগুলাই এইজন্য দায়ী। শ্রীযুক্ত কেনো সংরক্ষণগুলাকে কিছু দায়ী করেন সত্য; কিন্তু উহার উপর বেশী দোষ চাপাইতে নারাজ। তিনি দেখাইতেছেন যে, সংরক্ষণশুল্ক থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে প্রধান জিনিষগুলার পাইকারী দাম কাঁচা মালের দামের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়াছে। কাজেই, সংরক্ষণশুল্কের ঘাড়ের উপর সব দোষটা চাপানো চলে না।

প্রধান দোষটা তাহা হইলে কাহার? শ্রীযুক্ত কেনো বলেন, খুচরা দরের অত্যন্ত উঁচু হারই ইহার জন্য দায়ী। মালের উৎপাদন খরচা এবং কাঁচা মালের দর কমিলেও, ভোক্তারা কম দামে জিনিষ কিনিতে পায় না। কাপড়-চোপড়, খাদ্য দ্রব্য, কয়লা প্রভৃতি জিনিষগুলা খুচরা কিনিতে গেলেই অত্যন্ত বেশী দাম দিতে হয়,—যদিও ঐ

জিনিষগুলার উৎপাদন খরচা ও পাইকারী দর কমিয়া গিয়াছে। (ক) অত্যন্ত অধিকসংখ্যক ব্যবসাদার ও (খ) তাহাদের বেশী লাভ করিবার লোভই, খুচরা দর কমিবার পক্ষে বাধা। খুচরা দর বেশী থাকাতে, মালগুলা বেশী বিক্রী হইতে পারে না, সুতরাং ফ্যাক্টরীগুলার যত উৎপাদন-ক্ষমতা তারা তত মাল বেচিতে পারে না। ইহার ফলে মাল গুদামে পচিতে থাকে। মাল শীঘ্র বেচিতে হইলে, ভোক্তারা যাহাতে সস্তায় মাল কিনিতে পারে, তাহা দেখা দরকার। ইহার জন্য দরকার মাল-উৎপাদক ও ভোক্তা ইহাদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও দোকানদারের যে অসংখ্য লাভি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিলোপ-সাধন। কিরূপে এই বিলোপ-সাধন করা যায়? অনেকে বলিবেন, সমবায় প্রণালীতে দোকানদারি আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু কেলোর মতে উহাতে হইবে না। ব্যবসায়ী ও কড়িয়াদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও ষড়যন্ত্র আছে। তিনি বলেন যে, সমবায় প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত দোকানগুলাও উহাদের দলেই ঢুকিয়া যায়। সুতরাং, সমবায়ে দোকান-দারি দ্বারা বিশেষ সুবিধা হইবে না। তাঁহার মতে, তাহার বদলে আর একদিকে চেষ্টা করা যাইতে পারে। ভোক্তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন এবং 'কন্‌জিউমার্স লীগ' অর্থাৎ ভোক্তা-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারেন। এইসব ভোক্তা-সঙ্ঘ, তাঁহার মতে, সোজাসুজি উৎপাদকদের সঙ্গে কেনা-বেচা ও বোঝাপড়া করিবে। তাহার ফলে ব্যবসায়ী ও দোকান-দারদের দল উৎপন্ন যাইবে, জিনিষপত্রের খুচরা দর কমিয়া আসিবে। তাহার ফলে মালের বিক্রয় বাড়িবে। ফ্যাক্টরী-গুলাও পুরা দমে চলিবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাও শেষ হইবে।

বর্ত্তমান দুনিয়ার মন্দা সম্বন্ধে অনেকের অনেক বক্তব্য শুনিয়াছি। কিন্তু, মঁসিয়ে কেলোর বক্তব্যে নূতনত্ব আছে। তিনি যে উপায়টা বাৎলাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বটে। তবে, এটুকুও বলিতে হইবে যে, কন্‌জিউমার্স লীগ্ কি প্রণালীতে কাজ করিবে, তাহার গঠন-প্রণালী কিরূপ হইবে, এবং তাহা সমবায়ে দোকানদারি হইবে কি হিসাবে পৃথক হইবে, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই।

(২) 'ফ্ল্যাটে' বাস—জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা

উক্ত বিষয়ে লেডি ট্রাথস্‌লি ৩রা জানুয়ারী (১৯০২) তারিখের ঐট্‌ল্যাণ্ডে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেডি ট্রাথস্‌লির বক্তব্য এই—আধুনিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, স্বামি-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমন্বিত ঘর-সংসারের ভিত্তির উপর। কিন্তু আধুনিক ফ্ল্যাটগুলা, উঁহার মতে, পারিবারিক জীবন ধ্বংস করিয়া দিতেছে। প্রথমতঃ, লণ্ডনের ও বিলাতের মফঃস্বলের প্রধান প্রধান সহরের ফ্ল্যাটগুলাতে শিশুদের স্থান নাই। বাড়ীওয়ালারা বিজ্ঞাপনেই লিখা থাকেন এই বলিয়া যে শিশুরা ফ্ল্যাটে থাকিতে পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক ফ্ল্যাটে সাংসারিক কাজকর্ম্মের নানা সুবিধা—বেশী সুবিধা যে ঘরের গৃহিণীকে বাড়ীতে বসিয়া কিছুই করিতে হয় না; কাজেই গৃহিণীর বাড়ীর উপর টান থাকে না, তিনি থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান। তৃতীয়তঃ, যেখানে ফ্ল্যাটগুলায় ছেলেদের থাকিতে দেওয়া হয়, সেখানেও তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নানা দিক্ হইতে বাধা পায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা সিঁড়িতে নানারূপ খেলাধূলা করিতে কত ভালবাসে। কিন্তু ফ্ল্যাটের সিঁড়ি সাধারণের সিঁড়ি। ইহাতে ফ্ল্যাট-বাসীদের ছেলেরা ইচ্ছামত খেলাধূলা করিবে তাহা সম্ভব নয়। তাহার উপর, ফ্ল্যাটসংযুক্ত বাগানগুলা সম্বন্ধে নানা নিয়মের উৎপাত। ছেলেরা ইচ্ছামত ২।৪টি ফুল ছিঁড়িবে বা ছুঁইবে, বা ঘাসে গড়াগড়ি যাইবে, তাহাও হইবার উপায় নাই। ফ্ল্যাটে বাস মানে কয়েকটি ঘরে বাস, খাওয়ার জন্য রেস্তোঁয় যাওয়া এবং আমোদ প্রমোদের জন্য বাহিরে যাওয়া। এইরূপ জীবনের ফলে ছেলেমেয়েদের মন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে।

(৩) বার্ম্মায় বিবাহের রীতিনীতি—বার্ম্মিজ্ নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

(১) বার্ম্মায় বিবাহ চুক্তির ব্যাপার; একজন নারী ও পুরুষ ইচ্ছা করিলেই বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে;

আবার, দুইজনে একমত হইলে, বিবাহ-বন্ধন ছিঁড়িতে পারে।

(২) বিবাহের পূর্ব্বে অর্জ্জিত স্বামী বা স্ত্রীর সম্পত্তি তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিই থাকে; বিবাহের পরে স্বামী বা স্ত্রী যা কিছু সম্পত্তি পায়—উপার্জ্জন করিয়াই হোক্ বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াই হোক্—সেই সম্পত্তি উভয়েরই হয়।

(৩) ব্যবসা-ঘটিত ব্যাপারে ও সাংসারিক কার্য্য-কলাপে উভয়েরই মতামত দরকার। সম্পত্তি কেনাবেচা বা বন্ধক দেওয়া লওয়ায় স্বামি-স্ত্রী উভয়েরই দলিলে সই চাই।

(৪) আবশ্যক হইলে, স্ত্রী ব্যবসা করিয়া রোজগার করিতে পারে।

(৫) ব্রহ্মদেশের দৌরদের উইল করিবার ক্ষমতা নাই; স্ত্রী মারা গেলে তাহার সম্পত্তি স্বামী পায়, স্বামী মারা গেলে তাহার সম্পত্তি স্ত্রী পায়, উইল করিয়া ইহার নড়-চড় করিবার উপায় নাই।

(৬) যদি বিবাহ-বন্ধন ছেদ হয়, তাহা হইলে উভয়ের দোষ থাকিলে, বা কাহারও দোষ না থাকিলে, সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ হয়; আর যদি, এক জনের দোষ থাকে তাহা হইলে তাহার ভাগের সম্পত্তি কম হয়।

সমবায় সম্বন্ধে বিলাতী বার্ষিকী

ইংলণ্ডের সমবায়-সমিতিগুলা ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে কেন্দ্রবদ্ধ; স্কটলণ্ডের সমবায় সমিতিগুলা গ্লাসগো সহরে কেন্দ্রবদ্ধ। এই দুই কেন্দ্রীয় সমিতি মিলিয়া প্রতি বৎসর সমবায় সম্বন্ধে একটী বার্ষিকী বাহির করিয়া থাকেন। ইহার নাম—"দি পীপ্‌ল্‌স্ ইয়ার বুক—ন্যাশনাল অ্যাণ্ড ইণ্টার্ন্যাশনাল"। এই বার্ষিকীর ১৯৩১ সনের সংখ্যা বাহির হইয়াছে। ইহার দাম—মাত্র ২ শিলিং। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৩৬০। সারা দুনিয়ার সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে নানা তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, বিলাত, আর্ম্মাণি, ডাইত, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, সেলজিয়ান প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে কয়েকটী আর্থিক প্রবন্ধও স্থান পাইয়াছে। বিলাতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক অনেকগুলা সংখ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থের শেষের দিকে দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া, মোটা কুড়ি চিত্তাকর্ষক ছবি বইটীতে দেওয়া হইয়াছে। একটী ছবি অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছে। উহা হইতেছে একটী চাষের গুদাম ঘরের ছবি। কোন সমবায়-সমিতির যে এরূপ একটী সুন্দর ও বৃহৎ চালের গুদাম ঘর থাকিতে পারে, তাহা আমাদের পক্ষে একরূপ কল্পনার বাহিরে বলিলেই হয়। মোটের উপর, বইখানি সকল দিক্ হইতে সুন্দর। ২ শিলিং খরচ করিয়া বইখানি কিনিলে তাহা যে নিতান্ত জলে পড়িবে না তাহা জোর গলায় বলা চলে।

শ্রীনিবচন্দ্র দত্ত

২। হেজেস অ্যাণ্ড রেণ্ডলেশন অব্ কনডিশন্‌স অব্ লেবার ইন্ দি ইউ এস্ এস্ আর (সোভিয়েট রুশিয়ার মজুরি ও শ্রমের সর্ত্ত-সম্পর্কিত আইনকানুন), এস ৎসাগোরস্কি। প্রকাশক আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস, জেনেবা। অনুসন্ধান ও বিবরণী বিষয়ক ডি সিরিজের (মজুরি ও কাজের ঘণ্টা) ১৯ নং গ্রন্থ। পৃঃ ৮+২১২। মূল্য ৪ শি।

গ্রন্থকারের পরিচয়

আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস্ কর্ত্তৃক যে সকল বহি প্রকাশিত হয় সেগুলি সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির নামে বাহির হয় না। বর্ত্তমান কেতাবের গ্রন্থকার প্রথম খসড়া করিবার পর হঠাৎ পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়েন ও তারপর ১০ দিনের মধ্যে ১৯৩০ সনের ১৪ই মার্চ্চ মারা যান। তখন আন্তর্জ্জাতিক অফিসের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল: (১) তিনি যে সকল সহকারী লইয়া তাঁর গবেষণা চালাইতেছিলেন, তাঁদের হাতে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনের ভার দেওয়া, (২) তিনি যে ভাবে খসড়া তৈরী করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করা। অফিস্ দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার বাঁচিয়া থাকিলে এই কেতাবের আকার অনেক বদ্‌লাইয়া যাইত। আমাদের মতে, যে সহকারীদের তিনি হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছিলেন তাঁদের হাতে গ্রন্থ সম্পাদনের ভার দিলে ভাল হইত।

সাইমন ৎসাগোরস্কি ১৮৮১ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে রুশিয়ায় ও পরে আর্ম্মাণির মিউনিকে শিক্ষালাভ করেন। মিউনিকে তিনি অর্থনীতিতে ডক্টর উপাধি পান। অল্প বয়সে খ্যাতি লাভ করিয়া তিনি ত্রিশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে পেট্রোগ্রাড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৭ সনে রুশিয়ায়

অস্থায়ী শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁকে মজুর-সচিবের অধীনে ব্যবস্থাপক বিভাগের প্রধান কর্মচারিরূপে নিযুক্ত করে। বলশেভিক্ বিপ্লবের পর তিনি রুশিয়া ত্যাগ করেন ও বিপ্লবের আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। ইহার পর কিছুকাল তিনি প্যারিসের আইন-ক্যাকাল্‌টিতে (রুশ বিভাগ) অধ্যাপনা করেন ও ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক মজুর অফিসে যোগ দেন। গুস্টব পার্মোঁর মৃত্যুর পর ইনি রুশীয় বিভাগের প্রধান হন। তাঁর কীর্তি এই বিভাগে একটি লাইব্রেরী, বহুসংখ্যক পত্রিকা ও শ্রেণীবদ্ধ বহু দলিল-দস্তাবেজ যোগাড় করা, এই সমস্তই সোবিয়েট রুশের আর্থিক ও সামাজিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

অফিসের বাহিরে থেকেও তিনি যথাক্রমে ১৯২১, ১৯২২ ১৯২৩ ও ১৯২৮ সনে বোলশেভিক বিপ্লবের সময় হইতে রুশিয়ার আর্থিক ইতিহাসের বিশ্লেষণমূলক চারিটি কেতাব প্রকাশ করিয়াছেন। অফিসে তিনি শিল্পের সংগঠন ও কাজের সর্তের দিকে মনোযোগ দেন। ১৯২২ সনে হেগ্ সম্মেলনকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁর প্রথম বিবরণী প্রকাশিত হয়; রুশিয়ার প্রতিনিধিদের হাতে তাঁর কেতাবের প্রুফ্ দেওয়া হয় ও তাঁরা অল্প স্বল্প সংশোধন করিয়া দেন। এই কেতাব আন্তর্জাতিক মজুর অফিস্ কর্তৃক "অর্গানিজেশন অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড লেবার, কনডিশানস্ ইন্ সোবিয়েট রুশিয়া" (সোবিয়েট রুশিয়ার শিল্পের সংগঠন ও কাজের সর্ত) বি সিরিজের ১১নং কেতাব পৃঃ ৯৩। ১৯২৪ সনে এই বিবরণী পরিশোধিত ও বর্ধিত আকারে "ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল লাইফ্ ইন্ সোবিয়েট রুশিয়া" (সোবিয়েট রুশিয়ার শিল্পীদের জীবন যাত্রা) নামে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বিবরণী অর্থাৎ বর্তমান কেতাবে রুশিয়ার ১৯২২-১৯২৯ আর্থিক নীতির ফলাফলের কথা স্থান পাইয়াছে। সুতরাং ১৯১৭ সন হইতে পঞ্চ-বার্ষিকী সময় পর্যন্ত রুশিয়ার আর্থিক গতিপ্রগতির কথার আলোচনা তিনি সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুইটি ছাড়া থেকেও তাঁর আরো দুটি গ্রন্থ অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১) কো-অপারেশন ইন্ সোবিয়েট রুশিয়া, (সোবিয়েট রুশিয়ার সমবায়, এইচ্ সিরিজ, ৩ নং; জেনেবা, ১৯২৫; ৩৬২ পৃঃ); (২) দি ট্রেড্ ইউনিয়ন্ মুভমেণ্ট ইন্ সোবিয়েট্ রুশিয়া (সোবিয়েট রুশিয়ার মজুর সঙ্ঘ আন্দোলনের বিকাশ; এ সিরিজ, নং ২৬; জেনেবা ১৯২৭; ২৮৭ পৃঃ)।

থেকোরিচ্চির বিরুদ্ধে প্রধান কথা এই যে, ইনি বিশ্লেষণ কার্য্যটি একেবারে নির্মমভাবে চালাইয়াছেন, সমালোচনার কালে তিনি শুধু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছেন, হৃদয় দিয়া দেখেন নাই। ফলে অনেক সময় তাঁকে সোবিয়েট শাসনের বিরুদ্ধপক্ষীয় বলিয়া সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসার কথা এই যে, তিনি পক্ষপাতহীনভাবে সোবিয়েট কর্তৃপক্ষের মন্তব্য-সমূহ উদ্ধার করিয়া নিজের বক্তব্যসমূহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কেতাবের সূচী

কেতাবটি মোটামুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কাজ করিবার সর্ত নিয়ন্ত্রণ করিবার আইনকানুনের কথা ও দ্বিতীয় খণ্ডে মজুরির কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে চারিটি ও দ্বিতীয় খণ্ডে পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে। তা ছাড়া, পরিশিষ্টে মজুরি সম্বন্ধে মন্তব্য ও তালিকা, জীবন-ধারণের খরচার সূচী-সংখ্যা, গ্রন্থপঞ্জী আছে। দুই খণ্ডে বিস্তৃত সূচী নিম্নরূপ:

প্রথম খণ্ডে

প্রথম পরিচ্ছেদ: কাজ করিবার সর্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

১। সরকারী প্রতিষ্ঠান

যুথীকৃত ও স্বাধীন গণতন্ত্রসমূহের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কাজ করিবার সর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ।

২। মজুর সঙ্ঘ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আভ্যন্তরীণ বিধি-সমূহ ও ফ্যাক্টরি পরিচালনা।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুনের শাস্তি

২। ফ্যাক্টরি পরিচালনা সমস্যা

অনুপস্থিতি
ফ্যাক্টরি পরিচালনার ত্রিদোষ
৩। ফ্যাক্টরি পরিচালনা উন্নত করিবার নানা ব্যবস্থা, শাসন ও কারিগরি সম্বন্ধে কর্মচারীদের অধিকার শাসন-সম্বন্ধে নূতন শাস্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :—কাজ সম্পর্কে চুক্তি।
১। কাজ সম্পর্কে চুক্তির আকার
২। চুক্তি কতদিন মানা চলিতে পারে না।
৩। চুক্তিকারী দুই দলের কর্তব্য
৪। চুক্তির শেষ
চুক্তি শেষ হইবার পর উভয় দলের দাবী দাওয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মিলিত চুক্তি
১। মিলিত চুক্তির নীতি
২। মিলিত চুক্তির আইনগত প্রকৃতি
৩। মিলিত চুক্তির চৌহদ্দি
৪। চুক্তিকারী দলসমূহ
৫। বিভিন্ন প্রকার মিলিত চুক্তি ও চুক্তির শেষ
৬। চুক্তির সময় ও ভাষ্যতা
৭। মিলিত চুক্তি ভঙ্গ হইলে কাহার কিরূপ দায়িত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : মজুরির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ
১। মজুরি
২। নিয়তম মজুরি
৩। মজুরি সম্পর্কে গিরমিটের ব্যবস্থা
৪। মজুরি দেওয়া
৫। চুক্তি শেষ হইলে মজুরি দেওয়া
৬। মজুরি দেওয়া সম্বন্ধে অঙ্গীকার
মজুরির দাবী স্বীকার
মজুরি বাজেয়াপ্ত হওয়ার হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পায়
৭। মজুরি কিরূপে দেওয়া হয়
৮। মজুরি গণনার প্রণালী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মজুরি ভাগের নীতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রণালীবদ্ধভাবে মজুরি নিয়ন্ত্রণ
১। মজুরদের মজুরি নিয়ন্ত্রণ
২। বেতনপ্রাপ্ত লোকদিগের চাকুরেদের সম্পর্কে মজুরি নীতি
রাষ্ট্র কর্তৃক মজুরি নিয়ন্ত্রণ
চাকুরেদের মজুরির বিভিন্ন অস্থায়ী আকার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মজুরি ও শিল্পের উৎপাদন-শক্তি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সন পর্যন্ত মজুরির উঠা-নামা
১। আপাত মজুরি
শিল্প-সম্পর্কিত মজুরদের মজুরি
লোকদিগের চাকুরেদের মজুরি
২। প্রকৃত মজুরি
মজুরির ব্যক্তিগত অংশ
মজুরির মিলিত বা সামাজিক অংশ

কাজের সর্ত নির্দ্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান

কাজের সর্ত নির্দ্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান দুই প্রকার : (১) সরকারী, (২) ট্রেড্ ইউনিয়ান।

বর্তমান রুশ দেশ কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি প্রদেশকে ফেডারেটেড্ রিপাবলিক বলা হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দুই ভাগ (১) ইউনিয়ান কর্তৃপক্ষ, (২) ফেডারেটেড্ রিপাবলিকসমূহের কর্তৃপক্ষ। এই দুয়ের প্রত্যেকটি আবার কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত।

ইউনিয়ানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ :
(১) "ইউ এস্, এস্, আর" এর কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।
(২) "ইউ এস্, এস্, আর" এর জনগণের সভার (কনিগ্রাস) সমিতি (কাউন্সিল)
(৩) "ইউ, এস্, এস্, আর" এর মজুর-সভা।

তৃতীয়টি নানা প্রকার কাজে হস্তক্ষেপ করে। তন্মধ্যে (ক) কতকগুলি শ্রম-বাজার ও বেকার-নিবারণ সম্পর্কিত, (খ) কতকগুলি কাজের সর্ত নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, (গ) কতকগুলি শিল্প-দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত, (ঘ) কতকগুলি বাটী নির্মাণ নীতি সম্পর্কিত, (ঙ) আর কতকগুলি সামাজিক বীমা

সম্পর্কিত। ইহা ছাড়া সম্প্রদানের নির্দ্দেশ মত শিল্পের বাৎসরিক কার্য্যাবলী, শ্রমের বাজার, মজুরি, শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি, মজুর গণনা, মজুর সমতা বিষয়ক আইন, ইত্যাদি বহুবিধ কাজের লিপ্ত হয়। (পৃঃ ২-৩)।

কাজের সর্ত্ত নির্দ্ধারণকল্পে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের অন্তর্গত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিরও নাম করা যাইতে পারে, (১) "ইউ, এস্, এস, আর" চয়ন আর্থিক সমিতি; (২) মজুরদের ও চাষীদের তত্ত্বাবধায়ক সমিতি; (৩) যান-বাহন সমিতি।

অতঃপর প্রত্যেক ফেডারেটেড রিপাবলিকে কাজের সর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য একটি করিয়া সেই রিপাবলিকের মজুর সমিতি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে যোতায়েন রহিয়াছে। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত বিভিন্ন ফেডারেটেড রিপাবলিকের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ আইনদ্বারা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (পৃঃ ৪-৬)।

কাজের সর্ত্ত নির্দ্ধারণের নিম্নিখিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল

(১) মজুর সমিতির স্থানীয় শাখা

(২) রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের স্থানীয় প্রতিনিধি

ফেডারেটেড রিপাবলিকসমূহের মজুর সমিতির স্থানীয় শাখাসমূহ :—(১) স্বাধীন (অটনমাস্) রিপাবলিকসমূহের মজুর সমিতি; (২) "আর, এস, এফ, এস, আর" এ ফেডারেটেড রিপাবলিকের মজুর সমিতির প্রতিনিধিগণ; (৩) "আর, এস্, এফ, এস্, আর" এ স্থানীয় মজুর অফিস; (৪) উক্রেইন, ও "আর, এস্, এফ, এস, আর" এর কতকগুলি জিলার ও স্বাধীন রিপাবলিকে স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী (৫) "আর, এস, এফ, এস আর" এর জিলা তত্ত্বাবধায়ক অফিস।

রেজিওন, জিলা, গ্রাম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও মজুরি সমিতির স্থানীয় বিভাগের কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট আছে (পৃঃ ৭)।

কাজের সর্ত্ত নির্দ্ধারণের ভার ট্রেড ইউনিয়নসমূহের হাতেও আছে। কিন্তু ১৯২১ সন হইতে এই সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের মজুর বাজার নিয়ন্ত্রণ, কাজের চুক্তি কাজের ঘণ্টা, মজুরদের রক্ষা, মজুরি ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে (পৃঃ ৯-১০)। ফ্যাক্টরি পরিদর্শকদের ক্ষমতা খুব বেশী, আর এই সকল পরিদর্শকের সাহায্যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ নিজেদের যথেষ্ট ক্ষমতা জাহির করিবার অবকাশ পায় (পৃঃ ১১)।

আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থা

যে কোন প্রতিষ্ঠানে ৪ জনের বেশী কাজ করে তাহাই ফ্যাক্টরী। এই সকল ফ্যাক্টরী পরিচালনার জন্য কতকগুলি আভ্যন্তরীণ আইনকানুন যোতায়েন রহিয়াছে। সেগুলি দুই প্রকারের (১) আদর্শ চিঠি, (২) পরিচালক ও মজুরদের মধ্যে বোঝাপড়ার দ্বারা চিঠি। আভ্যন্তরীণ আইনকানুনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা থাকে; (ক) কাজের ঘণ্টা; (খ) হাজিরার ও যন্ত্র-পাতি, কাঁচা মাল, ফ্যাক্টরী দ্রব্যাদির ব্যবহার; (গ) স্বাস্থ্যঘটিত অবস্থা ও মজুর-রক্ষার বিধি; (ঘ) মজুরি; (ঙ) ফ্যাক্টরী ডিসিপ্লিন। ১৯২৭ সনের ১৯শে জুলাইয়ের চিঠি দ্বারা আভ্যন্তরীণ আইন কানুন না মানিলে তার শাস্তির ব্যবস্থা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কোথাও সাবধান কোথাও বিতাড়ন। তবে সাধারণতঃ বিপদের গুরুত্ব অনুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবার পর্য্যন্ত সাবধান করিয়া দেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু শীঘ্রই মনে হইল যথোচিত ব্যবস্থা করা হয় নাই। পর পৃষ্ঠার তালিকা হইতে মজুরদের কাজে অনুপস্থিত হওয়া স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৯২৮ সনে ট্রেড্ ইউনিয়ান, পরিচালকগণ ও মজুর সমিতির বিবরণী হইতে জানা যায়, মজুরদের কার্য্যে শিথিলতা ঘটে। ১৯২৯ সনে অবস্থা আরো খারাপ হয়। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য কতকগুলি অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ১৯২৮ সনের জানুয়ারী—মার্চ্চ মাসে কাজের ঘণ্টার ৩·৬ অংশ নষ্ট হইয়াছিল, আর পরবর্ত্তী তিন মাসে ৬·৮% নষ্ট হইয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে ও কোথাও কোথাও মজুরেরা প্রত্যেক দুই দিনে একদিন কাজই করিতে আরম্ভ করে। ডোনেৎস খনিতে ২০% হইতে ৩০% অনুপস্থিতির কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না। লেনিনগ্রাডের পোলটিব্ ফ্যাক্টরীতে অন্যান্য

অনুপস্থিতি ৩৪% ও ব্যাধিজনিত অনুপস্থিতি ৪০% দাঁড়ায়। জুন মাসে এই ফ্যাক্টরীর বিনা কারণে অনুপস্থিতির ফলে ১ লক্ষ ২০ হাজার দিন নষ্ট হয়। এপ্রিল হইতে জুন অবধি সময়ে ৪৮২ জন লোককে তাড়ান হয়, তন্মধ্যে ৫৮% ফ্যাক্টরী ডিসিপ্লিন মানে নাই বলিয়া। এইরূপ ব্যাপার অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়। (পৃঃ ১৬-১৮)।

বৎসর	প্রকৃত কাজ	কাজের ধারা	ছুটির দিন	ট্রেড্ ইউনিয়ান বা সরকারী কাজ	বাৎসরিক ছুটি	ব্যাধি ও মাতৃত্ব ছুটি	কাজ শূন্য দিন — অনুপস্থিতি — ছাড়া	অন্যান্য	মোট	কাজহীন দিন মোট
১৯২২-২৩	২৬১·৪০	১৮০	৪৯৮০	১·৬০	১২·৩০	১৩·১০		৯·৬০		৪১·০০
১৯২৩-২৪	২৬২·৫১	১·২৭	৬০·৩৮	১·৪৮	১৩·১৫	১৬·৪৪		৯·০২		৪১·৮৪
১৯২৪-২৫	২৬২·১৩	·৮৯	৬১·৭৯	১·৫৭	১৪·০৫	১৫·০৭		৭·২০		৪০·১৯
১৯২৫-২৬	২৫৯·৭৮	১·৮৭	৬১·১৮	১·৫৬	১৪·০২	১৬·১২		৮·০৪		৪২·১৭
১৯২৬-২৭	২৬২·০৭	১·৬৩	৬১·৪৯	১·৪৯	১৪·১৪	১৪·৮৪		৭·২৩		৩৯·৭১
১৯২৭-২৮	২৬৩·৮০	১·৭৩	৬১·৭৬	১·৫৬	১৪·০৬	১৫·০৬		৬·১০		৩৮·৭১
১৯২৮-২৯	২৬২·৩২	১·৭১	৬০·৩৭	১·৯৩	১৪·০৪	১৫·৪১		৪·৪৪		৩৪·৪২
অনুপস্থিতি							৩৮·২	১১·১		৫০·৭

অনুপস্থিতি ছাড়া ১৯২৮ সনের শেষের দিক্ হইতে মজুরদের কাজে নানারূপ শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। ডিসিপ্লিন-হ্রাস নিম্নলিখিতরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল: (১) ফ্যাক্টরীতে যাতায়াত, (২) দেরীতে কাজে আসা, (৩) কাজের সময়ে ঘুমান, (৪) শ্রমিকদের মধ্যে নিম্নতর স্বভাব, (৫) কর্তৃপক্ষের অসম্মান, (৬) ধর্মোৎসবের কালে কাজ হইতে অনুপস্থিতি, (৭) চুরি, (৮) উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস। এই সকলের কারণ নিম্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে: (১) গ্রাম হইতে নূতন মজুরদের ও নবীন বংশের লোকদের আগমন। নিম্নলিখিত তালিকা (%) যুগোস্লাভ ট্রাষ্টের রাইকব্ ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে। ইহা হইতে অবস্থা বুঝা যাইবে:

	পুরাতন শ্রমিক	নূতন শ্রমিক	গ্রাম হইতে আগত
কাজের সময় নিদ্রা	৩১·০	১১·৫	৫৭·৫
দুর্ব্যবহার	২৯·৬	৪·১	৬৬·৩
কারখানায় নিম্নতর কাজ	৩১·৬	১২·৫	৫৫·৯
বিনা অনুমতিতে কাজ ছাড়া	২০·২	৮·৫	৭১·৩

(২) শ্রমের অত্যধিক কার্যাচ্যুতি; (৩) কারিগরি ও পরিচালনা কর্মচারীদের ঔদাসীন্য; শ্রমিক সমিতির ও বিচার সমিতির নিষ্ক্রিয় ভাব। (পৃঃ ২১-২৩)

দেখা যাইবে যে, মজুরদের স্বর্গরাজ্য সোবিয়েট রুশিয়ায় নিম্নতর মজুর আধিপত্যে রাষ্ট্রের উৎপাদিকা-শক্তি বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। সোবিয়েট সরকার ইহাতে ভীত হইয়া কঠিন আইনকানুন প্রণয়ন করিয়াছেন। মজুরদের শাস্তি-যোগ্য কাজসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে: কাজের সময় সম্বন্ধে অপরাধ, (খ) যে কোন ব্যবস্থা ভাল মতে চালাইবার পক্ষে বাধা দিলে, (গ) অর্ডার শুনিতে অসম্মতি, (ঘ) নিরাপত্তা সম্বন্ধে আইন অমান্য করিলে, (ঙ) খারাপ কাজ করিলে, (চ) দুর্ব্যবহার, চুরি ইত্যাদি করিলে। প্রত্যেক ধরণে কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে (পৃঃ ৩০-৩২)। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চাকুরেরাও রেহাই পায় নাই (পৃঃ ৩২-৩৮)।

মিলিত চুক্তির সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:

বৎসর	মিলিত চুক্তির সংখ্যা	মজুরদের সংখ্যা	কত % ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য
			৮৬
			৮৭
			৮২৮
			২৩৫
			(পৃঃ ৫৩)

মজুরির নিম্নতম সীমা

১৯১৭ সনের মার্চ মাসের বিপ্লবে রুশ শ্রমিকদের একটা দাবী এই ছিল যে, রাষ্ট্র একটা নিয়তম ভাতা মজুরির হার বাঁধিয়া দিবে। সুতরাং ১৯১৮ সনে ঐরূপ ব্যবস্থার জন্য আইন জারি হয়। ১৯২২ সনে নব আর্থিক নীতি প্রবর্তনের পর স্থির হয় যে, কোন নিয়োক্তা মজুরের একটা নিয়তম সীমার নীচে মজুরি দিতে পারিবে না। কেহ সে প্রকার চুক্তি করিলে আইনের চোখে দণ্ডনীয় হইবে। ইউ এস্ এস্ আর মজুর সমিতির হাতে নিয়তম মজুরি বাঁধিয়া দিবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। এই সমিতি সমগ্র দেশকে কতকগুলি টারিফ্ জোন বা শুল্ক আয়তনে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জোনের নিমিত্ত বিভিন্ন নিয়তম মজুরি স্থির করিয়া দিয়াছে। এই বিভাগ এমনভাবে করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ফেডারেটেড রিপাব্লিক এক বা অধিক জোনে বিস্তৃত রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপাব্লিকের টারিফ জোন আবার প্রত্যেক বৎসর দুইবার বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম ১লা এপ্রিল, দ্বিতীয় ১লা অক্টোবর। এই দুই তারিখে ছাড়া অন্য সময়ে কোন জিলাকে এক টারিফ জোন হইতে অন্য টারিফ জোনের অন্তর্গত করা চলিবে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন টারিফ জোনের সৃষ্টি করা হয়: (ক) পূর্ববর্তী অর্ধ বৎসরে জিলার জীবনযাপন খরচার সূচী-সংখ্যা কিরূপ ছিল; (খ) শিল্প সম্পর্কে জিলার গুরুত্ব; (গ) জলবায়ু ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যবস্থা।

সমুদয় ইউ এস্ আরকে পাঁচটি টারিফ জোনে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন রিপাব্লিককে নিম্নলিখিতভাবে বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে:

	জোন
আর এস্ এফ্ এস্ আর	১ হইতে ৫
উক্রেইন	২ হইতে ৪
শ্বেত রুশিয়া	২ হইতে ৪
ট্রান্সককেশিয়া	১ হইতে ৩
তুর্কমেনিস্থান	
উজ্‌বেকিস্থান	১
তাজিকিস্থান	১

বিভিন্ন জোনের মজুরির হার নিম্নলিখিত প্রকারে স্থিরীকৃত হইয়াছে:

জোন	রুব্‌ল
১	১০
২	৯
৩	৮
৪	৭.৫০
৫	৭

সুতরাং বিভিন্ন ফেডারেটেড্ রিপাবলিকের নিয়তম মজুরি এই:

আর এস্ এফ্ এস্ আর	১০ হইতে ৭
উক্রেইন	৯ হইতে ৭.৫০
শ্বেত রুশিয়া	৯ হইতে ৭.৫০
ট্রান্সককেশিয়া	১০ হইতে ৮
তুর্কমেনিস্থান	১০ হইতে ৮
উজ্‌বেকিস্থান	
তাজিকিস্থান	১০

পূর্বে সকল প্রকার চুক্তিতে নিয়তম মজুরির হার এক ছিল। কিন্তু তাহাতে নানা অসুবিধা হইতে লাগিল। অন্য দিকে, নিয়তম মজুরির সীমা এমন এক সময়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল যখন রুব্‌লের দাম ক্রমাগত পড়িতেছিল। সুতরাং উচু হারে মজুরির হার বাঁধিয়াও কোন ফল হয় নাই। গোড়াতে টারিফ্ জোনের সংখ্যা ছিল তিনটি। ১৯২৪ সনের আগষ্ট মাসে পাঁচটি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত নিয়তম মজুরির উর্ধ সীমা ৬ রুব্‌ল ও নিম্ন সীমা ৪২০ রুব্‌ল ছিল। ১৯২৪ সনের আগষ্ট মাসে উর্ধ সীমা ৬.৪০ রুব্‌ল ও নিম্ন সীমা

৩'৫০ রুবল ঠিক হয়। ১৯২৫ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকে। তারপর উর্দ্ধ সীমা ১০ রুবল ও নিম্ন সীমা ৭ রুবল। ১৯৩০ সনের শেষ হইতে এই হার বর্ত্তমান থাকে।

ইতিমধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মজুরি এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে, সব চেয়ে কম মজুরিও ১০ রুবল ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে নিরতম মজুরির হার কথাটা প্রায় নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া মজুরে মজুরে ভেদ পার্থক্য জন্মিয়াছে, বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার মজুরি দেওয়া হইতেছে। কোন কোন চাকুরের নিয়তম মজুরি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যথা, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, মাসে ৪৮ হইতে ১০০ রুবল; ডাক্তার, ৯৮ হইতে ১২২ রুবল; দাঁত বাঁধাইকারী, ঔষধ-বিক্রেতা ইত্যাদি ৪৪ হইতে ৫৯ রুবল; ধাত্রী ৩৪ হইতে ৪৮ রুবল; কৃষি এঞ্জিনিয়ার ১০৪ হইতে ১২৭ রুবল; জিলা পশু-চিকিৎসক, ৯৮ হইতে ১২২ রুবল; পুলিশ, ৩৯ হইতে ৮০ রুবল; জিলা সংখ্যা-সংগ্রাহক, ৫০ হইতে ৫৪ রুবল। (পৃঃ ৮০-৮১)।

মজুরি দেওয়ার প্রথা

স্থায়ী শ্রমিকদিগকে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মজুরি দেওয়া হয়। মজুরি দেওয়ার প্রথায় নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৯২৬ সন অবধি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাসে একবার করিয়া মজুরি সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বে দেওয়া হইত। ১৯২৫-২৬ সনের আর্থিক দুর্দ্দশা হেতু ১৯২৬ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে নিয়ম হয় যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরেরা প্রথম অর্দ্ধ মাসের মজুরি ১৬ তারিখে ও দ্বিতীয় অর্দ্ধমাসের মজুরি পরের মাসের ১ম তারিখে পাইবে।

পূর্ব্বে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় একই দিনে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ফলে হঠাৎ হাতে টাকা পাইয়া সহরের শ্রমিকগণ বেশী বেশী জিনিষ কিনিত। ইহার ফলে মূল্য ও সিজার বিপর্য্যয় ঘটিত। অন্যদিকে, বাজারে হঠাৎ টান বৃদ্ধি পাইয়া পণ্যের বাজারকে একেবারে উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলিত। এক্ষণে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া মজুরি দেওয়ার তারিখ বহু ভিন্ন প্রকার করা হইয়াছে (পৃঃ ৮৮)।

মজুরি দুই প্রকারে দেওয়া হয়—(১) মুদ্রায়, (২) দ্রব্যাদিতে ও সুবিধায়। কমিউনিষ্ট সময়ে মজুরি অধিকাংশ নগদ না দিয়া দ্রব্যাদিতে দেওয়া হইত। তার কতকগুলি কারণ এই: পূর্ব্বে নগদ টাকার চেয়ে দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে যোগান রাষ্ট্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। সিজার বিপর্য্যয়ে নগদ মুদ্রার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। ১৯১৭ সনে শিল্পে নিযুক্ত মজুরের গড় মজুরির মোট দামের ৫'৩% দ্রব্যাদিতে দেওয়া হইয়াছিল; ১৯১৮ সনে ৪৭'৪%, ১৯১৯ সনে ৮০'০%; ১৯২০ সনে ৯৩'১%; ১৯২১ সনে ৮৬'২%। নব আর্থিক নীতি প্রবর্ত্তনের পর হইতে নগদ টাকার উপর জোর দেওয়া হইতে থাকে। স্থির হয় যে, ১৯২২ সনের ১লা অক্টোবরের পর হইতে মজুরি একমাত্র নগদ টাকায় দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহা একদিনে করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯২২ সনের প্রথমার্দ্ধে দ্রব্যাদির অনুপাত ছিল ৬৮%, দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৫৮'২%; ১৯২২-২৩ সনে ১৯'৩%; ১৯২৩-২৪ সনের প্রথম তিন মাসে ৭'২%। আর্থিক অবস্থার তদানীন্তন দুর্য্যোগে মজুরির অনেকাংশ দ্রব্যাদি থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মজুরেরা কতকাংশ মজুরি কুপনের আকারে পাইত। এই সকল কুপনের সাহায্যে শ্রমিকেরা খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমবায় ভাণ্ডার হইতে কিনিতে পারিত। অনেক সময় মজুরদের ধারে জিনিষপত্র দেওয়া হইত ও সেই সব জিনিষের দাম মজুরি হইতে বাদ দিয়া মজুরি দেওয়া হইত। ধারে জিনিষ দেওয়া আর দ্রব্যাদি দেওয়া একই কথা,—বস্তুতঃ, এইরূপে মজুরেরা নগদ টাকা হিসাবে খুব কম অংশ পাইত। মজুরের মজুরির শতকরা কত অংশ এইরূপে তার মজুরি হইতে বাদ যাইত তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:

বৎসর	মার্চ্চ	সেপ্টেম্বর
১৯২৪	১২'৬	১২'৯
১৯২৫	১২'৭	৮'১
১৯২৬	৭'৬	৪'৮

১৯২৪ সনে শিল্পের সংস্কারের পর দ্রব্যাদি দিয়া মজুরি শোধের প্রথা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। তথাপি এই প্রথা অল্প এক আকারে দেখা দেয়। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান মজুরদের বাসস্থান, তাপ, আলো ও অন্যান্য সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও বিপ্লবের কালে কখন কখন আংশিক টাকা লইয়া অথবা সাধারণতঃ সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় বাসস্থান যোগান রুশীয় শিল্পের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। এ ব্যবস্থা কিছুদিন আগেও ছিল। যখন বাসস্থান ও মিউনিসিপাল সুবিধাসমূহের জন্য দাম দিতে হয়, তখন সে দাম মজুরি হইতে বাদ দিয়া মজুরি দেওয়া হয়। গত দুই বৎসর ধরিয়া এই উভয় খাতের জন্য পয়সা দেওয়ার দিকে মজুরদের প্রবণতা বাড়িয়াছে। বাসস্থান ও মিউনিসিপাল সুবিধাসমূহ বিনা পয়সায় যোগাইলে সেগুলিকে মজুরির আংশরূপে বিবেচনা করা হয়। মোট মজুরির শতকরা কত অংশ নগদ আর কত অংশ দ্রব্যাদি তাহা নীচের তালিকায় জানা যাইবে।

সন ও মাস	নগদ মজুরি	দ্রব্যাদি মজুরি	সামাজিক অভার
১৯২৪			বাদ যায়
মার্চ্চ	৭৫·৪		২·৪
সেপ্টেম্বর	৮০·৬		১·৪
১৯২৫			
মার্চ্চ	৮১·৬		
সেপ্টেম্বর	৮৮·৮		
১৯২৬			
মার্চ্চ	৮৯·১		
সেপ্টেম্বর	৯২·১		

নগদ মজুরির শতকরা কত অংশ দ্রব্যাদি তাহা নীচের তালিকায় দেখান যাইতেছে :

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
বাসস্থান	—	০·১২	৪·৫	—
তাপ, আলো, জল, ট্রেন, স্নানের ঘর	—			—
বাসস্থান ভাড়া ও কাজে আসাযাওয়ার খরচা	—	১·২৫	১৮১	—
	৮·৫	৭·৬৮	৮·২৪	৮·১৮

দ্রব্যাদিরূপে মজুরির দাম :

	বিনা পয়সায় বাসস্থান তাপ, আলো, জল ইত্যাদি		বাসস্থান ভাড়া	
	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
সমগ্র শিল্প	১০০·৮	১৬৮·৮	৫৮·৪	৫৬·৯
কয়লা	১৩৮·০	১৪০·৯	৮১·৯	৯০·০
পেট্রোলিয়াম্	৩৪২·০	৩৭১·৮	১১৩·৩	৯৪·৬
ধাতু উত্তোলন	১২·৮		—	—
লবণ	১৬১·৯	১২৬·০	৪৪·৬	৫২·৯
রসে-শিল্প	১২৫·০	১৯৫·৬	৫১·৬	৪৬·০
ধাতু	৮৭·৩	১১১·১	৪৪·০	৬২·০

(পৃঃ ৯৬-১০১)

মজুরির স্তর-নির্ণয়

মজুরেরা দুই প্রকারে কাজ করে—(১) রোজ ধরিয়া, (২) টুকা বা পীস্ অনুসারে। রুশীয় শিল্পে পীস্ প্রথার বিকাশ নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

বৎসর	সমগ্র কাজের শতকরা কত অংশ পীস্ কাজ
১৯২৩	৪০·৬
১৯২৪	৪৪·৩
১৯২৪-২৫	৪২·২
১৯২৫-২৬	৪৮·৮
১৯২৬-২৭	৬১·২
১৯২৭-২৮	৬১·৬

কিন্তু সকল প্রকার শিল্পে পীস্ কাজের পরিমাণ একরূপ নহে। ১৯২৭-২৮ সনে নিম্নতম হার ছিল ১৩% বৈদ্যুতিক ষ্টেশনে, আর উচ্চতম হার ৭৬% কাপড়ের ব্যবসায়ে। অন্যান্য শিল্পে এই দুই হারের মধ্যে উঠা-নামা

ঘটিয়াছে। ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে সব চেয়ে বেশী পীস্ কাজের প্রসার ঘটিয়াছিল, তারপর পরিচালা কমিয়া গিয়াছে। শিল্পে পীস্ প্রথার বিস্তৃতি, মিশ্রিতভাবে মজুরি দেওয়া ও বোনাসের প্রবর্ত্তনের ফলে প্রথমতঃ বিভিন্ন মজুরের আয়ে পার্থক্য আনয়ন করে, দ্বিতীয়তঃ মজুরি অনেক বাড়ায়, তৃতীয়তঃ পীস্ হিসাবে মজুরির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট মজুরির চেয়ে অনেক বাড়িয়া যায়। (পৃঃ ১০৭)।

নব আর্থিক নীতি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মজুরির স্তরভেদ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। বৃত্তি বিভাগ করিয়া কার্য্যদক্ষতা অনুসারে মজুরি দেওয়া সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শিল্পকে বাণিজ্যিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া উৎপাদন-শক্তি বাড়াইবার জন্য মজুরি বাড়ান দরকার হইয়াছিল। ট্রেড ইউনিয়ন মজুরিকে ১৭টি স্তরে বিভক্ত করিলেও কার্য্যতঃ ২৪ হইতে ৩০ কোথাও কোথাও ৩২ স্তর-ভেদ দেখা যায়। স্কেলের প্রথম ও শেষ স্তরের পরস্পর অনুপাত ছিল ১:৫, ১:৬, ১:৭, ১:৮, এমন কি ১:১০। ট্রেড্ ইউনিয়ন যে ১৭টি স্তরে বিভাগ করিয়াছিল, তার প্রথম ১টির প্রথম ও নবমটির অনুপাত ছিল ১:২·৭ ও অন্য খাটিয়া যারা খায় তাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। বাকীগুলির সপ্তদশ ও প্রথমটির অনুপাত ছিল ৫:১ ও খুব দক্ষ কারিগরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। মজুরির স্তর নিম্নরূপ :

স্তরের নং	কোএফিসেণ্ট	স্তরের নং	কোএফিসেণ্ট
১	১·০	১০	৩·০
২	১·২	১১	৩·২
৩	১·৪	১২	৩·৫
৪	১·৬	১৩	৩·৭
৫	১·৮	১৪	৪·০
৬	২·০	১৫	৪·৩
৭	২·২	১৬	৪·৬
৮	২·৪	১৭	৫·০
৯	২·৭		

কিন্তু এই স্তর বিভাগও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ১৯২৪ সনের ৩ অক্টোবর হইতে প্রথম, নবম ও সপ্তদশ স্তরের অনুপাত স্থির করা হয় ১ : ৩·৫ : ৮। সম্পূর্ণ বিভাগটি নিম্নরূপ :

কাজের রকম	অদক্ষ শ্রমিক	দক্ষ শ্রমিক	নীচের শাসক ও কারিগরি কর্ম্মচারী	উঁচু কর্ম্মচারী
স্তর নং	১:২:৩:৪:৫	৬:৭:৮:৯	১০:১১:১২	১৩:১৪:১৫:১৬:১৭
স্কেলে কোএফিসেণ্ট	১·০:১·২:১·৫:১৮:২·২	২·৫:২·৮:৩·১:৩·৫	৪·২:৪·৮:৫·০	৫·৫:৬·২:৬·৯:৭·২:৮·০

এই বিভাগও যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় বিশেষজ্ঞদের জন্য পীস্ হারে ও বোনাস্ দিয়া বেশী মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পীস্ ও রোজ কাজের মজুরি যথাসম্ভব একপ্রকার করিবার চেষ্টা করিলেও বিভিন্ন শিল্পে কোন শ্রমিকের এক ঘণ্টার মজুরির রোজ হারের কত অংশ এক ঘণ্টার পীস্ হারে মজুরি ছিল তার তালিকা নীচে দেওয়া যাইতেছে :

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বাস্তব শিল্প	১২৯·১	১২৪·১	১২৪·১
খনি	১৭৫·৯	১৬১·৫	১৬৪·৪
কাঠের কাজ	১৪৯·০	১৫০·০	১৩৩·৮
কাগজ শিল্প	১৪৮·১	১৩৩·০	১৩০·৬
ছাপা	১৩৫·৭	১২৮·০	১২৭·৩
রঙ্গ শিল্প	১০৬·৩	১০৩·৮	১০৯·২
কাপড় শিল্প	১২৭·৮	১০৯·৪	১৪৪·৪
চামড়া শিল্প	১০৭·৩	১০৯·৬	১২৯·২
খাদ্যদ্রব্য	১১৭·৮	১১৯·৮	১০৮·৪
রাসায়নিক শিল্প	১৪৮·৫	১৪২·৪	১৩৭·৩
সমুদয় শিল্পের গড়	১২৮·৮	১২৪·০	১২৭·৭

ফলে বিভিন্ন শিল্প-শাখার সমান দক্ষ মজুরদের মজুরিতে ষোলতর পার্থক্য দেখা যাইত। একই ব্যবসায় অদক্ষ শ্রমিকের গড় উপার্জ্জনের শতকরা কত অংশ দক্ষ মজুরের উপার্জ্জন ছিল তাহা নীচের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

	যানবাহন গাড়ী নির্ম্মাণ			বিশেষ কল নির্ম্মাণ			বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং		
	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
অদক্ষ শ্রমিক	১০০·০	১০০·০	১০০·০		১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০
ধাতুড়িগার	১৪১·৯	১৪৪·২	১৪৩·২		১৪৯·০	১৪৩·১	১২২·৯	১৫৫·২	১৫০·৪
যন্ত্রপাতি নির্ম্মাতা	১৯০·৭	১৫৬·৮	১৬০·৯		১৫৩·৮	১৬২·৭			
টার্ণার	১৮৭·৭	১৭২·৭	১৭৬·২		১৮১·৫	১৭৪·১	২১৪·০	২০৩·১	২০৮·০
চাবিকার	১৯৯·৮	১৭৬·৯	১৮২·২		১৮৭·৮	১৮৪·০	১৯৯·২	১৯৫·১	১৯৫·১
মিলিং মেশিন টেণ্ডার	১৮১·৮	১৭২·৪	১৮৪·৩		১৮৬·৪	১৮১·৫	১৮৮·৫	২০৫·৩	২১২·৪
কামার	২১৪·৮	২০৩·১	২০৮·৭		২০৬·০	১৯৭·৮	২৪৫·১	২২৩·৮	২১৩·৭
মিস্ত্রী	২১৭·৮	১৯৩·৩	১৯১·২		১৭২·৪	১৮১·৪		২২৮·৯	২১৭·১
ম্যাডলার	২২৩·৭	১৯২·০	১৯৩·৫		১৮৮·৪	১৮৯·১	—	২৪৩·১	২৫৫·৯

(পৃঃ ১১০-১১৭)

মজুরির যে কেল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল ও যে মজুরি সত্য সত্য দেওয়া হইত এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিত অনেক। শ্রমিকদিগকে, বিশেষতঃ পীস্ হারে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে, অতিরিক্ত একটি মজুরি ধরিয়া দেওয়া হইত। সমগ্র শিল্পের গড় পীস্ হারে মার্চ্চ ১৯২৬এ ছিল ৬৮·৭, মার্চ্চ ১৯২৭এ ৭২·৩ ; আর রোজ হারে যথাক্রমে ২৫·৯ ও ২৯·৪ (পৃঃ ১১৯)। ১৯২৬ সনের শেষে সংস্কারের চেষ্টা হয় ; ১৯২৮ সনের ১লা মার্চ্চ মজুরির সংস্কৃত স্কেলে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে মিলিত চুক্তির অন্তর্গত শ্রমিকদের ৮৩·৫%কে মজুরি দেওয়া হয় (১২২ পৃঃ)। গড়ে শ্রমিকদের অতিরিক্ত বেতন আদায় মজুরির শতকরা ১৯২৭ সনে ৫৩·৯ (মার্চ্চ) ও ৬০·৭ (সেপ্টেম্বর) ও ১৯২৮ সনে ৩২·২ (মার্চ্চ) ও ৩৭·৮ (সেপ্টেম্বর) ছিল (১২৩ পৃঃ)। পীস্ হার ও রোজ হারের নমুনা :

মাস ও বৎসর	পীস্ হারে শ্রমিক	রোজ হারে শ্রমিক
নবেম্বর ১৯২৭	৭৯·৪	৩১·৬
ফেব্রুয়ারী ১৯২৮	৫৬·৬	২৩·৯
মে ১৯২৮	৪৮·৪	১৮·৭
আগষ্ট ১৯২৮	৫১·৭	৯·১
নবেম্বর ১৯২৮	৫৩·১	২১·৮
ফেব্রুয়ারী ১৯২৯	৪৪·৭	১৭·১

অতিরিক্ত মজুরি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মোট মজুরির অনুপাত বাড়িতে থাকে এবং ১৯২৬ হইতে ১৯২৮ সন অবধি দক্ষ ও অদক্ষ মজুরের মজুরির পার্থক্য কমিয়া আসে। যথা, সমুদয় শিল্পের গড় ১৯২৪, ১৪৭·৪ ; ১৯২৫, ১৪৪·৮ ; ১৯২৭, ১৩৭·৯ ; ১৯২৮, ১৩৮·১ (পৃঃ ১২৪)। ১৯২৮ সনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পীস্ হার, রোজ হার ও বোনাস্ সম্বন্ধে নূতন নীতি প্রবর্ত্তন করিতে হয় (১২৫ পৃঃ), ও ১৯২৮-২৯ ও ১৯২৯-৩০ সনে সম্মিলিত চুক্তি আন্দোলন চলিতে থাকে। ১৯৩০ সনে মজুরি সম্বন্ধে যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মজুরি নীতি বিলকুল বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। পীস্ হার ও রোজ হার, অথবা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি সমান করিবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে (১২৮ পৃঃ)।

প্রকৃত মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধি

নব আর্থিক নীতি প্রবর্ত্তনের ফলে প্রকৃত মজুরি কিরূপ বাড়ে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
খনি	৪১·১	৪৭·৫	৫৫·৫
যাদু	৪০·৭	৫২·৪	৬৭·৪

বয়ন	৬০·১	৮৮·৪	১০২·০
রাসায়নিক	৬৭·৯	৮২·৮	১০৪·৪
চামড়া	৬৭·০	৯৮·১	১১৬·৪
ছাপা	৬৪·৯	৯১·৯	১০৪·৯
খাদ্যদ্রব্য	৯০·২	১১৫·৫	১৩১·৪
কাগজ	৮০·৬	১০০·১	১১৫·৪
কাঠের কাজ	৭৫·৮	৮৬·৪	৯৯·১
সমগ্র শিল্পের গড়	৫২·২	৬৮·০	৮২·৬

মজুরি বাড়াইবার জন্য প্রতি বৎসর কোটি কোটি রুবল ঢালা হইয়াছে (১৩৫ পৃঃ)। মজুরির বৃদ্ধির ছাঁচ নানা প্রকার হইয়াছে, কিন্তু দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-শক্তি বাড়ানই ১৯২৯-৩০ সনের উদ্দেশ্য ছিল (১৩৭ পৃঃ)। ১৯২৯-৩১ সনে ১৯২৮-২৯ সনের মত ব্যক্তিগত উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়াছে (১৭১ পৃঃ)। গড়ে মাসিক মজুরি বাড়িয়াছে।

মন্তব্য

উপরে সংক্ষেপে রুশীয় মজুরি ও শ্রমের সর্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। একটা জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা এই যে, রুশিয়াকে নানা দিক্ দিয়া তার পূর্ব বোলশেবিক নীতিকে ত্যাগ করিতে বা পরিবর্তিত করিতে হইয়াছে। ধীরে ধীরে বোলশেবিক রুশীয়ার নিজস্বটুকু এমন সব প্রশ্ন আসিয়া জুটিয়াছে যার সমাধান পুঁজি দুনিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা ছাড়া সম্ভবপর হয় নাই। স্যাপোয়নকি এই কথা সভাতা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছেন।

শ্রীসুধাকান্ত দে

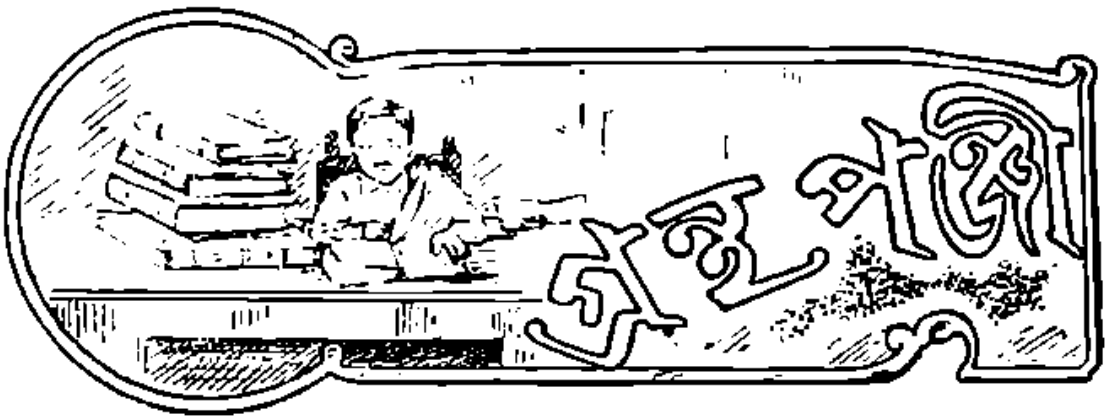

১। "দি একনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব্ পোষ্ট-ওয়ার ফ্রান্স। এ সার্ভে অব্ প্রডাক্‌শন।" (যুদ্ধের পরবর্তী ফ্রান্সের আর্থিক উন্নতি। উৎপাদন সম্বন্ধে অনুসন্ধান।) হিউবিয়াম্ এস্ গুডরার্ণ, ও হিউবিয়াম্ আর্কে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। ১২+৬১৩ পৃঃ।

২। "দি কষ্ট অব্ লিভিং ইন্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স" (যুক্তরাষ্ট্রে জীবন ধারণের খরচা) ১৯১৪-৩০। ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কনফারেন্স বোর্ড প্রকাশিত। নিউ ইয়র্ক। ১৯৩১। ১০+১৭০ পৃঃ।

৩। "দি একনমিক পলিসি অব্ সোবিয়েট্ রুশিয়া" (সোবিয়েট্ রুশিয়ার আর্থিক নীতি), ডক্টর পল হ্যানসেন। পি এস কিং। লণ্ডন। ১৯৩০। ৭+১৯০ পৃঃ।

৪। "সিলভার অ্যাণ্ড চায়না। অ্যান্ ইন্‌ভেষ্টিগেশন অব্ দি মনিটারি প্রিন্সিপ্‌ল্‌স গবর্ণিং চায়নাস্ ট্রেড্ অ্যাণ্ড প্রস্‌পারিটী।" (রূপা ও চীন। চীনের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী মুদ্রাঘটিত নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান।) এ ডারিট সিম্রিক। পি এস কিং, লণ্ডন। ১৯৩০। ১১+৯০ পৃঃ।

৫। "একনমিক পাওয়ার অব্ ক্যানাডা" (ক্যানাডার আর্থিক শক্তি), জে অ্যালেক্স ঐকিন। ক্যানাডার ম্যাকমিলান কোম্পানী, টোরোণ্টো। ১৯৩০। ২৬৪ পৃঃ।

৬। "অ্যান্ একনমিক হিষ্টরি অব্ ইয়োরোপ (ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস) ১৭৬-১৯৩০, আর্থার সিনি। ১৯৩০। ১১+২৮৯ পৃঃ।

৭। "দি নিগ্রো পেজেণ্ট টার্নস্ সিটিওয়ার্ড। এফেক্টস্ অব্ রিসেণ্ট মাইগ্রেশনস্ টু নর্থার্ণ সেণ্টারস্।" (নিগ্রো চাষী সংঘের দিকে চলিতেছে। উত্তর কেন্দ্রে আধুনিক আগমনের ফলাফল।) লুইস্ কেনাব্‌ল কেব্রেডি। ইতিহাস অর্থশাস্ত্র ও আইন বিষয়ে অনুসন্ধান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি কর্তৃক সম্পাদিত। নং ৩২৯। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। ২১০ পৃঃ।

৮। "নিগ্রো মেম্বারশিপ ইন্ আমেরিকান্ লেবার ইউনিয়ান্‌স্" (আমেরিকার মজুর সঙ্ঘে নিগ্রোদের সভ্য হিসাবে স্থান), ন্যাশনাল আর্বান লীগ। গবেষণা ও অনুসন্ধান বিভাগ। নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। ১৭৫ পৃঃ।

৯। "দি ব্ল্যাক্ ওয়ার্কার। দি নিগ্রো অ্যাণ্ড দি লেবার মুভমেণ্ট"। (কালা শ্রমিক। নিগ্রো ও মজুর আন্দোলন। রোলিং ডি স্পেরো ও আব্রাহাম এল্ হ্যারিস্। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩১। ১০+৫০৯ পৃঃ।

১০। "টুওয়ার্ডস্ সোস্যাল ইকোয়ালিটি" (সাম্যাজিক সাম্যের দিকে), জন এ হব্‌সন। এল্ টি হব্‌হাউস স্মৃতি বক্তৃতা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, লণ্ডন। ১৯৩১। ৩৪ পৃঃ।

১১। "দি রেস প্রব্লেম ইন্ আফ্রিকা" (আফ্রিকার জাতি-সমস্যা) চার্লস রোডেন বাস্কটন। দি মেটেন্‌স বক্তৃতা। হুগার্থ প্রেস, লণ্ডন। ১৯৩১। ৬০ পৃঃ। ১ শি।

ইংরেজি ভাষার দাসত্ব হইতে বাংলার ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার মুক্তিলাভ*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

প্রায় আড়াই বছর পর আবার দেশে ফিরে এলাম। আবার পুরাণো খানিতে জুড়ে যাব। পুরাণো কথাই আর একবার নতুন করে বলি। আমার ব্যবসা মজুরের কাজ করা। মজুরগিরি আমার বিভিন্ন প্রকারের। কখনও আছি শিক্ষা-প্রচারে, কখনও বা বর্ত্তমান ভারতের জীবন কি রকম এবং চীন জাপানের সহিতই বা এর যোগাযোগ কিরূপ, তা আলোচনা করি। আমার আর এক রকমের মজুরগিরি হচ্ছে আর্থিক জগতে কোন্ দেশ কোন্ পথে চল্‌ছে তার সন্ধান রাখা।

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেমন মজুর, এ রকম আরও পাঁচ সাত দশ জনকে মজুর রূপে গড়ে, তোলা। এ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমাদের কারবার,—ধনদৌলত সম্বন্ধে আলোচনা করা,—এ সম্বন্ধে কেতাব পড়া, খবরের কাগজ পড়া। এজন্য, ধনোৎপাদন যেখানে যেখানে ঘট্‌ছে সেই সব কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মোলাকাৎ করা ইত্যাদি।

ধনদৌলত সৃষ্টি করা এই পরিষদের কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত নয়, বলাই বাহুল্য। তাহার জন্য ব্যবস্থা চাই অন্য রকমের। জ্ঞানবৃদ্ধি আর সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া এই পরিষদের আর কোনো মতলব থাকিতে পারে না।

ধনদৌলতের আলোচনা করার চরম উদ্দেশ্য কি? ধনবিজ্ঞান চর্চ্চায় বাঙ্গালীকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম হ'তে হবে।

বাঙ্গালীরা ধনদৌলতের চর্চ্চায় অগ্রগামী জাতিদের অন্যতম হ'তে পারে কিনা, এবং যদি পারে তা হ'লে কি ক'রে হ'তে পারে এবং কবে হ'তে পারে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার একটা নেশার মধ্যে পরিগণিত। আর একটা গুরুতর কথা আছে। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হ'তে মুক্তি দেওয়াও আমার একটী উদ্দেশ্য।

অর্থনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা চালাতে হবে বাংলা ভাষার বাহনে, ইংরেজী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'রে। কত দিনে কি উপায়ে বাঙ্গালীর উচ্চতম শিক্ষা-ক্ষেত্রে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র,—কি কৃষি-বিষয়ক, কি শিল্প-বিষয়ক, কি বাণিজ্য-বিষয়ক,—একমাত্র বাংলা ভাষার মারফৎ আলোচিত হবে, একথা আমার মাথায় যায় পর নাই বড় স্থান অধিকার করে।

প্রশ্ন ওঠে, এম্-এ ক্লাসে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভবপর কি? ১৯১০ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে একটী প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। তখনকার কথা ছিল,—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার স্তরে প্রত্যেক বিষয়ে বাংলা ভাষা কায়েম করতে হবে। সেই প্রস্তাবটাই আজ সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে চালাবার কথা বলছি। অন্যান্য বিদ্যার কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সম্বন্ধে সেই বিশ বছর আগেকার প্রস্তাবই আবার খাড়া করছি।

আমি যেমন মজুর এই ধরণের মজুর বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কাজে আর সাতজন আছে। তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য কর্ম্মিকর্ম্মা যুবা।

কিন্তু, আজই দারা বাংলা দেশ থেকে এই সাত জনেরই

---

* বেঙ্গল ল্যাম্পস্ চেয়ার অব্ কমার্স ভবনে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত চা-সভায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম। (৭ নবেম্বর ১৯৩১)।

সমান ৭০ কি ৬০, কমসে কম ৫০ জন সংগ্রহ ক'রতে পারি। এদেরই সমান তাদেরও কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, মাথাও আছে। কিন্তু এই ৫০ জনকে হুপেট খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

তারপর তাদের কাজে লাগানো কঠিন নয়। যদি এদের প্রত্যেককে মাসে ১৫০৲ ক'রে দেওয়া যায়,—অধ্যাপক হ'লে এই রকমই বেতন পেয়ে থাকে,—৫০ জনে তা হ'লে অঘটন ঘটাতে পারে।

দশ বছর যদি এদেরকে রাখা যায়, তা হ'লে খরচ পড়ে ৯ লাখ টাকা। এই ৫০ জন লোককে শুধু মাহিনা রাখ্‌লে হবে না, এদের "গোচারণের মাঠ" চাই। এদের মাঠে নিয়ে যাওয়া চাই, কাহাকে বাঙ্গে, কাহাকে বীমায়, কাহাকে ব্যাঙ্কেরীতে পাঠানো হবে। আবার, কেউবা যাবে বেড়াতে জামসেদপুরে, কেউবা পাঞ্জাবে, আর এক আধজন যদি পারে, সমুদ্র সাঁতরে ওপারটা ঘুরে আস্‌বে—জাপানে, আমেরিকায়, রুশিয়ায়, ইতালি-জার্ম্মাণিতে।

এই যে ৫০টী লোক এরা হুধ দেবে কি রকম?

প্রথমতঃ এদের কাজ হবে অন্যান্য ভাষায়,—ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান—অর্থশাস্ত্রের যে সব কেতাব আছে তাদের বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করা। এর ফলে বাংলাভাষার মারফৎই ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী বইগুলা পাওয়া যাবে। তারপর, "আর্থিক উন্নতি" রকম মাসিক পত্রিকা এরকম দশ বারখানা বিভিন্ন কাগজ এক সঙ্গে চালানো সম্ভবপর হবে। তার ফলে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিষয়ক বহুবিধ রচনা বাঙ্গালীর সাহিত্যে দাঁড়িয়ে যাবে।

এইভাবে কাজ চালাতে পারলে ১৯৪০ সনের মধ্যে বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'রবে। পরের এই তর্জ্জমা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। স্বাধীন গবেষণার ফলও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে।

'রিসার্চ্চ' বস্তুটা কি, এ বিষয় আমাদের জ্ঞান কম। গবেষণার মধ্যে আধ্যাত্মিকত্ব কিছু নেই। প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক, ব্যাপারগুলা লক্ষ্য কর্‌লেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতির কর্ম্মপদ্ধতি দেখলেই এটা সহজে উপলব্ধি করতে পারা যায়। অতি সাধারণভাবে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি তারা লিপিবদ্ধ ক'রে যায়। সেইগুলাই আবার কাগজে পত্রে বেরোয়।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল মাষ্টার জনকতক নিয়োজিত আছে, ধনবিজ্ঞান বিষয়ক খবরাখবর সঙ্কলন করবার জন্যে। খবরের কাগজের কাটতি দিনের পর দিন কম ক'রে 'কাটিং'এর লাইব্রেরী অনেক সময়ে খাড়া ক'রে তোলে। এজন্য 'কাটিং'গুলার সারমর্ম্ম আবার প্রবন্ধাকারে বা পুস্তকাকারে বাহির হয়।

ইয়োরোপের নানা প্রদেশে এইভাবে গবেষণা চালানো হয়। বিলাতের আর জার্ম্মাণির মজুরদলের কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ বহুদিন চল্‌ছে।

বার্লিনের আর ভিয়েনার 'ক্রাইসিস্ ইন্‌ষ্টিটিউট্' ত আছেই। ইতালিতেও মুসোলিনি মোটা টাকা ঢেলে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন।

তারপর, ব্যাঙ্কের কেরাণীরাও পৃথিবীর কোথায় উৎপাদন কি, কৃষি-সংক্রান্ত, শিল্প-সংক্রান্ত, বা অন্য কোন বস্তু-বিষয়ক, কোথায় বাড়তি, কোথায় কমতি, এবং বাকী-বাণিজ্যের অন্যান্য খবরাখবর সঙ্কলন করে। সেইগুলা যখন আবার কাগজে বেরোয় আমরা অবাক হ'য়ে যাই—ভয়ানক মিষ্টিরিয়াস্ ব'লে বোধ হয়। আসল কথা,—রোজ রোজ মামুলি সংবাদ সংগ্রহ করতে করতে লোকেরা আর্থিক জীবনের উঠানামা আঁকবার বিদ্যায় পেকে উঠে।

আর একটা বৃহৎ পরিষদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—আন্তর্জ্জাতিক মজুর পরিষৎ। সমস্ত দুনিয়ার খবর এখানে সংগৃহীত হয়। মজুর থেকে পুঁজিপতির খবর পর্য্যন্ত। আর একটা পরিষৎ—লীগ অব্ নেশান্‌সের আফিস। প্রত্যেক দেশের লোক এখানে পাওয়া যাবে ইংরেজ, গ্রেক, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি এবং ওখানকার অনেকেই ৩।৪টা ভাষা জানে। এই দুইটা পরিষৎ গবেষণার খানিক 'বিশেষ'। দুঃখের বিষয় ভারতবাসীরা যে কয়জন ওখানে স্থান পেয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রায় কেরাণী

স্থানীয়। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে নাথা খাটিয়ে কাজ করার ধাতিরে তারা চাখুতে পারে না।

যে সব ঘটনাবলী এইভাবে ইয়োরোপের পরিষদে পরিষদে সংগৃহীত হচ্ছে, সেইগুলাই আবার 'মুখ-বুজ' হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। গবেষণার কোন ধাপেই রহস্যময় অতিকিছু নাই। সকলেই কাজ ক'রে চলেছে হাতে তুলি দিতে দিতে।

গবেষণা বস্তুটা হাতী ঘোড়া নয়। বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান গবেষণাও ঠিক এইরূপ মামুলি জিনিষে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, যদি বাংলা ভাষার সাহায্যে তথ্য-সংগ্রহ, অঙ্ক-সংগ্রহ, তথ্য-বিশ্লেষণ আর অঙ্ক-বিশ্লেষণ চালাবার ব্যবস্থা করা যায়। "আর্থিক উন্নতি"র মতন দশ বারখানা ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রচারিত হতে থাকলেই বাংলা দেশে গবেষণা জুজুর ভয় আর থাকবে না। বিদেশী অর্থশাস্ত্রীদের সঙ্গে টক্কর দিবার কাজে বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞানসেবী মাত্রেই সাধনী হতে পারবে।

আমি বলছিনা ইংরেজীকে বয়কট বা বর্জ্জন করতে। বস্তুতঃ, আমি শুধু ইংরেজী কেন, অন্যান্য ভাষা শিক্ষায়ও উৎসাহ দিয়ে থাকি। তবে মার্কিণ যেমন তাদের দেশীয় ভাষায় নিজেদের শিক্ষাকার্য্য চালায়, জাপানীরা যে রকম নিজের দেশে নিজের ভাষা দ্বারা শিক্ষা প্রচার করে, আমরা বাঙ্গালী সেইরূপ বাংলা ভাষাকেই শিক্ষাদীক্ষার একমাত্র বাহন মনে করবো। আমাদের দাবী এই যে, আগামী ৫, ৭, ১০ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রত্যেক বিষয়কেই ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হ'তে মুক্তি দিতে হবে। ধন-বিজ্ঞানের উচ্চতম আলোচনায় ও পঠনপাঠন গবেষণার সকল স্তরেই চাই বাংলা, চাই একমাত্র বাংলা।

এই গেল ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় যুবক বাংলার পক্ষে চরম লক্ষ্য ও আদর্শের কথা। এইবার কয়েকটা গবেষণার ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলব। নিম্নলিখিত দুই তিনটা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে পারলে আমাদের একটা বড় অভাব পূর্ণ হয়। আগামী তিন চার বৎসরের ভিতর এই সকল আলোচনাই আমার কার্য্য-তালিকার প্রধান ঠাঁই দখল করবে।

প্রথমতঃ, ১৯০৫ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী লেখকেরা বাংলায় ও ইংরেজিতে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা কিছু চিন্তা করেছেন তাদের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক। তাহার নাম হ'তে পারে "যুবক বাংলার অর্থনৈতিক চিন্তা।" ১৯০০-০১ সনে মিউনিকে অধ্যাপনার সময়ে এই বিষয়টার দিকেই বিস্তৃত-ভাবেরূপে দেশবাসীর নজর টেনে আনতে চেষ্টা করেছি।

"হিষ্টরিক্যাল্ ট্রেন্ড্স্-ইন্ দি ইকনমিক থিওরি সেন্ট্রাল্ কেনগাঙ্গেস ইণ্ডার্স আইট ১৯০৫" (ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তা, —১৯০৫ সনের পরবর্ত্তীকাল) নামে আমার ভাষায় একটা বই লিখবার মতলব ছিল। তাই এক্ষণে বাংলা ভাষায় —একমাত্র বাঙ্গালীর চিন্তা-বিষয়ক রচনার আকার গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়তঃ, যাথাপিছু বাঙ্গালীর আয় কত এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে চাই। এজন্য দরকার হবে জেলায় জেলায় খুঁটে খুঁটে তথ্য সংগ্রহ করা। মেহনৎ লাগবে খুব। অনেক গবেষকের সমবেত কাজ আবশ্যক হবে।

তৃতীয়তঃ, দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান সাহিত্যের যে সকল ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান ও অন্যান্য জাতীয় বই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহার ভিতর গ্রন্থকারদের মৌলিক (বা স্বকীয়) কতখানি আর ধার করা (বা পরকীয়)ই বা কতখানি তা জরীপ করে বাংলা ভাষায় একখানা বই প্রকাশ করা আবশ্যক। এই দিকেও দেশের লোককে মাথা খেলাবার জন্য ডাকছি। এই ধরণের বই বেরিয়ে গেলে বাঙ্গালী লেখক, পাঠক, মাষ্টার মশায়রা সহজেই বুঝতে পারবেন যে বিদেশী গ্রন্থকারদের মতন বাংলাভাষায় গ্রন্থকার গড়ে তোলবার জন্য বাংলা দেশকে বিশ পঁচিশ বৎসর বসে থাকতে হবে না। বাঙ্গালী জাতি আজই ধনবিজ্ঞান সাহিত্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সমর্থ।

মুর্শিদাবাদের একটী মেলা

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্, এ

মুর্শিদাবাদ মেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত জিৎপুর একখানি যাত্রাস্থি গ্রাম। গ্রামখানি ভোমকল পোষ্ট অফিসের এলাকাভুক্ত। এই গ্রামে কার্ত্তিক মাসে কালীপূজার সময় ৩ই সপ্তাহব্যাপী একটী বিরাট মেলা বসে।

মেলার উৎপত্তিকথা

বাঙ্গালা মুলুকের আরো অনেক মেলার ন্যায় এই মেলাটীর সঙ্গেও একটী কৌতূহলজনক কিম্বদন্তী জড়িত আছে। কথিত আছে, বহুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় একটী প্রাচীন পুকুরের ধারে একটী কৃষ্ণকায় রমণী একজন শাঁখারীকে একজোড়া শাঁখা পরাইতে অনুরোধ করে। শাঁখা পরাবার পর শাঁখারী দাম চাহিলে স্ত্রীলোকটী বলে যে, সে চৌধুরীদের মেয়ে—বুড়ো চৌধুরী তার বাপ। ঘরের তাকে পাঁচটী টাকা আছে, বৃদ্ধকে বলিয়া যেন শাঁখারী দাম চুকাইয়া লয়। শাঁখারী আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বৃদ্ধ চৌধুরীকে বলে। চৌধুরী মহাশয়ের কোন মেয়ে ছিল না। তাকে আশ্চর্য্যরূপে পাঁচটী টাকা দেখা যায়। শাঁখারীকে দাম চুকাইয়া দিয়া বৃদ্ধ চৌধুরী বিষম চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। রাত্রিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের স্বপ্নাদেশ হয় যে, স্বয়ং কালিকা দেবী পুকুরে স্নান করিয়া শাঁখা পরিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধ চৌধুরী যেন অতঃপর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা করেন, ঐ শাঁখারী কিংবা তাহার বংশধর যেন প্রতিমাকে শাঁখা পরায় এবং ঐ পুকুরেই যেন কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেলা স্থানের অবস্থান, যানবাহন লোক-সমাগম ইত্যাদি

জিৎপুর গ্রামের রাস্তা-সড়কের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। তবে গ্রামের তিন দিক্ দিয়া, ৩ মাইল ঘুরে ঘুরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তিনটী বৃহৎ কাঁচা সড়ক গিয়াছে। প্রথম সড়কটী বহরমপুর হইতে ভোমকল, জলঙ্গী হইয়া নদীয়া জেলার মেহেরপুর কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টী কাতলামারি থানা রাণীনগর হইতে থানা ভোমকল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তৃতীয়টী জলঙ্গী হইতে থানা রাণীনগরের নিকট দিয়া ইসলামপুরের নিকট প্রথম এবং প্রধান সড়কটীর সহিত মিশিয়াছে। শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে প্রথম এবং তৃতীয় দুইটী সড়ক দিয়াই যাত্রিবাহী মোটর বাস বহরমপুর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। মেলার সময় প্রথম রাস্তা দিয়া মোটর যাতায়াত করিয়াছে।

আলোচ্য মেলাটী পদ্মানদী হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও পদ্মানদীর প্রভাব ইহার উপর নিতান্ত সামান্য নয়। মেলা, বাজার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান-সমূহের সহিত যানবাহনের নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান। পদ্মা বিরাট নদী, বারমাস ইহাতে স্টীমার চলিয়া থাকে। এবার পূজার পর হইতে রাজসাহী জেলি স্টীমারখানি উঠিয়া যাওয়াতে মেলার বহু ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। পদ্মার পার হইতে মালপত্র লোকজন ইত্যাদি খুব কমই মেলাতে পৌঁছিয়াছে। মুর্শিদাবাদের মত অভিশপ্ত জেলা পশ্চিম বঙ্গে আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। কারণ এ জেলায় যানবাহন, রাস্তা সড়কের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাজসাহী জেলি স্টীমারখানি মুর্শিদাবাদের পারের পদ্মাতীরবাসীদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সেখানিও উঠিয়া যাওয়াতে একেবারেই ধকা ঠাণ্ডা হইল। এখন যদি কেহ মোটর বোট ইত্যাদি জলঙ্গী ঘাট হইতে লালগোলা ঘাট পর্য্যন্তও চালায় তাহা হইলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। কারণ সড়কের অবস্থা মোটর পরিচালনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়; বিশেষতঃ বর্ষার কয়মাস একেবারেই অসম্ভব।

মেলায় লোকসমাগম ও সামাজিকতা

জিৎপুরের মেলায় লোক সমাগম নিতান্ত মন্দ হয় না। এবারকার দুর্বৎসরেও কমপক্ষে প্রতিদিন ২।৩ হাজার লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছে। সুতরাং মেলায় মোট লোকসমাগম ২০।৩০ হাজার পর্য্যন্ত হইবে। মেলাযাত্রীর অধিকাংশই স্ত্রীলোক। নিরক্ষরের হিন্দু বিধবার সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বিধবারা তাহাদের অবলম্বনহীন একঘেয়ে জীবনে এইরূপ তীর্থযাত্রা ইত্যাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আনয়ন করিতে চেষ্টা করে। মেয়েদের এইরূপে বাহিরে আসার বিপক্ষে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু অনেকে মেয়েদের এইভাবে বাহিরে আসা পছন্দ করেন না; ভদ্রলোকের দেখাদেখি ভদ্রেতর জাতির ধনপতিগণও মজলিস করিয়া মেয়েদের বাহিরে আসা, ঝি-গিরি করা, হাটবাজারে যাওয়া বা কেরি করা ইত্যাদির বিপক্ষতাচরণ করিতেছে। যুবতী নারীরা বাহিরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিলে কিছু অনাচারের আশঙ্কা হয়তো থাকিতে পারে। নিজে সৎ থাকিলেও দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষগণ মেয়েদের সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু এই "কু"র হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নারীর স্বাধীনতা হরণ করিবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। চাই পুরুষদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন; আর এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন তখনই হইবে যখন যাহে দৈত্যে পড়িয়া মাত্র দু-চার জন নয়, কাজে বিনা কাজে, কারণে অকারণে, বাজার বাজার নারী রাস্তা ঘাট, হাট বাজার সমস্তই ছাইয়া ফেলিবে। তখন আর পুরুষরা নারীর সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করিতে সাহস করিবে না। যোগসাধনক্ষম সমর্থ নারীর সংখ্যাধিক্য হইলে এই সমস্ত অনাচার বিদূরিত হইতে যাবে।

ক্রয়-বিক্রয় দোকান পসার

দুর্বৎসরের জন্য এবার দোকানপাট এবং লোক সমাগম প্রতি বৎসরের মত হয় নাই—সমস্তই অর্দ্ধেকের মত দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য জিনিষপত্রের মধ্যে মিঠাই বিক্রয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মোট দোকানের সংখ্যা প্রায় ২৫খানি। দৈনিক গড়ে ২০৲ টাকা করিয়া বিক্রয় ধরিলেও মোট বিক্রয় প্রায় ৫০০০৲ হইবে। চানাচুর বাদামভাজার দোকান ৩ খানা, মোট বিক্রয় ৪০৲ টাকা; চানওয়ালী, ৬ জন; বিক্রয় ৭৫৲ টাকা, পানবিড়ির দোকান ২৪ খানা, বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫০৲ টাকা; চানওয়ালা ১ জন, বিক্রয় ৩০৲। সপের দোকান ২ খানা, বিক্রয় ১০০৲। সার্কাস পার্টি ২টী, আয় ১৫০৲। আখের দোকান ৩ খানা বিক্রয় ৬০৲। ছাতা মেরামতকারী ৬ জন বিক্রয় ৬০৲। বাসন ঝালাই ৫ জন বিক্রয় ৫০৲। খাঁতার দোকান ১ খানা বিক্রয় ১৫০। শাকদখুরী ৪ খানা বিক্রয় ৪০৲ টাকা। জুতার দোকান ২ খানা বিক্রয় ২৫০৲। কাটা কাপড়ের দোকান ৩ খানা বিক্রয় ৬০০৲। ছোট মনোহারি দোকান ১৪ খানা, বিক্রয় ৪০০৲। বড় মনোহারি দোকান ৭ খানা, বিক্রয় আন্দাজ ৭০০। কাপড়ের দোকান ৮ খানা বিক্রয় ৪০৲। জুতার দোকান ৫ খানা বিক্রয় ১০০৲। ছুরির দোকান ৪ খানা বিক্রয় ৮০৲। কুমারের দোকান ৪ খানা, বিক্রয় ৪০৲। জুতা সেলাইয়ের দোকান ১০ খানা, উপার্জ্জন ১০০৲। সিঁদুরের দোকান ১ খানা বিক্রয় ৫৲। মাটীর পুতুলের দোকান ২ খানা বিক্রয় ২০৲। ট্রাঙ্কের দোকান ১ খানা, বিক্রয় আন্দাজ ১২৫৲। খইয়ের দোকান ১৬ খানা বিক্রয় ৩২৲। উপরের এই সমস্ত হিসাব হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মেলায় মোট জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে প্রায় দশ বার হাজার টাকার। এই বৎসর দুর্ব্বৎসর বলিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের তেমন জোর নাই। সাধারণতঃ এই মেলায় ২০।২৫ হাজার টাকার জিনিষ বিক্রয় হইয়া থাকে।

মেলায় বেশ্যা সমাগম

জিৎপুরের মেলায় প্রতি বৎসরেই বেশ্যা সমাগম হইয়া থাকে এবং এই জন্য লোক-সমাগমও হইয়া থাকে বিস্তর। এবার প্রায় ২৫ জন বেশ্যা মেলায় আসিয়াছিল, এবং ইহারা অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা রোজগার করিয়াছে।

মেলায় বেশ্যা-সমাগম সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণের ধারণা অবশ্য ভাল নয়। সমাজের নৈতিকতার দিক্ দিয়া বেশ্যা-সমাগম ভাল না হইলেও মেলার আর্থিকতার তরফ হইতে

বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করিতে গেলে, সত্যসত্যই বলিতে হয় বেল্লা ছাড়া মেলা ভাল জমে না। শিংপুরের ৩ ক্রোশ দূরে ইসলামপুর একখানি পল্লিস্থ গ্রাম। নিকটেই এক গ্রামে প্রায় ৭০০ ঘর তাঁতীর বাস, ইহা দেশী কাপড় উৎপাদনের একটী বিশিষ্ট কেন্দ্র। নিকটে দুই দুইটী বড় বড় বাজার। এবার তথায় সখ করিয়া জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা বসান হইয়াছিল; কিন্তু বেল্লা-বস্তুর অভাবে মেলাটীর দুর্দশার অন্ত ছিল না—লোকাভাবে ইহা শ্মশানপুরীর মত দেখাইয়াছে। মোট কথা বেল্লার অভাবে মেলাটী একেবারে ফেল মারিয়াছিল।

একঘরকা মেলা

হাট বাজার মেলা প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের স্থানগুলির মধ্যে পদ্মার এপার আর ওপারে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এপারে কেবলমাত্র বিদেশী জিনিষ, শিল্পদ্রব্য ইত্যাদিই বিশি হইয়া থাকে। স্থানীয় জিনিষপত্রের মধ্যে এক স্থানীয় অভাব-পূরক-নাবিক খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোন জিনিষপত্র বিক্রয় হয় না। মোট কথা, জিনিষ কিনিবার জন্য বেপারীরা কেহই মেলাতে বা হাটে আসে না। পক্ষান্তরে ওপারের (উত্তর বঙ্গ) হাট, মেলা ইত্যাদির বিশেষত্বই এই যে, তথায় দেশী বিদেশী নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যও যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রী হইয়া থাকে। এজন্য অনেক দালাল-বেপারী আসে, ক্রয়-বিক্রয়ের বহরও খুব জাঁকাল। পদ্মা পারের লোকেরা নাকি সকলেই ব্যবসা করিয়া থাকে। সেইজন্য উত্তর বঙ্গে হাট বা মেলার সংখ্যা অনেক বেশী। ঐগুলি আকারেও বৃহৎ, এবং উহাতে ক্রয়-বিক্রয়ও অনেক বেশী হয়। পদ্মার এপারের হাট ও মেলাগুলি স্থানীয় লোকদিগের অভাব পূরণের জন্যই বসে—ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে এইগুলি বসান হয় না, বা সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। পদ্মার এপারের জমিদার, মহাজন, কড়িয়া, বেপারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ এসম্বন্ধে অবহিত হইবেন কি?

খেজুরগাছের চাষ

প্রকৃতিদেবী বাঙ্গালাদেশকে কতকগুলি নিজস্ব সম্পদ্-সম্ভারে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর অপর কোনও স্থানে নাই, এবং মানুষের প্রয়োজন হিসাবে সেইগুলি প্রায় পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগেই আবশ্যক হয়। এই অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির একটীরও স্বাভাবিক হইবার উপযুক্ত দ্রব্যের উৎপাদন-প্রণালী পর্য্যন্ত এখনও অপর স্থানের মনিষিগণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। সেই দ্রব্যের জন্য এখনও সমগ্র পৃথিবীকে একমাত্র বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে হয়।

এই নিজস্ব সম্পত্তি আর কিছুই নহে, তাহা পাট ও খেজুরে গুড়। একমাত্র এই বঙ্গদেশ ছাড়া পৃথিবীর অপর সকল স্থান প্রকৃতিদেবীর এই স্নেহের দান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

পাট ও খেজুরেগুড় বরাবরই বাঙ্গালায় ছিল এবং আছে। এই দুইটী কৃষিজাত দ্রব্য এক হিসাবে সহোদরতুল্য। কারণ ইহাদের জন্মস্থান সমতলবিশিষ্ট ভূমি অর্থাৎ যে প্রকার জমিতে খেজুর বৃক্ষ হইবে ঠিক সেই ভূমিতেই পাট চাষ হইবে, তবে পাটগাছের পরমায়ুঃ অল্প এবং তাহা সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই পাওয়া আবশ্যক। সেইজন্য তাহার উৎপাদক স্থানকে বিশেষরূপে পরিপাটি করিতে হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে তাহাতে কিঞ্চিৎ সার প্রদান করিতে হয়। কিন্তু খেজুর বৃক্ষের পরমায়ুঃ বহুবিলম্বস্থায়ী, সেই জন্য তাহার নিমিত্ত বিশেষ কোন কায়ক্লেশের আবশ্যক হয় না, কেবল রোপণ করিয়া শৈশব অবস্থায় তাহাকে বৃক্ষভক্ষকী পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই হইল।

বঙ্গদেশে অগ্রে পাট অপেক্ষা খেজুর গাছের আদর বেশী পরিমাণে ছিল। তখন লোকে পাট অপেক্ষা খেজুর গাছকে অত্যধিক যত্নসহকারে রোপণ করিত। কারণ একদিকে তখন বঙ্গদেশ হইতে পাট এরূপ অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত না, কেবল দেশবাসীর গার্হস্থ্য আবশ্যকীয় হিসাবে উৎপন্ন হইত। আবার অন্যদিকে তখন বৈদেশিক সর্করার আমদানি ছিল না বলিয়া দেশজাত সর্করার জন্য খেজুর গাছের চাষ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল।

বাঙ্গালীকে পাট ও খেজুরেগুড় দুইই রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী যদি অল্প পরিমাণ পাট বপন পূর্ব্বক পুনরায় খেজুরগাছ রোপণ করিয়া খেজুরে গুড় উৎপাদনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গের এই দুই কৃষি রক্ষা পাইতে পারে।

এক্ষণে খেজুরেগুড় প্রস্তুত করিবার আয়-ব্যয় সম্বন্ধে দেখা যাউক। প্রথমে দেখিতে হইবে, এক বিঘা জমিতে কতগুলি খেজুর বৃক্ষ রোপিত হইতে পারে। তৎপরে সেই বৃক্ষ হইতে কত রস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই রস হইতে কত গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা দেখিব।

এক বিঘা জমিতে চারিশত হইতে অধিক বৃক্ষ জন্মানো যায়; কিন্তু এক বিঘা জমিতে চারিশত বৃক্ষ জন্মিতে পারে ধরিয়া লইয়া আমরা এই হিসাব প্রদান করিব।

তৎপরে, রসের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সব মাসে সম পরিমাণে রস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রসোৎপত্তি শীতাধিক্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যে সময়ে অত্যধিক শীত হয় রসও সেই সময়ে অত্যধিক পরিমাণে হয়। আবার অল্প শীতে রসও অল্প হয়। তবে কার্ত্তিক মাসের রসের গুড় যেরূপ অধিক মূল্যে বিক্রী হয়, অন্য সময়ের রসের গুড় সেরূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না। সেই সময়ের রস হইতে একটী অতি সুবাস নির্গত হয় এবং ঐ রস ও রসজাত গুড়কে "নলেন" রস ও নলেন গুড় নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়ের গুড় বঙ্গবাসিগণের অতি প্রিয় দ্রব্য।

এক্ষণে রসের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইলে রস-ধরিবার কলসীর হিসাবেই তাহা করিতে হয়। যে কলসীতে রস ধরা হয় তার গ্রহণক্ষমতা দশ সের হিসাবে ধরা হয়।

হিসাব

১ বিঘা জমিতে ৪০০ শত খেজুর বৃক্ষ।

১ম দিন কার্ত্তিক মাসে এই ৪০০ শত বৃক্ষ হইতে ১০০ শত কলসী রস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২য় দিন	৫০
৩য় দিন	৩০

১০০ কলসী দশ সের হিসাবে ১০০০ হাজার সের, তাহা হইলে এই হাজার সের রসকে মণের পরিমাণে আনয়ন করিলে ২৫ মণ হয়। যত রস হইবে তাহার দশমাংশের একাংশ গুড় হইবে। তাহা হইলে এই ২৫/০ মণ রসে তার দশ ভাগের এক ভাগ ২½ আড়াই মণ গুড় হইবে।

কার্ত্তিক মাসের ১ম দিন ১০০ কলসী রস হইতে
২½ মণ ১২৲ হিঃ ০৲

২য় দিন ৫০ কলসী রস হইতে ১ মণ ৮৲ হিঃ ৮৲

৩য় দিন ৩০ কলসী রস হইতে ½ মণ ৪৲ হিঃ ২৲

৪০৲

এই সময়ে গুড়ের মূল্য অত্যধিক থাকে, সেখানে ১২৲ টাকা মূল্য ধরা হইল; কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যেও বিক্রয় হয়। পর দিবসের গুড়ের মূল্য কিঞ্চিৎ কম, তাহা ৮৲ আট টাকা মণ হিসাবে ধরা হইল। তৎপর দিবসের গুড়ের মূল্য আরও কম। তাহা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে ধরা হইল।

তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে একবার গাছ কাটিয়া যে গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা, সুতরাং এই মাসে চারিবার গাছ কাটিলে ৪০×৪=১৬০৲ টাকার গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তার পর অগ্রহায়ণ মাসে পাঁচবার গাছ কাটিতে পারা যায়। তাহা অপেক্ষা বেশী কাটিয়া রস বহির্গত করিয়া লইলে খেজুর বৃক্ষ খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং এ সময় রসও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এ সময় রস ক্রমশঃ কম হইয়া আসে।

১ম দিন ১৫০ কলসী ১০ সের হিঃ ০½ মণ ৮৲ হিঃ ২৮৲
২য় দিন ৮০ কলসী ১০ সের হিঃ ২ মণ ৫৲ হিঃ ১০৲
৩য় দিন ৪০ কলসী ১০ সের হিঃ ১ মণ ০৲ হিঃ ৫৲

৪২৲

এক দিবসের গাছ কাটায় ৪২৲ টাকা হইলে ৫ দিনের কাটাতে ৪১×৫=২০৫৲ টাকা হয়।

তৎপরে পৌষ এবং মাঘ এই দুই মাসে রস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সময়ে মাসে ৬ ছয় দিন হিসাবে গাছ কাটা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ তাহা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে কাটে, তাহাতে গাছ খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে ৬ দিবসের হিসাব প্রদত্ত হইল—

১ম দিন ২০০ কলসী ১০ সের হিঃ ৪ মণ ৪৲ হিঃ ২৪৲
২য় দিন ১৪০ কলসী ১০ সের হিঃ ৩½ মণ ৪৲ হিঃ ১৪৲
৩য় দিন ৬০ কলসী ১০ সের হিঃ ১½ মণ ০৲ হিঃ ৪৲০

৪৩৲০

তাহা হইলে এক দিবসের মূল্য ৪৩৲০ টাকা হইলে দুই মাসের ১২ দিবসের হিসাবে ৪৩৲০×১২=৫২২৲।

ফাল্গুন মাসে শীতাধিক্যের সহিত রসের পরিমাণও কম হইয়া যায়, সেই কারণে তাহা কার্ত্তিক মাসের রসপ্রাপ্তির সমান ধরা গেল। তবে এ সময়ের গুড়ের মূল্য পৌষ মাঘ মাসের সমান।

ফাল্গুন মাসের ১ম দিন ২½ মণ ৫৲ হিঃ ১২৷০
২য় দিন ১ মণ ৪৲ হিঃ ৪৲
৩য় দিন ½ মণ ০৲ হিঃ ১৷০

১৮৲

তাহা হইলে ১৮৲×৬=১০৮৲ টাকা। চৈত্র মাসে তিন পালা অবধি গাছ কাটা যায়, ১৮×৩=৫৪৲ টাকা।

এক্ষণে দেখা যাউক সমস্ত বৎসরে কত টাকার গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ—

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ	৫২২৲
পৌষ ও মাঘ	৫২২৲
ফাল্গুন	১০৮৲
চৈত্র	৫৪৲
	১০৪২৲

ব্যয়

আয়ের হিসাব দেখা গেল। এক্ষণে ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইতেছে। খেজুরে গুড় উৎপাদন করাইতে হইলে অন্য কোনরূপ ব্যয় আবশ্যক নাই, কেবল একজন শিউলির বেতন এবং তাহার সহায়তাকারী দুইজন মজুর হইলে আসানি সংগ্রহ হইতে খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইবে। আর যতগুলি খেজুর গাছ তাহার যেড়গুণ মৃৎকলসী এবং রস জাল দিবার জন্য ১০।১২ খানি যেলোহাঁড়ি আবশ্যক।

একজন শিউলির বেতন আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাস অবধি ২০৲ টাকা হিঃ ৬ মাসে ১২০৲ টাকা। ২ জন মজুর ১৫৲টাকা হিসাবে ৩০৲টাকা, ৬ মাসের বেতন ১৮০।

তবে ইহার মধ্যে আকাশের অবস্থানুসারে সময় সময় দুই একপালা খেজুর গাছ কাটা বন্ধ হইতে পারে, কারণ শীতকালে সময়ে সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, কিংবা বৃষ্টিপাত হয়। সেইরূপ হইলে সেই সময়ে রস হয় না, তাহাতে কিছু লোকসান হইতে পারে সেই লোকসানের পরিমাণ ১০০৲ এক শত টাকা ধরা গেল এবং তাহা ব্যয়ের মধ্যে গণনা করা হইল। এক্ষণে সমস্ত ব্যয় এক স্থানে যোগ দিয়া দেখা যাউক।

শিউলি	১ জন	১২০৲
মজুর	২ জন	১৮০৲
কাঠ খরিদ		২০৲
কলসী, হাড়ি প্রভৃতি		১৫৲
জমির খাজানা		৫৲
কার্য্য বন্ধের ক্ষতি		১০০৲
	ব্যয়	৩৪০৲

আয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং

আয়	১০৪৯৲	এই হিসাবটী লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ফল। ইহাতে
ব্যয়	৪৪০৲	কোনরূপ ভুলভ্রান্তি নাই।
লাভ	৬০৯৲ টাকা।	(পথ)

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার গ্রাম্য প্রণালীর উন্নতিসাধন

১। ইক্ষু রস অথবা খেজুর রস হইতে একেবারে গুড় প্রস্তুত হয়। এই দুই গুড় হইতেও নানা প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় চিনি প্রস্তুত করিবার কার্য্য সাধারণতঃ গৃহশিল্প হিসাবে ধরা হইয়া থাকে এবং এখানে প্রধানতঃ গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত করিবার কার্য্য চলিয়া থাকে। বীটের মূল হইতেও কখনও কখনও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে এ প্রণালী ভারতে বড় একটা প্রচলিত নাই। বাঙ্গালায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ইক্ষু এবং খেজুর রস হইতেই বহু পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গুড় ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর একটা প্রধান খাদ্য হিসাবে খরচ হইয়া থাকে। গুড়ের মোট উৎপাদনের অধিকাংশই ভারতবাসীর খাদ্য হিসাবে খরচ হইয়া যায়। সুতরাং চিনি উৎপাদনের জন্য অতি অল্প পরিমাণ গুড়ই মিলিয়া থাকে। শুদ্ধ এই কারণে চিনি তৈরীর জন্য যে গুড় পাওয়া যায় তাহার ভাল দর (কোয়ালিটি) অনেক বেশী দামে বিক্রী হইয়া থাকে। এই গুড় ভারতের রন্ধন বিদ্যার একটা বিশেষ অঙ্গ ও ইহার বহুল ব্যবহারের জন্য জাভা, কিউবা প্রভৃতি স্থানের চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের গুড় বেশ টিঁকিয়া আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ভারতে গুড়ের মূল্যের অনেক তারতম্য দেখা যায়, এবং সাধারণতঃ গুড় তৈয়ারীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষ ভাগেই গুড়ের দাম অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই সময়টা সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত। এই সময়ে মূল্যের এই প্রকার হ্রাস-প্রাপ্তির দুইটি কারণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ঐ সময়ে বাজারে চাহিদা অপেক্ষা অত্যধিক মালের উৎপত্তি, দ্বিতীয় কারণ সমস্ত উৎপাদনকারীরা এই সময়ে তাহাদের গুদাম সাবাড় করিতে চায়। কাল গুড়, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর গুড়, বেশীদিন গুদামজাত থাকিলে বিকৃত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা এবং ফলে মালের দামও বিশেষ কমিয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রীতিমত বিশুদ্ধ গুড় বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন দানাওয়ালা গুড়ের সহিত কতক পরিমাণে ঝোলা গুড়ও বাহির হয়, আর শুদ্ধ এই জন্যই গুড়ের কোয়ালিটি খারাপ হয়। এইভাবে বেশী দিন গুড় গোলাজাত থাকিলে গুড়ের দামও কমিয়া যায়। তবে এই খারাপ গুড় যে একেবারে অকেজো হইয়া যায় তাহা নয়; ইহা দ্বারা স্পীরিট্ এবং অন্যান্য ছোটখাট মাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে এই প্রকারের গুড়ের ব্যবহার অপেক্ষা, গোদাইলে গুড়ের খারাপ অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশ দিয়া চিনি প্রস্তুত করাই বাঞ্ছনীয়। এই কারণেই দেখা যায় গুড়-উৎপাদনের সময় অতীতে,—যে সময় গুড় বিশেষ হইতে আমদানি চিনির সমান অথবা বেশী মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে, তাহা দিয়াই বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় গৃহ-প্রতিষ্ঠিত মিলে চিনি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ১৯১৪-১৫ সনের হিসাব মত প্রায় ১৮ লক্ষ মণ গুড় হইতে ভারতে চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনি প্রস্তুত করিবার কালে গুড়ের যে অংশ দানাশূন্য ঝোলরূপে পড়িয়া থাকে তাহা শোধক করে স্পীরিট ও মদ্য তৈরীর কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

২। গ্রাম্য প্রণালীতে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে চিনির মূল্য যদিও কিঞ্চিৎ বেশী পড়ে, তবুও গোড়া হিন্দুস্থানীর

দিক্ হইতে বিদেশী আমদানি চিনি অপেক্ষা এই চিনির চাহিদা বেশ ভালই দেখা যায়। ফলে ভারতে ঐ দেশেরে সাবেকী প্রণালীতে এখনও বহু চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের অবস্থার যা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেশী প্রণালীতে প্রস্তুত চিনির প্রতি পূর্ব্বের পক্ষপাতিত্ব বেশী দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

৩। বর্ত্তমান সময়ের গুড় হইতে চিনি তৈরীর প্রণালীকে অর্থনীতি ও মিতব্যয়িতার দিক্ দিয়া খুব ভাল বলা যায় না। কারণ এ উপায়ে অনেক গুড় নষ্ট হইয়া যায়। ইক্ষু হইতে রীতিমত পেষণের অভাবে কম রস পাওয়া যায়, ফলে চিনির উৎপাদনও কমিয়া যায়।

ইক্ষু অথবা খেজুর রস খোলা পাত্রে আগুনের ঠিক উপরে রাখিয়া জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করাই এদেশের রীতি। এই প্রণালীতে প্রস্তুত গুড় অতিরিক্ত নাড়া হয়। ঐরূপ এবং উহাতে রং ফলাইবার কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযোগী সমস্ত স্বচ্ছ দানা নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারের ক্ষতি কমাইবার জন্য আধুনিক প্রণালীর চিনির কারখানায় বাষ্পদ্বারা জ্বালাইবার উপযোগী নূতন রকমের পাত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গৃহ-শিল্প ব্যাপারে এ প্রণালী সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করা এক প্রকার অসম্ভব এবং প্রস্তুত গুড়ের কতক অংশ নিম্ন শ্রেণীর হইবেই। এখন এই নিম্ন শ্রেণীর গুড় গোলাজাত করিয়া রাখিয়া শুধু শুধু নষ্ট করিয়া না ফেলিয়া সুবিধা ও সুযোগমত ইহা হইতে যাহাতে অতি শীঘ্র যথাসম্ভব অধিক চিনি উৎপাদন করা যায় তাহা করাই উচিত।

৫। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ যশোহর, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় গুড় হইতে চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক কাঁচা মালের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া এই চিনিরও একটা বিশেষ সময় আছে। ইহা বিশেষতঃ গুড় উৎপাদনের সময়েই হইয়া থাকে; কারণ এই সময় গুড়ের মূল্য আমদানি চিনির মূল্য অপেক্ষা অনেক কম থাকে। সাধারণ চাষীদের দ্বারাই সাধারণতঃ গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারা তাহাদের কৃষিকার্য্যের সহিত এই কাজটাও মিশাইয়া লইয়া ইহাকে কৃষিকার্য্যের একটা অঙ্গস্বরূপ করিয়া লয়। তাহাদের উৎপাদিত গুড়ের কতক অংশ কোন দালালের মারফতে চিনির কারখানায় পৌঁছায়। চাষীরা ইক্ষু অথবা খেজুর রস একটি অর্দ্ধ গোলাকার মাটীর পাত্রে জ্বাল দেয়। আঁকের ছিল্‌কা অথবা কাঠ দিয়া উনুনে পাত্র চড়াইয়া রস জ্বাল দেওয়া হয়। যাহারা বেশী পরিমাণে এই রস জ্বাল দেয় তাহারা মাটীর পাত্রের পরিবর্ত্তে বড় বড় লোহার কড়াজাতীয় পাত্র এই রস জ্বাল দিতে ব্যবহার করে। এই প্রকারে রস জ্বাল দেওয়া হয় বলিয়া প্রস্তুত গুড়ের দানাদার চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রকারে যাহারা গুড় প্রস্তুত করে তাহারা সাধারণতঃ গুড়ের আস্বাদ ভাল করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে চিনি ভাল হইবে কিনা সে দিকে তত নজর দেওয়া দরকার মনে করে না। তাহারা শুধু দেখে যাহাতে গুড় ভাল পক্ক করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ তাহারা গুড় সুপক্ক করিবার জন্য কি ভাবে কতক্ষণ জ্বাল দেওয়া দরকার তাহা ভালরূপই জানে। রস জ্বাল দিয়া যখন গুড় পরিণত করা হয়, তখন চাষীরা উহা মাটীর কলসীর মধ্যে ভরিয়া ফেলে। এই কলসীর মধ্যে কিছুকাল থাকিলে কলসীর নীচের গুড়ের দানাগুলি জমিয়া যায় এবং ঝোলা উপরে থাকে। এই ঝোলা অংশ বাদ দিয়া দানাওয়ালা গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত হয়।

৬। গ্রাম্য চিনির কারখানায় গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার বেলায় অল্প ঝোল মিশ্রিত দানাওয়ালা গুড় একটি ছিদ্রযুক্ত মাটীর পাত্রে ঢালিয়া রাখা হয়। এই ছিদ্রপথে ঝোল চুয়াইয়া নীচের আর একটি মাটীর পাত্রে জমা হয়। কিছু নেবু সংযোগে পুনরায় ইহা জ্বাল দেওয়া হয়। তার পর ঠাণ্ডা হইলে ইহার সহিত আরও কিছু দানাযুক্ত গুড় মিশাইয়া আর একটা মাটীর পাত্রে নীচের দানা জমাইবার জন্য এক ধারে ফেলিয়া রাখা হয়। এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে দানা জমিলে সমস্তটা আবার একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্রে ঝোল কাটিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে ২।৩ বার দানা কাটিয়া ঝোলের দানা কাটিবার ক্ষমতা নষ্ট করা হয় এবং ঝোল আঠাযুক্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকারের

আঠা গুড়কে "চিটাগুড়" বলে। এই চিটাগুড় সাধারণতঃ তামাক মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৭। এই ছিদ্রযুক্ত পাত্রে রং করান চিনির দানার উপর এক প্রকার সরের মত পর্দ্দা পড়িয়া যায়। ইহাকে বলে "পাতা ভাসি"। প্রতিদিনই এই পর্দ্দার সহিত নূতন পর্দ্দা জমিয়া ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া উঠে। এইভাবে এক সপ্তাহে এই পর্দ্দা ৩।৪ ইঞ্চি পুরু হইয়া উঠে, এবং রংও কিছু কমিয়া আসে। তখন ঐ পর্দ্দা চাঁছিয়া লইয়া একটি ছাদার চটের উপর শুকাইতে দেওয়া হয়। তার পর দ্বিতীয় সপ্তাহে এই প্রকারের নূতন পর্দ্দা জমিয়া উঠে ও তাহা চাঁছিয়া লওয়া হয়। এই ভাবে নীচের অপরিষ্কার অংশ বাদে প্রায় সমস্ত দানাযুক্ত অংশ লওয়া হয়। এইভাবে সমস্তটা অংশ লইতে ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাগে। এই রূপে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা তেমন ভাল হয় না, কারণ ইহার দানার সহিত অনেক ময়লা জমিয়া যায়।

৮। গৃহশিল্প হিসাবে সাধারণতঃ উল্লিখিত প্রকারেই চিনি প্রস্তুত হয়। এই প্রণালীর চারিটি অসুবিধা আছে। প্রথম নম্বর, উল্লিখিত প্রকারে ধীরে ধীরে ৪।৬ সপ্তাহ ধরিয়া চিনি প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রণালীতে বহুসংখ্যক নালীর পাত্র দরকার হয়, উৎপাদনও পরিমিত হয়। তৃতীয়তঃ, গুড়ের মধ্যে ঝোল অংশ ও অনেক অপরিষ্কার জিনিষ থাকে, এবং দ্বিতীয়বার গুড় মিশাইবার সময়ও অনেক ময়লা গুড়ের দানার মিশিয়া চিনিকে ময়লা ও অবিশুদ্ধ করিয়া দেয়। চতুর্থতঃ, অনেক পরিমাণ গুড় পাত্রে পড়িয়া থাকায় তাহা নষ্ট হইয়া যাবার সম্ভাবনা। এ ছাড়া গুড় জ্বাল দিবার বেলায় ক্রমাগত উৎপাদনের ফলে গুড়ের দানা কাটিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

৯। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই চিনি প্রস্তুত করিবার এই প্রণালীর উন্নতি সাধনের চেষ্টায় আছেন। তবে এ যাবৎ বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। গুড় ছাঁকিয়া তাহা হইতে চিনির দানা বাহির করিবার নূতন এক প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। সেন্ট্রিফিউজ দ্বারা এই ছাঁকুনির ফলে গুড়ের দানা হইতে ঝোল অংশ বাহির হইয়া আলাদা হইয়া যায়। এই প্রণালীতে দানা হইতে ঝোলা অংশ এমন সুন্দর ছাঁকা হইয়া যায় যে, এইরূপে প্রাপ্ত দানাগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থাতেই চলিয়া আসে। যে গুড় এই প্রকারে ছাঁকিতে হইবে তাহা একটী বহুছিদ্রযুক্ত পাত্রে রাখা হয়। গুড়ের দানার আকার বুঝিয়া পাত্রের ছিদ্রের আকার নির্ণীত হইয়া থাকে। এই ছিদ্রযুক্ত পাত্রের চতুর্দ্দিকে আর একটী লোহার ঘেরোয়া দেওয়া থাকে এবং এই সমগ্র পাত্রটীকে ঘুরাইবার সময় ভিতরকার পাত্রের গুড়ের দানা হইতে সমস্তটা ঝোলা অংশ ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিয়া বাহিরে যে লোহার ঘেরোয়া লাগান থাকে তাহাতে জড় হয়। সমস্তটা পাত্র জোরে ঘুরিবার ফলে গুড়ের দানাগুলি একত্রে অনেকগুলি করিয়া জড় হইয়া দলা বাঁধিয়া ছিদ্রমুখে আসিয়া জোটে বলিয়া দানার কোন কোনটী ছোট হইলেও তাহা ছিদ্রপথে বাহির হইতে পারে না, বরং জোরে ঘুরানোর ফলে ভিতরকার সমস্ত ঝোল অংশ ছাঁকিয়া বাহির হইয়া যায়। যখন খুব মিহি দানা রাখিবার দরকার হয়, তখন ছিদ্রযুক্ত পাত্রটীর চারিধারে হয় খুব মিহি ঝোনা তারের জাল, না হয় খুব সরু ছিদ্রযুক্ত ব্রোঞ্জের পাত মিরিয়া লওয়া হয়।

১০। দীর্ঘকালব্যাপী বহু পরীক্ষার ফলে ইহাই জানা গিয়াছে যে, উপরোক্ত সেন্ট্রিফিউজিংএর প্রণালীতে খুব বেশী ও মোটা দানাযুক্ত গুড়ের বেলাই ভাল ফল পাওয়া যায়। যে সমস্ত গুড়ে ঝোলা অংশ বেশী, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার ছাঁকিবার পর গুড়ের যা অবস্থা দাঁড়ায়, সেই অবস্থায় সেন্ট্রিফিউজিং প্রণালী খাটান সম্ভব হয় না। কারণ গুড়ের মিহি দানার সহিত অতিরিক্ত ঝোলা গুড় মিশিয়া থাকায় যে ঝোল অংশ বাহির হইয়া আসে তাহার সহিত অনেক দানাও বাহির হইয়া যায় এবং যেগুলি বাহির হইতে পারে না, তাহাদের ভিতর হইতেও গুড়ের ঝোল অংশ সব ভাল করিয়া কাটিয়া যায় না। ফলে চিনির পরিমাণ খুব কম হয় ও উহা অনেক ময়লাযুক্ত হইয়া পড়ে।

১১। বহু পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, গুড় সেন্ট্রিফিউজ করিবার পূর্ব্বে একবার ছাঁকিয়া লওয়া ভাল, কারণ তাহাতে চিনির কোয়ালিটি ভাল হয়, এবং ময়লা ভাবটা অনেক কাটিয়া যায়। গুড়ের কোয়ালিটি অনুপাতে

ছাঁকুনিটা ২ হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী করা দরকার হয়। এই প্রকারে ছাঁকিয়া যে দানা পাওয়া যায় তাহা হইতে যতদূর সম্ভব উচ্চ শ্রেণীর চিনি হয় এবং এই চিনি যে কোন দেশী প্রণালীর অথবা উক্ত প্রকারে না ছাঁকিয়া লইয়া যে চিনি পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ উৎকৃষ্ট হয় দেখা গিয়াছে।

১২। উপরিউক্ত গুড় ছাঁকিয়া সেন্ট্রিফিউজ করিবার প্রণালীতে সাধারণতঃ ঝোলশুদ্ধ গুড়কে একটা ছিদ্রযুক্ত মাটীর পাত্রে রাখা হয়। যদি গুড়ের মাঝে সাধারণ অপেক্ষা বেশী ঝোল থাকে, তাহা হইলে গুড়কে একটী বাঁশের কুচিতে চালিয়া ঝোলটা কিছু কমাইয়া লওয়া ভাল। মাটীর পাত্রটা নূতন হইলে প্রথমে পাত্রটীর মাঝে ছিদ্রের উপর দিয়া খানিকটা দানাযুক্ত গুড় বিছাইয়া লইলে ভাল হয়। কারণ ইহাতে গুড়ের ঝোল অংশকে দ্রুত বাহির হইতে দেয় না এবং ফলে দ্রুত নির্গমনশীল ঝোলের সহিত যে দানাগুলি বাহির হইয়া যাইত তাহাও বাঁচিয়া যায়। ছিদ্রপথ দিয়া যত ঝোল নির্গত হইয়া যায় মাঝের দানা গুড় ততই শুকাইয়া ক্রমে শক্ত চাপ বাঁধিয়া যায়। যাহাতে এইরূপ শুকাইয়া উঠিতে না পারে তজ্জন্য গুড়ের উপরে একখানা ভিজা কাপড় অথবা ছালার চট্ রাখিয়া দিতে হয়। এইভাবে গুড় হইতে ঝোল ঝরিতে সাধারণতঃ ৩৪ দিন লাগে। এই প্রকারে প্রাপ্ত গুড়ের দানাকে সেন্ট্রিফিউজে ফেলিয়া ঝাঁকিয়া লইলে যেটুকু ঝোলা অংশ দানায় লাগিয়া থাকে তাহাও নির্গত হইলে পরিষ্কার দানাযুক্ত চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তখন তাহার উপর কিছু জল ছিটাইয়া দিয়া আরও কয়েক মিনিট ঘুরাইয়া আরও সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই জল দেওয়ার ফলে দানার ভিতর হইতে চিনির অপরিষ্কার অংশ কাটিয়া ছিদ্রপথে ঝোলের সহিত নীচে পড়িয়া যায়। এইরূপ জল দ্বারা ধৌত হইবার ফলে ময়লা কাটিয়া চিনি খুব পরিষ্কার হয় রংও বেশ খুলিয়া যায়। নীচের পাত্রে এবং সেন্ট্রিফিউজের বাহিরের খোরোয়ায় যে ঝোলা গুড় জমা হয় তাহাতে দানা জমাইবার জন্য আবার পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিনি প্রস্তুত করা হয়। যে পর্য্যন্ত সামান্য চিনিও পাওয়া সম্ভব থাকে সেই পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি উক্ত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করা হয়।

১৩। উক্ত সেন্ট্রিফিউজের সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করিলে সাবেকি গ্রাম্য প্রণালীর তুলনায় নিম্নলিখিত বিষয়ে সুফল পাওয়া যায়।

(১) ইহাতে শ্রমও খুব কম লাগে। এই প্রণালীতে এক সপ্তাহে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়, গ্রাম্য প্রণালীতে সেই পরিমাণ চিনি উৎপাদন করিতে ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে।

(২) সময় সংক্ষেপ হওয়ার দরুণ অধিক দিন ফেলিয়া রাখায় যেরূপ দানা নষ্ট হয় সেরূপ হইবার সুযোগ পায় না।

(৩) এই প্রণালীতে জায়গা এবং পাত্রও অনেক কম লাগে, অথচ উৎপাদন খুব বেশী হয়।

(৪) দানা হইতে ঝোল অংশ সহজভাবে ছাড়াইয়া লওয়ার সুযোগ হয়।

(৫) চিনি হইতে সর্ব্বপ্রকারে অপরিষ্কার অংশ বাহির করা সম্ভব হয়।

(৬) ইহাতে চিনির দানা খুব মোটা হয়, সুতরাং প্রতিবারে উৎপাদনও বাড়িয়া যায়।

১৪। আবার গুড়টাকে প্রথম চোটেই সেন্ট্রিফিউজ করার চেয়ে প্রথমে ছাঁকিয়া সেন্ট্রিফিউজ করিলে আরও সুফল পাওয়া যায়। কারণ প্রথম প্রণালীতে শুদ্ধ উৎকৃষ্ট গুড় হইতেই ভাল ফল পাওয়া যায়, অথচ দ্বিতীয় প্রণালীতে সর্ব্বপ্রকারের গুড়েই সমান উৎপাদন হয়। তা ছাড়া গুড় ছাঁকিবার বেলায় গুড়ের মাঝে নূতন দানা বাঁধিবার সুযোগ পায় এবং পূর্ব্বের দানা আকারে বড় হইয়া থাকে। শেষকালে একটু জল ছিটানোর ফলে রং, ঝোরালিটি এবং পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়া বরাবর সেন্ট্রিফিউজ করা চিনি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর শ্রেণীর চিনি হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ : তাঁহাদের ভার ও দায়িত্ব*

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি

ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্গত ব্যবস্থা-পরিষদ সভার প্রায় সকল প্রধান সম্প্রদায়ই প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দাবী করিতেছেন। এই দাবী মানিয়া লওয়া হইলে বাঙ্গালা দেশে জমিদারদের দাবীও একবার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার হইবে।

ভারতীয় জমিদারগণ সাধারণ নাগরিক ও জমিদারের দায়িত্ব একসঙ্গে বহন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই সত্য কথাও আজ অনেক ইতস্তত করিয়া বলিতে হইতেছে। কারণ জনসাধারণের মনে জমিদারশ্রেণীর প্রতিকূলে কতকগুলি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; তাহাতে জমিদারদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক

বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিকূল মনোভাবকে এক্ষণে আর উপেক্ষা করা চলে না। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে গভীর বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। বর্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থায় বাঙ্গালার খাজাঞ্চিখানায় উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হয় না, সেইজন্য লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বরদাস্ত করা যায় না; কারণ যখন দেশের অন্যান্য নাগরিকের উপর শুল্ক করভার ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন জমিদারগণ এই বন্দোবস্তের কল্যাণে অনেকখানি রেহাই পাইয়া যাইতেছেন, ইহা সমীচীন নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারেরা আবকারের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন না, এই কথা প্রমাণের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহাদের কৃষি হইতে আয় বা মুনাফার উপর কর বসাইলে না কি অন্যায় হইবে না। ষ্টাটুটারি কমিশনের রিপোর্টে জমিদারি আয়ের উপর কর চাপাইবার পক্ষে ভূরি ভূরি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে কৃষি-আয়ের উপর কর বসাইলে শুধু যে একটি নূতন আয়ের পথ হইবে তাহা নহে; অধিকন্তু যে সকল জমিদারের কৃষি-ঘটিত ছাড়া অন্যরূপ আয় আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে বেশী হারে কর আদায় করা সম্ভব হইবে। জমিদার ও কৃষকের মাঝামাঝি অনেক লোক আছে, যাহারা জমিজমার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট হইতে আয়-কর আদায় করা অনুচিত হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরও কতকগুলি বহৎ দোষ আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাকি বাংলায় জমিকর আদায়ে বহু অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। ষ্টাটুটারি কমিশন বলিতেছেন,† "কলিকাতা শহরে এমন জমি আছে যাহার মালিক প্রত্যেক একরের জন্য এক টাকার বেশীর ভাগ অংশ জমির রাজস্ব রূপে দেয়, যদিও জমির বাৎসরিক খাজানা হাজার হাজার টাকা উঠে।" ১০০ বৎসর আগে যে জেলাগুলি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেগুলিকে গুরুতর কর দিতে হইতেছে, অথচ দূরে অবস্থিত বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর জেলাগুলি হইতে কম সরকারী রাজস্ব আদায় করা হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে যুক্তির গলদ

উল্লিখিত যুক্তিতর্কসমূহ নির্জ্জলা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি সকলের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি তলাইয়া বুঝিতে হইলে বিষয়টি আরও গভীরভাবে আলোচনা করিতে

---

* রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে যোগ দিবার প্রাক্কালে লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম।

† প্রথম ভাগ পৃঃ ৩৪০।

হইবে। কতকগুলি মূলসূত্র হইতে কাগজে কলমে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ। কিন্তু সরকারী কাগজপত্র বইয়ের পাতায় লিখিত যুক্তিতর্কসম্মত কতকগুলি তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। কতকগুলি বস্তুতান্ত্রিক ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ কার্য্যকরী নীতি সরকারকে মানিয়া লইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ জনসাধারণের তরফ হইতে জমির চারিদিকে কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জমির খাজানা নানা উপায়ে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। চিরাচরিত প্রথা এবং খানদারণা এ সম্বন্ধে কম কার্য্যকরী নহে। ভারতভূমিতে এই সমস্ত প্রথা বা খানদারণা উল্টাইয়া ফেলিয়া প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা জমিদারী খাজানা নির্দ্ধারণ করিলে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গল হইবে।

জমির মালিক ও অপর যাঁহাদের জমিতে স্বার্থ আছে তাঁহাদের সহিত ভূমির সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের পশ্চাতে চিরাচরিত প্রথা এবং সুপ্রাচীন খানদারণা রহিয়াছে। যদি কোন সরকারী ব্যবস্থা ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হয় তবে সমাজের ঐক্যসূত্র ছিন্ন হইয়া পরম অমঙ্গলের সঞ্চার হইবে। ১৭৯৩ সনের ১ নং রেগুলেশন দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করা হয়। এই ব্যবস্থা চিরাচরিত প্রথা এবং প্রাচীন খানদারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার গুণে বাঙ্গালা দেশের সরকারী রাজস্ব এবং সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত আছে। অনেকে অর্থনীতির প্রতি অস্বাভাবিক ঝোঁকবশত রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভুলিয়া যান।

বাঙ্গালার জমিদারের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে বাঙ্গালার অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কতকগুলি নির্জ্জলা আর্থিক নীতির বলে ইঁহাদিগের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করিলে হয়তো দেশের আর্থিক সম্পদ্ কিছু বাড়িয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে দেশের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে নিশ্চয়ই; আর ধনদৌলতের চেয়ে লোকের মনের সুখশান্তির দাম কম নয়। বর্ত্তমান কালের একটা বিশেষত্ব দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্থায়িভাবে অনুপস্থিত আয়তন হইতে সর্ব্বোচ্চ রাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগত করিয়া যাইতেছে এবং দেশের অস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশিষ্ট অঞ্চলগুলিতে জমি বন্দোবস্তের মেয়াদ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে।

জমিতে বিভিন্ন স্বত্বের সৃষ্টি

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, দেশের প্রকৃত অবস্থার মানদণ্ডে যাচাই না করিলে হ্যাটুটারি কমিশনের মন্তব্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন হইবে না। বাঙ্গালা দেশে জমিজমার হস্তান্তর-কার্য্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে হইয়া থাকে; এবং এই বন্দোবস্তের ফলে দোষ জমিদার এবং প্রজা এতদুভয়ের মধ্যে জমিজমার স্বার্থ বিশিষ্ট অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তী জীবের সমস্তই যে পরগাছা একথা বলা যায় না। বনজঙ্গল পরিষ্কার এবং দুর্গম ভূমিকে আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত হয় না; তজ্জন্য অনেক পরিশ্রম আর অধ্যবসায়েরও প্রয়োজন। জমিদারগণ যদি ইঁহাদের সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকেন ত তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্য পাঁচ জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা করেন তাঁহারাও তাহাই করিয়াছেন। মধ্য-স্বত্ব-ভোগকারী ব্যক্তিগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো জমিদারদের সহিত প্রজার যোগাযোগ সাধন করিয়া থাকেন। এমন বলিতেছি না যে, এই ধরণের মধ্যস্বত্ব-ভোগকারী একজনকে না হইলেও চলে না বা একজনও অনাবশ্যক নহে। কিন্তু যাঁহারা বড় বড় জমিদারির কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নহেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দেশের কৃষি-ব্যাপারে ইঁহাদের অধিকাংশের একটা বড় স্থান আছে। জমিজমার এইরূপ নানাপ্রকার স্বত্ব ও উপস্বত্বের কারণ বিশ্লেষণ কালে মিঃ অ্যাক তৎপ্রণীত বাখরগঞ্জ জেলার সেটেলমেণ্টের চরম বিবরণীতে (ফাইন্যাল্ রিপোর্ট অন্ বাখরগঞ্জ সেটেল্‌মেণ্ট) দেখাইয়াছেন যে, ছয়টি কারণের মধ্যে দুইটি অর্থনৈতিক, যথা—(১) কৃষিকার্য্যের উন্নতি, (২) বড় ও বিস্তৃত জমিদারি সুচারুরূপে পরিচালনার সৌকর্য্যার্থ জমি-ভাগ।

পারিবারিক ব্যবস্থাও জমি বিভক্ত হইয়া যাওয়ার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী; কিন্তু এক দিকে এইরূপ অধি-

বিভাগ ও জমির রক্ষণাত্মক হস্তান্তর যেমন আছে, অন্য দিকে মহাজনী সম্পত্তির ন্যায় দানের দ্বারাও অনেকাংশে উপকৃত হইয়াছে।

মোট কথা, মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্ব সৃষ্টি নিবারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। আর মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্ব ভোগকারী ব্যক্তিদের সাহায্যে জমিদারেরা রায়তের নিকট হইতে খাজানা আদায় করেন বলিয়া তাঁহাদের বিশেষ নিন্দাও করা যায় না। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, নিছক অর্থনৈতিক প্রয়োজন বশতঃ এবং চিরপ্রচলিত প্রথা ও পুরুষপরম্পরাগত ধ্যান-ধারণার জন্য জমির স্বত্ব হইতে জীবিকা অর্জ্জনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা এরূপ বেশী হইয়াছে।

"অনর্জ্জিত আয়"

জমির স্বত্বভোগকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা এরূপ অধিক হওয়ায় দেশের কোন কোন স্থলে রাজস্ব প্রথা স্থিতিস্থাপক হইতে পারে নাই। এই সমস্যাটা বিচারের কালে আমাদের দেশের জমিদারি প্রথার জটিলতার কথা স্মরণ রাখা দরকার। যে সকল মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব থাকার ফলে জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে দোষ দেওয়া এবং জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য সাধারণতঃ "বিনাশ্রমে বৃত্তি" ভোগ করিয়া থাকেন, কোন কোন লেখকের ন্যায় এরূপ মনে করা সমীচীন নহে। জমির সঙ্গে যাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে এরূপ দোষারোপ করা সম্ভব নহে।

এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে জমিদারগণ সুপরিচালনা, মিতব্যয়িতা দ্বারা এবং মেদিনীপুরের ন্যায় অত্যধিক মধ্যস্বত্ব-সৃজন-বিরোধী স্থানীয় অবস্থার ফলে নিজ নিজ আয় বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন।

এরূপ ক্ষেত্রে জমিদারির আয়ের কিয়দংশ বিনা পরিশ্রমে আসিয়াছে বলা যাইতে পারে; কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ঘর-বৃদ্ধি ও নানাপ্রকারের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জমিদারির আয় বাড়িয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এখানেও নেহাৎ বিনাশ্রমে আয়ের সংস্থান হয় নাই। জমিদারকে কলহজল সাফ করা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক কাঠ-খড় পোড়াইতে হইয়াছে। সেটেলমেণ্টের পরে এইভাবে অনেক জমি আবাদ হইয়া জমিদারির আয় বাড়াইয়াছে। জমিদারির আয় বা আয়তন যে এইভাবে বাড়িতে পারে সে কথার ইঙ্গিত ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মোসাবিদায় ছিল কিনা তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। ১৭৯৩ সনের ১নং রেগুলেসনের ৭ প্রকরণের "তাঁহাদের নিজ নিজ জমি-দারিতে উন্নতি সাধনের ফলে" কথাগুলির অর্থ ভাবিয়া দেখা দরকার।

আমার মনে হয় জমিদারদিগের সম্বন্ধে "অনর্জ্জিত আয়" কথার উল্লেখ করার সময় বিরুদ্ধবাদীদের নিশ্চয়ই ঘুঁসিয়ার হইয়া কথা বলা দরকার। মধ্যস্বত্ব উপভোগকারী-দিগকেও খোলাখুলিভাবে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নহে।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, শেষ পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের বিরুদ্ধে যুক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমি যুক্তিতর্কের দ্বারা হাটুটারি কমিশনের ভ্রম-নিরসনের চেষ্টা করিয়াছি। জমিজমাত বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব আদায় ব্যাপার নিতান্ত সরল নয়; উহার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি বিদ্যমান; কমিশন এই সমস্ত জটিলতা বুঝিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে, নানা প্রকার স্বত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কমিশন মাথা ঘামান নাই। সেইজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথার্থতা-সাধক কোন প্রস্তাবের গুরুত্ব তাঁহাদের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভব ও সার্থকতা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল সে কথা আজ অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সরকারী সাউকারী স্থাপন ও সরকারী রাজস্বের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আবশ্যক হয়। রাজকীয় ঘোষণার ৬ষ্ঠ ধারায় (১৭৯৩ সনের আইনের ৭ম প্রকরণ) স্পষ্ট করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে রাজস্ব আদায়ের কোন স্থিরতা ছিল

না। কোন বৎসর রাজস্ব বৃদ্ধি পাইত, কোন বৎসর আবার হ্রাস পাইত। এই ব্যবস্থার প্রতীকারের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; ঐ প্রকরণের শেষের প্যারাগ্রাফেও এইরূপ বক্তব্য স্থান পাইয়াছে :

"ল-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল বিশ্বাস করেন যে, সরকারী কর চিরকালের জন্য স্থায়িভাবে স্থির হওয়ায় জমির মালিকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কিরূপ উপকৃত হইতেছেন ও তাঁহারা আপন আপন জমিদারির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন। কারণ তাঁহারা নিশ্চিত-রূপে জানেন যে, তাঁহারা সুপরিচালনা ও পরিশ্রমের ফল সম্পূর্ণরূপেই নিজেরা ভোগ করিবেন এবং তাঁহাদের সম্পত্তির উন্নতি হইলে সরকারী কর বাড়াইবার জন্য বর্ত্তমান বা ভাবী কোন গবর্ণমেণ্টই তাঁহাদের বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে কখনো অধিকতর কর দাবী করিবে না।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে কিছু আভাস রাজস্ব বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ প্যাটল দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম নীচে দেওয়া হইল :

"যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যে করা হয়, তখন দেশের অধিকাংশ জমিই পতিত ছিল। সমস্ত দেশ তখন জঙ্গলময়। আর এই সমস্ত জঙ্গলে অনেক হিংস্র প্রাণীর বসবাস ছিল। কলিকাতা হইতে নিকটবর্ত্তী কোন জেলায় ভ্রমণ করিতে হইলে পথিককে অন্ততঃ ৪টি চাকর এবং ৪টি মশাল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইত। এই সময়ে সরকারী লাটকারি একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছিল। শক্তিশালী দেশীয় রাজাসমূহের আক্রমণ-ভয়ে তখন গবর্ণমেণ্ট ব্যতি-ব্যস্ত। এই সঙ্কটসময়ে প্রতিভাশালী লর্ড কর্ণওয়ালিসের মস্তিষ্কে এই বন্দোবস্তের কথা আবির্ভূত হইল। তিনি দেখিলেন, সরকারী লাটকারি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এবং দেশের জঙ্গল সাফ্ করিয়া উহাকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিতে হইলে এই ধরণের বন্দোবস্ত ছাড়া উপায় নাই। এই জন্যই স্থায়ী রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া জমিদারদিগকে জমিজমার চাষবাস এবং উন্নতিবিধান করিবার অবসর প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইয়াছে বটে ; কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে যে দেশের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাও চিন্তার বিষয়। আমার মতে, এই ব্যবস্থা না করিলে, আমরা এই দেশে বাস করিতেই পারিতাম না, রাজস্ব বৃদ্ধি করা ত দূরের কথা।"

জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ

এই ধরণের আরও অনেক দায়িত্বশীল রাজকর্ম্মচারীর কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এবং তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, স্থায়ী রাজস্বের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজনৈতিক কারণে আবশ্যক হইয়াছিল। যে সময়ে এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, সে সময়ে এই বন্দোবস্তই সরকারী খাজাঞ্চিখানার অর্থাগমের একমাত্র উপায়স্বরূপ বিবেচিত হয়। তখনকার দিনে জমিদারগণ বৎসরের পর বৎসর এই গুরুতর করভার বহন করিতেন। বর্ত্তমানেও মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশে জমিদারগণ যোগাইয়া থাকেন। এমন কথা কেহ বলিবে না যে, জমিদারগণ অতীতে স্বার্থত্যাগ করিয়া সরকারী রাজস্বের অধিকাংশে যোগাইয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ আবকরের হার আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে, আবকর বা শুল্ক অপেক্ষা জমিদারদের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে দেশের রাজস্বের অধিকাংশে সংগৃহীত হইত। বর্ত্তমানে জমিদারগণ অতিরিক্ত করভার বহন করিতে সমর্থ হইলেও (আমি যদিও তাহা বিশ্বাস করি না) তাহাদের তাহা করা উচিত কিনা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় যে ভার বহিতেছেন তাহার তুলনায় উহা যথেষ্ট ও ন্যায্য কিনা তাহা দেখাই কর্ত্তব্য। অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, সম্প্রদায় হিসাবে জমিদারেরা সরকারী খরচের ভার ও যথেষ্ট অংশ বহন করিতেছেন।

অর্থনৈতিক মূল্য নির্ণয়

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী আইন রদ বা সংস্কার

করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের আছে, তথাপি ১৯১০ সনের আইন সম্পর্কে সে কথা খাটে না; কারণ এই আইনটি সাধারণ আইন হইতে পৃথক বস্তু। এই আইনটিকে চিরস্থায়ী করিয়া এমন একটি চুক্তি সাধিত হইয়াছে যাহা কিছুতেই ভঙ্গ করা উচিত নহে। চুক্তির তাৎপর্যটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখা দরকার। এই দলিলের ভাষার্থ প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই দলিল সম্পর্কে রাশি রাশি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপারও নহে। হাইকোর্টের নিরপেক্ষ জজগণও ইহার মর্মার্থ উদ্ঘাটনে একমত হইতে পারেন নাই। অল্পদিন হইল* প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি এক বিরুদ্ধ রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আইন-আদালতের এই ধরণের মতানৈক্য হইতে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু আইন বা বিচারের তরফ হইতে পরীক্ষা করিলে চলিবে না। প্রথমত জাতীয় রাজস্বনীতিতে ইহার কি স্থান এবং দ্বিতীয়ত জমিদারগণের অতিরিক্ত করভার বহন করিবার ক্ষমতা আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে।

প্রথমত, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, জমিদারগণ তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী যথেষ্ট সরকারী রাজস্ব যোগাইতেছেন। অন্যান্য প্রদেশের জমির চাহিদা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করিবার এবং খেরাদের সময়ও ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিবার চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করা অথবা জমিদারগণের ট্যাক্সের ভার বাড়াইতে যাওয়া কখনই উচিত হইবে না। রাজনীতির দিক্ হইতেও এরূপ ব্যবস্থার প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কারণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওলট-পালট করা হইলে জমিদারগণের সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। এই বিরাট শক্তিশালী সম্প্রদায় যদি কক্ষচ্যুত হয়, তাহা হইলে দেশেরও সর্বনাশ উপস্থিত হইবে, দেশের শান্তি, সুশৃঙ্খলা, প্রগতি সবকিছুই তলিয়া যাইবে। জমিদারগণের উপর যদি আবার ট্যাক্স্ বসাইবার আয়োজন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষেরও আবির্ভাব হইবে। মধ্যবর্তী অন্তবর্ত্তুকাল বাদ দিলে জমিদারদিগের ট্যাক্স্ বসাইবার মত আর বিশেষ কিছুই থাকে না। সুতরাং এই আয়ের উপর আবার যদি ট্যাক্স্ বসান হয় তবে অনেক জমিদারই অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন, কারণ জমিদারি আর তখন একটুও লাভজনক বিবেচিত হইবে না, সাধারণভাবে টাকা খাটাইলে যে সুপরসার সংস্থান হয় জমিদারি চালাইয়া সে সুপরসার সংস্থান হইবে না।

মেদিনীপুর জেলার সেটেল্‌মেণ্টের কার্যাবলীর শেষ রিপোর্টে (১৯১১-১৭) প্রকাশ, জেলার উন্নত অংশ ধরিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত জমিদারদিগের আদায়ের ৪৮·৪% সরকারী রাজস্বরূপে সরকারী তহবিলে যায়। খোরদার ও রায়তদিগের প্রদত্ত খাজানা এবং জমিদারের খাস-খামার-ভুক্ত আয় একত্রে জমিদারের আদায় বিবেচিত হয়।

জমিদারের আদায়ের পরিবর্তে যদি জমির মোট বাৎসরিক খাজানা ধরা যায় তবে ঐ সংখ্যা ৩১·২% হইয়া দাঁড়ায়। মোট বাৎসরিক খাজানা অর্থে বুঝিতে হইবে, রায়তদিগের প্রদত্ত খাজানা এবং জমিদারের খাস্ জমিজমার আয়।†

মিঃ জ্যাকের রিপোর্টে বাখরগঞ্জ জিলার বড় বড় জমিদার-দিগকেও মেদিনীপুর জেলার জমিদারদিগের মতই সরকারী রাজস্ব যোগাইতে হয়। বাখরগঞ্জ জেলায় কোন কোন জমিদারকে মোট আয়ের ৭৫% পর্যন্ত সরকারের খাজাঞ্চি-খানায় জমা দিতে হয়, এরূপ ব্যাপার নিতান্ত বিরল নহে।‡

মেদিনীপুর ও বাখরগঞ্জ এই দুইটি জেলার আদর্শে দেখিতে পাই যে, বাংলার ভূস্বামিসম্প্রদায়, সরকারী রাজস্ব পরিশোধের পর মোট আয়ের গড়ে প্রায় ৫০% আপনাদের

* প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বনাম ভারত সম্রাট্। ১৯৩০ মে, এল, আর, ৫৭, ইণ্ড, এ, পি ২৪৮।

† কাইজাল রিপোর্ট, ৮০ পৃষ্ঠা।

‡ কাইজাল্ রিপোর্ট, ১৯০৫-১৯০৮, ১৩ পৃষ্ঠার তালিকা।

হাতে রাখিতে পারেন। এই আয় হইতে আবার জমিদারি পরিচালনার খরচা ও অন্যান্য খরচা বাদ দিতে হয়। সুতরাং অত্যন্ত লাভজনক জমিদারিরও শেষ পর্য্যন্ত মোট আদায়ী খাজানার শতকরা ২০ হইতে ২৫ টাকার বেশী নিট্‌লাভ থাকে কি না সন্দেহ। জমির উৎপন্ন ফসলের যদি এক-তৃতীয়াংশে খাজানা ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, জোতদার, প্রজাস্তি নিম্নবর্ত্তী সম্প্রদায়ের লাভ এবং অন্যান্য খরচপত্র মিটাইয়া শতকরা ১০ হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত জমিদারদিগের হাতে থাকে। এই লাভ খুব উচ্চহারের লাভ নয়। আর যাঁহারা অল্পদিন পূর্ব্বে জমিদারি ক্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সম্পত্তির মুনাফার ১৫ হইতে ২০ গুণ পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া জমিদারি ক্রয় করিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের লাভের অঙ্ক শতকরা ৬.৭ এর বেশী নয়।

দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় জমিদারের স্থান

পূর্ব্বলিখিত যুক্তিতর্ক এবং তথ্যাদির দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, জমিদারদিগের আর অতিরিক্ত দিবার ক্ষমতা নাই। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে জমিদার-শ্রেণীর অবস্থা কি ভাল? বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কল্যাণে এবং নানা প্রকার মামলা-মোকর্দ্দমায় জমিদারগণের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের আয়ের উপর আবার ট্যাক্স্ বসাইবার মত অবসর কোথায়? ভূমিরাজস্বই জমিদারগণের বেশ আয়কর স্বরূপ। স্বয়ং ভারত গবর্ণমেণ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন—"ভূমি রাজস্ব এবং আয়কর ইহাদের একটি অপরটি পূরক, প্রথমোক্তটি বসান হইয়াছে কৃষিলব্ধ আয়ের উপর এবং দ্বিতীয়টি শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশার উপর।* বেডেন্ পাওয়েলের মতে "ভূমি রাজস্ব ক্রমে ক্রমে কৃষি আয়ের উপর ট্যাক্সে পরিণত হওয়ায় অন্যান্য প্রকার আয়ের উপরে ট্যাক্স্ বসান হইয়াছে অপরাংশ মাত্র।"† সুতরাং দেখা যাইতেছে অর্থনীতির দিক্ হইতেও জমিদারদিগের উপর আয়কর বা অন্য কোন সাধারণ বা বিশেষ কর চাপানো সঙ্গত নহে। উহাতে জমিদারদিগের উপরে অবিচারই করা হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জমিদারগণ যথেষ্ট অর্থ যোগাইয়া থাকেন। এ ব্যাপারে জমিদারগণ কখনই কর্ত্তব্য-বিমুখ নহেন। জিলাবোর্ডগুলির মোট আয়ের ৭৬% জমিদারগণের নিকট আদায় হইয়া থাকে। জমিদারগণ মোট ১ কোটি টাকা বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জিলা বোর্ডগুলির হাতে সমর্পণ করিতেছেন।

এক্ষণে আমি আবার ১৭৯৩ সনের ১ নং রেগুলেশনের অবতারণা করিতে চাই। ঐ রেগুলেশনের "তাঁহাদের আপন আপন সম্পত্তির উন্নতির জন্য" এই কয়টী কথা নিশ্চয়ই নিরর্থক নহে। সম্পত্তির উন্নতি বিধানে জমিদারগণ বিমুখ হন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমি রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভ্য মিঃ প্যাটুলের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে দশসালা বন্দোবস্ত কায়েম করিবার সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিবৃত হইয়াছে। তদানীন্তন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, জমিদারগণ পুঁজি এবং মেহনৎ খাটাইয়া কিরূপভাবে আবাদ বৃদ্ধি করিয়া দেশের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ ছাড়া জমিদারগণ নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যও সাধন করিয়াছেন। সড়ক এবং সাঁকো নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, স্কুল, কলেজ ছাত্রবৃত্তি চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যুদ্বিকাশের, হাঁসপাতাল, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানসমূহে নানাপ্রকার দান, শিল্পমন্দির, কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহে চাঁদা প্রদান ইত্যাদি অনেক কিছু কার্য্যই জমিদারগণ করিয়াছেন। অনেক অনেক বেলায় কত কত সাঁকো এবং সড়ক জমিদারদিগের বদান্যতা এবং দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালা দেশে জমিদারদিগের দ্বারাই শ্রীরামপুর, বালী, উত্তরপাড়া, চুঁচুড়া, মেদিনীপুর এবং অন্যান্য স্থানে জলের

* ফিস্কাল এ্যাণ্ড রেভিনিউ এফাউটস্ ১৯২৯-৩০ ১১০ পৃঃ।

† বেডেন্ পাওয়েল। ল্যাণ্ড্ সিষ্টেম্স্ অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া ১ নং ভলিউম্ ৩৩৪ পৃঃ।

ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষসমূহের বিবরণীগুলি, বিশেষতঃ স্যর রিচার্ড টেম্পলের ১৮৭৩ সনের বিবরণীখানি, পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, জমিদারেরা কিরূপ মুক্তহস্তে দুর্ভিক্ষের দিনে সড়ক বা পুষ্করিণী খননের জন্য জমিজমা দান করিয়াছেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যও জমিদারগণ কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের পূর্ব্বতন রিপোর্টগুলি পাঠ করিলে জানা যাইবে, জমিদারগণ শিক্ষার জন্য কিরূপ দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া নানা প্রকার বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষা ব্যাপারে বড় বড় দানগুলির উল্লেখ করিতে হইলে, ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ, রাজসাহী, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, হেতমপুর, ভাগলপুর এই কয় স্থানের কলেজ সমূহ, এ্যাসোসিয়েশান্ অব্ দি কাণ্টিভেশান্ অব্ সায়ান্স, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারভাঙ্গা গৃহ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির নাম করিতে পারা যায়। দেশীয় বৃষ্টি রক্ষার জন্য জমিদারগণ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে একদিকে মাদ্রাসাসমূহ এবং অন্যদিকে শত শত টোল। দেশের মধ্যে বড় বড় সওদাগর তো অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাববয় বা মহম্মদ মহসীনের মত দানশীলতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? সংস্কৃত শিক্ষার জন্য জমিদারগণই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এক কোটি টাকা মূল্যের ভূমি বিনা খাজানায় দান করিয়াছেন।

সুতরাং যে দিক্ হইতেই বিচার করা যাক্, জমিদারগণ দেশের শাসনকার্য্যের ও দেশের উন্নতির জন্য আবশ্যক খরচার ন্যায্য অংশ দেন না, এই অপবাদ তাঁহাদের ঘাড়ে চাপান যায় না। যাহা জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যাহৃত হয় নাই। জমিদারগণ এজন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণই করিয়া আসিতেছেন। জমিদারগণের উপর ওজ করভার চাপান হইয়াছে, এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় এই করভার নিশ্চয়ই অধিক বলিতে হইবে। অতীতে জমিদারগণই সরকারকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব যোগাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূমিরাজস্ব আয়কর অপেক্ষা বেশী ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ হউক, অনাবৃষ্টি হউক, জমিদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজানা পান আর নাই পান, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে খাজানা তাঁহাদিগকে যোগাইতেই হইবে। কোন গবর্ণমেণ্টই ব্যবসায়ীদিগকে, অপ্রাপ্ত লাভের উপর টাক্স্ প্রদান করিতে আহ্বান করেন না। জমি বিক্রয়ের কড়া আইন এবং রাজস্ব আদায়ের অত্যন্ত চাপাচাপির জন্য বকেয়া রাজস্বের দায়ে অনেক জমিদারকে জমিদারি হস্তান্তর করিতে হইয়াছে। জমিদারি লাটে উঠার ব্যাপার সকলেরই জানা আছে। এমন দেখা যায় যে, অনেক জমিদারের ভূমিরাজস্ব যোগাইবার পর অতি অল্পই লাভ থাকে। অনেক জমিদারির ভাগ বাঁটোয়ারা হওয়ায় পরিচালনের ব্যয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অন্য পক্ষে বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইনের জন্য জমিদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি করার পথে অনেক কণ্টক আরোপিত হইয়াছে। একবার বৃদ্ধি করার পর আর দশ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই; আর এই বৃদ্ধির হারও বৎসামান্য। সুতরাং প্রজাকে প্রতি একরে ৵১৪৲ টাকার বেশী খাজানা দিতে হয় না। পক্ষান্তরে প্রজার প্রতি একরে ধানের বেলায় প্রায় ৪৫৲ টাকা এবং পাটের বেলায় অন্যূন ৬০৲ টাকা হস্তগত হইয়া থাকে। সুতরাং জমিদারের খাজানা এমন হাতীঘোড়া কিছুই নয়। আবার অভাব অভিযোগের সময় যে খাজানা মাপ করা হয় তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার উপর ১৯২৯ সনের আইনে প্রজার আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক ভ্রান্ত ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার মানসে আমি উপরে কিছু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছি। বাঙ্গালায় অতিরিক্ত রাজস্বের সংস্থান করা আবশ্যক, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন তাহার উপায় নহে। জমিদারদিগের করভার বর্দ্ধিত করিলে অনেক জমিদার, জোতদার ও রায়তের সর্ব্বনাশ হইবে। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সরাসরি কোন বিচার করা সমীচীন হইবে না। জমির সহিত অনেকের স্বার্থ বিজড়িত। সুতরাং জমিদারি লইয়া যদি

নাড়াচাড়া করিতে হয়, তবে আগে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত হইয়া স্থির ভাবে সব দিক্ তলাইয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যত দোষই জমিদারগণের থাকুক না কেন, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদারগণ অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছেন। অনাগত ভবিষ্যতে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দিবে নিশ্চয়ই; কিন্তু আমার আশা আছে যে জমিদারগণ ভবিষ্যতের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইবেন এবং দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে জমিদার-বর্গের দান তখনও সামান্য হইবে না।

ইংল্যণ্ডের স্বর্ণমান ত্যাগ ও ষ্টার্লিংএর সহিত টাকার সংযোগ

বিভিন্ন বাংলা পত্রিকার মতামত

১। ইংলণ্ডে স্বর্ণমান পরিত্যাগ

গত সেপ্টেম্বর মাসে পর পর তিন দিন ব্যাঙ্ক, কালেক্টারী ও কাছারী বন্ধ থাকায় ভারতের সর্ব্বত্র আশঙ্কা ও উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। এইরূপ বন্ধ থাকার কারণ জনসাধারণ ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছে না। ১৯২৫ সনের স্বর্ণমান আইনের প্রথম ধারার দ্বিতীয় উপধারাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ঐ উপধারার বলে পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর একটা স্বর্ণমান নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। কিন্তু উপধারাটি প্রত্যাহার করার ফলে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইল। যে নূতন আইন রচনা করা হইবে তাহার খসড়া বিলও পার্লামেণ্টে পাশ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুমান করিয়া যেন কার্য্য চালাইতে থাকে। এই ঘোষণার পরক্ষণেই সোনা বিক্রীর ব্যাঙ্ক রাতে চার টাকা হইতে ছয় টাকায় বাড়ান হইল।

জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের লেন-দেন সাধারণতঃ স্বর্ণদ্বারাই হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের প্রচলিত মুদ্রাকে পাউণ্ড বলে অর্থাৎ এই মুদ্রার ওজন যত ইহাতে সোনাও ঠিক ততখানি আছে। মার্কিণের মুদ্রাকে "ডলার", ফ্রান্সের মুদ্রাকে 'ফ্রাঙ্ক' ও জার্ম্মানির মুদ্রাকে 'মার্ক' বলে। এখন ইংলণ্ডের ব্যবসাক্ষেত্রে যদি মার্কিণকে কোন মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে একটি বাটখারার একদিকে একটি 'ডলার' রাখিতে হইবে এবং অন্যদিকে ইহার ওজনের পরিমাণ সোনা রাখিতে হইবে। এবং এই পরিমাণ সোনাকে পাউণ্ডের ওজনের সোনার সহিত হার ঠিক করিয়া মার্কিণকে স্বর্ণে মূল্য দিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে সাধারণতঃ এই নিয়মেই মূল্যের আদান প্রদান চলিয়া থাকে।

বিগত মহাসমরের পরে ইংলণ্ড বহু পরিমাণে দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মার্কিণ ও ফ্রান্সের নিকটই এই দেনার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দেনা শোধের জন্য উক্ত দুই রাজ্যকে ইংলণ্ডের সোনা প্রদান করিতে হইত। ক্রমাগত সোনার দাবী পূরণ করিতে হওয়ায় আশঙ্কিত হইয়া ইংলণ্ড যাহাতে এইরূপে সোনা স্বর্ণভাণ্ডার হইতে নিঃশেষিত না হয়, সেইজন্য ১৯২৫ সনে এক আইন প্রণয়ন করিয়া স্বর্ণমান ঠিক করিয়া দেয়। এই স্বর্ণমানের বলে ষ্টার্লিং পাউণ্ডের মূল্য স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই নূতন মুদ্রানীতির ফলে ইংলণ্ডের জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য বিদেশী ব্যবসায়ীকে তাহার নিজস্ব মুদ্রার মূল্য হিসাবে শতকরা দশ ভাগ বেশী দাম দিতে হইত। ইংলণ্ডের বিক্রেতাকে ব্রিটিশ মুদ্রায় নিরূপিত মূল্যের শতকরা দশ-ভাগ কম মূল্য গ্রহণ করিতে হইত। আবার কোন বিদেশী ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে কোন আমানত রাখিয়া নিজের দেশে যাইয়া

সেই আমানত উঠাইতে চাহিলে ব্রিটিশ মুদ্রার শতকরা দশভাগ বৃদ্ধির সুবিধা লাভ করিত। মুদ্রানীতির প্রতিকূলতার ফলে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমে ক্রমে অবনতি ঘটিতে থাকে। বৈদেশিক বাজারে ইংলণ্ডের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য ইংলণ্ড কোন পণ্যেরই উৎপত্তি-মূল্য কমাইয়া বহির্বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকায় (রপ্তানি কম হওয়া সত্ত্বেও) আমদানি কমাইতে পারে নাই। এই সময়ে আবার জগতের বাণিজ্যে 'মন্দা' দেখা দেওয়ায় আর্থিক দুরবস্থার সূত্রপাত হয় এবং ভারতবাসী কর্তৃক ইংলণ্ডের দ্রব্য বর্জনের ফলে দুর্গতির মাত্রা বাড়িয়া যাইতে থাকে। আবার বেকার সমস্যার জন্য ইংলণ্ডবাসী অনেককে রক্ষার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করে, কিন্তু তাহা কোন লাভজনক ব্যবসায়ে খাটিত হয় নাই। এইরূপ নানা অবস্থার সমবায়ে দেখা যায় যে, বিগত জুলাই মাসের মধ্য হইতে ইংলণ্ডের স্বর্ণভাণ্ডার হইতে ২০ কোটির অধিক পাউণ্ড মুদ্রার সোনা নিঃশেষিত হইয়া যায়। গত কয়েক দিন ধরিয়া বৈদেশিকদিগের জমা টাকা এত অধিক প্রত্যাহৃত হইয়াছে। এইরূপ সোনা বাহির হইয়া যাওয়ায় বাধা দেওয়ার জন্যই বর্ত্তমানে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা বাধ্যতা-মূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(বরিশাল)

বৃটিশ স্বর্ণমান পরিহার ও ভারত সচিবের নববিধান

গত সেপ্টেম্বর মাসে অকস্মাৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন—পর পর তিন দিন এ দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক সমূহ বন্ধ থাকিবে। সে অনুসারে তিন দিবস তাহাদের সকল প্রকার কার্য্য স্থগিত রাখা হইল। টাকা আমানত করা বা গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া লওয়ার কোন ব্যবস্থাই রহিল না। এরূপ গুরুতর ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘটিত হওয়ায় জনসাধারণ বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ কোন বিশদ বর্ণনা প্রকাশ করিলেন না। তিন দিবসের অবকাশের পর ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারোদ্ঘাটন হইল। সকলে অবগত হইল তাহাদের গচ্ছিত মুদ্রা আদায়ের কোনও বাধা নাই এবং যথারীতি ভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালিত হইবে।

ইহার ঠিক কারণ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রধানতঃ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা দরকার।

বিভিন্ন দেশের মাল আমদানি ও রপ্তানির উপর বাণিজ্যের ভিত্তি গঠিত। নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য-সম্ভার বিদেশে রপ্তানি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিভিন্ন দ্রব্য আমদানি করিয়া যে অভাব পূরীকৃত হয়, উহাতে উভয় পক্ষই লাভবান হইয়া থাকে এবং ইহারই পরিকল্পনায় প্রত্যেক দেশ যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া নানাবিধ বাণিজ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া স্বকীয় সমৃদ্ধি বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এতদুপলক্ষ্যে মুদ্রা বিনিময়ের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। বিক্রেতা রপ্তানি মালের মূল্য ধার্য্য করিয়া তাহার দাবীমূলক একটি বিল প্রস্তুত করে। উহা ক্রেতার সম্মুখে পেশ করিলে সে চুক্তিমত নির্দ্ধারিত সময় অতীতে তাহার দেনা শোধ করে। বিক্রেতা ও ক্রেতার সমন্বয় ঘটাইবার জন্য মধ্যবর্ত্তী লোকের প্রয়োজন। এখানেই আমরা ব্যাঙ্কের সাক্ষাৎ পাই। তাহারা কিঞ্চিৎ কমিশনের বিনিময়ে উভয়ের মধ্যে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করে। বিক্রেতার বিল ক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট প্রাপ্য টাকা আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহাতে উভয় পক্ষেরই অনেক সুবিধা ঘটে এবং তাহারা অযাচিত খরচ হইতে ত্রাণ পায়। একই দেশে একই সময়ে একদল লোক মাল আমদানি করে ও অপর দল রপ্তানি করে। আমদানিকারকের বিদেশে মূল্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় সে অনায়াসে রপ্তানি-কারকের বিল ক্রয় করিয়া তাহার পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। সে উহা তাহার ব্যাঙ্কের সাহায্যে উদ্দেশ্য আমদানিকারকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া টাকা আদায় করিয়া নেয়। ইহাতে যথেষ্ট খরচের লাঘব হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্যাটি সহজেই বোধগম্য হইবে। কলিকাতার এক মাড়োয়ারী চামনলাল রাউথমল ব্যাঙ্কোরের লুইস কোম্পানী হইতে এক লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করে;

এবং আর এক মহাজন ধীরাজলাল এণ্ড কোং বিলাতের কিং ব্রাদার্স লিমিটেডকে এক লক্ষ টাকার পাট বিক্রয় করিল। চাননলাল হাউথমল বরাবর নাকেস্টারে কাপড়ের মূল্য না পাঠাইয়া লুইস কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করিলে তাহারা কিং ব্রাদার্স লিমিটেড্ হইতে টাকা আদায় করিয়া নিবে। ইহাতে উভয়েরই দেনা শোধ হইল, অথচ দুবার টাকা যাতায়াতের হাঙ্গামা হইল না।

কিন্তু এসব বিলের বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় সংখ্যার অনুপাতে। ঠিক অন্যান্য দ্রব্যের মত চাহিদা ও সরবরাহের প্রভেদে ইহার মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। রপ্তানিকারকের সংখ্যা অত্যধিক হইলে বিলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং তদ্রূপ বিদেশীয় মুদ্রার অনুপাতে বিনিময় হার কমিয়া যায়। ঠিক তেমনি আমদানিকারকের সংখ্যা অতিরিক্ত হইলে অধিক হারে বিল খরিদ করিতে হয়। এমতাবস্থায় তাহারা স্বকীয় দায়িত্বে পাওনাদারের মুদ্রা প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক দেশেরই চলিত মুদ্রার স্বর্ণের সহিত নির্দ্দিষ্ট হারে বিনিময়ের ব্যবস্থা আছে, যেহেতু বিভিন্ন দেশে স্বর্ণই একমাত্র অবাধগতিতে প্রচলিত হইয়া থাকে। তাই বিলের মূল্য স্বর্ণ প্রেরণের খরচের মাত্রা অতিক্রম করিলেই দেশের স্বর্ণ-ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করা হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ব্যাঙ্কসমূহ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং নানা উপায়ে উহাতে প্রতিবন্ধকতা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে।

(১) দেশের ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধি করতঃ দেশান্তরের মুদ্রা আমদানির ব্যবস্থা করা, (২) ভিন্ন স্থানে দেনা গ্রহণ করা, (৩) স্বদেশজাত দ্রব্যের বহুল পরিমাণে রপ্তানির ব্যবস্থা করা, (৪) বিদেশে যে টাকা খাটান হইতেছে তাহা উঠাইয়া আনা, ইত্যাদি উপায়ে ক্রমে স্বর্ণভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

ব্রিটিশ মুদ্রা বিনিময় নীতিও অনুরূপভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড) সর্ব্বদা বহুল পরিমাণে স্বর্ণ সঞ্চিত রাখা হয়। বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজন হইলেই উক্ত ভাণ্ডার হইতে সরবরাহ করা হয়। বিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই ব্যাঙ্ক অনুভব করে এবার সে আক্রান্ত হইবে, সর্ব্বদাই ত্রাসিত থাকে যাহাতে তাহার ভাণ্ডার একদম উজার হইয়া না যায়। উপরিলিখিত উপায়াবলম্বনে আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থান হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আপনার অবস্থা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। এভাবে সতর্ক হইয়া গুরুতর দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান বৎসরে এই সাধারণ নীতির নানা কারণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণমান পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের প্রচলিত মুদ্রা পাউণ্ডের সহিত স্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিলাতে ভারত সচিবের অধীনস্থ অর্থ বিভাগের কর্ত্তা স্যর হেনরী ষ্ট্রাকোস গোলটেবিল বৈঠকের কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য সন্ধিধনীতে নিম্নলিখিত তিনটী কারণ দর্শাইয়াছেন :

(১) ১৯২৯ সনের পর জিনিষের দর অত্যধিক হ্রাস হওয়ায় দেনাদারের দেনা পরিশোধের পন্থা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২৯ সনে যে দ্রব্য বিনিময়ে দেনা শোধ হইত, ১৯৩১ সনে তাহার আড়াই গুণ দ্রব্যের প্রয়োজন।

(২) জার্ম্মাণির সর্ব্বসমেত প্রায় ৩৭ কোটি পাউণ্ড (১পা=১৩৯ টাকা) দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা এবার স্থগিত রাখায় ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার উপর হস্তক্ষেপ হইয়াছে।

(৩) দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস হেতু দেশের আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা সুকঠিন হইয়াছে। আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রার আধিক্যে গবর্ণমেণ্ট অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণ-বিপর্য্যয়ে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের স্বর্ণ হ্রাস হওয়ায় তাহাকে পূর্ব্বানুসৃত পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। (ক) ইংলণ্ডের প্রায় ৩৪০ কোটি পাউণ্ডের সম্পত্তি পৃথিবীর যাবতীয় দেশে খাটান হইতেছে। উহার সুদ ও লভ্য বাবদ কতিপয় কোটি মুদ্রা ইংলণ্ডের বাৎসরিক আয় হয়। এ দুর্ব্বৎসরে চিনী, ব্রাজিল প্রভৃতি অনেক দেশ অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় আয়ের পথ রুদ্ধ। (খ) জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়ার নিকট প্রাপ্য ১০ কোটি পাউণ্ড এ বৎসর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার সাহেবের নির্দ্দেশে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। (গ) ভারত রাজ-

নৈতিক আন্দোলনের ফলে বৃটিশ দ্রব্য পরিহার করায় রপ্তানি বন্ধ, এবং তজ্জন্য ক্ষতির পরিমাণ সামান্য নহে। (খ) এদিকে বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের গচ্ছিত মুদ্রা উঠাইয়া নেওয়ায় ব্যাঙ্ক আমেরিকা ও ফ্রান্স হইতে সোনা লইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময়ে তাহাও নিঃশেষ হওয়ায় স্বর্ণ-ভাণ্ডার উজাড় হইবার উপক্রম হইল। ২ মাসের মধ্যে প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ অন্তর্হিত হইল। ব্যাঙ্ক তাহার অবশিষ্ট ১০½ কোটি পাউণ্ড স্বর্ণের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হওয়ায় ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার আদেশ জারী হইল যে, নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ বিনিময় চলিবে না। স্বর্ণমান প্রত্যাহার করা হইল।

আমাদের শাসনকর্ত্তা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভাগ্যের সহিত আমাদের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত। বহির্ব্বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রণালী নির্দ্ধারিত হয় সুদূর ইংলণ্ডের 'হোয়াইট হল'-বাসী ভারত সচিবের সঙ্কেতে। ইহাতে আমাদের বিফল প্রতিবাদ ভিন্ন উপায় নাই। অতএব ইংলণ্ডের নূতন ব্যবস্থার সংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন—অতঃপর পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হারে টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ সরবরাহ করা হইবে না এবং ভারতে বিলের দর বৃদ্ধি পাইলে গবর্ণমেণ্ট আমদানিকারকের সুবিধার্থ 'রিভার্স কাউন্সিল' নামক যে বিল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন, সে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অফিসও তিন দিবসের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ভারতের বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রি-সভায় এই ব্যবস্থা ইংলণ্ডের কর্ত্তাদের পছন্দ হইল না। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র-গঠন সম্বন্ধিতে ভারত সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর প্রকাশ করিলেন যে, টাকার মূল্যের কোন ব্যতিক্রম করা হইবে না। বিলাতের পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর দরের সহিত নির্দ্দিষ্ট হার ১ শিলিং ৬ পেন্সে টাকা বিক্রী করা হইবে।

বাধ্য হইয়া ভারত সরকার ২১শে তারিখের ঘোষণা নাকচ করিয়া ভারত সচিবের নির্দ্দেশমত নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। কতিপয় সর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট লিখিতুক ব্যাঙ্ক সমূহের নিকট স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। ইহাতে পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর সহিত আমাদের 'টাকা'কে সংশ্লিষ্ট করায় উহার মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত টাকারও সমতালে নূতা করিতে হইবে।

এ ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে মহাত্মা গান্ধী স্যর পুরুষোত্তম-দাস ঠাকুরদাস, জি, ডি, বিরলা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারত সচিবের সহিত আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু নব বিধান বলবৎ রহিয়াছে।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

ইংলণ্ড ও ভারতের বাটা পরিবর্ত্তন

গত ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ইংলণ্ড তাহার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। দুই তিন মাস যাবৎ ইংলণ্ড হইতে এত পরিমাণ স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত সে আর স্বর্ণের যোগান দিতে পারিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বর্ণমান ছাড়িয়া দিতে হইল। প্রথমে, ইংলণ্ড হইতে কেন এত স্বর্ণ প্রত্যাহৃত হইতেছিল তাহার আলোচনা করা দরকার। একটী কারণ এই যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইংলণ্ড রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী করিতেছে। তার ফলে, ইংলণ্ডকে স্বর্ণের দ্বারা অতিরিক্ত আমদানির মূল্য দিতে হইতেছে। ইংলণ্ড ক্রমশঃই তার প্রস্তুত দ্রব্যসমূহের উচ্চ মূল্যজনিত রপ্তানি-হ্রাসের হেতু পৃথিবীর বাজারে হটিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা দৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ। তথায় তাহাদের বেতন-হ্রাসের প্রস্তাব উঠিলেই তাহারা এমন তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করে যে, তাহাদের আন্দোলনে গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। পৃথিবীব্যাপী এই বাণিজ্য-সঙ্কটের সময়ে, যখন দ্রব্যের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে তখনও, তাহারা কোনক্রমেই অল্প বেতন গ্রহণ করিবে না। দ্রব্যের উৎপাদন-মূল্য না কমিলে পৃথিবীর বাজারে অন্যান্য জাতির মালের সহিত অল্প মূল্যের প্রতিযোগিতায় মাল বিকাইবে কি করিয়া? স্বর্ণের বহির্গতির আর এক কারণ ইংলণ্ডের বাজেটে ঘাটতি। জাতীয় বাজেটে ঘাটতি পড়িলে বৈদেশিক মহাজনগণ ভীত হইয়া পড়ে।

কারণ ঐ দেশের আর্থিক সচ্ছলতায় তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা ঋণ দেয়। তাই ইংলণ্ড যখন তাহার বাজেটে সমতা রক্ষা করিতে পারিল না—আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক প্রদর্শিত হইল—তখন ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহাদের স্বর্ণ প্রত্যাহার করিতে লাগিল। বাহিরে কোথাও ঋণ পাইলে ইংলণ্ড এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে পারিত। কারণ ইংলণ্ডও ত বহু জাতিকে ঋণ দিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে এর অর্দ্ধেক টাকাও যদি তাহার প্রাপ্য অর্থ পাইয়া নিজের ঋণ পরিশোধ করিত। বস্তুতঃ, উপস্থিত ঘটনা হইতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, ইংলণ্ডের সত্যই দেউলিয়া হইবার মত অবস্থা হইয়াছে। ইংলণ্ড অন্যান্য জাতিকে যে ঋণ দিয়াছে (যাহার পরিমাণ তাহার নিজের ঋণ অপেক্ষা বেশী) তাহা সাধারণতঃ বেশী দিনের জন্য। আমানতকারীরা এক সঙ্গে তাহাদের আমানত প্রত্যাহার করিতে চাহিলে যে কোনও ব্যাঙ্ককে লালবাতি জ্বালাইতে হয়। তাহা হইতেই কি এই বোঝা যায় যে, সব ব্যাঙ্কই দেউলিয়া? তাদের টাকা অন্যদের নিকট আবদ্ধ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যতীত সে টাকা পাইবার আশা নাই। বর্ত্তমান করিয়া দেখিলে খরচ অপেক্ষা জমাই বেশী হইতে পারে। তবু তাহাদের ফেল হইতে হয় আমানতকারীদের একত্র দাবীতে। ইংলণ্ডেরও অনেকটা এই অবস্থা। যাহা হউক, ইংলণ্ড কিন্তু কোথাও ঋণ পাইল না। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে ধার দিবার মালিক হইতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স। কিন্তু তাহারা বিমুখ হইল। যখন কেহই তাহাকে ঋণ দিল না তখন ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া তাহার সাময়িক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে মনস্থ করিল।

এখন স্বর্ণমান পরিত্যাগের সহিত স্বর্ণের বহির্গতি প্রতিরোধের কি সম্বন্ধ তাহারই আলোচনা করা যাক। ইংলণ্ডে এখন স্বর্ণমুদ্রা সাধারণ ক্রয়বিক্রয়ে ব্যবহৃত হয় না। সমস্তই নোটের সাহায্যে চলে। এক পাউণ্ড (১৩।/০) পর্য্যন্ত নোট আছে। ভগ্নাংশের কার্য্য শিলিংএর দ্বারা চালিত হয়। শিলিং রৌপ্যমুদ্রা। সাধারণতঃ সোনার মুদ্রা দৈনিক ক্রয় বিক্রয়ে না চলিলেও একটা নিয়ম ছিল যে, কেহ চাহিলেই ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের নিকট হইতে নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ পাইবে। এখানে একথাটা বিশেষ মনে রাখা দরকার। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাধ্য ছিল না—তবু যত পাউণ্ডের নোট তত পাউণ্ড স্বর্ণতাল দিত। সুতরাং যে কেহ রপ্তানির জন্য সোনা চাহিলেই পাইত। অবশ্য ৪০০ আউন্স (প্রায় ১২৪০ সের) এর কমদামী হইলে ব্যাঙ্ক দিতে বাধ্য ছিল না। স্বর্ণমান পরিত্যাগের অর্থ এই যে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড এখন আর সোনা দিবে না। সুতরাং স্বর্ণের বহির্গতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইংলণ্ডের যে অতিরিক্ত আমদানির কথা বলা হইয়াছে তাহার মূল্য ব্যবসায়ীরা কিরূপে দিবে। যেহেতু, বিদেশী বণিকগণ—যাহাদের নিকট হইতে তাহারা মাল ক্রয় করিয়াছে—ইংলণ্ডের নোট গ্রহণ করিবে না, সোনাই চায়। এই সোনা এখন ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা কোথায় পাইবে? তারা এই সোনা বাজার হইতে কিনিবে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড ছাড়াও একটা সোনারূপার বাজার আছে। কিন্তু এখন এই সোনার ব্যবসায়ীরা বেশী মূল্য গ্রহণ করিবে। পূর্ব্বে ১ পাউণ্ড নোট দিলে ঠিক সমমূল্যের সোনা পাওয়া যাইত। যদি সোনার বাজারে কেহ তাহা দিতে স্বীকৃত না হইত তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা অনায়াসে উপরিউক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঐ পরিমাণ সোনা আনিতে পারিত। কিন্তু এখন ব্যাঙ্ক সোনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে; ফলে স্বর্ণবিক্রেতারা পূর্ব্বে ১ পাউণ্ড যতটা সোনার মূল্যবান ছিল সেই পরিমাণ সোনার জন্য যদি ১ পাউণ্ড অপেক্ষা বেশী দাবী করে, তাহা হইলেও ব্যবসায়ীদের গত্যন্তর নাই। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা। পূর্ব্বে ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং দ্বারা ৪৮৬ ডলার ক্রয় করা যাইত। এখন তাহা দ্বারা ৩৫০ ডলার ক্রয় করা যায়।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে, ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের সহিত একই যোগসূত্রে গ্রথিত ভারতবর্ষে ব্যবসায়ী মহলে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। আতঙ্কের ফলে যাহাতে ব্যাঙ্কগুলি ফেল না করে তজ্জন্যই গবর্ণমেণ্ট ৩ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধের আদেশ দেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা অবস্থাটাকে

আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করেন। কিন্তু ভারতের দুর্গতির এখানেই শেষ হয় নাই। পূর্ব্বে আমাদের টাকা সোনার সহিত যুক্ত ছিল। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট রপ্তানির জন্য টাকার পরিবর্ত্তে সোণা দিতে বাধ্য ছিলেন। এখন ভারত-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন টাকাকে অতঃপর 'ষ্টার্লিং'এর সহিত যোগ করা হইল। অর্থাৎ এখন গবর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্ত্তে সোনা দিবে না, দিবে ষ্টার্লিং। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, 'ষ্টার্লিং' ও 'সোনা' এখন আর এক নয়। ষ্টার্লিং এর মূল্য সোনার চেয়ে কম। সুতরাং ব্যাপার এই দাঁড়াইল যে, ষ্টার্লিং যে দিকে যাইবে আমাদের টাকার গতিও সেই-দিকে হইবে। ষ্টার্লিং আগেকার চেয়ে কম সোনা ক্রয় করিতে সমর্থ সুতরাং টাকাও কম সোনা ক্রয় করিতে পারে। পূর্ব্বে যখন ষ্টার্লিং ও সোনা একই ছিল তখন আমাদের টাকা ষ্টার্লিংএর সহিত যুক্ত হইলেও কার্য্যতঃ সোনার সহিতই যুক্ত হইত। কিন্তু এখন আর তা নয়। এখন এই নূতন এক্সচেঞ্জে ইংলণ্ড ও ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা দেখা। এই এক্সচেঞ্জ পরিবর্ত্তনে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে কোন পার্থক্যই হইবে না। পূর্ব্বে যা ছিল তাহাই থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্বর্ণমানযুক্ত দেশের (যেমন আমেরিকা, জাপান) সহিত আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের টাকার সোনা ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সেই দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে বেশী টাকা দিতে হইবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। ধরা যাউক জাপান হইতে ১০০০ গজ কাপড় কিনিতে আমাদিগকে এক ভরি সোনা দিতে হইত। এখন টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় ঐ ১ ভরি সোনা কিনিতে আমাদিগকে বেশী টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ ১০০০ গজ কাপড় কিনিতে আমাদিগকে বেশী মূল্য দিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জাপানের পক্ষে আমাদের এখানে মাল বিক্রয় করা কঠিন হইবে। ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দেশের সহিত বাণিজ্যেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিবে। ইংলণ্ডের সহিত কিন্তু কোন পার্থক্য ঘটিবে না; যেহেতু ইংলণ্ডের মুদ্রা ষ্টার্লিংএর সহিত আমাদের টাকা যুক্ত। যখন আমাদের বাজারে অন্যান্য দেশের পণ্য বিক্রয় করা কঠিন হইবে, তখন ইংলণ্ড অনায়াসেই সেই বাজার দখল করিবে। সুতরাং ভারতের সহিত ব্যবসায়ে ইংলণ্ড প্রচুর সুযোগ পাইল। ভারতেরও সুবিধা আছে। পূর্ব্বে আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশের পণ্য বিক্রয় করিলে আমরা যে পরিমাণ সোনা পাইতাম এখন সেই পরিমাণ সোনাই পাইব। কিন্তু সেই একই পরিমাণ সোনা পাওয়ার অর্থ বেশী টাকা পাওয়া। কারণ টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনায়ারা পূর্ব্বের চেয়ে বেশী টাকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে। কয়েক দিন পূর্ব্বেই ১০০ ইয়েনের (জাপানী মুদ্রা) মূল্য ছিল ১৩৪ টাকা; এখন ইহার দাম ১৮৪ টাকা। এখন আমরা যদি জাপানে ১০০ ইয়েন মূল্যের পাট বিক্রয় করি; তাহা হইলে ১৩৪ টাকার পরিবর্ত্তে ১৮৪ টাকা পাইব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমরাও এই এক্সচেঞ্জের পরিবর্ত্তন হইতে সুবিধা লাভ করিতেছি। তথাপি ভারতীয়েরা ইহার প্রতিবাদ কেন করিতেছে, তাহা একটু প্রণিধান করা প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের একটা গতি এই যে, কোন দেশ অন্য দেশের নিকট কিছু না কিনিয়া শুধু বিক্রয় করিয়াই যাইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশেই বিক্রয়ের সুবিধা পাইব, কিন্তু ঐ সমস্ত দেশ আমাদের সহিত পূর্ব্বে যে দ্রব্যের ব্যবসা চালাইত তাহা করিতে পারিবে না, ইংলণ্ড উহা হস্তগত করিয়া লইবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম অনুযায়ী এই সুবিধা বেশী দিন চলিবে না। জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি প্রভৃতির নিকট আমরা বিক্রয় করিব কিন্তু কিনিব না, ইহা হইতেই পারে না। এখন এ সমস্ত দেশের সহিত আমাদের ব্যবসা নষ্ট হইলে কত ক্ষতি তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই ভারতীয় বণিক টাকাকে সোনার সহিত যুক্ত করিবার জন্য দাবী করিতেছেন; তাহা হইলে অন্যান্য সমস্ত দেশের সহিত আমাদের ব্যবসা ঠিক থাকিবে। কেবল ইংলণ্ডের সহিত একটু সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু এই শেষোক্ত পন্থাতেই আমাদের লাভ বেশী। কারণ ইংলণ্ডের

সহিত আমরা যে বাণিজ্য চালাই তার মূল্য ১৭৫ কোটি টাকার অধিক নয়। কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত আমরা ৩১০ কোটি টাকার বাণিজ্য চালাই। এখন কোনটি ঠিক রাখিলে ভাল হয় তাহা যে কেহ বুঝিতে পারিবেন।

(মাসিক সমাজ—কলিকাতা)

ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত টাকা সংযুক্ত থাকার ফল

ইংলণ্ডে অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে, পৃথিবীর সকল দেশের ন্যায় সে দেশেও ব্যবসায় মন্দা হইয়াছে। এই সময় ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ইংলণ্ডে রক্ষিত স্বর্ণ লইয়া গিয়াছে। নানা কারণে ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। ভারতের টাকাকে পাউণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া ইংলণ্ড নিজের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এইরূপ করায় ভারতে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বিবৃত করা প্রয়োজন।

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমেরিকার প্রতি শত ডলারের মূল্য ছিল ২৭৭৲ টাকা; নূতন ব্যবস্থায় উহার মূল্য ৩৮২৲ টাকা হইয়াছে। ইহার ফলে আমেরিকা হইতে যেসকল জিনিষ আসে তাহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে। মোটরকার প্রভৃতির মূল্য শতকরা ৩৫ টাকা বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে ইংলণ্ডে প্রস্তুত মোটরকার এখন আমেরিকার মোটরকারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। কারণ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে টাকার মূল্য পূর্ব্ববৎ ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্দ্দিষ্টই আছে, উহার কোনও তারতম্য হয় নাই। সেজন্য ইংলণ্ডে প্রস্তুত মোটরকারের সেই দরই রহিল। কিন্তু আমেরিকার ফোর্ড গাড়ীর মূল্য ২৮০০ টাকা ছিল, এই হারে তাহার মূল্য ৩৭০০ টাকা হইবে।

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জাপানের প্রতি শত ইয়েনের মূল্য ছিল ১৩৪ টাকা, এখনে তাহার মূল্য ১৮৪ টাকা হইয়াছে। ইহার ফলে জাপানের প্রস্তুত কোটের কাপড়, সার্টের কাপড়, তোয়ালে, চাদর প্রভৃতির সহিত লাঙ্কাশায়ারের প্রস্তুত দ্রব্য সকলেই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। ইহাতে ইংলণ্ডের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দূর হইল।

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জার্ম্মাণির প্রতি ১৪০ মার্কে ১০০ টাকা হইত, নূতন ব্যবস্থায় ১১০ মার্কে ১০০ টাকা হইবে অর্থাৎ টাকার মূল্য দেড় গুণ করিয়া প্রত্যেক টাকা প্রায় এক মার্কের সমান সমান হইয়াছে। ইহার ফলে জার্ম্মাণির লোকও এদেশে আর ইংলণ্ডে প্রস্তুত মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।

এই নূতন ব্যবস্থায় রক্ষিত টাকার মূল্য ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং অপেক্ষা এখনও বেশী; কিন্তু ১ শিলিং ৬ পেন্স এক টাকার সমান এবং ইংলণ্ডের ষ্টার্লিংএর সহিত টাকার সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। যদি এই যোগ না থাকিত, তাহা হইলে ভারতবাসী পূর্ব্বের মতই আমেরিকা, জার্ম্মাণি ও জাপানের সহিত ব্যবসা করিতে পারিত। এখন সে ব্যবসা সকল বন্ধ হইয়া যাইবে এবং যাহা ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য দেশ হইতে আমদানি করা হইত, তাহা ইংলণ্ড হইতে বাধ্য হইয়া আনিতে হইবে।

ষ্টার্লিংএর মূল্য কমিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত টাকার দর যুক্ত থাকায় টাকার দরও কমিয়াছে। এই ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড বিলাতী দ্রব্য রফতের এক উল্টা চাল চালিল। এখন ভারতবাসী ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্য ব্যতীত অন্য দেশে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না; কারণ অন্য সকল দেশের জিনিষ দুর্ম্মূল্য হইবে। অর্থনীতির এক চাল দিয়া ইংলণ্ড, ভারতের বিলাতী দ্রব্য রফতে ব্যর্থ করিয়া দিল। কৃত্রিমভাবে টাকার সহিত ষ্টার্লিংকে সংযুক্ত করাতেই ইহা হইল।

কম আমদানি করিলে রপ্তানি কম হয়। ষ্টার্লিং টাকার সহিত সংযুক্ত করায় বিদেশী সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলে, এদেশের লোক আর বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিবে না বলিয়া আমদানি কমিয়া যাইবে। আমদানি কমিয়া গেলে রপ্তানিও কমিয়া যাইবে। আমরা আমেরিকা হইতে মোটরকার প্রভৃতি আনি এবং তথায় চট প্রভৃতি রপ্তানি করি। জার্ম্মাণি হইতে সস্তা দামের নানা প্রকার জিনিষ আনি ও তথায় চাউল, নারিকেল প্রভৃতি রপ্তানি করি। জাপান হইতে কাপড়, খেলানা আনি, তথায় লৌহ প্রভৃতি রপ্তানি করি। এইরূপে টাকা বা জিনিষ লওয়া ও দেওয়ারেই বাণিজ্য চলিতে থাকে। কম

দ্রব্য বিদেশ হইতে লইলে আমাদেরও বাধ্য হইয়া কম দ্রব্য বিদেশে পাঠাইতে হইবে। সুতরাং আমরা বিদেশ হইতে মূল্য বৃদ্ধির জন্য মাল কম লইলে তাহারাও আমাদের মাল কম লইবে।

ইহার আবার একটা ভাল দিকও আছে। আমেরিকা, জার্মাণি, জাপান প্রভৃতি এখন দেখিবে যে, তাহারা যতটা অর্থে যে পরিমাণ এদেশী দ্রব্য ক্রয় করিত, এখন সেই পরিমাণ অর্থে পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ অধিক মাল পাইবে, তাহা দেখিয়া তাহারা বেশী মাল লইলে এদেশ হইতে রপ্তানি বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে এদেশের মালের মূল্য বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আমরা কেবল ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করি না, আমরা পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করি। কিন্তু ষ্টার্লিংএর সহিত টাকা সংযুক্ত করায় আমরা আর বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিব না। কৃত্রিম উপায়ে ষ্টার্লিংএর সহিত টাকা সংযুক্ত করায় বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ এদেশে আসিবে না। একজন ব্যবসায়ী এদেশে একটা কল স্থাপনের জন্য বিদেশের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এমন সময় ষ্টার্লিংএর মূল্য কমিয়া যায়, তাহার সহিত টাকার সংযোগ হওয়াতে সেই ব্যবসায়ীকে এখন লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইবে। ইহাতে তিনি এদেশে কল স্থাপন পূর্ব্বক জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বিলাতী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহা বিক্রয় করিবার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কেবল মাত্র ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ষ্টার্লিংএর সহিত টাকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই সংযোগ সম্বন্ধে ভারতবাসীর কোনও মতামত লওয়া হয় নাই। ভারতবাসী স্বেচ্ছায় তাহাদের মত জানাইলেও তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এদেশ্‌স্থিতে ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকিলেও তদনুযায়ী কার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা বিদেশের সহিত যে বাণিজ্য করি, তাহাতে দেখিতে পাই, ভারতে ইংলণ্ড হইতে ১৭২ কোটী টাকার মাল আসে এবং অন্যান্য দেশ হইতে উপরি উক্ত কারণে ৩৮৬ কোটী টাকার মাল আসে। অন্যান্য দেশের দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেলে আমাদিগকে ইংলণ্ডের দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে; কারণ ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাটার বন্দোবস্ত পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে, উহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য দেশ হইতে ক্রীত ৩৮৬ কোটীর অর্দ্ধেক মালও যদি ইংলণ্ড হইতে আনা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখা যায়, কেন ষ্টার্লিংএর সহিত টাকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। (সঞ্জীবনী-কলিকাতা)

বিলাতের নূতন বাণিজ্য-নীতি

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

বিলাতে আমদানি কমাইবার চেষ্টা

গত অক্টোবরের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের ফলে ন্যাশন্যাল গবর্ণমেণ্টের বল বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রক্ষণশীল দলের লোক খুব বেশী। রক্ষণশীল দল সংরক্ষণ শুল্কের পক্ষপাতী। এখন যে সব জিনিষের উপর কোন সংরক্ষণ শুল্ক নাই, সেগুলা এখন বেশী করিয়া আমদানি করিয়া, পরে যখন সংরক্ষণ-শুল্ক বসিবার পর সেগুলার দর চড়িবে, তখন সেগুলা বেশী দরে বেচিয়া মোটা লাভ করা যাইবে, এই আশায় অনেক বিলাতী ব্যবসায়ীর আমদানির বহর বাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার ফলে মাসিক আমদানির বহরের পরিমাণ ২ কোটি ৬ লাখ হইতে ৩ কোটি ৫০ লাখ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। আমদানি রপ্তানির চেয়ে বেশী হইলে বিলাতের দেনা বাড়িবে ও তাহার ফলে পাউণ্ডের দর আরও

কমিয়া যাইবে এই ভয়ে আমদানি কমাইবার চেষ্টা হইতেছে। বিলাতে একটী নূতন আইন পাশ হইতেছে। ইহার ফলে উক্ত আইনে যে কয়টী কারখানা-জাত ও আধা কাঁচা মালের নাম করা হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে যে কয়টীর উপর গবর্ণমেণ্ট ভাল বুঝিবেন, শতকরা ১০০ হারে পর্য্যন্ত শুল্ক বসাইতে পারিবেন। বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলা হইতে আগত মালের উপর কিন্তু কোন শুল্ক বসানো চলিবে না।

বিলাতে আমদানি-শুল্ক বৃদ্ধি-ফ্রান্সের প্রতিবাদ

বিলাতে বিদেশী আমদানির বহর গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে অত্যন্ত বেশী বাড়ে। আমদানি বেশী হ'লে বিদেশের কাছে বিলাতের দেনা বাড়বার সম্ভাবনা। তার ফলে বিলাতী ষ্টার্লিংএর দরও কমে যাবে। এই জন্য বিলাতের সরকার আমদানির উপর চড়া হারে শুল্ক বসালেন। শোনা গিয়েছিল যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও নাকি এই পালটা জবাব দিয়ে বিলাতী জিনিষের ওপর শুল্কের হার বাড়াবে। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তা করে নি। কিন্তু ফ্রান্স এই ব্যাপারটী চুপ ক'রে সহ্য ক'রতে রাজী নয় দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্স বল্‌ছে—"তোমার এই শুল্ক বাড়ানোর ফলে বছরে ৮০ লাখ পাউণ্ড দামের ফরাসী জিনিষকে বিলাতের বাজার থেকে তাড়ানো হবে; কৃষিজাত জিনিষের দাম ধর'লে বছরে ১ কোটি পাউণ্ড দামের জিনিষ তোমার দেশে আমরা কম বেচ্‌তে পারবো। আমরা তোমাদের যে সব জিনিষের দামের ওপর মাত্র শতকরা ১০ হারে কর বসাই, তোমরা সেই শ্রেণীর জিনিষের উপর শতকরা ৩৩৯ হারে কর বসিয়েছিলে। এখন আরও শতকরা ৫০ হার বাড়িয়ে দিলে।" ফ্রান্সের মনের ভাবটা ঐ রকম। বিলাতের সরকারকে ফরাসী সরকার শীঘ্রই এ সম্বন্ধে একখানা জরুরি চিঠি লিখ্‌বেন এই রকম শোনা যাচ্ছে।

বাঙ্গালার রেশমের অবনতি

শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জ্জী (নাগপুর)

১৯৩১ সনের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে 'নাগপুর-বম্বে' এক্সপ্রেস্ ট্রেনে বম্বে যাবার জন্য চাপ্‌লাম। বড় দিনের জন্যদেশনে অনেকে যাচ্ছেন। আমার কামরায়, একজন গুজরাটী ভাটিয়া এসে আমাকে একটু সরতে ব'ললেন।

বাঙ্গালী নিজে কষ্ট স্বীকার ক'রে পরকে সুখী ক'রতে চির অভ্যস্ত ভেবে আমি বাম হস্ত দ্বারা তাঁকে আমার পাশে ব'সতে ইঙ্গিত ক'রলাম। তিনি ব'স্‌লেন। তাঁর কথার সুরে তিনি গুজরাটী বলে বেশ বোঝা গেল।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "আপনি কি গুজরাটী?"

তিনি বল্‌লেন, "হাঁ, আমি গুজরাটী ও জাতিতে ভাটিয়া।"

"তবে আপনি নিশ্চয়ই ব্যবসা করেন।"

"হাঁ, আমি সিল্কের ব্যবসা করি। নাগপুরে আমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও বিদ্যাবণ্টের খতিয়ান ক'রতে এসেছিলাম। আমি এইরূপে নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে বম্বে গিয়ে যাব।"

"আজকাল ভারতের বাজারে স্বদেশী সিল্ক বিক্রী হচ্ছে?"

"স্বদেশী আন্দোলন হবার দরুণ, ভারতে তৈরী সিল্কের চলন দেশে যথেষ্ট হ'য়েছে। পূর্ব্বে বিদেশী সিল্ক ভারতের বাজারে বেশী চলত। আজকাল, কাশ্মীরি, বাঙ্গালোরী (সাউথ্ ইণ্ডিয়ান) ও চীনা সিল্ক বাজার দখল ক'রেছে। এই দেশীয় আন্দোলনের পূর্ব্বে কাশ্মীরি সিল্ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব'লে বেশী পরিমাণে বিদেশে চালান যেত। বাঙ্গালোর সিল্ক ও বিদেশে রপ্তানি হ'ত। এখন দেশীয়

জিনিষের কদর হওয়াতে, ভারতবাসীরা এই সকল সিল্ক কিন্‌তে শিখেছে, যদিও এই সিল্ক বিদেশী সিল্ক অপেক্ষা বেশী মূল্যে বিক্রয় হ'য়ে থাকে।"

আমি চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "বাঙ্গালা দেশের মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের সিল্কের নাম পর্য্যন্ত ক'রলেন না,—কারণ কি? অথচ চীন দেশীয় সিল্ক ভারতের বাজারে যথেষ্ট চ'লছে।"

তিনি ব'ল্‌লেন, "কাশ্মীর, বাঙ্গালোর সিল্কের তুলনায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক নিকৃষ্ট। উহা ব'ক্সেরা পছন্দ করে না। উহা চেঁকসইও হয় না। চীনা ব্যবসায়ীরা ভারতের বাজারে চলনসই ও চাহিদামত নানা প্রকারের সিল্কের নমুনা নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে ঐরূপ সিল্ক ভারতের বাজারে প্রয়োজনমত পাঠিয়ে থাকে। বিলাতী জিনিষ নয় ব'লে চীনা সিল্ক ভারতের বাজারে বেশ চ'লছে। তারা জিনিষটাও সুলভ দরে দিতে পারে। এই সব কারণে মুর্শিদাবাদ সিল্ক একেবারে চাপা প'ড়ে গেছে। কখনও যদি বাজারে ঐ সিল্কের চাহিদা হয় তা'হলে সেও অতি অল্প পরিমাণে। বাঙ্গালা ও আসাম অঞ্চলের সিল্কের এখন এই অবস্থা। ঐ অঞ্চলে ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ঐ মাল চলে। ভারতের অন্যত্র এ সব জিনিষের চলন নাই ব'ললেই হয়।"

"ইহার কারণ কি আপনি ব'ল্‌তে পারেন?"

"কারণ আর কিছুই নয়; বাঙ্গালা দেশে, পূর্ব্বকালের ধারানুযায়ী বয়ন, রং করা ইত্যাদি চ'লে আস্‌ছে। ব্যবসা হিসাবে, বিভিন্ন বাজারে চলনোপযোগী সিল্ক তৈরী ক'রতে বাঙ্গালা দেশের বয়নকারীদের অ্যাপোসিয়েশন পরাঙ্মুখ। বাঙ্গালার বায়ু ও জলের প্রভাবে যদি সিল্কটা ভাল না হয়, তা'হলে, বয়নকারীরা হয়ত' আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিল্কটাকে উচ্চশ্রেণীর ক'রতে সচেষ্ট হয় না। উন্নতিবিধান ক'রলে, মুর্শিদাবাদ সিল্কের ভারতের বাজারে যথেষ্ট চলন হ'তে পারে ও বাঙ্গালীরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে পারে। আমি গুজরাটী, বাঙ্গালার উন্নতিকামী; কোটি ২ টাকায় বাঙ্গালার সিল্ক ভারতের বাজারে চালিয়ে দিব।"

এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, ভদ্রলোকটি আমাকে অভিবাদন ক'রে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নেমে পড়লেন।

ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকের ঔৎসুক্য*

প্রিয় অধ্যাপক সরকার,

* * *

আশা করি, আপনি আমার নূতন বই "এডাপ্ট সিভিলিজেশান অন্ ট্রায়াল" (আধুনিক সভ্যতা বিচারাধীন), প্রকাশক অ্যালেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন্, শীঘ্রই দেখিবেন। যদি আপনার সময় থাকে, ঐ বইখানিতে যে ধরণের খবরাখবর দেওয়া হইয়াছে, ভারতে ১৯০০ বা ১৯১০ সন হইতে যে সব সামাজিক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ ধরণের খবর আমাকে যোগাইলে আনন্দিত হইব। ভারতে সিনেমা, মোটরগাড়ী ও রেডিওর প্রবর্ত্তনের ফলে কি কি সামাজিক ফলাফল দেখা দিয়াছে এতদিনে তাহার চর্চ্চা করা যাইতে পারে। নারীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং যুবকদের স্বভাবের পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সংবাদপত্রের সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে এবং রাজনৈতিক সভাতে লোক সমাগমের বৃদ্ধিই বা কিরূপ ঘটিতেছে, তাহাও জানিতে উৎসুক আছি। আমার মনে হয় আপনি বা আপনার সহকারিগণ ঐ সব বিষয় সম্বন্ধে ও খাঁটি অর্থনৈতিক বিষয়—যেমন ১৯০০ সন হইতে ক্রয়-শক্তির কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—সম্বন্ধেও অনেক বিশেষ মূল্যবান তথ্য যোগাইতে পারেন। আমার মনে হয় আমার কথিত বিষয়গুলা সম্বন্ধে আপনি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু লিখিয়াছেন। ইতি

ভবদীয়

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১। সি, ডেলাইল বার্ণস্

* সি ডেলাইল বার্ণস্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন সম্বন্ধীয় কেতাব লেখা সম্পর্কে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তার কোন কোন অংশের মর্ম্ম দেওয়া হইল।

৪৩বি নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীসুধাংশু শীল বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

চৈত্র — ১৩৩৮ ৬ষ্ঠ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাজয়ের মূর্তি আমি,—'সহেতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—ভয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

কে ট্যাক্স দেয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় বঙ্গদেশের গ্রাম ও সহরে মুসলমান ও অমুসলমান কতজন ট্যাক্স দেয়।

গ্রামের বিবরণ

	মুসলমান	অমুসলমান	মোট
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সদাতা	৩৩৭১৬০৭	২২০২২৬৮	৫৫৭৩৮৭৩
ইউনিয়ন কমিটীতে ট্যাক্সদাতার সংখ্যা	২৩৮১	১৮১২৭	২১৫০৮
চৌকীদারী ট্যাক্স দেয়	৩৮১৭৩৮	৬৪৩৪৯৫	১০৩৪১৩৩

কলিকাতা ব্যতীত সহর

কলিকাতা, হাবড়া ও দার্জ্জিলিং ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের ট্যাক্সদাতা			

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটে জমিদারগণ

অর্থসঙ্কটের ফলে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই কষ্ট হইতেছে। সাধারণ লোকের হাতে টাকা নাই বলিয়া ধনী, মহাজন এবং জমিদারগণও টাকা পাইতেছেন না। বাংলা দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাট ও ধান। এই উভয় জিনিষের দামই অতিমাত্রায় কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কৃষক দরিদ্র হইয়াছে। তাহারা মহাজনের প্রাপ্য শোধ করিতে পারিতেছে না এবং জমিদারের খাজানাও দিতেছে না। এই অবস্থায় জমিদারগণ সদর জমা দাখিল করিতে পারিতেছেন না। নানা জেলায় বহু মহাল খাজানা বাকীতে নীলাম হওয়ার নোটীশের সংবাদ আসিতেছে।

১৯২৯-৩০ সনে মোট ১৪,২০৯টি মহালের সদর জমা বাকী পড়িয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সনে মোট ১৬ হাজার মহালের খাজানা বাকী পড়িয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই এই

মার্চ্চের শেষে নীলামের তারিখ ধার্য্য হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যদি জমিদারগণ বকেয়া খাজানা দাখিল করেন, তাহা হইলে এই সমস্ত মহাল নীলাম হইবে না। যুক্তি-সঙ্গত কারণ দর্শাইয়া যদি কোন কোন স্থলে জমিদারগণ সমস্ত খাজানা পরিশোধ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে নীলাম আরও কিছু দিনের জন্য স্থগিত হইতে পারে। মোটের উপর কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, খুব বেশী মহাল হস্ত নীলাম হইবে না। ১৯২৯-৩০ সনে যত মহাল নীলাম হইয়াছিল তাহা হইতে ২০০ মহাল এবার বেশী নীলাম হইতে পারে।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলায় বাকী খাজানার জন্য নীলামী মহালের সংখ্যা সাধারণতঃ বেশী। ইহার কারণ এই যে, এই জেলায় অনেক স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। নূতন আবাদ করা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্ত মহালের অধিকাংশ জমি অনুর্ব্বর। এইরূপ মহালই বেশী সংখ্যায় নীলাম হইয়া থাকে।

বগুড়া

গত বৎসর বগুড়া জেলায় ২০০ মহালের খাজানা বাকী পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে ১২টী মহাল নীলাম হইয়াছে।

বীরভূম

বীরভূম জেলায় ১৯২৯-৩০ সনে মোট ১১৮৮ তালুকের জমিদ্ব বাকী পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে ৩৪টি নীলাম হইয়াছিল।

ঢাকা

ঢাকা জেলায় ১২০৪টি মহালের খাজানা বাকী পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪টি নীলাম হইয়াছে।

পাবনা

পাবনা জেলায় মোট ৩৩৮ মহালের খাজানা বাকী পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে ২২টি মহাল নীলাম হইয়াছিল।

নোয়াখালী

নোয়াখালী জেলায় ৭৭টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহাল এবং ৪৩৩টি খাস মহাল রাজস্ব বাকীতে ৩১শে মার্চ্চ তারিখে নীলাম হইবে বলিয়া কালেক্টার সাহেব নোটীশ দিয়াছেন। আনুপাতী কিস্তির খাজানা দেওয়া হয় নাই বলিয়াই এই সমস্ত মহাল নীলামে চড়িয়াছে।

সিরাজগঞ্জ

প্রজাগণ খাজানা দিতেছে না। তাই জমিদারগণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। প্রত্যেক কিস্তির সময়েই বহুসংখ্যক মহাল নীলামে উঠিতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এবিষয়ে আবেদন করাতে তিনি পাবনার একটি দরবারের আয়োজন করেন। তাহাতে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাকী রাজস্বের কিয়দংশ দাখিল করিলেই মহালগুলি নীলাম করা হইবে না। জমিদারগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, রাজস্বের সেস আদায় সম্পর্কেও বিবেচনা করা হউক। তাহা না হইলে জমিদারের কষ্টের লাঘব হইবে না।

সম্পত্তি নীলাম

গত সেপ্টেম্বর মাসের কিস্তির সময় খাজানা না দেওয়ায় কোন্ জেলায় কয়টা সম্পত্তি নীলাম হইয়াছে তাহার তালিকা—

বর্দ্ধমান	রাজসাহী	২
বীরভূম	দিনাজপুর	৬
মেদিনীপুর	রংপুর	৩
হুগলী	বগুড়া	৩
হাবড়া	পাবনা	৯
২৪ পরগণা	মালদহ	১
নদীয়া	ঢাকা	৩৮
মুর্শিদাবাদ	ময়মনসিংহ	৩
যশোহর	ফরিদপুর	২০
চট্টগ্রাম	শ্রীহট্ট	৭
খুলনা	ত্রিপুরা	১৮

(সঞ্জীবনী—কলিকাতা)

কৃষিঋণ

গত ১৯৩১ সনে টাঙ্গাইল মহকুমিতিনে গবর্ণমেণ্ট যে কৃষিঋণ দিয়াছেন, তাহার হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

টাঙ্গাইল থানার অধীন ৯টী ইউনিয়নে	১৩৯৭ টাকা
ঘাটাইল থানার ৭টী ইউনিয়নে	৮১৬৬ ,,
নির্ম্মাপুর থানার ১০টী ইউনিয়নে	৯৯৯৫
কালীহাটি থানার ৫টী ইউনিয়নে	৩৮৯১
ঘোষালপুর ও নাগরপুর থানায়	১৫৫৪৯ ,,

মোট ৭৪১৯ জন লোককে সাহায্য করা হইয়াছে। জন প্রতি ১০ টাকা হইতে ৩ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

রাস্তা তৈয়ারীতে দরিদ্রের সাহায্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে যে, টাঙ্গাইল হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী করিতে ৩,৭৫০০ টাকা ব্যয় হইবে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বর্ত্তমান সময়ে রাস্তা তৈয়ারী না করিয়া কেবল পুলাদি তৈয়ারী করিতে ইচ্ছুক। এবার যে রকম দুর্ভিক্ষের পড়িয়াছে তাহাতে রাস্তা তৈয়ারী এখনই আরম্ভ করা উচিত; ইহাতে স্থানীয় দরিদ্র লোকের কষ্ট মোচন করা হইবে। দুর্ভিক্ষের সময়ে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দরিদ্রের কষ্ট মোচন করিয়া থাকেন। এ সময়ে ময়মনসিংহে ভীষণ অর্থাভাবে দরিদ্রগণ কষ্ট পাইতেছে। রোড বোর্ডের হাতে টাকা থাকিতে এই রাস্তা না করা অবিবেচনার কার্য্য হইতেছে।

বঙ্গীয় গোচারণ বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গোচারণ ভূমি সম্পর্কে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

এই আইনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে গোচারণের উপযুক্ত মাঠের অভাবে গোজাতি দিন দিন খর্ব্বের পথে চলিয়াছে এবং কৃষিকার্য্যের জন্য বলদ ও দুগ্ধবতী গাভীর অভাব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষকগণ সমস্ত পতিত ভূমি, জঙ্গল, চাষা-ঘাট প্রভৃতি আবাদ করিয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ফেলায় গবাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

এদেশের আয়তনের ও গো-মহিষাদির সংখ্যার তুলনায় গোচারণের উপযুক্ত ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। দেশের আয়তনের সহিত গোচারণ ভূমির অনুপাত জাপানে ১:৮, জার্ম্মাণিতে ১:৬, নিউজিলাণ্ডে ১:৩, কিন্তু ভারতবর্ষে ১:২৭। আবার প্রতি গো-মহিষের জন্য আমেরিকা যুক্তপ্রদেশে ১·৩ একর, নিউজিলাণ্ডে ১·৫ একর, জার্ম্মাণিতে ১·৩ একর আর বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মাত্র ·২৭ একর।

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গরু মারা যায় তাহাতে যদি বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে বাংলায় গরু আমদানি না হইত তবে বাংলার কৃষিকার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত এবং দুগ্ধ একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইত। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছ ও দুধ, কিন্তু এই দুইটী জিনিষই দিন দিন লোপ পাইতে চলিয়াছে। বাংলার নদী নালা দিন দিন ভরিয়া মজিয়া যাওয়ায় মাছের অভাব হইতেছে, আবার গো-জাতির অবনতির জন্য বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে বাঙ্গালী দিন দিন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে হইলে গোজাতির রক্ষা ও উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে গোচারণের মাঠের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রস্তাবিত আইন দ্বারা ইহার উপায় করা হইয়াছে। এই আইনের বিধানমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের খাস পতিত যে কোন ভূমি গোচারণের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং জনসাধারণের দখলী ভূমিও গোচারণের জন্য খাস করিয়া লইতে পারিবেন। এই সমস্ত গোচারণের ভূমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক গ্রামে বা কয়েকটী গ্রাম লইয়া এক একটী বোর্ড গঠিত হইবে। এই বোর্ডে ৭ জন সদস্য থাকিবেন। ইহাদের মধ্যে ৩ জন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত করিবেন এবং ৪ জন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। বোর্ডের সদস্যগণ মধ্যে একজন

সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন। তিনি উক্ত ভূমির আবাদের হিসাব রক্ষা করিবেন; বোর্ড গোচারণের ভূমিতে গোচারণের জন্য কিস আদায় করিতে পারিবেন; গোচারণের মাঠের কতকাংশে ঘাসের বাজারযোগ্য শস্য উৎপাদন করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্য নীলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন; যে সকল স্থানে জঙ্গল আছে এই আইনের বলে ঐ জঙ্গলের কতকাংশ গোচারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিবেন। গোচারণ ভূমি কেহ অন্যায়ভাবে দখল করিলে বা বিনা অনুমতিতে গোচারণের জমিতে গরু চরাইলে শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ভাবে আদায়ী জরিমানার কতকাংশ গ্রাম্য গোচারণ কমিটী প্রাপ্ত হইবেন।

(রহমনসিংহ-সমাচার)

অভিশপ্ত জেলা

বাংলার এই অভিশপ্ত জেলা পাবনার দুরবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার দিক্‌চক্রবালে কোন আশার লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বন্যার পর হইতে সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে এতদিন চলিল কিন্তু সাহায্য বন্ধ হওয়ায় দিন আর এখন চলিতেছে না। জেলার প্রতি স্থানেই অভাবক্লিষ্ট মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। চাটমহর থানার অন্তর্গত বড়বাড়ী ওইগ্রাম প্রভৃতি পল্লীর অধিবাসিবর্গ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দুইখানি আবেদন প্রেরণ করিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে। দরখাস্ত দুইখানি গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "সুহৃদে"ও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত দরখাস্তে তাহারা বলিয়াছে, ২।৩ জন লোক খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে, সাহায্য না পাইলে আরও মারা যাইবে। চৈতালী ফসল জমিতে নাই, ঘরে খাওয়ার কিছু নাই, ছেলে-পিলে লইয়া লোকে হাহাকার করিতেছে, এই দুঃসময়ে যাহার লোকজন ও মহাজনগণ উৎপীড়ন করিয়া যা কিছু আছে লইয়া যাইতেছে। আমরা নিরুপায় হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি।" আবেদনের বর্ণিত অবস্থা সামান্য একটা দৃষ্টান্ত মাত্র—জিলার প্রতি গ্রামেই এই অবস্থা চলিতেছে।

কিন্তু এ প্রকার দুঃসহ অবস্থার মধ্যে লোক কতকাল নির্ব্বিকার ভাবে টিকিতে পারে? পাবনার প্রতি গৃহে আজ এই অবস্থা এক অতি নিষ্ঠুর সত্য রূপে পরিণত হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন অভাব অনাটনের মধ্যে লোকের ঋণভার বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমেই ইহা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে। প্রভাত না হইতেই ব্যাঙ্কের পিয়াদা মহাজনের কর্ম্মচারী ঘূর্ণিত লোচনে দ্বারে উপস্থিত। পেটে অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, যাহা আছে তাহাও জীর্ণ শতচ্ছিন্ন গলিত প্রায়। ঘরে ঘর পর কাঁদিতেছে, শুইবার বিছানা নাই, এক বিন্দু ঔষধ নাই, পথ্য দিবার পয়সা নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, ক্ষীণস্রোত শব বিকারঘোরে প্রতি মুহূর্ত্তে চমকিয়া উঠিতেছে। ইহা কবির কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। যাঁর চক্ষু আছে হৃদয় আছে তিনি পাবনার যে কোন পল্লীতে গেলেই আজ এই দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? এই অগণিত বেদনা-পীড়িত মানবাত্মার শুশ্রূষা নিবারণেরই বা ব্যবস্থা কি? কবি এ বেদনার গীতি কতকাল গাহিয়া আসিতেছেন। সাহিত্যিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ইহারিপক্কেই দোষী স্থির করিতেছেন, ধনী বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে এই সব নরকঙ্কালে এখনও রক্তমাংসের স্বপ্ন দেখিতেছেন কিন্তু হায়! এদের পক্ষে যারা নিষ্ঠুর সত্য তাহা ত কেহই দেখিতেছেন না, দেখিলেও স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিতেছেন না। দিনের পর দিন যাইতেছে দুরবস্থা এইভাবে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু পাবনার এই দুরবস্থা এক দিনে আসে নাই, আকস্মিকও নহে। কুষ্টিই পাবনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া শিরাজগঞ্জ রেল লাইন নির্ম্মিত হইবার পর হইতে ক্রমাগত ১৫।১৬ বৎসর ধান এই জেলার কৃষি অবনতি চালতেছে। এই অবনতি আজ চরম সীমায় আসিয়াছে। পাবনার বিস্তৃত উর্ব্বর শস্য প্রান্ত-সমূহ আজ মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই রেল লাইনই যে পাবনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা আজ এখন কাহারও অবিদিত নাই—কেহ অস্বীকারও করেন না।

বন্যার উদ্ভূসিত জল এই রেল লাইনে প্রতিহত হইয়া শস্য-ক্ষেত্রসমূহ আকস্মিকভাবে প্রতি বৎসর ডুবাইয়া দিতেছে। পাবনার প্রজাসাধারণ এজন্য অনেক দিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। চিকনাই নদী, কিন্তু সরকারের ভোলা, বাঘাই ভোলাই ভোলা প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে কালভার্ট নির্মাণ করিয়া বন্যার উদ্ভূসিত প্রতিহত জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে রেল লাইনের অস্তিত্বও কিছু রক্ষিত এবং জেলার অন্ততঃ কতক জমিও রক্ষা পাইত; কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, এই কাজে দুইকল্পে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাব-বশতঃ ডিঃ বোর্ড এ কাজেও হাত দিতে পারিবেন না। দেশের সমুদয় শক্তি রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ব্যতীত এরূপ সার্বজনীন মঙ্গলকর বৃহৎ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাষ্ট্রের সুবিধার জন্যই যেখানে রেল লাইন নির্মাণ করিয়া জেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে, সেখানে ইহার প্রতীকার করিতে রাষ্ট্র স্বাভাবতঃ ও ধর্মতঃ বাধ্য। টাকা নাই এই কথা বলিয়া দায়িত্ব পরিহার রাষ্ট্রের পক্ষে এখানে শোভন নহে। পাবনার ১৪ লক্ষ লোক নিয়ন্ত্র পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছে, তথাপি সরকার ইহাদের জন্য মাত্র ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন না, ইহা কখনই সহানুভূতির পরিচায়ক নহে। প্রজাসাধারণ আজ দাবী করিতেছে সরকার পাবনার কৃষির অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে ইহার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। এই কাজ যতই বিলম্বিত হইবে জেলার দুরবস্থা ততই সাঙ্ঘাতিক হইতে থাকিবে। (সুরাজ—পাবনা)

সোনা রূপার চালান

স্বর্ণকারদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। পাবনা জেলায় সমুদয় সোনা ও রূপা স্বর্ণকারদের মারফতে এক প্রকার নিঃশেষে চালান হইয়া যাইতেছে। বস্ত্রের দালাল জুটিয়াছে, তাহারা মফঃস্বল হইতে সোনা রূপা আনিয়া সহরে স্বর্ণকার-দের নিকট বিক্রয় করিতেছে। রূপা বস্তায় করিয়া আনিয়া থান চাউলের মত বিক্রয় করিতেছে। দৈনিক গড়ে প্রায় ৫ হাজার টাকার সোনা সহর হইতে চালান হইতেছে। লোকের নিদারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তারপর সোনার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। দালালগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহ করিতেছে। কাজেই যার যেটুকু ছিল সমুদয়ই বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। অনেক বাড়ীতে ছেলেদের মধ্যে কান্না পড়িয়া গিয়াছে, গৃহিণীগণ সংসারে কলহ বাধাইয়া দিতেছেন। নানাস্থান হইতেই এই উপলক্ষে পারিবারিক অশান্তির কথাও শুনা যাইতেছে।

বেশী বস্ত্রে

দালালের প্রভাব

বিদেশী বস্ত্রের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায়, স্থানবিশেষে একেবারে বন্ধ হওয়ায়, দেশী বস্ত্রের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু এই চাহিদার অনুপাতে বাজারে আমদানি অনেক কম হইতেছে। এরূপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রেতাদের রুচি অনুসারে বস্ত্রবিক্রেতাগণ নানা প্রকারের বস্ত্রও আমদানি করেন না। সমুদয় মিলের মালেকগণ এক প্রকার মূলো বস্ত্রও বিক্রয় করেন না—তজ্জন্য কোন কোন মিলের বস্ত্রের চাহিদা বেশী থাকিলেও সেগুলি বিক্রয়ে লাভ কম হওয়ায় মফঃস্বলের মহাজনগণ ঐ সব বস্ত্র আমদানি করেন না—করিলেও খুব সামান্য করিয়া থাকেন। কলিকাতায় বস্ত্র-বিক্রেতা মহাজন এবং মফঃস্বলের মহাজনদের মধ্যে এক প্রকার দালাল আছে। ইহাদের হাতে পড়িয়া মফঃস্বলের মহাজনগণ স্বাধীনভাবে অনেক সময় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে না এবং এই কারণে দেশী নামে অনেক বিদেশী বস্ত্রও দালালদের মারফতে মফঃস্বলে আমদানি হইয়া থাকে। বাঙ্গলার কলকব্জা কটন মিলের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত মিলগুলি যদি আরও দেশী বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারেন এবং দালালের অপেক্ষা না করিয়া মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

জেলার অবস্থা

রবিশস্যের অবস্থা ভাল নহে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে অর্থাভাবে রবিশস্যের আবাদ হয় নাই। যাহা হইয়াছে বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। পাটের খরিদ-বিক্রয় নাই। ষোটা চাউল (৮০ তোলা সের) ২৸—৩৲ মণ বিক্রয় হইতেছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্নকষ্ট তীব্রভাবে চলিতেছে। জমিদারের খাজনা মহাজনের সুদ আদায় নাই। ব্যাঙ্কগুলি আমানতের টাকা ও ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।

আমের মুকুল ছিল, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে গুটী বাঁধিতে পারিতেছে না। রাত্রে শীত পড়ে কিন্তু দিনে গরম হাওয়া বহিতে থাকে। আপাততঃ কলেরা ও বসন্তের কোন সংবাদ নাই—জ্বরের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা কম।

সুবর্ণবণিকগণের সুবর্ণযোগ উপস্থিত। গৃহস্থগণ গৃহিণীদের স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করিতেছে। তাহারা গলাইয়া খাঁটী সোণা করিয়া কলিকাতায় লইয়া বিক্রয় করিতেছে। এই ব্যবসা সিরাজগঞ্জ ও পাবনা সহরে বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে।

(সুহৃদ-পাবনা)

"কাঁদিব কার কাছে"

গত সপ্তাহে শোলক গ্রামের চুরির সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এখন খবর পৌরসভা এলাকার প্রায় প্রত্যেক গ্রাম হইতে আসিতেছে। কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে এই সব চুরি শেষে ডাকাতিতে পরিণত হইবে। গত বৎসরও লোকের ঘরে কিছু ছিল, এবৎসর কিছুই নাই। কাজেই বুভুক্ষু ভীষণপ্রকৃতির লোক নীরবে বসিবে না—তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তুমুল হইয়া উঠিবে। আর যাহারা তুমুল হইয়া উঠিবে তাহাদিগকে বাধা দিবার শক্তি গ্রাম্য লোকদের নাই। পুলিশ বা কি করিবে? আমরা বহুবার পত্রিকায় লিখিয়াছি, শত শত বর্গ মাইলের মধ্যে ৪।৫ জন পুলিশ কর্ম্মচারী কি করিতে পারে? তাহারা দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে—এ গ্রামে সে গ্রামে দৌড়াদৌড়ি করে—তা ছাড়া কাপড়ের দোকানে—মাদক দ্রব্যের দোকানে চৌকী দেয়, কাজেই সে বেচারাদের দোষ দিলে কি ফল? তাহাদের নামের প্রভাবে যাহারা ভীত হয়, তাহারাই ভাল, কিন্তু দুর্দ্দান্ত যাহারা, প্রাণের দায়ে পেটের ক্ষুধায় যাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, ভবিষ্যৎ বিপদাপদ-চিন্তাহীন, তাহাদিগকে শাসন করা যে কঠিন ব্যাপার। একদিন ছিল যেদিন দেশ এমন সুশাসিত ছিল না, সেদিন আত্মরক্ষার জন্য গ্রামবাসী প্রস্তুত থাকিত··· এক ঘা খাইত, এক ঘা দিত। আজ সে দিন নাই—পুলিশই রক্ষা করিবে, এই বিশ্বাসে ও ভরসায় জনসাধারণ আজ আত্মরক্ষায় অক্ষম। যাহারা শারীরিক চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা আজ রাজনীতিক ভয়ে ভীতি-বিহ্বল। এই তো দেশের অবস্থা। এমন কার কাছে কাঁদিয়া প্রতীকার পাওয়া যাইবে, না বুঝিতে পারিয়া, লোক ভীত হইয়া পড়িতেছে। কি যে ভয়াবহ দিন সম্মুখে আসিতেছে তাহা কেহ ভাবিতেই পারিতেছে না। সমাজের সকল অঙ্গ আড়ষ্ট—রক্তের সঞ্চালন বন্ধ—অর্থ কোথাও নাই কলম-বাজীর, উকিল—মোক্তার—ডাক্তার—কবিরাজ—শিল্পী—চিত্রকর, এক কথায় যাহাদের ভূমির সহিত সম্পর্ক নাই—প্রকৃত উৎপাদক যাহারা নহে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু সে মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু নহে—ধনীপ্রবাহে তাহাদের ধন-সর্ব্বস্ব সৃষ্টিত হইবে—সোনা যাহা ছিল তাহা বিক্রয় হইল—আর যেটুকু থাকিবে তাহা কিনিবার লোকও থাকিবে না। তাই জনসাধারণ চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছে আর ভাবিতেছে কাঁদিব কার কাছে।

(বরিশাল-হিতৈষী)

রাস্তার অসুবিধা

লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত ১২নং লাহারকান্দি ইউনিয়ন বোর্ডের আটিয়াতলী মৌজার আনুমানিক ১ মাইল পূর্ব্ব-দিকে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর জহুরীন্ বাজারের উত্তর দিক হইতে লোকাল বোর্ডের একটী রাস্তা রামগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাজারের দক্ষিণ দিকে ভূলুয়া রাস্তা কিছুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। উক্ত ভূলুয়া রাস্তা

হইতে একটী অতি সংকীর্ণ রাস্তা চাঁদবালী, রামানন্দী কুতুবপুর এবং বর্ম্মপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া ভবানীগঞ্জ ষ্টীমার ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্ষাকালে উক্ত রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ভবানীগঞ্জ ষ্টীমারের অধিকাংশ যাত্রীই এই পথে যাতায়াত করে। বর্ষাকালে উক্ত যাত্রিগণের এবং স্থানীয় জনসাধারণের যে কিরূপ অসুবিধা হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারেনা। আমরা পূর্ব্বোক্ত গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ উক্ত রাস্তাটী সংস্কার করিয়া জনসাধারণের উপকার করিবার জন্য অনেকবার জিলাবোর্ড, লোক্যালবোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন পর্য্যন্ত আমাদের প্রার্থনা পূরণ করা হয় নাই। সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিলাম যে, একটী অতি প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার অনুরোধে জিলাবোর্ড হইতে ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। আমরা ইহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

পথের ধূলা

সহরের রাস্তাগুলি অত্যন্ত ধূলিময় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে রাস্তায় জল দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হইতেছে না বলিয়া আমরা অভিযোগ প্রভৃতি করিতেছি। অনুসন্ধানে আমরা জানিলাম, ১লা এপ্রিল হইতে রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সেরূপই খরচের বরাদ্দ হইয়াছে। প্রয়োজন এখন, কিন্তু বরাদ্দ মত খরচের জন্য ১লা এপ্রিলের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? তখন দুই একদিন বৃষ্টি হইলেও মিউনিসিপ্যালিটীর খরচ কম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তখনকার খরচ কি এখন করা যাইতে পারে না? এই কালপরিবর্ত্তনের সময়, ধূলাবালির চাপে পথচারী পথিকের এবং সহরবাসীর স্বাস্থ্যের যাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইতে না পারে সে ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের কি অসাধ্য?

(দেশের বাণী—নোয়াখালি)

পাট চাষীর প্রতি নিবেদন

আমাদের সমিতি হইতে গত বৎসর কৃষক ভ্রাতাগণের মধ্যে কম পাট বুনিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য প্রচার কার্য্য করিয়াছিলাম। তাহার ফলে পাটের চাষ অন্যান্য বৎসরের অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছিল। উৎপন্ন পাটের জন্য যাহাতে কৃষকগণ উপযুক্ত দর পাইতে পারে তজ্জন্য কৃষকগণকে আমরা বিজ্ঞাপন ও সংবাদের কাগজের মারফতে প্রায় প্রতি মাসেই উপদেশ দিয়াছি। এই সমিতির উপদেশ অনুযায়ী তাহারা যে অপেক্ষাকৃত লাভবান হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

এই বৎসর পাটের দর সাধারণতঃ প্রতি মণ ৪৲।৫৲ ছিল, কেবল মাত্র পূজার পরে হঠাৎ উহার দর চড়িয়া ৭৲।৮৲ টাকা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার ক্রমান্বয়ে দর কমিতে থাকে মোটামুটিভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, এ বৎসর পাটের দর গতবৎসর মণ প্রতি মাত্র ৪৷৷০ টাকা ছিল।

পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হইলেও ইহা ক্রয় করে বৈদেশিকগণ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্ণমান রহিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টও হ্রাস করিয়াছেন বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় টাকার প্রকৃত মূল্য প্রায় এক-তৃতীয় অংশ হ্রাস পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে আমেরিকাবাসী যদি এক মণ পাট এক ডলার (আমেরিকার মুদ্রা) মূল্যে ক্রয় করিতেন তাহা হইলে তখন উহার পরিবর্ত্তে আমরা প্রায় ৩৲ টাকা পাইতাম, কিন্তু আজকাল এক ডলারের পরিবর্ত্তে আমরা প্রায় ৪৲ টাকা পাইয়া থাকি। সুতরাং আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে, এ বৎসর পাটের দর বিশেষ কিছু বাড়ে নাই কেবলমাত্র স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহার দর অল্প কিছু চড়িয়াছে।

বিদেশে রপ্তানির হিসাব দৃষ্টেও বুঝা যায় যে, গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসর পাট বেশী রপ্তানি হয় নাই। আগামী বৎসর যে পাটের চাহিদা থাকিবে সে ভরসাও

নাই, কারণ পাটের প্রধান খরিদ্দার জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।

এই বৎসরের প্রথমে কলিকাতার জুট মিলগুলিতে মোট ৫২ লক্ষ গাঁইট পাট মজুদ ছিল এবং আমাদের অনুমান যে তাহারা আরও ৩৮ লক্ষ গাঁইট খরিদ করিবে। জুট মিলগুলি সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে মাত্র ৪০ ঘণ্টা হিসাবে কল চালাইতেছে এবং শতকরা ১০টি তাঁত বন্ধ রাখিয়াছে। এজন্য তাহাদের বেশী পাট আবশ্যক হইবে না। সম্ভবতঃ তাহাদের মাত্র ৩০ লক্ষ গাঁইট খরচা হইবে এবং আগামী বৎসরের জন্য ৫০ লক্ষ গাঁইট মজুদ থাকিবে। ইহা ব্যতীত বিদেশী বেপারীর হাতে প্রায় ১০ লক্ষ গাঁইট মজুদ থাকিয়া যাইবে।

দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার সময় আমাদের কৃষকগণ যাহাতে বাঁচিতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন বাঙ্গালীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি এই নিবেদনের প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহারা কৃষক ভ্রাতাগণকে ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক
বঙ্গীয় পাট-চাষী-সমিতি
১৬৭নং কার্ণিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গলার কৃষক ও পাটের চাষ

"পাট চাষীর প্রতি নিবেদন" শীর্ষক একখানি পত্র প্রকাশিত হইল—আমরা ঐ পত্রখানির প্রতি বাঙ্গলার, বিশেষভাবে রঙ্গপুরের পাটচাষী কৃষক ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অনেক দিন পূর্ব্বে যখন দুর্দ্দিনের কালিমা রেখা বাঙ্গলার আপামর সাধারণের মুখমণ্ডল বিষাদাচ্ছন্ন করে নাই, তখন আমরা "কৃষকের দুর্দ্দিন" "পাট পাট" প্রমুখ আলোচনার মধ্য দিয়া রঙ্গপুরের কৃষক মণ্ডলীকে যে সতর্ক বাণী শুনাইয়াছিলাম, উহার অবহেলার ফলে রঙ্গপুরের পাটচাষী কৃষকগণকে বিধাতার অভিশাপ বহন করিতে হইতেছে। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, বাঙ্গালার কৃষকের পাট-চাষের দ্বারা—পশ্চিমা প্রবাসী ও মাড়োয়ারী পাটের দালাল ও মহাজনগণই বিশেষভাবে লাভবান হইয়াছে—আর দরিদ্র কৃষক স্বকীয় অমিতব্যয়িতার ফলে বৈদেশিক বণিকের অনাবশ্যক বিলাসসম্ভার ও পণ্য ক্রয় করিয়া—সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার ও অনুষ্ঠানে অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং অতীতের সরল শান্ত জীবন-যাপন প্রণালী হারাইয়াছে। বাঙ্গলার কৃষকের একদিন সমস্তই ছিল—অতিরিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা ও বৈদেশিক চাকচিক্যের মোহে সে আজ সমস্তই হারাইয়াছে। পাটের চাষের আদৌ প্রয়োজন নাই আমরা এমন কথা বলিতে চাই না —বৈদেশিকের চাহিদা বুঝিয়া অনুপযোগিত ভূমিতে প্রয়োজন মত পাট চাষ করিয়া যাহাতে ঐ পাট অধিক মূল্যে বিক্রী হয় তৎপ্রতি বাঙ্গালার কৃষকের অবহিত থাকা প্রয়োজন। যাহাতে স্বার্থপর বণিক্, ফড়িয়া, মহাজন প্রভৃতির প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালার কৃষক আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রতি জেলায় এক একটী স্থায়ী কেন্দ্র সমিতি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা পাটচাষী সমিতির একটী শাখা রঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি সম্পাদক মহাশয় এই জেলার শক্তিশালী কৃষকবন্ধু জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষকগণের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার উপযোগী একটী স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবেন।

(রঙ্গপুর-দর্পণ)

পাটের চাষ

আজ ইয়োরোপীয় সমাজ পাটের চাষ হ্রাস করিবার জন্য খুব উৎসাহ দিতেছে। কংগ্রেস যখন এই প্রচেষ্টা করিতেছিল তখন তাহারা দেশের শত্রু আখ্যা প্রাপ্ত হইত। তখন বাহাদুরী লইত কংগ্রেস। আজকাল লয় সরকার। তাহাদের প্রচারের ফলে চাষ হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু বাহাদুরী হইল মন্দা বাজারের। বাজার মন্দায় পাটচাষীর অদৃষ্ট মন্দ হইয়াছে, কাজেই তাহারা আজ বুদ্ধিমান হইয়াছে। তাহারা "শাঁকের নীচ দিয়াই" চলিতে আরম্ভ

করিয়াছে। কিন্তু আজ যাহারা উড়ো জাহাজে চড়িয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতেছে তাহাদের উদ্দেশ্য সহজে বুঝা যায় না। ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে অঙ্কগুলি তোলা হইয়াছে তাহা পাঠে মনে হয় পাটকলের মালিকগণের হাতে যে মাল মজুত আছে, তাহা উচ্চদরে বিক্রয় করাইতে হইলে পাট চাষ কম হওয়া উচিত। ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন পাটকলের মালিকগণ একটী এসোসিয়েশান করিয়া বেশ সুবিধা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল কলওয়ালা তাহাতে যোগ দেন নাই—যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের কেহ কেহ সরিয়া পড়িতেছেন। ফলে যাহারা এসোসিয়েশানের মেম্বর নহেন তাঁহারাই লাভবান হইতেছেন এবং ষ্টেটস্‌ম্যানের মতে বাজার নষ্ট করিতেছেন। এখন যদি এদেশী কেহ কল করেন তাহা হইলে লাভবান হইতে পারেন। অতএব নূতন পাটের বিক্রয় অসম্ভব। আমরা কোনও দিন অতিরিক্ত পাট চাষের পক্ষপাতী নই। আবার যাহারা পাট চাষের সার রসটুকু শোষণ করিতেছেন তাহাদের পরামর্শ শুনিতেও পরামর্শ দিতে পারি না। পাট চাষ অবশ্য করিতে হইবে তবে সংযম রক্ষা করিয়া।

(বরিশাল-হিতৈষী)

টেক্‌নিক্যাল স্কুল

গত ৮ই মার্চ মঙ্গলবার বৈকালে পশু-চিকিৎসালয়ের সম্মুখস্থ টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রাঙ্গণে জেলাবাসীর একটী সাধারণ সভা হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে, এন, তালুকদার, আই-সি-এস মহোদয়। সভার উদ্দেশ্য, জেলায় একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব জেলাবাসীর দ্বারা সমর্থিত করা। জেলায় টেক্‌নিক্যাল স্কুলের প্রয়োজন সকলেই মনে করে। বাংলা দেশের মধ্যে শিক্ষায় মালদহ অত্যন্ত পিছনে। বাংলা দেশের সকল জেলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ আছে, নাই কেবল রাজসাহী বিভাগের কয়েকটী জেলায়। তাহাদের মধ্যে মালদহে স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও আশাপ্রদ নহে। সমগ্র জেলা হইতে বহুর বহুর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়—১২৭, ১২৪, ১২০ জন। ইহা কম লজ্জার কথা নহে। কিন্তু বলিলেই বা কি হইবে? সকল স্থানেই রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিরা নিজ কীর্ত্তি বা পিতৃপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিংবা সাধারণের দুঃখ বুঝিয়া—যে কারণেই হউক না কেন, উচ্চ শিক্ষায়তন খুলিয়াছেন এবং খুলিবার সাহায্য করিয়াছেন। এ জেলায় রাজা মহারাজা বড় জমিদার নাই এমন নহে। আশা করা যায় এই টেক্‌নিক্যাল স্কুল অর্থের অভাবে নষ্ট হইবে না। জেলায় অনেক কিছু হইবার কথা শুনা গিয়াছে—টেক্‌নিক্যাল স্কুল, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শুধুই শুনাই থাকিয়া গিয়াছে—বাস্তবের পরশ পায় নাই একটীও। বিশেষ করিয়া এই স্কুল বেকার-সমস্যার অনেকখানি সমাধান করিবে, বর্ত্তমান চাকরীর দুর্দ্দিনে নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিবার পথ ছাত্রদিগকে বাৎলাইয়া দিবে। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করিয়া সকলে কিছু বিদেশে গিয়া এ সব শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। নিজ জেলায় কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল, বা টেক্‌নিক্যাল স্কুল থাকিলে সুবিধা এই যে, অল্প খরচে জেলাবাসী শিক্ষালাভ করিতে পারে।

(মালদহ—সমাচার)

সহরে ধূলা

প্রকাশ, মকছুমপুরের অধিবাসিগণ নাকি বলিয়াছেন—"আমরা আর ধূলা সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইহার যথোচিত ব্যবস্থা হউক"। আর বলিবেই বা না কেন? সহিবার সীমাও একটা আছে? রাস্তায় এই ধূলা, তাহার উপর বিরাটকায় বাস চলাচল। মাসিক পত্রিকাদিতে যেরূপ "বন্যা ও প্রতীকার" প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই কি? প্রবন্ধে রাস্তার ধূলা অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আজ মকছুমপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে জানাইয়াছে—কাল হাটখোলা অঞ্চল জানাইবে—পরশু হাজুরাইপট্টি অঞ্চল জানাইবে—মহাশয় ধূলার অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না।

আমরাও প্রতি সংখ্যায় এই বিষয় বলিয়া ক্লান্ত—আর কিই বা বলা যায়? এত বড় সহরে ভিস্তি দিয়া জল দেওয়া সম্ভব নহে। পুনরায় জল দেওয়া গাড়ীর ব্যবস্থাও

তখন—সহরবাসীও বাঁচে আর মিউনিসিপালিটীরও লাভ হয়। (মাদরদল—সমাচার)

মেদিনীপুর গো-প্রদর্শনী

মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়গণের যত্নে ও উদ্যমে মেদিনীপুর জেলাবোর্ড প্রাঙ্গণে একটী গো-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই জেলায় এই প্রকার গো-প্রদর্শনী এই প্রথম। প্রদর্শনীতে কতক-গুলি উৎকৃষ্ট গাভী ও বাছুর প্রদর্শিত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা হইয়া উৎকৃষ্ট গাভী ও বাছুরের অধিকারিগণের মধ্যে দশটী প্রশংসাপত্রসহ ৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার এবং ১৯টী প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অনেক জনসমাগম হইয়াছিল। পশু-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সেন এবং কৃষি অফিসার শ্রীযুক্ত হিরণকুমার বণিক মহাশয়-দ্বয় প্রদর্শিত গাভী ও বাছুরের গুণ নির্ণয় বিষয়ে সভাপতি মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন। জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ দূরদেশ হইতে উৎকৃষ্ট বৃষ আনাইয়া জেলাবোর্ডের ষাঁড়ে উহা জেলার বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণের যেরূপ উপকার করিতেছেন, এই প্রকার প্রদর্শনীর দ্বারাও জেলাবাসীকে গো-পালনের উৎকর্ষতা বিধানকল্পে উদ্দীপিত করা জেলাবোর্ডের পক্ষে প্রশংসনীয় কার্য্য হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম, জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ গো-পালনের উৎকর্ষ বিধান ও উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রতি বৎসর এই প্রকার গো-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

বাজার দর

ধান চাউলের মূল্য সর্ব্বত্রই খুব সস্তা রহিয়াছে। মেদিনীপুরে ধানের মণ ৸৵০ আনা হইতে ১৵০ আনা। চাউল প্রতি মণ ১৸৵০ আনা হইতে ২।০ আনা। বেগুনের সের ৲১০ আনা। গোল আলুর মণ ২।০ টাকা। তমলুকে মোটা ধান ১৲ টাকা এবং সরু ধান ১।০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। বেগুনের সের ৲১৫ পয়সা। কাঁথিতে ধানের মণ ১৵০ আনা হইতে ১।০ আনা। চাউল সহরে টাকায় ১৮।১৯ সের। কিন্তু মফঃস্বলে টাকায় ২৩।২৪ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। বেগুনের সের ৲১০—৲১৫ পয়সা। পটাশপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তথায় ধানের মণ ৸০ আনা হইতে ৸৵০ আনা। চাউল টাকায় ২৫ সের। মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থা। অর্থসঙ্কটের জন্য লোকের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মহাজনের ঋণ শোধ, রাজস্ব প্রদান এবং সংসার পরিচালন জন্য অর্থা-ভাবে লোকে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে।

(সাহার—কাঁথি)

গঙ্গাধর মেলা

মুগবেড়িয়া কৃষি শিল্প প্রদর্শনী

মুগবেড়িয়ার স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় রায় সাহেব গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে গঙ্গাধর মেমোরিয়াল কমিটীর উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগামী ১০ই চৈত্র (২৩শে মার্চ্চ) বুধবার হইতে অন্যূন সপ্তাহ-কালব্যাপী কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য ও নানাবিধ জনশিক্ষামূলক বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে। উক্ত মেলায় দেশের কৃষকগণকে তাঁহাদের কৃষিজাত নানাপ্রকারের শস্য, ফলমূল, দুগ্ধ, বীজ ইত্যাদি ও শিল্পিগণকে স্বদেশজাত শিল্প দ্রব্য রেশম, পশম, তুলা, পাটের সুতার তৈয়ারী জিনিষ সোনা, রূপা, লোহা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য শাঁখ, শিং ও হাতীর দাঁতের কাজ, বাঁশ, বেত ও কাঠের কাজ, মাদুর, মাটী ও চামড়া ইত্যাদির কাজ, জরী, বুটী তোলা প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূচের কাজ, সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি সহ উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

যে সমস্ত দোকানদার প্রদর্শনী ক্ষেত্রে দোকান দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রদর্শনীর অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে মেলা কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে জনশিক্ষামূলক কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্য, সমবায় গো-পালন, শিশু মঙ্গল প্রভৃতি নানা বিষয় চলচ্চিত্র,

হাওয়াচিত্র ও বক্তৃতার দ্বারা আলোচিত হইবে এবং সর্ব-সাধারণের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ভাগবত পাঠ, কথকতা ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, স্বদেশী যাত্রা এবং যাদুর কৌশল ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে হলকর্ষণ, চরকায় সূতা কাটা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতির প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিযোগিগণ ইং ১৫ই মার্চের মধ্যে স্ব স্ব নাম ধাম ও প্রতিযোগিতার বিষয় সেবা কমিটীর কার্য্যালয়ে জানাইবেন এবং এতৎ-সম্পর্কীয় নিয়মাবলী অবগত হইবেন। প্রদর্শক ও প্রতি-যোগিগণকে যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

(নীহার—কাঁথি)

অর্থাভাব

এবার ধানের বাজার মন্দা পড়ায় লোকের নানা প্রকার আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাবে লোকে খাজানা দিতে পারিতেছে না। ইউনিয়ন ট্যাক্সও সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় না। বাস্তবিক তাহারা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য জিনিষপত্রের দর নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য সকলের দর নাই বলিলেই হয়। ধান ১৸০, ১৷৵০ মণ, চাউল ২।০, ২।৵০ মণ, আলু ১৲ ১।০ মণ খেঁসারী ১।০, ১৷০ মণ বিক্রয় হইতেছে। গুড় প্রভৃতি অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যও যথেষ্ট সুবিধা। এইরূপ দরে বিক্রয় করিয়া তাহারাই বা যাইবে কি, ধণ ও খাজানাই বা শোধ দিবে কি করিয়া? এই দারুণ অর্থসঙ্কটে উপায়ই বা কি?

(কাশীবাসব—মুর্শিদাবাদ)

বঙ্গদেশে জুতার কারখানা প্রতিষ্ঠা

মিঃ টমাস বাটা চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী। তাঁহার জুতার কারবার পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি বহুল অর্থের অধিকারী। তাঁহার কারবার পৃথিবীর অনেক দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন, কলিকাতা সহর হইতে অদূরে কোন স্থানে তিনি এক বিরাট জুতার কারবার করিবেন এবং খুব সস্তা দরে জুতা বিক্রয় করিবেন।

প্রস্তাবিত কারখানার মূলধন তিনিই দিবেন। তবে শ্রমিক এবং কাঁচা মাল (প্রধানতঃ জুতার তলার জন্য রবার এবং উপরের জন্য কেনিস) এদেশ হইতেই গ্রহণ করা হইবে।

ভারতবর্ষে কলকারখানা অনেক হইয়াছে। তথাপি আরও অনেক কলকারখানা স্থাপন করিবার সুবিধা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাহার প্রয়োজন যেরূপ মনে করেন, আমাদের দেশবাসীরা তেমন করেন না।

মিঃ টমাস বাটা দেখিয়াছেন ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ। এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫ কোটি। এই সমস্ত লোকের মধ্যে ৩০ কোটিই কোন প্রকার পাদুকা ব্যবহার করে না। ইহাদিগকে যদি জুতা পরিতে অভ্যস্ত করা যায় তাহা হইলে এদেশে অনেক জুতার কারখানা হইবে। কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া মিঃ বাটার মনে হইল যে, ভারতের অধিবাসীরা দরিদ্র। তাহারা বেশী খরচ করিতে পারে না। তবে অল্প মূল্যে জিনিষ পাইলে তাহা ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইবে। এই সম্পর্কে জাপানী জুতার কারবারের হিসাব তিনি সংগ্রহ করেন। ভারতে এখন যে সমস্ত সস্তা জুতা বিক্রয় হয় তৎসমস্তই জাপান হইতে আমদানি হইয়া থাকে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানী জুতার কাটতি কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে:

১৯২৬-২৭	১৯১৫০০০ জুতা
১৯২৭-২৮	২৭৭১০০০
১৯২৮-২৯	৩৪২০০০০
১৯২৯-৩০	৬৭৬১০০০
১৯৩০-৩১	১০৯২১০০০

জাপানী জুতা ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, সস্তায় পাইলে ভারতবাসী জুতা ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইবে।

অতঃপর কি করিয়া জাপানের অপেক্ষাও সস্তায় জুতা বিক্রয় করা যাইতে পারে?

বিদেশ হইতে জুতা লইয়া আসিতে হইলে যেন টীয়ারের তাড়া লাগিবে। তাহা বাঁচাইতে হইলে এদেশেই জুতা তৈরী করা দরকার। যত বেশী পরিমাণ তৈরী করা হইবে ততই ব্যয় কম পড়িবে। সুতরাং বিরাট কারখানা করা দরকার। এদেশে মজুরের অভাব নাই, মজুরীও খুব কম। অধিকন্তু কাঁচা মাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়াই মিঃ বাটা বঙ্গদেশে বিরাট জুতার কারখানা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাংলার বাজেট

আয়

	১৯৩০—৩১	১৯৩১—৩২ পরিবর্ত্তিত আনুমানিক বাজেট	উক্ত দুই সনের আয়ের পার্থক্য
ভূসম্পত্তির রাজস্ব		৩,১০,২৪,০০০৲	+১,৩১,০০০৲
আবগারী বিভাগ		১,৫৮,০০,০০০৲	−২২,১১,০০০৲
ষ্ট্যাম্প		২,৭৬,০০,০০০৲	−৩৬,৬৪,০০০৲
বন বিভাগ		১৬,২৪,০০০৲	−৬,৮৭,০০০৲
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ		১৯,০০,০০০৲	−৪,৭২,০০০৲
তপশীলভুক্ত টাক্স		১৫,৪০,০০০৲	+৪০,০০০৲
মোট আয়		৯,০৬,৩৯,০০০৲	−৫৯,২৫,০০০৲

ব্যয়	১৯১১—৩২
প্রস্তাবিত ব্যয়	
রাজস্ব বিভাগ	১১,১০,৮৯,০০০৲
তন্মধ্যে—জেল, পুলিস, সিভিল ওয়ার্কস্ ও বিবিধ	২১,৫৪,০০০৲
বন্যা প্রপীড়িত ও দরিদ্রের সাহায্যার্থে	২,২০,০০০৲
প্রধান প্রধান হেডে	৭৭,৩৯,০০০৲

মিঃ বার বলেন, বর্ত্তমান বৎসরে মোট ঘাটতি ২,১০,৯৪,০০০৲ টাকার কম হইবে না। এতদ্ব্যতীত ষ্টুডিক রিলিফ ফণ্ডে ১২,০০,০০০৲ এবং রোড ফণ্ডে ৯,৪৮,০০০৲ মোট ২১,৪৮,০০০৲ আছে। এই ঘাটতি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজস্ব সম্বন্ধীয় বৎসরের শেষ দিনে ঐ ঋণ গ্রহণ করা হইবে এবং প্রতি বৎসর ১৪,৩০,০০০৲ টাকা হিসাবে ৫০ বৎসরে ঋণ শোধ করা হইবে।

১৯৩২-৩৩

আনুমানিক আয়

শতকরা ১০৲ হারে বেতন হ্রাস

হেতু সঙ্কয় ২৭,৮৮,০০০৲

(মোট ৩৬,৯৮,০০০৲, তন্মধ্যে ১৯৩১-৩২ সনের শেষ ৩ মাসে ৯,১০,০০০৲)।

যানবাহন বাবদ ভাতা ইত্যাদি হ্রাস

হেতু-সঙ্কয় (আনুমানিক)

আনুষাঙ্গিক ব্যয়	
পুলিশ, জেল, সিভিল ওয়ার্কস্ এবং বিবিধ কারণে ব্যয়	৩৩,১৭,০০০৲
২ বৎসরে সেন্ট্রাল রোড ফণ্ডের হিসাব পাওনা	
৩১শে মার্চ্চ যে ঋণ করা হইবে তাহার সুদ	১৩,৭০,০০০৲
প্রথম প্রথম হেডে খরচ	৬০,৫৪,০০০৲

বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে ২৯,২০,০০০৲, তন্মধ্যে পুলিশ, জেল ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় হইবে ১১,৬৩,০০০৲। বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও আগামী বৎসরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া অনুমান ১ লক্ষ টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইয়াছে। ঋণ এবং অগ্রীম দেওয়ার জন্য সামান্য টাকা মাত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে। ডাক্তার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন লাহেরকে তাঁহার উপনিবেশ সংস্থাপন পরিকল্পনা পরিচালন জন্য ১,০০,০০০৲ টাকা ঋণের বরাদ্দ মধ্যে ধরা হইয়াছে

যেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী বর্ষে ১,৬৩,২৯০০০৲ টাকা ঘাটতি পড়িবে। যদি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইয়া গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যয়ভার কমিয়া যায় তাহা হইলে এত বেশী ঘাটতি নাও হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা কম হউক বেশী হউক একটা ভারি রকমের ঘাটতি হওয়া অনিবার্য্য, এবং যদি আনুষাঙ্গিক সংখ্যাগুলি মোটামুটি ঠিক হয় তাহা হইলে বাংলাকে ১৯৩৩-৩৪ সন হইতে ১৪,৩৩,০০০৲ টাকা ত দিতে হইবেই অধিকন্তু ১১,০৯,০০০৲ বেশী ঋণ শোধ করিতে হইবে। রেডারেল ফাইনান্স কমিটি যদি 'মেইন মীমাংসার' অন্যায় ব্যবস্থা রদের সুপারিশ না করেন তাহা হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নাই এরূপ মিঃ রায় আশঙ্কা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের আয়ব্যয়

সচিব মাননীয় মিঃ মায় বঙ্গীয় সরকারের আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন। আয়-ব্যয় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে, সেই বৎসরে মোট দুই কোটী টাকা আয় হ্রাস হইয়াছে এবং আগামী ১৯৩২-৩৩ সনে মোট ১ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হইবে। শুধু ইহাই নহে, রাজস্ব সচিব বলিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে ১ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকার অধিকও আয় হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোনও আশা দেখা যাইতেছে না।

বাজেটে দেখা যায়, সরকারের আয় ১৯৩১-৩২ সনে ২ কোটিরও অধিক টাকা কম হইয়াছে। আগামী বর্ষেও ব্যয় অপেক্ষা আয় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা কম হইবে। বাঙ্গালা সরকার যে জন্য ভারত সরকারের নিকট দুই কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন ও সেই টাকা ৫০ বৎসরে শোধ দিবেন। এই ঋণ গ্রহণের ফলে আগামী বৎসর হইতে ১৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা এবং তাহার পর বৎসর হইতে ১১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ঋণ শোধের বাবদ প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টকে যোগাইতে হইবে। ইহা বড়ই বিষম কথা। তবে ভবিষ্যতে যেষ্টন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গালা সরকারের আয় বাড়িয়া যাইবে ও সরকারকে ব্যয়ের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।

১৯৩১-৩২ সনের শেষে বাঙ্গালা সরকারের ২ কোটী ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ঋণ হইবে। ভূমিক সাহায্য তাণ্ডারের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ও পথ নির্ম্মাণের জন্য ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ঋণ ঐ হিসাবে ধরা হইয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সনে মোট আয় হইবে ৯ কোটী ৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ও ব্যয় হইবে মোট ১১ কোটী ১২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন শতকরা ১০ টাকা কমাইয়া ১৯৩১-৩২ সনের শেষ তিন মাসে ৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং ১৯৩২-৩৩ সনে ৩০ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যয় কম হইবে। গত দুই বৎসরের হিসাব দেখিলে বুঝা যায় এবার ভূমিরাজস্ব ১৪ লক্ষ টাকা, আবগারীর

আয় ৬৮ লক্ষ টাকা, ষ্ট্যাম্পের আয় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, বন বিভাগের আয় ১৪ লক্ষ টাকা ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় ১৩ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

ব্যবসার বাজার মন্দা হওয়ায় পাট কলের বহু শ্রমিক বাঙ্গালা হইতে চলিয়া গিয়াছে—তাহার উপর নানাস্থানে বন্যায় বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সকলের ফলে ১৯৩১-৩২ সনে আবগারীর আয় ৪৯ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কাঠের বাজার মন্দা হওয়ায় বন বিভাগের আয় খুব কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সনে বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলির দান কমাইয়া দেওয়া হইবে। এসিয়াটিক সোসাইটি বৎসরে ১৪ হাজার ৬ শত টাকা পাইত। এবার ১১ হাজার ৬ শত ৮০৲ টাকা পাইবে। নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সার ডেনিয়েল হ্যামিলটনকে এক লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে।

রাজস্ব সচিব বাজেট বর্ণনাকালে স্বয়ংই উহা নৈরাশ্যজনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিপ্লব আন্দোলন এবং ইহার আনুসঙ্গিক আন্দোলন দমন জন্য সরকারকে অতিরিক্ত খরচ করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বন্যায় বিপন্ন এবং দরিদ্র লোকের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে। ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা নিতান্ত খারাপ হওয়ায় আয় কম হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি হইলে এবং ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা শান্তভাব ধারণ করিলে ঘাটতির পরিমাণ অনেকটা কমিয়া যাইবে, এদিকে মেটনী ব্যবস্থায় বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহা বন্ধ হইলে বাংলার অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে। এবারকার বাজেটে নূতন কোন ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব হয় নাই। সরকার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন সত্য কিন্তু দেশের অবস্থানুযায়ী আরও ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভবপর কিনা সেদিকেও সতত লক্ষ্য রাখা উচিত।

বাংলা সরকারের ২ কোটি টাকা ঘাটতি

১৯৩১-৩২ সনে বাংলা সরকারের ২ কোটি ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে অনুমান করা হইয়াছে। উক্ত ২ কোটি টাকার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষ-নিবারণী কার্য্যের জন্য এবং ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা রাস্তার জন্য খরচ হইয়াছে।

এই ঘাটতিটা মেটানো হইবে কিরূপে? এই আর্থিক বছরের শেষের দিকে, অর্থাৎ আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বাংলা সরকার ভারত সরকারের কাছে ঐ টাকা ধার লইবেন এবং তাহা ৫০ বছরে শোধ করিবেন এই বন্দোবস্ত হইবে।

১৯৩২-৩৩ সনের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে? অনুমান করা হইয়াছে যে, ঐ সনে আয় হইবে ৯ কোটি ৪৯ লাখ ৮৪ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ১১ কোটি ১২ লাখ ২৮ হাজার টাকা; অর্থাৎ আগামী আর্থিক বছরেও আয়ের চেয়ে ব্যয় ১½ কোটি টাকারও উপর বেশী হইবে।

সরকারী চাকরেদের মাহিনা হইতে শতকরা ১০ হারে কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে কত টাকা বাঁচিয়াছে? মাহিনা কাটার ফলে ১৯৩১-৩২ সনে বাঁচিবে ৯ লাখ ১০ হাজার টাকা এবং আগামী সনে বাঁচিবে প্রায় ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার টাকা।

ভারতের আমদানি রপ্তানি

১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আমদানি রপ্তানির হিসাব নিম্নরূপ :—

	১৯৩১-৩২	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
কাঁচা মাল রপ্তানি	৬৬·৯৮	১০১·২৫	১৫৬·৪৪
শিল্প দ্রব্য	৪৪·৫৬	৫৯·৫৭	৮৬·৮০
খাদ্য, পানীয়, তামাক রপ্তানি	৪৪·৩৪	৫৯·৩৭	৬৭·৫৭
পুনঃ রপ্তানি	৪·৬৬	৫·১৪	৭·১৩
মোট রপ্তানি	১৬০·৫৪	২২৫·৬৪	৩১৭·৯৩
আমদানি	১২৫·৬১	১৬৩·৬১	২০৮·২৫
আমদানি হইতে রপ্তানি বেশী	+৩৪·৮৬	+৬২·০৩	+৭৮·৯৮
সোনা আমদানি	২·৮০	১৩·২৫	১৪·২৩
সোনা রপ্তানি	৬০·৭৭	·৪৯	
রূপা আমদানি	৪·৪২	১৩·৪৬	১৩·৩৬
রূপা রপ্তানি	১·৮০	১·৮১	১·৪৭
সোনা রূপার বাণিজ্যিক জের	+৫৫·৬৪	−২৪·৪৩	−১৮·২০
মোট যুক্ত বাণিজ্যিক জের	+৯০·৫০	+৩৭·৮০	+৫২·৭৮
গবর্ণমেণ্ট পাঠাইয়াছে ষ্টার্লিং ক্রয়	৪০,০৪৯,০০০ পা	৪,৩৯৫,০০০ পা	১৫,২০৫,০০
কাগজী লিরা রিজার্ভ সাহায্যে প্রেরণ	৯,০০০,০০০ পা	৮,১২৭,৮২৬ পা	১১,৮২৪,৬৭০
মোট প্রেরিত	৪৯,০৪৯,০০০ পা	১৪,১২২,৮২৬ পা	২৭,০৩৯,৬০৭ পা

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, আমদানি ও রপ্তানি ১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। রপ্তানিতে দেড় শত কোটির উপর ও আমদানিতে সওয়া শ কোটির উপর টাকা হ্রাস পাইয়াছে। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সোনার দাম পড়িয়া যাওয়ার পর আমরা এ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ কোটি টাকা মূল্যের সোনা পাঠাইয়াছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কত টাকার মাল ভারতের বাজারে বেচিতে সমর্থ হইয়াছে তার তালিকা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

	১৯৩১-৩২		১৯৩০-৩১	
	কোটি টাকা	%	কোটি টাকা	%
যুক্তরাজ্য	৪৪·৭৬	৩৫·৪০	৬১·২৯	৩৭·১৮
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১১·৮৬	৯·৪০	১৪·৭০	৮·৯৪
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১২·৮৫	১০·২০	১৫·১৫	৯·১৯
জাপান	১৩·৩৪	১০·৫৮	১৪·৫১	৮·৮০
জার্ম্মানি	১০·২১	৮·০৯	১২·৩৮	৭·৫১
ইতালি	৪·৮৫	৩·৮৪	১০·৩৪	৬·২৭
বেলজিয়াম	৩·০২	২·৪০	৪·৬৭	২·৮৩
ইতালি	৩·৬১	২·৮৬	৪·৫১	২·৭৪
অন্যান্য দেশ	২১·৮৪	১৭·৩৩	২৭·২৪	১৬·৫৪
	১২৬·৩৪	১০০·০০	১৬৪·৮২	১০০·০০

আর ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোন্ দেশের বাজারে কত টাকার মাল বেচিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

	১৯৩১-৩২		১৯৩০-৩১	
	কোটি টাকা	%	কোটি টাকা	%
যুক্তরাজ্য	৪৩·৪৬	২৭·৮৯	৫১·৭৭	২৬·৪৮
বৃটিশ সাম্রাজ্য	২৫·২৬	১৬·২১	৩৪·৩৫	১৫·৫৮
যুক্তরাষ্ট্র	১৩·৮৭	৮·৯০	২০·৮৫	৯·৫৭
জাপান	১৩·৯৫	৮·৯৫	২৩·৭৩	১৯·৭৬
জার্ম্মানি	১০·১৯	৬·৫৩	১৪·২৬	৬·৪৭
ফ্রান্স	৭·৪৮	৪·৮০	১১·০৮	৫·০২
বেলজিয়াম	৪·২৪	২·৭২	৭·৫০	৩·৪২
চীন	৭·৭৯	৪·৯৯	১৩·২১	৫·৯৯
ইতালি	৫·৪০	৩·৪৬	৭·৮৫	৩·৫৬
নেদারল্যাণ্ডস্	৪·৬৫	২·৯৮	৬·৬৭	৩·০৩
অন্যান্য	১৯·৩০	১২·৫৭	২৯·৩৯	১৩·৩০
	১৫৫·৪৯	১০০·০০	২২০·৪৯	১০০·০০

ইয়োরো-ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যের তিনমাস

[এপ্রিল হইতে জুন—১৯৩১ সন]

১৯৩১ সনে গোটা দুনিয়া জুড়িয়া ব্যবসাবাণিজ্যের দুর্গতির আবির্ভাব হয়। এই সনের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিনমাসে বিনিময়পত্রের দাম আরও নামিয়া যায়। ভারত হইতে ইয়োরোপে প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য—পাট, তুলা, তৈলবীজ, গইল, চাউল, মসলা, চামড়া এবং শুক-সমস্ত জিনিষেরই দর নামিয়া যায়।

এপ্রিল মাসে এবং জুন মাসের প্রথম ভাগে পয়লা

নম্বরের পাটের দর ১৫ পাঃ ১০ শিঃ ০ পেঃ হইতে ১৬পাঃ ১১ শিঃ ৬ পেঃ-এ বৃদ্ধি পায়। মে মাসের শেষার্ধে এবং জুনমাসে দর ১৬ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ দাঁড়ায়। জুনের শেষে দর দাঁড়ায় ১৬ পাঃ ৭ শিঃ ৬ পেঃ। আলোচ্য তিন মাসে এবং পূর্ব্ব সনের এই কয় মাসে চাথুর্থ এবং ব্রিমেন বন্দরে পাট আমদানির পরিমাণ :—

মাস	১৯৫১	১৯৫০
	বেল	বেল
এপ্রিল	৪০,১৮৭	৪০,৪৯১
মে	৪৫,৩২৭	৬৬,৮৫০
জুন	৩২,০২৭	২১,৬০৮

১৯৩০ সনের শেষে ষ্টকের পরিমাণ ২৮,৭৯৮ বেল; ১৯২৯ সনের জুনের শেষে ৮৭,৮৭৯ বেল। থইল রপ্তানির মধ্যে তিনাবাদামের থইলের দর হ্রাস, এপ্রিল মাসে প্রতি ৫০ কিলোগ্রামে ৬'৫৫—৬'৬৪ মার্ক হইতে জুন মাসে ৫'৭০—৫'৭৫ মার্ক; মসিনার থইল ৭'৩৫ মার্ক হইতে ৬'৭০ মার্ক। তৈলবীজ এবং চিনাবাদামের দর এপ্রিল মাসে টন প্রতি ১২ পাঃ ৫ শিঃ ০ পেঃ—১১ পাঃ ১০ শিঃ ০ পেঃ হইতে জুন মাসে যথাক্রমে ১১ পাঃ ৫ শিঃ ১০ পেঃ এবং ৯৳ পাঃ দাঁড়ায়। আলোচ্য তিন মাসে ভেজিটেবল তেলের দরেও হ্রাস দেখা যায়। চিনাবাদাম তেল, মসিনার তেল এবং রেড়ীর তেলের দর হ্রাস, এপ্রিল মাসের ২৫ পাঃ ১০ শিঃ ০ পেঃ, ১৮ পাঃ ১৫ শিঃ ০ পেঃ এবং ৩৮পাঃ ১০শিঃ ০ পেঃ হইতে জুন মাসে ২৩ পাঃ ০ শিঃ ০ পেঃ, ১৯ পাঃ ১৫ শিঃ ০ পেঃ এবং ৩৬ পাঃ ১০ শিঃ ০ পেঃ।

আলোচ্য তিন মাসে চামড়া এবং হুকেরও দর হ্রাস দেখা যায়। প্রেসিডেন্ট হুভারের ঘোষণাবাণীর ফলে দর সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি পাইলেও পরে দর এমন নামিয়া যায় যে হুভারে ঘোষণাবাণীর প্রফলটুকুর অনেকগুণ কুফলের আবির্ভাব হয়।

আলোচ্য তিন মাসে সকল প্রকার চাউলেরই দর হ্রাস পাইয়াছে। বার্মা এল-আর-ও, আরাকান এবং সৌদিন চাউলের দর (শুল্ক সমেত প্রতি ৫০ কিলোগ্রাম) ১১/৩ পেঃ, ১১/৯ পেঃ, ১৮/০ পেঃ হইতে যথাক্রমে ৯/০ পেঃ, ১১/৩ পেঃ এবং ৫১/৭½ পেনিতে কমিয়া আসে। পক্ষান্তরে এই কয় মাসে পাটনাই চাউলের দরে কোনই তারতম্য দেখা যায় না। সকল সময়েই দর ২০/০ পেঃ ছিল।

ভারত হইতে মাল আমদানি

১৯৩০ সনের তুলনায় ১৯৩১ সনে জার্ম্মানিতে সকল প্রকার ভারতীয় পণ্যেরই আমদানি হ্রাস পায়। কাঁচা পাটের আমদানি কমিলেও ১৯৩০ সনের তুলনায় জার্ম্মানি অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানির যন্ত্র কলগুলির ৪০% কলে কাজ কম চলিতেছে। সেইজন্য জার্ম্মানির কাঁচা পাটের চাহিদাও কমিয়াছে। শিল্পজাত হইতে জার্ম্মানি কৃষির দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছে। বিশেষতঃ জার্ম্মানি বিদেশে কম রপ্তানির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। গম ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে চালান দিবার জন্যই জার্ম্মানি বেশী পরিমাণে চট এবং থলিয়া আমদানি করিয়াছে। কাপাসের তুলা, শণ এবং নারিকেলের দড়ি আমদানি খুব কমিয়াছে; তবে চা এবং চাউল আমদানি খুব বেশী কমে নাই; পক্ষান্তরে ভারতীয় কফি অত্যধিক পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। পশুর চামড়া আমদানি কম হইয়াছে বটে কিন্তু ছাগলের চামড়া আমদানি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। তৈলবীজ এবং থইল আমদানি কমিয়াছে। তবে সর্ষপ এবং চিনা বাদামের থইল আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষোক্ত বস্তুটীর আমদানি ১৯৩০ সনের তুলনায় তিনগুণ বাড়িয়াছে। পিগ লোহা এবং তামার ওর ছাড়া সকল প্রকার ধাতু খনিজ পদার্থের ব্যবসা একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে।

জার্ম্মানিতে চা-আমদানি

নিম্নের তালিকায় ২০ বৎসরে জার্ম্মানিতে চা আমদানির হিসাব প্রদত্ত হইল। যুদ্ধের সময়কার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই।

[ডুয়েসবি কেন্টার্স-এ হিসাব দেওয়া হইল। ১ ডি-গ্রেড্ = ১০০ কিঃ গ্রাঃ = ২২০·৫ পাউণ্ড]

সন	মোট চা-ব্যবহারের পরিমাণ	জাভা সুমাত্রা	বৃটিশ ভারত	সিংহল	চীন
১৯১১	৩৮,১২৪	৫,১৫৫	৫,১৬৭	৩,৫৪৯	১২,০০৬
১৯১২	৪১,৩৮৪	৫,৮০৪	৫,৫২২	৪,০৪৩	২৪,০০৯
১৯১৩	৪২,১০৩	৭,০২৪	৫,৯১০	৪,৫৫৬	২২,৮৮৯
১৯২০	১৭,৪৬৫	১২,০৫০	২,১০৩	১,১৬৯	১,৫৪০
১৯২১	৫৩,৭৭১	৫৬,১৯০	৫,৮০৫	৪,২৮৮	৭,০৮৩
১৯২২	২৮,০২৩	১৬,৭০২	৪,০৩৫	১,৮৯২	৫,৩০৮
১৯২৩	২৪,৭৮৩	১০,৮৮০	৩,২২০	২,২৬৭	৮,১৬৭
১৯২৪	৪০,৬১৩	১৪,৬৮৩	৭,১৭১	৫,৭৬২	১২,৮২৭
১৯২৫	৪১,৫১৮	১৬,০৪৩	৭,৮৯৬	৭,১৪৫	৯,৭৭০
১৯২৬	৪৫,৮৮৪	১৬,১৭৭	১০,৪৬০	৮,১১১	১০,৬২৩
১৯২৭	৫১,৭৫২	১৭,৭২৯	১৬,৩৪০	৯,৬৪৬	১০,২৬০
১৯২৮	৫৩,৪৫৪	১৯,৯৫১	১৩,৫৩৪	১০,২১১	৮,৯৯২
১৯২৯	৫৭,৭১০	২১,০৭৭	১৫,১১৯	১১,২২৮	৮,৯২৩
১৯৩০	৬০,৪১৭	২৩,০৪৩	১৭,৯৪৭	১১,৬২৬	৬,৮৯৩

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে, জাভা, সুমাত্রা এবং ভারতবর্ষ সমান তালে রপ্তানি বাড়াইয়া চলিয়াছে। আলোচ্য সনে অর্থনৈতিক দুর্যোগের জন্য জার্ম্মাণিতে চায়ের কাটতি কমিয়াছে। তোর পাঁচটায় চা-পানের রেওয়াজ জার্ম্মাণিতে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। তবে জার্ম্মাণিতে এখনও চা বিলাসের বস্তুরূপে পরিগণিত।

ইয়োরোপে ভারতীয় মাল রপ্তানি

আলোচ্য তিন মাসে ভারতীয় রপ্তানিকারক এবং ইয়োরোপীয় আমদানিকারকগণ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর লইয়াছেন। ভারতীয় রপ্তানিকারকগণ ইয়োরোপের আমদানিকারক হৌসগুলির সহিত পরিচয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয় আমদানিকারকগণ ভারতীয় চালানদাতাগণের একমাত্র এজেন্টরূপে পরিগণিত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় রপ্তানিকারকগণ একই অঞ্চলে অনেকের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করিয়াছে; ইয়োরোপীয় আমদানিকারকগণ কিন্তু চেষ্টা করিয়াছে অন্য ধরণের। প্রত্যেকটি ফার্ম্ম একই বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান শিপারগণের পক্ষে পূর্ব্বের ব্যবস্থাই ভাল; কারণ অনেকের কাছে বাচাই করিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাইবার সুবিধা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থার অসুবিধাও আছে ঢের। ইয়োরোপের ইম্পোর্টারগণ রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধ, এতদর্থে ইয়োরোপে গণ্ডায় গণ্ডায় ট্রেড এসোসিয়েশান আছে। যদি এই সমস্ত এসোসিয়েশানের টের পায় যে, অমুক ভারতীয় চালানদাতা বেশী দাম পাওয়ার লোভে অনবরত এধারে ওধারে কেব্‌লের খরচা করিতেছে উত্তর দেওয়ার বেলায় কেবল দেরী করিতেছে; তাহা হইলে এই চালানওয়ালাকে কেবলগ্রামের খরচা করিয়াই মরিতে হইবে। ভবিষ্যতে ইহার কেবলগ্রামে আর কেহই কর্ণপাত করিবে না। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যনির্ণয়ের সুবিধা আছে সত্য; কিন্তু ইহাতে বিপদও অনেক। লোন্ এজেন্সির ব্যবস্থায় ভারতীয় রপ্তানিকারকদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে না; ইহা সত্য বটে। কিন্তু এই ধরণের এজেন্সির ব্যবস্থার দ্বারা ভারতীয় চালানদাতা শিপার এবং ইয়োরোপীয় ইম্পোর্টারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাসের ভাব জাগিয়া উঠিয়া

শেষ পর্য্যন্ত দর-দস্তুরেরও সুরাহা হইতে পারে; ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতে পারে। এই জন্য ভারত এবং ইয়োরোপের কার্য্যগুলি দুনিয়ার সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার বেলায় সোল্ এজেন্সির ব্যবস্থারই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে।

ইয়োরোপ হইতে ভারতে মাল রপ্তানি

ইয়োরোপ এবং ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরাহা করিবার জন্য বার্ম্মাধিপ অন্তর্গত হাপুর্গ সহরে একটী ভারতীয় অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একজন ট্রেড্ কমিশনার এই অফিসের কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই অফিসের সহায়তায় ভারতীয় ব্যবসাদারদের সহিত ইয়োরোপের ম্যানুফ্যাকচারার এবং এক্সপোর্টারদের অতি সহজে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। বড় বড় মেশিন, মিল, হার্ডওয়ার, ছুরি কাঁচি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম, কাগজ, ষ্টেশনারি জিনিষ, ইলেক্‌ট্রিক এবং অটোমোবিলের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি নানা বস্তুর জন্য ভারতীয় ব্যবসাদারগণ সুযোগসুবিধাই এই অফিসে খোঁজখবর লইতেছে।

আলোচ্য তিন মাসে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ইয়োরোপ ভ্রমণকালে হাপুর্গস্থ ভারতীয় অফিসে হাজির দিয়াছেন। অফিসের সহায়তায় অনেক ব্যবসায়ী মহলের সহিত পরিচয় সৌহার্দ্দ্য ইত্যাদি করিবার অবসর পাইয়াছেন। ভারতের বাণিজ্য চেম্বারগুলিও অফিসে নোটিশ দ্বারা আপন আপন প্রতিনিধিদের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া থাকে। এই ধরণের বাণিজ্য সফরের ফলে ইয়োরোপের সহিত ভারতের নিবিড় বাণিজ্য-সম্পর্কই স্থাপিত হইবে।

ভারতে ইক্ষুর চাষ ও চিনির কারখানা

১৯২৯-৩০ সনে ভারতে বাহির হইতে দশ লক্ষ টন চিনির আমদানি হইয়াছিল। আর দেশী কারখানাসমূহে উননব্বই হাজার আট শত টন সাদা চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৎসরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টন আখের গুড় এবং বহুল পরিমাণে খেজুর গুড় ও তাল গুড়ও হইয়া থাকে। এক টন প্রায় ২৮/৯ মণের সমান ধরিয়া হিসাব করিলে এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় চৌদ্দ কোটী মণ চিনি খরচ হইয়া থাকে। ইহা হইতে চিনির চাহিদা কত বেশী তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। পাটের মূল্য হ্রাস হেতু দেশে যে অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা দূর করার অন্যতম উপায় দেশে আখের চাষ বৃদ্ধি করা এবং ভাল চিনি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করা।

নানাপ্রকারের চিনি ও গুড় প্রস্তুতের জন্য বিহারে ১৩টি, যুক্তপ্রদেশে ১৯টী, পাঞ্জাবে ৩টী মাদ্রাজে ৬টী, আর বোম্বাই প্রদেশে ২টী কারখানা আছে। বাংলাতে একটীও নাই।

দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে ও বেকার-সমস্যা দূর করিতে হইলে ইক্ষুর চাষ ও কারখানা বৃদ্ধি করা দরকার এবং বিদেশী চিনির পরিবর্ত্তে দেশী চিনি ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে আখের ও খেজুরের গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আখের চাষ আরও অনেক বেশী হইত। পাটের মোহে কৃষকগণ আখের চাষ পূর্ব্ব হইতে অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছে। লোকের বিলাসিতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাল দেশীয় চিনি পাওয়া সত্ত্বেও চক্‌চকে বিদেশী চিনি ব্যবহৃত হইতেছিল। বর্ত্তমানে সাদা চিনির দর প্রতি মণ ১২৲ টাকা, আর দেশীয় আখের চিনি ৯।৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকে দেশীয় চিনির পরিবর্ত্তে বিদেশী চিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান অর্থাভাবের চাপে জনসাধারণের এই বিষয় কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানলাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ অধুনা দেশে অনেকে সাদা চিনির পরিবর্ত্তে আখের চিনি ও গুড় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক মিষ্টান্নের দোকানেও আখের গুড় ও চিনির মিষ্টি প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি দেশের নানাস্থানে পাটের চাষ হ্রাস ও সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষ বৃদ্ধি করার

আন্দোলন করিতেছেন। দেশের কৃষকগণ আখের চাষ বৃদ্ধি করিলে এবং জনসাধারণও দেশীয় আখের গুড় চিনি ব্যবহার করিলে পাটের মূল্য হ্রাস হেতু দেশে অর্থাভাব হইয়া যে অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইতে পারে। বাংলা দেশে ধনী লোকের অভাব নাই। তাঁহাদের চেষ্টায় এই দেশে কয়েকটী চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা দ্বারা একদিকে ধনবৃদ্ধি ও অপর দিকে বেকার যুবকগণের কর্ম্মের সংস্থান হইতে পারে। আমরা এই বিষয়ে উৎসাহী যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (নয়মনসিংহ-সমাচার)

সুদূর প্রাচীতে বার্ম্মা চালের চাহিদা

সাংহাই এবং সুদূর প্রাচীর অন্যান্য স্থানে ব্রহ্মদেশীয় চালের চাহিদা বাড়িয়াছে। সাংহাইয়ের কাছকাছি যেসব স্থানে চাল উৎপন্ন হত সে সব স্থানের উৎপাদনও কমিয়া গিয়াছে শুনা যাইতেছে। এই সব কারণে ব্রহ্মদেশে চালের দর বাড়িয়া গিয়াছে। রেঙ্গুনে প্রতি ১০০ ঝুড়ি চালের দাম ১০০৲ টাকা উঠিয়াছে। আরও দাম উঠিবে এই আশায় উত্তর ব্রহ্মদেশের অনেক জায়গায় চালের রপ্তানি আপাততঃ বন্ধ করা হইয়াছে। অনেক জেলার ব্যবসায়ীরা প্রতি ১০০ ঝুড়ির জন্য ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাম আদায় করিতেছে। ১৯৩০ সন হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশীয় চালের দর এতটা উঠে নাই। এই সব খবর "ষ্টেটস্‌ম্যান" এর রেঙ্গুনস্থ সংবাদদাতা ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত পত্রিকায় পাঠাইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ের কৃষিক্ষেত্রে বিজলীর আবির্ভাব

মীরাট জেলায় মাহমুদিনপুরের একটী চুণের কারখানা ও দুইটী চাষের ক্ষেত্র ভোলায় বিজলী ঘর হইতে বিজলী লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। উহারা গভর্নমেণ্টকে বলিয়াছে যে, ঐ কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে বিজলী লইয়া যাইবার জন্য যা খরচা হইবে, গভর্মেণ্টের বার্ষিক আয় তাহার অন্ততঃ শতকরা ৭ হারে হইবে। ইহার পর, আরও কয়েকটী চাষের ক্ষেত বিজলী সরবরাহ করাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে।

ভারতীয় বাজারে ইংরেজের বাণিজ্য

শ্রীযুক্ত টি এম্ আইনস্‌কাফ ভারত ও সিংহলের বাজারে বিলাতের বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টের কয়েকটা দরকারী কথা এইখানে উল্লেখ করা যাইতেছে :—(১) ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ; (২) ভারতের আমদানি বাণিজ্যে বিলাতী মালের ভাগ শতকরা ৫০ ভাগে কমিয়া গিয়াছে—ইহার প্রধান কারণ বয়কট আন্দোলন, আর একটী কারণও আছে, সেটা এই যে, অন্যান্য বিদেশী মালের চেয়ে বিলাতী মালের দর বেশী ; (৩) কৃষিজাত মালের দর কম, তাছাড়া সাধারণ আর্থিক অবস্থার শীঘ্র উন্নতী হইবার সম্ভাবনাও কম, সুতরাং, ভবিষ্যতে বিলাতী মালের কাটতি বাড়িবার সম্ভাবনাও কম।

জাপানের জাহাজ শিল্প

গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত যে সব জাহাজ (১০০ টনের উপর) তৈয়ারী হইতেছে, তাহার একটা মোটামুটী হিসাব দেওয়া হইল :—

কারখানা	তৈয়ারী হইতেছে	
	সংখ্যা	টনেজ
ইয়োকোহামা ডক্ কোং	১	
উরাগা ডক্ কোং	১	
নাগুরা শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড	১	
কাওয়াসাকি শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড	১	
হারিমা শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড	১	
মিৎসুই শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড, তামা	৪	
উয়াজিমা শিপবিল্ডিং আসোসিয়েশন	১	
মিৎসুবিশি শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড, নাগাসাকি	৪	১৩,৪০০
মোট	১৪	৫৯,৮৭০

ভাসান হইয়াছে

ইশিকাওয়াজিমা শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড	১	
মিৎসুই শিপ্‌বিল্ডিং ইয়ার্ড, তামা	১	
উয়াজিমা শিপ্‌বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন্		
মিৎসুবিশি শিপ্‌বিল্ডিং ইয়ার্ড, নাগাসাকি	১	৩,২০০
মোট	৪	৭,৮১৮

তৈয়ারী শেষ (কমপ্লিটেড্)

ইশিকাওয়াজিমা শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড	১	
কানেশাশি শিপ্‌বিল্ডিং ইয়ার্ড		
ফুজিনাগাতা শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড		
নাগুরা শিপ্‌বিল্ডিং ইয়ার্ড		
মিৎসুই শিপ্‌বিল্ডিং ইয়ার্ড, তামা		৭,২৫১
সুমিতোমো বেদ্‌লি মাইনিং কোং		১৯৯
ওসুগা শিপ্‌বিল্ডিং ইয়ার্ড		১১৬
মোট	৭	৮, ৪৩

"জাপানের বিদ্যুৎ শিল্প"

জাপানীরা যেরূপ বিপুলভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি কাজে লাগায় অতি অল্প দেশের লোকেই সেরূপ ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গড়ে জাপানে গৃহ-পিছু ২৪টী বিদ্যুৎ-বাতি আছে ; তাহাছাড়া শিল্প ও যান-বাহনের কাজে ত ব্যবহার হইয়াই থাকে। শুধু যে বড় বড় সহরগুলিতে বিদ্যুৎ-বাতির রেওয়াজ দেখা যায় এরূপ নহে, দূর পল্লীদেশেও, এমন কি সুদূর প্রান্তের খড়ে-ছাওয়া মাটীর কুটীরগুলিতে পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-বাতি দেখা যায়। জাপানের প্রায় সমুদয় শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরকারী রেলপথের অনেক অংশ বিদ্যুৎ-চালিত ;—টোকিও হইতে ইয়োকোহামা ও ইয়োকোহামা হইতে আরো পশ্চিমে বাদ্ রেলপথ বিদ্যুৎ চালিত। বড় বড় সহরগুলিতে যাতায়াতের জন্য ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রলি ও ইলেক্‌ট্রিক্ ইন্‌টার্-বান্‌স্ আছে। জাপান সরকার অন্যান্য রেলপথও

বিদ্যুৎচালিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। জাপানীরা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসে; তাই বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাপানে প্রায় ৬০% বিদ্যুৎ শক্তি, জলশক্তির (ওয়াটার পাওয়ার) সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। আয়তনের তুলনায় জাপানে "ওয়াটার পাওয়ার রিসোর্স" যথেষ্ট আছে। ইহার হেতু এই যে, জাপান পর্ব্বতসঙ্কুল দেশ এবং জাপানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও তুষারপাত হইয়া থাকে; নদীগুলিও ক্ষুদ্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীগুলি নৌবাহ নহে বলিয়া জলশক্তি ব্যবহারে কোনরূপ বাধাগ্রস্ত হইতে হয় না। ইহা ছাড়া দ্বীপের পর্ব্বতমালার দক্ষিণ ও দক্ষিণ প্রান্তেই অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; কিন্তু জাপান মধ্যরাত্রিমুখী উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে অধিক চাষী। তাই অধিকাংশ জলশক্তির স্থান এই অংশেই। অধিকন্তু শীত কালে জাপান সমুদ্রের উপর দিয়া যে বায়ু বহিয়া আসে তাহা পশ্চিমাঞ্চলের পর্ব্বতগাত্রে তুষার স্তূপীকৃত করে। গ্রীষ্মকালে এই তুষার গলিয়া গিয়া নদীগুলির স্রোত অবিকৃত রাখে—এই হেতুও জলশক্তির কেন্দ্রভূমি হইবার পক্ষে এই অঞ্চলের সুবিধা হইয়াছে। জাপানের জলশক্তি অসীম; কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা ৮,৪১৫,০০০ অশ্বশক্তি, আবার কেহ বলেন ১৩,৬০০,০০০ অশ্বশক্তির সমান।

জাপানের বৈদ্যুতিক বাতি ও শক্তি শিল্পের (লাইট্ পাওয়ার ইণ্ডাষ্ট্রী) গোড়াপত্তন হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে; এই সময়ে ১০০,০০০ ডলার মূলধন লইয়া "টোকিও ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ কোং টোকিও সহরে ১৫টী বাতিতে আলো দান করিতে থাকে। সেই টোকিও ইলেক্‌ট্রিক লাইট কোং আজ পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ আলো ও শক্তি বিকীরণী কোম্পানী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার কিঞ্চিদ্ধিক প্রোপোরসান আজকাল ৩১০,০০০,০০০ ডলারেরও অধিক, অন্যান্য বৃহৎ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনী কোম্পানীগুলির তুলনায় ইহার বাৎসরিক উৎপাদন হেয় নহে :—

(১) টোকিও ইলেক্‌ট্রিক লাইট কোং	৩,০০০,০০০,০০০ কে, ডব্লিউ, এন,
(২) কমন্ ওয়েল্‌থ্ এডিসন কোং (শিকাগো)	৪,২০০,০০০,০০০ কে, ডব্লিউ, এন,
(৩) নিউইয়র্ক এডিসন্ কোং	৪,১০০,০০০,০০০ কে, ডব্লিউ, এন,
(৪) ডেট্রয়ট এডিসন্ কোং	২,৪০০,০০০,০০০ কে, ডব্লিউ, এন,
(৫) পাসিফিক্‌ গ্যাস আণ্ড ইলেক্‌ট্রিক কোং	২,০০০,০০০,০০০ কে, ডব্লিউ, এন,

জাপানে বিদ্যুৎ-শিল্পের মূলধনের মূল্য অধুনা ২,০০০,০০০,০০০ ডলার বলিয়া অনুমান করা হয় বিদ্যুৎ-বিকীরণী আধারের (জেনারেটিং ষ্টেশনস্) মোট শক্তি ৪,১০০,০০০ অশ্ব-বল বলিয়া অনুমিত হয়; এখানো যে সকল "পাওয়ার হাউসেস্" (শক্তি-কেন্দ্র) নির্ম্মাণ হইতেছে সেগুলির শক্তি আরও ২,৫০০,০০০ অশ্ব-বল হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। গত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পরই এই শিল্প বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে, ১৯১৯ হইতে ১৯২৮ সনের মধ্যে বিকীরণী শক্তি (জেনারেটিং কেপাসিটি) ৩৩১%, পেড্ ইন্ ক্যাপিটেলিজেসান্ ৩১৬% ও মোট ক্যাপিটেলিজেসন্ ৪৬৮% বাড়িয়াছে।

এই বিপুল বিদ্যুৎ-শিল্পের শতকরা নব্বই টাকা যোগাইয়াছে খোদ্ জাপান। তবে টোকিও ইলেক্‌ট্রিক লাইট কোং লিমিটেড, তোকো ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার কোং লিমিটেড, দাইচো ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার কোং লিঃ, উজিগোয়া ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার কোং লিঃ এবং নিপন্ ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার কোং লিঃ—এই পাঁচটী বড় বড় কোম্পানী কিছু কিছু বণ্ড বা নোট ইহু যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় করিয়াছে। এই পাঁচটী বাদে কোম্পানীর বণ্ড বা নোটের মোট পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৩৬,৪০০,০০০ ডলার। গত দেড় বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল্ ষ্ট্রীটে যে দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে সেই দুর্য্যোগ সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের বণ্ড বাজারে বৈদেশিক সিকিউরিটির মধ্যে জাপানী বৈদ্যুতিক কোম্পানীগুলির বণ্ডসমূহের দর অপেক্ষাকৃত চড়া ছিল। এই কোম্পানীগুলি নিয়মিতভাবে

মুনাফা দিয়া আসিয়াছে। টোকিও ইলেকট্রিক কোং মোড়াপত্তনের সময় হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসরই নগদ্ মুনাফা (ক্যাশ্ ডিভিডেণ্ড) বিলি করিয়া আসিয়াছে।

আমেরিকান, ইংরাজ ও সুইস্ ইঞ্জিনিয়ারগণ জাপানের কারখানাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক কল-কব্জাই বিদেশ হইতে আমদানি করা, তবে আজকাল সব রকম কলকব্জাই স্বদেশজাত বলিয়া মনে হয়।

জাপানের বিদ্যুৎ-শিল্পে নিযুক্ত কোম্পানীগুলির মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য বর্ত্তমান। একটী কোম্পানী সেই শিল্পে নিযুক্ত অপর একটী কোম্পানীর বণ্ড বা ষ্টক্ খরিদ্ করিয়া রাখে; ছোট কোম্পানীগুলি বড় বড় কোম্পানীগুলির নিকট হইতে বা একটী কোম্পানী আর একটী কোম্পানীর নিকট হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি (পাওয়ার) খরিদ্ করে; তাহা ছাড়া একই ব্যাঙ্কের কাছ হইতে দুইটী বিভিন্ন কোম্পানীকে (একই শিল্পে নিযুক্ত) টাকা লেনদেন করিতে হয় বলিয়া অথবা প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা নাই; এইরূপে বিদ্যুৎ-শিল্পে কমিউনিটি অব্ ইন্টারেষ্ট স্থাপিত হইয়াছে।

দুনিয়াব্যাপী দুর্য্যোগের ধাক্কা জাপানেও লাগিয়াছে; তাই একথা বলিতে শুনা যাইতেছে যে, বিদ্যুৎ-শক্তি বিকীরণের জন্য যত কারখানা হওয়া উচিত ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক জাপানে হইয়াছে। কিন্তু শিল্প-মুরুব্বরেরা এদিকে নজর রাখিতেছেন। দুর্য্যোগ দেখা দিলেও, এই শিল্পে এপর্য্যন্ত বেশ আয় পাওয়া গিয়াছে; বণ্ডের সুদও বেশ পাওয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে কলখানার বহর অত্যধিকরূপে না বাড়ে সেদিকে বেশ নজর রাখা হইতেছে। ডিভিডেণ্ডের হার কিঞ্চিৎ কমিয়াছে ও এবৎসর আরও কমিতে পারে—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এদিকে সতর্ক দৃষ্টি পড়িয়াছে।

জাপানে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বিদ্যুৎ বাতি ও শক্তি যোগানের হার অল্প। ১৯২১ সন হইতে ক্রমশঃ দর কমাইয়া দেওয়া হইতেছে; এই দর সরকারী অনুশাসনের অধীন। খরিদ্দারগণের আন্দোলন ও প্রতিযোগিতার ফলেই দর কমিয়াছে।

জাপানের বিদ্যুৎ-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এখনো লোক-প্রতি (পার্ ক্যাপিটা) বিদ্যুৎ-খাদনের পরিমাণ অল্প। জাপানে "পার্ ক্যাপিটা কন্জাম্পশান" বাৎসরিক ২০০ কিলো ওয়াট এইচ; সেস্থলে যুক্তরাষ্ট্রে ৬০০ কে, ডব্লিউ, এইচ্ ও নরওয়েতে ১৫০০ কে, ডব্লিউ, এইচ্; আমরা আশা করিতে পারি যে জাপানীরাও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর বিদ্যুৎ ভোগ করিবে। অধিকন্তু গৃহস্থালী ব্যতিরেকেও শিল্প-কারখানায়ও অধিকতর কাজে লাগান হইবে। জাপান প্রাচ্য দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান দেশ হইয়া উঠিতেছে; অথচ কয়লাখনি অপর্য্যাপ্ত নহে—সুতরাং বিদ্যুৎ শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাকে শিল্প-প্রধান দেশ হইয়া উঠিতে হইবে।

ইংলণ্ডের ধনদৌলত

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্করেট অনবরত কমানতে সকলেরই একটা ধারণা হ'য়ে গেছে যে, সারা দেশটা এইবার দেউলে হবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তা' মোটেই নয়। হয় তো সাময়িক দরকারে ব্যাঙ্করেট গুঠাতে বা নামাতে হয়, কিন্তু তাই বলে দেশটার সমস্ত ধনদৌলত উড়ে যেতে পারে না। ষ্টার্লিং বা পাউণ্ডের দামও এক্সচেঞ্জে কমে গিয়েছিল, সেই কারণে হয়তো অনেকেরই ইংলণ্ডের দেউলে হবার আশঙ্কা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। সেই অথবা আতঙ্কের কারণ এখন আর নাই, সেই কথা বোঝাবার জন্যই এই বিষয়ের অবতারণা করেছি।

প্রথমে বলি যে পাউণ্ডের দর এখন বাড়ের দিকেই চলেছে। খুব আধুনিক এক্সচেঞ্জ সম্বন্ধে ইন্‌ডেক্স নম্বর দেখলেই বোঝা যাবে যে, পাউণ্ডের দর কি রকম ভাবে উঠ্‌ছে।

ডিসেম্বর মাসে ইন্‌ডেক্স নম্বর ছিল	৮৯·৫২ (শতকরা)
জানুয়ারীতে	৯০·৭০
ফেব্রুয়ারীতে	৯১·১৬

ফেব্রুয়ারী মাসের সহিত জানুয়ারীর তুলনা করিলে দেখা যায় পাউণ্ডের দাম চড়িয়াছে।

তারপর ইংলণ্ডের লোকে কত টাকার ব্যাঙ্কার্স ডেভিস্

সার্টিফিকেট কিনিয়াছে তাহা দেখিলেও ধারণা হবে যে সেখানে কত টাকা জমান রহিছে। যদি টাকা না থাকে তবে আহারাদি ভরণপোষণের পর অর্থ সঞ্চয় করা কি সম্ভব? কাজেই লোকের আয় ও সঞ্চয় দেখলেও দেশের ধনদৌলত সহজে ধারণা হ'তে পারে। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯০২ সনে সপ্তাহের শেষে দেখা গিয়াছে যে ১,১৪৪,৪৩৫ টাকার সার্টিফিকেট বিক্রয় হ'য়েছে।

কাহারও মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীকে বিষয় পেতে হ'লে গভর্ণমেণ্টকে কিছু টাকা দিতে হয়। তারপর সেই উত্তরাধিকারীর নাম রেজিষ্টারী করা হয়। এই রকম নাম রেজেষ্টারী করার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তাহাকে "ডেথ ডিউটি" বলে। বিলাতে "ডেথ ডিউটী" কত টাকা উঠিয়াছে এবং পূর্ব্বের থেকে এখন বাড়ছে কি না দেখলেই বুঝা যাবে যে দেশের টাকা সঞ্চয় বা ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি কত পরিমাণে হয়েছে। এখন জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে যে, "ডেথ ডিউটী" বাড়া কমায় দেশের টাকা সঞ্চয় বা ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি কি রকম ক'রে বোঝা যাবে?

তার উত্তরে এই কথা বলবো যে "ডেথ ডিউটী" আদায় করা হয় যত টাকার বিষয় সেই বিষয়ের দামের উপর। কাজেই বিষয়ের বৃদ্ধি ও তাহার দামের সঙ্গে সঙ্গে "ডেথ ডিউটী" বেড়ে যাবে। নিম্নোক্ত তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে যে, প্রতিবৎসর লোকের ব্যক্তিগত বিষয় কত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তজ্জন্যই উত্তরাধিকারীকে নাম রেজেষ্টারী করার জন্য কতটাকা গভর্ণমেণ্টকে দিতে হয়েছে।

১৯২১-৩০	৭১,৭৭০,০০০
১৯০০-০১	৮২,৬১০,০০০
	৬৭৫,০২২,০০০

এইবার দেখুন ১৯২১।২২ সনে ৫২,১২১,০০০ পাউণ্ড ছিল আর ১৯০০-০১ ৮২,৬১০,০০০ পাউণ্ড হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশে টাকাকড়ি বিষয়াদি সাধারণের মধ্যে বেড়েই চলেছে।

শ্রীগজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়,
গবেষক, আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ-পরিষৎ

বিলাতের বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি

ডিসেম্বরের ২১শে হইতে জানুয়ারীর ২৪শে তারিখ পর্য্যন্ত বিলাতের রেজেষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে—২,১৮,৪১০ জন। অর্থমান পরিত্যক্ত হওয়ার পর প্রথম তিন মাস অর্থাৎ ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে বেকারের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল—২,২৫,০০০ জন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত এক মাসের মধ্যে যে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে এই হ্রাস প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যাই সম্পূর্ণ নহে। অনেক বেকার আছে যাহারা তাহাদের বীমার সুবিধা লুপ্ত হইয়া যাওয়ার ফলে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে পারে নাই। এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের সংখ্যাও কম নয়। অক্টোবরের শেষ হইতে বড়দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ পর্য্যন্ত শাসন ব্যাপারের পরিবর্ত্তনের জন্য ২০,০০০ বেকার নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রী করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার পরেও অনেকের এই অবস্থা হইয়াছে। কাজেই বেকার সমস্যা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিরকালই বড়দিনের পর বেকারের সংখ্যা ভয়ানক বাড়িয়া যায়। নিম্নে ১৯২২-২৩ হইতে ১৯০১-০২ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের বড়দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী সোমবার এবং জানুয়ারীর ৪র্থ সোমবারের বেকার সংখ্যা পরস্পর তুলনা করিয়া বৃদ্ধির

সংখ্যা দেওয়া গেল। ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, একমাত্র ১৯২৬-২৭ সন বাদ্দীত আর প্রত্যেক বারই বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে :—

মোট বেকার-সংখ্যা

সন	সংখ্যা বৃদ্ধি
১৯০১-৫২	২১৮,৪৯০
১৯০০-৩১	১৮৪-২৭৯
১৯২৯-৩০	১৮৭,৯৪৩
১৯২৮-২৯	৯০,৪২১
১৯২৭-২৮	৭৮,৬৯৮
১৯২৬-২৭	৭৫,০২৬
১৯২৫-২৬	৯৮,৪২৭
১৯২৪-২৫	৭১,৬৯৫
১৯২৩-২৪	১৪৬,০৫২
১৯২২-২৩	৮২,০০০

শ্রমী বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, ২১শে ডিসেম্বর হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মাত্র দুইটী প্রধান শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা—খনির বাদন পত্র এবং বুট ও সু (জুতা)। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ শিল্প ব্যবসায়েই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বাসন নির্ম্মাণ ও কন্ট্রাক্ট, কয়লার খনি, ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং তুলা, কাগজ আনা-নেওয়া।

সমস্ত বড় বড় ব্যবসা অঞ্চলেই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে দেখা যায়, লণ্ডন এবং উত্তর-পূর্ব্ব-বিভাগেই বিশেষরূপ বাড়িয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগের হিসাব দেওয়া গেল :—

বিভাগ	বৃদ্ধি
লণ্ডন	৪৭,৮২৩
দক্ষিণ-পূর্ব্ব	২৪,৫২৩
দক্ষিণ-পশ্চিম	১৭,০১২
মিড্‌ল্যাণ্ড	২৮,৯৭৩
উত্তর-পূর্ব্ব	৩৫,৪২৮
উত্তর পশ্চিম	২৮,২৯৬
স্কটল্যাণ্ড	১৫,৪২৩
ওয়েলস	২১,২১১

নারায়ণগঞ্জ স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনী

গত ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোম ও মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরী হল ও সংলগ্ন উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে এই সর্ব্বপ্রথম নারায়ণগঞ্জে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনী হইয়া গেল। সোমবার উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তথায় বাঙ্গালার সোসিয়েল সার্ভিস লীগের কর্ম্মচারিগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পাবলিসিটি অফিসার রায় বাহাদুর কে, সি রায় বক্তৃতা দেন এবং বাণী হলে প্রায় ১৫০০ লোকের সম্মুখে কলেরার প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ ও মাতৃমঙ্গল সম্পর্কে চলচ্চিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলায় আধুনিক স্বাস্থ্যনীতি ও সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা হইয়াছিল।

মঙ্গলবার দিবস ৩০০ শতাধিক ভদ্রমহিলা পর্দ্দা প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকাল ৪॥০টা পর্য্যন্ত শিশু প্রদর্শনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৪০০ চারিশতের উপর শিশুর মধ্যে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। ডাঃ বি, চক্রবর্ত্তী এবং ডাঃ মিসেস ই, প্যাটম্যান ও ডাঃ এন্ কে গুহ বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নিম্নোক্তরূপে রৌপ্য পদকসমূহ পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

৬ ছয় মাসের অনূর্দ্ধ বয়স্ক শিশু:—

১। বসরুদ্দিনের কন্যা মজেদন্।

২। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পুত্র খোকা।

৬ মাস হইতে ১৮ মাস বয়ঃপ্রাপ্ত শিশু :—

মণীন্দ্রচন্দ্র ধরের কন্যা কনিকা রে।

২। ডাঃ এম, সি, সেনের কন্যা বুলু।

১৮ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক।

কালাচাঁদ বসুর কন্যা বাসনা।

২। সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছায়ারাণী।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিশু মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ পদক মুগ্ধ নারী একটী বালিকাকে এবং নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান সাহেবের ইংরেজ শিশুদের জন্য একটী বিশেষ পদক মিঃ সি, সি, আপকারের শিশু কন্যাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

মিস্ ম্যানসন্ বহু পদক ও অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ করেন। শিশু প্রদর্শনীর পর শিশুমঙ্গল বিষয়ে রায় বাহাদুর কে, সি, রায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। এতৎসঙ্গে ভোজবাজীও দেখান হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর কার্য্যনির্ব্বাহের ভার কতিপয় ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় ভদ্রমহোদয় ও মহিলা দ্বারা গঠিত এক সুদক্ষ কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। মিসেস পি, নাগ অনারারী সেক্রেটারী এবং সাব ডিভিসাল্যাল অফিসার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত দিবসেই বহু লোকের সমাগম হইতে জন-সাধারণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক মঙ্গলের দিকে স্থানীয় লোকের বিশেষ আগ্রহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

(পক্ষান্তরে—চাকা)

উত্তর রঙ্গপুর কৃষক সম্মিলনী

বিগত ১০ই ফাল্গুন মঙ্গলবার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ধনাকুঠী মাঠে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তর রঙ্গপুর কৃষক সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন

হইয়াছে। সভায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় বারের উকিল শ্রীযুক্ত প্রকাশ নাথ মজুমদার মহাশয় সেটেলমেণ্ট ও তৎসম্পর্কে কৃষকের কর্ত্তব্য বিষয় বক্তৃতা করেন। তৎপর সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলভী শাহ আবদুল হাউফ বি, এল উকিল মহাশয় সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত কোন সরকারী কর্ম্মচারী রায়ত বা কৃষকগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার ও অবিচার করিলে তিনি কোনরূপ ফি বা পারিশ্রমিক না লইয়া উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট তদ্বিষয়ে প্রতিকার পাইবার চেষ্টা করিবেন। তিনি পাটের চাষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, আপাততঃ ২।৩ বৎসর পাটের চাষ না করাইলে চাষী প্রজাগণের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। চাষী প্রজাগণ তাঁহার সঙ্গে একমত হইয়া পাট চাষ করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে অধিদার প্রজা মহাজন সকলের একে অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের সভা

ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অধীন বিখ্যাত বসাই গ্রামে গত ১১।৩।৫২ তারিখ অপরাহ্ণে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণে বাবু আশুতোষ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বসাই ও মেঘনা ইউনিয়নের বহু গ্রামের কৃষি প্রজা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বসাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী খোন্দকার নছির উদ্দীন আহমদ সাহেব তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা চাহিদার অতিরিক্ত পাট চাষের অপকারিতা, দেশের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের কারণ, কৃষকগণের বাঁচিবার উপায় এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১ম প্রস্তাব। অতিরিক্ত পাট আবাদের ফলে উহার মূল্য যেভাবে কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে দেশের সর্ব্বত্র দারুণ অর্থাভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মৃত্যুর পথে ধাবমান। চাহিদার অতিরিক্ত পাট বুনাইলে আগামী বৎসর এই অবস্থা আরও ভীষণাকার ধারণ করিবে। বিশেষ বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া এতদঞ্চলবাসী পাটচাষী কৃষকগণ প্রতিজ্ঞা ও স্বীকার করিতেছে যে, তাহারা আগামী ১৩৬৯ সনে স্বয় আবাদী জমির ½ অংশের জমি ভিন্ন বেশী জমিতে কোন মতেই পাট বুনাইবে না।

২য় প্রস্তাব। কৃষির উপর নির্ভরকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই ভীষণ অর্থসঙ্কটে জর্জ্জরিত। ফলপক্ষে নিম্নশ্রেণীর এতদঞ্চলের কৃষি প্রজাগণ তাহাদের ঋণমুক্তির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল অতিরিক্ত সুদের চাপ ও মহাজনের তামাদি ব্যাপারে ডিক্রিজারির ফলে তাহারা ২।১ বৎসরের মধ্যেই ভূমিশূন্য হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কা বর্ত্তমান। বাংলার মাটীতে কৃষি প্রজা শ্রেণীকে মজুরে পরিণত দেখিতে অনিচ্ছুক বলিয়া এই সভা সরকার বাহাদুর সমীপে প্রার্থনা করিতেছে যে, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৯৷৵০ আনার বেশী আদায় না হইতে পারে সরকার বাহাদুর অগৌণে তাহার জন্য আইন প্রণয়ন ও বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটাবস্থা পর্য্যন্ত কর্জ্জা টাকার ডিক্রি জারি ও তন্মূলে কৃষকের ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধ থাকিবার ব্যবস্থা করুন।

৩য় প্রস্তাব। বাংলা দেশের প্রত্যেক পল্লীর কৃষক এই সভার সহিত একমত হইয়া সভার ১ম প্রস্তাবানুযায়ী পাট চাষ করিতে এবং ২য় প্রস্তাবানুযায়ী সরকার বাহাদুর সমীপে প্রার্থনা জানাইতে এই সভা দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্রের মূলসূত্র

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হাউস টেবিল কনফারেন্সের ভারতীয় প্রশ্ন কমিটীর অধিবেশনে কয়েকটী মূলসূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে ধর্ম্মবিষয়ক ক্রিয়া কাণ্ডে ও আচার ব্যবহারে সকলেরই স্বাধীনতা থাকিবে।

২। স্ব স্ব গৃহ ও সম্পত্তির উপর অধিকার ও পূর্ণ কর্তৃত্বের অঙ্গীকার দেওয়া হইবে।

৩। সকলেই স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে।

৪। ফরদী আইনের বিধান ব্যতীত অন্য সর্ত্ত বিষয়ে হেবিয়াস কর্পাস অর্থাৎ কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা বা বিনা বিচারে অবরুদ্ধ আসামীকে খালাস দিবার হুকুমনামা প্রচলিত থাকিবে।

৫। ভারত গভর্ণমেণ্ট কোন ধর্ম্মবিশেষের পোষণ-কর্ত্তা হইবেন না।

ভারতীয় প্রজা সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে কিনা; বিদেশীয়া ভারতে অবাধ বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইবে কি না, এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই।

আইনের চক্ষে ও পুরবাসীর অধিকার সম্পর্কে সকলেই সমান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলে সকলেরই পড়িবার অধিকার ও সর্ব্বত্র অবৈতনিক স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। তাহার মীমাংসা হয় নাই।

মন্ত্রণা সভার মুসলমান সভ্যগণ এই আপত্তি তুলিয়াছেন, যদি গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলে সর্ব্ব-সাধারণকে ভর্ত্তি হইবার অধিকার দেওয়া হয়, তবে মুসলমান বিদ্যালয়ে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ভর্ত্তি হইয়া মুসলমানী শিক্ষার অনিষ্ট করিতে পারে। মুসলমানগণ যে এইরূপ সঙ্কীর্ণ অনুদার মত পোষণ করেন, ইহা অবগত হইয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। গভর্ণমেণ্টের টাকায় যেসকল স্কুল চলে সেখানে সকলের ভর্ত্তি হইবার অধিকার থাকিবে, ভারতের নূতন শাসনে এইরূপ নীতিই রাখা উচিত।

ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ওয়াটসন্

কলিকাতার রোটারী ক্লাবে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে একটী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অ্যালফ্রেড্ এইচ ওয়াটসন এই উপলক্ষে একটী বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে দুইটী কথা প্রধান:—(১) ভারতের লোক-বল প্রতি বছর শতকরা ১ হারে বাড়িতেছে। এরূপভাবে যদি লোকসংখ্যা বাড়ে তাহা হইলে কৃষির উন্নতি ব্যতীত ভারতবর্ষ এই বিরাট জনবল পুষিতে পারিবে না; (২) বিশেষজ্ঞদের কাছ হইতে তিনি শুনিয়াছেন যে, এদেশে কোন বছরে সার দিয়া চাষ করিলে সেই বছর বেশ ফসল হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বছরে জমি একেবারে অনুর্ব্বর হয়, জমিকে উর্ব্বর করিতে হইলে কয়েক বছর সার দিতে হয়, অথচ সেই খরচা যোগাইবার মত পুঁজি চাষার নাই, সরকার যদি এ বিষয়ে চাষাদের সাহায্য করিবার বন্দোবস্ত করেন, তবে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়।

কাগজ-শিল্পের সংরক্ষণ—ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা

কাগজ-শিল্পের জন্য ৭ বৎসর সংরক্ষণ-শুল্ক চলিত ছিল। টারিফ বোর্ড আরও কয়েক বৎসর সংরক্ষণ-শুল্ক বাড়াইবার কথা বলিয়াছেন। সংরক্ষণ-শুল্ক থাকিবে কিনা, বা কত বৎসর থাকিবে এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তর্ক-বিতর্কই হয়। অনেকগুলি সভ্য বলেন যে, বর্ত্তমানে সংরক্ষণ-শুল্কের সুযোগ লইয়া যে সব কোম্পানী উন্নতি করিতেছে, উহারা দেশী বাঁশের মণ্ড ব্যবহার না করিয়া বিদেশী কাঠের মণ্ডের সাহায্যে তাহাদের বেশীর ভাগ কাগজ তৈয়ারী করিতেছে, ভারতীয়দের কাগজ তৈরী করিবার উপায় শিখিবার সুযোগ দিতেছে না। তাহাদের ডিরেক্টরদের মধ্যে অধিকসংখ্যক ভারতীয় লইতেছে না, ইত্যাদি।

চিনি শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ সম্প্রতি চিনি শিল্প আইন নামে একটী আইনের খসড়া আলোচনা করিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য চিনি-শিল্পকে সংরক্ষিত করা। আইনের খসড়াটী বিশদরূপে আলোচনা করিবার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদ্ একটী কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি রিপোর্ট দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাবগুলা মোটামুটি নিম্নরূপ:—

(১) মার্চ্চ, ১৯৩৬ পর্য্যন্ত যে সংরক্ষণ-শুল্ক থাকিবেই

সে সম্বন্ধে চিনি-শিল্পের লোকদের আশ্বস্ত করা ; (২) উক্ত তারিখের পর একটী অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হইবে, সেই সমিতি সংরক্ষণ-শুল্ক থাকিবে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিবেন না, তাঁহারা অনুসন্ধান করিবেন শুল্কের হার কিরূপ বাড়ানো কমানো হইবে ; (৩) শিল্পকে ঠিক ঠিক সংরক্ষিত করার জন্য শুল্কের হার যতটা বাড়ানো কমানো গভর্মেণ্ট উচিত মনে করিবেন, তাহা করিতে পারিবেন ; (৪) চাষাদের কাছ হইতে ফ্যাক্টরীওয়ালারা কি দরে আখ কেনে, সে বিষয়ে ফ্যাক্টরীওয়ালাদের ছাপানো রোটীশ বাহির করিতে হইবে ; (৫) বিদেশী আমদানি-কারকেরা যাহাতে কোনরকম মিঠাই-মণ্ডার আকারে চিনি পাঠাইয়া, সংরক্ষণ-আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না করে, এ বিষয়ে আবগারী বিভাগের লোকদের নজর রাখিতে হইবে ; (৬) যদি চিনি গবেষণার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করা হয়, শুধু সংরক্ষণ-শুল্কে কোন কাজ হইবে না। এই জন্য সরকারের উচিত এই উদ্দেশ্যে "কৃষি সভা"কে (এগ্রিকালচারাল কাউন্সিল) বেশী করিয়া টাকা দেওয়া ; অন্ততঃ একটী চিনি গবেষণা পরিষৎ খাড়া করা বিশেষ দরকার ; (৭) সংরক্ষণ-শুল্ক চলিত করিলেই উহার সুবিধা ভোগ করিবার জন্য ভারতে অভারতীয় কোম্পানী খাড়া হইতে পারে ; এবং তাহার ফলে শিল্পটী বিদেশীদের হাতে চলিয়া যাইতে পারে ; ইহা নিবারণ করিবার জন্য যা কিছু দরকার তাহা সপরিষদ্ বড়লাট করিবেন।

বিলাতে সংরক্ষণ-নীতি

বিলাত অবাধ স্বাধীনতার দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কোন শুল্ক না দিয়াই বিদেশী মাল বিলাতে ঢুকিতে পাইত। কিন্তু, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি বারোটার পর হইতে এই অবাধ স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে। পার্লামেণ্ট এক নতুন আইন পাশ করিয়াছেন—ইহার নাম "ইম্পোর্ট ডিউটিজ্ অ্যাক্ট।" এই আইন অনুসারে বিদেশী মাল শতকরা ১০ হারে শুল্ক না দিয়া বিলাতে ঢুকিতে পাইবে না। এই পথ অবলম্বন করা হইল কেন ? ইহার কারণ এই, বিলাতের আমদানি বাড়িতেছিল, রপ্তানি কমিতেছিল, সুতরাং বিদেশের কাছে বিলাতের দেনা পাওনার ভেদে বাড়িতেছিল। বিলাতের "ষ্ট্রেটি", "ইকনমিষ্ট" প্রভৃতি বিখ্যাত আর্থিক পত্র বলিতেছেন যে বিলাত সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন না করিলেই ভাল ছিল। তাঁহারা বলেন যে, সোনার সহিত পাউণ্ডের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর পাউণ্ডের দর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, এবং তার ফলেই বিদেশের বাজারে বিলাতের প্রতিযোগীদের চেয়ে বিলাত অন্ততঃ শতকরা ২৫ হারে সস্তায় মাল বেচিতে পারিতেছে, এবং বিলাতেও বিদেশী আমদানি অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং, এখন সংরক্ষণ-শুল্ক অবলম্বন না করিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু, নূতন বন্দোবস্তের সুবিধার দিকটাও দেখা দরকার। বিলাতের লোকসান বন্ধ করা দরকার, এই জন্যই এই নূতন পন্থা। কিন্তু ইহার এক মস্ত দিকও আছে। সংরক্ষণ-শুল্কের বৃদ্ধিই দুনিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন। এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সংরক্ষণ-শুল্ক অবলম্বন করার ফলে দুনিয়ার সকল দেশের মধ্যেই আমদানি কমাইবার যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহা আরও বাড়িয়া যাইবে, এবং সকল দেশই তাহার কুফল ভোগ করিবে। তবে, সংরক্ষণ শুল্ক অবলম্বন করাতে একটী সুফল দেখা দিতে পারে। সংরক্ষণ-শুল্ক-ওয়ালারা এতদিন বিলাতে খোলা বাজার পাইতেছিল, তাহাতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইতেছিল। সেই বাজার বন্ধ হওয়াতে রাজস্ব-সচিব শ্রীযুক্ত নেভিল চেম্বারলেন ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন যে, এই নূতন কর বসানোর ফলে আট-করের হার কমানো যাইতে পারে, এবং পেট্রল ও বিয়ারের (মদ) উপর যে কর আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিলাতের শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় মাল

'বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ ফেয়ার' নামে বিলাতের বিখ্যাত শিল্প-প্রদর্শনী আগামী সোমবার (২৯শে ফেব্রুয়ারী) খুলিবে। ইহার এক অংশ থাকিবে লণ্ডনে, আর এক অংশ বার্মিংহামে। লণ্ডন-বিভাগে ভারতীয় মালপত্র যেখানো

হইবে। 'এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড' ভারতীয় কৃষিজাত মাল, যেমন চাল, কফি, চা, এবং চুরুট ও সিগার দেখাইবার জন্য দোকান খুলিয়াছেন। নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য, যেমন হাতে বোনা পরদা, রাগ প্রভৃতি দেখাইবার জন্য ভারত সরকার খানিকটা জায়গা ভাড়া করিয়াছেন। বিদেশীদের ভারতভ্রমণে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ভারতীয় রেলওয়েগুলা খানিকটা জমি লইয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-বীমার প্রস্তাব

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমান বেকার সংখ্যা ৯০ লাখ। বেকার-বীমার প্রবর্ত্তনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে এক আইনের খসড়া আনা হয়। সেনেট সেই খসড়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। বিলাতে বেকার বীমার জন্য সরকার হইতে বন্দোবস্ত আছে। দেখা যাইতেছে, বেকার বীমার ব্যবস্থা মার্কিণদের জন-প্রতিনিধির অনুমোদন এখনও অর্জ্জন করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় বিশ্ব শক্তি সম্মিলনী

বার্লিন সহরে ১৮ই হইতে ২৫শে জুন (১৯৩০) পর্য্যন্ত "দ্বিতীয় বিশ্ব-শক্তি সম্মিলনীর" অধিবেশন হয়; এই সম্মিলনীতে ৩,৯০৬ জন আনুষ্ঠিত মেম্বর ও ৮০০ জন মহিলা অতিথি উপস্থিত ছিলেন; ৪৯টী বিভিন্ন দেশ হইতে ডেলিগেটস্ আসিয়াছিলেন।

টেক্‌নিক্যাল মিটিং

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩৯টী বিভিন্ন দেশ হইতে ৩১৫টী বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল; এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে ৫৯টী জোগাইয়াছিল জার্ম্মাণি, ৫৯টী যুক্তরাষ্ট্র, ৪৪টী গ্রেটবৃটেন, ৩১টী অষ্ট্রিয়া, ২৪টী রাশিয়া, ২১টী ফ্রান্স, ২০টী সুইজার্ল্যাণ্ড, ১৭টী ইটালী, ১৪টী জাপান ও বাকী অন্যান্য দেশ। এই অঙ্কগুলি দেখিয়া বেশ বোঝা যায় যে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ এ বিষয়ে কিরূপ মাথা খাটাইতেছে। এই লেখাগুলিকে ৩৪ ভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যেকটী ভাগের জন্য একটী করিয়া বিশেষ সভা হইয়াছিল। প্রত্যেক বিশেষ সভার জন্য বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতকে সভাপতি করা হইয়াছিল। সমস্ত প্রবন্ধগুলি সময় সংক্ষেপের জন্য সভায় পাঠ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া সেগুলি সঙ্কলিত করিয়া ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত করা হয়। এই সঙ্কলনে দেওয়া হইয়াছিল (১) যে সব লেখা স্থান পাইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (২) পরিপত্তির যে গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (৩) যে সব বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইবে তাহার কর্দ্দ। অধিবেশনের পূর্ব্বেই এই সঙ্কলনের সহিত সকল সভ্যের পরিচয় হওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। এই ৩৪টী বিভাগে শ্রোতার সংখ্যা ছিল ১০,০০০। কোন কোন বিশেষ বিভাগীয় সভায় ১২০০ সভাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। এই সব বিভাগীয় সভায় আলোচনা গড়ে ১২টী হয়। সকলের বুঝিবার সুবিধা দেওয়ার জন্য "ট্রান্সলার ট্রান্সমিশন" (তিন ভাষায় বক্তৃতা) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যে সময়ে বক্তা এক ভাষায় (ইংরাজী) কথা বলিতেছেন, সেই সময়ে অপর দুইজন অনুবাদক মাইক্রোফোনের সম্মুখে সেইগুলি অপর দুই ভাষায় (ফরাসী ও জার্ম্মাণ) ভাষান্তরিত করিয়া বলিতেন; প্রত্যেক শ্রোতাকে একটী করিয়া হেড-ফোন দেওয়া হইয়াছিল—যে ভাষায় তিনি শুনিতে চাহেন সেই ভাষা অপর ভাষাটীর সহিত বিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে একই বক্তৃতা তিনটী বিভিন্ন ভাষায় শুনিবার সুযোগ থাকায় আলোচনার সুবিধা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে প্রধানতঃ আলোচনা হয়—

জ্বালানী, বাষ্প-শক্তি, ইণ্টার্ন্যাল-কম্বাস্‌চান্ পাওয়ার, জলশক্তি, পাওয়ার ষ্টেশন, বিদ্যুৎ আইন, গবেষণা, ষ্টাণ্ডার্ডাইজেশন্, জেনেরেশান্যাল ট্রেনিং প্রভৃতি।

সাধারণ সভা

এই সব বিভাগীয় সভা ব্যতীতও সাধারণ সভায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। যাহাতে জনসাধারণের সহিত যোগ স্থাপিত হয়। বার্লিনের অধ্যাপক আইন্‌ষ্টাইন্ বক্তৃতা

যেন "প্রাকৃতিক অবকাশ ও ইথর সমস্যা" বিষয়ে, প্যারিসের অধ্যাপক ডাঃ সিকইস্ বলেন "যুক্তি প্রয়োগের নব-আকৃতি" বিষয়ে, নিউ ইয়র্কের ডাঃ ফষ্টার-বেন্ বলেন "শক্তি সঞ্চালিত দুনিয়ার খনিজ পদার্থের স্থান" বিষয়ে, টুবিংগের অধ্যাপক ডি. ভ্যালাউডি বলেন "বিদ্যুৎ ও বল" বিষয়ে, কাম্ব্রিজের অধ্যাপক স্যর এ, এস্, এডিংটন বলেন "সাব্ অ্যাটমিক্ এনার্জি" বিষয়ে, বার্লিনের ডাঃ ও অলিভেন্ বলেন "ইউরোপীয় পাওয়ার লাইন্স" বিষয়ে ইত্যাদি।

নূতন বৎসরের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ডাঃ অস্কার কোন্ বিলার; গত বৎসর সভাপতি ছিলেন রাইট্ অনারেবল্ আর্ল অব্ ডার্বি।

সকলকে মেলা মেশার সুবিধা দিবার জন্য অনেকগুলি ভোজের ব্যবস্থা হয়।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর সঙ্ঘ

আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘের নিকটে বেকার সমস্যার কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বেকার নিবারণের উপায়স্বরূপ সারা জগতের মজুরদের খাটুনির সময় ৪০ ঘণ্টা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই পরামর্শ ১৫।৩ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট লেজিস্লেটরের বেকার কমিটীর উপদেশাবলী

একটী যুক্ত লেজিস্লেটর কমিটি বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন পাবলিক্ কনট্রাক্ট বা সাধারণের মধ্যে যদি কোন চুক্তিপত্র করা হয় তবে নিম্নলিখিত পরামর্শ অনুযায়ী যে বিধি বা আইন গঠিত হইবে তদনুযায়ী সেই চুক্তিপত্র করা হইবে।

উপদেশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। কনট্রাক্ট বা চুক্তি করিবার পূর্ব্বে চুক্তিকারক ব্যক্তিকে বা কার্ম্মকে বা কর্পোরেশনকে সেই ষ্টেটে অন্ততঃ এক বৎসরকাল বাস করা চাই।

২। শিল্প কার্য্যে যে সকল দ্রব্যাদি আবশ্যক হয় তাহা সেই ষ্টেটের ভিতরেই যতদূর সম্ভব প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩। কোন মজুর যদি কোন ষ্টেটে কাজ পায়, তাহা হইলে, কাজ আরম্ভ করিবার তারিখের পূর্ব্বে মজুরকে সেই ষ্টেটে অন্ততঃ এক বৎসর বাস করিতে হইবে।

৪। মজুরদের নিযুক্ত করিবার আগে তাদের অভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত করিতে হইবে এবং যাহাদের অনেকগুলিকে ভরণপোষণ করিতে হয় অথচ কোন সংস্থান নাই তাহাদিগকেই প্রথম অধিকার দিতে হইবে।

৫। কোন ব্যক্তি, কার্ম্ম বা কর্পোরেশন কোন মজুরকে এই রকম কাজ যোগাইবার জন্য তাহার নিকট কোন রকমে কিছু দাবী করিতে বা পুরস্কার লইতে পারিবে না।

৬। এই রকম কাজের জন্য কোন প্রকার "লেবার ক্যাম্প" করিতে দেওয়া হইবে না।

৭। এই আইনগুলি যাহাতে যথাযথভাবে চালিত হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৮। প্রত্যেক ষ্টেট যতদূর সম্ভব আকস্মিক মঙ্গল কার্য্যে বুঝিয়া খরচ করিবে। এবং লোকাল গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়া চলিতে বাধ্য করিবে।

৯। যদি দেখা যায় ট্যাক্স বাড়ান আবশ্যক হইয়াছে তাহা হইলে লেজিসলেটর থেকে কি উপায়ে তাহা বাড়ান যায় তাহা বিবেচনা করিবে তখন কিন্তু কোন বিশেষ ষ্টেটের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ রাখা চলিবে না। তাহাদের ইতিমধ্যে কর্জ্জ সার্টিফিকেট দিয়া দুঃখ দূর করিবার পন্থা ঠিক করিয়া দিবে।

অতিরিক্ত উপদেশাবলী

১। ষ্টেট লেজিসলেচরে বা আইনে মাঙ্গলিক এবং দুঃখ নিবারণের কার্য্যাদি স্থানীয় এবং সামাজিক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২। কোন সময়ে আকস্মিক আবশ্যকে যদি কোন

কার্য্য করিতে হয় তাহা বহু দিন ধরিয়া যাহাতে চলিতে পারে এবং সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু নূতনত্ব আনিতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৩। সাধারণের হিতকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ বা তাহাদের খরচপাতির হিসাব রাখার ভার প্রত্যেক ষ্টেটে সামাজিক হিতসাধন বিভাগের উপরেই দেওয়া হইবে।

৪। মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য টাকা বন্দাইয়া কোন তহবিল তৈয়ারী করিবার কোন ষ্টেটেরই বিশেষ আবশ্যক নাই।

৫। কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দানস্বরূপ নগদ টাকা দেওয়া চলিবে না।

৬। পাবলিক ওয়ার্কসে সপ্তাহে পাঁচ দিন পরিশ্রম করিয়া মজুরী পাওয়া বিষয়ে যে প্ল্যান বা মতলব আছে তাহা গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে কাজে লাগাইলে ভাল হইবে।

শ্রীহট্টের চা-বাগিচায় কুলি যোগান

[শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার চা-বাগিচাসমূহে আগত অ-বাঙ্গালী কুলিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালী বনিয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীযুত গংগাচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয়ের সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হয় নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল। শ্রীমন্মথ নাথ সরকার]

প্রশ্ন—শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ের চা বাগিচা অঞ্চলে কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে কুলি আসে?

উত্তর—বাঙ্গালার কতকাংশ, মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ—এই সমস্ত স্থান হইতে কুলি আসিয়া থাকে।

প্রঃ—এই সমস্ত কুলি কোন কোন জাতি বা লোক?

উঃ—কুলিদিগের অধিকাংশই অবাঙ্গালী, বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব অল্প, প্রধানতঃ বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোক। ছোট নাগপুর সাঁওতাল পরগণা হইতে আগত সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির কুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কুলি হিসাবে ইহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং চরিত্রাংশেও ইহারা অন্যান্য কুলির চেয়ে ঢের ভাল। সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতির পরই হিন্দুস্থানীদের সংখ্যা। উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। চরিত্র হিসাবে উড়িষ্যা কুলি সকলের নিম্নে। ইহারা ঠক ও প্রবঞ্চক। সেই জন্য কোন বাগানেই ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চায় না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই সময়ে সময়ে মালিকগণ উড়িষ্যা কুলি নিযুক্ত করিয়া থাকে। উড়িষ্যা কুলিরাও সাধারণতঃ এক বাগিচায় বেশী দিন ধরিয়া থাকিতে চায় না।

প্রঃ—এখন কি উপায়ে কুলি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর—যে যে অঞ্চলে এখন চা-বাগিচাসমূহ বিরাজমান পূর্ব্বে ঐ সমস্ত অঞ্চল গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। চা-করগণের কল্যাণেই এই সমস্ত বন প্রদেশ শস্য-সম্পদযুক্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। প্রথমতঃ আড়কাঠির দ্বারা সংগৃহীত কুলি চা-বাগানের সন্নিহিত কুলি লাইনেই বসবাস করিত। বাগান ছাড়া অন্যত্র কাজ করিতে পারিত না। আবার বাগান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার উপায়ও ইহাদের ছিল না। চা-বাগানের সংলগ্ন ক্ষেত্রে কুলিদের খাইবার উপযোগী ধানের আবাদ কুলিদের দ্বারাই করা হইত। ক্রমে চুক্তিবদ্ধ কুলি নিয়োগের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ার ফলে কুলিরা স্বাধীনতা পায়। চা-বাগিচার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় মালিকগণ কুলিদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। সপ্তাহে এক দিন, কোন কোন ক্ষেত্রে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত কুলিদিগকে কাজ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে যেমন চা-করগণ কুলিদিগকে বাগানে আটকাইয়া রাখিতে যত্নবান্ ছিল এখন তেমনি কি উপায়ে কুলিদের স্বাধীনভাবে বসবাসের উপায় হয় সেদিকেই উহাদের মাথাব্যথা। বাগানের কাজে অসুবিধা হইতে থাকে, কুলিরা আশেপাশের বনভূমি সাফ

করিয়া কৃষিক্ষেত্রসমূহ গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সময়ে চা-বাগানেও কাজ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ সময় আপন আপন ক্ষেতের কাজে মোতায়েন থাকে।

প্রঃ—কুলিরা কি স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত একত্র এক গ্রামে বসবাস করে, না ভিন্ন স্থানে দল বাঁধিয়া বাস করে?

উঃ—কুলিরা পুরাতন গ্রামে বাঙ্গালীদের সহিত প্রায়ই বাস করে না। অন্য স্থানে দল বাঁধিয়াই উহারা বসবাস করে। তবে কখনও কখনও দুই একজন কুলিকে বাঙ্গালীদের পাড়াতেও ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে দেখা যায়।

প্রঃ—এখন কুলিরা কেন বাঙ্গালী বনিয়া যাইতেছে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন?

উঃ—আপন আপন দেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়ায় কুলিরা ক্রমে বাঙ্গালী বনিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। কুলিদের অধিকাংশই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক। কলিকাতা অঞ্চলের হিন্দুস্থানীরা যেমন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুস্থানীদের সংস্পর্শে হিন্দুস্থানীই রহিয়া যায়, এখানে তাহা হইবার উপায় নাই। উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলিতে এখানে বাঙ্গালীরাই প্রধান, সুতরাং বাঙ্গালীর সভ্যতা গ্রহণ করিতে উহারা বাধ্য হইতেছে।

প্রঃ—কুলিদের বাঙ্গালীর প্রতিযোগিতা কতদূর?

উঃ—কোন সভ্যতা গ্রহণে সাধারণ মানবজাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবধান দৃষ্ট হয় এখানেও সেইভাবেই দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ বাহ্য বেশভূষা। বেশভূষায় কুলিরা ক্রমেই বাঙ্গালী বাবুয়ানা গ্রহণ করিতেছে। কোন কোন বাড়ীতে হারমনিয়াম গ্রামোফোন ইত্যাদিও দেখা যায়। কথাবার্ত্তা ক্রমেই বাঙ্গালাতে পরিণত হইতেছে। লেখাপড়ার চর্চ্চাও বাঙ্গালাতে। ছেলেপিলের শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই চলিতেছে। এমন কি বয়স্ক কুলিগণ কীর্ত্তন, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারেও বাঙ্গালাভাষার প্রচলন করিয়াছে। তবে বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপার এখনও উহাদের আপন গণ্ডী এবং আপন আপন প্রাদেশিক প্রথাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সময়ে সময়ে পুরোহিতগণ আসিয়া এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়া আবার দেশে চলিয়া যায়।

প্রঃ—সকল শ্রেণীর কুলিই একই ভাবে বাঙ্গালী বনিয়া যাইতেছে?

উঃ—না। মাদ্রাজী কুলিগণ এইভাবে বাঙ্গালীদের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না। ভাষার অন্তরায় এ সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায়। তবে ইহা সত্য যে কিছুদিন পরে এই মাদ্রাজীরাও বাঙ্গালী বনিয়া যাইবে। সাঁওতাল প্রভৃতি অন্যান্য জাতিদের বাঙ্গালিত্ব প্রাপ্তি হইতেছে অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে। উড়িয়া এবং হিন্দুস্থানী কুলিই বাঙ্গালী বনিয়া যাইতেছে দ্রুতগতিতে।

:—কুলিদের বর্ত্তমান আচারব্যবহার কিরূপ?

:—পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সমস্ত কুলি সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। চাল-চাল সাংসারিক কার্য্য, আচার ব্যবহার—সমস্ত ব্যাপারেই ইহারা বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক নীচে। ইহার মধ্যে উড়িয়াদের অবস্থাই আবার সর্ব্বনিম্নে। হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াও মানুষ যে কতদূর নোংরা হইতে পারে উড়িয়ারা তাহার জলন্ত নিদর্শন। শুনিলে অবাক হইয়া যাইবেন যে, এই সমস্ত উড়িয়া কুলির কতকাংশ মরা গরুর মাংস পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়া থাকে।

প্রঃ—স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কুলি কি প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে?

উঃ—কৃষিকার্য্যই এখন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। বাগানসমূহে কুলির কাজও করে, এবং বাঙ্গালী গৃহস্থদিগের বাড়ীতেও কুলিগিরি করিয়া থাকে। চাষআবাদের মধ্যে ইক্ষুর আবাদই সর্ব্বপ্রধান। ইক্ষুর আবাদ ইহারা নিকৃষ্ট ধরণে চালায়। প্রথমতঃ জঙ্গল সাফ করিয়া কাঠ শুষ্ক হইবার পর আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেয়। তারপরে স্থানে স্থানে ছোট

ছোট খাদ করিয়া তাহার মধ্যে ইক্ষু রোপণ করে। কেহ কেহ বা কোদালির সাহায্যে একবার চাষও করিয়া থাকে। ক্রমে ইক্ষুর চারা বাহির হয়। অধিকাংশ কুলিই আর ইক্ষুর দিকে মনোনিবেশ করে না। তবে কেহ কেহ একবার আগাছা এবং ঘাস তুলিয়া ফেলে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভগবানের হাতে ইক্ষুক্ষেতের ভার অর্পণ করিয়া কুলিগণ নিশ্চিন্তে কালহরণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ আশ্বিন মাস এবং তাহার পর হইতে আখ কাটা আরম্ভ হয়। আখ কাটিয়া লইবার পর আখের ক্ষেতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। পুড়িয়া যাওয়ার পর আবার ইক্ষুর চারা গজাইতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় বৎসরে আখ পরিমাণে অনেক অল্পতর। তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত কেহ কেহ আখ রাখিয়া থাকে, তবে তৃতীয় বৎসরে আখের পরিমাণ কিছু অল্প হয়। এই সমস্ত আখ হইতে গুড় প্রস্তুত করিয়া ইহারা স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই গুড় কাছাড়ে গুড় নামে বাজারে পরিচিত। তবে মণিপুরি এবং বাঙ্গালীরাও এই গুড় উৎপাদন করিয়া থাকে। এবং মণিপুর হইতেও এই গুড়ের চালান আসে।

:—এই গুড় তৈরীর প্রণালীই বা কেমন এবং উহার গুণাগুণ বা কিরূপ? এই কুলি উপনিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর করণীয় কিছু আছে কি?

উঃ—কুলিদের প্রস্তুত গুড় নিকৃষ্ট ধরণের। সাধারণ আখমাড়াই কলের সাহায্যে উহারা আখ হইতে রস বাহির করিয়া লয় বটে, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে ইহারা একেবারেই অজ্ঞ। রস একটু খিতাইয়া লইলে মলো মাটী তলে পড়িয়া যায়। এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও ইহাদের নাই। যেমন রস বাহির হওয়া শেষ হইল অমনি উহারা জাল দিতে আরম্ভ করে। জাল দেওয়ার সময় যে গাদ ওঠে তাহাও উহারা ফেলিয়া দেয় না। সুতরাং অত্যন্ত খারাপ গুড়ই ইহারা তৈয়ার করে, এই গুড় বেচিয়া যে দাম পায় তাহাতেই খুসী থাকে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা যদি ইহাদের সহিত মিলিয়া ইহাদিগকে উন্নত ধরণের নির্য্যাস-প্রণালী শিখাইয়া দেয় তাহা হইলে ইহারাই উৎকৃষ্ট ধরণের গুড় প্রস্তুত করিতে পারে। ব্যবসায়ীরাও এই গুড় চালান দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। চাষআবাদেও ইহারা নিতান্ত মান্ধাতার আমলের প্রণালীতে চালাইয়া থাকে। সার দেওয়ার প্রথা এবং ভাল করিয়া চাষ আবাদ করিবার পন্থার প্রবর্ত্তন করিলে কাছাড় এবং শ্রীহট্টের অরণ্যভূমিতে সোনা ফলান যাইতে পারে। এই অঞ্চলের জঙ্গলসমূহ ইক্ষুচাষের পক্ষে অতীব উপযোগী। বর্ত্তমানে চিনির উপর চড়া আমদানি শুল্ক বসাইবার ফলে দেশের মধ্যে গুড় ব্যবহারের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। চিনি শিল্প কায়েম করিবার পক্ষেও সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত। এরূপ সময়ে যদি এই দুই জেলায় ইক্ষু চাষের উন্নত ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এদিকে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে এই বিদেশী কুলিগণও যথেষ্ট উপকৃত হয় এবং শিক্ষিত বেকার যুবক এবং ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট সুবিধা হয়। বহু দিন হইতেই আমার বাসনা, একটী আদর্শ কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বেকার বাঙ্গালী যুবকদিগের অন্ন-সংস্থানের উপায় বাৎলাইয়া দিই এবং উদাহরণ দ্বারা অনগ্রসর কুলিদিগকেও অর্থোপার্জ্জনের পন্থা হাতে কলমে শিখা দিই, কিন্তু অর্থাভাবে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণের আপাততঃ কোন উপায় দেখিতেছি না। শিক্ষিত এবং ধনী বাঙ্গালীগণ এ সম্বন্ধে অবহিত হইলে দেশের এবং দশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

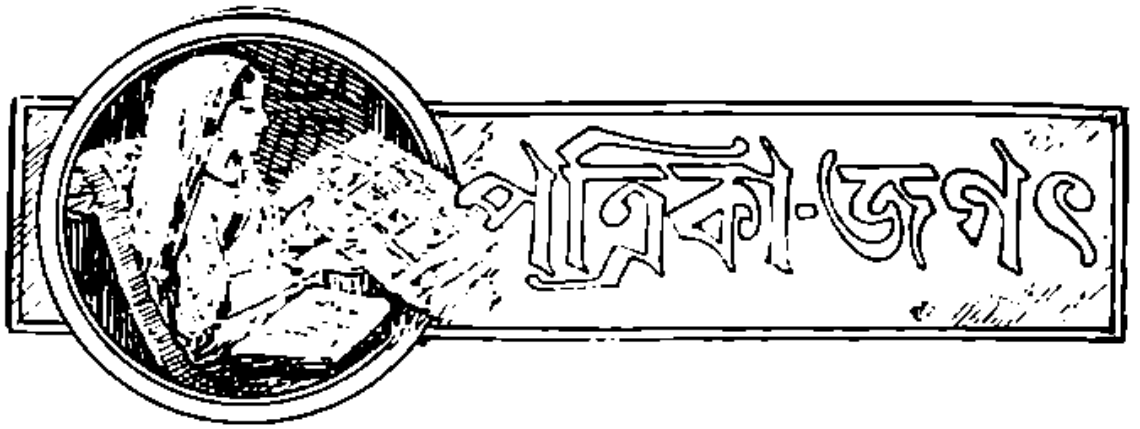

"ইন্দো-জেপানীজ ট্রেড্ বুলেটিন" এপ্রিল, ১৯৩২

জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য

গত বৎসর (১৯৩১) ১লা এপ্রিল হইতে এ বৎসর (১৯৩২) ৩১শে জানুয়ারী—এই দশ মাসে জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্যের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সময় বাণিজ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। প্রথম ছয় মাসে ভারতের আর্থিক দুর্গতি হেতু তাহার ক্রয় করিবার শক্তিই কম দেখা যায়; এবং রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ মেয়াদে মাল দিতেও পিছপাও হয়। গান্ধী-আরুইন সন্ধির পর এদেশে জাপানী-বাণিজ্য কিছু মাথা খাড়া করে। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান উঠাইয়া দেয়; ইহাতে ভারতের টাকার বাজারে যে চাঞ্চল্য হয় তাহা জাপানী বাণিজ্যকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। জাপান গবর্মেণ্ট স্বর্ণমান বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ় থাকায় ভারতের সহিত বাণিজ্যের অন্তরায় বাড়িল বৈ কমিল না। অপর দিকে ভারত গবর্মেণ্টের অর্থ অনটনের জন্য আমদানি মালের উপর ২৫% হারে শুল্ক বসাইতে হইল। এমন সময়ে মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের রাজনৈতিক গণ্ডগোল সুরু হইল; সুতরাং জাপানেও অর্থের বাজার বিশেষ চকল হইয়া উঠিল। ডিসেম্বর মাসে জাপান মুদ্রার স্বর্ণমান ত্যাগ করায় বাণিজ্যের উন্নতি হইল; কিন্তু জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের সহিত গবর্মেণ্টের সন্ধি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্য পুনরায় খারাপ হইতে থাকে। এ সত্ত্বেও জাপানী জিনিষের আমদানি অন্য দেশের তুলনায় হ্রাস পায় নাই।

নিম্নে আমরা গত তিন বৎসরের তুলনামূলক হিসাব উদ্ধৃত করিতেছি :—

(হাজার টাকার হিসাব)

	মোট বিদেশী আমদানি			জাপান হইতে আমদানি			জাপানের শতকরা অংশ		
জিনিষ	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
বুট ও জুতা	৭০,০০	৭২,১৪	৪৪,১৮	১৮,১০	৫২,৯৮	৪১,৫৬	২৫'৮	৭৩'৪	৭৮'৬
কর্পূর	৭৭,৯০	২২,৮৯	২৫,০৭	১৮,৩৯	৭,৮৬	৬,২৪	৬৫'৯	৩৪'০	২৭'১
সিমেন্ট	৫২,৯৪	৪৪,৮০	৩৮,৮৮	৫,৪১	৯,৭১	৮,১৭	১০'২	২১'৬	২২'৭
চিনেমাটির জিনিষ	৬১,১৬	৪০,৫২	৩২,৩০	২৬,৪২	১৭,৫৯	১৩,৫৬	৪৩'২	৪৩'৪	৪১'৯
কাচ ও কাচের জিনিষ	২,১৩,৭৫	১,৩৪,৩০	১,০২,০৮	৬৪,৪০					
লোহালক্কড়	৪,২৮,৬৫	৩,০১,১৬	২,২৩,২৫	২২,৩২					
বিজলী তার	৯৫,০৫	৮৪,২৩	৫৮,০৩	১,৯৮					
সুতা	৫,২১,৫৫	২,৬০,৭০	২,৫৫,৩৪	১,৪৯,০৬					

মোজা গেঞ্জি	১,১৭,৬৮	৭৯,১৭	৪২,৮৯	১,০০,৬৮	৬৯১১	৩৬,৮৬	৮৭'৩
কাপড় (কোরা)	১৭,৬১,৪২	৬,২২,৭৯	৩,২৪,৯১	৭,৬৩,০০	৩,৪৭,৯৪	২,৪২,০০	৫৫'৯
কাপড় (ধোয়া)	১০,৭৮,৫৫	৫,৫৫,৩৮	৪,৮০,৭৬	২২,৭৭	৪০,৬৮	৮০,৭৮	৭'৬
রঙীণ ও ছাপা কাপড়		৬,০২,৫৬	৪,১২,৯৫	২,৮৮,০১	৬,১৮,২৫	১,৩৮,৯৩	৩৩'৪
ছিট		৬৪,৩৯	৪৮,১৮	১৭,৪১	১৯,৫৩	৮,৬৭	১৭'৮
রেশমের সূতা		৪৩,৮৬	৪৬,৪৫	১১,৮৩	৭,৯৮	৪,৫১	৯'৭
রেশমের সহিত মিশ্রিত		২৩,৩০	২৬,৭০	১৬,৮৮			
রেশমের কাপড়		১,০৬,১৭	১,০৫,৩০	১,০৮,৬৯			
পশমের কাপড়		১,১২,৬০	৬১,৮৬	৪,৬০			
কৃত্রিম রেশমের জিনিষ							
কৃত্রিম রেশম ও সূতার কাপড়			৩৫,৯০				৮'৪

পাঠক যদি একটু মনোযোগ করিয়া তালিকাটি দেখেন ও বুঝিতে পারিবেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে জাপান তিন বৎসরের মধ্যে কি পরিমাণে কাপড়চোপড় আমদানি করিয়াছে।

"ইন্দো-জেপানীজ ট্রেড্ বুলেটিন" জানুয়ারী, '২১

জাপানের বয়নশিল্প

বলিতে গেলে গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে জাপানের বয়ন-শিল্প কারখানা আকার ধারণ করিয়াছে। জাপান যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রায় ১৮৬৩ সনে জাপানে বয়নকার্য্য আরম্ভ হয়; তবে ১৮৯০ হইতে হাত-টেকোর বদলে কলের টেকো ব্যবহার সুরু হয়। সে সময়ে জাপানে টেকোর সংখ্যা ছিল ১,৩০,০০০ তারপর পেকে যৌথ কারবারেই জাপানের বয়ন-শিল্প উন্নতি করিতে থাকে। নিম্নে জাপানের বয়ন-শিল্পের মূলধন, টেকো ও তাঁতের খবর দিলাম।

বৎসর	মূলধন (হাজার ইয়েন)	রিজার্ভ (হাজার ইয়েন)
১৯০৭	৫৭,৫০১	২০,১৬৬
১৯১২	৭২,৩৮৬	২৮,৫৩৩
১৯১৭	১১৫,৬২৩	৭০,০৫৭
১৯২২	৩১৭,১৪৮	২০২,১১৪
১৯২৭	৩৯১,৫৫০	২৩৮,৫৬৭
১৯২৮	৪২৬,৩৭৬	২৪৩,৯৮৭
১৯২৯	৪২৮,০৯৮	২৪৭,৪০৬

উল্লিখিত সংখ্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিবেন যে, জাপানের শিল্পগুলির পিছনে আর্থিক বল কি প্রচুর। ১৯০৭ হইতে ১৯১৭ সনের মধ্যে মূলধন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল এবং ১৯১৭ হইতে ১৯২৯ সনের মধ্যে প্রায়

১৭০% হারে মূলধন বাড়িয়াছে। রিজার্ভ তহবিলও ঠিক সেই ভাবেই বাড়িয়াছিল। প্রথম এগার বছরে তাঁতের সংখ্যা ২৮২% এবং শেষ তের বৎসর ১১৮% হারে বৃদ্ধি পায়। মিলের উৎপন্ন সামগ্রী এই চল্লিশ বছরে সেই তালেই আগাইয়া চলিয়াছে।

	সূতা	বস্ত্র
১৯০৭	৯,৮৩,৪৮২ গাঁট	১৫৮,৯৮১ হাজার গজ
১৯১২	১৮,৫২,২১০	৩৪২,৫৮৫
১৯১৭	১৯,২৩,৮৪১	৫৯৪,৬৪৯
১৯২২	২২,২৮,২৪৬	৮৬৯,৩২৭
১৯২৭	২৫,৩০,৬৯৪	১২,১৪,৬৬৯
১৯২৮	২৪,৫১,৮৬১	১৩,৮২,০০৪
১৯২৯	২৭,৯২,৫৮৬	১৫,৩৮,২৪৯ ,,

জাপানী কলগুলি ক্রমশই সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতেছে; অর্থাৎ তাহার কলকব্জা ক্রমেই ভাল হইতেছে। কেবল যে সূতাই সূক্ষ্ম হইতেছে তাহা নহে, তাহার কাপড়ও পাতলা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি ১৯১৩ সনে জাপানী কলে যেখানে মোটা কাপড় সাড়ে তের কোটি গজ প্রস্তুত হইত, ১৯২৮ সনে সেখানে ১২ কোটি ৮২ লক্ষ গজ প্রস্তুত হয়। অপর দিকে পাতলা কাপড় নয় কোটি গজের স্থানে চুয়াল্লিশ কোটি গজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

পৃথিবীর বড় বড় বাজারে জাপানী কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ সমুদ্রে দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকায়, মিশরে, মরক্কোতে ও ভূমধ্যসাগরের কতকগুলি স্থানে জাপানী কাপড়ের কাটতি বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতে ও চীনে বাজে একটু কমিয়াছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে জাপানী মাল খুবই চলিতেছে; বিশেষভাবে 'খদ্দর'।

পৃথিবীর তুলা উৎপাদক দেশের বড় রকম খরিদ্দার জাপান। জাপানের একদিকে আমেরিকা, অপর দিকে ভারতবর্ষ—পৃথিবীর দুটি তুলার দেশ। জাপানী কারিগরেরা তুলা মিশাইয়া কাজ করিতে ওস্তাদ; তাই ভারতের সস্তা তুলা ও আমেরিকার মহার্ঘ তুলা মিশাইয়া তাহারা খুব ভাল সূতা সস্তায় তৈয়ার করিতে পারে। জাপান ভাল কাপড় চোপড় তৈয়ারী করিতেছে বলিয়া সে ক্রমেই মিশরের ও মার্কিণের তুলা বেশী ব্যবহার করিতেছে। ভারতের তুলার চাহিদা কমিতেছে। নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য :—

	ভারতীয় তুলা	মার্কিণ	চীনা	মিশর
১৯০৩	৫৬%	১৭%	২০%	২%
১৯০৭	৫৭	২৪	১৪	১
১৯১২	৫৭	৩৩	৪	২
১৯১৭	৬১	২৬	৫	১
১৯২২	৫৮	৩৭	০	১
১৯২৭	৪৬	৪৭		
১৯২৮	৪৫	৪৫	৫	২
১৯২৯	৪৯	৪৩	২	২

জাপানের বয়ন-শিল্পের এই উন্নতির কারণ কি তাহা আমাদের বিশেষভাবে জানা দরকার। জাপানের এই প্রগতি সেখানকার কলকব্জা যন্ত্রপাতির উন্নতি ও শ্রমিকদের কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবীর কোথায় কতকগুলি টেকো বা চরকার কি পরিমাণ তুলা বৎসরে লাগে তাহা হইতে আমরা মিলের কর্মকুশলতা কি রকমের তাহা জানিতে পারি। ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রধান প্রধান বয়ন-কেন্দ্রের মিলের হিসাব আমরা নিম্নে দিতেছি :—

দেশের নাম	টেকো (হাজার)	বাৎসরিক তুলার খরচ (হাজার গাঁট)
মার্কিণরাজ্য	৩৪,৭৩১	৬,৯০৪
গ্রেটবৃটেন	৫৮,২৭৭	২,৭৭৪
জাপান	৬,৮০৭	১,৯৬৯
ভারতবর্ষ	৮,৯০৭	২,১৮২
চীন	৩,৬৯৯	২,১০৬
ইতালি	৫,০১৭	১,০৫৭
রুশিয়া	৭,৬২৪	২,২২০
জার্ম্মানি	১১,২৬০	১,৩৩০
ফ্রান্স	৯,৮১১	১,২০৩

জাপানের চরকা য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের কারখানার চরকা হইতে অধিক ঘুরে। এখানকার অনেক চরকা দিন হইতে দশ হাজার বার করিয়া ঘুরে, আর

য়ুরোপের চরকার গড় ঘুরপাক পড়ে সাত হইতে আট হাজার বার মাত্র। জাপানী কলকব্জা য়ুরোপীয় কলকব্জা হইতে অনেক ভাল। এছাড়া কাপড় বুনিবার সময়ে সুতা কাটিয়া গেলেই যাহাতে কল জানিতে পারে এরূপ কল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং জাপানে প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। এই তোষাকা অটোমেটিক কল মাল প্রস্তুতের খরচ কমাইয়া দিয়াছে। এছাড়া কল ভাল হওয়াতে হাজার করা চরকা ও তাঁতে শ্রমিকের সংখ্যা কমিতেছে। ১৯১০ সনে যেখানে হাজারটি চরকার কাজ দেখিবার জন্য গড়ে ১১ জন পুরুষ ও ৩৪ জন স্ত্রীলোক লাগিত, ১৯২৯ সনে সেখানে গড়ে ৭ জন (৬·৫১) পুরুষ ২২ জন নারী কাজ করে। তাঁতেও তাই। ১৯০৮ সনে হাজার তাঁতে ১৫৮ পুরুষ ও ৯১৮ নারী শ্রমিক লাগিত; সেইখানে বিশ বৎসর পরে যথাক্রমে ১২২ ও ৪৯৬ জন শ্রমিক লাগিয়াছে। কলকব্জার উন্নতি ইহার একমাত্র কারণ।

শ্রমিক সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে মাল প্রস্তুতের খরচও কম হইতেছে। কোনো কোনো কলে কলকব্জা এত উন্নত হইয়াছে যে, মোটা সুতার ৬০০ টেকো ও মাঝারি সুতার ৪০০ টেকো পর্য্যন্ত এক একজন শ্রমিক তত্ত্বাবধান করিতে পারে। জাপানী মেয়েরাও কাজে খুব দক্ষ। কোনো কোনো কলে গড়ে একজন তাঁতী ছয়খানি হইতে আটখানি তাঁতের কাজ পরিদর্শন করিতে পারে। অটোমেটিক তাঁতের প্রচলন হওয়ায় একজন তাঁতী ২০ হইতে ৫০ খানি তাঁত দেখিতে পারে। ইহার ফলে শ্রমিকের কাজ কমিতেছে।

পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতার ফলে এক এক দেশের ধনিক ও শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। পরিচালনার ব্যয় কমাইবার জন্য যৌথভাবে মালপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব চলিতেছে। জাপানের অধিকাংশ কারখানা ছোট। পাঁচ লক্ষের উপর টেকো আছে এমন কলের সংখ্যা ৬৭%। মোট চারিটি কোম্পানী। এক লক্ষ টেকোযুক্ত কারখানা ১৫·২%—মোট বাইট কোম্পানী। পঞ্চাশ হাজার টেকো ২৭·১%—১৬টি কোম্পানী। ত্রিশটি কোম্পানীর (৫·৮%) পঞ্চাশ হাজারেরও কম করিয়া টেকো কারখানায় আছে। জাপানীদের মতে নয়টি হাজার টেকো ও তদনুপাতে তাঁত হইতেছে একটা আদর্শ কারখানার যথার্থ সংজ্ঞা। জাপানে অবশিষ্ট কারখানা খুবই ছোট।

বড় কারখানার লাভও বড়। পূর্ব্বোক্ত যে কয় শ্রেণীর কারখানার কথা বলিলাম তাহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ টেকোর কারখানার লাভ ২১% হইতে ২৫%, এক লক্ষ টেকোর কারখানার ১৫% হইতে ২২%, পঁচিশ হাজার টেকোর কারখানার ৬% ও তার নীচের কারখানার ৫% হইতে ৮% হারে লাভ হইয়াছিল।

১৯৩০ সনে জাপানের বয়ন শিল্পের অবস্থা একটু মন্দ হয়; তাহার কারণ চীনের ও ভারতের বয়কট নীতি। ইহার ফলে জাপানের বয়ন-শিল্প সমিতি ১৯৩০ সনের জুন মাস হইতে কাজকর্ম্ম ২৭% হারে কমাইয়া দেয়। গত বৎসরে উৎপন্ন সামগ্রী ৫% হারে কমাইয়াছে।

জাপানের কারখানাগুলি তাহাদের সমিতির দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ। ইহার ফলে তাহারা বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে। কলকব্জা খুবই বিজ্ঞানসম্মত; তুলার মিশ্রণ প্রণালীতে জাপানী কারিগরেরা ওস্তাদ। এই সব কারণে জাপান আজ পৃথিবীর মধ্যে বয়নশিল্পে এরূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

"ময়মনসিংহ সমাচার"

কৃষি শিক্ষা

কৃষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল নানা কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কৃষকদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে না পারিলে বাঙ্গালী সমাজের আর উন্নতি নাই একথা অনেকে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে কৃষকগণ যথার্থই লাভবান্ হইতে পারিবে তাহা আজিও কেহ বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বাঙ্গালার কৃষকেরা নিতান্ত মূর্খ ও মহৎ প্রকারে অজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু কৃষিবিষয়ে তাহাদের নূতন কিছু শিখাইবার নাই। এইরূপ নানা মতের নানা কথা সকল দিকে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার কৃষকদের শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করা উচিত।

এদেশে এখন যেভাবে কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করে তাহা কোন্ সুদূরাতীত কালে, কোন্ আদর্শ কৃষক প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। এই কৃষি-পদ্ধতির যখন এবং যেরূপেই উৎপত্তি হউক, ইহাকে সম্পূর্ণ-রূপে দেবতার অনুগ্রহের উপর স্থাপন করা হইয়াছে। চাষের সহিত জলের কিরূপ সম্বন্ধ একথা পুরাকালের কৃষক-গণ ভালই জানিতেন। কিন্তু বোধ হয় পরিশ্রমের লাঘব করিবার জন্য বাঙ্গলার অনেক নদনদীর অনুরূপ জল-সম্ভারের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ পড়ে নাই। তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির শক্তির ভাণ্ডার কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু জ্যোতিষগণনাদি বিবিধ বিদ্যার বলে বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়া বিশেষতঃ স্থানীয় বারিবর্ষণ ও তদ্রূপাদি নিরূপণ করিলেন, এবং কোন্ ফসলের জন্য কোন্ জমিতে কোন্ সময়ে কতবার হাল দিতে হয় তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্য্যা স্থির করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার কৃষকগণও সেই সমস্ত অপরোক্ষা পুরুষদিগের আদেশ ও উপদেশ অন্ধ-বিশ্বাসে পালন করিয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু আজ এমন সময় আসিয়াছে যে, উক্ত কৃষি-কয়লাগুলি সেরূপ ফলপ্রদ হইতেছে না। নিম্নলিখিত অন্তরায়গুলি বাঙ্গলার কৃষকের জীবনপথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে (১) চিরাচরিত নিয়ম ধরিয়া বাঙ্গলার আকাশে মেঘসঞ্চার ও বৃষ্টিপাত হইতেছে না। সুতরাং লক্ষ অভিজ্ঞতা কৃষকদের তাদৃশ কাজে লাগিতেছে না। (২) উৎপন্ন ফসলের গতি বাঙ্গলার গণ্ডী পার হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এজন্য কৃষকের সঞ্চয় করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। (৩) জমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কারণ নির্ণয় করা যায়; তন্মধ্যে কৃষকদের দারিদ্র্য ও উপযুক্ত সার ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে চাষের জমিতে পর্য্যায়-প্রথা চলিত থাকায় সার ব্যবহার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। এখন পর্য্যায় প্রথার লোপ ও পর্য্যাপ্ত সারের অভাব বাঙ্গলায় অনুর্ব্বরতার সৃষ্টি করিয়াছে। গো-জাতির অবনতিও ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। (৪) ব্যয়-বহুল বর্ত্তমান সভ্যতার অনুকরণে অত্যধিক (ডিসেন্ট লিভিং) যাপনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব্বে কৃষকেরা সেট পূরিয়া খাইয়া শীতাতপের সর্ব্ববিধ উৎপীড়ন অম্লানবদনে পিঠ পাতিয়া সহ্য করিত। কিন্তু এখন নিজের ও পুত্রপরিজনের বেশভূষা ও কিছু না কিছু বাবুগিরির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হয়। কাজে কাজেই সেই পরিমাণে আহার্য্যের খরচের অভাব পড়ে। সুতরাং পুষ্টির অভাবে শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এবং আধিব্যাধির অত্যাচার আর কেবল পিঠের উপর দিয়া যাইতেছে না—বক্ষে আঘাত করিতেছে। আরো নানা কারণে আহার্য্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। (৫) দেশের বিস্তৃত জল-হাওয়াও কৃষকের দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ। কিন্তু ধরিতে গেলে কৃষকরাই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পাট চাষের বিস্তার বাঙ্গলার জল-হাওয়া দূষিত করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। পাট বাঙ্গলার অন্যতম কৃষি-সম্পদ্ এবং যে যে ফসলের চাষ করিয়া চাষীরা দুটি পয়সার মুখ দেখিতেছে পাট তাহাদের অগ্রগণ্য। কিন্তু পাটগাছ হইতে পাটতন্তু পৃথক করিবার প্রণালীর মধ্যেই কৃষকের সর্ব্বনাশ নিহিত। পাট গাছ না পচাইলে ইহার তন্তু পৃথক করা যায় না। সেজন্য পাটপ্রধান গ্রামগুলিতে উৎপন্ন পাটগাছগুলি পচাইবার জন্য গ্রামের সমস্ত জল নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি অধিবাসীদের পানীয় জলটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। পাট পচিলে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং জল বিষাক্ত হইয়া নীলবর্ণ ধারণ করে। তখন মৎস্যাদি জলচর জীবগুলি পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে না। ঐ বিষাক্ত জল মনুষ্য-শরীরের কতদূর অনিষ্ট সাধন করে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর পাট কাটিবার ও ধুইবার সময় কৃষক ও মনুষ্যকে সমস্ত দিন সেই বিষাক্ত জলে আবক্ষ নিমগ্ন থাকিয়া কাজ করিতে হয়। অর্থাৎ তাহারা জগতের হাটে পাট সরবরাহ করিতে যাইয়া জগতের আধিব্যাধি স্বকীয় ক্ষীণ দেহে আশ্রয় দিয়া থাকে। তখন পাটবিক্রয়লব্ধ অর্থের চতুর্গুণ খরচ করিয়াও বাঁচিবার পথ বাহির করিতে পারে না। যাহারা কৃষকদের বন্ধু এবং দেশে পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ফসলের প্রচলন ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পাটচাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাট দ্বারা অনর্থ

বিস্তারের প্রতিরোধ করিবেন। তবেই দেশের প্রকৃতিক মঙ্গল হইবে। পাটের কোন অংশই গোখাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় না বলিয়া পাটচাষের বিস্তার গোজাতির উন্নতির অন্যতম অন্তরায়। (৬) গোজাতির অবনতি কৃষকদিগের দুর্দশা আনয়ন করিয়াছে কারণ গরু হীনবল হইলে জমির সুকর্ষণ সম্ভব হয় না এবং ফসলও আশানুরূপ ফলে না।

মোটামুটি এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার কৃষকের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। তাহার উপর কৃষিকার্য্য আজকাল প্রকৃত ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করা যায়। কোনো মুদিখানার দোকানদার যেমন তাহার কতগুলি পরিষ্কার ও কোন্ সময়ে তাহাদের কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার উপর নজর রাখিয়া নিজের দোকানখানি সুসজ্জিত করে এবং অন্য দোকানদার কিরূপ দরে মালপত্র বিক্রয় করিতেছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া নিজের খরিদ্দারের মনস্তুষ্টি করিয়া লাভ করে; কৃষকদেরও আজকাল তেমনি বাজারের চাহিদা বুঝিয়া ও বিদেশী কৃষকদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে উৎকৃষ্টতর ফসল উৎপাদন করিতে হইবে। বাঙ্গলাদেশে পূর্ব্বে (বেশীদিন নহে, ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে) যে সময়ে যেভাবে বৃষ্টিপাত হইত এখন আর সেরূপ হইতেছে না। শীতকালে বর্ষার আবির্ভাব এবং বৎসরের যে কোন সময়ে ঝটিকা দেখা দিতেছে। সেজন্য আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন বশতঃ কৃষকেরা চাষে আর আগে সাবধান হইতে পারিতেছে না। আমাদের দেখা উচিত এইরূপ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ার জন্য দেশে কিরূপে চাষবাস চলে অথবা বাঙ্গলাদেশের সমান আবহাওয়াবিশিষ্ট দেশ পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে আছে কিনা, থাকিলে তথায় কৃষিকার্য্যে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। তাহাদের পদ্ধতি উৎকৃষ্ট হইলে তাহা আমাদের দেশে চালান সম্ভব কিনা এবং কিরূপে চালান যায় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলার কৃষকেরা নিরক্ষর ও বিচ্ছিন্ন। বাঙ্গলার চাষ-আবাদ কৃষকের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। জগতের অন্যান্য সমস্ত দেশই একতায় উন্নত ও বলবান। সুতরাং কৃষকদের তথা কৃষির উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কৃষকদের নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্মুখে এমন আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হয় এবং তাহারা সহজেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদেশী কৃষকগণ কিরূপে উন্নতি করিয়াছে, সেই আদর্শই আমাদের বর্ত্তমান অবলম্বন। কিন্তু বিদেশী পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুকরণের মধ্যে আমাদের মুক্তি নিহিত নাই। তাহাদের অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী আমাদের সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও জলবায়ুর মধ্যে কতদূর কার্য্যকর হইবে তাহাই বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন ও অন্যান্যের জন্য আমরা এখনই আমেরিকার ন্যায় কলকব্জার প্রচলন করিতে পারিব না। কিন্তু আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে আমাদের সহজ শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর।

ফসল উৎপাদনের যেমন প্রয়োজন তেমনি তাহা যথা-সময়ে যথাযোগ্য বাজারদরে বিক্রয় করা দরকার। উপযুক্ত দর না পাইলে সকলে মিলিয়া সেই দ্রব্য যতদিন না সুবিধা মত দর পাওয়া যায় ততদিন মজুত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন এবং কাঁচামাল হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাকামালের সৃষ্টি করিয়া হস্তদ্বয় হইতে দত্যাংশ বাহির করিয়া লইবার উপর শিক্ষাও কৃষি-শিক্ষার অন্তর্গত। কৃষকদের নিরক্ষরতা ঘুচিয়া যেন দায়িত্ববোধ ও দূরদর্শিতা জন্মে।

চাষের উন্নতি ও গোজাতির উন্নতি বোধ হয় একই কথা। উৎকৃষ্ট প্রজনন-প্রথা ইত্যাদি নানা প্রকারে গোজাতির উন্নতি করিতে পারা যায়। কিন্তু পর্য্যাপ্ত আহার্য্য ও নির্ম্মল পানীয় এবং স্বাস্থ্যকর গোয়াল ঘরই তাহাদের উন্নতির প্রধান উপায়। পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে সকলেই প্রায় হৃষ্টপুষ্ট হয়। আজকাল যদি প্রয়োজন মত গোচারণ ভূমি রাখিবার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে মানুষের প্রয়োজন মত যেমন নানাবিধ শস্যের চাষ হয়, সেইরূপ গরুর খাদ্যের জন্যও নির্দ্দিষ্ট ফসলের বা ঘাসের চাষ করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞগণ "গিনি ঘাসের" চাষ করিতেছেন। আমাদের দেশীয় ফসলের চাষও করা যায়। কোন কোন জেলায়

স্থানে স্থানে দেখিয়াছি, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে, অর্থাৎ "আশু" ধান্য পাকিবার পূর্ব্বে গরু বাছুরের আহার্য্যের অভাব হয়। সে জন্য স্থানীয় কৃষকগণ জ্যৈষ্ঠের শেষে "ভূষা"র চাষ করে। "ভূষা" ঘাস দেখিতে প্রায় "শ্যামা" ঘাসের মত। ইহার বীজগুলি পোস্ত বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র। ভূষা ঘাস পাকিলে অনেক দরিদ্র কৃষক ইহার বীজ বাছিয়া করিয়া অতি উপাদেয় পায়স রাঁধিয়া খাকে। প্রকারান্তরে ভূষা ঘাস মানুষ ও গরু উভয়েরই উপকারে লাগে।

শিক্ষা শব্দের যত প্রকার অর্থ ও সূত্র থাকুক না কেন, ইহার একটী ব্যবহারিক দিক্ আছে, তৎপ্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। জগতের মধ্যে নিজের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় এবং ঐ স্থান স্বীয় অধিকারে রাখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন শিক্ষার ব্যবহারিক অর্থ। জগতের মধ্যে নিজেদের স্থান কোথায় তাহা কৃষকেরা অবশ্যই জানে, কিন্তু কিরূপে সসম্মানে ও অনায়াসে তাহা বজায় রাখিতে হয় তাহা তাহারা আদৌ জানে না। আজ যুগপরিবর্ত্তনের দিনে, জগতের সহিত প্রতিযোগিতার দিনে, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, শিল্পবিদ্যা, সংসার পালন, দূরদর্শিতা, একতা এবং অর্থনীতি-জ্ঞান শস্যোৎপাদনজ্ঞানের পরিপূরক মাত্র। সুতরাং এই নূতন যুগের উদ্বোধনের দিনে কৃষিশিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা যুগপ্রবর্ত্তকগণের ভাবিবার বিষয়।

"ত্রিস্রোতা" জলপাইগুড়ি

চিনি শুল্ক বৃদ্ধি হেতু বাঙ্গলার চাষীর সুযোগ

বিদেশী চিনির উপর মণকরা ৷৷৹ অর্থাৎ সের করা ৶৹ তিন আনা শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। ইহাতে চিনি ও গুড়ের দর চড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। চিনির উপরে ৷৷৹ আনা হারে শুল্ক ৭ সাত বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। ২০ কোটী টাকার চিনি ভারতে আমদানি হয়, তাহার বেশীর ভাগই বাঙ্গলা দেশে খরচ হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গলা দেশ হইতে সারা জগতের চিনি সরবরাহ হইত সেই বাঙ্গলা দেশে আজ একটীও চিনির কারখানা নাই। সেই বিরাট অভাব পূরণ করিবার এই সময়। বাঙ্গলার সন্তান যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন কালবিলম্ব না করিয়া এই সুযোগে স্থানে স্থানে তাঁহাদের চিনির কলকারখানা খুলিয়া চিনি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে শুধু বিলাত ও যুক্ত প্রদেশে তৈয়ারী চিনির উপর আমাদের নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। অর্থনৈতিক পরাধীনতা আর আমাদের ঘুচিবে না।

পাটের ঘর পড়িয়া যাওয়ায় দেশের যে কি দুরবস্থা হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, ঘরে ঘরে হাহাকার, কৃষক অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না, মহাজন টাকা খাটিতেও দরিদ্র, জমিদারের খাজানা আদায় নাই, উকিল মোক্তার বাবুদের ফিসের টাকা ঘরে আসে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা কৃষক শ্রেণীর অপেক্ষাও শোচনীয়। কৃষকেরা হয়ত পেটে ভাতে খাইয়া থাকিতে পারে কিন্তু মধ্য বিত্তের পক্ষে তাহা সম্ভবপর না। ব্যাঙ্ক, লোন অফিসগুলি আদায়ান্তি টাকা বা তাহার সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। যাঁহাদের টাকা মজুত আছে তাঁহারাও আজ পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সোনার অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন।

পাট চাষীদের অনেকের মনে ধারণা যে চীন জাপানে যে বিবাদ চলিতেছে তাহা আর একটী মহাযুদ্ধে পরিণত হইবে এবং পাটের দরও বাড়িবে। কিন্তু সে ভরসা নাই, যুদ্ধের জন্য দর বাড়িবার হইলে এতদিন নিশ্চয়ই বাড়িত। পাটের দর বরং কমিতেছে। অক্টোবর মাসে যে বাড়তি দেখা গিয়াছিল তাহার কারণ আমাদের মুদ্রার স্বর্ণমান কম হইয়া যাওয়ায় ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অনেক বেপারী একসঙ্গে মাল খরিদ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ পাটের বাজার অদূর ভবিষ্যতে ভাল হইবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাণিজ্যে আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় এখন আর কেহ মানিতে চাহে না। সকল জাতিই নিজ নিজ প্রয়োজন মত মাল তৈয়ারী করিয়া তাহা চালাইতে ব্যস্ত। ব্যবসায়ী জাতিগণের মধ্যে পারস্পর্য্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় মন্দা পড়িয়াছে। পাট সাধারণতঃ মালপত্র বাঁধাই করিয়া একস্থান হইতে

স্থানান্তরে পাঠাইবার সুবিধার জন্য দরকার হয়। কিন্তু চলাচল কম হইলে পাটের প্রয়োজনীয়তা বা দর বাড়িবে কেমন করিয়া? পাট চাষীদের পক্ষে চিনি-শুল্ক-বৃদ্ধি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যে জমিতে পাটের চাষ হইত সে জমিতে ইক্ষুর চাষ করিলে কৃষকের ভাগ্যে সোনা ফলিতে পারে; অন্ততঃ পাটের চাষ হইতে যে অনেক বেশী লাভ হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চিনির উপর শুল্ক বাধা হওয়ায় অনেকে চিনি ছাড়িয়া গুড় ধরিয়াছেন। স্থানে স্থানে ইহা লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে শুনা যায়। ইহাতে কৃষকদের মঙ্গলই হইবে মনে হয়। তাহাদের হাতে নগদ টাকা আসিবে, ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও সাহায্য হইবে। যতদিন দেশীয় কল কারখানা আমাদের প্রয়োজন মত চিনি যোগাইতে না পারে ততদিন গুড় দিয়া কাজ চালানো মন্দ নয়।

"কোয়ার্টারলি জারন্তাল অব্ একনমিক্স্"

নভেম্বর, ১৯৩১

নিম্নলিখিত বিষয় উক্ত পত্রিকাতে আলোচিত হইয়াছে:

১। একনমিক এস্পেক্ট অব্ এডালটারেশন্ এণ্ড ইমিটেশন্ (ভেজাল ও নকলের আর্থিক দিক্)।

২। ভেলসিটি কন্সেপ্ট এণ্ড প্রাইসেস্ (সঞ্চালন বা গতি কি জিনিষ ও দরের কথা)।

৩। দি সেপারেশন অব্ ওনারশিপ এণ্ড কনট্রোল ইন্ আমেরিকান ইন্ডাষ্ট্রি (আমেরিকান শিল্পে মালিকত্ব ও পরিচালনা স্বাধীকরণ)।

৪। ওয়ান্টস্ এণ্ড একটিভিটিস্ অব্ মারক্যান্ট (ভদ্রশ্রেণীর মার্গ্যালের অভাব ও তাহার প্রতীকারসূচক কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা)।

৫। দি কপার ইন্ডাষ্ট্রি এণ্ড দি টারিফ (তাম্রের ব্যবসা ও শুল্ক)।

"একনমিকা" নবেম্বর, ১৯৩১

দি থিয়োরি অব্ মানি (মুদ্রাতত্ত্ব)

(ক) ডক্টর হেবের প্রত্যুত্তর দে, এম্ কিন্স্।

(খ) একটি জবাব এফ্, এ, ফোন্ হেক্।

২। একনমিক সিগনিফিকেন্স অব্ পাবলিক্ ইউটিলিটিস্ (সার্বজনীন হিতসাধক কার্য্যাবলীর আর্থিক সার্থকতা)।

৩। দি ইণ্ডিয়ান প্রব্লেম্ প্রবলেম্ (ভারতীয় সিক্কা-সমস্যা)।

"দি জার্ন্যাল অব্ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স", ১৯৩১

১। দি ইকোয়েলন্ অব্ কম্পারেটিভ্ রেলওয়ে ইনডাষ্ট্রিয়ালিজেশন্ (তুলনামূলক রেলওয়েশিল্প নিষ্ঠার আর্থিক সমীকরণ)।

২। কার্টেলস ইন জাপান এ ষ্টাডি ইন্ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গ্যানিজেশন্। (জাপানের সঙ্ঘ: আর্থিক সংগঠন বিষয়ক অনুসন্ধান)।

৩। ইতালি: হাউ ইতালিয়ান্ টুরিং ক্লাব হেল্প্ টু নো ইয়ার (ইতালি; ইতালির ভ্রমণ ক্লাব কিরূপে ইতালিকে জানিতে সাহায্য করে)।

৪। দি বৃটিশ এণ্ড আমেরিকান ক্যাপিটাল (বৃটিশ ও আমেরিকার পুঁজি)।

৫। দি মাইনিং এসোসিয়েশন্ অব্ নর্থ ওয়েষ্টার্ণ জার্ম্মানি (উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানির খনি সঙ্ঘ)।

৬। মেসিনারি এক্সিবিশন্স এণ্ড দি লাইপৎসিগ্ ফেয়ার (লাইপৎসিগ্ মেলায় যন্ত্রপাতি প্রদর্শন)।

৭। গভর্মেণ্ট লোন্স্ টু কালটিভেটরস্ ইন্ ফ্রান্স (ফ্রান্সের চাষীদের গবর্মেণ্টের ঋণদান)।

৮। দি এসোসিয়েশন্ অব্ জার্ম্মাণ এনজিনিয়ার্স (জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার পরিষৎ)।

৯। কনট্যাক্ট উইথ একনমিক ইতালি (আর্থিক ইতালির সংস্পর্শে)।

তুলার ব্যবসায় বিলাত, জাপান ও ভারত

১। ল্যাঙ্কাশিয়ার অ্যাণ্ড দি কার ইষ্ট (ল্যাঙ্কাশিয়ার ও সুদূর প্রাচী), ফ্রেডা উট্‌লে। এদেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন। ১৯৩১। ৩২৫ পৃঃ।

এককালে দুনিয়ার কাপড় ও তুলার জিনিষের প্রধান যোগানদাতা ছিল ল্যাঙ্কাশিয়ার। সেই ল্যাঙ্কাশিয়ার আজ তুপতিত। এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ কি? বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে দুনিয়ার তুলার বাজারে গ্রেট বৃটেনের অবস্থা কিরূপ ছিল গ্রন্থকর্ত্রী তাহা বিশদভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কটন তুলার ব্যবসার আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্যালোচনা করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পান যে, ল্যাঙ্কাশিয়ার কলকারখানা ও অন্যান্য বিষয়ে সেই মান্ধাতার আমলের প্রণালী অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছে। যাহারা কাজ করিতেছে তাদের চারিদিকের আবহাওয়া উন্নত করিবার চেষ্টা নাই, মজুরির হার নীচু, আর বেকার-সমস্যা ক্রমেই প্রবল হইতেছে। এই গেল গ্রেট বৃটেনের কথা; কিন্তু অন্য দিকে জাপানের বেলা কি দেখিতে পাই? ব্যবসায় জাপানের এরূপ দ্রুত উন্নতি লাভের কারণই বা কি? জাপানে যতগুলি বড় শিল্প-ব্যবসাই সরকারী সাহায্যের আওতায় বাড়িয়াছে,—তুলার ব্যবসার বেলাও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জাপান সরকার এই ব্যবসার পিছনে টাকা ঢালিয়াছে প্রচুর। গ্রন্থকর্ত্রীর মতে আজ জাপান যে যে কারণে গ্রেট বৃটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এই: (ক) জাপানের সস্তা মজুরি; (২) যুদ্ধের ফলে ল্যাঙ্কাশিয়ারের তুলার ব্যবসার ক্ষতি ও সেই সুযোগে জাপান কর্ত্তৃক বিভিন্ন বাজার দখল; (৩) এদেশে ব্যবসা অধিকতর সুগঠিত ও সুপরিচালিত।

কিন্তু জাপানের এই বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না। দুনিয়ার বাজারে তুলার ব্যবসায় জাপান যে হাত দিয়া নিজস্থান অধিকার করিতেছে, সে হাত দেওয়া উচিত হইতেছে কি না তাহা লইয়া যথেষ্ট ভাবিবার অবকাশ আছে। এই একটি ব্যবসা জাপানের সামাজিক জীবনকে বহুপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। জাপানী চাষী ও বড় বা মধ্যম আকারের তুলার কলের মজুরের দৈনিক জীবনের যে ছবি গ্রন্থকর্ত্রী আঁকিয়াছেন তাহা আংশিক সত্য হইলেও জাপানের আনন্দিত হইবার কারণ নাই।

জাপান ধীরে ধীরে চীনের বাজার দখল করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং জাপানের দৃষ্টান্তে—কতকটা তার প্রতি ঘৃণাবশে হইয়াও বটে—চীনা তুলার ব্যবসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। এত সস্তায় এরূপ প্রচুর মজুর জাপানের ভাগ্যে জুটিবার সম্ভাবনা কোন দিন নাই। তারপর ভারতের তুলার বাজারে বিলাতে-জাপানে যে প্রবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে সে সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক সংবাদ এই কেতাবে পাওয়া যাইবে। তারপর ভারতীয় তুলার ব্যবসার উন্নতি ও বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার আলোচনাও বাদ পড়ে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে ভারতে গ্রেট বৃটেনের আর্থিক নীতি, ভারতীয় চাষীর দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা, ভারতীয় তুলার কলে মজুরদের অবস্থা ও উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় মিলসমূহ নিযুক্ত মজুরগণ সস্তা এবং কার্য্যে পটু নয় বটে, তথাপি জাপানের নারী মজুর আজ ল্যাঙ্কাশিয়ারের যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতীয় মজুরও প্রায় তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২। নিচি-ইন মেনসিয়ো বোন (জাপান ও ভারতের তুলার ব্যবসা), রিওকিচি আটানাবে। নিহন হিয়োরোন শা, তোকিয়ো। ১৯৩১। ৩৫৬ পৃঃ। তালিকা আছে।

জাপানী গ্রন্থকার ভারতের ও জাপানের তুলার ব্যবসার তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯২৬ সনের অঙ্ক ও তথ্য তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি তিনি উভয় দেশে ঐ ব্যবসার যে ক্রমোন্নতির ইতিহাস এবং অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় উহার গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উপাদেয় হইয়াছে। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে উভয় দেশের তুলা ব্যবসায় সংগঠন, উৎপাদন ও লাভালাভ লইয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে উভয় দেশের পরিচালনার কথা স্থান পাইয়াছে—উৎপাদনের প্রণালী কি, পুঁজিপাটাই বা কিরূপে খাটান হইয়া থাকে। কাঁচা মাল কোন্ দেশ কি উপায়ে সংগ্রহ করে এবং তৈরী জিনিষ বা বাজারে কি ভাবে ফেলে, এ বিষয়ে তিনি তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জাপানে আধুনিক তুলার ব্যবসা ভারতের অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে, এ বিষয়ে জাপানের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য প্রকার বাধাবিঘ্নের অন্ত নাই। তথাপি আজ জাপান ভারতের বাজারে ভারতীয় মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে ও ক্রমাগত সেই বাজার কাড়িয়া লইতেছে,—ইহা ভাবিবার বিষয় বটে।

এই সম্পর্কে বঙ্গীয় অর্থবিজ্ঞান পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কটন ট্রাফিক : ইট্স সিগ্‌নিফিকান্স (তুলা শুল্কের মর্ম্মোদ্ঘাটন) নামক পুস্তিকাও দ্রষ্টব্য। উহাতে জাপান ও ভারতের তুলার সম্পর্ক বিশদভাবে প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

দুনিয়ার আর্থিক সঙ্কট

দি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ক্রাইসিস্ (দুনিয়ার আর্থিক সঙ্কট), ১৯২৯-৩১, পল আইনৎসিগ্। দ্বিতীয় সং। ম্যাকমিলান, লণ্ডন। ১৯৩২। ১৪+১৭০ পৃঃ।

ডক্টর আইনৎসিগ্ এই কেতাবে সংক্ষেপে সঙ্কটের কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আর্থিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দরকার যে কর্তৃপক্ষদের সহিত উৎপাদকদের, উৎপাদকদের সহিত উৎপাদকদের, কর্তৃপক্ষদের সহিত কর্তৃপক্ষদের (রাষ্ট্রীয়), নিয়োক্তার সহিত মজুরের, উৎপাদকদের সহিত ফড়িয়া ও খাদকগণের এবং ব্যাঙ্কসমূহের সহিত অন্য ব্যাঙ্ক বা মুদ্রা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ হইবে। বর্ত্তমান দুনিয়ার আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই শেষ কথা নয় একথা মনে রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় সোবিয়েট রুশিয়া যে পরীক্ষা চালাইতেছে তাহাতে অনন্য পুঁজি-শাসিত দেশগুলির চেয়ে বেশী সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ও উচু ধরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে, তবে গ্রন্থকারের মতে পুঁজিকারীর দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং সেজন্য দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই।

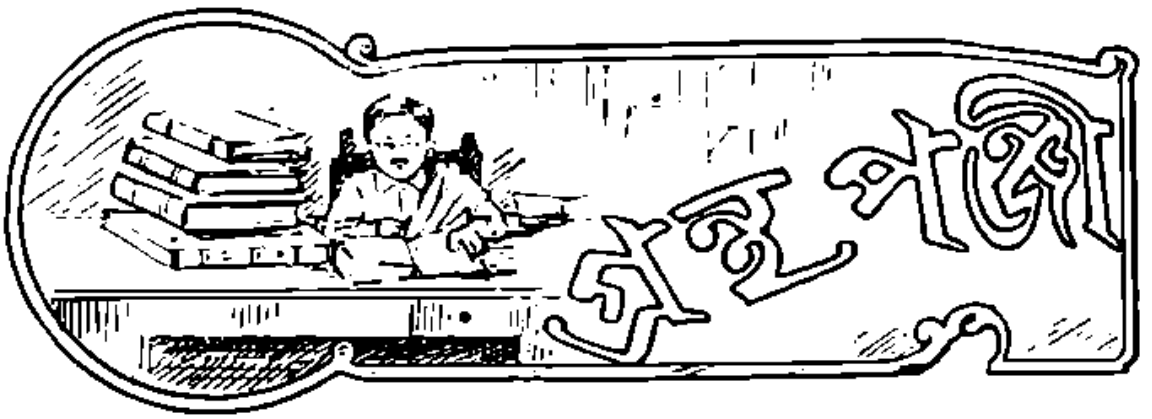

১। "দি ইণ্ডিয়ান্ পেজেণ্ট আপ্রুটেড্। এ ষ্টাডি অব্ দি হিউম্যান মেসিন"। (ভারতীয় চাষীর সর্ব্বনাশ হইতেছে। মানুষরূপ যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা।) মার্গারেট হীড্। লংম্যান্স্ গ্রীন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোরোণ্টো। ১৯৩১। ১৪+২৪৬ পৃঃ। ছবি আছে।

২। "ল্যাকাশায়ার অ্যাণ্ড দি ফার ইষ্ট" (ল্যাঙ্কাশায়ার ও সুদূর প্রাচী), ফ্রেডা উট্‌লে। আলেন আনউইন, লণ্ডন। ১৯৩১। ৩৯৫ পৃঃ।

৩। "লেবার্স ফিউচার অ্যাট্ ষ্টেক" (মজুরদের ভবিষ্যতে বাধা), ক্লিফোর্ড আলেন। আলেন আনউইন, লণ্ডন। ১৯৩২। ৭৭ পৃঃ।

৪। "লেবার এগ্রিমেণ্টস্ ইন্ কোল মাইন্স্। এ কেস্ ষ্টাডি অব্ এভ্‌লিনিষ্ট্রেশন অব্ এগ্রিমেণ্টস বিটুইন মাইনার্স এণ্ড অপারেটারস্ অর্গানিজেশনস ইন্ দি বিটুমিনাস্ কোল মাইন্স্ অব্ ইলিণ্ডনয়"। (কয়লার খনিসমূহে মজুরদের চুক্তি। ইলিণ্ডনয়ন্থ বিটুমিনাস কয়লার খনিসমূহে মালিক ও মজুরদের সঙ্ঘসমূহের মধ্যে পরস্পর চুক্তি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে)। লুই ব্লক। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল রিলেশন্স সিরিজ্। রাসেল সেজ্ ফাউণ্ডেশন, নিউইয়র্ক। ১৯৩১। ৫১০ পৃঃ। ২ ডলার।

৫। "দি অষ্ট্রেলিয়ান ইকনমি। সিম্পল ইকনমিক ষ্টাডিজ্। অষ্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি। সরল আর্থিক পাঠ।) ডি বি কোপল্যাণ্ড। অ্যাঙ্গাস্ এণ্ড রবার্টসন, সিড্‌নি। ১৯৩১। ১৭+১৮ পৃঃ।

৬। "আইনে নিউরে আউফাজুঙ্গ বোদ্ আর্কাইটুন-রেখ্ট" (মজুর-নীতির এক নয়া ধারার কথা), ডক্টর পেটের ডেবেন। মাথিয়াস্ নাউ, কোন্‌সে-কার্টহাউস্: হ্যাণ্টার ডি গ্রুয়িটের, বার্লিন। ১৯৩১। ১১৪ পৃঃ।

৭। "আর্কাইটুস্ গেরিখ্‌টস্ গেসেট্‌ৎস" (জার্মাণ মজুর আইন ব্যাখ্যার বিশ্বকোষ), ডক্টর হেরমান ডেনি ও ডক্টর এরিখ্ কোজমার। দে বেন্‌স্‌হাইমের, বার্লিন, লাইপৎসিগ্। ১৯৩১। ৭৪৫ পৃঃ।

৮। "দি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ক্রাইসিস্" (দুনিয়ার আর্থিক সঙ্কট), ১৯২৯-৩১, পল সাইনৎসিগ্। দ্বিতীয় সংস্করণ। ম্যাকমিলান, লণ্ডন। ১৪+১৭০ পৃঃ।

৯। "সোশ্যাল পলিটিক্স এণ্ড মডার্ণ ডিমক্রেসিজ্"। সামাজিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান গণতন্ত্রসমূহ। ডক্টর চার্লস ডব্লিউ পিপ্‌কিন। ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক। ১৯৩১। প্রথম ভাগ—৩৪+৩৭৭ পৃঃ। দ্বিতীয় ভাগ—৭+৪১৭ পৃঃ।

১০। "নিগ্রো ইয়ার বুক। অ্যান এন্‌নুয়েল এন্‌সাই-ক্লোপিডিয়া অব্ দি নিগ্রো ১৯৩১-৩২"। (নিগ্রো বাৎসরিকী। ১৯৩১-৩২ নিগ্রো বিশ্বকোষ।) নিগ্রো ইয়ার বুক পাবলিশিং কোং, টাস্কেজি ইন্‌ষ্টিটিউট, আলাবামা। ১৯৩১। ১৫+৫৪৪ পৃঃ। ২ ডলার।

১১। "একনমিক এসেজ্ এণ্ড এড্রেসেস" (আর্থিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা), এ সি পিগু, রবার্টসন, এইচ্ ডেনিস্। পি এস কিং এণ্ড সন, লণ্ডন। ১৯৩২। ৭+২১৪ পৃঃ। ১০ শি ৬ পে।

মরুভূমিতে সোনা-ফলানো*

আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইবার প্রয়োজন আছে, আমাদের দেশের কৃষকগণ একথা জানিয়াও সার-প্রয়োগের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় না। গোবর ত এখন সাররূপে ব্যবহৃত হয় না বলিলেও চলে;—জ্বালানিরূপেই আজকাল ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইবার জন্য সারের যে বিশেষ প্রয়োজন, ইহা তিন হাজার বৎসর ধরিয়া চীনদেশের কৃষকগণ অবগত আছে। তাহারা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে চাষ-বাসের কাজ করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ইংলণ্ডে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুসরণে এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক সার-প্রয়োগ করিয়াও সেখানকার কৃষকগণ চীনের কৃষকদের চেয়ে বেশী ফসল জন্মাইতে পারে না। চীন একটি জনবহুল-দেশ; কিন্তু সেখানে একই জমি তিন চার হাজার বৎসরের উপর চাষ করিয়াও চীনের অধিবাসীরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিজেদের খাদ্য উৎপন্ন করিতেছে। চীন দেশের জমি হইতে কি প্রণালীতে এত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মাইতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য অধ্যাপক কিং ১৯০৯ সনে চীনদেশে ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন, চীনারা একই জমি তিন হাজার বৎসর ধরিয়া চাষ করিতেছে; এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই জমি হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতেছে; চীনদেশে জমিতে সার-প্রণালীর সাহায্যে কি প্রকারে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়, জলাভূমি ও নদীর নিম্নস্থলে অবস্থিত জমিগুলিকে কি উপায়ে কৃষির উপযোগী করিয়া তোলা হয়, কি প্রণালীতেই বা শস্য-উৎপাদন করিবার জন্য জমিগুলিকে আবাদ করা হয়, কথায় বা মানচিত্রে তাহার স্পষ্ট ধারণা জন্মানো সম্ভব নহে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৩৫৭ সনে চীনদেশের এক সম্রাট ইয়াও তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ইউকে জলসেচ বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। জল-নিকাশ, বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা ইঁহার কর্ত্তব্য ছিল। চীনদেশের সম্রাটগণ সকলেই কৃষি-উন্নতির দিকে সর্ব্বদা মনোযোগ দিয়া আসিয়াছেন; এবং ইউ যে বিপুল কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্তও সেই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য চলিতেছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১১২২ সনে চৌবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে বৃদ্ধি-বিভাগের প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সরকারী দপ্তরে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। কোন্ জমি কোন্ ফসলের উপযুক্ত, কোন্ জমি গোচারণের উপযোগী, সমস্ত আবাদী জমিতে ফসল রোপণ উন্নত কৃষি-যন্ত্রের সদ্ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকারের আবর্জ্জনা ও সবুজের মলমা হইতে সার প্রস্তুত প্রণালী, এবং উহা প্রয়োগ করিয়া একই জমি হইতে বৎসরে নানাপ্রকার ফসল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয় জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া উক্ত মন্ত্রীর কর্ত্তব্য ছিল। অধ্যাপক কিং বলেন যে, তিনি এমন জমিও দেখিয়াছিলেন, যে জমি হইতে প্রতি একরে ২৫ হইতে ১১৬ বুশেল (এক বুশেল আমাদের দেশের প্রায় ৯৷৷০ সেরের সমান) পর্য্যন্ত গম উৎপন্ন হয়। অথচ আমেরিকার গমের ফলন প্রতি একরে গড়পড়তায় ১৫ বুশেল, ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণিতে ২৩ বুশেলের বেশী নহে। ইহা ছাড়া তিনি আর যে সকল ফসলের ফলন দেখিয়াছিলেন, তাহা আপনারা একবার শুনুন। প্রতি একরে ভুট্টা ৬০ হইতে ৬৮৷০ বুশেল, আলু ২৮০ বুশেল, মিঠা আলু ৪৪০ বুশেল, শুষ্ক জমির ধান ২০ হইতে ২৬ বুশেল, জলাভূমির ধান

---

* ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৬২ বুশেল। চীনদেশে একই জমিতে বৎসরে দুই তিনবার ফসল জন্মানই সাধারণ নিয়ম। চীনদেশের একজন কৃষকের পক্ষে এক একার জমি হইতে বৎসরে ১৬০ হইতে ২০০ ডলার পর্য্যন্ত পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এক ডলারে প্রায় তিন টাকা।

কৃষি সম্বন্ধে অপর একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, চীনদেশে জীবের মল-মূত্রাদি যাবতীয় অপবিত্র পদার্থই সাররূপে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র চীন ও জাপানে বিষ্ঠার আদর খুব বেশী, কিন্তু আমাদের দেশে বিষ্ঠাকে আমরা কেবল ঘৃণার চক্ষেই দেখি এবং উহাকে কাজে লাগাইবার কোন ব্যবস্থাই করি না। এই জন্য প্রত্যেক বৎসরই আমরা কোটি কোটি টাকার ফসল অপচয় করিয়া ফেলি। গত বৎসর এই কৃষি-প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম যে, বারাকপুরে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৩০।৪০ বিঘা জমির উপর ট্রেঞ্চিং প্রাউণ্ড করা হয়। সেই সমস্ত জমি নীলামে পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা তিন চার হাজার টাকা দেলামী দিয়া সারের জন্য কিনিয়া লয়। আমাদের বাংলার কৃষকেরা এত বার দিয়াও বাঁচে না। সেখানে কানেক নামে একজন পশ্চিমা মুসলমান শাক-সব্জী উৎপন্ন করিয়া বহু পাকা বাড়ী করিয়াছে।

মলমূত্ররূপ সারের প্রয়োজনীয়তা

আমি বৎসর বৎসর বাঙ্গালোর ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সে যাই। বাঙ্গালোরে বৃষ্টিপাত অতি কম। বর্ষার দু এক মাস ছাড়া সেখানে মাটি সকল সময় এত বেশী নীরস থাকে যে, ঘাস-তৃণাদি পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়; আবার সেখানে পাহাড়ে জমি। কিন্তু জলসেচন দ্বারাও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেখানকার জমি হইতে সোনার ফসল উৎপন্ন করা হয়। কেবল দু-একটি ছাত্রাবাসের পায়খানার মল প্রথমতঃ একটি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ মলের উপর একপ্রকার জীবাণুর চাষ করা হয়। এই জীবাণুর ক্রিয়াতে মলের গন্ধ দূর হইয়া যায়; এবং পরে এই গন্ধহীন মলকে জলের সহিত মিশাইয়া কিছুক্ষণ ফিতানো হয়। এই মলযুক্ত জল বাঙ্গালোরের মরুভূমি সম মাটিতে মাঝে মাঝে সেচন করিয়া সোনা ফলান হইতেছে। আমাদের এই বাংলাদেশেও উপরোক্ত প্রণালীতে মল-মূত্রাদিকে সারক্রপে পরিণত করিয়া মাটির উৎপাদিকা-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে পারা যায়। সম্প্রতি স্বাস্থ্যবিভাগের চেষ্টায় খড়দহের নিকটে যে সকল পাটের কল আছে, তাহার মাত্র দু-একটি কলের কুলিমজুরদের মল-মূত্র ইত্যাদি উপরোক্ত নিয়মে গন্ধহীন করিবার জন্য একটি দীঘি খনন করা হইয়াছে।

চাই কষ্টসহিষ্ণু বাঙ্গালী চাষী

যাহারা কলিকাতা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত দৈনিক যাতায়াত করেন, তাঁহারা গাড়ী হইতে এই দীঘি দেখিতে পান। এই দীঘির মলযুক্ত ঘোলা জল উঠাইয়া ও কয়েক বিঘা জমিতে সেচন করিয়া, সে সকল জমি সারবান করা হইয়াছে। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, ঐ সকল জমির বার্ষিক খাজানা বিঘা প্রতি ৮২৲ টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী কৃষকগণ এত অধিক খাজানা দিয়া ঐ জমি লইতে সাহস করিতেছেন না;—বিঘাভূঁই ৮২৲ টাকা খাজানা দিয়া সেই জমি হইতে লাভ করা তাহাদের পক্ষে যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার! কিন্তু যেমন পলতা অঞ্চলে পশ্চিমারা চাষবাস করিতেছে, এখানকার জমিগুলিও পশ্চিমারা লইতেছে। বাঙ্গালী কৃষকের মত তাহারা উরূপ অধিক খাজানায় ভাল জমি লইতে কিছু মাত্র ভয় পায় না। কারণ, তাহারা বেশ জানে ও বোঝে যে, ঐ সব জমিতে 'বার মাসে তের ফসল' জন্মান যায়। কিন্তু আমরা ত চোখ চাহিয়া দেখিব না, কেবল আরাম কেদারায় বসিয়া চর্চ্চা করাই যে আমাদের স্বভাব। হা অন্ন, হা অন্ন, করাটাই যেন আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহা একমাত্র অলসতা ও শ্রমবিমুখতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেকে আবার বলেন যে, যেখানে গড়ে মাথা-পিছু দুই তিন বিঘার বেশী জমি নাই, যেখানে হাড়ভাঙ্গা-পরিশ্রম করিয়াও কৃষকেরা দু'বেলার পুরা আহারের সংস্থান করিতে পারে না, সেখানে আবার যদি ভদ্রলোকের ছেলেরা কৃষি কাজ আরম্ভ করিয়া কৃষক-

দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করে, তাহা হইলে কৃষকেরা দাঁড়াবেই বা কোথায় এবং অর্থ-সমস্যারই বা কি সমাধান হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যখন বাংলা-দেশের মাথাপিছু গড়পড়তা আয় দশ পয়সা মাত্র, তখন আর অর্থোপার্জনের চেষ্টারই বা কি দরকার? হাত-পা গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকাই ত ভাল। কিন্তু জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইয়া ও উন্নত-শ্রেণীর শস্যাদি জন্মাইয়া দেশের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ান যাইতে পারে। আমাদের তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় কৃষিকার্যকে এখনও অসম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। স্কুল ও কলেজের ছেলেরা বিজ্ঞানে কৃষিকার্য করিতে নারাজ। ও দেশের কোন কোন বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা বাধ্যতা-মূলক। আয়ার্লণ্ডের অন্য নাম এমারল্ড আইল, অর্থাৎ সবুজ ঘাসের দেশ। সেখানে গোধনই শ্রেষ্ঠ ধন। গরুর খাদ্যের জন্য আয়ার্লণ্ডের লোকেরা কত রকমের ঘাস জন্মায়, কিন্তু আমাদের দেশে আমরা গরুকে মা ভগবতী বলিয়া তাহার শিঙে, কপালে সিন্দুর-চন্দন দিয়া পূজা করিয়াই ক্ষান্ত থাকি। গরুর উপযুক্ত খাদ্যের কোন ব্যবস্থা করি কি? শুকনা-খড়ই তাহার একমাত্র আহার। আবার ফরিদপুরে শুনিলাম খড় একরূপ দুষ্প্রাপ্য। এখানকার জেলখানায় যে খড়ের দরকার হয় সে খড় মণপ্রতি দু টাকা আড়াই টাকা মূল্য দিয়া রংপুর অঞ্চল হইতে আনাইতে হয়। উন্নত কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া বৎসরে একই জমিতে আমাদের নিজেদের ও গরুর খাদ্য অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়। জলসেচনের ও সারপ্রয়োগের দ্বারা জমির উর্বরতাশক্তিকে অটুট রাখা যায়।

ফরিদপুর ও খুলনা

আমি বরাবর বলিয়া থাকি, আমি একজন রাসায়নিক; টেষ্ট-টিউব হাতে করিয়া কাজ করাই আমার অভ্যাস; প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ছাড়া আমি কোন কথা বিশ্বাস করি না বা বলি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। এই কৃষিক্ষেত্রে যে সব জন্মিয়াছে, তাহা আপনারা দেখিবেন; তাই আশে-পাশে ত এমন উৎকৃষ্ট সব জন্মায় নাই। সমস্ত মত চাষ, জমির-তদ্বিরও সারপ্রয়োগই ইহার একমাত্র কারণ। গতবার যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এখানকার পুলিশ সাহেব মিষ্টার আজিজুল হকের বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম। একটা বিলাতী বেগুনের গাছ কত বড় হইয়াছে ও তাহাতে কত পরিমাণ বিলাতী বেগুন ফলিয়াছে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার বাগানের কড়াইশুঁটির গাছ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি; কেমন বড় বড় শুঁটি ও কত সুস্বাদু। ইহা ছাড়া ফুলের বাগানেরই বা বাহার কি! সময়মত জমি তৈয়ারী, জল-সেচন ও সার প্রয়োগ করিয়া এইরূপ উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া গিয়াছে। একটু পরিশ্রম করিলে যে আমরা আমাদের নিজের নিজের তরিতরকারী অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন সময়ের অভাব; কৃষিকার্য করিব কখন? কিন্তু তাস-পাশা খেলিবার সময়ের ত অভাব হয় না। কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলে, সময়ের অভাব হয় না। আমরা যেমন সময়ের অপব্যবহার করি, জগতে আর কোন জাতি এমন করে না। আমি আজকাল চীনদেশ সম্বন্ধীয় অনেক অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেছি; চীনাদের অভিধানে আলস্য বলিয়া কোন কথাই নাই। কলিকাতার চীনা পাড়াগুলিতে ঘুরিলেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমি যখন গ্রীষ্মকালে খুলনার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই তখন কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা এবং কে কোথায় চাষবাস করিয়া—তরিতরকারী জন্মাইয়া গ্রামে থাকিয়া নিজেদের আহার-সংস্থানের চেষ্টা করিতেছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা আমার পেশা দাঁড়ায়। যশোহর-খুলনার ইতিহাস-লেখক যৌলভীপুর কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র আমাকে এ বিষয়ে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহা আপনাদিগকে একবার শুনাইয়া আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ একটু কষ্টকর ব্যাপার। সকল সংবাদ সত্যভাবে কেহ বলে না, পাছে কোন নূতন ট্যাক্স প্রভৃতির বিপদ হয়। যাহা হউক, এখন হইতে

ক্রমান্বয়ে আপনাকে কিছু কিছু রিপোর্ট পাঠাইব। আজ কিছু খবর লিখিলাম।

১। শ্রীহীরালাল মিত্র, দাং সেনহাটি—গত বৎসর /১৸০ বিঘা জমিতে বেগুন, আলু, পাট ও কপি জন্মাইয়াছিলেন। বেগুন ২৬৲, পাট ২৫৲, ইক্ষু ১৫০৲, বাঁধাকপি, ১২৭৲ মোট—৩২৮৲ বিক্রয় করেন। কিন্তু গত বৎসর এই কার্য্যের প্রথম বর্ষ বলিয়া, কূয়া-কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা ও বেড়া-দেয়া প্রভৃতি কার্য্যে প্রায় ৩০০৲ টাকা খরচ গিয়াছে। অতি অল্পপরিমাণই লভ্যাংশ হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে যে সব ফসল জন্মান হইয়াছে, তাহাতে ইক্ষু, ১৭৫৲, পাট ৩০৲, বেগুন ২৫৲, কপি ১২৫৲, মোট আনুমানিক ৩৪৫৲ টাকা লাভের মধ্যে মজুর প্রভৃতির আনুমানিক খরচ ১০০৲ টাকা যাইতে পারে; সুতরাং লভ্যাংশ ২৫০৲ টাকার কম হইবে না। তাঁহার জমি মাত্র /১৸০ বিঘা।

২। দৌলতপুর হইতে দুই মাইল দূরে পাঁইকুড় গ্রাম। সেখানে মেনাজ সেখ বাস করে। সে প্রথম একটি পুকুর কাটিয়া, তাহার পাহাড়ের উপর আনারস জন্মায়। অল্প পরিশ্রমে উহাতে প্রচুর আনারস হয়; এই আনারস যেমন বড় তেমনই সুমিষ্ট হয়। উহার নমুনা আপনাকে প্রতি বৎসর পাঠাইয়া থাকি। দশ পনর বৎসরের মধ্যে সে তিন চারিটি পুকুর কাটিয়াছে, পুকুরের জোরাল মাটির উপর আনারস গাছ লাগাইয়া প্রতি বৎসর সহস্রাধিক টাকা লাভ করিতেছে। তাহার জমির পরিমাণ চার পাঁচ বিঘার অধিক নহে। উহাতে এ বৎসর চারি হাজারের অধিক আনারস হইয়াছে; লভ্যাংশ ৮০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। মেনাজ সেখ বেগুন, কুমড়া, কিপ্পা প্রভৃতি অন্যান্য তরকারীও উৎপন্ন করে। তাহাতেও মাসমাস তাহার বাজার চলে। অকালে আনারসগুলি ৸০ আনা হইতে ১৷০ সিকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। তাহার আনারসগুলির বিশেষত্ব আছে বলিয়া খোকালেও ৵০ আনা হইতে ৷৵০ আনা পর্য্যন্ত মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্রয় হয়। এই আনারসের ব্যবসায়ে সে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে।

আর আমরা ভদ্রলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে দোলানী করিতে যাই, আর চাষকে চাষার কাজ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি!

মজুর-ভারত ও বিশ্ব-দৌলত*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

"মজুর" আর "গরীব লোক" একার্থক নয়

মজুর বলিলে আমাদের দেশে সাধারণতঃ গরীব লোক বুঝায়। কিন্তু এইরূপ বুঝা ঠিক নয়। বাংলা দেশের পাটের কলে, চা বাগানে, খনিতে যে সব মজুর কাজ করে তাহাদের বেতন অনেকেরই মাসে বিশ পঁচিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা। ইহাদের চেয়ে বেশীও কেহ কেহ রোজগার করে। আবার কম বেতনও কেহ কেহ পায়। বোম্বাই অঞ্চলের তুলার কুলিরও বেতন মাসে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা। বুঝা যাইতেছে যে, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের লোক আমাদের দেশে একমাত্র মজুর নয়। আমরা—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজের অনেকেই,—মাসে বিশ পঁচিশ ত্রিশ টাকার বেশী রোজগার করি না। অবশ্য মাসে বিশ পঁচিশ টাকা আয়—বিশেষ কোন সচ্ছলতার লক্ষণ নয়। এই আয়ের লোককে গরীব বলিতেই হইবে। কেন না মানুষের মতন জীবনযাপন

* অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম (১৭ ডিসেম্বর ১৯৩১)।

করিতে হইলে যে সকল জিনিষের দরকার তাহার অনেক জিনিষই এই আয়ে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাহিনার লোককে সহজে এক কথায় গরীব সমঝিয়া রাখা সম্ভব। কিন্তু মজুর শব্দ ব্যবহার করিবামাত্র একটা গরীব সম্প্রদায়ের কথা বলা হইতেছে এইরূপ ভাবা উচিত নহে। বাংলা দেশের অথবা গোটা ভারতের নরনারীর আয়ের পরিমাণ এত কম যে মজুর-শ্রেণীকে একটা গরীব সম্প্রদায় ধরিয়া লইলে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বলিলে যাহা বুঝায় সেই সম্প্রদায়ের লোককেও ঠিক সেইরূপ গরীব সমঝিয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে, মজুর শ্রেণীকে বিশেষভাবে একটা গরীব শ্রেণী বুঝিয়া রাখা ঠিক নয়।

আমার বিবেচনায় আমাদের দেশে অথবা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যত লোক খাটিয়া খায় সকলেই মজুর। কেহবা হাতে পায়ে খাটিয়া খায়, কেহবা কলম পিষিয়া খাটিয়া খায়, কেহবা যৎকিঞ্চিত মগজ খাটাইয়া খাটিয়া খায় কেহবা আর কিছু খাটাইয়া খায়। শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই মেহনৎ করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। কাজেই যে সকল লোক খামে, মাঠে, কারখানায় অথবা আর কোথাও হাতে পায়ে খাটিয়া ভাতকাপড় জুটাইয়া থাকে তাহাদিগকে বিশেষভাবে মজুর বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেরাণী, ইস্কুল মাষ্টার, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, কারখানার এঞ্জিনিয়ার, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী মায় লাটসাহেব পর্য্যন্ত সকলেই মেহনৎ করিয়া খায়। সকলেই অপর কোন মনিষের অথবা উপরওয়ালার নিকট হইতে তঙ্খা পাইয়া জীবনধারণ করে অর্থাৎ সকলেই মজুর।

বিদেশী ভাষায় ইংরেজামেরিকায় একটা কথা আছে তাহাতে বুঝা যায় যে—সংসারে গোলাম দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর গোলাম ঘোড়া খাটে পরে আর তাদের কপালে থাকে সাদা অর্থাৎ তাহারা মরণা না খাঁটিয়া কাজ চালাইতে পারে—যথা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, ব্যাঙ্কের কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টার ইত্যাদি। সোজা কথায় ইহাদের নাম "হোয়াইট কলার্ড শ্রেড"—সাদা কলার-পরা গোলাম। আর অপর শ্রেণী হইতেছে এমন লোক যাহারা হাতের তালুতে লোহালক্কড় কাঠ মাটী কয়লা ধাতু ইত্যাদি বস্তু সংক্রান্ত কাজ করিতে বাধ্য, কাজেই তাহাদের জামাটা—কর্ম্মক্ষেত্রে অন্ততঃ—ময়লা থাকে, আর তাহারা সাধারণতঃ কাজের সময় কলার পরে না অথবা কলারটা যদিও পরে সেটা ময়লা দেখা যায়।

মজুরি করা অন্যতম পেশা বিশেষ

যাহা হউক আমার বিবেচনায় "মজুর" "মজুরি" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে যাইয়া কি বাহিরের দুনিয়ার লোক, কি ভারতের লোক সাধারণতঃ একটা ভুল ধারণা পুষিয়া চলিতেছে। এই ভুলটা রাখা উচিত নয়। আমি অন্ততঃ সেই ভুলটা চালাইতে রাজী নই। পরিশ্রম করে, দুনিয়ার সব লোক। বেতনের উপর নির্ভর করে দুনিয়ার প্রায় সব লোকই। বিনা মেহনতে অথবা বিনা বেতনে বাঁচিয়া আছে এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ অল্প। তাহাদের কথা সংসারের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার সময় বাদ দিয়া চলিলেও ক্ষতি হয় না। সাধারণতঃ যাহাদিগকে মজুর বলা হইয়া থাকে তাহারা তাহা হইলে কিরূপ জীব? আর্থিক হিসাবে তাহাদিগকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলিবে? আমার বিচার অতি সোজা। চাষ করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। বাঁধা মাহিনে কেরাণীগিরি করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। ইস্কুলমাষ্টারী করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। আদালতে জবিহতি করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। ওকালতী করা, ডাক্তারী করা, গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করা, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী করা ইত্যাদিও কতকগুলি ব্যবসা অথবা পেশা। ঠিক সেই ধরণেরই একটা পেশা বা ব্যবসা হইল খাদে, কারখানায়, চা বাগানে, তুলার কলে মজুরি করা। আমার চিন্তায় সংসারে যত প্রকার আর্থিক জীবন-ঘটিত কাজ থাকিতে পারে সবগুলিই ব্যবসা বা পেশা বিশেষ। অতএব মজুর শ্রেণী আমার কাছে সংসারের অন্যান্য হাজার ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার শ্রেণীর মতন অন্যতম শ্রেণী ছাড়া আর কিছু নয়।

দারিদ্র্য, সচ্ছলতা, ঐশ্বর্য্য, কষ্টের সংসার, সুখের সংসার ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে তর্ক না তুলিয়াও আমি মজুর, মজুর-

জীবন, মজুরি, মজুরের স্ত্রীপুত্র, মজুরের স্বাস্থ্যোন্নতি, মজুরের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। বুঝা যাইতেছে যে, মজুর-সমস্যা নামক একটী স্বতন্ত্র সমস্যা আমার মাথায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য লোকের সম্বন্ধে যদি কোন সমস্যা থাকে তাহা হইলে সেই সমস্যাই আমি এই তথাকথিত মজুরদের সম্বন্ধেও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। আমার জিজ্ঞাস্য,—চাষীদের কোনো সমস্যা আছে কি না, কেরাণীদের কোনো সমস্যা আছে কি না, ইস্কুলমাষ্টারদের কোনো সমস্যা আছে কি না, সরকারী চাকুরেদের কোনো সমস্যা আছে কি না? যদি থাকে তাহা হইলে আমি আদবৎ বলিব যে মজুরদেরও সমস্যা আছে। আমার বিবেচনায় সমস্যা আছে প্রত্যেক পেশাতে, প্রত্যেক আর্থিক কাজ কর্ম্মে, প্রত্যেক শ্রেণীতে। কেরাণীদেরও সমস্যা আছে, চাষীদেরও সমস্যা আছে, সরকারী চাকুরেদেরও সমস্যা আছে। ঠিক সেই হিসাবে খাদের কুলি, কারখানার মজুর, জাহাজের খালাসী, ট্রামের কন্‌ডাক্টর, আমদানি-রপ্তানি আফিসের দরোয়ান, হোটেলের বাবুর্চ্চি, আর পরিবারের সানদামা ইত্যাদি তথাকথিত মজুরদেরও সমস্যা আছে।

মজুর শ্রেণীর তিন সমস্যা

সমস্যাগুলি কি? জবাব অতি সোজা। আমরা যে যেখানেই কাজ করিনা কেন, সকলেই অন্নবস্ত্রের জন্য খাটাইয়া থাকি, একথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথাও সত্য যে,—আমরা সর্ব্বদাই মানুষের মতনই বাঁচিয়া থাকিতে চাই। কি চাষী, কি কেরাণী, কি সরকারী চাকুরে কি খালাসী—সকলের প্রধান সমস্যা মজুরির হার। যতখানি খাটিতেছি ঠিক সেই মাপে তথা পাইতেছি কি না ইহাই প্রথম ভাবিবার কথা। অথবা যে পরিমাণ বেতন পাইতেছি সেই বেতনে আমার মাস চলিতেছে কি না। এখানে আমার সঙ্গে বুঝিতে হইবে আমার পরিবারস্থ আরো দুই একজনের অন্নবস্ত্র। বলা বাহুল্য মজুরীর হার সমস্যা ফিনফিনে চাদরওয়ালা বাবু-জাতীয় গোলামদের জীবনে যতটা দেখা যায় তার চেয়ে কম দেখা যায় না কুলী খালাসী বরকন্দাজদের জীবনে।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে কাজের ঘণ্টা সম্পর্কিত। রোজ কতক্ষণ করিয়া খাটা যাইতে পারে? যার ঘণ্টা রোজ ঠিক থাকা উচিত কি দশ ঘণ্টা রোজ খাটা উচিত, কি আট ঘণ্টা কি ছয় ঘণ্টা—এসব প্রশ্ন কেরাণী জীবনের একটা বড় কথা সন্দেহ নাই। কারখানার মজুরদের বেলায়ও সেই প্রশ্নগুলি উপস্থিত হয়। এই সময়ের কথা ভাবিতে গেলে ছুটীর কথা ভাবিতে হয়। সপ্তাহে কতদিন অথবা মাসে কত ঘণ্টা বা সপ্তাহে কত ঘণ্টা ও মাসে কতদিন অথবা বৎসরে কত সপ্তাহ কাজের কামাই চলিতে পারে, আর এই কামাইএর সময় বেতন পাওয়া যাইবে কিনা অথবা কামাইএর বেতন যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে বৎসরের যে কয়দিন কাজ করা যাইবে সেই কয়দিনের বেতনের হার কত হওয়া উচিত এই সবও ভাবিবার কথা। তাহা ছাড়া কাজটা সুরু করা উচিত কখন—একদম সকালে, না আটটার সময়, না দশটার সময়? দুপুর বেলা কাজ বন্ধ থাকা উচিত কিনা, থাকিলে কতক্ষণ? সন্ধ্যার সময় অথবা রাত্রি-কালে কতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ চালানো যুক্তিসঙ্গত এই সব প্রশ্ন একমাত্র বাবু মজুরদের জীবনের বেলায় উঠিতে পারে এইরূপ ভাবা যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যান্য মজুরদের বেলায়ও এই সকল সমস্যা উঠিতে বাধ্য।

তৃতীয় সমস্যা হইতেছে—কার্য্যক্ষেত্রের আবহাওয়ার বিষয়ে। আবহাওয়া বলিলে একমাত্র জল হাওয়ার কথা হইবে—এরূপ নয়। যে সকল লোকজনের সঙ্গে কাজ করা যাইতেছে তাহাদের ধরণধারণ, তাহাদের মেজাজ, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশ ইত্যাদিও বুঝিতে হইবে। আমি যখন কেরাণী হিসাবে কোনো আফিসে চাকুরী করিতে যাই তখন আমি দেখি যে, যে ঘরটায় আমাকে কাজ করিতে দেওয়া হইল সেই ঘরটা সাঁতসেঁতে না শুকনো, সেই ঘরটায় আলো আসে কিনা, সেই ঘরে ঘরময়ের সময় হাওয়া পাওয়া যায় কিনা, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য আমি যদি কাপড়ের কলে নোকরী চুঁড়িতে যাই তখনও আমাকে এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কোনো না কোনো রকমে চাকুরী পাওয়া আমার জীবনের পক্ষে আমার পরিবারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কর্ম্মক্ষেত্রের আবহাওয়া যেমই আমার স্বাস্থ্যের,

আমার কর্ম্মদক্ষতার ক্ষতি হইবে কিনা তাহার কথা প্রথমেই ভাবিয়া দেখিতে চাই।

সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথায় প্রত্যেক মজুর—সে বাবু-মজুরই হউক অথবা তথাকথিত চাষাভূষা'র মজুরই হউক—খতাইয়া দেখিতে বাধ্য। আমি যেখানে চাকুরী করিতেছি সেখানে আমার উপরওয়ালা বাবুর মেজাজ কি রকম। কথায় কথায় সে ব্যক্তি আমার উপর জুলুম চালায় কিনা। তাহার মেজাজ তোষামোদ করিয়া চলা আমার পক্ষে সম্ভবপর কিনা। অথবা আমাকে তাহার বাড়ীর জন্যও কিছু কিছু সওদা খাটাইয়া লওয়া আইনতঃ অথবা বে-আইনী ভাবে আশা করা হইতেছে কিনা। এই সকল প্রশ্ন প্রত্যেক কেরাণীকে, প্রত্যেক ইস্কুলমাষ্টারকে সর্ব্বদাই নিজ নিজ জীবনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। কেননা চাকুরী করিতে হইলে উপরওয়ালা থাকেই থাকে। কেবলমাত্র উপরওয়ালা নয়, কয়েকজন সহযোগী, সমানপদস্থ লোকও থাকে। তাহা ছাড়া কয়েকজন নিম্নপদস্থ লোকও কর্ম্মক্ষেত্রের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে বাধ্য। এই সকল লোকের চরিত্র, তাহাদের ব্যবহার ইত্যাদি আমার জীবনের উপর, বিশেষতঃ আমার কর্ম্মক্ষেত্রের কাজকর্ম্মের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাহা তুলিয়া আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভবপর হয় না। একথা বাবু-মজুর মাত্রেই অতি সহজে বুঝিবে। অন্যান্য মজুর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বোধ হয় আরো জোরের সহিত বুঝিয়া রাখিলে মজুর-জীবনের তৃতীয় সমস্যাটী বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ধরিতে পারা যাইবে।

মজুর আমার "পূজাস্থান" কেন?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি মজুরকে পৃথিবীর অন্যান্য আর্থিক পেশার মতন অন্যতম পেশার প্রতিনিধিরূপে বিবৃত করিলাম। এইবার মজুর সম্বন্ধে একটা গভীরতর কথা বলিব। মজুরকে আমি বর্ত্তমান যুগের, বর্ত্তমান জগৎ অন্যতম বড় প্রতিনিধি বিবেচনা করি। বর্ত্তমান জগৎ বলিলে বুঝিতে হইবে যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কলকারখানা-শাসিত, আধুনিক ক্রোধবীর্য্য-বহুল স্বয়ংশাসিত ডেমক্রাটিক নরনারীর দুনিয়া। এই দুনিয়াটা সৃষ্টি করিয়াছে কাহারা? নিশ্চয়ই তাহারা, যাহারা মাথা খাটাইয়া বাষ্পযন্ত্র আর বাষ্প-যন্ত্রের সন্তানসন্ততিরূপ অসংখ্য কলকারখানা উদ্ভাবন করিয়াছে। অর্থাৎ টেকনলজী আর টেক্‌নলজী বিদ্যা সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি লোক হইতেছে বর্ত্তমান জগতের জন্ম-দাতা। কিন্তু একমাত্র উদ্ভাবনার সাহায্যে, একমাত্র আবিষ্কারের ফলে এই সব নয়া নয়া যন্ত্রপাতি সংসারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে কি? না। তাহার জন্য দরকার হইয়াছে হাজার হাজার নিপুণ মিস্ত্রী, কারিগর, খনিষ্ঠ মজুর। লক্ষ লক্ষ মজুর হাত-পা লাগাইয়া টেক্‌নলজীতে পোক্ত না হইয়া উঠিলে, কি ইয়োরোপে কি আমেরিকায় কি এশিয়ায় কি আমাদের বাংলা দেশে,—কলও চলিত না, রেলওয়েও চলিত না, ষ্টীমারও চলিত না, কারখানাও চলিত না, খাদও চলিত না। যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রবর্ত্তক নামজাদা বিজ্ঞানবীরেরা যদি আমার "পূজার স্থান" হন তাহা হইলে এই সকল বিজ্ঞানবীরের সহায়ক এই সকল এঞ্জিনিয়ারের সহযোগী কর্ম্মবীর মিস্ত্রী, কর্ম্মবীর মজুর ইত্যাদিও আমার নিকট "পূজা-স্থান।" তথা-কথিত মজুরই বর্ত্তমান জগতের স্রষ্টা। তাহারাই নূতন নূতন কলকব্জা সমাজের ভিতর পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া দিয়াছে। টেক্‌নলজি জিনিষটা যে পৃথিবীর সকল দেশে চলিতে চলিতে সার্ব্বজনীন, ডেমক্রেটাইজড্ হইতে পারিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই সকল মজুরবীরদের কৃতিত্ব। মজুরদেরকে একটা বে-সে পেশার প্রতিনিধি বিবেচনা করি না! মজুরেরা আমার নিকট বর্ত্তমান জগৎ-স্রষ্টা কর্ম্মবীরদের অন্যতম। এই গেল মজুরদের আসল কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রথম কথা।

এই সঙ্গে আর একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। মজুরদেরকে আমি মস্তিষ্কজীবী হিসাবেও বড় বিবেচনা করিয়া থাকি। সাধারণ লোকের বিশ্বাস,—যাহারা কলম পিষিয়া খায় তাহারা মস্তিষ্কজীবী, যাহারা খবরের কাগজ লেখে, যাহারা ইস্কুলমাষ্টারী করে, যাহারা সরকারী চাকুরে, যাহারা সভা সমিতিতে গলাবাজী করে—এক কথায় সেই সব লোককেই মস্তিষ্কজীবী বলা হইয়া থাকে। এই ধারণার ভিতর অনেক ভুল আছে। বস্তুতঃ মাথা খাটায় না এমন

লোক পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। এমন কি অতি নিরক্ষর চাষীও প্রতিমুহূর্ত্তে মাথা খাটাইয়া তাহার আবাদ চালাইয়া থাকে। কাজেই একমাত্র বাক্-সর্ব্বস্বকে অর্থাৎ সাদা কলারওয়ালা গোলাম জাতকে আমি মস্তিষ্কজীবী বিবেচনা করিতে পারি না। মিস্ত্রীদের কথাই বলিতেছি। অন্যান্য দেশের মিস্ত্রীরা অবশ্য আজকাল লিখিতে পড়িতে পারে আর আমাদের দেশের মিস্ত্রীদের অনেকেই নিরক্ষর। প্রশ্ন এই,—অন্যান্য দেশের মিস্ত্রীরা তাহাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী: লোক হইতে মাথা খাটানো হিসাবে কম কি? আর আমাদের সমাজেই বা কি দেখিতে পাই? নিরক্ষর মিস্ত্রী যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করিবার সময় যে ধরণের মাথা খাটায় তাহার চেয়ে কি বেশী মাথা খাটায় তাহারা যাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলম পিষিয়া নকল করিয়া যাইতেছে অথবা ইস্কুল কলেজে বসিয়া কতকগুলি বইএর লেপা বকিয়া যাইতেছে? মজুরদেরকে আমি কেরাণী ইস্কুলমাষ্টারের চেয়ে কোনো হিসাবে কম মস্তিষ্কশালী বিবেচনা করি না। বরং আর একটী বিশেষ কথাই বলিব। মজুরেরা আধুনিক মস্তিষ্কের মালিক। একশ' দেড়শ' বছর আগে মজুরেরা যে ধরণের মাথা খাটাইয়া জীবন ধারণ করিত আজকাল তাহারা ঠিক সেই ধরণের মাথা খাটাইলে জীবন ধারণ করিতে আর সমর্থ নয়। তাহাদিগকে বিগত শ, পঁচাত্তর, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ঘাঁটিতে হইতেছে। এই জন্য তাহাদের চোখ, তাহাদের কান, তাহাদের মাংসপেশী, তাহাদের হাতের তালু, তাহাদের পায়ের চং, তাহাদের আঙুল—সবই অনেক পরিমাণে বদলাইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মগজটাতেও কিছু কিছু নূতন চংএর ঘী আসিয়া জমিয়াছে। আধুনিক মাথা, আধুনিক চিন্তা-শক্তি, আধুনিক চিন্তা প্রণালী—ইত্যাদি বলিলে যাহা কিছু বুঝি তাহার অনেক কিছুই মজুরদের মস্তিষ্কে মজুদ আছে। এই কারণেই তথাকথিত মজুরেরা আমার নিকট বিশেষভাবে অন্যতম "পূজার স্থান"। মজুরদেরকে অন্যান্য কারণেও আমি বিশেষরূপেই আদরের সামগ্রী বিবেচনা করি।

এইবার বলিব নৈতিক জীবনের কথা। পৃথিবীর যেখানে যেখানে আধুনিক কলকারখানার প্রবর্ত্তন হইয়াছে অর্থাৎ যেখানে যেখানে আধুনিক প্রণালীতে মাথা খাটাইয়া মজুরেরা ভাত কাপড় জুটাইতেছে সেই সকল স্থানে এক একটা নতুন কর্ত্তব্যজ্ঞান, নতুন দায়িত্ব বোধ, নতুন চরিত্রবত্তা দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের নব্য নৈতিক জীবনের প্রধান গুরু হইতেছে মজুর। তাহার বিপুল প্রমাণ —মজুরদের সঙ্ঘগঠন—ট্রেড ইউনিয়ন। এই সঙ্ঘ-জীবনে যে ধরণের দায়িত্ব বোধ, যে ধরণের সামগ্রস্য জ্ঞান, যে ধরণের পরস্পর-সাপেক্ষতা, যে ধরণের ভ্রাতৃত্ব বিকাশ লাভ করে সেই ধরণের সদ্‌গুণ মানব জীবনে পৃথিবীর অন্যান্য যুগে এক প্রকার ছিলই না। ট্রেড ইউনিয়ন বর্ত্তমান জগতের এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। আর এই সঙ্ঘ জীবনের ভিতর যে নৈতিক চরিত্র বিরাজ করিতেছে তাহাও মানব জাতির ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নূতন চরিত্রবত্তার পরিচায়ক। এই নব্য নীতির প্রতিনিধি হিসাবে মজুর শ্রেণী সকল দেশে ও সমাজে যুগান্তর সৃষ্টি করিতেছে। আর্থিক জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই পৃথিবীর উন্নততর দেশসমূহে মজুরদের এই নৈতিক চরিত্র অনেক উৎকর্ষ আনিয়া ছাড়িয়াছে। ভারতবর্ষেও আমরা মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধতার কিছু কিছু ফলও পাইয়াছি। এই সঙ্ঘবদ্ধতার পরিমাণ যতই বাড়িয়া যাইবে ততই আমরা অন্যান্য দেশের মতনই মজুর-সমাজ হইতে আরও অনেক কিছু উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব।

এইবার বলিব রাষ্ট্রীয় জীবনে মজুরদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটীমাত্র কথা। যে নব্য নীতি মজুরেরা আর্থিক জীবনে আনিয়াছে সেই নব্য নীতির প্রভাবে পৃথিবীর সকল দেশে কিছু না কিছু স্বরাজ, আত্মকর্ত্তৃত্ব, স্বায়ত্ত শাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আসিয়াছে। মজুর আর মজুরদের সঙ্ঘ না থাকিলে ইয়োরামেরিকার ডেমক্রেসি আত্মশাসন বা স্বরাজ ইত্যাদির যতটুকু দেখিতে পাই তাহা দেখিতে পাইতাম না। বর্ত্তমান যুগের ডেমক্রেসির আসল প্রবর্ত্তক হইতেছে মজুর শ্রেণী। কাজেই মজুর আমার নিকট আবারও বিশেষ ভাবে প্রণম্য।

এই চার তরফ হইতে আধুনিকতার কর্ম্মকৌশলে, যন্ত্রিকচালনায়, আর্থিক সঙ্ঘগঠনে আর রাষ্ট্রিক স্বরাজে—

এই চার রকমই মজুরেরা আমার চিন্তায় বর্ত্তমান যুগের ধুরন্ধর। মজুরদিগকে বাদ দিলে বর্ত্তমান জগতের এই চারটী উৎকর্ষ প্রায় ষোল আনা কাণা হইয়া যাইবে। এই সকল কথা সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক বোধ হয় মানিতে চাহেন না। পয়সাওয়ালা লোকেরা মজুরদের এই কৃতিত্বের কথা কখনও সত্যসত্যই চিন্তা করিয়াছে কিনা সন্দেহ। আমার কাছে আধুনিক যুগান্তর-কারার আসল তাগীরথীই হইতেছে মজুর সমাজ। দুনিয়ার চাই মজুর, চাই আরো মজুর, চাই আরো বেশী মজুর।

চাষী-সমবায় বণিক-ভবন ও মজুর-সঙ্ঘ

বর্ত্তমান জগতের একমাত্র প্রতিনিধি মজুর নয় ইহাও বলা বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এঞ্জিনিয়ার রাসায়নিক ইত্যাদি বিজ্ঞানবীরেরা বর্ত্তমান যুগের অন্যতম চালক। তবে মজুরদের কথা ভাবিবার সময় সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, মানুষের সমাজে ইহাদের স্থান অতি উচু শ্রেণীর অন্তর্গত। সভ্যতার সৃষ্টিকার্য্যে মজুরদের কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার জিনিষ নয়। খোলাখুলি যদি আমরা একালের আর্থিক জীবনটা বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, বর্ত্তমানে তিনটী বড় বড় প্রতিষ্ঠান ধনদৌলতের উৎপাদন-বিতরণ কাজে নিযুক্ত আছে। প্রথম প্রতিষ্ঠানকে বলিতে পারি চাষীদের সমবায় বা কো-অপারেটিভ আন্দোলন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানকে বলিব পুঁজিপতিদের মিলনকেন্দ্র—এক কথায় তাহাকে বলিতে পারি বণিক-ভবন বা চেম্বার অব কমার্স। আর তৃতীয় প্রতিষ্ঠান হইতেছে মজুর-সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন। এই তিনটীর ভিতর কোন্‌টী বড় কোন্‌টী ছোট ইহা লইয়া তর্কাতর্কি উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু আমি এই বড়-ছোটের মামলার সময় দিতে প্রস্তুত হইব না। আমার কাছে মজুরের শক্তিযোগ, মজুরের কৃতিত্ব অন্যতম প্রাথমিক স্বীকার্য্য।

আমার দেশ বড় হইতেছে কিনা, আধুনিক আধ্যাত্মিকতায় ভারত-সন্তান উন্নত হইতেছে কিনা, বাংলার নরনারী বর্ত্তমান জগতের উপযুক্ত কর্ম্মনিষ্ঠার পাকিয়া উঠিতেছে কিনা এই সকল কথা চিন্তা করিবার সময় আমি অন্যান্য অনেক কিছু কথাই ভাবিয়া থাকি বটে, আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের অলি গলি, খুটিনাটী সব তন্নতন্ন করিয়া থাকি সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই আমি শুনিয়া থাকি আমাদের মজুরদের সংখ্যা। মজুরেরা শুনতিতে বাড়িল কিনা, মজুরেরা নতুন নতুন কর্ম্মপ্রণালী শিখিল কিনা, নতুন নতুন আকার প্রকারের মজুরশ্রেণী বাংলাদেশে দেখা দিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন সর্ব্বদাই আমার মাথায় বিরাজ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে মজুর সঙ্ঘ আজ কি অবস্থায় আছে, মজুর সঙ্ঘগুলি শুনতিতে বাড়িল কিনা, মজুর সঙ্ঘ নতুন নতুন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে রুঁকিতেছে কিনা এই সকল কথা আলোচনা না করিলে আমি বর্ত্তমান ভারতের উন্নতি-অবনতির সঠিক প্রমাণ পাই না। দুনিয়ার সভ্যতা তরীর হাল ধরিবার পক্ষে একটা বিপুল যন্ত্রই হইতেছে আমার নিকট মজুরসঙ্ঘ। মজুরসঙ্ঘের মাপে ভারত কোথায়? বিশ্ব-দৌলতের ভিতর মজুরের সৃষ্টি, মজুরের দেওয়া ধনসম্পদ্ কতখানি, দুনিয়ার মাপে ভারতের মজুর সমাজ কি অবস্থায় রহিয়াছে এই সকল প্রশ্নই আমার কাছে বর্ত্তমান জগতের আধ্যাত্মিকতা, বর্ত্তমান জগতের উন্নতি-নিষ্ঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন।

ভারতের মজুরশক্তি

ভারতবর্ষের কারখানার সংখ্যা হাজার পনর। নেহাৎ ছোট কারখানাও এই সংখ্যার ভিতর ধরা হইয়াছে। আর এক মাপে কারখানার সংখ্যা ৬৪০০। এই হিসাবে এক মাত্র সেই সকল প্রতিষ্ঠান ধরা হয় যাহাতে কমসে কম বিশজন লোক কাজ করে। এই ধরণের কারখানায় সর্ব্বসমেত মজুরসংখ্যা পনর লাখ। কিন্তু যদি ছোট ছোট কারখানাগুলিও ধরি তাহা হইলে পনর হাজার কারখানার ছোটের উপর পঁচিশ লক্ষ মজুর বহাল আছে। এই হইল ভারতের মজুরশক্তি। তিন-পয়ত্রিশ কোটী নর-নারীর দেশে পনর লক্ষ বা পঁচিশ লক্ষ মজুর মুষ্টিমেয়। আমার মতে ভারতবাসীর আধুনিক আধ্যাত্মিকতা, আধুনিক চরিত্রবত্তা, আধুনিক শিল্পনৈপুণ্য, আধুনিক শক্তিযোগ আধুনিক মস্তিষ্কশক্তি—সবই নেহাৎ সামান্য মাত্র।

বর্ত্তমান জগতের ভিতর ভারতীয় নরনারী অনেক নীচের ধাপে অবস্থিত। কত নীচে তাহা অঁাকজোকের সাহায্যে মাপিয়া বলাও অসম্ভব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে, ভারতের মজুরসংখ্যা পনর লক্ষই হউক কি পঁচিশ লক্ষই হউক, ইহাদের অনেকেই সঙ্ঘবদ্ধ নয়। সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ভারতে খুব কম। অন্যান্য দেশেও সকল মজুরই সঙ্ঘবদ্ধ নয়। অন্যান্য দেশেও সঙ্ঘের বাহিরে অনেক মজুর তাহাদের জীবন চালাইয়া থাকে। মজুরদের ইউনিয়ন অর্থাৎ মজুরসঙ্ঘগুলিকে বর্ত্তমান জগতের শক্তিযোগের খুঁটা বিবেচনা করি। কাজেই ভারতে যখন মজুরসঙ্ঘের অল্পতা লক্ষ্য করিতেছি তখন ভারত-বাসীকে শক্তিযোগে নেহাৎ অবনত বিবেচনা করা আমার পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

কথায় কথায় আমরা বলিয়া থাকি ভারতবাসীরা গুন্‌তিতে দুনিয়াবাসীর পাঁচ ভাগের বা ছয় ভাগের এক ভাগ। তাহা হইলে মজুর সঙ্ঘ আর সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যাও বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার ভিতর আমাদের ছয় ভাগের এক ভাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে বুঝিতাম যে, বাস্তবিক ভারতবাসী জগতের মাপে বর্ত্তমান নিষ্ঠ,—আধুনিক যুগেও ভারতীয় জীবন কর্ম্মঠ ভাবে চালাইতেছে। কিন্তু কি দেখিতে পাই? সমস্ত পৃথিবীতে আজকাল সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটী। ইহা হইতেছে ১৯০০ সনের গুন্‌তির ফল। ১৯২৫ সনে ছিল প্রায় সাড়ে চার কোটী। বুঝিতে হইবে দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে অর্থাৎ জগতের নরনারী আধুনিক বুদ্ধিচর্চ্চায়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আধুনিক স্বরাজ-যোগে ক্রমসে কম গুন্‌তিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষও মজুর-সঙ্ঘ হিসাবে খানিকটা বাড়িয়া চলিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৯২০ সনের পূর্ব্বে আমাদের দেশে মজুর-সঙ্ঘ একপ্রকার ছিলই না। বিগত দশ বারো বৎসরে ভারতীয় মজুরেরা নানাবিধ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে। আর সঙ্ঘবদ্ধতাও ক্রমে ক্রমে ভারতীয় মজুর সমাজের অন্যতম লক্ষণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এই সকল কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আবার স্বীকার করিতে হয় যে, আজও গুন্‌তিতে আমাদের মজুর-সঙ্ঘগুলি বারপর নাই নগণ্য। আজ যদি ভারতে অন্ততঃ পঁচাত্তর আশী লক্ষ মজুর সঙ্ঘবদ্ধরূপে থাকিত তাহা হইলে বুঝিতাম যে ভারতও একটা দেশ বটে। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি আমাদের ভারতে মজুর-সংখ্যা মোটের উপর পনর লক্ষ হইতে পঁচিশ লক্ষ মাত্র। আর সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ইহারও অনেক কম। ভারতবর্ষে আজকাল সঙ্ঘবদ্ধ মজুর গুন্‌তিতে কত তাহা যথার্থরূপে বলা খুবই কঠিন। কেন না আমাদের সঙ্ঘগুলির জীবন অতিমাত্রায় পরিবর্ত্তনশীল। কোন্ সঙ্ঘটা চলিতেছে কোন সঙ্ঘটা উঠিয়া গেল এই সব খবর পাওয়া যায় না। অনেকগুলির অবস্থাও অনেক সময় বেশ কিছু কাহিল। তাহার উপর তিন চার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মজুর মহলে একে দলাদলি তাহার উপর আর্থিক দুর্দ্দৈব ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। কাজেই সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা বর্ত্তমানে খুব কম। ১৯২৭ সনের দৃষ্টান্ত বলিতে পারি। তখন ছিল লাখ চারেক মাত্র সঙ্ঘবদ্ধ মজুর অর্থাৎ যে সময় দুনিয়ার প্রায় পাঁচ কোটী মজুর সঙ্ঘবদ্ধ, সেই সময়ে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ মাত্র শতকরা একজনেরও কম। আগেই বলিয়াছি আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ মজুর যদি দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের পাঁচ ভাগের বা ছয় ভাগের এক ভাগ হইত অর্থাৎ যদি শতকরা ষোল বা বিশ হইত তাহা হইলেই মানুষ হিসাবে ভারতবাসীর ইজ্জত রক্ষা হইত। কোথায় হওয়া উচিত শতকরা পনর হইতে বিশ, আর কোথায় একজনেরও কম! এখানেই ভারতীয় মজুর সমাজের দুর্ব্বলতা আর এখানেই বর্ত্তমান ভারতেরও আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অক্ষমতা হাতে হাতে ধরা পড়িতেছে।

সঙ্ঘবদ্ধ মজুর দুনিয়া

এইবার দুনিয়াও নানাদেশে একটু পায়চারি করিয়া দেখা যাউক কোথায় মজুরসঙ্ঘ কত। ১৯২৭ সনের মাপেই সব কিছু বলা যাইতেছে।

দেশের নাম	সঙ্ঘবদ্ধ মজুর-সংখ্যা	লোক-সংখ্যা
রুশিয়া	৮,০০৩,০০০	১৩৯,১৬০,৫০০
জার্ম্মানি	৮,১২৬,০৩৫	৬৩,৩০৮,১৪০

গ্রেটবৃটেন	৪,৫০১,০০০	৪২,৭৬৯,১৯৬
যুক্তরাষ্ট্র	৩,০৪১,৬১৮	১০৫,৭১০,৬২০

ইত্যাদি।

এই ধরণের প্রায় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ দেশের সংখ্যা বাড়া যাইতে পারে। সকলগুলি এখানে আহির করিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি আশী লক্ষের বেশী সঙ্ঘবদ্ধ মজুর আছে জার্ম্মানিতে আর কশিয়ার, তার পরেই হইতেছে বিলাতের ঠাঁই। এখানে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের গুনতিতে ভারতবর্ষ কোথায়? এইবার কয়েকটী সংখ্যা আবার ঝাড়িতেছি—

দেশের নাম	সঙ্ঘবদ্ধ মজুর-সংখ্যা	লোক-সংখ্যা
সুইডেন	৪৭৮,৪৬১	৫,৯০৪,৪৮৯
স্পেন	৪৫১,০২৩	২১,৩৬১,৮৪২
ভারত	৪০৭,০৩৭	৩১১,১৩০,০৪৫
আইরিশ ফ্রি ষ্টেট	৫৮৩,৪৫৪	৩,১৬০,০০০
ডেন্‌মার্ক	৫০৮,৮৩৪	৩,৩৩৬,২১৪
হাঙ্গারী	২৬৭,৮৮৫	৭,৯৮০,১৪৩
কানাডা	২৮০,৬৪৩	৮,৭৮৮,৪৮৩
জাপান	২২৫,৭৭০	৫৯,১০৬,৭০৬

দেখিতেছি ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা সেইসকল দেশের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সমান যে সকল দেশের লোক-সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ লোক-সংখ্যার অনুপাতে ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। অন্যান্য দেশের নাম সম্প্রতি করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এইবার বিষয়টা আরো কিছু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। লাখ চারেক সঙ্ঘবদ্ধ মজুর ভারতে আছে, আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আইরিশ ফ্রি ষ্টেটেও তদ্রূপ দেখিতেছি। একত্রিশ বত্রিশ কোটী নরনারীর বিপুল মহাদেশে মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে যতখানি শক্তি দেখাইতেছে একত্রিশ বত্রিশ লক্ষ নরনারীর আইরিশ ফ্রি ষ্টেটেও প্রায় ততখানিই দেখাইতেছে।

প্রতি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা

জিনিষটা বুঝিবার জন্য সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে কিছু পুরাণ খবর দিব,—১৯২০ সনের। প্রত্যেক দশ হাজার নরনারীর ভিতর তখন কতজন মজুর সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তাহাই দেখাইব :—

দেশের নাম	প্রতি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুর
১। জার্ম্মানি	২,১৭২
২। গ্রেটবৃটেন	১,৮৭০
৩। চেকো-শ্লোভাকিয়া	১,৪৭১
৪। অষ্ট্রীয়া	১,২৭৭
৫। অষ্ট্রেলিয়া	১,২৫৮
৬। ডেনমার্ক	১,২৩১
৭। বেলজিয়াম	১,১২৬
৮। হল্যাণ্ড	৯৯৫
৯। ইতালি	৭৯৪

ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিতে পাই যে, প্রতি দশ হাজারে দুই হাজার অথবা দুই হাজারের বেশী সঙ্ঘবদ্ধ মজুর আছে মাত্র এক দেশে, তাহার নাম জার্ম্মানি। গ্রেটবৃটেন এই হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তবে জার্ম্মানির খুব কাছাকাছি বটে। চেকো-শ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রীয়া, ডেন্‌মার্ক ও বেলজিয়াম এই চার দেশে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা গোটা লোক-সংখ্যার কি দশ হাজারে এক হাজারের বেশী ও দুই হাজারের কম।

এইবার কতকগুলি দেশের নাম করিব যেখানে জন-সংখ্যার কি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা এক শতেরও কম :—

দেশের নাম	কি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮৬
বুলগেরিয়া	৭৫
রুমানিয়া	৫৩
সার্ব্বিয়া	৫০
জাপান	৪৩
ভারত	১৬

আমি ঘোটের উপর তিনটী দেশের সংখ্যা লইয়া ধাপ খোক চালাইয়াছি। তাহাতে দেখিতেছি ভারত আসিতেছে একেবারে সকলের নীচে।

এইবার সংখ্যাগুলিকে সামাজিক জীবনের কাঠামে ফেলিয়া যাচাই করা যাউক। দশ হাজার নরনারীর ভিতর দুই হাজার। সঙ্ঘবদ্ধ মজুর,—একথাটার মানে কি? ধরা যাউক যেন মজুরের পরিবারে তিন কিংবা চারজন লোক আছে। তাহা হইলে বলিব, জার্ম্মাণিতে কি দশ হাজার নরনারীর ভিতর প্রায় আট হাজার সাত শ, আর গ্রেটবৃটেনে প্রায় সাত হাজার পাঁচ শ লোক প্রকারান্তরে সঙ্ঘের আওতায় জীবন ধারণ করে। সঙ্ঘ ধর্ম্ম, সঙ্ঘ শক্তি, সঙ্ঘ চরিত্র, সঙ্ঘ জীবনের আধ্যাত্মিকতা, সঙ্ঘ যোগের স্বরাজ শক্তি সবই কি দশ হাজার নরনারীর ভিতর আট হাজার সাত শ আর সাত হাজার পাঁচ শ লোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে। ইহাকে বলে বর্ত্তমান যুগের ডেমক্রেসী বা আত্মকর্তৃত্বশীল সমাজব্যবস্থা। যে দেশের দশ হাজার লোকের ভিতর আট হাজার সাত শ লোকই প্রতিদিন প্রত্যেক উদ্যোগের নিজ হাতে গড়া সঙ্ঘের বিধান অনুসারে জীবন চালাইতে অভ্যস্ত তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে স্বভাবতই অধিকারী। আর তাহার ফলে কি শাসনপ্রণালী কি বিচারপ্রণালী, কি ধনী সমাজ কি কারখানাপতি সকলেই জনগণকে সম্মান করিয়া চলিতে অভ্যস্ত থাকে। বলিয়া রাখা ভাল জার্ম্মাণি আর বিলাত এই হিসাবে শীর্ষস্থানীয়। বর্ত্তমান জগতের সঙ্ঘশক্তি, টেকনিক্যাল কর্ম্ম প্রচেষ্টা, সমাজতন্ত্র বা সমাজনিষ্ঠা, সোশ্যালিজম স্বরাজ ইত্যাদির চরম আমরা জার্ম্মাণ আর বিলাতী সমাজে দেখিতে পাই। এইসব জিনিষ কল্পনা করা পর্য্যন্ত বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া, জাপান, আর তাহাদেরই সমগোত্রভুক্ত ভারতের পক্ষে অসম্ভব। ডেমক্রেসী আর সোশ্যালিজম যদি কেহ পৃথিবীতে বুঝে তবে তাহা একমাত্র জার্ম্মাণ আর ইংরেজ নরনারীই বুঝে। আজ আমরা ভারতে মজুরসঙ্ঘ গঠনের যে অবস্থায় রহিয়াছি সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া জার্ম্মাণির মজুর সংগঠন, বিলাতের মজুর আন্দোলন ইত্যাদি আলোচনা করিতে যাওয়া অথবা তাহাদের দৃষ্টান্তে নিজের কর্ম্ম সুরু করিতে বসা আমাদের পক্ষে অতিমাত্রায় বাতুলতা। আসমানের চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইয়া দেওয়া যেরূপ, জার্ম্মাণ মজুর আন্দোলন, ইংরেজ মজুর আন্দোলন, ইত্যাদির আদর্শ আমাদের চোখের সমুখে ধরিয়া চলাও ঠিক সেইরূপ। কি ব্যাঙ্কযোগে, কি কারখানাযোগে, কি বহির্ব্বাণিজ্যযোগে কি যানবাহনযোগে,—আর্থিক জীবনের অন্যান্য অসংখ্য কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবাসী যেমন ইংরেজ আর জার্ম্মাণকে কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নয়, ঠিক সেইরূপই এই মজুরযোগে, মজুরের শক্তিযোগে সঙ্ঘবদ্ধতার কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় নরনারী জার্ম্মাণ সমাজকে আর ইংরেজ সমাজকে কোন মতেই যথার্থরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

মজুর ভারতের গুরু মজুর জাপান

কোন্ দৃষ্টান্ত, কাহার দৃষ্টান্ত তাহা হইলে ভারতবাসী আজ বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ? কোন্ দেশকে সামনে রাখিয়া ভারতীয় মজুরেরা নিজেদের সঙ্ঘশক্তি পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে? তালিকায় দেখাইয়াছি আমাদের সমগোত্রভুক্ত যে সকল দেশ তাহাদের ভিতর ভারতের ঠিক উপরে রহিয়াছে জাপান। ভারতে যেখানে দশ হাজার নরনারীর ভিতর ষোলজন মজুর সঙ্ঘবদ্ধ জাপানে সেখানে তেতাল্লিশ জন। কাজেই ভারতবাসী যদি কাহাকেও গুরু করিয়া চলিতে চায় তবে সে গুরু জাপান। জাপানের মজুর সমাজ, জাপানী মজুরের ধরণধারণ, জাপানের মজুর আন্দোলন, জাপানী মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধতা এই সকল দিকেই ভারতীয় মজুর-নেতাদের গবেষণা চালানো আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জাপানও বাস্তবিক পক্ষে ভারতের মাপে অনেক উর্দ্ধে, ভারতবাসীর পক্ষে ষোল হইতে তেতাল্লিশ পর্য্যন্ত উঠা বড় সোজা কথা নয়। ভারতীয় মজুরদিগকে জাপানী মজুরদের কোঠায় উঠিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধতা হিসাবে আড়াই গুণের বেশী ত্রুটিস দেখাইতে হইবে। বুঝা যাইতেছে ইহা বড় সহজসাধ্য নয়। অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে অপ্রাসঙ্গিক।

তাহারা জাপানের চেয়েও উঁচুতে রহিয়াছে। আমি আমাদের আর্থিক, সামাজিক আর রাষ্ট্রিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাপানকে মূলক ভারতের প্রকৃত গুরুরূপে প্রচার করিয়াছি। মজুর আন্দোলন মজুরের শক্তিযোগ ইত্যাদি আসরেও আমি আমার জাপানকে মূলক ভারতের অনুকরণস্থল রূপে খাড়া করিতেছি।

চাই বাবুর্চি-খানসামা সঙ্ঘ

ভারতীয় মজুর সমাজের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই সঙ্ঘবদ্ধতা বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। কি খাদ, কি তুলার কল, কি রেলওয়ে লাইন, কি জাহাজ লাইন,—কোন দিকই বাদ দিলে চলিবে না।

তবে দু'একটী লাইনের কথা আমি এই সঙ্গে বলিয়া যাইতে চাই। সেটা হইতেছে খানসামা, বাবুর্চি খাদোয়ান আর বেয়ারা সংক্রান্ত মজুর জীবনের কথা। এই সকল লোকই বিদেশীদের নিকট ভারতবর্ষের "যথার্থ" প্রতিনিধি। মার্কিণ নরনারী, ফরাসী নরনারী, ভারতের বোম্বাই কলিকাতা বা আর কোথাও পদার্পণ করিবামাত্র যে সকল লোকের সাক্ষাৎ পায় তাহারা এই চার শ্রেণীর অন্তর্গত। বস্তুতঃ এই চার শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাহারা নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সর্ব্বদা সংস্পর্শে আসে। ইহাদিগকে দেখিয়া শুনিয়াই বিদেশী পর্য্যটকেরা আর ভারতপ্রবাসী বিদেশীরা ভারতীয় নরনারীর দোষ গুণ, ভাল মন্দ সবই সমষ্টিতে অভ্যস্ত। কাজেই খানসামা, বাবুর্চি, আর্দ্দালী, দরোয়ানের দায়িত্ব খুব বেশী। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের এই শ্রেণীর লোক কখনও বিদেশীর সঙ্গে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া আত্মমর্য্যাদা দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর লোক বিদেশী পর্য্যটক অথবা ভারতপ্রবাসীদের নিকট অতিমাত্রায় হীনতার পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপ হীনতার দৃষ্টান্ত পাইয়া বিদেশীরা সমগ্র ভারত-সমাজকে অতি অধম শ্রেণীর নরনারীরূপে নিজ নিজ দেশে প্রচার করিয়াছে। এইরূপ প্রচারের ফলে কি আমেরিকায়, কি ইতালিতে, কি ফ্রান্সে, কি আর্জ্জাণিতে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভারতীয় নরনারীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ জমিয়া রহিয়াছে। ভারত-বাসীরা মানুষ হিসাবে নেহাৎ অপদার্থ একথা নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন আর রোমের নরনারীরা ভারতে না আসিয়াও বুঝিয়া রাখিতে অভ্যস্ত। এই অপবাদ খণ্ডন করিবার উপায় এবং প্রণালী হয়ত অনেক প্রকারের। কিন্তু এক প্রকারের হইতেছে ভারতের সেই সকল নরনারীকে মানুষ হিসাবে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান করা যে সকল লোক প্রতিদিনই বিদেশী পর্য্যটক ও ভারতপ্রবাসী বিদেশীদের সেবায় নিযুক্ত থাকে। এই কাজের জন্য আমার বিশ্বাস বাবুর্চি খানসামা, আর্দ্দালী ও দরোয়ান এই চার শ্রেণীর সেবকদের ভিতর চার শ্রেণীর স্বতন্ত্র ইউনিয়ন বা সঙ্ঘ কায়েম হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে এই সকল লোক নিজ নিজ ইজ্জত বাঁচাইয়া বিদেশীদের সেবা যেন চালাইতে পারিবে। তাহার ফলে নিজেদের আর্থিক অবস্থাও কিছু কিছু উন্নত ত হইবেই; সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবন, চরিত্র গঠন, মনুষ্যত্বলাভ আর ভারতের ইজ্জত রক্ষা অনেকটা সাধিত হইতে পারিবে।

মজুর-গবেষণা পরিষৎ

ভারতের মজুর আন্দোলন আজকাল যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে শীঘ্রই দেশবিদেশের মজুর, মজুরি, মজুরের উন্নতি অবনতি, মজুর জীবনের উঠানামা ইত্যাদি সম্বন্ধে পঠনপাঠন এবং অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইবার জন্য একটা পরিষৎ কায়েম করা আবশ্যক। তাহাতে বিশ্বদৌলতে ভারতীয় মজুরের ঠাঁইও সঙ্গেই বসা পড়িবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কখন কোন্ দেশের মজুর সমাজ হইতে ভারতের মজুর নূতন নূতন কর্ম্মপ্রণালী শিখিতে পারিবে তাহাও সহজেই আয়ত্ত হইতে পারিবে। শীঘ্রই ভারতে একটা মজুর গবেষণা পরিষৎ কায়েম হউক।

মজুর-বীমা*

বিশ্বদৌলতের মালে মজুর ভারতের ঘাড়াই করিয়া

* ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌স্টিওর‍্যান্স ইন্‌স্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম (২ এপ্রিল, ১৯৩২)। "জীবন বীমা"য় প্রকাশিত।

লইতে গেলে আর একটা মস্ত অভাবের কথা সর্ব্বদাই মনে পড়িবে। সে মজুর বীমা।

যে সকল জিনিষের বীমা করা চলে তাহাদের দিক হইতে শ্রেণীবিভাগ করিলে বীমা ব্যবসাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়:—(১) বস্তুবিষয়ক বা অচেতন পদার্থের বীমা এবং (২) মানুষবিষয়ক অর্থাৎ মানুষের নিজের উপর বীমা। আমাদের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের জন্য বিবিধ শ্রেণীর বীমা করা যায়, তবে অগ্নি, নৌ, বন্দোবস্ত, যানবাহনাদি, কলকব্জা, প্লেট গ্লাস, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি শ্রেণীর বীমাই প্রধান। মানুষ নিজের উপর যে বীমা করে তাহাকে সাধারণতঃ জীবন বীমা বলা হয়। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই যে-কোনো রকম স্বার্থের জন্য জীবনবীমা গ্রহণ করিতে পারে। প্রায় সকল দেশেই জীবন বীমার চলতি আছে, কিন্তু ব্যাধি, দৈব, দৈহিক অক্ষমতা (ইনভ্যালিডিটি) এবং বেকার বীমাও কোনো কোনো দেশে বেশ উন্নতি লাভ করিতেছে।

সমাজের আর দশজন লোকের মত মজুরেরাও যে-কোনো কোম্পানীতে জীবনবীমা করিতে পারে। এই দিক্ দিয়া দেখিলে শ্রমিক বীমা সম্বন্ধে কোন সমস্যার কথাই উঠে না। ইহার সহজ অর্থ এই যে, মজুরেরাও জীবনবীমা-পত্র গ্রহণ করার ফলে জীবন বীমা ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটিবে।

কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্র শ্রমিকদের বেলায় জীবনবীমা করাটা কেবল তাহাদের এই ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপরই ফেলিয়া রাখা সমীচীন মনে করে নাই। ইহার ফলে বীমা ব্যবসাক্ষেত্রে অনেক নতুন বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ কালের আইন কানুনে শ্রমিকদের বীমার জন্য সমস্ত সমাজই (মালিক এবং রাষ্ট্র সমেত) তুল্যভাবে দায়ী। শ্রমিকের জন্য এই প্রকার সমষ্টিগত বা সম্মিলিত বীমার রেওয়াজই আজকাল বেশী। কাজেই মানুষের জীবন-বিষয়ক বীমাকে প্রধানতঃ দুইটী ভাগে ভাগ করা যায় (১) ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিস্বতন্ত্র জীবনবীমা, যাহার মক্কেল সাধারণতঃ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী এবং (২) সমাজগত রাষ্ট্রীয়, আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শ্রেণীবীমা বা রাষ্ট্র বীমা,—শ্রমিক এবং সামান্য বেতনের কেরাণীরাই যাহার মক্কেল।

এই ধরণের সমাজ-বীমা সাধারণতঃ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত। যথা—

১। ব্যাধি (মাতৃমঙ্গল ইহার মধ্যে পড়ে)

২। দৈব

৩। দৈহিক অক্ষমতা (বার্দ্ধক্য, বৈধব্য, পিতৃমাতৃহীন হওয়া, ইত্যাদি)

৪। বেকার থাকা।

এই চার শ্রেণীর বীমার প্রত্যেকেরই ক্রমপরিণতির স্ব স্ব ইতিহাস আছে। অবশ্য সে ইতিহাস অর্দ্ধ শতাব্দীর বেশী পুরাতন নয়। কোন্ কোন্ দেশে কোন্ ধরণের বীমা সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

১। ব্যাধি

(ক) জার্ম্মানি (১৮৮৩ খৃঃ)

(খ) ইতালি (১৯১০—কেবল মাতৃত্ব)

(গ) গ্রেটবৃটেন (১৯১১)

(ঘ) রুশিয়া (১৯১২)

(ঙ) জাপান (১৯২৭)

(চ) ফ্রান্স (১৯২৯)

(ছ) ইতালি (১৯২৭—কেবল যক্ষ্মা)

২। দৈব

(ক) জার্ম্মানি (১৮৮৩)

(খ) ফ্রান্স (১৮৯৯)

(গ) গ্রেটবৃটেন (১৮৯৭)

(ঘ) ইতালি (১৯০৪)

(ঙ) রুশিয়া (১৯২৭)

৩। দৈহিক অক্ষমতা

(ক) জার্ম্মানি (১৮৮৯)

(খ) গ্রেটবৃটেন (১৯১১)

(গ) রুশিয়া (১৯২২)

(ঘ) ইতালি (১৯২৩)

(ঙ) ফ্রান্স (১৯২৯)

৪। বেকার

(ক) গ্রেটবৃটেন (১৯১১)

(খ) রুশিয়া (১৯২২)

(গ) ইতালি (১৯২৩)

(ঘ) জার্মানি (১৯২৭)

প্রথম তিন প্রকারের বীমা ব্যবস্থায় জার্মানি কাল হিসাবে অগ্রণী ; চতুর্থটীর বেলায় গ্রেটবৃটেন পথ-প্রদর্শক। ব্যাধি-বীমার প্রিমিয়াম (চাঁদা) দেওয়ার ব্যবস্থা এক এক দেশে এক এক রকম। জার্মানি ও অষ্ট্রীয়াতে শ্রমিকদিগকে প্রিমিয়ামের দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হয়, বাকী এক-তৃতীয়াংশ মালিক বহন করে। বুলোগ্নাভিয়া, হাঙ্গারী এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে শ্রমিক ও মালিক উভয়েই তুল্যাংশে প্রিমিয়াম যোগায়। পক্ষান্তরে বুলগেরিয়া, এস্থোনিয়া এবং ল্যাটভিয়ার ব্যবস্থা অনুসারে শ্রমিক, মালিক এবং রাষ্ট্র এই তিন পক্ষ মিলিয়া সমভাবে প্রিমিয়াম দেয়। পোলাণ্ডে শতকরা ৬ ভাগ, গ্রেটবৃটেনে শতকরা ২২ ভাগ এবং নরওয়েতে শতকরা ৩০ ভাগ গভর্ণমেণ্ট দেয়। গ্রেটবৃটেনে শ্রমিকগণ রাষ্ট্রের অনুমোদিত মজুর সঙ্ঘ, পারস্পরিক (মিউচুয়াল) কারবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বীমা পত্র গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু জার্মানিতে সেটী হইবার যো নাই। সেখানে শ্রমিকদিগকে এই বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বীমা করিতে হয়। জার্মানিতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৭,৬০০। জার্মানির লোক-সংখ্যার শতকরা ৩০ জন অর্থাৎ প্রায় দুই কোটী লোকের রোগবীমা করা আছে। সেখানে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মোট দাবী ও অন্যান্য খরচপত্রের পরিমাণ প্রায় ১,৪৬১,৩৩৯,০০০ মার্ক (বা ১,০০০,০০০,০০০ টাকা) হইয়াছিল।

গ্রেট বৃটেনে কলকারখানার মালিকগণ তাঁহাদের শ্রমিকদের জন্য যে কোন বীমা-কোম্পানীতে দুর্ঘটনা বিষয়ক বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু জার্মানিতে এই উদ্দেশ্যেই পেশা-সংক্রান্ত ১৪২৫টী সমিতি আছে। তাহাতেই সকলে বীমাপত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানিতে ২৪,০০০,০০০ জন লোক দৈববীমা করিয়াছিল (মোট লোক-সংখ্যা ৬৩,০০০,০০০)। গ্রেট বৃটেনে লোক-সংখ্যা ৪৩,০০০,০০০, তন্মধ্যে উক্তরূপ বীমাকারীর সংখ্যা ১৫,৪০০,০০০ জন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানি ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বাবদ ৩২১,৫১৯,০০০ মার্ক এবং আহত, বিধবা এবং মাতৃপিতৃহীনদের ভাতা বাবদ ২১৬,৫১২,০০০ মার্ক ব্যয় করিয়াছিল।

দৈহিক অক্ষমতা (ইনভ্যালিডিটি) বিষয়ক বীমার দরুণ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬১৭,৮৯৮,০০০ মার্ক। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানিতে অক্ষমতা-বীমাকারীর সংখ্যা ছিল ২২,০০০,০০০; আর গ্রেট বৃটেনে ছিল ১৬,৫০০,০০০ জন।

বেকার-বীমা সম্বন্ধে সর্বশেষ বৃটিশ আইন অনুসারে (অর্থাৎ ১৯২৯—৩০ সনের আইনমাফিক) মালিক এবং মজুর উভয়ে যে প্রিমিয়াম দেয়, রাষ্ট্র তাহার অর্দ্ধেক দেয়। ২১ হইতে ৬৪ বৎসর বয়সের পুরুষ নিজ বেকার বীমার জন্য প্রতি সপ্তাহে চাঁদা দেয় ৭ পেন্স। এই খাতে মালিক দেয় ৮ পেন্স (আর এই কাজেই রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হয় ৭½ পেন্স। নিম্ন হারে সাপ্তাহিক ভাতা দেওয়া হয় :—

	সাপ্তাহিক ভাতা	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৪ বৎসর	৬ শিলিং	৫ শিলিং
২০ বৎসর	১৪ শিলিং	১৩ শিলিং
পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত	১৭ শিলিং	১৫ শিলিং

জার্মানিতে বেকার-বীমা আইন প্রবর্ত্তনের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৭ সনের অক্টোবর হইতে ১৯২৮ সনের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেকার-বীমাকারীর সংখ্যা ছিল ১৫,৯০৪,৯০৫ জন। তন্মধ্যে ৯৬৯,০০১ জনকে প্রায় ৯১০,০০০,০০০ মার্ক ভাতা দেওয়া হইয়াছিল।

মজুর-বীমার বিদেশী আইনকানুন সম্বন্ধে ভারতীয় মজুর-নায়ক ও স্বদেশ-সেবকগণ অনুসন্ধান-গবেষণা চালাইতে সুরু করুন। শীঘ্রই এই দিকে ভারতেও আইন কায়েম করিতে হইবে।

নানা দেশের শুল্ক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীহরধনাথ সরকার, এম্. এ

বিলাত

নিম্নে বিলাতের ১৯০১-০২ এবং ১৯০২-০৩ সনের সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১৯০১-০২ সনের প্রস্তাবিত আয় :—

	পাঃ
	৮০৩,৪০০,০০০
সাধারণ ব্যয়*	৭৫১,৩১৬,০০০
দেনা-পরিশোধ (সিঙ্কিংফাণ্ড)	৪২,৫৪০,০০০
প্রস্তাবিত বাড়তি	১০৪,০০০

মোট রাজস্ব আদায় কম পড়ে ২৯,০০০,০০০ পাঃ; ইহার মধ্যে আন্তর্দেশিক রাজস্ব হ্রাস ২৫,০০০,০০০ পাঃ; ষ্টাম্প এবং আবগারী বিভাগ ৪,০০০,০০০ পাঃ। হুভার মোসাবিদা অনুযায়ী যুদ্ধের দেনা শোধ নিবৃত্তি হওয়ায় তজ্জন্য অতিরিক্ত খাতে রাজস্ব হ্রাস ৩০,০০০,০০০ পাঃ।

অন্যপক্ষে, হুভার মোসাবিদার ফলে যুদ্ধঋণের সুদ পরিশোধ কমে ১৩৫৫০,০০০ পাঃ। ১৯০১ সনের সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেট্ ৮,৩,০০০ পাঃ। বেকার বীমা তহবিল এবং সড়ক তহবিল খাতে সই করিবার প্রস্তাব রহিত হওয়ায় তজ্জন্যও যথাক্রমে ২৪,০০০,০০০ পাঃ এবং ৯,০০০,০০০ পাঃ খরচ কমিয়াছে। মোট কথা হুভার মোসাবিদার ফল

৪,৭৫০,০০০ পাঃ।

ব্যয় সংক্ষেপ এবং নূতন নূতন ট্যাক্স সমেত ১৯০১-০২ সনের সংশোধিত বাজেট্ :—

রাজস্ব	
সাধারণ ব্যয়	
দেনা শোধ	
আন্দাজী বাড়তি	

২। ১৯০২-০৩ সন

১৯০২-০৩ সনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরাহা হইবার কথা; তবে তাই বলিয়া সরকারী রাজস্বেরও সুরাহা হইবে এইরূপ বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের কথা নহে। ব্যয় সঙ্কোচ এবং নয়া ট্যাক্স্ বসাইবার পূর্ব্বে, ১৯০২-০৩ সনের আন্দাজী বাড়তি ১৭০,০০০,০০০ পাঃ। ইহার মধ্যে দেনা পরিশোধের ৫৫,৮০০,০০০ পাঃ ধরা হইয়াছে। ১৯০১ সনের আয় এবং ব্যয় দুই বলিয়া যে, ১২০,০০০,০০০ পাঃ বাড়তি পড়িয়াছে তাহারও হিসাব এই সঙ্গে লওয়া হইয়াছে। নিম্নে ১৭০,০০০,০০০ পাউণ্ড বাড়তির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

অপৌনঃপৌনিক কতকগুলি খাতে রাজস্ব হ্রাস—

---

* এই সংখ্যায় ৫৮,২০২,০০০ পাঃ পোষ্ট-অফিস খরচা ধরা হয় নাই। এই খরচা পোষ্টাফিসের আয় হইতে মিটাইয়া বাড়তি আয়-বাজেটের মধ্যে ঢুকান হইয়াছে। এইরূপ ২৩,৩১০,০০০ পাঃ সড়ক তহবিলের খরচা, মোটর-গাড়ীর উপর আদায়ী শুল্কের অংশ হইতে মিটান হইয়াছে। মোটর শুল্কের এই অংশ রোড ফাণ্ডের সামিল করা হয়।

	পাঃ
(একস্‌চেঞ্জ একাউন্ট পাঃ, ইনকাম্ ট্যাক্স্ বৃদ্ধি ১০,০০০,০০০ পাঃ, রেটিংরিলিফ্ সাস্‌পেন্স্ একাউন্ট ৪,০০০,০০০ পাঃ)	
রাজস্ব হ্রাসের আন্দাজ— (আন্তর্দেশিক রাজস্ব ৩৫,০০০,০০০ পাঃ, ফাইন্স্ এবং আবগারী ৪,০০০,০০০ পাঃ, বিবিধ ৭,০০০,০০০ পাঃ)	
পরিবর্ত্তনশীল লাভ করিবার দরুণ ৩০,০০০,০০০ পাঃ হইতে ৪০,০০০,০০০ পাঃ বাদ-বৃদ্ধি সমেত ১৯৩১-৩২ সনের মৌলিক এষ্টিমেট অপেক্ষা ১৯৩২-৩৩ সনের ধারণা করা খরচ বৃদ্ধি...	
বেকার বীমা তহবিলের জন্য ৬০,০০০,০০০ পাঃ এবং সড়ক তহবিলের জন্য ১০,০০০,০০০ পাঃ খরচ নিষ্কৃতি...	৭০,০০০,০০০
অনুমিত ঘাটতি	১৭০,০০০,০০০

	পাঃ
মন্ত্রী, পার্লামেণ্টের সদস্য, জজ, সরকারী চাকুরে এবং ডিফেন্স সার্ভিসের সদস্যগণের বেতন-হ্রাস	
ডিফেন্স সার্ভিস (বেতন এবং পেন্সন ছাড়া অন্যান্য খাতে)	
শিক্ষা	
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্ট	
স্বাস্থ্যরক্ষা	
পুলিশ	
কৃষি	
বনবিভাগ	
এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড	
কলোনিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড	
আন-এম্প্লয়মেণ্ট গ্রাণ্ট্	
আন-এম্প্লয়মেণ্ট ইনসিওরেন্স্—	
(ক) ব্যয়হ্রাস	
(খ) চাঁদাবৃদ্ধি	
রোড্ ফাণ্ড	৭,৮৭৫,০০০
বিবিধ	২,৫০০,০০০
	৭০,০৭২,০০০

ব্যয় সঙ্কোচ এবং কর্জ্জশোধের প্রস্তাবাবলী

৩। ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্তাব

গবর্ণমেণ্টের ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে প্রস্তাবাবলী ইতিপূর্ব্বেই বিশদভাবে বাহির হইয়াছে। যে পুঁথিতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা "হোয়াইট পেপার" অর্থাৎ "শাদা পুঁথি" নামে সুপরিচিত। উক্ত পুস্তকের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত লিপি পাঠে দেখা যায় ১৯৩২-৩৩ সনের বাজেটের ৭০,০০০,০০০ পাঃ ভার লাঘব হইবে। ১৯৩১-৩২ সনে বাজেটের ২২,০০০,০০০ পাঃ সঙ্কট হইবার কথা।

১৯৩২-৩৩ সনের সঙ্কটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী—

৪। দেনা-পরিশোধ (সিঙ্কিং ফাণ্ড)

১৯৩১-৩২ সনে এবং ১৯৩২-৩৩ সনে ৩২,৪০০,০০০ পাঃ হিসাবে দেনা পরিশোধের কথা। ৩½% কনভার্সন লোন, ৪% কন্সল্স্, ডিক্টরিবণ্ড, ফাণ্ডিং লোন্, টামিনেল্ এ্যান্যুইটির পুঁজি বাবদ দেনা পরিশোধের জন্য এই ব্যবস্থা।

উপরি উক্ত প্রস্তাবানুসারে ১৯৩১-৩২ সনে ১৩,৭০০,০০০ পাঃ এবং ১৯৩২-৩৩ সনে ২০,০০০,০০০ পাঃ বাজেটের সাধারণ উদ্বৃত্তসাধনের জন্য রেহাই পাইবে।

নূতন ট্যাক্স্ চাপাইবার প্রস্তাব

৫। কাষ্টম্স্ এবং আবগারী

কাষ্টম্স্	চলতি শুল্ক পূরা হার পাঃ শিঃ পেঃ	চলতি শুল্ক পক্ষপাতশূন্য হার পাঃ শিঃ পেঃ	প্রস্তাবিত শুল্ক পূরা হার পাঃ শিঃ পেঃ	প্রস্তাবিত শুল্ক পক্ষপাতশূন্য হার পাঃ শিঃ পেঃ
১·৫৫০ স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি বিশিষ্ট বিয়ার (ব্লাক বিয়ার ছাড়া) প্রতি ৩৬ গ্যালন		—		—
তামাক—কাঁচা—				
১০% অতোহধিক জলযুক্ত অ-ছাড়ান- প্রতি পাউণ্ড				৫½
ছাড়ান—প্রতি পাউণ্ড				৫৳
১০% জলের কম জলযুক্ত অ-ছাড়ান				২৳
তৈরী—				
ছাড়ান			৬½	৩৳
সিগার			১	২৳
সিগারেট			৭	৫৳
ক্যাভেণ্ডিস্ কিংবা নিগ্রোহেড্			৯	৯৳
ক্যাভেণ্ডিস্ কিংবা নিগ্রোহেড্ বণ্ড তৈরী				
অন্যান্য তৈরী তামাক				
মদ—				
১৩%এর অধিক জলযুক্ত—প্রতি পাউণ্ড	৮ ১৳		৪	
১৩% বা তার চেয়ে কম জলযুক্ত „	৯ ১০৳		৯	
হাইড্রোকার্বন অয়েল প্রতি গ্যালন	—		৮	—

আবগারী	চলতি শুল্ক শিঃ পেঃ	প্রস্তাবিত শুল্ক পাঃ শিঃ পেঃ
১·৫৫ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বিশিষ্ট বিয়ার (কালো বিয়ার ছাড়া) প্রতি ৩৬ গ্যালন		
তামাক—কাঁচা		
১০% জলযুক্ত প্রতি পাউণ্ড		৩½
১০%এর কম জলযুক্ত		৯৳
তৈরী—		
ক্যাভেণ্ডিস্ কিংবা নিগ্রোহেড, ন্যাচুরাল্কার্চার্ড ইন্ বণ্ড		

আবগারী এবং কাষ্টমস্ ট্যাক্সের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

	১৯৩১-৩২ এষ্টিমেট বৃদ্ধি পাঃ	পূর্ণ এক বৎসরে বৃদ্ধি পাঃ
বিয়ার	৪,৫০০,০০০	
তামাক	২,১০০,০০০	৪,০০০,০০০
ষাইল্ড্রো কার্বন অয়েল	৩,১০০,০০০	৭,৫০০,০০০
এন্টারটেন্‌মেন্টস্	১,০০০,০০০	২,৫০০,০০০
কাষ্টমস্ এবং আবগারীর মোট	১১,৫০০,০০০	২৪,০০০,০০০

কিউবা

১৯৩১ সনের ২৬শে জুলাই তারিখ হইতে কিউবা বীপে চাউলের উপর আমদানিশুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্‌হাস্ক চাউলের উপর সাধারণ শুল্ক বৃদ্ধি প্রতি ১০০ কিলোগ্রামে ১·৬৮ হইতে ২ ডলার। খাওয়ার উপযুক্ত হাস্ক্ কিংবা আন্‌হাস্ক্ চাউলের শুল্ক বৃদ্ধি প্রতি ১০০ কিলোগ্রামে ১·২০ হইতে ১॥ ডলার।

ইরাক

১৯৩১ সনের ১৯নং কাষ্টমস্ রেগুলেশান্।

নিম্নে ইরাক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ ১৯নং কাষ্টমস্ রেগুলেশনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। উহা "ইরাক গবর্ণমেণ্টের" ১৯৩১ সনের ২৩শে আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

রাজপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে, রাজস্ব সচিব, এবং মন্ত্রী সভার অনুমত্যনুসারে এবং ১৯৩১ সনের ৫৬নং কাষ্টমস্ আইনের ৩৫ এবং ১০১ ধারানুযায়ী, রাজার তরফ হইতে আমি নিম্নলিখিত আইন বিধিবদ্ধ করিতেছি :—

১ম ধারা।—অনেকগুলি পণ্যের উপর পরিমাণ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি জিনিষের ওজন হ্রাস পাওয়ার দরুণ শুল্ক হ্রাস করা হইবে। ঐ সমস্ত পণ্যের এমন বোঝা হওয়া চাই যাহার অন্ততঃ পক্ষে ১০% মূল্য হ্রাস হইয়াছে। এসেস্‌মেণ্ট হওয়ার পূর্ব্বে এ-সম্বন্ধে লিখিত আবেদন কলেক্টরের নিকট পৌঁছান চাই। নিম্নে উল্লিখিত পণ্য দ্রব্যের নাম দেওয়া হইল :—

(১) কার্ডবোর্ড (ট্রে বোর্ড সমেত)।
(২) মোমবাতি।
(৩) কার্বনেট্ অব্ সোডা।
(৪) সিমেণ্ট্।
(৫) সিগারেটের কাগজ।
(৬) সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মস্।
(৭) কফি।
(৮) তামা (চাদর এবং বটম)।
(৯) ফিউব্যাণ্ট্স্।
(১০) ঘি।
(১১) হেয়া (পাতা কিংবা গুড়া)।
(১২) নীল (প্রাকৃতিক এবং সিন্থেটিক)।
(১৩) মার্গারিন্।
(১৪) মেশলাই।
(১৫) চাউল এবং চাউলের সংখ্যা।
(১৬) স্যাকারিন্।
(১৭) লবণ (রিফাইন করা)।
(১৮) চিনি (মিছরী, অপরিষ্কৃত চিনি, গ্লুকস্ এবং গুড়)।
(১৯) চা।
(২০) টিন (চাপড়া)।
(২১) তামাক (কাঁচা এবং তৈরী) সিগারেট্ সমেত।
(২২) সুতের সংখ্যা।

২নং ধারা।—রাজস্ব সচিব এই আইন জারি করার অধিকার পাইয়াছে এবং ইহা ১৯৩১ সনের ১৫ই জুলাই হইতে জারি হইবে।

১৯৩১ সনের ১৪ই জুলাই তারিখে বাণিজ্য সম্বন্ধে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ড

নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপেও কাষ্টমস্ এবং আবগারী বিভাগে কতকগুলি নূতন নূতন আইন জারি হইয়াছে। যে সমস্ত আইন কানুনে ভারতের স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে নিম্নে সেই সমস্ত আইনের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইল।

সকল প্রকার আমদানি বস্তুর উপর ৩% এ্যাড্‌ভ্যালোরেম্ প্রাইমেজ্ শুল্ক বসান হয়। ১৯৩১ সনের প্রথমে এই সমস্ত জিনিষের উপর কোন শুল্ক ছিল না। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পণ্য-দ্রব্য অবশ্য শুল্ক হইতে রেহাই পাইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের স্বার্থ ইহাতে আদৌ নিহিত নাই। ১৯৩১ সনের ৩০শে জুলাই হইতে নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে আমদানি দ্রব্যের এই প্রাইমেজ্ শুল্ক বসিবার কথা; তবে ১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের শেষে এই শুল্ক আর থাকিবে না।

নিম্নের তালিকায় নিউজিল্যাণ্ডের ট্যারিফ পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ট্যারিফ্	ব্রিটিশ পক্ষপাতমূলক ট্যারিফ	সাধারণ ট্যারিফ
১ম শ্রেণী।—আনোয়ার, কৃষিজাত দ্রব্য, খাদ্য এবং মুদিখানার জিনিষ।		
চা।—৪ পাউণ্ড প্যাকেট্ বা তদতিরিক্ত ওজনের—		
১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	পাউণ্ড প্রতি ৩ পেঃ	পাউণ্ড প্রতি ৫ পেঃ
১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারীর পর	বিনা শুল্কে	পাউণ্ড প্রতি ২ পেঃ
চা।—যাহা পূর্ব্বে ধরা হয় নাই।		
১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	পাউণ্ড প্রতি ৫ পেঃ	পাউণ্ড প্রতি ৭ পেঃ
১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারীর পর	পাউণ্ড প্রতি ২ পেঃ	পাউণ্ড প্রতি ৪ পেঃ
৪র্থ শ্রেণী।—বস্ত্রাদি		
পোষাক পরিচ্ছদ ব্যক্তিগত ব্যবহার জন্য		
১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	৩৫% অ্যাড্‌ভ্যালোরেম্	৭০% অ্যাড্‌ভ্যালোরেম্
১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারীর পর হইতে	৪০% অ্যাড্‌ভ্যালোরেম্	৬৫% অ্যাড্‌ভ্যালোরেম্
পোষাক এবং রেডিমেড্ কাপড়, যাহা পূর্ব্বে ধরা হয় নাই; হোসিয়ারি—		
১৯৩২ সনে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	৩২½% এ্যাড্‌ভ্যাঃ	৪৫% এ্যাড্‌ভ্যাঃ
১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে	২৭½% এ্যাড্‌ভ্যাঃ	৪০% এ্যাড্‌ভ্যাঃ
মেঝের আবরণ, যথা :—		
(৩) লিনোলিয়ম্, মাদুর, রাগ ইত্যাদি—		
১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	২০% এ্যাডভ্যাঃ	
১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারির পর	বিনা শুল্কে	
(৪) কার্পেট্ ইত্যাদি		
১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	২৫% এ্যাড্‌ভ্যাঃ	৫০% এ্যাড্‌ভ্যাঃ

ধারার নম্বর	ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ট্যারিফ্	বৃটিশ পক্ষপাতমূলক ট্যারিফ্	সাধারণ ট্যারিফ্
	১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারির পর	২০% এড্ভ্যাঃ	৩৫% এড্ভ্যাঃ
	ধার এবং এই ধরণের অন্যান্য শুল্ক এবং তজ্জাত দ্রব্যাদি, যথা :—		
	(১) ধার শুল্ক, কাঁচা এবং রৌদ্রশুষ্ক		
	১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর শুল্ক	১০% এড্ভ্যাঃ	১০% এড্ভ্যাঃ
	১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে	বিনা শুল্কে	বিনা শুল্কে
	(২) ধার অনুরূপ শুল্ক সমূহ পাকান, অন্তভাবে তৈরী করা নয়		
	১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর শুল্ক	২৫% এড্ভ্যাঃ	২৫% এড্ভ্যাঃ
	১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারির পর	১৫% এড্ভ্যাঃ	১৫% এড্ভ্যাঃ
	(৩) ধার এবং নকল ধার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পোষাকে রাগে এবং অন্যান্য জিনিষপত্রে রূপান্তরিত ; ধার ট্রিমিংস্ এবং নকল ধার ট্রিমিংস্—		
	১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর শুল্ক	৩৭½% এড্ভ্যাঃ	
	১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারির পর	২৭½% এড্ভ্যাঃ	
	(১) টেক্স্টাইল্ ফিস্গুড্স্ কার্পাস্, লিনেন, পাট, হেসিয়ান, শণ এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জাত তন্তু এবং এই সমস্ত দ্রব্যের মিশ্রিত তন্তুজাত বস্ত্র (পশম, রেশম এবং নকল রেশম ছাড়া)—		
	১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	বিনা শুল্কে	
	(২) রেশম, ইমিটেশান রেশম, নকল রেশম ইত্যাদির প্রস্তুত মৌলিক এবং মিশ্রিত বস্ত্রাদি—		
	১৯৩২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্পাস, লিনেন, পাট, শণ, অন্যান্য উদ্ভিজ্জাত তন্তু, রেশম, ইমিটেশান রেশম, নকল রেশম ইত্যাদির মিশ্রিত বস্ত্র (পশম এবং লোম ছাড়া)—	১০% এড্ভ্যাঃ	১৫% এড্ভ্যাঃ

ধারার নম্বর	ভিন্ন ভিন্ন ধারার ট্যারিফ্	বৃটিশ পক্ষপাতমূলক ট্যারিফ্	সাধারণ ট্যারিফ্
	১৯০৩ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে ৮ম শ্রেণী।—সৌখীন জিনিষ, বাদ্য যন্ত্র, ইনষ্ট্রুমেণ্টস্, খেলিবার সরঞ্জাম ফটোগ্রাফিং জিনিষপত্র।	বিনা শুল্কে	১৫% এড্‌ভ্যাঃ
	সুখের জিনিষ ও খেলানা; খেলিবার সরঞ্জাম, মাছ ধরিবার সরঞ্জাম, বিলিয়ার্ড খেলার সরঞ্জাম ছড়ি, চিরুণী, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি—		
	১৯০২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	২৫% এড্‌ভ্যাঃ	৪০% এড্‌ভ্যাঃ
	১৯০৩ সনের ১লা জানুয়ারির পর	২০% এড্‌ভ্যাঃ	৪৫% এড্‌ভ্যাঃ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ হইতে ১৯০১ সনের ২৫শে জুন তারিখে একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি কতগুলি দেশে মুখ-পাকের নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা যায়। এই আইন দ্বারা ঐ সমস্ত দেশ হইতে ভেড়া শূকর প্রভৃতি রোমন্থনকারী পশু, ছাগল, ঘরফ দেওয়া বা জমান গোমাংস, ভেড়ার মাংস ছাগমাংস বা শূকর ইত্যাদির মাংস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় আমদানি করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

২। এই আইনের বলে আরও জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দেশ হইতে যদি নিষিদ্ধ জানোয়ার বা মাংস ইত্যাদি আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়; এবং আমেরিকান রাষ্ট্র যদি উহা দেশের মধ্যে ঢুকিতে না দেয় তাহা হইলে আমদানিকারকগণ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সমস্ত চিজ রপ্তানি করিবে নতুবা পশুবিভাগের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ সমস্ত চিজ নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।

বিবিধ

২৭শে আগষ্ট, ১৯০১

বৃটিশ সাম্রাজ্য—

অষ্ট্রেলিয়া।—সেলাইকলের উপর ধার্য্য, শুল্ক পরে পরিশোধের ব্যবস্থা।

বহুতোলাশু, বেচুয়ানল্যাণ্ড, এবং সোয়াজিল্যাণ্ড—কাষ্টম ট্যারিফের নানা সংশোধন।

কানাডা।—খাদ্য এবং ঔষধির আইন; মাপকাঠি বিষয়ক।

ফিজি।—ডাই-হাইড্রো-মার্কিনোন্ এবং তদ্ভাত লবণ আমদানি-রপ্তানি।

আইলিশ অফ ম্যান—ট্যারিফ কমিশন; ঐই উপর কাষ্টম শুল্ক আদির প্রশ্ন উত্থাপন। বাধন রপ্তানি।

ম্যাসেডোইন্।—কাষ্টম শুল্ক রেয়াইয়ের ব্যবস্থা।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন।—কয়েক প্রকার গ্রেণ্ ফিড্ চামড়ার উপর ধার্য্য কাষ্টম শুল্কের রিবেট প্রদানের ব্যবস্থা।

অন্যান্য দেশ।—

বেলজিয়াম।—গলিপেড্ আমদানি। নাইট্রোজেন-ঘটিত জমির সার আমদানি।

ফ্রান্স।—ঔষধপত্রের শুল্ক নিয়ন্ত্রণ।

জার্ম্মানি।—গম এবং রাইয়ের উপর কাষ্টম শুল্ক। আমদানির উপর নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি।

হাঙ্গারি।—চামড়া, চামড়া-মাফিক চিজ বা তদ্ভাত দ্রব্যের উপর টার্ণওভার ট্যাক্সস্।

ইত্যাদি।—এ্যালুমিনিয়াম এবং এ্যালুমিনিয়াম-ঘটিত দ্রব্যাদির উপর ধার্য্য কাষ্টম শুল্ক-বৃদ্ধি।

ইরাক।—কাষ্টম এবং আবগারী শুল্কের কন্‌সার্ভেন্‌ আইন।

নিকারাগুয়া—কাষ্টম ট্যারিফসমূহের সংশোধন।

কমানিয়া।—বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন কর।

স্পেন। বিনা শুল্কে গোলআলুর বীজ আমদানির ব্যবস্থা। কাষ্টম শুল্ক পরিশোধ।

সিরিয়া।—ট্যারিফসমূহের হেরফের।

যুগোশ্লাভিয়া।—উৎপাদন কর সংস্থাপন।

বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য

নিম্নের তালিকায় ১৯৩০-৩১ সনের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী চার সনের বাঙ্গলার বৈদেশিক এবং উপকূল বাণিজ্যের পরিচয় প্রদত্ত হইল। প্রধান বন্দর কলিকাতা এবং অধীন বন্দর চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, কক্সবাজার, বরিশাল এবং নীলার ব্যবসাবাণিজ্যের বিবরণ এই তালিকায় পরিবেশিত হইল :—

				১৯২৯-৩০	
				টাঃ	
বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানি					
পণ্যদ্রব্য—বেসরকারী	৮১,৬৭,৬০,৭৩৮	৮৬,৪০,৯০,৫৭০	৮৯,০০,৮৮,৭০৪	৮৫,৩১,৬৪,৭৯৪	৫১,৫০,৯৬,৭৮৯
সরকারী	৩,৩৪,৪৭,৪০৮	৩,৩৬,০৪,৯৯৮	২,৩৯,৩৯,১১০	২,৮৩,১৫,৯০৪	১,৭০,২৪,৬৬৯
মোট	৮৫,০২,০৮,১৭৬	৮৯,৭৬,৯৫,৫৬৮	৯১,৪০,২৭,৮৩৪	৮৮,২০,৮০,৬৯৮	৫২,৯৪,২২,৪৪৮
দৌলৎ—					
সোনা—বেসরকারী					
,, —সরকারী					
রূপা—বেসরকারী				৩,৩৮,০৪,৭৬৩	
,, —সরকারী					
কারেন্সি নোট—বেসরকারী					
,, —সরকারী	৯০		...	১০,৪১৬	...
মোট	৪,৮৫,৯৯,৯৩১	৩,৮৯,৯৩,৩৯৯	৪,৭৬,০৭,৩২৮	৩,৬৫,৮৪,৭০৩	৪,১৯,৪৫,১১৫
রপ্তানি					
বিদেশী-মাল পুনঃ রপ্তানি					
বেসরকারী	৫৮,৫২,৫৯৫	৭১,২২,৮১০	৫৯,৯৭,৬৭২	৫৬,১৬,৪২৭	৪০,১৭,০৯০
সরকারী	৫,৩১,১৬১	১০,২৭,৮৮০	৮৭,৭৮৩	৪৮,১৬৪	২৪,৯২০
মোট	৬১,৮৩,৭৫৬	৮১,৫০,৬৭০	৬০,৮৫,৪৫৫	৫৬,৬৪,৫৯১	৪০,৪২,০৫০

ভারতীয় মাল					
বেসরকারী	১,৩৪,০৭,৯৯,৩৭৫	১,৪৬,৩৭,৪২,০৮৭	১,৪৪,৩১,৩১,৫২৫	১,৩৩,১১,২৫,৯৮১	৮৬,৩১,৭৫,২৭৭
সরকারী	১,২২,২৭,০৩৮	১,২০,১২,৪৪২	১,০৩,৫১,৫১৬	৯০,৫১,৯৫০	৭১,৪৬,০৬২
মোট	১,৩৫,৩০,২৬,৪১৩	১,৪৭,৫৭,৫৪,৫২৯	১,৪৫,৩৪,৮৪,১১১	১,৩৪,০১,৭৭,৯৩১	৮৭,০৩,২১,৩৮৯
মোট রপ্তানি	১,৩৫,৯২,১০,১৬৯	১,৪৮,৩৯,১৫,১৯৯	১,৪৫,৯৫,৬৯,৫৬৬	১,৩৪,৪৮,৪২,৫২২	৮৭,৪৬,৬৩,৩৪১
দৌলৎ—					
সোনা—বেসরকারী			৬,১৬৬		
„ —সরকারী					
রূপা—বেসরকারী					২,৪৯৭
„ —সরকারী					৩৮,৫৫,৪২৫
কারেন্সি নোট—বেসরকারী					
—সরকারী	১২৫	...	...	...	...
মোট	১,৫৪২	২,৭৭,০০	১,৫৮,২৪,৮০৪	১,৭১,৬৬,৪২৩	৩৮,৫৭,৯২২
মোট বৈদেশিক বাণিজ্য,					
দৌলৎ সমেত					
উপকূল বাণিজ্য					
আমদানি পণ্য দ্রব্য—					
বেসরকারী ভারতীয় মাল	১৮,৮৫,৬০,৮৭১	২২,৯৫,৭৮,৫২২	৪৪,৮০,৬২,৭০২	২৯,২৮,১১,২৮৯	১৭,৮৪,৯০,২৯৫
বিদেশী শিল্প দ্রব্য	১,১৭,৮৭,২৮৪	১,০১,২১,২১,২৪৪	৮১,০৬,০৩২	৯৭,৪১,৮৫২	৮২,২০,৪৪৪
মোট	২০,০৩,২৮,০৫৫	২৩,৯৩,৯৯,৭৬৬	২৫,৬১,৬৮,৭৩৪	২১,৯৫,৫০,১৪১	১৮,৬৭,১০,৭০৯
সরকারী					
ভারতীয় মাল	৯,৩৩,০৭৯	৫,৭৬,১১২	১৪,৯০,৪৪৩	৪,৪০,৫০৮	৩,২৪,৭৪৯
বিদেশী শিল্প	৫,৪৬,৫৮০	৭,১২,৮৭৭	৯,৩১,৯৭২	৮,০৪,৫০৪	৬,২১,৫২৪
মোট	১৪,৭৯,৬৫৯	১২,৮৮,৯৮৯	২৪,২২৪১৫	১২,৪৫,০১২	১০,১৬,২৭৩
মোট আমদানির	২০,১৮,০৭,৭১৪	২৪,০৬,৮৮,৭৫৫	২৫,৮৫,৯১,১৪৯	২২,০৭,৯৮,১৫৩	১৮,৭৭,২৭,০১২
দৌলৎ—					
সোনা—বেসরকারী					
„—সরকারী					
রূপা—বেসরকারী	৬৮,৪৬,৫৩০	৯২,৯১,৯৬৬	১,২০,১১,৫৯৯	১,২৬,৭০,৫০৯	১,০৪,৬৬,১৭৬
„—সরকারী	১,৪৫,৫৮,৭১১	৪,৭৯,১৮৭	২১,৬১,৫৩৯	১৮,১৭,১৫৯	১৪,৭৭,৭২৯
মোট	২,২৪,০৫,২৪১	১,০৪,৭১,১৬৩	১,৪২,৪০,৯৫০	১,৪৫,১৭,৭২৩	১,২০,৯৩,৯৪৮
রপ্তানি—					
পণ্য দ্রব্য					

বেসরকারী					
ভারতীয় মাল	১৫,১৭,১৯,০১৮	১৪,৯১,১৪,৭৭২	১৪,৪১,০৬,৬৪১	১৩,৬৪,৩১,১২২	
বিদেশী মাল	১,৭৬,৭৯,২৬৮	১,৬০,৪২,৪২৪	১,৪১,০৭,২২১	১,৩৩,০৮,১২৮	
মোট	১৭,৪০,৯৮,২৮৬	১৬,৫২,১৭,১৯১	১৬,৮২,১৩,৮৬৩	১৪,৯৮,৩৯,৩৫১	
সরকারী—					
ভারতীয় মাল	৪০,৫৩,৭১৪	৩০,০৪,২৪৮		৪৬,৮৭,৭৭৯	৪২,২৯,০৬৫
বিদেশী পণ্যদ্রব্য	৩৩,২৮,৬০১	৩০,৪৪,৫০০		১৪,৫৭,১৪৮	১০,৫৭,৩৭৬
মোট	৭৩,৬২,৩১৫	৬০,৪৮,৭৬৮	৪৮,৫৩,০৩০	৬১,৪৪,৯২৭	৫৯,২৬,১৪১
মোট রপ্তানি	১৮,১৭,৬০,৬০১	১৭,১২,৬৫,৯৬৪	১৭,৪০,৬৬,৮২৬	১৫,৬৯,৮৪,২৭৭	১২,৯৫,৫৬,৮০৩
দৌলৎ—					
সোনা—বেসরকারী					
,,—সরকারী					
রূপা—বেসরকারী					
,,—সরকারী					
কায়েন্সি নোট—					
,,—বেসরকারী					
,,—সরকারী					
মোট	১৮,২৭,৯৩৫	২৭,৮৭,৩০৬	২১,২০,৪৭০	৩,৩১,১০০	৫,৫২,০৫০
মোট উপকূল বাণিজ্য (দৌলৎ বাদে)	৩৮,৩৫,৬৮,৩১৫	৪১,১৯,৫৪,৭১৯	৪৩,২৬,৫৮,০৪৫	৩৭,১৭,৮২,৪৩০	১,৭২,৮৩,৮১৫
মোট বাণিজ্য (দৌলৎ বাদে)	২,৫৯,২৯,৮৬,৩৮০	২,৭৯,৩৫,৮৫,৪৮৬	২,৮০,৬২,৫৫,৪৫৪	২,৫৮,৫১,০৫,৭৫০	১,০২,১৩,৬৯,৬২২

ছনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক ভাঙ্গা, এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের অত্ত আলোচ্য সনে বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সনের মধ্যে এমন দুর্য্যোগ এবং ভাটা আর কখনও বাঙ্গলার ভাগ্যে দেখা যায় নাই। ১৯২৯-৩০ সনের তুলনায় ১৯৩০-৩১ সনে বাঙ্গলার আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের উভয় প্রকারের বাণিজ্য হ্রাস ঘটিয়াছে আরও ৬৭,০৭৮৬ লাখ টাকার। বাণিজ্য-হ্রাস মূল্য হ্রাসের একটী কারণ, বাণিজ্যের পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আমদানির তরফে, বুট, জুতা, ছাং, চামড়া ট্যান করিবার উপকরণসমূহ এবং রেশমী কাপড়চোপড় বাদে আলোচ্য প্রধান প্রধান বিদেশী মালের আমদানি কমিয়াছে। তুলার কাপড়চোপড়, ধাতু, ওষ, যন্ত্রপাতি, মিলের প্রস্তুত দ্রব্য, চিনি, শস্য, তাইল, ঘৃতাদি এই কয় জিনিষের আমদানি কমিয়াছে অতিরিক্ত পরিমাণে।

রপ্তানির তরফে, লাখ, নোনাজাতি, এবং চায়ের বর্জ্জিত অংশ, ছাড়া অন্যান্য সকল চিজের রপ্তানি কমিয়াছে এবং খুব অতিরিক্ত পরিমাণ কমিয়াছে পাট এবং পাটজাত দ্রব্য। এই দুই খাতে রপ্তানি হ্রাস হইয়াছে যথাক্রমে ১০ কোটী এবং ২০ কোটী টাকার। চা, লাক্ষা, কাঁচা চামড়া এবং শুক, ধাতু এবং ওষ এই কয়েক জিনিষও খুব কম রপ্তানি হইয়াছে।

বিলাত হইতে মাল আমদানি কমিয়াছে ৫০% হইতে ৪৩% এ; কিন্তু ঐ দেশে মাল রপ্তানি বাড়িয়াছে ২৫% হইতে ২৮% এ।

কলিকাতার বন্দরে টনেজের পরিমাণ :—

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
মোট টনেজের পরিমাণ	৪,৬৩৮,৫৬৯	৪,৭৬৮,৮৩১
জেটিতে আমদানি	১,০৯৮,৯০৫	১,১২১,০০০
ডকে "	৪৭২,৫৪২	১,১৮৩,১৮৩
" জাহাজানি (মোটামুটি)	১,৭৬৮,১৭৪	১,৭৯৯,২২৮
" (কয়লা)	২,৮১৭,৩৬২	২,৬৪৪,২৫৮

প্রধান বন্দর কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচয়

নিম্নের তালিকায় কলিকাতার সহিত বিদেশের এবং ভারতীয় বন্দরসমূহের মোট ব্যবসায় পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

	বৈদেশিক বাণিজ্য				উপকূল বাণিজ্য				
	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯২৬-২৮	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯		
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা		
আমদানি									
পণ্যদ্রব্য—									
বেসরকারী	৮০,০২'১৯	৮৩,৪৯'২৫	৮৬,১৫'৯৪	৮১৩০'৭২	৪২৮৬'১৭	১৬১৫'০৩	১৭২৮'৮৪	২০৯৮'৭০	১৮৪০'৩৯	১৫৪০'০২
সরকারী	৩,৩৪'৪৭	৩,৫৬'০৪	২৩৯'৩৯	২৮৩'১৬	১৭০'২৬	১৪'৪২	১২'৫৪	২৫'২১	১২'০৭	৯'৭১
মোট	৮৩৫৭'২৬	৮৬,৯৫'২৯	৮৯০৫'৩৩	৮৪১৩'২১	৫১৫৯'৪৩	১৬২৯'৪৫	১৮১১'১৮	২১২০'৬১	১৮৮২'৪৬	১৫৪৯'৭৩
দৌলত										
সোনা—বেসরকারী					৮৮'৮৬					
—সরকারী										
রূপা—বেসরকারী				৩৩৮'১৫		৬৮'৪৬				
—সরকারী						২৫৫'৫৯				

	বৈদেশিক বাণিজ্য					উপকূল বাণিজ্য				
	১৯২৬-২৭ লক্ষ টাকা	১৯২৭-২৮ লক্ষ টাকা	১৯২৮-২৯ লক্ষ টাকা	১৯২৯-৩০ লক্ষ টাকা	১৯৩০-৩১ লক্ষ টাকা	১৯২৬-২৭ লক্ষ টাকা	১৯২৭-২৮ লক্ষ টাকা	১৯২৮-২৯ লক্ষ টাকা	১৯২৯-৩০ লক্ষ টাকা	১৯৩০-৩১ লক্ষ টাকা
কারেন্সি নোট—বেসরকারী										
,, —সরকারী	...			১০	...	...	...			
মোট	৫৮৫.১৭	৮৯৯.১৩০	৪৪৬.০৭	৩৮৫.৮৫	৪১৯.১৫	২১৪.০৫	১০৬.৭১	১৪১.৪১	১৪৫.১৮	২০.১৪
মোট আমদানি	৮৯২৩.২৩	৯০৮৫.২২	৯৫৮১.৪৯০	৮৭৭৯.৭৬	৫৫৭৮.৬৮	১৮৫০.৫০	১১১৫.৮৯	২৩৩১.১২	২০০৭.৬৪	১৮৭০.৬১
রপ্তানি										
পণ্যদ্রব্য—										
বেসরকারী	১২৬,৮৯.৮৪	১০৮৮.৩৫	১৩৭৫২.৩০	১২৭০২.৯৪	৮১১৫.৯৯	১৪৮৯.৪০	১৪৩১.৫৪	১৫০৭.৮৮	১৫৩৮.৭৯	১১১৯.০০
সরকারী	১৪৭.৫৮	১৩০.৫০	১০৪.৪৯	৯১.০০	৭১.৭১	৭২.৮৪	৫৯.১০	৪৮.০৮	৭০.৮৪	৫৯.৪১
মোট	১২৮১৭.১২	১০৯৮৮.৮৫	১৩৮৫৬.৬৯	১২৭৯৫.৯৪	৮১৮৬.৭০	৪৫৬১.২৭	১৪৯২.৪৭	১৫৮৫.০৬	১৫০৯.৪০	১১৭৮.৫১
রৌপ্য—										
সোনা—বেসরকারী										
,, —সরকারী										
রূপা—বেসরকারী										
,, —সরকারী										
কারেন্সিনেট বেসরকারী										
সরকারী										
মোট	০০১	২.৭৭	১৪৮.২৫	১৭১.৬৬	৩৮.৫৮	১৮.২৮	২৭.৮৭	২১.২০	৩.৫১	৪.৫১
মোট রপ্তানি	১২৮১৭.২৩	১০৯১১.৮৮	১৩৮১৮.৫৪	১২৯৬৭.০০	৮২১৫.২৮	৪৫৮০.৫৫	১৪৫২.৫৪	১৫৮৭.৪৬	১৫৩১.৭৯	১১৮৩.০৯
বাণিজ্যের ব্যালান্স	+৩৮৯৪.০০৫	+৪.৪৭৪৪	+৩৯৩৫.৩৪	+৪৯.৭৭৫১৫	+৪৯.৩৪৯২	−২৭২.২৫	−৩৫.৫৫	−৬৭.৪৬	−৪৩.৫৯	−৫৮৭.৬৪
মোট বাণিজ্য (দৌলৎ বাদ)	৮.৪	২২৯২.২০	২১২০৭.৫৫	১৫৪৯০.৬৫	৩১১১.৭২	৩৩০৩.৮৫	৫৪৮৫.৯৭	৩২৭১.৮৯		

নিম্নের তালিকায় কতকগুলি জিনিষের গড় দরের তারতম্য প্রদত্ত হইল :—

আমদানি								
তুলার সুতা—প্রতি পাউণ্ড								
মোটা তুলার কাপড়								
প্রতি গজ				২৩৫·৩	২১৯·০			
ধোলাই তুলার								
কাপড়—,,			৩৮৭·৫					
রঙীন তুলার								
কাপড়—,,			৫১৪·৮	২৭০·৪	১৪০·৭	২৭৪·৪	২১৮·৫	১৮১·৫
লোহা ও ইস্পাত—,, টন		১৪·৬	২৫৪·৬	১৩৮·৫	১২০·৬	১০৯·৪	১১১·৮	১১৫·৮
লবণ—,, মণ		৯২·১	২৪৬·১	১৪৯·০	২০১·০	১৬৮·৬	১৩৫·৩	১০২·৯
চিনি—,, টন		৮৮·৯	৩০৮·৫	১০১·৮	৮৮·৯	৭৮·৯	৯১·৬	৫০·২
পশমী কাপড়—,, গজ		১৮·৭	৪৪৪·৭	১৮১.৮	২০৮·২	১৮৯·৪	২০৯·৪	১৮৪·৫
কেরোসিন তেল—,, গ্যালন	১০০	৯৫·১	১৬০·২	১৪৭·০	১০৩·১	১৪৭·০	১৪৩·৪	১২৮·৯
সিমেন্ট—,, টন	১০০	৯০·৭	২৫৮·৭	১০৪·৫	১৩৪·৬	১২৭·৬	১১৯·৮	৯৯·৭
গড়	১০০	১১২·৬	৩৪৪·৪	১৭৪·৮	১৭৪·০	১৬৯·৬	১৬৩·২	১৩৩·৫
রপ্তানি		১০০-১১	১৯১০-২১	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
কয়লা—প্রতি টন		৮১·২	১২১·৯	১১৭·১	১১২·০	১০৫·০	৯৮·৩	১০৭·৭
কার্পাস—,, ,,		১৪৪·৫	২৪২·৪	১৯০·১	১৮১·০	১৯৯·৭	১৭৫·৪	১১৯·৪
আফিম্—,, বাক্স		১৩৮·৬	২৭৩·০	৫৩·১	৩৩ ·৮	৫৩·১	৩৩·৭	৫৩·৭
নীল—,, হন্দর		৯৪·১	২৪৮·৮	১২৪·২	১২০·৪	১১৪·৩	১২৭·০	১২৩·৫
চাউল—,, টন		১১৭·২	২৬৮·৮	১৯৭·৪	১৯৮·৩	১৯৩·০	১৮০·৯	১৪৩·৯
গম—,,		১১২·৫	২৩০·৮	২৩৮·২	২১৮·৮	১৭০·০	১৯৪·৩	১৫৭·৪
চামড়া—		১৫০·৮	১৩২·০	১০৭·৬	১০৩·৪	১১৫·৬	১২৫·৬	৯৫·২
পাট—,, ,,		১৫০·০	২১৯·৮	২৪২·১	২১৮·৯	২২৯·৮	২১৪·০	১৩৩·১
পাটের থলে—		১১৫·৪	২২০·৫	২৬৬.৭	২৪৮·২	২৪৬·২	২০৫·১	১৬৬·৮
থলে—,, গজ		১০০·০	২০৫·৩	২১১·৮	২১৭·৬	২২৯·৪	১৫২·৯	১৪৭·১
শেলাক্—,, হন্দর	১০০	১১৩·৬	৫৩৮·৬	২১৪·৪	২৯৬·৪	২৭০·৮	২৪০·১	১৩১·৪
রসিনা—,, টন	১০০	১৬৫·৭	২৪১·৬	১৪৯·৯	১৪৭·৮	১৫৩·৬	১৬৮·৮	১১৩·১
তিল—,,	১০০	১০৯·৯	২২৯·২	২১০·১	১৯৪·৭	১৭৮·৩	২৬০·৩	১৩৭·৬
চা—,, পাউণ্ড	১০০	৯১·৭	৭৮·৩	১৬১·৯	১৭৩·২	১৪৪·৩	১৩৪·০	১২৬·৮
গড়—	১০০	১২৮·২	১৩২·৪	১৯৪·০	১৯৭·৩	১৯১·৫	১৮৮·৪	১৪৮·৯

বৈদেশিক বাণিজ্য

নিম্নের তালিকায় সরকারী হিসাব সমত শ্রেণীবিভাগযুক্ত কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদত্ত হইল :—

আমদানি

		১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
		লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা
১।	খাদ্য পানীয় এবং তামাক	১৪,১৬'৬৬	১২,৪৩'১৮	১১,৭২'৬১	১৪,৭১'২৫	৯,৬২'৫৫
২।	কাঁচা মাল	৪৭৯'৯৪	৬,০৮'৫৬	৬,০৬'৮১	৬,৪৩'৯৮	৪৮২'৬২
৩।	কারখানাজাত মাল	৫৯,৮২'২৯	৮৩,৫২'৪২	৬১,২৯'৩৩	৫৯,০৩'৬১	৩৪,৪২'৫১
৪।	তাজা আনোয়ার	২১'৩৮	১৯'৭৭	১৮'৪৭	৭'২০	৭'০৫
৫।	পোষাক জিনিষপত্র	১০২'৫২	১০৫'৩৪	১১২'৫৮	১০৪'৫০	৯১'৩৬
	মোট—	৮০,০২'৭১	৮৩,৫৯'২৫	৮৬,৬৫'৯১	৮১'৩৯'১৪	৪৯,৮৮'১৭

রপ্তানি

		১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০ ৩১
		লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা	লাখ টাকা
১।	খাদ্য পানীয় এবং তামাক	২২,৬৯'৩১	২৫,৯৯'৪৯	২০,৪০'৬২	২০,৪৮'১০	১৭,৫৭'৭১
২।	কাঁচা মাল	৪৪,৫৩'০১	৫১,৫০'৩৮	৫৩,১৯'৯৪	৪৭,৪৭'২৬	২৫,৯৪'৮২
৩।	কারখানাজাত মাল	৫৯,১১'৭৭	৬০,১৯'৪১	৬৩,২০'৬৫	৫৮,৬২'২৫	৩৭,২৫'২৯
৪।	তাজা আনোয়ার	৭'৯৫	৭'৯৩	৯'৪০	৭'৬৭	৪'৭৭
৫।	পোষাক জিনিষপত্র	৪৭'৬০	৬১'১৪	৬১'১৪	৩৭'০৬	৩২'৪০
	মোট—	১২৬৯'৬৪	১৩৮৩'৩৫	১৮১৫২'৩০	১২৭০'৯৪	৮১১৪'৯৯

আমদানি

নিম্নের তালিকায় কলিকাতা বন্দরে আমদানি পণ্যসমূহের তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

পণ্য দ্রব্য	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	মোট আমদানির
	টাঃ	টাঃ	টাঃ	টাঃ	টাঃ	শতাংশ
সোর্পাসজাত দ্রব্য	২১,২৯,১৬,০০৮	২৮,১০,৮০,৮৫৪	২৯১০২০০৭২	২৩১০৮৯২৫৭	৮৬৫০৭৮৯০	১৭'৩৫
মেশিনারি ও মিলওয়ার্ক	৪,১১,০৪,৭০২	৫,২০,৫০,১০৯	৬১৩০৩১৫৬	৬৮৯২৯১২২	৫৩০৭২৭৭৩	১০'৬৯
ধাতু এবং ওর	৯৮৮৫৫৪৪২	১০৫১,৫৫৭৭৮	১০৬০৪১৬৫১	৯০২৮৩৮৯৯	৫১০৩৪১৭২	১০'২৪
খনিজ	৭৭৩০৭৪৬২	৫৯২৮৬২০২	৬১৯২৫৫৩৯	৪৭২৩৭৭৪১	৩৯২২৬৫২৪	৭'৮৭
তৈল	৫৫০৭৭৮৮১	৪৭৭৫৭৯৮০	৪৬৬৪৮৯৪৬	৪১৮৩৭২৩৬	৩৪১৬৩০০৮	৬'৮৫
মাল হাতিয়ার	১৭০৩৯১৬৬	১৯৪১৫৬৩১	২১০৩১৩৮১	২২৮৬৯৫২৪	১৯৫৬৮৫১৮	৩'৯২
মসলা	১৬৫১০১৭৯	১১০৪২০০৭	১৪৯৬,৫৮২	১৭০৭৬২৮০	১৪২৬১৫৩৯	২'৬৮

মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল ইত্যাদি	১৪৯৫৯০৭৮		১১১১৫৪৯১	১৬২৯০৮৮০	১১৪২৫৫৩৯	২.২০
হার্ডওয়ার	১৬২৬৩১৪		১৭৮৭২৫৪	১৭২১০৭২১	১১৩২৩৪২০	২.১৯
খাদ্য, অয়েলম্যান্স্ ষ্টোর	১৫১৮১০১০		১৫৭১১৪০	১৫০৪৫০৮০	১১০০৩৩৮০	২.২৭
শস্য, দাল ময়দা	৮০৪৮৩৮৪		৫১৭০০ ৩১	১৮৩৩৭৫৮৫	১০০২৫৪২১	২.০২
কেমিক্যাল দ্রব্য	৯৩৭৭৪৭৭		১০০৭৯০৯৮	১১৫০২৬১৬	১০০৭০২১৯	২.০২
লিকার, স্পিরিট ইত্যাদি	৯৮৪১৯১০		১০০৯৮৭৩৫	১১১০৯৫৭৬	৯৩১৪২৬২	১.৮৭
পোর্টাল আইকেল	১০২৫২১৫০		১১২৫৮০৩৩	১০৪৫০৬৬৭	৯১৩৬৩৮০	১.৮০
কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড	৯০৬১৮৬৩		১০৫৪০৩৬১	১২১১৯২০৫	৮৭১৯৭১৫	১.৭৫
লবণ	৮৯৪১২৭২		১০৮২৪৮২০	৯৫১৫৬৭২	৮২০৪৭৫৫	১.৮৫
ক্যারেজ রেল ইত্যাদি			৭১৫২১০৩	২৫৪২৫২৩	৭২৬৭২৮০	১.৪৬
ঔষধপত্র	৬৭২৫৩৩৬		৭১১১৩৭৫	৭৭৬২২৯৪	৬৬০৬৮৯৫	১.৩৩
পশমী কাপড়	৮৪০৮০৬৭		৯৩১২৮৭৯	৮৪০১৯১৮	৫৬৮৬৫৫০	১.১২
তামাক	৮৭৬৮৩১৯		১১৫২৫৪১৭	১২০৯৬১১	৫৩৪৪৬১৯	১.০৭
রবার	৫৯১৬৫৮৫		৭০০৯৮৬৫	৬৮১১০১	৪৯৯৫২৯০	
কাচ ও কাচের পাত্র	৮৮৫৬১০৩		৭৪৩১৯৯৮	৭৬৯৯৮৮	৪৯৪৪৩০	
রেলওয়ে প্লান্ট ও রোলিং ষ্টক		২৭১৬৮১৬				
চায়ের বাক্স		৫০১২৫০৯	৪৮৩১৮১	৫৫৪৩৫০৩	৪৩১৫১৮৩	
কাগজ তৈরীর চিজ		৪০১২৫০৩	৩৯৫৪৪১১	৪২০৬১৫	৪০০০১৭৬	
রং ইত্যাদি		৫৮৯৬১০৫	৪৯৮১৫৩৫	৫৪৫৮৭০১	৩৯৮১৭১১	
বুট ও জুতা		১৬৮২২৬৪	২০৪১৬২০	৬৪৯৯৮০৬	৩১১৪০০৭	
নকল রেশম		৯৮০০০০৩	৫৬৪০৬৫৫	৫৭৯১২৯৬	৩৮৩৪২৪৪	
ডাই এল ট্যান্						
করিবার উপকরণ			২২৭৩৮২১		২৯৭৩৮১৫	৭৬০
সাইকেল			৫১২১৪০২		২৮০৫৯৫১	৫৬
রেশম কাপড়			১৬৬১৫৩		২৬৭৯২৫৩	৫৬
কাঠ			২৪০৪৫০৪		২৬৮২৯১৮	৫৪
ষ্টেশনারি			৩৪৪০০৮৩		২৬১৮২৬১	৫৩
বিল্ডিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং মেটিরিয়াল	২৯৪৩৮২৮	৩৪২৫৪৯১	৩০৯১৪০২	৩৮১৫০১	২৫৫১৫০৬	৫১
পরিচ্ছদ	৩২১৪২৫২	২২১৬৯০৩	৭৫৫৪১৫৮	৪৯৮৬৭২	২৪৭৬১৯২	৫০
পুস্তক ইত্যাদি	২৪৮১৯৬৮	২৫৮৭৫০	২৮৪৭২৬০	২৮৯৮৮০	২৪৫৪৩২০	৪৯
মেশিনের বেল্টিং	২৯১২৪৮১	৩১০১২০	৩০৯৭৮৫২	৩১৯২৪৮	২২০০৮৬৬	৪৬

লাক্ষা	১৭৪১৬৭৬	২১৯২৭৪৭	৩০০৮৯৯৮	৫৭২৪৫০১	২১২৭১৩২	·৪৩
সাবান	২৬৮৮৫৭৯	২৭৫১০৮১	২৭০২৮৪৫	২৮২৯৪৩২	১৭০৮৯৭৩	·৩৪
টয়লেট্	১৭৫৮১৩	১৮৭৮১১২	১৮৫০২৪২	২১৮৫৪১৯	১৬১৯৮২৯	·৩৩
ছাতা ইত্যাদি	২৭৬৮১২৯	৩৩১৬০৭৪	২৮৮৯৫০৪	২১৫২০৫২	১৬০৪১৯৫	·৩২
অস্ত্র শস্ত্র	১৯৯১৪০৬	২০২৫৭২২	১৮২৩৫১৯	১৭২৯০৪৯	১৫৬৭৭৬৬	·৩১
খেলনা, খেলার সরঞ্জাম	২১৯৪২৯১	১৯৮৫৬৩০	২০৬৭২৮০	২১৯২২৯৭	১৫৪৪৪১০	·৩১
বেবার্ডেপারি এণ্ড মিলিনারি	২২৮১২২৯	২২৭৩৭১৪	২৭৮৪৪৯	১৭৮১২০৮	১৪২৩০৭৮	·২৮
চামড়া	২০২১৮৮০	২২৫৮২৮০	২১৬৪০৪০	২৩৮১১০২	১৪১৫৮১৯	·২৮
ফ্লাক্স্	১৭২৪৭২১	২১১৫৪৯৪	১৮৯৯০১৯	১৮৯০৭৭৯	১১৯৭২১২	·২৪
পোর্সেলিন্ মাটীর বাসন	১৬৪৬৯০১	১৬৮১০৬৯	১৬১৬৫৯৬	১৫১৫৮১৪	১০৬৫৪৬৯	·২২
যুদ্ধ যন্ত্র ইত্যাদি	১১৭৯৪৭৮	১২০৭০৪৭	১৭০৯৭৯২	১৭০৪৯৭৩	১০৩৪৭৮৮	·২১
ষ্টার্চ ও ফেরিনা	৫৮১৪৫১	৮২৬৬৮১	৯৭১০৩১	১৬৮৯২৫৮	১১১৬৯৫৪	·২১
কার্টলারি	১৫২৩৩৯৫	১৩২৭৯০২	১২২১৯৪৯	১৪৪৬৭৯১	৫০০০৬১৮	·২০
অন্যান্য জিনিস	২১৬৫৪১০২	২০৬১৯২২৯	২৪২১৬৯৭২	২৫৭৫৭২৮০	১২৪৪৯৭৫০	৩·১০
মোট	৮০০২৭৯১৯৬	৮৩৫২৪৭১৫৪	৮৬৬৫৯২০৪	৮১৩০৭৫১৮৫	৪৯৮৬১৭৪৩৩	১০০·০০

রপ্তানি

কলিকাতা বন্দর হইতে যে যে প্রধান পণ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়, নিম্নের তালিকায় তাহার তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

পণ্য দ্রব্য	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯		১৯৩০-৩১	মোট রপ্তানি
	টাঃ	টাঃ	টাঃ		টাঃ	বাদের শতাংশ
পাটের জিনিষ	৫৩০৬৭০৪১৩	৫৩৪৬৮৫৫৪০	৫৬৮১৫৯৮০৮	৫১৮৬০৪৫৯১	৩১৮৪৪৯৩০৩	৩৯·৪৫
চা	১৮৭৫৯৭৫৯০	২১৪৩২৭৭৫৮	১৬৭২৫৩৭০৭	১৬৭৮৭৫৩১৬	১৪৬৪৩২৬৪০	১৮·১৪
কাঁচা পাট	২৫৫৮৪৯৫৩৭	২৯০৮৮৮৮৬১	৩০৭৪১৫২২২	২৫৭৪৮৮৬৩৪	১২৪৬৩৪৭০৪	১৫·১৪
চামড়া আর স্কিন	৪৮১১৯০৫০	৫৭৮৯৯২২৩	৫৭১০২১৮১	৪৮২০৫৪৮৮	৩৩১৫৮১০০	৪·১২
বীজ	২৭১৩৯১৩৮	৩১৫৭৭৮৩৯	১৮৪২২০০১	৪০৪০৫১২০	৩২৮১২৮৩৪	৪·০৬
লাক্ষা	৫৪১৯৫৫৭০	৬৯১১২৭৯৬	৮৪৭১৬৩৭৭	৬৮৮২৪৪৩	৩১০৫০৩০০	৩·৮৫
ধাতু ও ওর্	২৬২১৮৪৭১	৩৩৭৫২৫৫০	৫৬১৫৭৮০৯	৪৯০৬৯৩৮৪	২৭১৬৫২৭১	৩·০৬
শস্য ডাল ও ময়দা	৩২৩০১২৬৩	৩৫২৬৪৮১৪	২৯৬১৮৮১৫	৩০১৬৭৪৬৮	২৫৬০৮৪৬১	২·৯৩
আফিমের	২১১৮৪০০০	১৯৯০৮০০০	১৫৭৪০০০০	১৪২০০০০০	১২২০৪০০০	১·৫১
সাবি	৫৮৮৯১৮৬	৫৬০৬১৯৫	৫৯৪৭০৩৭	৬১৫৭৮২৩	৬৩১৪১২৯	·৭৮
প্যারাফিনের মোমবাতি	২৬৪১৬১২	২৬০৬০৯০	১৯১৫৪৮০	৪৮০১২৩১	৫৬৮৭৮১৪	·৭০
গাইকা	৯০৫৭৮০৩	৭৮১১৭০০	৭৪২৪৩০০	৮৫৮২৮৪৭	৫২৯৭৮২৬	·৬৯
রবার	৮০৭০২৯০	৭৩৬৫৭২	৭১৮১৮৬৮	৭১২৫৫৮৩	৪৯২৪৫৮৩	·৬১

তাই এবং টান করিবার						
উপকরণ	৪৮৪৬৩৮৪	৮০৭৫৯৮৩	৫৭৪২৩৬৬	৪০১৫৩০৪	৩৭২১৫১৮	·৪৬
পশমী কাপড়	৩৩২৭৪০৮	৪৬৫৭৭৮৯	৪৫০৬৫৭৭	৫১৪৯৮২৪	৩৭০২৪৯১	·৪৬
পোষাক আটিকেল	৪৭৫৯৫৪২	৬১১৩৮৪৫	৬১৬৯১৩৮	৩৭০৬৫০৪	৩২৪০৪০২	·৪০
বইএ	৫২৬৭৮৪২	৭০৪৮৯৭৪	৯২০২৫২১	৫৮৬১৩৮১	৩২৩৮৯৯১	·৪০
সূতা	৫৯৩৮৩৩৯	৫৩৬৭০২৭	৬৮০৬৬৪০	৪৭১০৮৮৫	২৯০৪৩১৫	·৩৬
কার্পাস তুলা	৬৪০১২৫৭	৭১৪৭৪২৩	৫৮৩২০১৪	৩৩৪৫২৩০	২৮৩০৯০৭১	·৩৫
মসলা	২৭৫৯০৭	৩৯১২৩৭৯	২২৩১৯৫৬	২৫৫২৬৪০	২৩৩২০৮০	·২৯
খাদ্য দ্রব্য অহেলমানস্						
ষ্টোর্স	২৮৫৩১৭৩	২৭১২৬৮৮	২৭৪৬৬৮৭	২৫৬৭০৪৫	২১৪২৫৩৬	·২৭
পোষাক	১৭৭৮১৫০	১৮৬৬০৫৫	১৩৮০৩১২	২০৭০৯২৭	১৩৪৮১৩৯	·১৭
ষ্টেশ	১১৮২৬২৩	১৩৯২৬৬৫	১১৩৯২৫২	১৩০২৮২৪	৮৫২৪৯৩	·১১
তামাক	৫০০৫৩৯	১৩৩৩৭৯৮	১৩৫২১৭৭	১৫৪০৮৯১	৪৭৩২২৪	·০৮
চায়ের বর্জ্জিত অংশ	২৩০৮৮৭	৪১৪১০৪	৩৭৮২৮৫	৪৫০০৭৪	৮২১২৮৪	·০৮
কর্ডেজ ও দড়ি	১৩১৭২৪১	১০৮২৭৩৭	১০০২৬৮৩	২১৫৬৬৮	৬১৭০৩৯	·০৮
চামড়া	৩২৪৬০১	৫৭৭৮১০	৭৮৩৭১৫	৮৩৭৭৭৯	৫৮০০৪২	·০৭
সল্ট পিটার	১১২৮১৮৯	২৭৯৩৫৯	৯৬৪২২২	২৬০৩২৪	৫৭১৪৭৫	·০৭
অন্যান্য জিনিষ	১২১০১৭৭৪	১০৮৬২৮৪	১১০৮১৫৪৯	১১১৬৮৪০০	৫৭০৬২৯৮	·৭১
মোট ভারতীয় মাল	১২৬৩৫৩৮৯৬	১৩৭৬৭০৮৭৭৯	১৩৬২২৬৫৫১৭	১২৬৪৭২৯১২৭	৮০৭২৬০২৮৩	১০০·০০
পুনঃ রপ্তানির মোট						
বিদেশী মাল	৫৬০২৬১০	৭০২৫৮২২	৫১৬১৭২৭	৫৫৬৪২১৭	৪২৩৮৮১৩	
মোট পণ্য দ্রব্য	১২৬৯৯৬৫৫০৩	১৩৮১৮৩৪৬০১	১৩৭৫২৩০২৪৪	১২৭০২৯৪০১৪	৮১১৪৯৯১০৭	

রপ্তানি কয়া জিনিষের মধ্যে সার রপ্তানি ৬১'৫৭ লাখ টাকা হইতে ৬৩'১৪ লাখ টাকায় উঠিয়াছে। সারের মধ্যে হাড়ের গুঁড়া ৫১'৬২ লাখ টাকা। বেলজিয়াম ভারতীয় সারের প্রধান খরিদ্দার। বেলজিয়ামের খরিদের পরিমাণ ২৪ ৫৫ লাখ টাকা। প্যারাফিন মোমবাতি রপ্তানি বৃদ্ধি ৪১'০১ লাখ টাকা হইতে ৫৬'৬৮ লাখ টাকা। পোর্ত্তুগীজ্ পূর্ব্বআফ্রিকা ২৯'৪৬ লাখ টাকার মোমবাতির ক্রেতা। পশমী কাপড় রপ্তানির মধ্যে কার্পেট এবং র‍্যাগ কম্বলই বেশী। এই চিজের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে ৪১'৫০ লাখ টাকা হইতে ৩৭'০৯ লাখ টাকায়। কল এবং শাক-সব্জী রপ্তানি কমিয়াছে ৫'৫০ লাখ টাকা হইতে ২'৯৬ লাখ টাকায়। শুকনো ফলই বেশী রপ্তানি হয়; ইহার দিক্কা ২'৫৮ লাখ টাকা। মসলা রপ্তানি হ্রাস ২৯'৬০ লাখ হইতে ২০'৩২ লাখ টাকার লঙ্কা রপ্তানি নামিবার জন্যই এই রপ্তানি হ্রাস। তামাক রপ্তানি হ্রাস ১০'৪১ হইতে ৬'৭১ লাখ টাকা। ইহার মধ্যে কাঁচা তামাকের মূল্য ৫'৭৩ লাখ টাকা, প্রধান খরিদ্দার জাপান, খরিদের পরিমাণ ৩'১২ লাখ টাকা। আহার্য্য বস্তু রপ্তানি হ্রাস ২৫'৬৭ লাখ টাকা। ঘী-রপ্তানির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। রপ্তানি হ্রাস ২১'২২ লাখ হইতে ১৭'৭১ লাখ টাকা। এই ৩'২৮ লাখ টাকার কম রপ্তানির জন্য ষ্টেটস্ সেটেলমেন্ট দায়ী। এই দেশই ভারতীয় ঘীয়ের একমাত্র খরিদ্দার।

বাঙ্গালার বস্ত্র-সমস্যা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

বাঙ্গালার অন্ন সমস্যার সহিত বস্ত্রসমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্নের কথা মনে উঠিলেই অপরিহার্য্যরূপে বস্ত্রের কথা সঙ্গেই মনে উদিত হয়। তাই অন্নের পরেই বস্ত্রের কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই বিষয়টীতে বহু দিন যাবৎ মনোযোগ দিতেছেন। তাই আজ চরখার চলন ও কাপড়ের কলের আন্দোলন বিশেষভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। হয়ত এইভাবে একদিন আমরা কাপড়ে স্বাধীন হইতে পারিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদিগকে আরও কিছু ভাবিতে ও করিতে হইবে।

কাপড়ে স্বাধীন হইতে হইলে তুলায় এবং সুতায় স্বাধীন হইতে হইবে। এখন প্রতিযোগিতার যুগ। এই প্রতিযোগিতায় জিতিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রে বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের অর্থাৎ খরিদ্দারের মনের খবর জানিতে হইবে। লোকে চায় সস্তা, সুন্দর ও মজবুত জিনিষ। কাজে কাজেই যথাসম্ভব কম মূল্যে উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিয়া নৈপুণ্য সহকারে সুদৃশ্য অথচ মজবুত পণ্য উৎপাদন করিতে পারিলেই বাজার করায়ত্ত হইবে।

আমরা কাপড়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেছি কিন্তু তুলায় স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছি না। বাঙ্গালার মিলের জন্য অন্যান্য কৃষক তুলার চাষ করিতেছে। কত মাল, রেলওয়ের মারফৎ যানবাহনাদি খরচা বহন করিয়া যখন মিলে আসিয়া তুলা পৌঁছায় তখন দেখা যায় যে, অন্য দেশের তুলাওয়ালা তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে তুলা পাইয়া থাকে। অথচ বাঙ্গালার কৃষকেরা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ করিয়া না খাইয়া মরিতেছে ও দেশে আধিব্যাধির বিস্তার করিতেছে। বাহিরের তুলার উপর নির্ভর করিয়া মিলের লাভ্য কামনা করা স্বপ্ন ভিন্ন কিছুই নয়।

কেহ কেহ বলেন যে অন্য দেশের জমি কম মূল্যবান এবং সেখানকার চাষারা তুলার চাষ করিয়া সামান্যই মুনাফা পায়। কিন্তু এদেশেও বহু জমি অনাবাদী পতিত থাকে। কেন নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার দিকে নজর দিলেই দেখিতে পাইবেন যে কথাটা কত সত্য। বাঙ্গালার জমি মূল্যবান হইতে পারে (যদিও ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে), তুলার চাষেও অন্য চাষের চেয়ে কম আয় হইতে পারে। কিন্তু যে সব জমি বহুকাল অনাবাদী থাকিয়া ক্রমে বন জঙ্গলে পরিণত হইতেছে তাহাতে কৃষকদের কি লাভ?

যদি তুলায় স্বাধীনতা আসে, তবে চরখাতে হউক বা মিলেই হউক কাপড়ে স্বাধীনতা পাওয়ার বাধা থাকিবে না। কিন্তু এখানেও বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে মিল ছিল না। তখাপি কাপড় তৈয়ারী হইত প্রচুর। তখন কাপড়ে স্বাধীনতা ত ছিলই অধিকন্তু ইহা বহির্ব্বাণিজ্যেও মূলধনরূপে বিদেশের বহু ধন হরণ করিয়া আনিত।

এরূপ অলঙ্ঘ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা বলি যে যন্ত্র ভিন্ন বস্ত্রসমস্যা সমাধান থাকে না। ইহা আসলে কতদূর সত্যতা দেখার চেয়ে নিজ নিজ কল্পনার কতটা পরিপোষক অন্বেষণ তাই চিন্তা করেন।

তুলায় স্বাধীনতা লাভের পর আমাদিগকে সুতায় স্বাধীন হইতে হইবে। ইহার জন্য হয় চরখার আশ্রয় লইতে হইবে, না হয় মিলের উপাসনা করিতে হইবে। ইচ্ছা হয়, আপনি মিলের মধ্য দিয়া ধনীর ঐশ্বর্য্যের পূজা করিতে পারেন বা চরখার মধ্যে দরিদ্র প্রতিবেশীর মৈত্রকে পূজা করিতে পারেন। কিন্তু চরখাকে শক্তি সমীক্ষার আহ্বান করিবেন না। মিল ও চরখার মধ্যে দুটি বিভিন্ন ভিন্ন কোন সমাধান নাই। কতকগুলি লোক চেষ্টা করিয়া একটা দেশকে হয়ত সস্তা করিতে পারে কিন্তু সব

মূলের দরকার। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি সস্তা হয় তবে সমস্ত দেশটা নিশ্চয়ই সস্তা হয়, আর সময়ও অতি সামান্য লাগে। মিলে ও চরখাতে এই প্রভেদ। মিল বিলাতের খাটিয়া সমস্ত দেশের আবশ্যক সূতা উৎপাদন করিতে চেষ্টিত থাকিয়াও অভাব মিটাইতে পারিতেছে না। পরন্তু প্রত্যেক অবসর সময়েই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ প্রয়োজন মত সূতা চরখার সাহায্যে অনায়াসে করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু আমরা যন্ত্রসভ্যতার পূজারী, তাই যন্ত্রের তর্পণ করি। কিন্তু এই যন্ত্রের মধ্যেই যে আমরা নিজেদের মঙ্গল নির্দ্দয়ভাবে নিষ্পেষিত করিতেছি সে কথা খুব বেশী লোকে ভাবে না। একটা মিলপ্রতিষ্ঠা করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছি, তার পরিবর্ত্তনে সহস্র সহস্র শ্রমিক আট-কাইয়া রাখিতেছি এবং পাছে তারা মিলের আয়তন পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পল্লীর শান্ত সুধুর নীড়ে ফিরিয়া যায় সেই ভয়ে তাহাদের চারিদিকে মদ্য বারবনিতাদি হীন প্রলোভনের বেড়া দেওয়া হইতেছে। মিলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কত পল্লী হতশ্রী হইয়াছে, কত গৃহ শ্মশান হইয়াছে—তার উপর নৈতিক অবনতির ত কথাই নাই। দেশকে বস্ত্রবিলাসী করিবার জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিবস্ত্র করিতেছি। দেশের অর্থাগমের জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিরন্ন কাঙ্গালে পরিণত করিতেছি। দেশের শ্রীসম্পদ আনিবার চেষ্টায় বহু অর্থ কলকব্জার জন্য বিদেশে পাঠাইতেছে। পল্লীজীবনে দুর্ব্বিসহ বেদনা প্রস্তুত করিতেছে কে? মিল। আমরা সেই মিলেরই যশোগীতি গাহিতেছি।

যদি সূতার জন্য পরের মুখের দিকে চাহিতে না হয়, তাহলে কাপড়ের জন্যও মিলের মুখের দিকে চাহিতে হইবে না। বাঙ্গালার তাঁতীরা দুর্ব্বল হইতে পারে, তাদের তাঁতের উৎপাদন-ক্ষমতা কম হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার বস্ত্রবিলাস মিটাইতে তাহারা এখনও খুব সমর্থ। মিলের গুণগান করিতে করিতে ধনীর স্তাবকদল তাঁতীদের উপহাস করে। মিল নাকি কম দামে কাপড় দিতেছে আর তাঁতীরা প্রতি-যোগিতায় হটিতেছে। কিন্তু ঘটনা যে বাস্তবিক তা নয় সে সত্য একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই।

বাস্তবিক: দেখা যাইতেছে যে, কাপড়ের জন্য ভারতের ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত লড়াই চলিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ রাগে যে মিলের ও তাঁতের মধ্যে কি মারাত্মক বিবাদ চলিতেছে তার সন্ধান কয়জন রাখিতেছে? মিল বুঝিয়াছে যে এই স্বদেশীর অকাল-ছায়ায় এইবার নিজের আসন কায়েম করিতে হইবে। কিন্তু তার পক্ষ কে? তাঁত। তাই মিল আজ তাঁতকে নষ্ট করিবার আয়োজন করিয়াছে। সূতা উৎপাদন আজ মিলের একচেটিয়া—তাই তাঁত দুর্ব্বল।* আর এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগে মিল নি সূতা উচ্চ মূল্যে এবং নিজ কাপড় যথাসম্ভব কম দ বেচিতেছে। তাঁতী নিরুপায়। অথবা মূল্যে সূতা কিনি নিজের প্রস্তুত কাপড়ে তারা কিছুমাত্র মজুরী পাইতেছে না

মিলের এই দুরভিসন্ধিতে কত সহস্র সহস্র তাঁ পথের ভিখারী হইতেছে কে তাহার হিসাব রাখিতেছে দেশের এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় গৃহশিল্পটী ধ্বংসের পথে অনে দূর নামিয়া গিয়াছে। কে তাকে রক্ষা করিবে?

বাঙ্গালার নিরন্ন পল্লীবাসীর মুখে অন্ন দিতে হইলে বাঙ্গালার তাঁতীযোলা গৃহীকে রক্ষা করিতে হইবেই। বাঙ্গালী যদি পবিত্র বস্ত্র চায়, যদি দেশের ধনসম্পদ চায়, যদি স্নিগ্ধ মনোরম পল্লীশ্রী চায়, তবে তাঁতকে বাঁচাইতে হইবে। আজকার অসমপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়, অন্যায় যুদ্ধে তাকে বাঁচাইবার উপায় কি? এই অবস্থার প্রতীকারের প্রধানতঃ দুইটি পথ আছে। প্রথমতঃ ব্যাপকভাবে তুলা চাষের প্রচলন ও তথায় চরখার অবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র সূতার উৎপাদন জন্য মিল প্রতিষ্ঠা এবং কি হইতে অতি সামান্য লাভে সরাসরি তাঁতীকে সূতা সরবরাহ করা। প্রথমটীর সস্তায় চাষের চাটকা তুলা পাইলে চরখার জন্য যাহা উৎকৃষ্ট মজবুত সূতা হইবে তাঁতীও অনায়াসে মজুরী পাইয়া কাপড় বুনিয়া দিতে পারিবে। দ্বিতীয়ের মাত্র তাঁতীদের ব্যবহারের জন্য সূতার মিল প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁতী ন্যায্য মূল্যে সূতা পাইবে এবং নিজ মজুরী রাখিয়া প্রায় মিলের দরে কাপড় দিতে পারিবে। ইহাতে দে ধন সম্পদে পূর্ণ হইবে। পল্লী শ্রীসম্পন্ন হইবে, দারিদ্র কাহাকার পলায়ন করিবে এবং দেশ বস্ত্রে স্বাধীন লাভ করিবে।

* ৺ পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীসুধাংশু শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।